# কাজী মোতাহার হোসেন

সংকলন ■ সম্পাদনা ■ ভূমিকা

আবুল আহসান চৌধুরী

প্রায় এক শতাব্দীর প্রতিনিধি ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন মুক্তমানসের প্রতীক এক স্মরণীয় বাঙালি। তাঁর প্রতিভা নানাভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, জিজ্ঞাসু বিজ্ঞানসাধক, ওস্তাদ দাবাড়ু, সঙ্গীত-সমঝদার, মুক্ত-মন বুদ্ধিজীবী, কুশলী সংগঠক এবং নিষ্ঠ সাহিত্যসেবী।

ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর উদ্যোগে যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল, তিনি ছিলেন তার অন্যতম নেতৃপুরুষ। একটি সংস্কারমুক্ত আধুনিক প্রগতিবাদী সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রে যে মুক্তদৃষ্টি, কল্যাণবুদ্ধি ও প্রগতিচিন্তার দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর প্রতিফলন আছে তাঁর জীবনচর্যা ও রচনায়—বিশেষ করে প্রবন্ধাবলিতে।

সাহিত্যচর্চায় তাঁর মূল পরিচয় সমাজভাবুক মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেই চিহ্নিত। তাঁর প্রথম বই, প্রবন্ধসংকলন 'সঞ্চরণ', ঢাকা থেকে ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের 'স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষা', 'বলবার সাহস' ও 'চিন্তার স্বকীয়তা'র প্রশংসা করেছিলেন। জানা যায়, প্রমথ চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদের মতো ধ্রুপদী-প্রাবন্ধিকদেরও সমাদর পেয়েছিল বইটি। 'সঞ্চরণ'-এর পর দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশ পায় তাঁর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'র প্রথম খণ্ড (জুন ১৯৭৬)। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা একাডেমী থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী' (ডিসেম্বর ১৯৮৪, ডিসেম্বর ১৯৮৬, মে ১৯৯২, জুন ১৯৯২)। 'রচনাবলীতে' বেশকিছু অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত রচনা সংকলিত হয়, তবে এর বাইরেও থেকে যায় অনেক

পরবর্তী ফ্ল্যাপে

কাজী মোতাহার হোসেন

১১০তম জন্মবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

# প্রবন্ধ-সংগ্রহ

## কাজী মোতাহার হোসেন

সংকলন-সম্পাদনা-ভূমিকা
আবুল আহসান চৌধুরী

নবযুগ প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ-১৪১৪, জুলাই ২০০৭



মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

---

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। ফোন : ৭১১-৮৬৫৪, মোবাইল : ০১৭১১-৫২১৯৯৮
মুদ্রক : রুকু শাহ্ কম্পিউটার, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ০১৭১১-৭৩৮১৯২
লন্ডনে প্রাপ্তিস্থান : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিকলেন, ফোন : ০০৪৪২০৭২৪৭৫৯৫৪
ভারতে : দেজ পাবলিশিং, নয়াউদ্যোগ (কোলকাতা)
সুবর্ণরেখা (শান্তিনিকেতন)।
রেখাচিত্র : মুর্তজা বশীর
প্রচ্ছদ : উত্তম সেন

---

A COLLECTION OF ESSAYS : QUAZI MOTAHAR HUSSAIN (A Tribute to Quazi Motahar Hussain on his 110th Birth Anniversary.) Edited By Dr. Abul Ahsan Choudhury. Published by Ashok Roy Nandi of Nabajuga Prokashani. 2/3 Pari Das Road. Banglabazar. Dhaka-1100. Bangladesh. First Published : July 2007.

Cover : Uttam Sen. Price : Tk. 600.00.

রেখাচিত্র : মূর্তজা বশীর

# ভূমিকা

বহুমাত্রিক চরিত্র কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানসাধক, দাবাড়ু, সঙ্গীত-সমঝদার, সাহিত্যসেবী নানা অভিধায় চিহ্নিত হলেও তাঁর মূল পরিচয় সংস্কৃতিসাধক ও সমাজভাবুক মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেই।

২.

তাঁর প্রথম বই, প্রবন্ধসংকলন 'সঞ্চরণ', প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৩৭-এ। এই বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> আপনি বিচিত্র ভাবকে এবং আলোচনার বিষয়কে স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষার রূপ দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি আপনার 'সঞ্চরণ' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন তা পড়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি। আপনার বলবার সাহস এবং চিন্তার স্বকীয়তা সাধুবাদের যোগ্য। সাহিত্যপথে আপনার অধ্যবসায় জয়যুক্ত হোক এই কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য মোতাহার-মানস ও তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথার্থ ইঙ্গিত দেয়। 'স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষা', 'বলবার সাহস' ও 'চিন্তার স্বকীয়তা'র আদর্শ উত্তরকালে মোতাহার হোসেনের রচনাকে আরো মনোগ্রাহী ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করে তোলে।

৩.

তাঁর চিন্তা-চেতনায় যে সমাজমনস্কতা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় মেলে, তা তিনি মূলত পেয়েছিলেন ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর সূত্রে। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রয়াসের উদ্যোগ রচিত হয়। গড়ে ওঠে সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতনতাবোধ। সমাজ-জাগরণের এই ধারায় প্রাণিত হয়ে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ঢাকায় গড়ে ওঠে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'। বুদ্ধির মুক্তিই ছিল এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের ভেতর দিয়ে একটি সংস্কারমুক্ত আধুনিক প্রগতিবাদী সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট। এই সংগঠনই মোতাহার হোসেনের মন-মনন-মানসে মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিচিন্তার বীজ বপন করে দেয় এবং কালক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন মুক্তচিন্তার একনিষ্ঠ সাধক। 'সাহিত্য-সমাজে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার এবং এই সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা'র সম্পাদক হিসেবে তিনি যে মুক্তবুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনায়— বিশেষ করে প্রবন্ধাবলিতে।

৪.

মোতাহার হোসেন তাঁর প্রবন্ধচর্চার প্রেরণার পটভূমি ও তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং প্রবন্ধের বিষয় ও প্রকরণ সম্পর্কে নিজেই পাঠককে ধারণা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন :

> বস্তুতঃ সমাজে সংস্কৃতি, শিল্প ও ধর্ম নিয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাঙালী মুসলমান সমাজে যে নতুন চিন্তার উন্মেষ হয়— নব-জাগরণের সেই চিন্তার ধারা

আমাদের সকলের চিন্তায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার অনেকগুলি প্রবন্ধে সেই মানসিকতার ছাপ রয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে যে-গুলো ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতি নিয়ে সে-গুলোর মধ্যে ['নির্বাচিত প্রবন্ধ', ১ম খণ্ড, ঢাকা, পৃ. ভূমিকা-৬]।

পাশাপাশি তিনি তাঁর রচনার শিল্পগুণ রক্ষার ব্যাপারে যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, সে-বিষয়টিও স্পষ্ট করে বলেছেন :

> একটি কথা আমি আমার পাঠকদের বলব, আমার লেখায় প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম ও সমাজের কথা অনেকবার এসেছে, এসেছে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের কথা, শিল্প ও সংগীতের কথা— কিন্তু সে-সব কথা যাতে রিপোর্ট অর্থাৎ বিবরণী না হ'য়ে যায় সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল। আমি সাহিত্যকে সাহিত্য-রস থেকে বঞ্চিত করে বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের ওকালতি করিনি। সে-জন্যেই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমার প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'সঞ্চরণ'-এর কিছু প্রশংসা করেছিলেন [ঐ, পৃ. ভূমিকা-৬]।

'সঞ্চরণ'-এর পর দীর্ঘ ব্যবধানে জুন ১৯৭৬ ঢাকার মুক্তধারা থেকে প্রকাশ পায় তাঁর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'র প্রথম খণ্ড। অবশ্য এর মাঝে ৩২ বছর পর 'সঞ্চরণ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬৯) প্রকাশ করে ঢাকার সেবা প্রকাশনী। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা একাডেমী থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী' (ডিসেম্বর ১৯৮৪, ডিসেম্বর ১৯৮৬, মে ১৯৯২, জুন ১৯৯২)। এর বাইরেও থেকে যায় বেশকিছু অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত বাংলা-ইংরেজি রচনা।

৫.

মোতাহার হোসেনের চিন্তা-চেতনার মূল ধারাটি তাঁর সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, বিজ্ঞান ও ভাষা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের মাধ্যমেই প্রকাশিত। তাঁর সমাজবীক্ষণ মূলত বাঙালি মুসলমান সমাজকেন্দ্রিক হলেও তা প্রসঙ্গক্রমে সমগ্র বাঙালিসমাজকেও অনেকসময় স্পর্শ করেছে। বাঙালি মুসলমানের সংকট-সমস্যা-অবক্ষয়-অনগ্রসরতার কার্য-কারণ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। 'বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন', 'শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য', 'সাম্প্রদায়িক বিরোধ', 'আনন্দ ও মুসলমানগৃহ' প্রভৃতি প্রবন্ধে মোতাহার হোসেন বাঙালি মুসলমানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন উত্থান-রহিত জীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, অন্তঃ--পুরবাসিনী মুসলিম নারীর দুঃসহ অবরুদ্ধ জীবন, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও বিভেদ এবং উভয়ের জীবনযাপনের তুলনামূলক চিত্র মূলত এ-সব বিষয় তাঁর আলোচনায় এসেছে। সমাজ স্বভাবতই চলিষ্ণু—কিন্তু মুসলমান সমাজ স্থবির এবং তার বাস অজ্ঞতা-অশিক্ষা-কুসংস্কার-অনৈক্যের অন্ধকার বিবরে। মোতাহার হোসেন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, 'জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ হাসি ও আনন্দ'। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে',—কিন্তু তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, এই আনন্দ কেবল বাঙালি মুসলমানের জীবনে, মনে ও গৃহে অনুপস্থিত। কারণ, 'মুসলমান ত বেঁচে থাকতে আনন্দ করে না, সে ম'রে গিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ ক'রে পেট ভ'রে খাবে; আর হুর-পরীদের নিয়ে অনন্তকাল ধ'রে আনন্দ করবে। বাস্‌! এই তার সান্ত্বনা।' তাঁর বিবেচনায় বাঙালি মুসলমানের কোনো 'কালচার' নেই। তার ওপরে সুশিক্ষা-সুরুচির অভাব আছে বলেই—

> মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এক কথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোনও সম্পর্কেই থাকবে না। মুসলমান পুরুষেরা কেবল কাজ করবে, আর ঘর শাসন করবে; মেয়েরা কেবল রাঁধবে বাড়বে, আর ব'সে ব'সে স্বামীর পা টিপে দেবে ['আনন্দ ও মুসলমান গৃহ', 'সঞ্চরণ']।

নারী— বিশেষ করে মুসলিম রমণীর জীবনের ছবিও তাঁর রচনায় পরম মমতায় আঁকা হয়েছে,— যে অবরোধবাসিনী রমণী পর্দা-প্রথার শাসনে ম্রিয়মাণ, ঘরকন্না-সন্তানপালন আর স্বামীসেবায় সমর্পিত, গৃহগত আনন্দ ও সুখ যাদের কাছে চির অধরা। শাস্ত্র-ধর্ম-সংস্কার-সমাজ-পরিবারের শাসনে ও চাপে এইসব রমণীর জীবনযাপন যে কতোখানি শোচনীয় ও দুর্বিষহ ছিল তার খণ্ডচিত্র এইরকম : ...'খেলা-ধুলা, হাসি-তামাশা বা কোনও প্রকার আনন্দ তারা করবে না—সব সময় আদব-কায়দা নিয়ে দুরস্ত হয়ে থাকবে' ['আনন্দ ও মুসলমান গৃহ']। বাঙালি হিন্দু রমণী যেখানে শিক্ষার প্রভাবে 'সমস্ত কর্মে পুরুষের সহকর্মিণী' হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি সামাজিক আনুকূল্য থাকায় মুসলিম রমণী সেখানে অবরুদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে 'দিনগত পাপক্ষয়' করে চলেছে। মোতাহার হোসেন এই অসম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন, 'শিক্ষার চাঞ্চল্য পর্দার কুহক কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে তাহাদের সত্বর মুক্তি নাই' ['বাঙালীর সামাজিক জীবন', 'সঞ্চরণ']। নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণ সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্য নিছক তত্ত্বকথা ছিল না,— তাঁর আগ্রহ, সমর্থন ও প্রযত্নে নিজের পরিবারেও তার যথাযথ অনুশীলনে সক্রিয় ছিলেন তিনি।

৬.

সমাজ-প্রগতি ও জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায়ের সামাজিক ঐক্য যে বিশেষ জরুরি সেই বিষয়টির ওপরও তিনি জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে দেশভাগের পর পূর্বাঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি উল্লেখ করেছেন :

> হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতি হইলে তবেই বাঙলা প্রদেশের উন্নতি হইতে পারিবে। অতএব যাহাতে সামাজিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেধ অগ্রাহ্য করিয়া মূল সূত্র ধরিয়া বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে মিলন সম্ভবপর হয়, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের কতর্ব্য ['শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য', 'সঞ্চরণ']।

যে-দ্বিজাতি তত্ত্ব দেশভাগের রাজনৈতিক দর্শন ছিল, তা সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও কম-বেশি আচ্ছন্ন করেছিল। এই ধর্ম ও জাতিদ্বেষী সাংস্কৃতিক-উন্মাদনা সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দিয়ে এই প্রবণতার সমালোচনা করে বলেছিলেন :

> আশা করি নতুন জীবনের টানে আবার আমাদের দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য ফিরে আসবে। বিশেষ করে আমরা সাহিত্য বা সমাজ কিছুই পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারব না ['কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড]।

এই চিন্তার সূত্র ধরে তাই তিনি সেদিন সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনভূমি হবে পাকিস্তানী সাহিত্য'। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এক বৈরী সময়ে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এইভাবেই তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৭.

মোতাহার হোসেন পেশায় ছিলেন শিক্ষক। তাই তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবহারিক দিক ও প্রকৃত জ্ঞান-অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা—এইসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। তাঁর সেই চিন্তাধারাকে সংক্ষেপে সূত্রাকারে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

> ১. কোন্ জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য। এসবের ভিতর দিয়ে জাতির আশা-

আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়; নৈতিক ও সামাজিক মানের পরিমাপ পাওয়া যায়; এবং কর্মক্ষমতা, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, এক কথায় জাতীয় আদর্শের ভিত্তি-ভূমির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ['শিক্ষা-প্রসঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী', ২য় খণ্ড]।

২. বর্তমানে ইংরেজী ভাষার উপর যতটা জোর দেওয়া হচ্ছে তা অযৌক্তিক ব'লে মনে হয়। বলা বাহুল্য মাতৃভাষার দাবি সর্বাগ্রে...। ইউনিভার্সিটিতেও মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন ['শিক্ষা-প্রসঙ্গে']।

৩. আসল কাল্‌চার বলে তাকেই যা লোকের মনেপ্রাণে প্রবেশ করছে। সে কাল্‌চার মাতৃভাষার ভিতর দিয়েই আত্মস্থ হয়ে থাকে। দুই-চারটা ইংরেজী, বাংলা, উর্দু বা আরবী বোলচলি শুধু কণ্ঠাগ্রে রাখলেই, সত্যিকার সভ্য মানুষ হওয়া যায় না। দীর্ঘদিনের বদ্‌-অভ্যাসে আমরা এই সহজ সত্যটা ভুলে গিয়ে গতানুগতিক চিন্তাধারা আঁকড়ে মনের 'জড়ত্ব' প্রমাণ করছি মাত্র' ['শিক্ষা প্রসঙ্গে']

দৈববয়নের মতো শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মত ও মন্তব্যের কিছু নমুনা এখানে পেশ করা হলো যাতে এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৮.

মোতাহার হোসেনের ধর্মে বিশ্বাস ছিল, ছিল নিষ্ঠাও। ধর্মাচরণে কখনো শৈথিল্য আসেনি তাঁর। কিন্তু ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার কালিমা তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনো। তিনি ধর্মকে উপলব্ধির বিষয় ও অন্তরের সম্পদ বিবেচনা করতেন। তাই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকে তিনি কখনো অনুমোদন করেন নি। স্পষ্টই তাঁকে বলতে শুনি :

> সচরাচর আমাদের ধর্ম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে— অজ্ঞদিগের ধর্মোন্মত্ততা সৃষ্টি করে তার সুযোগ মতলব হাসিল করে নেবার জন্য—ভোট সংগ্রহ বা পার্টি গঠন দ্বারা প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভ করবার উদ্দেশ্যে। আজকাল তাই দেখা যায়, ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতির একটি প্রধান অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম যে এর থেকে স্বতন্ত্র বস্তু এ কথা যেন আজকাল আমরা বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিনে ['বাংলা ভাষার নতুন বিন্যাস', 'কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী', ৩য় খণ্ড]।

এই কথাটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কতো যে সত্য, তা দেশের মানুষ নিয়তই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে।

বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি সাহস করে যে কথাটি উচ্চারণ করেছেন তাতে তাঁর মুক্ত-মানসের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। বলেছেন তিনি :

> বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত সংঘর্ষে (অর্থাৎ জ্ঞানবিচার ও বুদ্ধির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাসগুলির যদি একটু পরিবর্তন হয়, তবে তাহা দূষণীয় নহে বরং সেইটিই প্রয়োজন ['ধর্ম ও সমাজ', 'সঞ্চরণ']।

৯.

কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক। তাই তাঁর চিন্তা-চেতনার একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল বিজ্ঞান। তবে বিজ্ঞান নিছকই তাঁর পেশাগত পঠন-পাঠনের বিষয় ছিল না। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সূত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর সন্ধিৎসা-কৌতূহল ও মৌলিক চিন্তাও ছিল। বিজ্ঞানকে তিনি নিছক যুক্তি প্রমাণের প্রণালীবদ্ধ শৃঙ্খলা-শাস্ত্র বিবেচনা করেন নি—তিনি একে দিয়েছিলেন সৃষ্টিশীল শাস্ত্রের মর্যাদা। তাই তাঁর মন-মনন-শাসনের স্বরূপ সন্ধানের জন্য তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ও চিন্তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে মোতাহার হোসেনের নিজস্ব একটি পাঠদান পদ্ধতি ছিল। তিনি জটিল বিষয়কে মাতৃভাষায় বোঝানোর পক্ষপাতী ছিলেন। আর পঠন-বিষয়ে উদাহরণ কিংবা সাদৃশ্য-বিবরণ আহরণ করতেন শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে। কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, গতানুগতিক কোনো প্রণালীও নয়, তিনি পড়াতেন নিজস্ব এক ভঙ্গিতে। জানা যায়, "... প্রচলিত ফরমূলাটাকে কাছে না নিয়ে তিনি নিত্য নতুন ফরমূলা ও পদ্ধতি নিজেই উদ্ভাবন করতেন। ...তিনি চাইতেন ছাত্ররা যেন মূলসূত্র (first Priniciple) থেকে যুক্তির প্রয়োগের দক্ষতা ও মানসিকতা অর্জন করতে পারে। বই থেকে না-বুঝে বা আধা বুঝে ক্লাশরুমে বা পরীক্ষার খাতায় উদ্‌গীর্ণ করা ছিল তাঁর অতি অপছন্দ" (কাজী ফজলুর রহমান, 'কাজী মোতাহার হোসেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ')। প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণা ও অনুসরণে তিনি পদার্থবিজ্ঞান কিংবা তথ্যগণিতের মতো দুরূহ বিষয় প্রথম থেকে বাংলাতেই পড়াতেন।

কাজী মোতাহার হোসেন বিজ্ঞানের সাধনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও ছিলেন নিবেদিত। তাই তাঁর সাহিত্যবিষয়ক মননশীল রচনায় নিরাবেগ-যুক্তিনিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য এবং বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় সাহিত্যের সংবেদনা ও রসবোধ এবং সামাজিক কল্যাণচিন্তার ছাপও পড়েছে। তিনি নিজেও এ-কথা বলেছেন : 'বিজ্ঞান যে সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত হয়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং তা সমাজ ও জাতির মঙ্গল সাধনে শুভ-ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেটা দেখানোও আমার উদ্দেশ্য' (ভূমিকা, 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', ১ম খণ্ড)। তাঁর 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্দেশের পাশাপাশি এদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টাও করেছেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চিন্তা তাঁর মনে যে সক্রিয় ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

মোতাহার হোসেনের বিজ্ঞানচিন্তা ছিল নিখাদ ও যুক্তিশাসিত। আমাদের দেশের অনেক মনীষীর মতো তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের অযৌক্তিক সমন্বয় ও সরল সমীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি স্পষ্টই বলতে পারেন : 'বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত সংঘর্ষে (অর্থাৎ জ্ঞানবিচার ও বুদ্ধির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাসগুলির যদি একটু পরিবর্তন হয় তবে তাহা দূষণীয় নহে বরং সেইটিই প্রয়োজন' ('সঞ্চরণ')। সক্রেটিস ও গ্যালিলিওর সত্য-প্রকাশের চরম পরিণাম-ফলের দৃষ্টান্ত টেনে এ-কথাও তিনি বলেছেন : '...মত বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে পৃথিবীতে জ্ঞানের উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হত। বর্বরতা স্থায়ী করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নতুনের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে স্থায়ী হয়ে পুরাতনকেই আঁকড়ে বসে থাকা' ('কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী', ২য় খণ্ড)। বিজ্ঞানচর্চায় তিনি 'সংস্কারমুক্ত নিরাসক্ত বিচারকেই গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তাঁর বিবেচনায়, '...বৈজ্ঞানিক সচরাচর দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনাকেই বিশেষভাবে পরখ করে দেখতে চান। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়াদির প্রাধান্য নাই' ('সঞ্চরণ')।

বিশ্বাস নয়, নির্ভুল তথ্য আর অকাট্য যুক্তিই বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন– সিদ্ধান্তের মূল উপকরণ। তাই রক্ষণশীল শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধারণের চোখে বিজ্ঞানীর স্বরূপ ভিন্নভাবে উদ্‌ঘাটিত। তাদের কাছে বিজ্ঞানীকে 'বস্তুতান্ত্রিক নির্মম বিশ্লেষক ও নাস্তিক' আখ্যাও পেতে হয় অনেক সময়। কিন্তু তা-যে সঠিক মূল্যায়ন নয়, যুক্তি দিয়ে তা তিনি প্রমাণ করেছেন।

কাজী মোতাহার হোসেনের বিজ্ঞানদৃষ্টির পেছনে নিছক জ্ঞানস্পৃহাই নয়, ছিল কল্যাণবুদ্ধি মানবতাবোধের ধারণাও। তিনি ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি ইংরেজি

প্রবন্ধের অনুবাদ করেন 'সভ্যতা ও বিজ্ঞান' নামে। এই প্রবন্ধটি তর্জমায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন শুভবুদ্ধির প্রেরণা আর নিজের মতের প্রতিফলন লক্ষ করে। প্রবন্ধটির মূল বিষয় ছিল বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অপপ্রয়োগ, এর নারকীয় ধ্বংসলীলা ও এর ফলে সভ্যতার সংকটের কথা এবং সর্বোপরি এই সমস্যা-সংকট উত্তরণের উপায়-নির্দেশ।

১০.

ভাষা-সাহিত্যের আলোচনা-বিশ্লেষণেও তিনি মুক্তদৃষ্টি ও নির্ভীকচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের সঙ্গে জীবন ও সমাজের যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, তা যে বায়বীয় কল্পনার বিষয় নয়,—এই ধারণায় আস্থাবান ছিলেন তিনি। তাই এক আলাপচারিতায় তিনি 'শিল্পের জন্য শিল্প'—এই তত্ত্বকে 'ছেঁদো কথা' বলে খারিজ করে দিয়েছিলেন ['সাপ্তাহিক বিচিত্রা', ১১ আগস্ট ১৯৭৮]।

সাহিত্যের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে এই রচনায় :

> মানবচিত্তের বিভিন্ন অবস্থায় রসযুক্ত সম্যক্ প্রকাশ লইয়াই সাহিত্যের কারবার। সাহিত্য কখনওবা অগ্রদূত হইয়া সমাজকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে, আবার কখনও বা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজের প্রতিস্তরের প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখায়। এইরূপে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্ঘোষিত হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশের চিত্তের প্রকৃত ইতিহাস রচিত ও রক্ষিত হয় ['বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপ', 'সঞ্চরণ']।

অন্যত্রও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, 'সমাজ-মনের প্রকাশ থাকাতেই সাহিত্য হৃদয়গ্রাহী হয়। তাই সমাজ-মনটাকে বুঝে নেওয়া, সাহিত্যরচনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক' ['সাহিত্য-প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা', কা.মো.হো. রচনাবলী, ১ম খণ্ড]। মোতাহার হোসেনের সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাতে লেখকের সামাজিক ভূমিকা ও সেইসঙ্গে শিল্পবোধের বিষয়টিই মূলত গুরুত্ব লাভ করেছে।

১১.

রাষ্ট্রভাষা, ভাষা-সংস্কার কিংবা হরফ-পরিবর্তন সম্পর্কে মোতাহার হোসেনের মত ছিল স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ। এ-সব বিষয়ে কখনো আবেগতাড়িত হয়ে নয়, বরং তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তাঁর মত-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে মোতাহার হোসেনের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ১৯৪৭-এর ১৫ সেপ্টেম্বর, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক মাসের মধ্যেই, প্রকাশিত তাঁর 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষাসমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন :

> ...পূর্ব-পাকিস্তানের রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হওয়া স্বাভাবিক ও সমীচীন। কোনও কোনও পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালীর মুখেই ইতিমধ্যে উর্দুর ঝনৎকার শুনা যাচ্ছে। কিন্তু এঁদের বিচার-বুদ্ধিকে প্রশংসা করা যায় না। ...এ সমস্ত উক্তি 'কলের মানুষে'র অবোধ অপুষ্ট মনেরই অভিব্যক্তি। এতে বাঙ্গালীর জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। এর ফল এই দাঁড়াবে যে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান ইংরাজ-রাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অমনিই পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিরাজের কবলে যেয়ে পড়বে।

ঐ একই প্রবন্ধে তিনি সতর্ক করে দিয়ে এ-কথা উচ্চারণ করেছিলেন যে :

> বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা করা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারেনা। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।

ইতিহাসের পথ বেয়েই এ-উক্তি চরম সত্যমূল্য লাভ করেছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে ভাষা-আন্দোলনই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মনে মানসিক ব্যবধান রচনা করেছিল এবং বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আন্দোলনকে ভিত্তি দিয়েছিল। বাঙালির এই গণজাগরণ ক্রম-পরিণতি লাভ করে মুক্তি-সংগ্রাম ও স্বাধীনতার আন্দোলনে—পূর্ব ও পশ্চিমের চিরবিচ্ছেদের ভেতর দিয়ে।

"ভাষা-সংস্কার প্রসঙ্গেও তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য পেশ করেছিলেন। 'বাংলা ভাষা সমস্যা' নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন :

> ... পণ্ডিতদেরই হোক, সমাজপতিদেরই হোক অথবা রাজনীতিকদেরই হোক, কারও নির্দেশমত ভাষার কোনও স্থায়ী সংশোধন বা সমৃদ্ধি লাভ হয়না— হবেনা। এরূপ অবাঞ্ছিত ও আত্মঘাতী হস্তক্ষেপের ফলে দেশবাসীর চিন্তাশক্তিতে বাধা পড়বে, তাবের স্বাধীনতা ব্যাহত হবে, ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যজনিত আনন্দের অভাব হবে ['নির্বাচিত প্রবন্ধ']।

বাংলা বানান ও লিপি-সংস্কার উপসঙ্ঘের সদস্য হিসেবেও তিনি সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেছিলেন। আরবি ও রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা-লিখনের উদ্যোগ ও প্রয়াসেরও প্রতিবাদ জানান তিনি।

১২.

মোতাহার হোসেনের ১১০তম জন্মবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তাঁর একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজী মোতাহার হোসেন ফাউণ্ডেশন। সেই পরিকল্পনারই রূপ এই বই। এক-অর্থে এটি তাঁর প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলনই। মোতাহার হোসেন নানা বিষয়ে যে-সব প্রবন্ধ বা প্রবন্ধধর্মী রচনা লিখেছিলেন তা থেকে নির্বাচন করা হয়েছে 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ'-এর প্রবন্ধগুলো। এই নির্বাচনে গ্রন্থ-সম্পাদকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হলেও প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষাবৈশিষ্ট্যকেই মূলত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মোতাহার হোসেনের প্রবন্ধাবলিকে 'সাহিত্য', 'ভাষা-সংস্কৃতি', 'আলোচনা-সমালোচনা-ভূমিকা', 'শিক্ষা', 'ধর্ম', 'বিজ্ঞান', 'দর্শন', 'সংগীত', 'মনীষী-মূল্যায়ন', 'বিবিধ প্রসঙ্গ'—শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সংকলিত প্রবন্ধগুচ্ছে মোতাহার হোসেনের বিচিত্র আগ্রহ, মানসতা ও সন্ধিৎসার পরিচয় মিলবে। আশা করি এই 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে' মোতাহার হোসেনের চিন্তা-চেতনার প্রকৃত স্বরূপটি আবিষ্কার সম্ভব হবে।

১৩.

কাজী মোতাহার হোসেন ফাউণ্ডেশন এই 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' সংকলন-সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। নেপথ্যে থেকেও এই কাজে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা ও সহায়তা দিয়েছেন প্রফেসর সনজীদা খাতুন। তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশক যে আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তাতে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রান্তিকালে বা সংকট-মুহূর্তে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের মতো মুক্তবুদ্ধির স্বচ্ছ সৎ সাহসী মানুষের বড়ো প্রয়োজন বিবেকী ভূমিকা পালনের জন্যে। মুক্ত মনের মানুষ ও মুক্ত সমাজ সৃজনে তাঁর মতো মনীষীর রচনা কালান্তরেও প্রেরণার উৎস। তাঁর এই অসামান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকার কথা স্মরণ করে আসন্ন ১১০তম জন্মবর্ষে তাঁর প্রতি নিবেদন করি আন্তরিক শ্রদ্ধা।

আবুল আহসান চৌধুরী

াংলা বিভাগ
সলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ষ্টিয়া বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

# সাহিত্য

# সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব

বহির্জগতে যেমন নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিকশিত হয়, অন্তর্জগতেও সেইরূপ চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান-ধারণার অপরূপ বিচিত্রতায় মানসলোকের অসীম রহস্য উৎসারিত হয়। অন্তঃপ্রকৃতি কাহারও শেফালির ন্যায় স্নিগ্ধ, কাহারও বা হাসনাহেনার ন্যায় উগ্র, কাহারও বেতশ লতার ন্যায় নমনীয়, কাহারও বা শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সুদৃঢ়; কাহারও নক্ষত্রখচিত গগনের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর, কাহারও বা ব্যাত্যাতাড়িত বনানীর ন্যায় শতধাবিক্ষুব্ধ। দৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য যেমন মনোহর, অন্তর্জগতের ভাবপুঞ্জও সেইরূপ বিস্ময়কর।

বাহ্যজগতের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া বোধশক্তি জাগ্রত করে। প্রত্যেকের মানসিক প্রবণতা বা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, ইহারই বিচিত্র প্রকাশ। মানব-জীবনের প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যে মূর্ত হইয়া উঠে; এজন্য সাহিত্যের ভিতর আমরা অনন্ত বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই। এই বৈচিত্র্য কেবল ভাষাগত তাহা নহে—ইহার মূলীভূত কারণ লেখকের চিত্ত-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত থাকায় ইহা রুচিগত বা প্রকৃতিগত।

সাহিত্য পাঠ করিয়া পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার হয় কেন? একথার উত্তরে বোধ হয় বলা যায়, ইহা সাহিত্যিকের চিত্তের সহিত পরিচয়ের আনন্দ। আমাদের স্মৃতিমূলে যে সকল মনোহর চিত্র সমাবিষ্ট হইয়া আছে, সাহিত্যিকের চিত্তের স্পর্শে তাহা জীবন লাভ করিয়া আনন্দের হেতু হয়। ইহাই সাহিত্যের রস। জীবনের সহিত সাহিত্যের নিবিড় যোগ থাকা সত্ত্বেও ইহা অবসরকালের বিবৃতি, প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে। সংঘটনকালে যে ব্যাপার আমাদের অত্যধিক আনন্দ বা পীড়াজনক হয়, বিবৃতিকালে তাহারই উগ্রতা কমিয়া গিয়া স্মৃতিমূলে সঞ্চিত চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া সাহিত্যরসের সৃষ্টি করে। এই কারণেই আমরা সাহিত্যে একদিকে যেমন মিলন, প্রেম, যৌবন ও সফলতার স্তবগানে আনন্দ উপভোগ করি, অন্যদিকে তেমনই বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ, বার্ধক্য এবং অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের চিত্রেও সাহিত্যিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি।

মনের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সাহিত্যিক আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তাহার জন্য নৈর্ব্যক্তিক স্থৈর্য ও প্রশান্তি আবশ্যক। পাঠকের পক্ষে যাহা সত্য, রচয়িতার পক্ষেও তাহাই সত্য। সাহিত্যস্রষ্টা ঘটনার ফটোগ্রাফার বা গ্রামোফোন মাত্র নহেন। সাহিত্যিকের মনে ঘটনার যে চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কোনো কোনো অংশ প্রধান এবং কোনো কোনো অংশ অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বলিয়া মনে হয়। এই নির্বাচনেই সাহিত্যিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহাতেই সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অতএব দেখা যাইতেছে, ঘটনার যে প্রযোজনা বা রূপসংস্থান সাহিত্যে স্থান পায় তাহা বাস্তব ঘটনার সহিত (অন্ততঃ সম্ভাব্যতার

বাড়াইয়াছেন, চিরাচরিত মিথ্যাচারের দিকে তিনি কিরূপ মুক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া অটল ধৈর্য এবং পৌরুষের সহিত কল্যাণপথ কাটিয়া চলিয়াছেন, এক কথায় নিজের সহিত বিশ্বজগতের তাবৎ সম্বন্ধকে তিনি কি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, ইহারই (তত্ত্বমূলক নয়) রসমূলক পরিচয় আমরা তাঁহার রচনার মধ্যে লাভ করি। ইহা লাভ করিতে আমাদের মাথা ঘামাইতে হয় না, রসসহযোগে অবলীলাক্রমে এই সমস্তের একটা সমগ্র ছবি আমাদের চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। ইহাই সাহিত্যের বিশেষত্ব। সাহিত্যশিল্পীর মনঃসৌন্দর্য এক প্রকার বিনা আয়াসে রস ভোগের মধ্য দিয়া সমঝদার পাঠকের চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। শরৎচন্দ্রও বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষাগুরু, কিন্তু গুরুমহাশয় নহেন। তিনি উপন্যাস লিখিয়াছেন, আপন মনের প্রাচুর্যে গল্পের পর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চিত্তরসে অভিষিক্ত হইয়া সজীব চরিত্র-সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত চরিত্রের ভিতর দিয়া তিনি যে মাধুর্যের সঞ্চার করিয়াছেন, তার মূলে রহিয়াছে তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। যে ঔদার্যপূর্ণ দৃষ্টির ফলে তিনি মন্দের মধ্যেও নিছক মন্দই দেখিতে পান নাই, (বরং সেখানেও মহত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন;) এবং যে পরিপূর্ণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে তিনি পরিত্যক্তার প্রতি সমাজের মর্মন্তুদ অত্যাচার লক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। যথার্থ সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীই এক মূল্যবান সম্পদ—বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সাহিত্যিক এই দৃষ্টিভঙ্গীই উপহার দিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার অমরতার কারণ।

আত্মাশ্রিত সাহিত্যই উৎকৃষ্ট, না বহিরাশ্রিত সাহিত্যই উৎকৃষ্ট, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ আছে। এই সমস্ত বাদানুবাদ প্রায়শঃ কথার ঘোরফেরের উপরই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সাহিত্য লেখকের চিত্তরসে সিঞ্চিত, অতএব ইহা অবশ্যই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে সাহিত্য অবশ্যই আত্মাশ্রিত। যাঁহারা বলেন সাহিত্য আত্মাশ্রিত হইলে নিম্নাঙ্গের হয়, তাঁহাদের কথার মূল লক্ষ্য হইতেছে এই যে, আপন মনের বিক্ষোভ বা অনুভূতি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, অতএব তাহাতে সর্বজনের কৌতূহল বা আনন্দের কি হেতু থাকিতে পারে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য বিক্ষুব্ধ অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা নহে। বরং তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্মৃতিরসাশ্রিত শান্ত-সমাহিত অবস্থার স্বতঃউৎসারিত বাণী। সাহিত্যিক যে দৃষ্টিতে ঘটনা বা ভাবপুঞ্জের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহার ফলে ওগুলি তাঁহার অন্তঃকরণে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া এক অনির্বচনীয় সর্বজন-মনোহারী রূপ পরিগ্রহ করে। এই অন্তররসের অভিষেকেই যাহা ব্যক্তিগত তাহা সার্বজনীন হইয়া উঠে, যাহা ক্ষণকালীন অনুভূতি তাহা চিরকালীন সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সাহিত্যিক সত্যদ্রষ্টা; তিনি ঘটনা ও ব্যক্তির অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া অন্যের অপরিদৃষ্ট অতি নিগূঢ় সম্বন্ধাদি নির্ণয় করিয়া পরিচিতকে অভিনব এবং অকিঞ্চিৎকরকে অসাধারণত্ব দান করিয়া থাকেন। সাহিত্যিকের তুলি-স্পর্শেই পাঠকের মনের অস্পষ্ট চিত্র, সৌষ্ঠব-সৌষ্ঠবে পুষ্টাঙ্গ হইয়া অভাবনীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এজন্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্য দৃশ্যতঃ বহিরাশ্রিত হইলেও, গভীরভাবে আত্মাশ্রিত এবং গভীরভাবে আত্মাশ্রিত বলিয়াই সর্বজনের অন্তগ্রাহ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে।

দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতরেই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, এই কারণেই তিনি নব নব সৌন্দর্য আবিষ্কার করিতে পারেন। সাধারণ লোকের চক্ষুতে জগতের শোভা তেমন করিয়া ধরা পড়ে না। এজন্য যদি বলা যায়,

সাহিত্যিক শোভা ও সৌন্দর্য শুধু আবিষ্কার নয়, সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহা অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর ভাবপুঞ্জের কুঞ্চিকা সাহিত্যিকদের হস্তেই ন্যস্ত। তাহারাই জগৎকে আদর্শ হইতে আদর্শান্তরে লইয়া গিয়া প্রগতির পথে চালিত করিতেছেন। সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীই ক্রমশঃ পরিণত হইতে হইতে সমগ্র জাতির দৃষ্টিভঙ্গী বা ভাববৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এজন্য জগৎ সাহিত্যিকবর্গের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। সভ্যতার অগ্রদূত স্বরূপ সাহিত্যিক পরিদৃষ্টি ক্রমশঃ নির্মল হইতে নির্মলতর হইয়া সাময়িক যাবতীয় সমস্যা সমাধান করিয়া প্রেম ও প্রীতিমূলক আদর্শ মানবসভ্যতার পত্তন করিতে পারিবে, এ আশা বোধ হয় দুরাশা নয়।

# সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ

সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ আবশ্যক। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সংগে মানুষের গভীর যোগাযোগ এই দু'টিকেই মোটামুটিভাবে সাহিত্যের পরিবেশ বলা যায়। এই পরিবেশ থেকেই বিষয়বস্তু আহরণ করে সাহিত্য রচিত হয়। বিষয়বস্তুর চয়ন, বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও বর্ণনা (বা সাহিত্যিক প্রকাশ) রচয়িতার নিজস্ব গুণ। এর উৎকর্ষ নির্ভর করে তার মানসিক প্রস্তুতি, অন্তর্দৃষ্টি, সমবেদনা, শিক্ষা ও সাধনার ওপর। বিশেষ করে শিক্ষা ও সাধনা লেখকের নিজস্ব গুণ হলেও বহুলাংশে শিক্ষা ব্যবস্থা পাঠকের রুচি ও সমঝদারী, সমাজের আচার ব্যবহার, তাহজীব-তমুদ্দুন প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অতএব দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যের ভেতর রচয়িতার বিশিষ্ট যোগ্যতা প্রতিফলিত হলেও এর ওপর পরিবেশের প্রভাবও সামান্য নয়।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ-ক্রটির বিষয় অনেক দিন থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে। এর প্রধান ক্রটি, পারিপার্শ্বিকের সংগে পাঠ্য-বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগের অভাব, বিদেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আপেক্ষিক ঔদাস্য, আর সাধারণ শিক্ষকদের অযোগ্যতা। দেশে শতকরা আশি জন কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও কোন্ ঋতুতে কোন্ ফসল জন্মে, কোন্ ফসলের কি প্রকার সার আবশ্যক, বা চাষের প্রক্রিয়া কিরূপ, কোন্ ফসলে বিঘাপ্রতি কতটা বীজ লাগে বা 'কত ধানে কত চাল হয়' এসব শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করি, অথচ দেশে কলকারখানা, রেলওয়ে ইঞ্জিন বা মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের সঙ্গে কোনো পরিচয় লাভ করিনে; আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে কেবল মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাপ্রণালী দেখলেও স্পষ্ট বুঝা যায়, কতকগুলো ফরমুলার মত বাণী মুখস্থ করে উদ্‌গীরণ করতে পারলেই পাশ অবধারিত,— ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য কি, বর্তমান জগতের অন্যান্য আদর্শের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ইসলামের, তথা ব্যবহারিক ইসলামের স্থান কোথায়, পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থা কেন এবং কি কি বিষয়ে পৃথক হয়েছে, আর এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য কি, এসব মৌলিক শিক্ষার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়ও এই রকম, কতকগুলো ইংরেজী শ্লোগান শিখে আমরা সময়ে অসময়ে সেগুলো আওড়িয়ে থাকি এবং সেই অহঙ্কারে নিজেদেরকে বিষম পণ্ডিত বলে মনে ভেবে, অপরের প্রতি বেশ খানিটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করি। এই অসুস্থ পরিবেশে, দৈন্যপিষ্ট অবহেলিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করে আমাদের ছাত্রদের বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হচ্ছে না, তারা বাস্তব সমস্যা সমাধানের শক্তি অর্জনের পরিবর্তে পুঁথিগত বিদ্যার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ছে।

বর্তমান পরিবেশে সুসাহিত্যের আদর্শ সামনে না থাকায় স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসবার পরও আমাদের লেখকেরা দিশেহারা অবস্থায় এটা সেটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই

সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। সাহিত্যিক হতে হলে শুধু প্রবল ইচ্ছা আর মানসিক প্রবৃত্তি থাকলেই যথেষ্ট হয় না— এর ওপর আরও চাই প্রভূত পরিশ্রম আর রচনার অভ্যাস। অভ্যাস দ্বারা ভাষার জড়তা দূর হয়, উপযুক্ত লাগসই শব্দ চয়নে দক্ষতা জন্মে। মোটামুটিভাবে লেখক হতে হলে এরূপ দক্ষতাই যথেষ্ট; কিন্তু সাহিত্যিক হতে হলে গভীর সহানুভূতি, সূক্ষ্মদর্শিতা, মননশীলতা আর সহানুভূতি চাই, তবেই লেখক সাহিত্যিক বলে পরিগণিত হতে পারেন। এ অবস্থায় তার বাণীতে অন্তরঙ্গতার চাপ লেগে পাঠকের মনে সাড়া জাগায়, আর অনুভূতির সঙ্গে সংগতি রাখবার জন্য কোন্ স্থলে কোন্ শব্দটি প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ধারণা জন্মে। কিন্তু শব্দ প্রয়োগ ত রচনার বহিরঙ্গ মাত্র সাহিত্যিক রচনার প্রধান আবেদন হচ্ছে, রস সমৃদ্ধ ভাব সম্পদ। রচনা যেন সর্ব অঙ্গ দিয়ে ভাবের চারদিকে সম্ভ্রমে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। রচনার মূলভাবের অনুসারী অন্যান্য টুকরোভাব সুসংগতভাবে আবর্তিত হয়ে একযোগে সমগ্র রচনার ঐক্যরক্ষা আর পুষ্টি সাধন করে।

অনেক লেখককে দেখা যায়, তাঁরা কোনও বিশিষ্ট সাহিত্যিকের ভাষা অবলম্বন করতে চেষ্টা করেন। অভ্যাস হিসেবে এর থেকে সদভ্যাস আর কিছুই হতে পারে না। তবে কথা এই ভাষার চমৎকারিতা ফুটে ওঠে মানসিক পরিপূর্ণতার ফলে। এই পরিপূর্ণতা আসবার পরেই সাহিত্যিকের সব কথার তাৎপর্য বুঝা যায়, তার আগে নয়। তবু নিঃসন্দেহে উঁচুদরের সাহিত্যিকের ভাষা অনুকরণ করতে করতে সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায়। তারপর সাহিত্যিক পরিণতির সংগে সংগে একটা নিজস্ব ষ্টাইল বা রচনা বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। বড় সাহিত্যিকের নিজস্ব ষ্টাইল অনুকরণীয়। এই প্রকার ষ্টাইল অর্জন করতে পারলে, তবেই লেখককে সত্যিকার সাহিত্যিক বলা যেতে পারে। আগেকার দিনে ফেনায়িত ভাষাকে সাহিত্যিক ভাষা বলা হ'ত। আসলে কিন্তু উক্ত ঢং সাহিত্যের শৈশব-কাকলি মাত্র। আধুনিক রীতি-অনুসারী বাংলা ভাষার বয়স অধিক নয়। এরইমধ্যে আমাদের জীবন-কালে বাংলা গদ্যের আদর্শ হিসেবে বিদ্যাসাগরী, বঙ্কিমী, প্রমথী এবং রাবীন্দ্রিক ভাষা দেখেছি, আবার দুলালী, উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমী, বিষাদ-সিন্ধী, ঈসা খাঁ ও রায়নন্দিনী এবং রাজবন্দীর জবানবন্দী ভাষাও দেখেছি। পদ্যের ক্ষেত্রেও গুপ্তি, মাইকেলী, হেম-নবীনী, কায়কোবাদী, রাবীন্দ্রিক, নজরুলী, জসীমী, ফররুখী ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। এদের কতক আপাততঃ পরিত্যক্ত হয়েছে, আবার কতকগুলো এখন পর্যন্ত আসর সরগরম করে রেখেছে। মোটের ওপর লক্ষ করা যায়, বর্তমান যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের প্রবণতা রয়েছে সরলতার দিকে, বাস্তবতার দিকে আর বাহুল্যবর্জিত সুস্পষ্ট প্রকাশের দিকে। অবশ্য পূর্বপাকিস্তানে ইসলামী ভাবধারার পরিপুষ্টির দিকে স্বভাবতই দৃষ্টি পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে সরলতার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, বাস্তবতার দিক দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহুল্যবর্জিত ঋজুতার দিক দিয়ে প্রমথ চৌধুরী, আর ইসলামী ভাবধারার পরিপুষ্টির দিক দিয়ে নজরুল ইসলামই হয়ত এখন পর্যন্ত আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারেন। এঁদের লেখা অনুকরণ করা কঠিন হলেও, এমন অনুকরণে ফায়দা আছে।

ওপরে ইসলামী ভাবধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ কথাটার একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি লোকের মনের গভীরে ইসলামী ভাবধারার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ রয়েছে। কিন্তু মনে হয়, অনুরাগ অনেকটা আবছায়ার মত, অস্পষ্ট। ইসলামী ভাবধারা যে কি বস্তু, তার সাহিত্যিক প্রকাশই বা কী রূপ নেবে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় উক্ত ভাবধারার কী প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এসবের জওয়াবের জন্যে

# সমালোচনা-সাহিত্য

সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে সাধারণতঃ কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, রূপকথা, খণ্ডকবিতা, রস-রচনা প্রভৃতি ধরা হয় ; আর দর্শন, বিজ্ঞান, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয় বাদ দেওয়া হয়। এর কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় আগেরগুলো মোটামুটি বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, আর শেষেরগুলো বিশেষ বুদ্ধি খরচ না করলে বুঝাই যায় না। আগেরগুলো একটু আধটু বুঝলেই বেশ উপভোগ করা যায় আর শেষেরগুলো সম্পূর্ণ না বুঝলে প্রায় কিছুই বুঝা যায় না। — আগেরগুলোকে যদি রসগোল্লা-পান্‌তোয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে শেষেরগুলোকে হয় ত ঝুনো নারকেল বলা চলে। অবশ্য সহজ পথ ছেড়ে কঠিন পথে কেউ সহজে যেতে চায় না, তার জন্য ছোবড়ার অন্তরালে লাড়ুর লোভ চাই। অন্য কথায়, গুরুগম্ভীর বিষয়ের রচনাও রসায়িত করে লিখতে পারলে অনেকে তা' উপভোগ করতে পারে, আর তাতে হিতও হয়— তখন তা সর্বাগ্রে সাহিত্য নামের অধিকারী হয়।

এইভাবে সুলিখিত সমালোচনাও সাহিত্য সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। আমরা সমালোচনার উদ্দেশ্য কি, তার প্রকৃতি কিরূপ, এসম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করেই কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্য সুস্পষ্ট করবার চেষ্টা করব। প্রথমতঃ সাহিত্য জিনিষটাই এক হিসেবে জীবনের উপলব্ধি, সমালোচনা বা পর্যালোচনা— কারণ তা' মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্ম প্রচেষ্টা, চিন্তা-কল্পনা, ত্যাগ-সম্ভোগ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করেই রচিত হয়— আর রসাশ্রিত করে রচনা করা হয় বলেই তাকে সাহিত্য বলে। একথা বলাই বাহুল্য যে প্রথম দৃষ্টিতে কোন জিনিষের সব অংশ আমরা ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনে, বা সবটুকু সৌন্দর্য্য ধারণায় আনতে পারিনে। তার জন্য নানা দিক দিয়ে নানা অবস্থার ভিতরে পরখ করে দেখা দরকার। জীবনকে নানাভাবে পরখ করে দেখবার জন্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে। আবার এইসব শাখা-প্রশাখাকে ভাল করে পরখ করে নেবার জন্যই সমালোচনার আবশ্যক হয়েছে। কোন জিনিষ যাচাই করার অর্থ, মোটামুটি তার ভালমন্দ সবদিক উদ্‌ঘাটন করা। তাই সমালোচনা শুধু দোষ বর্ণনা নয়। প্রকৃত সমালোচনা বলতে আমরা পর্যালোচনা বুঝি, দোষ গুণ সব কিছুই তার আলোচ্য বিষয়।

সমালোচনা দ্বারা সাহিত্য বুঝবার সুবিধা হয়। এই হিসাবে সমালোচনা অনেকটা ব্যাখ্যার কাজ করে— সে ব্যাখ্যা ভাব ও আঙ্গিকের। অনেকেই অবসরের অভাবে অসাহিত্য পড়ে সময় নষ্ট করতে নারাজ। তাঁরা নির্ভরযোগ্য সমালোচকের অভিমত পেয়ে যথার্থ সুসাহিত্য পড়তে চান। সমালোচক তাঁদের বন্ধু। আবার অনেকেই বোধ শক্তির খর্বতার জন্য নব সৃষ্ট সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ণয় করতে অক্ষম। সমালোচক তাঁদের পরামর্শদাতা। এই গেল পাঠকের দিক দিয়ে সমালোচকের আবশ্যকতা। গ্রন্থকার ও প্রকাশকের দিক দিয়েও সমালোচকের সাহায্য মূল্যবান। সমালোচক হচ্ছেন সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ। তাঁর মতামত বা

সুপারিশের উপর বই এর কাটতি নির্ভর করতে পারে। তাছাড়া শক্তিমান সমালোচক ও সাহিত্যিকের কিঞ্চিৎ প্রশংসা উৎসাহ বা উপদেশ নবীন লেখকের কল্পনার স্ফুরণ ও নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। তাই সমালোচক নবীন লেখকের হিতৈষী গুরু স্থানীয়। তাঁরা লেখকের দোষগুলি দেখিয়ে দিতে পারেন এবং কোন দিকে তার প্রতিভা বিকাশ পেতে পারে তার নির্দেশ দিতে পারেন। মোটের উপর সমালোচক সাহিত্য বিচার করে সাহিত্যিক বোধ এবং রুচি দুইয়েরই উন্নয়ন করে থাকেন। কোনও বই পড়ে বিশেষ কারো ভাল লাগবে কি মন্দ লাগবে একথা অবশ্য সমালোচক বলে দিতে পারেন না। পাঠক ভেদে এবং রুচি ভেদে ভাল লাগা বা মন্দ লাগার মান বিভিন্ন। তবে সমালোচক বলেন, সর্বসম্মত উন্নত মাপকাঠিতে বিচার করে ঐ বইএর অমুক অমুক ভাল দিক অমুক অমুক মন্দ দিক আছে। তাতে সাধারণ মানুষের ঐ বই কতটা ভাল লাগা উচিত আর কতটা মন্দ লাগা উচিত, তার একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। কোনও বিশেষ লোকের সৌন্দর্যবোধ বা উৎকর্ষবোধ যদি প্রতিষ্ঠিত আদর্শের থেকে অনেক তফাৎ হয় তাহলে তাঁর এই বিশিষ্ট মতবাদ যতক্ষণ না সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত অদ্ভুত বলেই গণ্য হয়ে থাকে। পরে কালে কালে হয়ত সেই মত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এমনও দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। বঙ্কিমের দেশজ শব্দ মিশানো রচনাকে সে সময়কার পণ্ডিতেরা গুরুচণ্ডালী ভাষা বলতেন; মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা (ছুছুন্দরবধ কাব্য) রচিত হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথের বাক্যবিন্যাস রীতি প্রথমে লোকের কাছে এলোমেলো এবং বাংলার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছিল; নজরুল ইসলামের উর্দু ফার্সী শব্দ সংযোগ প্রথম প্রথম বহু সমালোচকের কাছে অসঙ্গত ও হাস্যকর বলে বোধ হয়েছিল। কিন্তু পরে জনসাধারণ এবং সমালোচক দল এঁদের মত বা রীতিকেই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। বলাবাহুল্য এইভাবে সকলের মত ঠেলে ফেলে নিজের মতকে দাঁড় করান অবশ্যই প্রতিভাবান স্রষ্টার কাজ। প্রতিভাবান স্রষ্টারা সৃষ্টি করে যান, আর সমালোচকেরা সেই সৃষ্টির সৌন্দর্য বিচার করেন। এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সাধারণতঃ সমালোচক সংরক্ষণশীল। আর সাহিত্য স্রষ্টা উদ্ভাবনশীল অবশ্য তেমন উন্নত স্তরের সমালোচকও উদ্ভাবনশীল হতে পারেন। এঁরাও সাহিত্য স্রষ্টার ধারা বা সৌন্দর্যবোধ বিবর্তিত করে থাকেন। মোটের উপর স্রষ্টা ও সমালোচক পরস্পরের মুখাপেক্ষী। স্রষ্টা সৃষ্টি করবার সময়ই সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক অনেক দিক বিচার করেই তাঁকে সৃষ্টির নির্বাচনী শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আবার সমালোচক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি ধর্মী, কারণ সৃষ্টি বোধ দিয়েই তিনি সাহিত্যের প্রশংসা এবং ত্রুটিনির্দেশ করে থাকেন। তাতেই সমালোচনা গতানুগতিক রাস্তা ছেড়ে উদ্ভাবনী সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে থাকে।

এইবার সাহিত্য দিক-পালদের রচনা থেকে দুই-একটা উদাহরণ দিয়ে আদর্শ সমালোচনা রীতি দেখবার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি' না হয়ে পড়ে এ জন্য কাট ছাঁট করা ছাড়া উপায় নাই। ভবভূতিকৃত "উত্তর চরিত"-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস ও ভবভূতির বর্ণনা শক্তির তুলনা করেছেন এইভাবে...

"কালিদাসের বর্ণনা-শক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা শক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমা প্রয়োগের দ্বারা মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমা প্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনায় বস্তু তাঁহার লেখনী মুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া

বসে। কালিদাস একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলো একত্র করেন ; সুন্দর সামগ্রীগুলোর সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়াসকল সূচিত করেন, তাহার উপর উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হয় ; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রীগুলি একত্র করেন না। যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই-চারিটি স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন— কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেণ না। কিন্তু সেই দুই চারিটি কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়, উৎকটে ভবভূতি।"— বিবিধ গ্রন্থ।

উপরের বিশ্লেষণ অতিশয় স্পষ্ট আর এইরকম বর্ণনভঙ্গীর কোনটার প্রতি লেখকের মনের টান তাও ইঙ্গিতে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, অথচ কারো প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়নি।

আর একটি উদাহরণ দেই। শ্রীইন্দ্রলাল পাল প্রণীত "কুসুমারিন্দম অর্থাৎ স্বকপোল কল্পিত উপন্যাস-এর সমালোচনা : "স্বকপোল কল্পিত এই কথা লিখিয়া না দিলে লোকে বুঝিতে পারিবে কিনা গ্রন্থকার এই সন্দেহ করিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রন্থকার বিশেষ বিজ্ঞ মনে করিয়া আমরা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পড়িলাম, পথিকেরা দেখিল একখানা বৃহৎ সোনার থাল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আর বার দেখিল হেমমালীর হাসি চলিয়া যাইতেছে। হেমমালী পরায়ণা হিরণ্যদার হৈমহাসি লুকাইল, মলিনবদনা দেবী বিধবা হইল।" এই স্থলে একটু নোট দিলে ভাল হইত, তাহা না দেওয়ায় আমরা অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর তৃতীয় পৃষ্ঠায় পড়িলাম ঃ "নিশাসুন্দরী জগৎকে ভালবাসে, সে এখন পতিহীনা। জগৎকে সান্ত্বনা করিতে আকাশ সহচরীকে বলিল, "সখী আকাশ, জগৎ দিদির মুখে জল দে।" নিশার কথা শিরোধার্য্য করিয়া আকাশ শিশির রূপে জল দিতে লাগিল, শুষ্ক জগৎকে টসটসে করিল।" আমরা আর অধিক পড়িতে পারিলাম না। যাঁহারা মাথা থাকে তিনি পড়িবেন।" বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, চৈত্র।

এখানে কষ্ট কল্পিত উপমা ও রূপকের প্রতি অব্যর্থ কশাঘাত পড়েছে ; আর অনতি-প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে সঙ্গেই ত্রুটি দর্শানের কাজও সুসম্পন্ন হয়েছে।

"বাঙ্গালা নব্য লেখকদের প্রতি" বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন। এতে উপকারের সম্ভাবনা দেখে তার থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৩। যাহা লিখিবেন তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই-এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে

বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৪। যে বিষয়ে যাঁহারা অধিকার নাই সে বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা কিন্তু সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৫। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনি প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান কোটেশন বড় বেশি দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৬। অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলংকার ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে ; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজন মত আপনি আসিয়া পৌঁছিবে— ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর নাই।

৭। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।— ইত্যাদি। [প্রচার, ১২৯১, মাঘ]

এইবার রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্য থেকে "আষাঢ়ে" নামক একটি হাস্যরস প্রধান গল্প-কবিতা পুস্তকের সমালোচনা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে দেখান যাচ্ছে :

"গল্পগুলিকে 'আষাঢ়ে' আখ্যা দিয়া গ্রন্থকার পাঠকদিগকে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, আমরা বাঙালি পাঠকেরা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বে-রসিক বর যেমন বাসর ঘরের অপ্রত্যাশিত রসিকতায় খাপ্পা হইয়া উঠে, আমরাও তেমনি ছাপার বই খুলিয়া হঠাৎ আদ্যোপান্ত কৌতুক দেখিতে পাইলে ছিবলামী সহ্য করিতে পারিনা। বইখানির মধ্যে গায়ে বাজে এমনতরো কৌতুকও আছে। শেষ কবিতার নাম "কর্ণ মর্দ্দন"। কিন্তু এই মর্দ্দন ব্যাপারটি সকল কবিতাতেই কিছু না কিছু আছে। এরূপ প্রকৃতির রহস্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এবং "আষাঢ়ের কবি অপূর্ব্বের প্রতিভাবলে ইহার ভাষা, ভঙ্গী সমস্ত বিষয়ই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন। ... আজকাল বাংলা কবিতা আবৃত্তির দিকে একটা ঝোঁক পড়িয়াছে। আবৃত্তির পক্ষে কৌতুক কবিতা অত্যন্ত উপাদেয়। অথচ "আষাঢ়ের" অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা বসত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অথও আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে; অথচ ছন্দের এই মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য্য দখল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড় পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক চৌদকের মুখে তেমনি করিয়া মিল বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মত আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ— শুভ্রমাত্র অমিশ্র সদ্য ফেনরাশির মত লঘু ও অগভীর। তাহা বিষয় পুঞ্জের উপরিতলের অস্থায়ী বর্ণপাত মাত্র। ... হাস্য রসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার থাকিলে হবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। ... "আষাঢ়ে" রচয়িতার এমন কোন কবিতা বাহির হইয়াছে যেগুলিতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়।"

এখানে সমালোচকের উপমাসম্ভারপূর্ণ বর্ণমাধুর্যে চমৎকার রস-সৃষ্টি হয়েছে। আর সহানুভূতিপূর্ণ উৎসাহবাণীর সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার প্রতিভার স্বরূপ এবং বিকাশ সম্ভাবনার দিকনির্দেশ করা হয়েছে। এমন হিতৈষী সমালোচকই নবীন সাহিত্যিকের প্রকৃত বন্ধু।

ফরাসী ভাবুক জুবেয়ার সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে অনেকগুলি কাজের কথা বলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মারফৎ তার কয়েকটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি—

"জ্ঞানের জন্য চেষ্টাজাত অভিজ্ঞতা চাই, কিন্তু প্রকাশের জন্য নবীনতা আবশ্যক। লেখার বিষয়টির বিস্তর পরিচয় যত থাকে, ততই তাহার গৌরব বাড়ে, কিন্তু রচনার মধ্যে চেষ্টার লক্ষণ যত অল্প থাকিবে তাহার প্রকাশ শক্তি ততই অধিক হইবে।"

"পূর্ব্বে যাহা সুখ দেয় নাই, তাহাকে সুখকর করিয়া তোলা এক প্রকার সৃজন।" এই সৃজন শক্তি সমালোচকের।

"লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য্য। লেখায় বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হইয়াছে কিনা তাহারই খবরদারী করা তাহার ব্যবসাগত কাজ বটে, কিন্তু সেইটেই সবচেয়ে কম দরকারী।"

"অকরুণ সমালোচনায় রুচিকে পীড়িত করে এবং সকল বস্তুর স্বাদে বিষ মিশাইয়া দেয়।"

"যেখানে সৌজন্য এবং শান্তি নাই সেখানে প্রকৃত সাহিত্যই নাই। সমালোচনার মধ্যেও দাক্ষিণ্য থাকা উচিত— না থাকিলে তাহা যথার্থ সাহিত্যশ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না।"

"ব্যবসাদার সমালোচকরা আকাটা হীরা বা খনি হইতে তোলা সোনার ঠিক দর যাচাই করিতে পারে না। ট্যাকশালের চলতি টাকা লইয়াই তাহার কারবার। তাহাদের সমালোচনার দাঁড়ি পাল্লা আছে, কিন্তু নিকষ পাথর অথবা সোনা গলাইয়া দেখিবার মুচি নাই।"

"রুচি লইয়া সমালোচকের উন্মত্ত উৎসাহ, তাহাদের আক্রোশ, উত্তেজনা, উত্তাপ, হাস্যকর।"

"অধিক ঝোঁক দিয়া বলিবার চেষ্টাতেই নবীন লেখকদের লেখা নষ্ট হয়, যেমন অধিক চড়া করিয়া গাহিতে গেলে গলা খারাপ হইয়া যায়। সাহিত্যে মিতাচরণেই বড় লেখককে চেনা যায়; ভাল করিয়া লিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনায়াসতা এবং অত্যন্ত আয়াসের প্রয়োজন।"

"ভাল সাহিত্য উন্মত্ত করেনা, মুগ্ধ করে। যাহা বিস্ময়কর তাহা একবার মাত্র বিস্মিত করে, যাহা মনোহর, তাহার মনোহারিতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।"

শিখা
শ্রাবণ ১৩৩৬

# সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য

"শিল্প ও সাহিত্য" বিষয়ে দুই-একটি কথা বলতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছি। সাহিত্য-আলোচনার হয়ত ভূত আর ভবিষ্যতই প্রশস্ত। কারণ অতীতের বাচাই বহুজনেই করেছেন, তাই এর কতকটা স্পষ্ট আকৃতি দাঁড়িয়ে গেছে; আর ভবিষ্যতের আলোচনা দৈবজ্ঞের ভাগ্য নির্ণয়ের মত— দুই-একটা ঠিক ঠিক লেগে গেলেই, বাকী দশটা বেঠিকের জন্য জওয়াবদিহি নাই। কিন্তু বর্তমান চোখের সামনে সর্বদা নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে; তাই মনের ফটোপ্লেটে এর স্পষ্ট ছাপ পড়ে না— সব যেন হিজিবিজি হয়ে যায়।

সমসাময়িক সাহিত্য বলতে এখানে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাত্র সাত বছরের সাহিত্য সৃষ্টির কথাই মনে করা হচ্ছে। এই সাহিত্য দাঁড়িয়েছে বিভাগ-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্যের উপর। তখন এর কেন্দ্র ছিল কলকাতা, আর এর সারথী ছিলেন রবীন্দ্র-শরৎ-নজরুল। অবশ্য, এর উপর কল্লোলযুগ আর অতি আধুনিক যুগের প্রভাবও সামান্য নয়। এইসব সাহিত্যিকের মধ্যে কেউ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের, কেউবা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী।

বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের লিখিয়েদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন সাহিত্যিক অনেকেই গত সাত বছরের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছেন, তবু এখন পর্যন্ত মধ্য বয়সের বা প্রাচীন বয়সের সাহিত্যিকেরাই বোধ হয় সংখ্যায় অধিক। অবশ্য সাহিত্যে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর প্রশ্ন অবান্তর— তরুণ-প্রবীণের প্রশ্নও তাই। তবে কথাটা উল্লেখ করলাম শুধু এই ইঙ্গিত করবার জন্য যে, সামান্য সাত বছরের মধ্যে সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যের সূচনা হতে পারে মাত্র; কিন্তু চোখে পড়বার মত মস্ত একটা পরিবর্তন ঘটে যাবার সম্ভাবনা খুব কম। সাহিত্য মনের সৃষ্টি, বরং বলা উচিত পরিণত মনের সৃষ্টি। আর মনটা রাতারাতি চট করে বদলে যেতে পারে না। তাই যে-যে প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য-রীতির কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, প্রধানতঃ সেইসব প্রভাব পূর্ববঙ্গেও ক্রিয়া করছে।

প্রধানতঃ দুটো কারণে এখানে সাহিত্যের পরিবর্তন— অগ্রের দিকেই হোক আর পশ্চাতের দিকেই হোক— ত্বরান্বিত হচ্ছে। প্রথম দেশবিভাগের ফলে লোক-সংখ্যার শ্রেণী-বিন্যাসে পার্থক্য এসে পড়েছে— স্পষ্ট কথায় সাহিত্যে অনুরাগী শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের অনেকে (বিশেষ করে প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত আর শিক্ষক শ্রেণীর লোক) দেশ ত্যাগ করে গেছেন। তাতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে শিক্ষা-বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছিল। এ অভাব বর্তমানে কতকটা পূর্ণ হলেও এখনও এর জের মেটে নাই। এর ফল হয়েছে এই যে, পূর্ববাংলার অনেক প্রতিশ্রুতিবান লেখকেরও [illegible] নাই। এই বাংলা ও শিক্ষা [illegible]। [illegible], শুধু সকল [illegible] যেমন [illegible], [illegible] চিন্তার [illegible]। এ বিষয়ে [illegible] হতে হবে। [illegible], [illegible] হিন্দু [illegible], শিক্ষা এবং [illegible]

ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল বলে, এদের মনোভাব কিছুটা নিরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তান অর্জনের পর সে-নিরোধের অবসান হয়েছে। শাদা কথায়, এরা নিজেদের মুখের কথা ফিরে পেয়েছে— ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে কেবল জল চল ছিল, এখন এখানে জল পানি দুইই চলে; আগে ঈশ্বর-পরমেশ্বরের একাধিপত্য ছিল, এখন 'আল্লা'ও নিজের দখল সাব্যস্ত করেছেন। বলাবাহুল্য যা স্বাভাবিক এ-ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। পূর্ববাংলার সাহিত্যিকেরা এখন অবাধে বা অসঙ্কোচে ভাবের উপযুক্ত শব্দ-যোজনা করবার স্বাধীনতা পেয়েছেন।

কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গেই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্ন জড়িত। কোনো কিছুতেই আতিশয্য ভাল নয়। অতি-আগ্রহের ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ভাষার বহিরঙ্গের দিক দিয়েই বেশী দেখা দিয়েছে। লোকের বুঝবার জন্যই ভাষা। সহজ বোধযোগ্য শব্দ হাতের কাছে থাকতে আমরা দেশ-বিদেশে হাতড়ে বেড়াব কেন? কাছে জিনিস দেখতে পাইনে, অথচ দূরের সব পরিষ্কার— এ একটা ব্যাধির সামিল। সোজাসুজি "ভাত না খেয়ে" "তা'ম তানাউল করা" কিংবা "সভ্যতা" বর্জন করে "তমদ্দুন" আমদানী করা— এতে নতুনত্ব থাকতে পারে, কিন্তু গৌরব নাই। যদিও অনুবাদ করলে বিশেষ পার্থক্য হবার কথা নয়, তবু যে পরিবেশে যেটি খাটে বা প্রচলিত রয়েছে, সেখানে সেইটিই কি সুন্দর নয়? হয়ত দূর অতীতে একরকম ছিল, বর্তমানে আমরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন এক লম্ফে সেই অতীতে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে হাত-পা ভাঙবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া অতীতের ভিতর দিয়ে যে অতীত এসেছিল, বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যতের গর্ভেও ঠিক সেই অতীতকে ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা সেও সন্দেহ। তাই মাটিতে পা রেখে বর্তমানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হয়ে আমাদের এগুতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই যখন আমাদের মুখের ভাষা অন্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন আমরা সাহিত্যে সেই পরিবর্তিত ভাষাই ব্যবহার করব। অতীতের অনেক শব্দ এখন অচল হয়ে গেছে, আবার এখনকার অনেক শব্দ আমাদের পৌত্র প্রপৌত্রেরা বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি কি? অচল শব্দের বদলে হয়ত অন্য শব্দ এসে গেছে, বা এসে যাবে। হয়ত অচল পুরানো শব্দের কতকগুলো আবার সচল হবে। হ'লে তা' আবার গ্রহণ করব। তবে একটি কথা এই যে, আমরা অনেক সার্থক শব্দকে গ্রাম্য অপবাদে সাহিত্যে স্থান দিই নাই, অথচ এগুলোর কোনো 'সভ্য' রূপও দেওয়া হয় নি। প্রয়োজন মত নাটক-নভেলে বা যথোপযুক্ত স্থানে ঐসব শব্দ ব্যবহার করা উচিত। একই কথার বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ থাকতে পারে, তবু সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকেরা যেখানে যেমন প্রচলিত আছে সেইখানে সেই মত লাগাতে পারেন। এতে সাহিত্য বরং সমৃদ্ধই হবে, আর পূর্বাভাস থেকে হয়ত ভিন্ন-অঞ্চলবাসীদের কাছেও নেহাত দুর্বোধ্য হ'বে না। তেমন সম্ভাবনা থাকলে হাশিয়া বা পাদটীকাতেও এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া চলতে পারে। সাহিত্যে গণসংযোগের দিক দিয়ে এ ব্যবস্থা উত্তম। দেশীয় ভাষায় যখন কোনো বিশেষ ভাব-প্রকাশের যোগ্য শব্দ পাওয়া যায় না, তখন অবশ্যই বিদেশী ভাষার থেকে অসঙ্কোচে উপযুক্ত ভাবব্যঞ্জক শব্দগ্রহণ করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

যা'হোক, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, ভাব-নিরোধের অবসান হওয়াতে মাত্রাবোধ নিয়ে আবার নতুন বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। একটা মুশকিল হয়েছে এই যে, মাত্রাজ্ঞান কাউকে শেখান যায় না, তর্কের সাহায্যে প্রমাণও করা যায় না। প্রতিভাবানেরা মাত্রাজ্ঞানের আদর্শ স্থাপন করে যাবেন, আর অন্যেরা তাঁর অনুসরণ করবেন, এই পন্থা। কিন্তু বর্তমানে পূর্ববাংলায় সর্বস্বীকৃত সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক না থাকায়, আনাড়ীদের মধ্যে অনেকেই নিজেকে

সৃজনী প্রতিভার অধিকারী মনে করে রাতারাতি পাকিস্তানী বাংলা সৃষ্টি করবার কাজে লেগে গেছেন। যার যে কাজ, তা' ফেলে প্রতিভাবানের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে যা' ফল হবার তাই হচ্ছে। শুধু সাহিত্যে নয়, রাষ্ট্রেও গত সাত বছর ধরে এই ব্যাপার দেখছি। বোধ হয় রাষ্ট্রীয় প্রভাবই সাহিত্যের উপর একটু প্রবলভাবে পড়াতে সাহিত্যেও বক্র দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আজ জীবনের এক বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রের কুক্ষিগত; তাই কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলা যাক। রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বা শরীয়তি রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা দেখে মনে হয়, ভাবখানা এই "নাম মাহাত্ম্যেই সব বালা-মুসিবত কেটে যাবে, আমাদের আর কিছু করবার নাই।" আর তা কতদিনে, তাই বা কে বলতে পারে? গলিতে-গলিতে ল্যাম্প-পোস্টের চিমনীর গায়ে পাকিস্তান লেখা পড়েছে, স্টেশনে স্টেশনে রীতিমত নক্‌শা কেটে কেবলার দিগদর্শন তৈরী করা হয়েছে, কায়েদে আজম আর কায়েদে মিল্লাতের মাজারে নিয়মিত ফুল ছড়ান হচ্ছে আর দেশ-বিদেশ থেকে লোক ডেকে এনে তাঁদেরকে উৎকৃষ্ট হোটেলে রেখে আমাদের দেশের অপূর্ব উন্নতি বিষয়ক সার্টিফিকেট আদায় করা হচ্ছে, আবার কি ? কিন্তু দেশের অকৃতজ্ঞ লোকগুলো ভাত-কাপড় চায়, একটু মাথা গুঁজবার স্থান চায়, সুবিচার চায়, যোগ্যতার অনুপাতে পদ চায়, মত প্রকাশের স্বাধীনতা চায়, এমনকি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে মন্ত্রী নেওয়ার পরেও তারা সমান নাগরিক অধিকার চায়। এইসব অনর্থক ভ্যাজাল সৃষ্টিকারীরা নিশ্চয় দেশের শত্রু। আরও একটা আশ্চর্যের বিষয়, দেশের যতসব ছোটলোক মূর্খের দল এসব বুদ্ধি পায় কোথা থেকে? বুদ্ধির সাগরও রয়েছে কম্যুনিষ্ট দেশে বা সীমান্ত পারের দেশে। এইসব লোককে নিশ্চয়ই কম্যুনিষ্ট বা পঞ্চমবাহিনীরা এসে উস্‌কানি দিচ্ছে। "পোরো বেটাদের জেলে, দেখি বাছাধনদের কত তেজ!"— এ যাবৎ আমরা কর্তৃপক্ষের এই মনোবৃত্তিই বেশী ক'রে টের পেয়েছি। সুখের বিষয়, বাংলাদেশের অশিক্ষিত মূর্খেরাই গত নির্বাচনে দেখিয়ে দিয়েছে, শুধু ইসলামের নামে ধাপ্পাবাজী আর চলবে না, পূর্ব-পশ্চিম সবদিক থেকে ভাড়াটে বক্তার ফাঁকা কথার তোড়ে আর পাল্লা হেলবে না। আশা করি, এইবার ইসলামের নামের সঙ্গে সঙ্গে এর আদর্শের অনুবর্তিতাও কিছু দেখতে পাব। ইতিমধ্যেই শুভসূচনা দেখে দেশের সাহিত্যিকবৃন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এবার হয়ত রাজনৈতিক উস্কানি বা চাপের অবসান হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদেরও শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে। এই সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনই সাহিত্যিক শুভবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া ইসলামের প্রকৃত রূপ কি, এ সম্বন্ধে উন্নত চিন্তামূলক প্রবন্ধও দুই-একটা বের হচ্ছে। এ খুবই আশার কথা। ল্যাম্প-পোস্টের চিমনী, স্টেশনের কেবলা-নিশানা, মাজারের ফুল, কিংবা বিদেশীয় অতিথির সার্টিফিকেট যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, তেমনি ইজার-কোর্তা-ওড়না; আয়েন-গায়েন-ক্বাফ, ফোরাত-দজলা-কোহেতুর, পেস্তা-বাদাম-কিসমিসও ইসলামী সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। বরং সমদর্শিতা, নির্লোভতা, প্রেম-প্রীতি, সুবিচার সুকৃতি প্রভৃতি প্রশংসনীয় মানবীয় গুণই ইসলামের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এইসব গুণের প্রতি প্রশংসমান ইঙ্গিত যে রসাশ্রিত সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তা' হিন্দুর লেখাই হোক, মুসলমানের লেখাই হোক বা ইংরাজের লেখাই হোক, তা' ইসলামী সাহিত্যের বিরোধী নয়। ইসলামের আদর্শকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার তাজিয়া বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছি বলে, আমরা ইসলাম বলতে কেবল একটি সম্প্রদায়কেই সচরাচর বুঝে থাকি, তাই হয়ত আমরা বহু ইসলামী সাহিত্যকে ইসলামী বলে চিনতেই পারিনে। ইসলামী পরিবেশ, বিশিষ্ট ইসলামী

বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি রসাশ্রিত করে সাহিত্যে পরিবেশন করতে পারলে তা ভালই হ'ত। কিন্তু তা' করা কঠিন। এর জন্য চাই প্রতিভার স্পর্শ যা' আমরা দেখতে পেয়েছি নজরুলের রচনায়। তাঁর হাতে নানা ভাষার শব্দ যেন মিতালি করে পরস্পরের সৌষ্ঠব বাড়িয়ে পরম ঐশ্বর্যের সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববাংলার নবীন-প্রবীণ সকল সাহিত্যিকই নজরুলের সমৃদ্ধ রচনারীতির আদর্শে ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে চেষ্টা করলে লাভবান হবেন।

শব্দে প্রাণ নাই, প্রাণ ভাব-সৃষ্টিতে। তাই আদর্শের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। তাই বলে যে আমরা সামাজিক জীবন না এঁকে কেবল আদর্শ পুরুষ আঁকব, তা' নয়। আর্দশ প্রকট হলে সাহিত্য হয় না, আবার বাস্তবতার নগ্ন বর্ণনাও সাহিত্য নয়। বাস্তব ও আদর্শের যথাযোগ্য সংমিশ্রণই সুসাহিত্যের লক্ষণ। এই 'যথাযোগ্য' কথাটাই গোলমেলে— এর মধ্যে রুচির প্রশ্ন, সাহিত্যিক নির্বাচনের প্রশ্ন, মাত্রাবোধের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। এ ব্যাপারেও শিক্ষা দেওয়া যায় না। আগে মনটা তৈরী করতে হবে, তারপর সাহিত্য। সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব অনায়াসেই পাঠকের মনে ছাপ এঁকে দেয়। শিল্পস্রষ্টার সঙ্গে পাঠক বা দর্শকের এই সংযোগেই সাহিত্যিক আনন্দ সঞ্জাত হয়, সাহিত্য সার্থক হয়। এই আনন্দও নানা পর্যায়ের হতে পারে, সেই অনুসারে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করা চলে। কোনো আনন্দ অহেতুক আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, আবার কোনো আনন্দ অলক্ষ্যে কর্ম-প্রেরণা যোগায়, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককে গভীর আর মধুর করে তোলে। কোনোটাই ফেলবার মত নয়। সময় মত দুটোই ভাল— কখনও খেলার আনন্দ কখনও কাজের আনন্দ। কেউ একা একা আপন মনে খেলেই আনন্দ পান, আবার কেউ বা আর দশজনের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে খেলতে ভালবাসেন। কিন্তু সব সময় আপন মনে খেলবার খেয়ালীপনায় জীবনটা একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে, আবার ক্রমাগত লুটোপুটি খেলার উন্মাদনায়ও জীবনে অবসাদ এনে দিতে পারে। মোট কথা, দেহপুষ্টির খাদ্যের মত মনোপুষ্টির খাদ্যেও বিভিন্ন উপাদান থাকাই স্বাস্থ্যকর।

রাজনীতি বর্তমান সমাজ-জীবনের অনেকখানি স্থান দখল করে নিয়েছে আর ধর্ম তো সবটুকুই গ্রাস করতে যেয়ে অনেকখানিই হারাতে বসেছে। কাজে কাজেই আজকার সাহিত্যে রাজনীতি আর ধর্ম বেশ খানিকটা জায়গা নেবে এই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। এর জন্য চাই চিন্তার স্বাধীনতা। মত প্রকাশের স্বাধীনতা। নতুনকে আমল না দিলে উৎকর্ষ হবে কেমন করে? সময় এগিয়ে চলেছে,— মৃত্যু আর নতুন জীবন এর নিত্য-সহচর। মৃত্যুকে ভয় করলে নতুন জীবন আসবে না। তাই আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সবেরই কালোপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন স্বীকার করতে হবে। এ পরিবর্তন চোখের সামনেই ঘটছে, অথচ আমরা সাহস করে তা' স্বীকার করে নিচ্ছিনে। আমার মনে হয়, আজকালকার জটিল সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সহজ-সরল পরিচয় দিয়ে সাহিত্যিকেরা দেশের লোকের বোধশক্তি জাগ্রত করতে পারেন, তাতে সাধারণ লোকের চোখ খুলে যাবে, চিন্তা বিকশিত হবে, আর সার্বিক উন্নতির সহায়তা হবে।

শুধু সাধারণ লোক কেন, দেশনায়কদের জন্যও শিল্পী ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি আর সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। এরাই তো জাতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষক। দেশের নায়কেরা কর্মের আবর্তে অনেক সময় সত্যের সরল পথ দেখতে পান না, সাময়িক স্বার্থবোধের বশবর্তী হয়ে স্থায়ী কল্যাণের পথ রোধ করে থাকেন। সাহিত্যিকেরা অনাসক্তভাবে সত্যের নির্মল রূপ

দেখতে পান— তাঁদের দৃষ্টি আরও দূরপ্রসারী, এঁদের চিন্তা ও পথ-নির্দেশকে অগ্রাহ্য পর্যুদস্ত বা প্রভাবিত করলে দেশের অকল্যাণ আর বিশৃঙ্খলাই ডেকে আনা হয়।

শুধু পাকিস্তানে নয়, (সম্ভবতঃ ইংলন্ড ছাড়া) অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও আজকাল চিন্তার স্বাধীনতা বিশেষভাবে খর্ব হয়েছে। হয়ত স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসীনদের সন্দেহ আর ভয়ই এজন্য দায়ী। এর পরিণাম ভয়ানক। এতে মিত্রকেও শত্রুতে পরিণত করে; যে-শক্তি দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারত তার থেকে দেশ বঞ্চিত হয়; তাছাড়া দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আর বিরুদ্ধ শক্তির সৃষ্টি হয়। আজকাল স্বার্থবাদী বিভিন্ন দল অনেক মিথ্যা প্ররোচনা চালাচ্ছে। আর সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে লোভের দ্বারা বা আইন বলে বশ করে দলীয় স্বার্থে নিয়োগ করেছেন। এর ফলে দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, আরও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্যাঁচ-কষাকষি চলছে। পৃথিবীর এই বিষাক্ত গ্যাসের সংক্রমণ রোধ করার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মাবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা দরকার; যাতে ধর্মীয় গোঁড়ামি, রাজনৈতিক দলীয় গোঁড়ামি, বা সাহিত্যিক দলীয় গোঁড়ামির স্থলে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সহজ মূল্যবোধ জন্মাতে পারে। তা'হলে মানুষ বিশ্বমানবতার ক্ষেত্রে এক সমতলে এসে মিলতে পারে। সকল ধর্মেই প্রীতি, সাম্য ও ন্যায়-নিষ্ঠার দিকে সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামেই হয়ত ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ অধিক ব্যাপক হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানের দোষে এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের বাহিরে অপর সকলের মনে ইসলামী নীতি সম্বন্ধেই সন্দেহের উদয় হয়েছে। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করাতে সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার থেকেই দেখা যায় জগদ্বাসীর কাছে আজ ইসলাম (?) কি চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামী আদর্শ সম্বন্ধে হাজার বক্তৃতা করলেও, জগদ্বাসী সেই সব বক্তৃতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, বর্তমান যুগের মুসলমানের যোগ্যতা আর চরিত্র দেখেই ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা করে থাকে। এই স্বাভাবিক। তাই এখন দরকার সাহিত্যিকেরা এমন সাহিত্য সৃষ্টি করবেন যার প্রভাবে মুসলমানের জীবন সুন্দর হয়। শুনা যায়, বাংলাদেশেই নাকি ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান অন্যান্য মুসলিম দেশের (আরব সমেত) চেয়ে বেশী করে পালিত হয়। এখন সম্প্রদায়ের দিক থেকে আদর্শের দিকে একটু বেশী ঝোঁক দিতে পারলেই এ-দেশীয় মুসলমানের জীবন-সাধনায় অগ্রগতি হতে পারে। বিশেষ করে সাম্য, মৈত্রী, সুবিচার, নম্রতা, সদাচার, পরহিত প্রভৃতি ইসলামের শ্রেষ্ঠ গুণরাশির অনুশীলন করলেই মুসলমান সম্প্রদায় জগতে মর্যাদা লাভ করতে পারে, তাতেই ইসলামের গৌরব বাড়বে। নৈতিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ইসলামের সঙ্গে অন্য কোনও ধর্মের (অন্ততঃ বর্তমান যুগে) কোনও মৌলিক বিরোধ নাই। দেশাচারগত বিরোধ বিরোধই নয়।

গত সাত বছরে সাহিত্য, সমাজ, সমালোচনা, অনুবাদ, গবেষণা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্পকলা, রসরচনা, লোক-সাহিত্য, শিশু-সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, ইসলাম, দর্শন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সাধারণভাবে কিছু কিছু মন্তব্য আগেই করা হয়েছে। এ সব প্রবন্ধ নানাবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের দোষগুণ আলোচনা করা অবশ্যই এখানে অসম্ভব। তা ছাড়া সবগুলো প্রবন্ধের সন্ধান ও পরিচয় লাভ করাও যে-কোনো একজনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মোটের উপর এই মন্তব্য করা যায় যে, সমালোচনা আরও নিরপেক্ষ এবং সহানুভূতিমূলক হওয়া উচিত। রসরচনা আরও পর্যাপ্ত সংখ্যক হওয়া

ভাল হয়। আর, মোটের উপর আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণের বোধোপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় রাষ্ট্রনীতি, ইসলাম, দর্শন প্রভৃতি রচনা করতে পারলে বেশী উপকার হয়। এ কাজটা যে অসম্ভব তা নয়। তবে এতে বেশ খানিকটা প্রতিভা আর রসবোধের দরকার। আসলে, সাহিত্যিকগণ জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন এক উন্নত শ্রেণীর জীব না হয়ে যদি জনসাধারণেরই একজন হয়ে সাহিত্য রচনা করেন তাহলে লোকের পক্ষে সুবিধা হয়, তারা দ্রুত মানসিক উন্নতি লাভ করে, তারপর ক্রমে ক্রমে আরও উচ্চপর্যায়ের সাহিত্য-রস আস্বাদনের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। এইভাবেই সাহিত্যিকেরা সমগ্র দেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নত জ্ঞান ও রুচির দিকে আকর্ষণ করতে পারেন।

কবিতা, উপন্যাস, নাটক এসব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অল্প, ধারণাও অপ্রচুর। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে দুই-একটা মামুলি কথা বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি। আজকাল পদ্য-কবিতা আর গদ্য-কবিতা দুই-ই লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বীকার করতে হচ্ছে, অনেক কবিতারই মানে বুঝতে পারি না। শুনেছি আজকালকার কবিতার নাকি অস্পষ্টতা একটা বিশেষ গুণ। এমন হতে পারে যে, কবিগণ যে ঊর্ধ্বে থেকে বাণী বর্ষণ করেন, তা সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে, এমনকি ঐ কবিরাই হয়ত মর্তে পা ঠেকান মাত্র নিজেরাই স্বরচিত কবিতার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারেন না। আবার, এমনও হতে পারে যে স্পষ্ট কথা বললে আর কাব্য হ'ল কি? তার জন্য ত গদ্যই আছে। কবিতা নতুন বৌ-এর মত থাকবে ঘোমটার আড়ালে, আর পাঠকেরা যার যার কল্পনা মত একটা-কিছু আন্দাজ করে নেবে। তাই ইচ্ছা করেই যেন শব্দের ঝঙ্কারে পাঠকের মনে ধাঁ-ধাঁ লাগিয়ে দেওয়া হয় — মানে বার করতে গেলেই যাতে শব্দের টিয়ার-গ্যাসে চোখে পানি আসবে। তবে একটা খটকার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের পদ্য-কবিতার মানে বোঝা যায়, আর তাতে মনের সামনে একটা চিত্রও উদ্ঘাটিত হয়। কাজে কাজেই বর্তমান কবিরা কত ঊর্ধ্বে উঠে মেঘের আড়াল থেকে চরণাঘাত করেন তা' বুঝা যায় না। এ সমস্যার সমাধান করতে চাওয়াও বোধ হয় ঠিক কবিজনোচিত নয়। তবে এ-স্থলে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে কোনো কোনো কবিতার বইয়ের কিয়দংশ বুঝতেও পেরেছি। ইকবালের কাব্যানুবাদ, 'সিরাজাম মুনীরা', 'নক্ষত্র মানুষ মন', 'তালেব মাষ্টার' এবং কয়েকখানা লোকগাথার ষোল আনা না হলেও অন্ততঃ বারো আনা বুঝা যায়। শিশু সাহিত্য 'সোনার কাঠি' আর 'চাঁদ মামার দেশ' উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ উপন্যাসের মধ্যে 'আলোর পরশে' নাম উল্লেখযোগ্য। বইখানা প্রচলিত পুঁথির উপন্যাসে রূপায়ণ বললে অনেকটা ঠিক বর্ণনা হয়।

নাটকের দিক দিয়ে কয়েকখানা একাঙ্কিকা বেরিয়েছে। 'রূপান্তর' আর 'মেমেসিস' নামক দুইখানা প্রহসন বোধ হয় ১৯৪৭ সালের আগেকার লেখা, কিন্তু পুস্তকাকারে বেরিয়েছে ১৯৪৮ সালে। নাটিকা দুটো আঙ্গিকের বাহাদুরীর জন্য উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছে। দু'খানাই দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর আলেখ্য। 'শনিগ্রহ ও পৃথিবী' নামক একখানা প্রহসন রচিত হয়েছিল, কিন্তু কোথায়ও অভিনীত হয়েছে বলে শুনি নি। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'নাদির শাহ' কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল, অভিনীত হয়েছে কিনা জানা নাই। 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ', 'বিদ্রোহী পদ্মা' প্রভৃতি সামাজিক নাটকে কৌলিন্যের অহঙ্কার, হিন্দু-মুসলিম মিলন-সমস্যা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয় চিত্রিত হয়েছে। কোনো কোনো স্থলে অস্বাভাবিকতা আর আতিশয্য দোষ ঘটেছে; তবে রঙ্গমঞ্চে উৎরেছে ভালই।

গল্প-সংগ্রহ এবং বড়গল্পের মধ্যে 'লালসালু' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর 'দুপর্শান্তি', 'নয়নচুলি' এবং 'জিবরাইলের ডানা', 'মাটির মায়া', মানবী ধরনের ছোটগল্প। উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে অন্ততঃ একখানায় অতি-ইসলামীর ঝোঁকে মতবাদে আর্ট ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তবু লেখকের ভাষার গুণে মোটামুটি ভালই উৎরেছে বলতে হবে। নবীন গাল্পিকদের আরম্ভ আর সমাপ্তির টেকনিক ঘটনা-সংস্থানে কৌতূহলোদ্দীপন আর আকস্মিকতা আর আশেপাশের বিষয়-নির্বাচন ও বর্ণনায় বাস্তব দৃষ্টি প্রশংসনীয় বলতে হবে। তবে বর্তমান লেখকদের কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতির উপমা নির্বাচনে একটি বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়, সেটি হচ্ছে, চমক লাগাবার চেষ্টা আর অপরিচিত জিনিসের উপমা দিয়ে অতি-পরিচিত বিষয়ের ব্যাখ্যা। নমুনা দেখাবার জন্য কয়েকটা কল্পিত উদাহরণ দিচ্ছি : যেমন, মাতালের চোখের মত ঠিকরানো, বনিতার ভণিতার মত শানিত, চামচিকের ঘুমের মত চিমসে, গোবরের গাদার উপর গাড়ীর চাকার দাগের মত মোলায়েম ইত্যাদি। যা'হোক এগুলো হয়ত একটা নতুন কিছু করবার আগ্রহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আশা করি উপমা-প্রয়োগে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও আর একটু সংযম আসবে। এখানে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে ত্রুটি স্বীকার করছি। সে এই যে, অনেক প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসের সঙ্গে এ পর্যন্ত আমার পরিচয় হয় নি। আংশিক পরিচয়ের উপর নির্ভর করেই উপরের মন্তব্যগুলো করা ঠিক হয়েছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারছি না। অবশ্য আমার বুঝবার ভুল নিশ্চয়ই হতে পারে। আশাকরি, সাহিত্যিক বন্ধুগণ এ ত্রুটি গ্রহণ করবেন না।

সওগাত
আষাঢ় ১৩৬১

## জানা কথা

সাহিত্য সম্পর্কে যুগ-যুগ ধরে এত কথা বলা হয়েছে যে, এখন আর নতুন কথা বলবার তেমন সুযোগ নাই। তবে যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক জোর দেওয়ার আবশ্যক হয়ে পড়ে— এইটুকুই নতুনত্ব। অবশ্য, ইতিমধ্যেই আমাদের পুরোনো পৃথিবীটা অনেক ঘুরপাক খেয়েছে; তাই যুগের নতুনত্বটাও আমাদের একরকম জানাই রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই ধরনের কয়েকটা জানা কথা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। কারণ, জানা কথাও অনেক সময় জানবার কথা।

প্রথমেই একটু খতিয়ে দেখা যাক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তান হাসেলের ঠিক আগখানে আমরা কি উত্তরাধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম, আর এ কয় বছরে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি। উত্তরাধিকারের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বাংলা সাহিত্য প্রায় সব শাখায়ই বেশ সমৃদ্ধ, এমনকি, এ সাহিত্য বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিষয় অনায়াসে চোখে পড়ে— সেই কৃতিত্বের জন্য বাংলার হিন্দু জাগরণই মুখ্যতঃ প্রেরণা যুগিয়েছে। মুসলিম জনসাধারণ ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই নানা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে সাহিত্য ও সভ্যতার দিক দিয়ে এত পিছিয়ে পড়েছিল যে, পরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও আর সে-ব্যবধান ঘুচাতে পারে নাই। ইতিমধ্যে ইংরেজের উৎসাহে উচ্চশিক্ষিত হিন্দু লেখকগণ ভাষাকে সংস্কৃতের আওতায় নিয়ে গিয়ে এমন এক ভদ্রসাহিত্যের সৃষ্টি করে ফেললেন, যা সাধারণ লোকের মুখের ভাষা থেকে অনেক পৃথক। পরে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভাষা ধাপে ধাপে জনমুখী হয়ে উঠছিল। তারপর নজরুল ইসলাম আর একধাপ অগ্রসর হয়ে প্রচুর উর্দু-ফার্সী চলতি শব্দ সুসংগতভাবে প্রয়োগ করে ভাষাকে আরও জোরালো করে তুলেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্য দীর্ঘকাল কেবল হিন্দু কৃষ্টির বাহন থাকায়, এর বাগভঙ্গী বাক্যালঙ্কার আর সমালোচনার ধারা এমন একটা বিশেষ রূপ নিয়েছিল যে মুসলমান লেখকগণ এ ভাষায় 'চাচা', 'পানি', 'জিয়াফৎ', এমনকি 'আল্লা' পর্যন্ত লিখতে ভরসা পেতেন না। নজরুল ইসলাম এই বাধা ভেঙ্গে দিয়ে বর্তমান মুসলমান লেখকদের সামনে এক উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন করেছেন।

বর্তমানে, পাকিস্তান হাসেলের পরে, ভাষার বিকাশের পক্ষেও মুসলমান লেখকদের স্বাধীনতা এসেছে। এখন এঁরা অবাধে বাংলা ভাষাকে ইসলামী ভাব-সম্ভারে পরিপুষ্ট করে এর সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারেন। কিন্তু একাজ যার-তার দ্বারা সম্ভব নয়। ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হলে প্রতিভার দরকার, আর চাই ভাষা-জ্ঞান ও প্রচুর সাধনা। অবশ্য প্রতিভার পথ চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাই আথালে পাথালে রঙ-বেরঙের চেষ্টা করে প্রতিভার আগমন-পথ অনেকটা সুগম করে তুলতে হবে। অনেক অসার্থক চেষ্টার পর এখন একটা অস্পষ্ট পথের রেখা দেখা যাচ্ছে। সকল অগ্রগতিই অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ধীরে

ধীরে সাধিত হয়। ভাষার বেলায়ও তাই। সুদূর অতীতে যে-শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হ'ত, এখন তার সবগুলোই আর ব্যবহার করা চলবে না। বর্তমানে ভাষার যে-স্থিতাবস্থা রয়েছে, তার সঙ্গে সমন্বয় রেখেই এর গতিপথ স্থির করতে হবে, অর্থাৎ সহনযোগ্য বা বর্তমান পাঠকের বোধগম্য শব্দই প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে শুধু আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার দ্বারাই ইসলামী সাহিত্য সৃষ্ট হয় না, চাই ইসলামী ভাব। যে-সব ইসলামী শব্দ বাংলার সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে এবং আপ্‌সে-আপ ভাষায় এসে পড়ে, তাতে সাহিত্যের স্বাভাবিকতাও বজায় থাকে, সাহিত্যিক রসেরও ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু ইসলামী ভাব যদি সমাজ-জীবনে সুপ্রকাশিত না হয়, আর সাহিত্যিকদের মনের ভিতরেও থাকে অস্পষ্ট বা দ্বিধাগ্রস্ত, তাহলে জোর করে শব্দের দ্বারা ভাবের স্থান পূরণ করতে চাইলে শব্দের ঝংকার হয়ত উৎপন্ন হবে, কিন্তু ইসলামী সাহিত্য গড়ে উঠবে না। বর্তমান সমাজ-জীবনে চোরাবাজারী, মুনাফাখোরী, জুলুমবাজী, আর ইসলামের নামে সুবিধা তালাশী মনোবৃত্তির যে-সব জঘন্য প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তাই লক্ষ করেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছি। ইসলামে শেরেক আর মুনাফেকীই নিকৃষ্টতম গুনাহ্ বলে গণ্য হয়, বিশেষতঃ ভিতরে পাকা তৌহীদ থাকলে সাংসারিক কাজে বা ব্যভহারে মুনাফেকী আসতেই পারে না। আবার ভাবের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব থাকলে তা সাহিত্যই হয় না। জোরে শোরে ইসলামী বাণী প্রকাশ করলেই যে ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, তার নিশ্চয়তা নাই। তাই ইসলামী মনোভাব আত্মস্থ করে আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলামী নীতি এবং ...(?) রূপ প্রকাশ করবার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে (?) সকল সাহিত্যিকের উপর। পাকিস্তান প্রাপ্তির প্রথম উৎসাহের মুখে কোনও কোনও অতি-আগ্রহী লেখকের ইসলামী সাহিত্য ব্যাপারে যে আড়ম্বর আর আতিশয্য দেখা গিয়েছিল, বর্তমানে তা অনেকটা প্রশমিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে বলে মনে হয়। স্বাভাবিক অবস্থাই ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উত্তম পটভূমিকা সৃষ্টি করবে।

পাকিস্তান হাসেলের পূর্বে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তা নয়। ইসলাম প্রভাবিত বিরাট পুঁথিসাহিত্য ছাড়াও শেখ আবদুর রহীমের 'হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি', মীর্জা ইউসুফ আলীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি', গিরীশ সেনের 'তাপসমালা', 'কোরান শরীফের' অনুবাদ ও 'সহী হাদীসের' অনুবাদ, মোজাম্মেল হকের 'তাপসী রাবেয়া' মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু', মৌলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত', নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা', কাজী ইমদাদুল হকের 'নবী কাহিনী' ও 'আবদুল্লাহ্', ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'মহাশিক্ষাকাব্য', কায়কোবাদের 'মহরমশরীফ কাব্য', বরকতউল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা', কাজী আকরম হোসেনের 'ইসলামের ইতিবৃত্ত', এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'শান্তিধারা' ও 'মানব মুকুট', তসলীমউদ্দীন আহমদের 'কোরানের' অনুবাদ, আজহার আলীরকোরানের আলো' ও 'হাদীসের আলো'। এছাড়া মুন্সী মেহেরুল্লাহ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন, মুন্সী রেয়াজউদ্দীন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শেখ ফজলল করীম, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইসলাম প্রচারকের ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক রচনা ও বাংলা বক্তৃতা ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। অবশ্য, ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সাধুরীতি অনুসারে সংস্কৃতমূলক শব্দের আধিক্য রয়েছে, কিন্তু তাই বলে ওগুলো যে ইসলামী সাহিত্য থেকে খারিজ হয়ে গেছে, আশা করি এমন কথা কেউ বলবেন না। ইসলামী ভাবাদর্শ, ইসলামী ঐতিহ্য আর মুসলমান

সমাজের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে লেখা যেসব রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, সে সবই ইসলামী সাহিত্য। সাহিত্যকে মনের খোরাক বলা যেতে পারে। এতে প্রয়োজনীয় মাল-মসলা পরিমাণ মত মিলিয়ে মনোগ্রাহ্য করে নেওয়া হয় (?)। দেহের খোরাক সম্বন্ধে যেমন মনের খোরাক সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায়, তাতে কোনও বিশেষ উপাদানের উগ্র গন্ধ অত্যধিক প্রবল হয়ে ওঠে বা যা গলাধঃকরণ করলে সেই পদার্থের ঢেকুর উঠতে থাকে, সে খাদ্য সুপাচ্য বা রুচিসম্মত। যে পর্যায়ের রচনাই হোক না কেন, তার উপাদানগুলোর মধ্যে মাত্রা সঙ্গতি ঠিক রাখতে হবে, নইলে তা সাহিত্যের পর্যায়ে পড়বে না। এই মাপ কাঠিতে দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুনর্জাগরণের যুগের অনেক বলিষ্ঠ গ্রন্থই বিশেষ প্রবল হয়েও সাহিত্য হতে পারে নি। তবু স্বীকার করতে হবে এর দ্বারা অর্ধ চেতনাকে জাগানোর কাজ হয়েছে, আর ভবিষ্যৎ সাহিত্য সৃষ্টির পথও সুগম হয়েছে।

বলতে গেলে, পাকিস্তান এখনও দশ বছরের শিশু। এর মধ্যেই যে সাহিত্য জগতে একটা কিছু যুগান্তর কাণ্ড ঘটে যাবে, তা আশা করা যায় না। তবু আমরা যে স্পন্দন দেখতে পাচ্ছি,— প্রতি ক্ষেত্রে লেখকদের যে উদ্দীপনা প্রকাশ পাচ্ছে, প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে যে একটা সজীবতার লক্ষণ এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে বাস্তব দৃষ্টি বা পারিপার্শ্বিকের প্রতি মনোযোগ লক্ষ করা যাচ্ছে, তা বাস্তবিকই আশার কথা। গল্প-উপন্যাসে— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু ইসহাক, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, সরদার জয়েন উদ্দীন, শাহেদ আলী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, মহিউদ্দীন, মাহবুবুল আলম, আতোয়ার রহমান প্রভৃতি; নাটকে— নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, পরেশ সেন, আবদুল হক প্রভৃতি; জন-রঞ্জক-বিজ্ঞানে— আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, শাহ ফজলুর রহমান, আবদুল জব্বার প্রভৃতি; পল্লী-গাঁথায়— রওশন ইজদানী; কাব্যে— ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, বেগম সুফিয়া কামাল প্রভৃতি; প্রবন্ধ-গবেষণা ও আলোচনা— আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কাজী মোতাহার হোসেন, এনামুল হক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আলী আহসান, আবদুল হাই, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহম্মদ আজরফ, হাসান জামান, আনিসুজ্জামান প্রভৃতি; শিশু-সাহিত্যে— মঈন উদ্দীন, ফেরদৌস খাঁ, বেনজীর আহমদ, বজলুর রশীদ প্রভৃতি; ভ্রমণ-বৃত্তান্তে — জসীমউদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ প্রভৃতি; এঁদের প্রত্যেকের রচনায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বা নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া অবশ্যই আমার অজানিত বহু পুরাতন এবং নতুন লেখক আছেন, যাঁদের রচনা পুস্তক প্রকাশের নানা প্রকার অসুবিধার জন্য সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই রয়ে গেছে।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায়, গল্প-উপনাস শ্রেণীতেই প্রচুর পরিমাণে উল্লেখযোগ্য নতুন সৃষ্টি হয়েছে। প্রবন্ধ, গবেষণা ইত্যাদিকে তার পরেই ধরা যেতে পারে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেও গল্প-উপন্যাস সবিশেষ উন্নত ছিল। শব্দচয়নে পূর্বের থেকে বেশী স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে, যথাযোগ্য স্থলে আরবী, ফার্সী বা উর্দু শব্দ ব্যবহারের সঙ্কোচ ঘুচে গেছে। বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়েও সাধারণ চাষী-মজুর, মাঝি-মাল্লা, নামাজ-রোজা এবং ইসলামী উপকথার দিকে নজর পড়েছে। তাছাড়া প্রাদেশিক চিত্র পরিস্ফুট করবার জন্য দেশজ ভাষাও অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুখের বিষয়, এইসব সাহসিক কাজ নিপুণভাবেই করা হচ্ছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে আমরা এখন আর কলকাতার ভাষাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন পন্থাকে

আঁকড়ে ধরে বসে নেই, বরং স্বতন্ত্র পন্থা খুঁজে নিয়ে সেই দিকে স্বাধীন পদক্ষেপ করবার সাহস অর্জন করেছি। এটা সামান্য কথা নয়। এর থেকে সূচিত হচ্ছে যে, আমরা বাংলা ভাষার একটি অপূর্ণ স্থান পূর্ণ করবার কাজে লেগে গেছি। এতে সমগ্র বাংলা ভাষা পরিপুষ্ট হবে, আর অতীতে মাতৃভাষার সেবায় মুসলিম সমাজের যে শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল, সে গ্লানিও দূর হবে। অচিরেই এ কথা প্রমাণিত হবে যে, শুধু মধ্যযুগীয় পন্থায় নয়, আধুনিক উৎকৃষ্টতম সাহিত্যিক পন্থায়ও বাংলা ভাষা অন্য যে কোনও ভাষার মতই ইসলামী তমদ্দুন ধারণ ও বহন করতে সক্ষম। (?)

আজকাল রক্ষিত খাদ্যের মত রক্ষিত সাহিত্য-শিল্পও পরিবেশিত হচ্ছে। ছায়াচিত্রে রক্ষিত নাটক-উপন্যাস রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর আর ভঙ্গী নৈপুণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী, আর গ্রামোফোনে রক্ষিত সঙ্গীত ওস্তাদের কণ্ঠে বিধৃত স্বাভাবিক সুর বিস্তারের বৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যান্ত্রিকতার প্রভাবে কুটিরশিল্পের কারুকার্য যেভাবে নিম্নস্তরে নেমে চলেছে, অভিনয়প্রতিভা আর সঙ্গীতসাধনের মানও হয়ত তেমনি ক্রমান্বয়ে নেমে পড়বে বলে আশঙ্কা হয়। এক আসল থেকে যখন বহু নকল বেরোতে থাকে, আর আসল-নকলে যখন তুল্য সম্মান পেতে থাকে, তখন আর অধিক সংখ্যক আসলের চাহিদা থাকে না। এই সংখ্যা হ্রাসের ফলে শেষে সাহিত্যশিল্পের মানের অবনতি, এমনকি বিলুপ্তির সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। পাকিস্তানে, বিশেষ করে, মুসলিম সমাজে নাটক অভিনয়কে ইতিপূর্বে নেক নজরে দেখা হয় নি এবং সামাজিক ও পারিবারিক মেলামেশাও তুলনামূলকভাবে অনেক সীমাবদ্ধ। এইসব কারণে নাটক বহুলাংশে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হয়ে পড়তে পারে। ফলে চরিত্র চিত্রণে অস্বাভাবিকতা এসে পড়াই স্বাভাবিক। আমাদের ছায়াচিত্রে বিদেশী প্রভাবেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, যৌন-অভিব্যক্তি এবং রোমাঞ্চকর অপরাধবৃত্তির দিকেই বিশেষ প্রবণতা আছে বলে শুনা যায়। একথা সত্য হলে আমাদের রচিত নাটকও ক্রমে ক্রমে নিকৃষ্ট, এমনকি, অসাহিত্য হয়ে পড়বার ভয় আছে। কাব্যের দিক দিয়ে প্রকাশের প্রাচুর্য যত দেখা যাচ্ছে, উৎকর্ষের পরিমাণ তার তুলনায় অতিশয় সামান্য বলে মনে হয়। প্রেমকেই কাব্যের একটা প্রধান বিষয়বস্তু বলে ধরে নেওয়া যায়, বিশেষতঃ লেখকবর্গ যখন অধিকাংশই তরুণ। কিন্তু এ বস্তুটি কেমন বা কি, তা কেউ কাউকে বুঝতে পারে না,— এ একটা অনুভবের ব্যাপার। আবার এ অনুভূতি বয়স অনুসারে ক্রমশঃ রূপ বদলাতে থাকে, অথচ মনের সন্দেহ কিছুতেই ঘোচে না,— এর প্রথম কাঁচা রূপটাই সুন্দর, না শেষের ঝুনো রূপটাই সুন্দর, না আদ্যন্ত সবটাই সুন্দর। আমার মনে হয়, কাঁচা অবস্থার মোহ আর ঝুনো অবস্থার পরমার্থতত্ত্ব বাদ দিয়ে মধ্যবর্তী বিকশিত অবস্থাই মানবীয় বেশী এবং সুন্দরতম অভিব্যক্তি। এই ... জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অভিজ্ঞতা ... এর বিচিত্র ও অভাবনীয় বিকাশ ঘটে থাকে। যা বুঝানো যায় না তা বুঝাতে চেষ্টা না করে হয়ত তরুণ লেখকদের এইটুকু উপদেশ দেওয়া যেতে পারে যে, ভাবের প্রথম অত্যাশ্চর্য অঙ্কুরগুলোও লিখে রাখা মন্দ নয়, ব্যক্তি বিশেষের কাছে তা প্রকাশও করা যেতে পারে কিন্তু সাহিত্যে প্রকাশ করে বাজারে ছাড়া সমর্থন করা যায় না। বাল্যে হয়ত আমের ঝরা বোল বা গুঁটি নিয়ে মাতামাতি চলে, খেলাও বেশ জমতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে যতবড় সম্ভাবনাই নিহিত থাক তা বাজারে বিকোয় না। এ প্রসঙ্গে একটি জানা কথা এই যে, আমরা কোনও কিছুর ভিতরে ডুবে থাকলে তাকে সহজে বুঝতে পারিনে, তার বাইরে বেরিয়ে আসলে তবে আস্তে আস্তে জিনিসটা ভালকরে বুঝতে আরম্ভ করি। এই যুক্তিমহুল করে যে

প্রয় একই কথা। অবশ্য দুর্নীতিমূলক সাহিত্য বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নাটক-নভেল লিখতে গেলে রাজনীতি বা যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয় বর্ণনা করতে গেলেই তো প্রচুর দুর্নীতির কথা বাধ্য হয়েই উল্লেখ করতে হয়। এখানে আসল বিচার্য বিষয় লেখকের লক্ষ্য বা সহানুভূতি কোন দিকে। যদি দুর্নীতির গুণগান করাই লক্ষ্য হয়, তবে সে রচনা সাহিত্যই নয়। কিন্তু যদি বৈপরীত্য দ্বারা নীতিকে মহিমান্বিত করবার বা দুর্নীতির কুফল দেখাবার জন্যই এর অবতারণা করা হয়ে থকে, তবে সে রচনা সাহিত্য হতে পারে, যদি সাহিত্যের অন্যান্য গুণ এতে বর্তমান থাকে। অন্যান্য গুণের মধ্যে বর্ণিত বিষয়ের সুষ্ঠু নির্বাচন, ঘটনা সংস্থানের কৌশল, বর্ণনার সরসতা এবং ভাবের সঞ্চারণ ক্ষমতাই প্রধান। বাস্তবের উপর ভিত্তি করেই সাহিত্য গড়ে ওঠে, একথা সত্য হলেও সব ঘটনাই বর্ণনায় নয়, —সুষ্ঠু নির্বাচনের উপরেই অনেক সময় রচনার শালীনতা বা অশ্লীলতা নির্ভর করে; এর জন্য উপযুক্ত মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই। আবার স্বাভাবিকতার দিকে লক্ষ রেখে ঘটনা সংস্থান করতে হয়, এর জন্য চাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর কল্পনা-কুশলতা। বর্ণনার সরসতা একটি ব্যক্তিগত গুণ হলেও অভ্যাস আর সাধনা দ্বারা ভাষাজ্ঞান লাভ করে এর উন্নতি সাধন করা যায়। ভাবের সঞ্চারণ ক্ষমতা জন্মে লেখকের গভীর অনুভূতি, আর শব্দের অব্যর্থ বা নিশ্চিত প্রয়োগ দ্বারা;এর জন্য বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সুপরিচয় তো চাই-ই, তার সঙ্গে আরো চাই পাঠকের সঙ্গে নিবিড় সহানুভূতি।

উপরে বলা হয়েছে, সাহিত্যের লক্ষ্য সুনীতি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিছুকাল পূর্বে একটা বদ্ধ বিশ্বাস ছিল— 'আর্ট শুধু আর্টের জন্য, আর কোনও উদ্দেশ্য নেই, সুতরাং সাহিত্যবিচারে সুনীতি দুর্নীতির প্রশ্ন উঠে না?' কিন্তু মনে হয়, আজও অধিকাংশের মতেই আর্টের বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে— তা হচ্ছে আনন্দবিধান আর উন্নয়ন। আনন্দ উৎপন্ন হয় সৌন্দর্যের অনুভূতিতে, আর মূল্যায়ন (?) হয় জ্ঞান আর আত্মিক সমৃদ্ধিতে। সৌন্দর্যের অনুভূতি জীবনে একটা সৌসাম্য এনে দেয়, যার ফলে কদর্যতার প্রতি আকর্ষণ নিবারিত হয়, এবং সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্যময় সহানুভূতিশীল জীবন-যাপনে রুচি জন্মে। জ্ঞানবৃদ্ধিতে হিতাহিত এবং সুনীতি কুনীতির ভেদ বুঝতে পারা যায়, আর আত্মিক সমৃদ্ধি হলে বিশ্বকে আপন করে নিজেকে ব্যাপ্ত করা যায়। প্রশ্ন হ'তে পারে, আর্টে বা উৎকৃষ্ট সাহিত্যে এসব গুণ কেমন করে জন্মাবে? সাহিত্যে কথার যাদু আছে, যা মনকে আকর্ষণ করে। হজরত মোহাম্মদ যখন কোরান শরীফ তেলাওয়াত করে বক্তৃতা করতেন, তখন কোরেশগণ বিদেশীদের সতর্ক করে দিত— এই লোকটা যাদু জানে, এর কথায় তোমরা কর্ণপাত করো না। সত্যি সত্যি যে বাক্য হৃদয় থেকে উত্থিত হয়, তা অন্যের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি বা সহস্পন্দন জাগায়। বাস্তবিকপক্ষে, কোরান শরীফ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে মনে করা যেতে পারে। "এইসব মহাগ্রন্থ যুগবাণীর বাহক, সেই বাণীতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই; যারা মনোযোগী তাদের জন্য সুপথের নির্দেশক কেবল যারা পাষাণ হৃদয়, যারা চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির, সেইসব মুনাফেকেরাই এর থেকে কোন নির্দেশ পায় না।" শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যেও এইসব গুণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। রচয়িতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। অকৃত্রিম মানবপ্রীতি থাকলেই সাহিত্যিক অব্যর্থ ভাষার সন্ধানে যুক্তিপূর্ণ ঘটনা সমাবেশ করে পাঠকের চিত্ত জয় করতে পারেন। তখন সৌন্দর্য আপনি উদ্‌ঘাটিত হয়, সৌন্দর্য আর সত্য একাকার হয়ে যায় আর এই সংযোগ থেকে নিঃসৃত হয় কল্যাণ ধারা। আমার মনে হয়, সাহিত্য-রস যাঁরা প্রাণ

ভরে পান করেছেন,— যাঁরা প্রকৃত আর্টিস্ট তাঁদেরকে ক্ষুদ্রতা স্পর্শ করতে পারে না। আর্টের সাধনা গর্হিত কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত রাখে, সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে প্রেরণা দেয়, আর কল্যাণের পথে তাঁদের নিত্য নিয়োজিত রাকে। বাস্তবিক শুদ্ধচিত্ততা অর্জন না করলে সুসাহিত্যিক হওয়া অসম্ভব। শুদ্ধচিত্ততার বিচারে আমরা অনেক সময় ভুল করে বসি বলেই বোধহয় এর সঙ্গে সুসাহিত্যের সম্পর্ক আমরা স্পষ্ট দেখতে পাইনে।

সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অনেক জানা কথার অবতারণা করা যেত,— যেমন, শিক্ষা পদ্ধতি, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ও দায়িত্ব, সাহিত্যিকের জীবিকা অর্জন, দেশীয় ছাপাখানার উন্নতি বিধান, ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু অফুরন্ত সাহিত্য কথা নিঃশেষ করবার বৃথা চেষ্টা না করে উপসংহারে কেবল এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের সাহিত্যবিচারে সুরুচি জন্মুক এবং আমাদের সাহিত্যিক ও আর্টিস্টদের মান উন্নত হোক, সম্মান বর্ধিত হোক। তাহলেই আমাদের নতুন দেশে নতুন প্রাণ জেগে উঠবে, চিত্ত-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে জীবন সুন্দর আর যথাসম্ভব সুখের হবে।

# নতুন অবস্থায় সাহিত্য

দেশের অবস্থার সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ আছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। কাজে কাজেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও ক্রমিক পরিবর্তন হবে এ-ই স্বাভাবিক। কিন্তু ওদিকে আবার জড়ধর্ম বলে বিশ্বজগতে একটি নিয়ম আছে, যার ফলে চলিত অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রবণতা বা প্রবৃত্তি সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। শুধু বস্তুর জগতে নয়, চিন্তার জগতেও এই জড়ত্ব ক্রিয়া করে। একে অতিক্রম করতে হলে বেশ খানিকটা স্বাতন্ত্র্যের দরকার হয়। খুব একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা যাচ্ছে।

সাহিত্যশিক্ষার আরম্ভেই বর্ণপরিচয়ের স্থান। আর বাংলাদেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষার সূচনা হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায়, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শিশুশিক্ষা পুস্তকের যথেষ্ট উন্নতি হয়ে থাকবে। আসলে কতটুকু হয়েছে তা' ভাবলে হতাশ হতে হয়। হ্যালহ্যাড ও কেরী সাহেবের ব্যাকরণের পর, রাজা রাধাকান্ত দেবের বর্ণবিনির্ণয় ১৮২০ সালে বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর এদের অনুকরণে শিশুবোধক, জ্ঞানারুণোদয়, জ্ঞানকিরণোদয় এবং বর্ণমালা প্রভৃতি রচিত হয়। এগুলির কোনটিই তরুণ শিক্ষার্থীর পক্ষে সুখপাঠ্য ছিল না। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে সার্থক পুস্তক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। আগেকার বইগুলোর তুলনায় এর সরলতা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তারপর আরও অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়ই বলুন বা রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষাই বলুন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের আদর্শে রচিত। তারপর ১৮৯৯ সালে যোগীন্দ্র সরকার ছড়া ও রঙীন ছবির সাহায্যে জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। আজ পর্যন্ত তর্কালঙ্কার কিংবা সরকারের পাঠান্তরই বাজারে চলছে। এই এক শতাব্দীর মধ্যে শিশুপাঠ্য পুস্তকের শব্দচয়ন বা শব্দের অনুক্রম-নির্ণয়ের কোন চেষ্টাই হয় নাই, অথচ অন্যদেশে ১৮২৬ সালের Pestalozzian Primer থেকে আরম্ভ করে ১৯২১ সালের Heller এবং Courtis প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ! ডঃ (প্রবোধচন্দ্র) চৌধুরী ১০ খানা সুপ্রচলিত "শিশুশিক্ষা" প্রথমভাগ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন তার মধ্যে অপ্রচলিত শব্দের আমদানী হয়েছে খুব বেশি, আর শিশুদের বোধগম্য হইতে পারে না, এমন শব্দ অন্ততঃ শতকরা ১৫টি। নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, কৈরব, পানস, মূর্চ্ছা, শান, অনুকৃতি, আধিদৈবিক, কৈতব, অকুতোভয়, অশনি, কিংশুক, চূড়ামণি, পারলৌকিক, বশংবদ, পীন, বিভূতি, মুকুর, পটু প্রভৃতি শব্দ। আর একটি লক্ষযোগ্য বিষয় এই যে কোনও দুইখানা বইয়ের মধ্যে শতকরা ১৫টির অধিক শব্দে মিল নাই। এ বিষয়ে এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শব্দের প্রয়োগ-বহুলতা নির্ণয় করে শিশুপাঠ্য পুস্তকে সহজ সহজ কথা ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ একেবারে বর্ণমালা আর শিশুশিক্ষা থেকে শুরু করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যে জনগণের মনোবৃত্তি এবং তাদের সমস্যা প্রতিফলিত হওয়া উচিত। জনসংখ্যার অনুপাত এখন বদলে গিয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকেন্দ্র স্বভাবতঃই কলকাতা থেকে সরে ঢাকায় এসেছে। তাই এদের ভাবধারা এবং জীবনযাত্রা প্রণালী সাহিত্যে প্রাধান্য পাবে। কাজে কাজেই ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত অনেক গ্রন্থ অদূর ভবিষ্যতে রচিত হবে এবং তা শুরুও হয়ে গেছে। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি পত্রিকায় ইতিমধ্যেই এ পরিবর্তন বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোরান-হাদিসের অনুবাদ শেখ সাদী, মৌলানা রুমি, হাফেজ, ওমর খৈয়াম, হালি, একবাল প্রভৃতির সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, গুলে বাকাওলী, চাহের দরবেশ প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যের ভাবানুবাদ এ সমস্ত আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম জ্ঞান পরিবেশনের জন্যই পাঠককে অনেক সাহিত্যিক পিল গেলাতে হবে, তারপর সাহিত্য রচনা একটু অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করবে। যাহোক এই প্রাথমিক কাজ যাঁরা করবেন তাঁদের আতিশয্যে অধীর হয়ে লাভ নেই— প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেই বাছাই কাজ সহজ হবে এবং যেটুকু অনাবশ্যক বা অযোগ্য, তা' আপনা আপনি মরে যাবে। তবে, লক্ষ্য রাখবার বিষয় এই যে, অনুস্বার বিসর্গ ছড়ালেই যেমন সংস্কৃত হয় না, সেই রকম কেবল আয়েন গায়েন এর ছড়াছড়িতেই ইসলামি তামাদ্দুনের প্রকাশ হয় না। পুঁথিসাহিত্যের মারফৎ এক সময় জনসাধারণের মধ্যে ইসলামিক ভাব প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ের এখন পরিবর্তন হয়েছে, লোকের এখন সভ্যতার মান অন্য রকম হয়ে গেছে। তাই ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে কাজ হবে না— ঐ কাজই সময়-উপযোগী ভাব ও ভাষা দিয়ে নতুন করে আনজাম দিতে হবে। উদাহরণ দেখুন : আবদুল ওহাব রচিত 'কাছাছোল আম্বিয়ার' আছে—

> "এবরাহিম পয়গম্বরে নেদা হবে হৈল।
> কেমন লস্কর চাহ মেরা তরে বলো॥
> এতশুনি খলিলুল্লা বলিলেন তখন।
> তোমাতে রওশন সব আছে নিরঞ্জন॥
> নাহিক গরজ পাহাল ওয়ান লস্করেতে।
> জাহাতে কুদরত তেরা দেখা সকলেতে॥
> কমজোর সবহৈতে হোছজে ওজুদে।
> তার হাতে ছারখার কর নমরুদে॥
> তখনি হুকুম আল্লা দিল ফেরেশতারে।
> সেতাবি চলিয়া যাও কোকাফ মাঝারে॥
> মসার তরাখ যত আছে সেখানেতে।
> একটি তরাখ খুলে দেহ তাহা হৈতে॥
> হুকুম এলাহী হয় মালাএক গণে।
> সাত লাখ মচ্ছর ছাড়িবার কারণে॥
> এক এক সওয়ার পর এক এক মচ্ছর।
> বরাবর হবে তার মস্তেক লস্কর॥

— এর শব্দ সম্বন্ধে কিছু না বললেও, ছন্দ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলা যায় যে, এর চেয়ে ঢের বেশি সবল ও সরস ছন্দ না হলে এখানকার পাঠকের মনে ধরবে না। সহায়ত প্রচলিত মুসলমানী শব্দ নিশ্চয়ই লাগাতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু মাত্রাবোধও থাকা চাই।

উপরে লোকসংখ্যার অনুপাতের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য, এরকম হিসাব করে, অতখানা ইসলামী তামাদ্দুনের বই লিখলে, ঠিক অতখানা হিন্দু সভ্যতার বই লিখতে হবে— এমন দাবী কেউ করতেও পারে না, আর করলে তা কার্য্যকরীও হয় না। তবে একথা সত্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশেই বাস করবে, আর সে মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্রই হচ্ছে সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ইত্যাদি। ইসলামী সাহিত্য হিন্দু সাহিত্য— এসব কথার মধ্যে একটু ত্রুটি রয়েছে। কতকগুলি ব্যাপার আছে, যা নিছক হিন্দুর ঘরের কথা বা মুসলমানের ঘরের কথা— সেগুলির মধ্যে যদি অন্য সম্প্রদায়ের লোকের কোন গরজ বা ঔৎসুক্য বা ভাব-সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে সেগুলি ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না— তা' শুধু সম্প্রদায় বিশেষের শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্যিক পিল্ বা সালসা মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পাঞ্জগানা নামাজের ফজিলত কিংবা গঙ্গাস্তোত্রের মাহাত্ম্য যতই ফলাও করে বর্ণনা করা হোক না কেন, তার গণ্ডী এত সংকীর্ণ যে তা সাধারণ অবস্থায় সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। কিন্তু ইমাম হুসেনের শাহাদাৎ কিংবা অশ্বত্থামার শবব্যূহ বিশেষভাবে মুসলমান বা হিন্দুর নয়— এর মধ্যে এমন এক্ করুণ-রসের আবেদন আছে যা' সাম্প্রদায়িক ভেদবোধের অনেক উর্ধ্বে। এই রসের ক্ষেত্রেই সাহিত্যের মিলনভূমি। এর মধ্যে বিপরীতকে জোড়াতালি দিয়ে মিল করবার চেষ্টা আদৌ নেই। যাঁরা ইসলামী সাহিত্য বলতে কেবল তউহীদের ব্যাখ্যা এবং হিন্দু-সাহিত্য বলতে তশরীকের কীর্তন বোঝেন, আমার বোধ হয়, তাঁরা সাহিত্যকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলে মনে করেন। সাহিত্য তখনই সার্থক হয়, যখন তা' সম্প্রদায় পেরিয়ে মানবতার মধ্যে প্রসারিত হয়। সম্প্রদায়গত পরিবেশের মধ্যে তার মূল থাকতে পারে, কিন্তু তার আবেদন হবে সর্বজনীন। তাই পাকিস্তানী সাহিত্য হবে হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতির মিলন-ভূমি। রসমাধুর্য্যে সে সাহিত্য সকলেরই মনোহরণ করবে। এখানে রস সম্পর্কেও একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমরা বাঙালি জাত বোধ হয় অতিশয় গম্ভীর। 'রস' বলতেই রসিকতার কথাটাই সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। তাই মনে হয়, কোন কোন মুরব্বী রসের উল্লেখ মাত্রেই যেন চোখ রাঙিয়ে বলেন— খবরদার ! তফাৎ থাক, ওসব ছিবলামী বা ফাজলামী চলবে না। এ-টি আসলে আমাদের সামাজিক জীবনে দৈন্যের পরিচায়ক— নইলে রসের সঙ্গে বেতমীজী বা বে-আদবীর নিকট-সম্বন্ধের কল্পনা মনে আসবে কেন ? বোধ হয়, জীবনের পরিধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনাবিল রসের সৃষ্টিও করতে পারব, সম্ভোগও করতে পারব।

একথা বলাই বাহুল্য যে ভোক্তার রুচি অনুসারে ভোজ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে। তাই আমাদের পাঠক সমাজের রুচি-উন্নয়নের সঙ্গেও সাহিত্যের উৎকর্ষের সম্বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়েও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কদ রস বা অশ্লীলতা যে 'রস' নয়, এ-বোধ সাহিত্যিকের তো অবশ্যই থাকা চাই। কিন্তু শুধু তা'তেই চলবে না— ক্রমান্বয়ে জনসাধারণের মধ্যেও যাতে রসবোধ সম্পর্কে উচিত সর্বজনীনভাবে জাগ্রত হয় তার চেষ্টাও করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আনন্দের কথা যে বর্তমানে আমরা সময়োপযোগী নাটক, নভেল এবং গল্প-কবিতারও আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। যাঁরা এখনও কাঁচা হাতে লেখেন, লিখতে লিখতে অবশ্যই তাঁদের হাত পাকবে। তা' ছাড়া এঁরাই হবেন অদূর ভবিষ্যতের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের অগ্রদূত— এমন কি এঁদের মধ্যেই প্রতিভার উন্মেষ হবে। চাই শুধু তাদ দৃষ্টি আর

অকৃত্রিম নির্ভীক প্রকাশ। তবু আর সত্যের সন্ধিৎসা নিয়ে সাহিত্যকে অর্থবোধ করা যায়। সাহিত্যিক যদি নিজের মনের কথা অকপটে প্রকাশই করতে না পারেন, তবে তার বিকাশ হবে কেমন করে? নিজেরাই যাতে চিন্তার শর্ত বোধ না হয়, সেদিকে যেন সাহিত্যিকদের নজর থাকে।

মনের ক্ষুধা যাতে মেটে, যাতে মনের আনন্দের অনুভূতি হয়, যাতে কল্পনার বৃদ্ধি হয়, আর যাতে ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত হয় সব দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। অনুকরণ নয়, অনুভূতিকে সম্পূর্ণ দরদ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। দেশের লোক এবং তার আকাশ, বাতাস, নদী, পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করতে হবে, তবেই সাহিত্যে বিশিষ্টতা প্রকাশ পাবে। অনুকরণের আকাশ-কুসুমের চেয়ে অনুভূতির বন-কুসুম শ্রেষ্ঠ— এই কথা স্মরণ রেখে আমাদের নবীন সাহিত্যিকেরা "ধূলায় তাজমহল" গড়তে পারবেন, এ আশা নিতান্ত দুরাশা নয়।*

* রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা সৌজন্যে

দিলরুবা
অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

# বাঙ্গালা সাহিত্য

মুসলিম শাসনের পূর্বেকার কোনো বাঙ্গালা সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এর থেকে হয়তো এ-কথা মেনে নেওয়া অসঙ্গত হবে না যে, তৎকালীন সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা জনগণের কথ্য ভাষাকে 'ইতর ভাষা' বলে ঘৃণা করতেন, আর উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হ'লে 'দেবভাষা' সংস্কৃতেই করতেন। ফলে জনসাধারণের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিষয় মুখে মুখেই প্রচারিত হয়ে বংশানুক্রমিকভাবে রক্ষিত হ'ত। ফল কথা, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেকার কোনো কবিতা বা কাব্য-গ্রন্থের নিদর্শন দেখা যায় না। তা'ছাড়া গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দুই শ' বা তিন শ' বছরের আগেকার কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় বাঙালীর আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কর্ম-তৎপরতা নিয়ে রচিত সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে এদেশে মুসলিম শাসন-কালেই। কিন্তু এই যুগেরও গদ্যরচনায় কেবল দলিল-দস্তাবেজ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিঠিপত্র ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল ব'লে মনে হয় না। কিন্তু এ-গুলোকে 'সাহিত্যের' পর্যায়ে ফেলা যায় না। এ-গুলো থেকে কেবল এই বুঝা যায় যে, ঐ সময় প্রচলিত ভাষায় বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসী শব্দের কি পরিমাণ মিশ্রণ হয়েছিল।

প্রাক-মুসলিম যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করলে, তার বিলুপ্তির কোনো সঙ্গত কারণ থাকা চাই। একটি সম্ভাব্য কারণের কথা ভাবা যেতে পারে, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৌদ্ধ-নিপীড়ন। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ "শূন্যপুরাণে" "নিরঞ্জনের রুস্মা" ব'লে একটা অধ্যায় আছে। তাতে জাজপুরে মুসলমান এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ আছে :

'জাজপুর' এবং 'মালদা' অঞ্চলে ১৬০০ বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবার এসে জোট বেঁধেছিলেন। তাঁরা দশ-বারো জনে মিলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সদ্ধর্মী (বৌদ্ধ)-দের অভিশাপ এবং গালিগালাজ করে তাদের কাছ থেকে ধর্ম-চাঁদা দাবী করতেন। দাবী-মতো চাঁদা দিতে অস্বীকার করলেই তাদের হত্যা করা হ'ত। তাঁরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন, আর তাঁদের মুখ থেকে আগুন বের হ'ত।

বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের স্বাধীন চিন্তার লীলাভূমি ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধরা-বাঁধা আচার-নিষ্ঠা এবং জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে এ ছিল এক প্রতিবাদ। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি থেকে সহজিয়া, কর্তাভজা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি সম্প্রদায় উৎপন্ন হয়েছিল। সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরাই এইসব মতবাদে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের বিড়ম্বিত জীবন-ভরা ব্যর্থতা আর অসন্তোষ ভুলবার জন্য এরা 'মানব জীবন অসার'—এই ফিলজফি চিন্তা করেই সান্ত্বনা পেত। এমন সময় ইসলাম এলো আল্লাহর একত্ব এবং মানুষের ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের বাণী নিয়ে। বহুলোক এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হ'ল।

মুসলিম বিজয়ের পর বাংলার পাঠান রাজগণ দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিতে লাগলেন, আর পূর্ববর্তী শাসকদের তুলনায় অনেক বেশী উদার মনোভাবেরও পরিচয় দিলেন। ফলে, রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা কাব্যে অনূদিত হ'ল। শুচাচার্য ব্রাহ্মণেরা এ-গুলোকে শাস্ত্র-বিগর্হিত বলে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে তা' গ্রাহ্য করল না। আজও ধর্মপরায়ণ বাঙালী হিন্দুরা বাংলা রামায়ণ-মহাভারতই পাঠ করে থাকেন। এরফলে হিন্দু কালচার এ-দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হ'তে পেরেছে; আর ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আগে যে কৃষ্টিগত পার্থক্য ছিল তারও অবসান ঘটেছে।

গৌড়ের অনেক পাঠান নৃপতি-ই বাঙালী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। যশোরাজ খাঁ সুলতান হুসেন শাহকে 'বিশ্বের রত্ন' বলে প্রশংসা করেছেন। চণ্ডীদাস সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে 'মহাপ্রভু গিয়াসউদ্দীন' বলে সম্বোধন করেছেন। পাঠান-রাজ শামসুদ্দীন ইউসুফ ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুকে পুরস্কৃত করেন। আরও অনেক রাজপুরুষের অর্থসাহায্যে বিখ্যাত কবিগণ এইসব ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন। 'কবীন্দ্র' পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারতের একখানা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এখানি "পরাগলী মহাভারত" নামে খ্যাত।

মুঘল আমলেও বাঙালী কবিগণ উৎসাহ পেয়েছেন। এ-যুগের কবিদের মধ্যে আরাকান রাজ-সভার কবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল সবিশেষ বিখ্যাত। উজীর আশরাফ খাঁর আদেশে দৌলত কাজী "সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী" কাব্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু তিনি কাব্যখানি সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেননি; পরবর্তীকালে সৈয়দ আলাওল তা সমাপ্ত করেন। বাংলার সঙ্গে ব্রজ-বুলির মধুর মিশ্রণে দৌলত কাজী সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। এ-ছাড়া তিনি আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য আর কাব্যকুশলতার দৌলতে বিদ্বৎসমাজ বাংলা কাব্যকে সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করেন। তাঁর রচিত বারমাস্যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

সৈয়দ আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা "পদ্মাবতী"র আখ্যান-ভাগ হিন্দী কবি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর রচিত "পদুমাবৎ"-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তাঁর কল্পনা-কুশলতা, বর্ণনা-ভঙ্গী এবং সৌন্দর্য-সৃষ্টির মৌলিকতায় গ্রন্থখানা এক নতুন সৃষ্টির গৌরব লাভ করেছে। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং বাংলা, হিন্দী, ব্রজবুলি, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যে জিন-পরীর অবতারণা ক'রে কল্পনার রাজ্য প্রসারিত করেন। সুবিজ্ঞ সমালোচক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, কাব্য-কুশলতায় তিনি পরবর্তী শতাব্দীর বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

প্রাথমিক যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান আর মোহাম্মদ খাঁ সমধিক প্রসিদ্ধ। সৈয়দ সুলতান "যোগ"-সাধন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাঁর "জ্ঞানপ্রদীপ", "ওফাতে রসুল" এবং "শবে মে'রাজ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহাম্মদ খাঁ মর্সিয়া সাহিত্যের প্রবর্তক। তিনি ফারসী কায়দায় অনুসরণ ক'রে "মকতুল-হুসেন" রচনা করেন। এখন পর্যন্ত এই বইয়ের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। মীর মশাররফ হোসেন এর থেকেই প্রেরণা লাভ ক'রে "বিষাদ-সিন্ধু" রচনা করেছিলেন।

পাঠান এবং মুঘল যুগের মুসলিম কবিদের একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁরা ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে কাব্য রচনা করে গেছেন। তাঁরা হিন্দুধর্মের মর্মকথা এবং

দেওয়ার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। এতে খানিকটা উপকার হ'ল' কারণ সাধারণ মুসলমান বুঝতে পারল, তাদেরও অতীত ছিল গৌরবময়। 'মহাশ্মশান' কাব্য এবং 'বিষাদ-সিন্ধু' ছাড়া এই যুগে আকরম খাঁর 'মোস্তফা-চরিত' ও 'কোরআনের তফসির', ডক্টর এনামুল হক ও মুন্শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'আরকান রাজ-সভায় বাংলা সাহিত্য', কাজী আকরম হোসেনের 'ইসলামের ইতিবৃত্ত', এম. আকবর আলীর 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান', আবুল হাসানাতের 'যৌনবিজ্ঞান', গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরুভাস্কর', ইব্রাহিম খাঁর 'খালেদার সমর-স্মৃতি', এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'শান্তিধারা' ও 'মানব-মুকুট', ডাঃ লুৎফর রহমানের 'উন্নত জীবন' ও 'মহৎ জীবন', কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ', ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল-প্রবাহ', মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' প্রভৃতি বই বিগত যুগের মুসলিম-জাগরণে সাহায্য করেছে।

উপরে যাঁদের নাম করা গেল, তাঁদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের জীবিত মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কবি নজরুল ইসলামই সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। বলতে গেলে একমাত্র তিনিই হিন্দু লেখক এবং হিন্দু জনসাধারণের কাছে মুসলিম লেখকের জন্য সম্মানজনক স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছেন। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের বলিষ্ঠ ভঙ্গী, তাঁর সঙ্গীত ও কাব্যের অপরূপ মাধুর্য, তাঁর স্বদেশী গান, প্রেমের গান, গজল, কীর্তন, উপন্যাস, গল্পোপন্যাস, শিশু-সাহিত্য প্রভৃতির জন্য তিনি অনায়াসে উচ্চ আসন লাভ করেছেন। সংস্কৃতান্বিত বাংলা ভাষায় তিনি বহু আরবী-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করে ভাষার সমৃদ্ধি ও প্রকাশ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। তাঁর 'পূজারিণী' ও 'রহস্যময়ী' পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের সমকক্ষ। তাঁর 'ঝিঙেফুল', 'কামাল', 'আনোয়ার', 'রীফ সর্দার' ও 'খালেদ' কবি বাইরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তাঁর মার্গ-সঙ্গীত এবং লোক-সঙ্গীত যেমন অজস্র, তেমনি ভাব ও সুর-বৈচিত্র্যে গরীয়ান। বাংলা গানে উর্দু-ফারসীর ঝোঁক ব্যবহার করে তিনি একে আরো জোরালো এবং বিচিত্র ভাব-প্রকাশক্ষম করে দিয়েছেন। ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী পুরাণ, ইতিহাসের জ্ঞানে তিনি কবি আলাওলের সমকক্ষ।

নজরুলের সঙ্গে তুলনায় সমসাময়িক অন্য কবিরা অনেকখানি খাটো। কেবল পল্লীকবি জসীমউদ্দীন পল্লীবাসীর আশা-নিরাশার চিত্রাঙ্কনে সত্যিকার সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ'-এর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।

বাংলা ভাষার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যেও প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র উল্লেখ না করলে একটা বড় ফাঁক থেকে যায়। আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং কাজী মোতাহার হোসেনের পরিচালনায় এই 'সাহিত্য-সমাজ' প্রায় ৮/৯ বছর চালু থাকে। কর্মবীর আবুল হুসেন 'আদেশের নিগ্রহ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা' আর 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' নামে তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন। চিন্তাবীর আবদুল ওদুদ 'নবপর্য্যায়' বইয়ে 'সম্মোহিত মুসলমান' নাম দিয়ে এক যুগান্তকারী প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি বলেন : 'পাথরের প্রতিমার বিধান না করলেও মুসলমানের মন কতকগুলো সংস্কারে এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের পক্ষে এক নতুনতর প্রতিমা!' মোতাহার হোসেন 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ', 'সঙ্গীত-চর্চায় মুসলমান', 'বাঙালীর সামাজিক জীবন' প্রভৃতি কয়েকটি স্মরণীয়

প্রবন্ধ লেখেন। এঁদের এবং এঁদের সমভাবুকদের এইসব লেখায় তৎকালীন মুসলিম-সমাজে বেশ একটু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ ক'রে পেশাদার ধর্মধ্বজীরাই প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। যা হউক, ক্রমে ক্রমে সাহিত্য ও কলা সম্বন্ধে মোল্লা-মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হ'লেও অনেক দিক দিয়ে গভীর পরিবর্তন হয়েছিল।

আধুনিক যুগের আর একটি সাহিত্যিক দলের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁদের মতে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্ববর্তী সকল সাহিত্যিকই মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টি-কোণ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন; নিম্নস্তরের লোক, কৃষক, কুলি, মজুর প্রভৃতি যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যেও অবহেলিত হয়ে এসেছে। আগে যে-ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কৃষ্টি স্থান পায়নি, এ আপত্তিও অনেকটা সেই ধরনের। এই বাস্তববাদীর দলে তরুণ মুসলিম লেখকেরাও দলে দলে ভিড়ছেন। এঁরা সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর প্রসার চান এবং করছেনও। এখনও এই দলের হিন্দু লেখকেরাই মুরব্বীয়ানা করছেন বটে; কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হয়, আগামী পনের-কুড়ি বছরের মধ্যেই বহু তরুণ মুসলিম সাহিত্যিক পুরোভাগে এসে দাঁড়াবেন এবং সাহিত্যের সব বিভাগেই কৃতিত্ব অর্জন করবেন।

পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার
ঢাকা, ১৯৫৪

# বাঙ্গলা সাহিত্যের স্বরূপ

মানব-চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার রসযুক্ত সম্যক্ প্রকাশ লইয়াই সাহিত্যের কারবার। সাহিত্য কখনও বা অগ্রদূত হইয়া সমাজকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে, আবার কখনও বা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজের প্রতিস্তরের প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখায়। এইরূপে সাহিত্যের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্বোধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশের চিত্তের প্রকৃত ইতিহাস রচিত ও রক্ষিত হয়। বাঙ্গালী মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি বাঙ্গলা-ভাষার ভিতরে অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে পণ্ডিতেরা বহু খুঁটি-নাটি তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু এখানে সাধারণভাবে মাত্র একটি বিশেষত্বের কথাই আলোচনা করা যাইতেছে।

ইংরাজ অধিকারের সমসাময়িক ও তৎপূর্বকার বাঙ্গলা সাহিত্যে দেব-দেবীর উপাখ্যান এবং ঐতিহাসিক ঘটনামূলক রচনা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তাহা সামান্য। কৃত্তিবাস-কাশীদাসের অমূল্য দান; এবং অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, ময়নামতির গান, বেহুলা-সতী-সাবিত্রীর উপাখ্যান, অজামিলের হরিভক্তি, ধ্রুব-চরিত্র, সুরথ উদ্ধার, কংসবধ, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি পালা গান— এ সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দুর বিশিষ্ট ধর্মীয় আবেষ্টনে পরিপুষ্ট। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির প্রেমের কবিতাও অনুভূতির নিবিড়তা ও ভাবের সূক্ষ্মতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমাদর্শের অনুরূপ হওয়াতে ধর্মীয় সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। তৎকালীন বাঙ্গালী হিন্দুর এই ধর্ম-সর্বস্বতা প্রকৃত ধর্মপ্রবণতার লক্ষণ, না পরাধীন বীর্যহীন জাতির শেষ অবলম্বন ধর্মকেই প্রবলভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রচেষ্টা তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রকৃত ধর্মপ্রবণতায় সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই; কিন্তু ধর্ম ও অতীত গৌরব-কাহিনী যখন অন্ধের যষ্টির মত লোকের একমাত্র সম্বল হয়, তখন তাহা অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ পায়। সেই অসীম আগ্রহের মুখে বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রমাণ-প্রয়োগ দেখিতে পাই। প্রকৃত ধর্মবোধ মানবপ্রীতির দৃঢ়-ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পরাধীন জাতির পক্ষে প্রকৃত ধার্মিক হওয়া স্বাভাবিক কিনা (এমন কি, সম্ভব কিনা) তাহা সন্দেহের বিষয়। তথাপি তাহার অন্ধবিশ্বাস ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি পালন তুচ্ছ জিনিস নয়— নিতান্ত প্রাণের জিনিস বলিয়া উহাও মহামূল্য। বস্তুতঃ ভক্তি, বিশ্বাসপ্রবণতা, ও ভাবাতিশয্য আজিও অধিকাংশ বাঙ্গালীর প্রধান বিশেষত্ব।

তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চিত্তের কোনো বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায় স্থানে স্থানে মুসলমানের অত্যাচার ও নিপীড়িত হিন্দুর অসহায় অবস্থার জ্বালাময় বর্ণনা দেখা যায়। অবশ্য বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বলিয়া কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁহাদের বিস্তর স্তুতিবাদও আছে, কিন্তু তাহার সহিত সমগ্র বাঙ্গালীর চিত্তের

কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। মুসলমান রচয়িতাগণ যে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বিশেষ করিয়া মুসলমান কৃষ্টির তেমন আভাস পাওয়া যায় না।

মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামী আদর্শ হইলেও অল্প কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক, সাধক ও মুর্শিদা-সঙ্গীত রচয়িতা ছাড়া অন্য কোনো মুসলমান যে হিন্দুর সহিত মানবতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে মিলিত হইতে চাহিয়াছিলেন, বা তাহার আবশ্যকতা ও ঔচিত্য অনুভব করয়াছিলেন, সাহিত্য হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসল কথা, বাংলা-সাহিত্যরূপ মিলনক্ষেত্রই সেই সময় তেমন করিয়া প্রস্তুত হয় নাই। তখন মুসলমান উর্দু ও পার্শী পড়িত, চাকুরী-প্রত্যাশী হিন্দুরাও তাহাই পড়িত। তাহা ছাড়া মুসলমানের আরবী ও হিন্দুর সংস্কৃত ধর্মভাষা ও দেবভাষারূপে পঠিত হইত। যাহা হউক উর্দু ও পার্শীর ভিতর দিয়াই হিন্দু-মুসলমানে অনেকখানি সম্প্রীতি হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যতঃ পরস্পরের ভিতর বিদ্বেষের চিহ্নই অধিক পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মুসলমান ভুলিতে পারে নাই যে তাহারা এদেশ জয় করিয়াছে, আর হিন্দুও ভুলিতে পারে নাই যে মুসলমান তাহাদিগকে বেদখল করিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছে। মুসলমান হিন্দুর প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছে, আর হিন্দুও সুযোগ পাইলে তাহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই। এজন্য অধিকাংশ মুসলমানের নিকট সুলতান মাহমুদ, কালাপাহাড়, আওরঙ্গজেব, আহ্‌মদশাহ আবদালী প্রভৃতিই আদর্শ নরপতি; আর হিন্দুর নিকট রাণাপ্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতিই আর্দশ বীর; পরবর্তীযুগে জাতীয়তাবোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজসিংহ, সীতারাম এবং যাবতীয় মারাঠা ও শিখ্ বীরপূজার আসনে স্থান পাইয়াছেন। ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ যতদিন ধর্ম সংস্কারের উর্ধ্বে না উঠিতেছে, ততদিন এরূপ সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে সম্ভবতঃ বাধাই স্থাপন করিবে।

আর একটি কথা মনে হয়। আলোচ্য সময়ে বাঙ্গলা-ভাষার চর্চা করা হিন্দু-মুসলমান কেহই বিশেষ আবশ্যক বা গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন না। আর সে সময়ে যে অধিকাংশ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভাষা সংস্কৃত, উর্দু কিম্বা পার্শী ছিল, তাহাও ধারণা করিবার কোনো হেতু নাই। অতএব দখা যাইতেছে, তাঁহারা ভাষা সম্বন্ধে এক অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। বোধ হয় এইরূপ কৃত্রিম অবস্থায় লালিত হওয়াতেই মনে প্রাণে কোনো মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহা উৎসাহে কাজ করিয়া যাওয়া স্বাভাবিক ছিল না। কাজে কাজেই পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষের গৌরব এবং আপন আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠতা কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকাই সাধারণ প্রথা ছিল। তখনকার লোকের জীবনে অভাব অল্প ছিল বলিয়া সমস্যাও অধিক ছিল না। সাহিত্যের ভিতর আমরা নিশ্চিন্ত আরাম ও প্রচুর অবসরের ভিতর ধর্ম, প্রেম ও অবাধ হাস্য-রসিকতার সন্ধান পাই।

ক্রমে ক্রমে মুসলমানের হস্ত হইতে শাসনভার ইংরেজের হস্তে আসিয়া পড়িল। পার্শী আর আদালতের ভাষা রহিল না। রাজানুগ্রহ লাভের নিমিত্ত ইংরাজী শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল। হিন্দু এই নূতন অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে গ্রহণ করিল; কিন্তু অপরিণামদর্শী মুসলমান অন্ধ অহঙ্কারের বশেই হউক, রাজনৈতিক ভেদনীতির জন্যই হউক, কিম্বা তাহাদের চরিত্রগত অপরিবর্তনশীলতার জন্যই হউক, ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য ভাষা উপেক্ষা করিয়া রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া চাকুরী ও ব্যবসার ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িল, এবং অসভ্যতা ও বর্বরতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সময় মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন এবং ইংরাজ রাজপুরুষের বাঙ্গলা-ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা, প্রধানতঃ এই দুই কারণে বাঙ্গলা-ভাষার চর্চায় এক গৌরবজনক নবযুগের সূত্রপাত হইল। এই সময় বাঙ্গলা-ভাষা মুসলমানী-ভাষার প্রভাব হইতে যথাসম্ভব মুক্ত হইয়া অতিরিক্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ তৎকালীন হিন্দুদিগের মনে বাঙ্গলা-ভাষাকে যাবনিক ও প্রাকৃত প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া দেবভাষার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন করিয়া ইহার আভিজাত্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। ওদিকে উর্দু-পার্শী ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণের লোকসাহিত্য হিসাবে আরবী-পার্শী ও উর্দু শব্দবহুল পুঁথিসাহিত্যের প্রসার হইল। মনে হয়, এইরূপে বাঙ্গলা-ভাষা শৈশবেই দ্বিধা-বিভক্ত হওয়াতে হিন্দু-মুসলমান চিত্তে নূতন করিয়া আর এক ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। পুঁথিসাহিত্যের বিষয়বস্তু অতীতে, মুসলমানের গৌরব ও বিজয়ের দিনে, অবস্থিত। ইহাতে অমুসলমানেরা কাফের ও নরককুণ্ডবাসী এবং মুসলমানের হস্তে নিত্য-লাঞ্ছিত। পক্ষান্তরে হিন্দুয়ানী বাঙ্গলাসাহিত্য প্রধানতঃ বর্তমানের সমস্যা লইয়া রচিত হইতে লাগিল। নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ছাড়াও ইহাতে নির্যাতনকারীর প্রতি নির্যাতিতের স্বাভাবিক আক্রোশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এজন্য মুসলমান বাদশাদের অত্যাচার, কাজীর বিচার, মুসলমান জনসাধারণের নৈতিক হীনতা ও চরিত্রগতদোষ এবং বাদশাদের কু-শাসনে দেশে দস্যু-তস্করের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি বিষয়ে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেখা যায়। ইহাতে কতক কতক সত্য থাকিলেও, কিয়দংশে ইহা যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ স্থায়ী করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণ হইতে উদ্ভূত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐতিহাসিক সত্য-বিকৃতিই এরূপ সন্দেহের প্রধান কারণ।

যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যাইতেছে, এই সময় বাঙ্গালী মুসলমান কেবল অতীতের দিকেই মুখ ফিরাইয়া রহিল; কিন্তু হিন্দু সামাজিক সমস্যাবহুল জীবনের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। সতীদাহ প্রথা, সমুদ্রযাত্রা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিশেষ করিয়া হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন ও আদালতের ভাষা করিবার জন্য যে সমস্ত বাঙ্গালী উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও মুসলমানকে অনুপস্থিত দেখিতে পাই। এইরূপ হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চাঞ্চল্যকর জীবন সমস্যায় সম্মুখীন হইয়া ক্রমশঃ জাগ্রত ও শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল, আর আত্মবিস্মৃত মুসলমান তাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অনেকের জীবনে ও সাহিত্যে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল সত্য; কিন্তু জনকয়েকের সাময়িক ক্ষতির তুলনায় সমগ্র সমাজের চাঞ্চল্যকর নবঅনুভূতি এবং নূতনতর জীবনাদর্শের প্রতি সবিস্ময় দৃষ্টিপাত অনেক অধিক মূল্যবান। কারণ, এই অন্ধ অনুবর্তন বাহ্য ব্যাপার,— শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষযুক্ত সাহিত্য ও মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়া গেল; পক্ষান্তরে সনাতন প্রথা ও নৈতিক আদর্শের দিক হইতে নূতনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ, সনাতনকে বজায় করিয়া ও নূতনের সামঞ্জস্য স্বীকার করিয়া সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার প্রবৃত্তি এবং বর্তমান প্রয়োজনের দাবী স্বীকার করিবার মত মনোবৃত্তির অনুশীলন স্থায়ীভাবে নবযুগের ভিত্তি স্থাপন করিল।

এই নবীন উদ্যমে যখন বাঙ্গালীর সাহিত্য বেগবান হইয়া উঠিয়াছে, তখন আস্তে আস্তে মুসলমানের ঘুম ভাঙ্গিতে শুরু করিল। সাহিত্যে অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অধঃপতন সর্বাঙ্গীনরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। অথচ হিন্দুর রচিত সাহিত্যে মুসলমানের যে রূপ দেখিতে

পাইল, তাহাতে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ তাহারা বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ ও মুসলমান সভ্যতার স্পর্শলেশ-শূন্যতায় সহসা অভিভূত ও নৈরাশ্য-পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন মুসলমান লেখক ইসলাম ও মুসলমানের গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই সাহিত্যে ঝাঁঝ ছিল, হয়ত শতকরা নব্বই ভাগ সত্যও ছিল, কিন্তু যে মুক্ত-দৃষ্টি ও যুগোপযোগী জ্ঞানগাম্ভীর্য সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহার অভাবে এই সব রচনার অধিকাংশ তথ্যপূর্ণ হইলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিল। এই সময় আর এক শ্রেণীর মুসলমান লেখক হিন্দু সাহিত্যিক্যের সৃষ্ট চরিত্রের পাল্টা জওয়াব দিতে গিয়া মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকা সম্বলিত নভেল লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, রুচি-সৌষ্ঠবের অভাবেই হউক, বা সাহিত্যিক সৃষ্টি প্রতিভার অভাবেই হউক, সেগুলি হিন্দু সমাজে তো দূরের কথা, মুসলমান সমাজেও স্থায়ীভাবে আদর লাভ করিতে পারিল না। এখন পর্যন্ত-মুসলমান সমাজ এতদূর পিছাইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন লোক অল্পই দেখিতে পাই। সামান্য প্রতিভার বিকাশেই প্রচুর বাহবা জুটিতেছে বলিয়া, আমার মনে হয়, সাহিত্যিকোচিত সাধনার বিঘ্ন ঘটিতেছে। নানা প্রকার সমস্যার আজ মুসলমান সমাজ জর্জরিত। সাহিত্যের ভিতর দিয়া এইগুলি একরূপ গুছাইয়া লইয়া একটু অবসর পাইবার পরে অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে, বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান কাল্‌চারের একটা বিশেষ ছাপ পড়িয়া হিন্দু-মুসলমান আদর্শের সমাবেশে পূর্ণতর সাহিত্যের উদ্ভব হইবে।

এইবার হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী সাহিত্যের পৃথক আলোচনার পরিবর্তে সাধারণভাবে বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের কয়েকটি মোটামুটি ভাবধারার কথা উল্লেখ করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। (১) পূর্বেকার বাঙলা সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্র ভারতবর্ষের কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাব ছিল না, বর্তমান সাহিত্যে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও নিখিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। (২) আগেকার সাহিত্য ঘটনা-বহুল ছিল, তাহা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই উপভোগ করিতে পারিত; এখনকার সাহিত্য চিন্তা-বহুল, তাহা অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিতের উপভোগ্য নহে। ইহাতে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিত লেখকদিগের অবজ্ঞা ও সহানুভূতিশূন্যতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ সাহিত্যে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তির সহিত সংস্রব থাকাই অধিক বাঞ্ছনীয়। (৩) পূর্বে সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রায়ই রাজা, মহারাজা, কোটাল, মন্ত্রী প্রভৃতির আখ্যান হইতেই গ্রহণ করা হইত; এখন সাধারণ লোকের পারিবারিক সুখ-দুঃখও সাহিত্যে স্থান পাইতেছে। কিন্তু অতি আধুনিকের কথা বাদ দিলে এই 'সাধারণ লোক' বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্তই বুঝাইত। অতি আধুনিক যুগে কুলিমজুর ও বস্তিওয়ালাদের জীবনকাহিনীও সাহিত্যের বিষয় হইয়াছে। এটা অবশ্য ভাল লক্ষণ; কিন্তু যে সাহিত্যিক-সুলভ সহানুভূতির স্পর্শে সাহিত্যে সুরুচি-সঙ্গত রস-সঞ্চার হয় তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। (৪) পূর্বে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করা হইত; এবং প্রায় প্রত্যেক রচনাই কোনো বিশেষ নৈতিক আদর্শের পরিপোষক হইত; বর্তমানে দোষগুণ-সমন্বিত মানুষ সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বকালের চেয়ে আধুনিককালে মানবসুলভ দুর্বলতা স্বীকার করিয়া তাহার বিচার একটু কঠোর করা হইয়াছে। (৫) পূর্বেকার সাহিত্য নিয়মানুগ সন্ধান করিত, বর্তমান সাহিত্য অনিয়ম-মতের যোগ্যতাকেও অনুকূল বলিয়া স্বীকার করে।

জীবনাদর্শের এইরূপ পরিণতির ফলে, পূর্বে যে সমস্ত বিষয় অনৈতিক বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহার অনেকগুলিই লোকে আর ততটা দূষণীয় বলিয়া মনে করে না। কাজে কাজেই পূর্বে যে সমস্ত কাজ লোকে গোপনে করিলেও মনে মনে সঙ্কুচিত থাকিত, অতি-আধুনিক যুগে তাহা প্রকাশ্যে করিয়া বাহবা লইতে চায়। (৬) পূর্বকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখা যাইত; কিন্তু অতি আধুনিক সাহিত্যে এইরূপ পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি লেখকদের মানসিক অপরিপক্কতা, না স্পষ্টতার প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞা, না অস্পষ্টতার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ— একথার মীমাংসা করা বর্তমানে সুকঠিন। আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং অনুপলব্ধ সত্যের নীরস আবৃত্তির ফলেই বিভিন্ন ভাবের পূর্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হইতেছে না। বাঙ্গালীর এখন জীবন সমস্যা অতিশয় কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোনো মীমাংসাই হইতেছে না, অথচ সাহিত্যে বাস্তবতার দোহাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম মালের সরবরাহ হইতেছে। বস্তুতঃ সাহিত্য যেদিন সাহিত্যিকদের গভীর অনুভূতি দ্বারা রসময় হইবে, সেইদিনই তাহা প্রকৃত সাহিত্যরূপে গণ্য হইতে পারিবে, তৎপূর্বে নয়। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যখন অতি আধুনিক সাহিত্যের বর্তমান দিশাহারা অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া তাহা এক সুস্পষ্ট পরিণতি ও লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং আমাদের জীবনসমস্যা সমাধানের শক্তি যোগাইবে।

জীবনাদর্শের এইরূপ পরিণতির ফলে, পূর্বে যে সমস্ত বিষয় অনৈতিক বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহার অনেকগুলিই লোকে আর ততটা দূষণীয় বলিয়া মনে করে না। কাজে কাজেই পূর্বে যে সমস্ত কাজ লোকে গোপনে করিলেও মনে মনে সঙ্কুচিত থাকিত, অতি-আধুনিক যুগে তাহা প্রকাশ্যে করিয়া বাহবা লইতে চায়। (৬) পূর্বকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখা যাইত; কিন্তু অতি আধুনিক সাহিত্যে এইরূপ পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি লেখকদের মানসিক অপরিপক্কতা, না স্পষ্টতার প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞা, না অস্পষ্টতার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ— একথার মীমাংসা করা বর্তমানে সুকঠিন। আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং অনুপলব্ধ সত্যের নীরস আবৃত্তির ফলেই বিভিন্ন ভাবের পূর্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হইতেছে না। বাঙ্গালীর এখন জীবন সমস্যা অতিশয় কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোনো মীমাংসাই হইতেছে না, অথচ সাহিত্যে বাস্তবতার দোহাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম মালের সরবরাহ হইতেছে। বস্তুতঃ সাহিত্য যেদিন সাহিত্যিকদের গভীর অনুভূতি দ্বারা রসময় হইবে, সেইদিনই তাহা প্রকৃত সাহিত্যরূপে গণ্য হইতে পারিবে, তৎপূর্বে নয়। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যখন অতি আধুনিক সাহিত্যের বর্তমান দিশাহারা অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া তাহা এক সুস্পষ্ট পরিণতি ও লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং আমাদের জীবনসমস্যা সমাধানের শক্তি যোগাইবে।

# মহাকাব্য রচনা আধুনিক সাহিত্যের উপযোগী কিনা

"বর্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহাকাব্য বা মহাগ্রন্থ উপযুক্ত মাধ্যম কিনা?"— এই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নটার উদ্ভব হয়েছে এই কারণে যে, বিগত শতাব্দীতে যেসব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, সমালোচকেরা বলেছেন, তার কোনোটাই মহাকাব্য বা মহাগ্রন্থ নয়। কাজে কাজেই এর একটা কারণ নির্দেশ করতে হবে, নইলে সমালোচকদের মান থাকে না। তাই তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে, মহাকাব্যের যুগ অতিক্রম ক'রে আমরা, বিশ্ববাসী, আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, মহাকাব্য-জাতীয় জিনিস এখন আর আমাদের নাগাল পাবে না। আমাদের মন অনেক অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে যেখান থেকে ঐ জাতীয় জিনিসকে আমরা আর আমল দিতে চাই না। আমার জানা নাই, এমন কোনো সমালোচক আছেন কিনা যিনি বলেছেন,— বর্তমানে আমাদের মন এমন নীচু পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, সেখান থেকে মহাকাব্যের আস্বাদন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক বিষয়টা অনুধাবন করবার যোগ্য।

প্রস্তাবে epic writing বলে উল্লেখ হয়েছে— পদ্য কি গদ্য, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। তাই আমি মহাকাব্য এবং মহাগ্রন্থ দু'টোকেই epic writing-এর অন্তর্গত বলে ধরেছি। কি কি লক্ষণ থাকলে সাহিত্যে 'মহত্ব' সঞ্জাত হয় তা' লক্ষ করা দরকার। মহাকাব্যে লক্ষণের কথা শুনেছি, প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ করা রয়েছে; কিন্তু ঐ জাতীয় গদ্যরচনা, যাকে আমরা মহাগ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছি, সে-বিষয়ে সমালোচনা সাহিত্য কতদূর কি বলেছে তা' আমার জানা নেই। যা'হোক, সাহিত্যের 'মহত্বের' লক্ষণ গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে অনেকটা এক ধরনের হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তা' ছাড়া আমরা এখানে শুধু বাংলা সাহিত্যের কথাই ভাবছি, না বিশ্বসাহিত্যের কথা বলছি, এ বিষয়েও সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবে যখন সাহিত্য বিশেষিত হয় নি, তখন শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যই প্রস্তাবের লক্ষ্য— এও অনেকটা স্পষ্ট। বিশেষ করে সাহিত্য যখন সার্বজনীন ব্যাপার, সাধারণ মানব-প্রকৃতি যখন এর উপাদান, তখন 'মহা-সাহিত্যের' একটা সার্বজনীন মাপকাঠি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ জাতীয় পরিধির বিষয়বস্তু আশ্রয় করেও মহা-সাহিত্য হতে পারে, যদি এর মানব-প্রকৃতিমূলক সার্বজনীন আবেদন থাকে।

শাস্ত্রীয় শ্লোক আমার মুখস্ত নেই; তবে যা' শুনেছি তার থেকে ধারণা হয়েছে যে (১) মহাকাব্যের নায়ক হবে খুব মহামহাব্যক্তি— যেমন বিজয়ী সম্রাট, আত্মবিসর্জনকারী বীরপুরুষ, শাস্ত্রীয় মহাপুরুষ, ইত্যাদি। (২) মহাকাব্যের মূল সুর হবে এক বা একাধিক বা সামগ্রিক নৈতিকবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৩) এর ভাষা হবে সুমার্জিত রুচিসম্মত। আর (৪) এতে থাকবে নির্দিষ্ট সংখ্যক অঙ্ক, যার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হবে সমস্যা, দ্বন্দ্ব, সমাধানের বিপুল চিত্র।

আগেই বলেছি, পদ্য আর গদ্যের বিশিষ্ট আঙ্গিকের কথা বাদ দিলে, অন্যান্য বিষয়ে অনুরূপ গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। পবিত্র কোরান, শাহ্‌নামা, রামায়ণ, মহাভারত, Paradise Lost, Divine Comedy, মেঘনাদবধ কাব্য, Odyssey, Iliad, Bible, Pilgrims Progress, Resurrection, Faust প্রভৃতি প্রাচীন যুগের ও আধুনিককালের মহাগ্রন্থের কয়েকটা শ্রেষ্ঠ নমুনা। এ পর্যায়ের আরও গ্রন্থ নিশ্চয়ই আছে যা আমার জানা নেই। এখন, একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে যে, মানুষের মূল্য নৈতিকবোধ সাধারণভাবে স্থির থাকলেও এর একটু আধটু পরিবর্তন সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে ঘটে থাকে। এজন্য এবং নতুন নতুন সাহিত্যিক উদ্ভাবনার ফলে আঙ্গিকের মাপকাঠিও কিছু কিছু বদলায়। তাই, ঠিক কয়টি অঙ্ক থাকলে বা কি বিশেষ চরিত্রের নায়ক থাকলে মহাকাব্য হবে, তার খুঁটিনাটি নিয়ে মারামারি না করাই ভাল। বিশেষতঃ এক দেশের সাহিত্যিকের উদ্ভাবনা ও অভিজ্ঞতার ফলে যে আঙ্গিকের উৎপত্তি হয়, অন্য দেশীয় সাহিত্যে তার ব্যতিক্রম অবশ্যই স্বীকার্য। এই কারণে কিসে মহাসাহিত্য হয়, এ সম্বন্ধে সাধারণ উচ্চ মাপকাঠি হওয়াই যথেষ্ট। এই উচ্চতার মূল্যবোধের ব্যতিক্রমে কোনো বিশেষ গ্রন্থ হয়ত বা কারো কাছে মহাগ্রন্থ বলে মনে হবে, আবার কারো কারো বিচারে হয়ত মহাগ্রন্থের পর্যায়ে পড়বে না। এইসব সীমাবর্তী রচনা বাদ দিয়েও আমরা মোটামুটি উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলোকে মহাসাহিত্য বলে ধরে নিতে পারি। অবশ্য কেউ কেউ Faust, Resurrection এবং মেঘনাদবধকে হয়ত মহাকাব্য বলে স্বীকার করতে রাজী হবেন না প্রধানতঃ এই কারণে যে, এগুলো হয়ত এখনও যথেষ্ট বুনিয়াদী বা সুপ্রাচীন হয়ে পাঠক-সাধারণের রাজ-দরবার দিয়ে লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পায় নি। জনসাধারণের এই স্বীকৃতি অবশ্যই বড় সাহিত্যের একটা বড় লক্ষণ। এই স্বীকৃতির মধ্যে, আমার মনে হয়, সাহিত্যিক কারণ ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক কারণ, ধর্মীয় বা নৈতিক মূল্যবোধ এবং হৃদয়বৃত্তিও কাজ করে। এজন্য বর্তমান সাহিত্যবিচার করতে অনেক সময় ভুল হয়। এক সময়কার অননুমোদিত সাহিত্য পরবর্তী যুগে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করতে পারে।

আমার মনে হয়, আমাদের আশেপাশে বা ঐতিহ্যের ভেতরে যদি 'মহাকাব্য সংরচনের' যোগ্য উপকরণ থাকে এবং সাহিত্যিকের জীবনবোধ, প্রকাশক্ষমতা এবং নির্বাচনী শক্তি উচ্চপর্যায়ের হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের যুগেও মহাকাব্য বা মহাগ্রন্থ রচনা হওয়া সম্ভব। তেমন মহাগ্রন্থ রচিত হলে লোকসমাজে তার সমাদর হওয়ারও সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু তার জন্য কালের পানে চেয়ে থাকতে হবে। বিশিষ্ট প্রতিভা নিয়ে ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক ক্ষণে ক্ষণেই জন্মে না। আবার কখনও যে তেমন প্রতিভা জন্মাবে না, বা এই বর্তমান যুগেই আমাদের আশেপাশেই যে জন্মাতে পারে না, এরও কোনো কারণ নেই। তাই 'মহাকাব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে'— এ কেবল হুজুগের কথা। এ কাজের যোগ্য লোক যেই জন্মাবে, অমনি নতুন মহাকাব্য বা মহাগ্রন্থের সৃষ্টি হবে। আমাদের ঐতিহ্যে হাসান-হুসেনের কারবালা রয়েছে, হযরত আলীর খয়বরের যুদ্ধ রয়েছে, খালেদ-আমর-মুসা-তারেকের বিজয়কাহিনী রয়েছে, হযরত মোহাম্মদের (দঃ) বিরাট সর্বমুখী জীবন রয়েছে,— সুতরাং উপকরণের অভাব কোথায়? আমাদের আশেপাশে জীবন-সংগ্রাম রয়েছে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মাহুতির দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা'ছাড়া স্বাধীন দেশের সুস্থ মানসিকতা শীগ্‌গিরই আসবে। তাতে সামাজিক জীবনে স্থৈর্য হবে। জীবনযাত্রার মান এবং নৈতিক মানুষের উন্নতি হবে। এসব কথা অস্বীকার করে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বার কোনো সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। তাই আমাদের মনে অবশ্য একথা

স্বীকার্য যে, ঠিক পূর্বনির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুযায়ী মহাকাব্য হয়ত না হতে পারে। তা' না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রতিভা অন্যের নির্দিষ্ট পথে চলে না, নিজের পথ নিজেই কেটে চলে। আর পাঠক বা লেখকের মধ্যে সবাই যে চপলমতি, চুটকিপ্রিয় হবে, তা-ও নয়। বৃহৎ গণসমাজ এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এখন এদের মধ্যে থেকেই বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঈশা খাঁ, টিপু সুলতান, চাঁদ সুলতানা, সিরাজউদ্দৌলার মত মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার জন্ম হবে। এ আশা দুরাশা নয়। বরং বিশিষ্ট বেগবন্ত মহাকাব্য রচনার দিন আমাদের পূর্ববাংলায় সবেমাত্র আরম্ভ হতে চলেছে। এই কথাই ঠিক।

# আধুনিক মুসলিম সাহিত্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে আগে সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া দরকার। কারণ আধুনিক কথাটা তুলনামূলক। এক-একজনে এর এক-এক রকম মানে ধরতে পারেন। এমন অবস্থায় তর্ক বা আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে কেবল ঘুরপাক খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমেই কথা ওঠে সাহিত্যকে কি রচনাকালের জন্য, না লেখকের বয়স অনুসারে, না রচনার রীতিদৃষ্টে, না বিষয় নির্বাচনে সাময়িক উপযোগিতার দিক দিয়ে প্রাচীন বা আধুনিক বলব? অবশ্য যে ফিরিস্তি দেওয়া গেল তা পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। যেমন রচনাকাল যদি প্রাচীন হয়, তবে লেখকের বয়স খুব নবীন হতে পারে না, আর রচনারীতিও খুব বেশী আধুনিক হওয়া সচরাচর প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু এ কথার বহু ব্যতিক্রম আছে। এখনও অনেকের ভাষা বিদ্যাসাগরীয় বা অক্ষয়কুমারীয় রয়ে গেছে, আবার কোন্ সে অতীতে টেকচাঁদ বা কেশবচন্দ্র সহজ স্বাভাবিক ভাষায় লিখে গেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্যের' ভাষার সঙ্গে পরবর্তীকালের ভাষার তুলনা করলে অনেক পার্থক্য দেখা যাবে, যা শুধু বিষয়ভেদের জন্যই হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে প্রতিভাবান ভাষার আদর্শ খাড়া করেন, আর অন্যেরা সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। তাই বর্তমানে শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা আদর্শস্থানীয় হয়ে অন্য অনেকের ভাষা প্রভাবিত করছে। এই সম্মান প্রতিভার প্রাপ্য। অবশ্য কোনো দুইজন সাহিত্যিকের ভাষা হুবহু একরকম হতে পারে না; কারণ যিনি সাহিত্যিক নাম পাবার যোগ্য তাঁর বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে প্রতিফলিত হবে। অনুকারক সাহিত্যিক নয়, স্রষ্টাই সাহিত্যিক। আর স্রষ্টা তার মনের রস সাহিত্যে সঞ্চারিত করে থাকেন; সেই রসই সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

প্রশ্ন উঠবে, সাহিত্য যদি রসবস্তু হয় তবে তার আবার প্রাচীন-আধুনিক কি? রস তো চিরন্তন। মহাভারত, বাইবেল, কোরান, হিতোপদেশ, ইসফস্ ফেবলস, আরব্যোপন্যাস, ইলিয়ড, শাহনামা, রেজরেকসান এসব কি চির নূতন নয়? কথাটা সত্যি। নানা পর্যায়ের সাহিত্য আছে, রসেরও প্রকারভেদ আছে। তবে রসের গভীরতাই সাহিত্যের মাপকাঠি। রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বাস্তবিকই চিরন্তন। আবার বিষয়কে আশ্রয় করেই রসের প্রকাশ, কিন্তু বিষয় রস নয়, বিষয় যেমন-তেমন করে প্রকাশিত হলেই রস হয় না। অনুভূতির তীব্রতা আর তার অকৃত্রিম ঋজু প্রকাশই রসের সঞ্চার করে। রস হৃদয়ের গভীর প্রদেশে বাস করে, সেখান থেকে উৎসারিত হয়ে অন্যের প্রাণের অন্তস্থলে প্রবেশ করে সেখানেও স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। পাঠক যেন চিরচেনা কোনো ভাব বা মনের হারানো কোনো গভীর গোপন কথা খুঁজে পায়। তাইতে তার আনন্দ হয়— রস দ্বারা তার অন্তরাত্মা যেন সিক্ত, পরিতৃপ্ত হয়।

আমার বিবেচনায় সাহিত্যের রচনাকাল, লেখকের বয়স বা রচনারীতি নিতান্তই আনুসঙ্গিক। মানুষের গভীর চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়াই সাহিত্যের প্রধান ব্যাপার। তাই মনে হয়, যে-সাহিত্য বর্তমানকালের মানুষের মনে সাড়া জাগাতে পারে সেই সাহিত্যই আধুনিক, তাতে যখনই যারই দ্বারা এবং যে ভঙ্গীতেই লেখা হোক না কেন। মানুষের মনের আদিম প্রকৃতি চিরদিন একই রকম আছে; পারিপার্শ্বিকের দ্বারা কিছু রূপান্তরিত দেখা যায় বটে, কিন্তু আসলে সনাতন প্রকৃতি ঢেউয়ের তলায় অচঞ্চল সাগর-জলের মতই স্থির আছে।

পারিপার্শ্বিককে আশ্রয় করে রসসঞ্চার করাই প্রকৃষ্ট বিধি। বোধ হয় সেইই সবচেয়ে প্রত্যক্ষ উপায়। তাই সব ক্ষেত্রে না হলেও, সচরাচর সমসাময়িক আবেষ্টন ও সমস্যা নিয়ে যে সাহিত্য লেখা হয়, তাকেই আমরা আধুনিক বলব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুগের আধুনিক সাহিত্য লিখে গেছেন; সে সাহিত্যের কতক কতক এখনও আধুনিক– বাকী অধিকাংশই প্রাচীনের পর্যায়ে পড়ে গেছে। যেটুকু নিছক তখনকার সাময়িক সাহিত্য ছিল– সাময়িক প্রয়োজনে লেখা হয়েছিল– যার মধ্যে চিরন্তনের তাগিদ ছিল না, সেটুকু বর্তমানে অসাময়িক হয়ে পড়েছে। আর যেটুকু গভীর মর্মস্পর্শীতায় পাঠক-হৃদয়ে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, সেটুকু এখনও বেঁচে আছে। শরৎচন্দ্রেরও ঐরূপ, রবীন্দ্রনাথেরও তাই, নজরুলেরও তাই। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ এখনও বেঁচে আছে, সে যে মুসলিম সমাজ হয় নি তার জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া নিরর্থক, কারণ তিনি হিন্দু সমাজকে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন এবং সে চিত্রণ সার্থক হয়েছে। সার্থক চিত্রণ সকলেরই আনন্দদায়ক। সহানুভূতি দ্বারাই রসানুভূতিতে পৌঁছাতে হয়। আর সহজ মানুষের পক্ষে সহানুভূতি খুবই স্বাভাবিক। আজ কেউ যদি মুসলিম সমাজ নিয়ে শরৎবাবুর মত দরদ দিয়ে সাহিত্য রচনা করতে পারেন, তবে তা সহজেই হিন্দুর মনে রসানুভূতি জাগাতে পারবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয়-বৃত্তিতে এমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নাই, যার ফলে প্রায় একই প্রকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে একজন আর একজনকে বুঝতেই পারবে না। দুই একটা খুঁটিনাটি আচারের পার্থক্য মুখ্য নয়, নিতান্তই গৌণ– সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও অনুভবে যেটুকু বুঝা যায় রসানুভূতির পক্ষে তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় না। রস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিবেচনা করে, এক দুই করে পা ফেলে মর্মে প্রবেশ করে না সমগ্রভাবে হৃদয় অধিকার করে।

কিন্তু তাই বলে মুসলিম পরিবেশ, বিশিষ্ট ইসলামী ধারা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবার প্রয়োজনীয়তা কিছু কম আছে এমন নয়। বরং এই দিকেই বাংলা সাহিত্যের বিস্তর প্রসারের ক্ষেত্র রয়েছে। এর জন্য বাস্তবগ্রাহী সবল মন চাই, জীবনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি চাই, আর প্রকৃত রসস্রষ্টা প্রতিভা চাই। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই এখন পর্যন্ত আধুনিক রয়েছে। তাঁর সাময়িক রচনাও অনেকগুলি এমন রসোত্তীর্ণ হয়েছে যে সময়কে অতিক্রম করে সেগুলি আরও বহুদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতের 'বর্তমান সাহিত্যের' মধ্যে স্থান পাবে। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই সামান্যকে আশ্রয় করে অসামান্যে পৌঁছেছেন, বিশেষকে লক্ষ্য করে নির্বিশেষের বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর 'অচলায়তন' বিশিষ্ট হিন্দু পরিবেশে ব্রাহ্ম-সংস্কারের মন নিয়ে লেখা, কিন্তু এমন সুন্দর ভঙ্গীতে প্রকাশ হয়েছে যে, আমার মনে হয়, হিন্দু-মুসলমান সবাই (এমন কি বিদেশীয়রাও) এর রস অনুভব করতে পারবে। আমরা 'হ্যামলেটে' রস অনুভব করার সময় যেমন কল্পনা বলে নিজেদের তৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রক্ষেপ করে থাকি, এও সেই রকম। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' বা 'কচ ও দেবযানী' একান্তই হিন্দুর ধর্মীয় কাহিনীর রূপায়ণ; কিন্তু তা

ভিতরকার চিরন্তন আবেদন যেভাবে কবির কল্পনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে, তা কোন মুসলমানের হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করবে না? আমি বলতে চাই বাংলা ভাষার সুসাহিত্য শুধু হিন্দুর নয়। শুধু হিন্দু-মুসলমানের নয়, সমগ্র বাঙ্গালীর গৌরব ও আদরের সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ যে-পরিমাণে সার্বজনীন রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেই পরিমাণে তাঁকে আধুনিক বলব। কালের স্রোতে তার বাহুল্য ধুয়ে যাবে। তিনি পদ্যে বহুস্থলে এবং গদ্যে কোথাও কোথাও ভাষার কারিগরীর নেশায় উহাকে অতিরিক্ত দীর্ঘ করেছেন। কালের বিচারে সেইখানে তাঁর আর্ট প্রশংসা হারাবে, কিন্তু বাহুল্য বর্জন করেও তাঁর হীরের টুকরার মত উজ্জ্বল রত্ন এত অধিক থাকবে যে তিনি দীর্ঘ অনাগত ভবিষ্যতের সত্যই দ্বিতীয় রত্নাকর হয়ে থাকবেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে চাই না। তার কারণ, কালের ব্যবধান নয় বরং তাঁর রচনা রীতির দূরত্ব। তাঁর কাব্যপ্রতিভার প্রশংসা করি, কিন্তু তিনি পণ্ডিতের কবি। ইংরেজী সাহিত্য যেমন আমাদের কষ্ট করে শিখে তারপর তার রসভোগ করতে হয়, মাইকেলের অধিকাংশ লেখাও তাই। তাঁর 'মেঘনাধবধ' অতুলনীয় কাব্য; কিন্তু বর্তমানে 'ডিমোক্রেসির' যুগ, সাহিত্যের ভাষা আর সাধারণের কথ্য ভাষার মধ্যে অধিক ব্যবধান অসহ্য। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এঁরা সকলেই কথ্য ভাষার দাবী স্বীকার করে জনসমাজের দিকে এগিয়ে এসেছেন, তাই মাইকেল যেন আরো পশ্চাতে পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সমাজের কাছে মাইকেলের সমাদর কমবার নয়।

নজরুল ইসলাম এ-যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর ভাষার সাবলীল ভঙ্গী, ভাবের সময়োপযোগিতা আর হৃদয়ের প্রাচুর্য তাঁকে সহজেই জনপ্রিয় করেছে। মীর মশাররফ হোসেন ও কবি কায়কোবাদ সমসাময়িক যুগে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' এখনও সুসাহিত্য বলে পাঠকসমাজে সমাদৃত। কবি কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ দান 'মহাশ্মশান কাব্যের' অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা বলা যায় না। কাজী এমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস হয়েও এতদিন পর্যন্ত অনাদৃত হয়েই রয়েছে, বোধ হয় উপযুক্ত মুদ্রণ ও প্রকাশের অভাবই এর অন্যতম কারণ। ইসমাইল হোসেন সিরাজী তীব্র ধরনের অনেকগুলি বই রচনা করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুর পাল্টা জওয়াব দিতে গিয়ে সেগুলি সাহিত্য হয় নি, প্রতিবাদ মাত্র হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কোন সময়ের চাহিদা মিটিয়ে লিখলেই সাময়িক সাহিত্য হয় না। সিরাজী সাহেবের সময় মুসলমান সমাজে নবজাগরণের সূচনায় প্রবল পক্ষ হিন্দুর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা দিয়েছিল, তিনি তাঁরই চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন। সে-চিত্র যদি আর্ট পর্যায়ের উপযুক্ত হ'ত তাহলে এতদিন বেঁচে থাকত এবং তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উপকার হ'ত। কবি মোজাম্মেল হককে 'বুলবুলে বাংলা' খেতাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে খেতাব তাঁর যশকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। তাঁর কবিতায় মিষ্ট ছন্দের মিল ছিল। হজরত মোহাম্মদের জীবনকথা তিনি ছন্দে অঙ্কিত করেছিলেন। তা ছাড়াও 'ফেরদৌসী', 'রাবেয়া' প্রভৃতি তাঁর কয়েকখানা বই মুসলিম সমাজে বেশ খানিকটা চালু হয়েছিল। ঐ সময়কার লেখকের মধ্যে বোধ হয় নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' নামক উপন্যাসখানিই সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে গিয়েছে; এখনকার ছেলেদের অনেকে হয়ত সে বইয়ের নামও কোনোদিন শোনেনি। এই সূত্রে 'মানব-মুকুট' লেখক চৌধুরী এয়াকুব আলী, 'মতিচুর' লেখিকা

মিসেস সাখাওয়াৎ হোসেন এবং 'রায়হানা' এবং 'উন্নত জীবনের' লেখক ডাঃ লুৎফর রহমানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সাহিত্যিকের ইতিহাসে এরা অবশ্যই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবেন।

কিন্তু সর্বপ্রথম যে-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, যে-বিদ্রোহীর স্বদেশী কবিতা সর্বজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, যাঁর 'বুলবুল'-'চক্রবাক' গানে ও কাব্যগীতিকায় যুগান্তর এনে দিয়েছে তিনি হচ্ছেন হাবিলদার কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর 'বাঁধনহারা' হয়ত টিকবে না, কিন্তু 'মৃত্যুক্ষুধা' বেঁচে থাকবে, 'পূজারিণী' হয়ত থাকবে না, কিন্তু 'বিদ্রোহী' মরবে না। তাঁর কীর্তন, ইসলামী সঙ্গীত এগুলি যথেষ্ট নিপুণ সন্দেহ নাই, জনপ্রিয়ও হয়েছে খুব; কিন্তু বোধ হয় দাশরথী রায়ের পাঁচালীর মত কালের মুখে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর বাংলা গজল এবং 'বাগিচায় বুলবুলি' 'রুমু-ঝুমু নূপুর পায়' 'কেন কাঁদে পরাণ' প্রভৃতি গীতিকবিতা অমর হয়ে থাকবে। সুর ও ছন্দের উপর তিনি যে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন, উর্দু ও বাংলার সংমিশ্রণে ভাষায় যে শক্তি সঞ্চার করেছেন তা মুছে যাবার নয়। এইসব কারণে আমি নজরুল ইসলামকে সর্বপ্রথম সার্থক আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক বলি।

নজরুল ইসলামের পর কবিখ্যাতিতে জসীমউদ্দিনই প্রধান। এঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর একতারা সুন্দরভাবেই বাজিয়েছেন; কিন্তু জোয়ারীর অভাবে বোধ হয় রেশ থাকবে না। এছাড়া আধুনিক আরো কয়েকজন মুসলিম কবি বেশ ভাল কবিতা লিখছেন। কিন্তু এঁদের সম্যক পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

আধুনিক গদ্য-সাহিত্যিকদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে। সাহিত্যিক বিচার করতে গেলে কয়জনকে ঐ পর্যায়ে ফেলা যায়, সে বড় কঠিন সমস্যা। কিন্তু আবদুল ওদুদই মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে জীবনজিজ্ঞাসা প্রথম আরম্ভ করেন। তাঁর 'নব-পর্য্যায়' মুসলিম সাহিত্যে এক শুভ সূচনা এনে দিয়েছে। আবুল মনসুর, মোতাহার হোসেনদ্বয়, ওয়াজেদ আলীদ্বয়, আবুল হোসেনদ্বয়, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, মোহাম্মদ ইদরিস, আবুল হাসানাৎ প্রভৃতি অনেকেই কেউ প্রত্যক্ষভাবে কেউ পরোক্ষভাবে সম্ভবতঃ আবদুল ওদুদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কিংবা তাঁর উদাহরণে উৎসাহী হয়ে আত্মমত প্রকাশে সাহসী হয়েছেন।

আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টার মধ্যে নানা সমস্যা রয়েছে। আমি কেবল একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যাবশ্যক মনে করছি। প্রায়ই শুনা যায় মুসলিম পরিবেশে মুসলমান চরিত্র নিয়ে মুসলিম সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে। কথাগুলি শুনতে বেশ এবং আকাঙ্ক্ষাটাও প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সব অস্পষ্ট আবহাওয়ার ভালটাও সহজে মন্দে পরিণত হতে পারে। আমার বোধহয় উপরোক্ত উক্তির মানে এই রকম : বাংলাদেশের মুসলমানের যেসব সমস্যা আছে, তাদের গভীর হৃদয়তন্ত্রীতে যে-সব ভাবের ঝঙ্কার খেলে, সেইসব বিষয় অবলম্বন করে তাদের সহজবোধ্য ভাষায় যে-সাহিত্য রচিত হবে তাই আর্দশ মুসলিম সাহিত্য। অনেক সমস্যাই সহজে চোখে পড়ে। যেমন অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অন্ধক্রোধ, মামলাবাজী, স্বাস্থ্যহীনতা, পেটের দায়, চোরাবাজার, বস্ত্রসঙ্কট, মহাজনের অত্যাচার পারিবারিক নিরানন্দ, ধর্মের নামে ফেরেববাজী, সমাজনেতাদের ধাপ্পাবাজী, রাজনৈতিক ও সামাজিক দলাদলি, আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ, পণপ্রথার প্রচলন, সর্বত্র অন্যায় অনুগ্রহ ও

পক্ষপাতিত্ব এইরূপ আরও কত কি! কিন্তু হৃদয়তন্ত্রীতে যে-সব ভাবের ঝঙ্কার খেলে তার ফিরিস্তি দেওয়া এত সহজ নয়। হিংসা, প্রেম, শোক, আনন্দ প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিকভাব সার্বজনীন। কাজেই সেগুলিকে বিশেষভাবে ইসলামীয় ভাব বলা যায় না। তবে মুসলমানের স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষায় কোরান, হাদিস ও খোদা রসুলের প্রতি তাজিম বা উপযুক্ত সম্মানবোধ, নামাজ-রোজা, ঈদ-বকরিদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক দরদ, পীর-পয়গম্বর, ছাহাবা-ইমাম, আউলিয়া-দরবেশ প্রভৃতি বুজুর্গের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি; খালেদ, হায়দার, মুসা, তারেক প্রভৃতি মুসলিম বীরের নামে গর্ববোধ; বেহেশত, দোজখ, পুলসিরাত, রোজকেয়ামত, মুনকির-নাকির প্রভৃতির মানসচিত্রে পূর্ণ আস্থা, ফেরেশতা জীন, বোরাক, মেরাজ, সিদরাতুল মোনতাহা প্রভৃতি কল্পনায় দৃঢ় বিশ্বাস, হারুত-মারুত, শাদ্দাদ, খেজর, জোল-কারনায়ন প্রভৃতির কাহিনী শ্রবণে বিগলিত ভাব, কাবা বায়তুল মোকাদ্দাস, ইয়াসরাব, হেরা-সুর-তুর এইসব পবিত্র স্থানের প্রতি প্রাণের আকর্ষণবোধ, এইগুলিকে মুসলিম ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়। এ ছাড়া সোহরাব-রুস্তম, শিরী-ফরহাদ, ইউসুফ-জোলেখা, নওশেরওাঁ-হাতেমতাই, কায়কোবাদ-কায়খসরু প্রভৃতি প্রাক ইসলামিক বীর ও প্রেমিকগণও বিভিন্ন পরিমাণে মুসলমানের মানসক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। পরবর্তী যুগের মামুদ, তৈমুর আবদালী, আলমগীর প্রভৃতি নৃপতিগণ জাতীয় বীর হিসাবে মুসলমানের হৃদয়ক্ষেত্রে সমাসীন। বিবি আয়েশা, ফাতেমা, রহিমা, হাজেরা প্রভৃতি আদর্শ নারীরূপে মুসলিম সমাজে সমাদৃতা। শাহনামা, কাসাসোল আম্বিয়া, আলেফ লায়লা, গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, দিওয়ান-হাফেজ, তাজকেরাতুল আউলিয়া, কিমিয়া-এ-সাআদৎ এইসব শিক্ষিত মুসলিমের সভ্যতার অঙ্গ। আমীর হামজা, চাহার দরবেশ, গুলেবাকাওলী, জঙ্গনামা, জৈগুণ-সোনাভান, শহীদে কারবালা প্রভৃতি পুঁথিসাহিত্য এখনও মুসলিম জনসাধারণের রসের যোগান দেয়। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে আরও অনেক জিনিসের নাম করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজন নাই। এবিষয়টি বাস্তবিকই বিচিত্রিরূপে ব্যাপক। তাই আদর্শ মুসলিম সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অভাব হবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন রকমের সাহিত্য থাকাতে আপত্তি বা অসুবিধার কথা কিছুই নাই। দেবভাষা ও প্রাকৃত ভাষার মত দোধারা সাহিত্য সেকাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু আজ গণতান্ত্রিক যুগে আকাশ-পাতালের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির তাগিদ প্রবল হয়েছে; এখন রামায়ণ-মহাভারত বা কোরানের মত মহাগ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্যরচনাকেও জনগণের মনের তীরে পৌছিয়ে দিতে হবে— নইলে তা আধুনিক সাহিত্য বলে পরিগণিত হবে না। তাই সাহিত্যিক (অন্ততঃ সাময়িকভাবে) লোকশিক্ষাও দিবেন, আর যে-পরিমাণে শিক্ষা অগ্রসর হল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপস্থিত পরিবেশ থেকে সাধারণ লোকের সহজবোধ্য ভাষায় রস সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান ও রুচির উন্নয়নও করবেন।

আমার মনে হয় এদিক দিয়ে বর্তমানে সাহিত্যিকদের ত্রুটি হচ্ছে। আমরা পর্যাপ্ত সহানুভূতি ও দিব্যদৃষ্টি দিয়ে জনসাধারণের পর্যায়ে নেমে আসতে পারছিনে— আবার ইসলামিক ঐতিহ্যমূলক রচনা দ্বারা শিক্ষার কাজও অগ্রসর করে দিচ্ছি না। এ কথার উপর জোর দিবার বিশেষ হেতু এই যে, প্রায় দেড়শ' দুইশ' বছর যাবৎ আমরা উর্দু-পার্শী-আরবীর ইসলামী আবহাওয়া হারিয়ে ফেলেছি অথচ বাংলা সাহিত্যের মারফতে সে আবহাওয়ার পুনঃপ্রবর্তন করতে পারি নাই। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণ ত

দূরের কথা, শতকরা নিরানব্বই জন উচ্চশিক্ষিত অর্থাৎ বি.এ. এম. এ. পাশ মুসলমানও উপরিলিখিত ইসলামিক কৃষ্টি সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন নন। আমরা নিজেদের অজ্ঞতা জাহির করতে লজ্জা পাই, তাই অপরিচিত বা অর্ধ পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ অন্যে ব্যবহার করলে মুখ ফুটে কখনও বলিনে যে ঐ শব্দগুলো দুর্বোধ্য বা অপ্রচলিত; বরং নিজে বিজ্ঞভাব দেখিয়ে অন্যের উপর দিয়ে একটু বাহাদুরী নিতে পারলে ছাড়িনে। ইসলামিক ঐতিহ্য আমাদের মনে নিতান্তই আবছা ধরনের, তাই পশ্চিমের মুসলমান পাগড়ি বেঁধে এলে অনায়াসে আমাদের পীর সাজতে পারে; তাদের সামনে ধর্ম বিষয়ে নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করি বলে অনায়াসেই আমাদের মাথা নুয়ে আসে। আমরা যে আসহাব-কাহাফের নাম শুনলেই আবিষ্ট হই, আলবুর্জের নামে মূর্ছা যাই বা সমরখন্দ-বোখারার নাম উচ্চারণ করলেই ভাবে গদগদ হই—এ ঘটনা নিছক অতীতপ্রীতির অস্পষ্ট আলোড়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পিছনে জ্ঞান নাই, মোহ আছে। এ মোহ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। সুস্থ বলিষ্ঠ মন অতীত গৌরবের দিকে সজ্ঞানে তাকিয়ে পরিপুষ্ট হতে পারে, তার থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারে, কিন্তু অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন মন অতীতের দিকে তাকিয়ে বড়জোর একটু অস্পষ্ট ভাববিলাসে মগ্ন হতে পারে। তাতে কি লাভ? শুনেছি কোন এক রাজদরবারে কাব্য প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। প্রচুর পুরস্কারের কথা শুনে এক ঠাকুর মশাই উপস্থিত হয়ে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। শ্লোকটি হচ্ছে—'ক্ষীরং পীবেৎ বিড়ালঃ'। রাজসভার কবিরা তো অবাক। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন— 'আর চরণ কই?' ঠাকুর বললেন— 'মহারাজ, বিড়ালের চারচরণই তো এতে আছে।' রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন,— 'এটি কোন রস?' ঠাকুর বললেন, 'এতে আছে ক্ষীরের অতি মিষ্ট রস।' রাজা বললেন, 'উত্তম'। রাজকবিরা ভাবলেন, মধ্যম। যাই হোক উত্তম-মধ্যম ছাড়াই অধমের কিছু প্রাপ্তি ঘটে গেল। মোট কথা অনুস্বার-বিসর্গ ছড়ালেই যেমন সংস্কৃত হয় না, তেমনি বোধ হয় তামাদ্দুনের খোরমা-খেজুর, আনার, আঙ্গুর, কিসমিস, বেদানা ছড়ালেই মুসলিম সাহিত্য হয় না (আধুনিক হওয়া তো আরো দূরের কথা)। নজরুলের শব্দসম্ভার বিচিত্র, কিন্তু তা পীড়া দেয় না, কারণ তিনি প্রকৃত কবি, অন্তরের অনুভূতি থেকে কাব্য রচনা করেছেন। শব্দ অবলীলাক্রমে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে— সেজন্যে ভাবতে বা লোগাৎ' দেখতে হয় নি। নজরুল তাঁর কাব্যরূপ প্রথমে সমগ্রভাবে মনে ধারণ করে পরে লিখেছেন— কাজেই সে-প্রকাশ হয়েছে অনবদ্য মধুনিঃস্যন্দী। আমি একথা ভাবতেই পারিনে, যার মনে হিমালয়ের কোনো আবেদন নাই, পদ্মা-ভাগীরথী কোনো স্পন্দন জাগায় না, ধানের ক্ষেত যাকে মুগ্ধ করে না, তার মুখে আলবোর্জ, ফোরাত-দাজলা বা আঙ্গুর ক্ষেতের মহিমা কেমন করে মানায়? যে নিকটকে দূর করে, সে কেমন করে পরকে আপন করতে পারে, এ রহস্য আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তাই মনে হয়, একি সত্যি? মুসলিম জনসাধারণ কি সত্যিই অতীত গৌরবে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, না অহিফেনের মাদকতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে? তরুণ সাহিত্যিকের অত্যন্ত জরুরী কাজ লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করে শীঘ্র ঐতিহ্যবোধ জাগানো আর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বোধগম্য এমন সুসাহিত্য রচনা করা যা পাঠকের মনের দুয়ারে ঘা দিয়ে প্রাভাতিক আনন্দবোধ জাগাবে।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী]

# পূর্ববাংলার সাহিত্য

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র যে সাহিত্যে যত বেশী এবং নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয় তাকেই তত বেশী পুষ্ট বলতে হবে। সাহিত্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে প্রথমতঃ জীবনের পরিসরের উপর, দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যস্রষ্টাদের জীবনবোধের উপর। মানুষ এবং জাতির ইতিহাস ক্রমে ক্রমে (কখনও-বা দ্রুতগতিতে) পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যে এই সবের ছাপ থাকবার কথা।

বাস্তবের আঘাতে বা স্বার্থ-সংঘাতের তাগিদে সাধারণ মানুষ জীবনটাকে যথাযথভাবে বুঝতে বা উপভোগ করতে পারে না। সাহিত্যের আসরে তারা ভাববার এবং বুঝবার সুযোগ পায়। এই সাহিত্য রচনা করেন জাতির শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা, যাঁদের সুস্থির মনে জীবন-ব্যাপার অপরূপভাবে উদ্ভাসিত হয় এবং যাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ঘটনাপ্রবাহের মর্মকথা বা গতি-পরিণতির বিষয় সরস আর জোরালোভাবে দশের সামনে তুলে ধরতে পারেন। শিল্পীর অনুভূতির গভীরতা আর প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতা থেকেই সাহিত্যে প্রাণের সঞ্চার হয়।

সাহিত্যের এই সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে বাংলা সাহিত্য বিচার করবার আগে পারিপার্শ্বিকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। একাদশ শতাব্দীতে দেখি, গ্রাম্য গায়েনরা নাথগুরুদের মাহাত্ম্যকথা গান করছেন। লোকের মুখে মুখে এই সব গান ছড়িয়ে পল্লীঅঞ্চল মুখরিত করে তুলত। এর মূল কথা ভোগ-বিলাস ত্যাগ আর গুরুপদে সর্বস্ব সমর্পণ। বাংলাদেশে, বিশেষতঃ পূর্ববাংলায়, তখন সদ্ধর্মী সহজিয়া আর নাথপন্থীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। বৌদ্ধধর্মের থেকে ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোকের মনে স্বাভাবিকভাবে এই সব মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। তখনও বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশ জয় করেন নি; কিন্তু মুসলমান পীর-দরবেশরা এ দেশে ইসলামের মূল কথা, বিশেষতঃ তৌহিদ ও সাম্যবাণী প্রচার করেছিলেন। ইসলামের উদার বাণী বৈষম্যপীড়িত জনগণের মনোহরণ করেছিল। আবার প্রেমধর্মী সুফীমতও ভারতীয় বেদান্তদর্শন দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। তাই পারস্যের মরমিয়া সুফীবাদের সঙ্গে 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' মতবাদের সমন্বয় হয়েছিল। বাস্তবিক, 'মন্ তু শুদম, তু মন্ শুদী, তা কাছ না ওয়াদ বাদ আজই মনদীগরম তুদীগরী'র সঙ্গে দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের পার্থক্য খুব বেশী নয়। কালে কালে 'আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নাই', 'আহাদ আর আহমদের মধ্যে একটি মিমের পর্দা মাত্র' এই সব রঙিন মতবাদ বাঙালীর মনকে অভিষিক্ত করেছে; আর একটু আধটু ঘোরপ্যাচ দিয়ে পীরপুরস্তি বা গুরুপূজার পরিপোষক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে :

> 'ব মায় সজ্জাদা রঙ্গীন কুন, গরত পীরে ম গাঁ ওয়াদ
> কে সালেক বেখবর না বাশাদ যে রাহ ও রিসমে মনযিলহা।'

—এই ধরনের বাণী উল্লেখ করা যেতে পারে। বৌদ্ধ 'নির্বাণ' আর সূফী 'ফানাফিল্লাহ' কার্যত এক,—যদিও নির্বাণের উৎপত্তি জ্ঞান থেকে আর ফানাফিল্লাহর উৎপত্তি প্রেম থেকে। এই

প্রকার ভাব বোধ হয় মানব মনের গহনে অতি সঙ্গোপনে বাস করে। তাই যখন শুনি— 'খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হ'য়ে রই পড়ে।' তখন শারাবকে হারাম বলে ফতোয়া দেওয়ার বদলে হয়তো ভিতরে ভিতরে মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাইতেই 'শারাব সাকীর গুলিস্তাঁ' সম্বন্ধীয় কাওয়ালী ও গজল এশ্‌কিয়া সঙ্গীত বলে সমাদৃত হয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে বা রসের ক্ষেত্রে নীতিবিদের ফতোয়া নিত্যই উপেক্ষিত হয়ে এসেছে।

প্রাচীন সাহিত্য মূল প্রেরণা লাভ করেছিল ধর্মের সংস্রব থেকেই। উপরে একাদশ শতকের ইহবিমুখিতা আর পীরপুরস্তির কথা যা' বলা হয়েছে, আজ বিংশ শতাব্দীতেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নি দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান, খাদ্য উৎপাদন ব্যাপারে আদিম যন্ত্রপাতিই এখন পর্যন্ত চলে আসছে। লোকে অল্পেই সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্ট না হয়ে উপায়ও নেই; কারণ শাসন ও রক্ষণের সমুদয় কলকাঠি জমিদার বা মহাজনের হাতে। দেশে অশিক্ষা আর কুসংস্কারের ফলে লোকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়, বরং 'বিধিনির্দিষ্ট' অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। তারা ঐহিক সম্পদের জন্য জমিদারপ্রভুর মুখাপেক্ষী, আর পারত্রিক কল্যাণের জন্য পীর-মোল্লা-পুরোহিতের উপর নির্ভরশীল। কাজে কাজেই সেকালের সাহিত্য, দেশের লোকের মনোবৃত্তি আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলতে হবে।

সমাজের উচ্চ-নীচ স্তরভেদও সাহিত্যক্ষেত্রে পরিস্ফুট ছিল। মুসলমান শাসনের আগে পর্যন্ত দেশের উচ্চস্তরের অর্থাৎ রাজসভা ও বিদ্বৎসমাজের ভাষা ছিল দেবভাষা সংস্কৃত। সাধারণ লোকের 'ভাষা' ছিল ইতর ভাষা; তা চলতি ব্যবহারে কাজে লাগলেও মর্যাদাবান সাহিত্য রচনায় এর ব্যবহার ছিল ধারণার অতীত। কিন্তু গৌড়ের মুসলমান বাদশাহ এবং তাঁদের আমীর-ওমরাহদের কল্যাণে জনগণের মুখের ভাষা সর্বপ্রথম রাজদরবারে স্বীকৃতি লাভ করল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বাধানিষেধ সত্ত্বেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, হিতোপদেশ প্রভৃতি বাংলায় অনুবাদ করা হলো। মুসলমান বাদশাহরা দেশবাসীর মনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তাঁদের ধর্মাদর্শ, কথা ও কাহিনী বাংলা ভাষায় রচনা করবার উৎসাহ দিয়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশের যে কত উপকার করেছেন, তা পরিমাপ করা যায় না। হিন্দুধর্ম ও পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করতে মুসলমান নবাবদের মনে কোনো সংকীর্ণতা বা বিদ্বেষভাব জাগে নি। বর্তমান বিদ্বিষ্ট পরিবেশের ভিতর থেকে এই ব্যাপার লক্ষ করলে সত্যিই আমাদের পূর্ববর্তীদের ঔদার্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না। যে জাতির যখন উন্নতির সময় হয়, তখন জোয়ারের মুখে কুটার মত সব আবর্জনা দূর হয়ে যায়—থিতিয়ে যাবার অবকাশ পায় না। আজ আমাদের মনে যে নানা রকম সন্দেহ, কুটিলতা, অবিশ্বাস বাসা বেঁধেছে এ সবের মূলে রয়েছে দুই শ' বছরের পরাধীনতার গ্লানি। এর প্রভাব আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। আশা করি নতুন জীবনের টানে আবার আমাদের দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য ফিরে আসবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে শতকরা ত্রিশ জন অমুসলমানকে অগ্রাহ্য করে আমরা সাহিত্য বা সমাজ কিছুই পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারব না। এই দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ববাংলার সমস্যা ভিন্ন ধরনের, এবং দায়িত্বও অনেক বেশী। তাই সিন্ধী-পাঞ্জাবী-বেলুচীর মনোবৃত্তি নিয়ে বাংলার সমস্যা বোঝা যাবে না, আর তার সমাধানও পাওয়া যাবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়েও এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। মোট কথা, 'পরিপূর্ণ মানুষ' হয়েই আমাদের শরীয়তী স্টেটের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

সেটার কোনও বিশেষ অঙ্গ অবশ হলে তাকে টেনে নিয়ে চলতেই সমাজের বা রাষ্ট্রের বিপুল শক্তিক্ষয় হবে।

গৌড়ের সুলতান এবং আরাকান রাজসভার মুসলমান অমাত্যরা যে শুধু হিন্দুসভ্যতা বিষয়ক রচনাবলী উৎসাহ দিয়েছেন, এমন নয়। সাহিত্য-রচনা অনেকাংশে পৃষ্ঠপোষকতার ফলে হয় বটে, কিন্তু দেশের লোকের চাহিদা এবং মানসধর্মের উপরেই শেষ পর্যন্ত তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। চাহিদা অনুসারে একদিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও গোরক্ষবিজয়, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ময়নামতি প্রভৃতি রচিত হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি রসুলবিজয়, শবে মে'রাজ, নবীবংশ প্রভৃতি ছাড়াও তোহফা, লায়লী-মজনু, সেকেন্দরনামা প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যিকদের ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল উল্লেখ করব, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কালচার সম্বন্ধে কি কি বিষয় লেখা হয়েছে। উপরে লায়লী-মজনু কাব্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে দৌলত উজির বাহরাম খাঁ এই কাব্যের ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মানবীয় চরিত্রের আমদানী করেন। এর আগেকার সাহিত্যে দেবমাহাত্ম্য ছাড়া মানবীয় প্রেমকাহিনী কখনও স্থান পায় নি। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল কাব্যে সৈয়দ আলাওল সর্বপ্রথম বাঙালী পাঠককে পরীর রাজ্যে পরিভ্রমণ করান। এর পর গোলেবকাওলি, বাহারিয়া, শাহ এমরান, চন্দ্রভান, সুরবদত-এ-ওবাহার, কামরুজ্জামান-বেদৌরা প্রভৃতি পুস্তক রচিত হয়। আবার মহম্মদ খাঁ মর্সিয়া-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তন করেন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত মকতুল হোসেন নামক গ্রন্থে। এরপর থেকে নানা রকমের পুঁথিসাহিত্যের প্রচলন হয়। তার মধ্যে জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, হানিফার লড়াই, জৈগুনের পুঁথি, সোনাভান, শকসুমারী মল্লিকা আকবর, ফাতেমার সুরতনামা, ইমামসাগর, মহররম পর্ব, এমামবধ নাটক, কাসাস-উল-আম্বিয়া, মোহকামুল ইসলাম, শাহনামা প্রভৃতি পুঁথির নাম উল্লেখযোগ্য। জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে বটতলার মুসলমান শায়েরগণ মোট ৮৩২৫ খানা পুঁথি লিখেছেন, তার মধ্যে ৪৪৪৬ খানা বিভিন্ন পুঁথির এখনও কাটতি আছে। এ থেকেই এই পুঁথিসাহিত্যের প্রসারের কথা বোঝা যায়।

পুঁথিসাহিত্যে প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবু দেশের অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণ পুরোপুরি না বুঝেও বহুকাল যাবৎ এর থেকে কাব্যরসের যোগান পেয়েছে। দেশের মাটি ও জলধারার থেকে বিচ্যুত হয়েও ধর্মীয় অস্পষ্ট আবেগের জন্যেই পুঁথিসাহিত্যের সমাদর হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওহাবি আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় পুঁথিসাহিত্যের আজগবী গল্পগুজবের স্থলে ইতিহাস অনুযায়ী বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়; কিন্তু তাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নি। কল্পনার রঙিন ফোয়ারা ছড়িয়ে অর্ধশিক্ষিত মুন্সী সাহেবেরা উর্দু-ফার্সী সাহিত্যের অনুকরণে সকল-রকম শরীয়তি-মারেফতি তত্ত্ব পুঁথিসাহিত্যের ভিতরে চালিয়েছেন। একদিকে যেমন এই সাহিত্য অনেক কুসংস্কারে ভরা, অন্যদিকে আবার এ ছাড়া ধর্মবিষয়ে বা মুসলিম আউলিয়া-দরবেশ ও বীরদের কাহিনী সম্বন্ধে অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও ছিল না। সুতরাং জন-গণ হিসাবে এই দোভাষী পুঁথিসাহিত্য সমাজচেতনার উদ্বোধনকারিতা গুণেই আপন আসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। কিছুদিন পর্যন্ত পুঁথিসাহিত্য দেশের লোকের গড়পড়তা মানসিকতার সমধর্মী ছিল বলিয়াই এর আদরও ছিল। বর্তমানে আর পুঁথিসাহিত্যের সেই আদর নেই। এ

জন্য অনেকে আফসোস করেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে ও দেশেও পৃথিবীর অন্যত্র বিজ্ঞান আর শিল্পের যুগ এসে অতীত প্রণালীর কৃষিযুগকে পিছনে দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের জীবনধারা সামন্তযুগের মন্থরতা ছাড়িয়ে বিজ্ঞান ও শিল্পযুগের প্রতিযোগিতা আর দ্রুতবেগের মধ্যে এসে পড়েছে। এ দেশে ইংরেজী এবং বাংলাসাহিত্যের মারফতে আমাদের রক্ষণশীল মনেও ধাক্কা দিয়েছে। তাই অনিশ্চয়ের দোলা অনেকটা ঘুচেছে, কিন্তু পথের দিশা এখনও ঠিকমত পাওয়া যায় নি। প্রথমটির জন্য আফসোস নয়, আফসোস দ্বিতীয়টির জন্য। আফসোস করবার এই জন্য যে, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত না হয়েও যে-সাহিত্য একটি উন্মাদনা আনে; সে শুধু বাইরের উন্মাদনা, তাতে ভিতরের জোর নেই। অর্ধশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান এই অবাস্তবিক মানসিকতা আঁকড়ে ধরেই কোনও রকমে সান্ত্বনা খুঁজছিলেন, আবার এই পলায়নধর্মী মানসিকতা আজ পর্যন্ত বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করে উন্নতির চেষ্টার পথে সর্বপ্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজও দেখতে পাই, বাঙালী মুসলমান ধর্মের ক্ষেত্রেও পশ্চিমের মুখ চেয়ে বসে আছে, উর্দু সাহিত্য তার ধর্মের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পুঁথি মনোবৃত্তি কত ক্ষতিকর, তার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। পথের দিশা পেতে হলে পুঁথির চশমা খুলে সজাগ চোখে চারদিকে তাকাতে হবে, এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল রেখে আর অতীতের সঙ্গেও যথাযোগ্য সম্পর্ক রেখে এমন বাস্তবসাহিত্য রচনা করতে হবে যার মধ্যে আদর্শের সন্ধানও পাওয়া যায়।

যে সব গ্রন্থকে আমরা সাধারণতঃ পুঁথি বলে আখ্যাত করি, তার জন্ম শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তার অল্প কিছুদিন আগে থেকে। এই সময় ইংরেজ রাজা মুসলমানকে দমন করে হিন্দুর সাহায্যে রাজ্য সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত। তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলা ভাষা স্বাভাবিকভাবেই যে সময় প্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়েছিল, এই সময়ে ইংরেজের ইঙ্গিতে এবং হিন্দু লেখকের স্বজাতিপ্রীতি বা বিজাতীয় বিদ্বেষের বশে সেগুলো যথাসম্ভব বর্জনের নীতি গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, রাজ্যহারা মুসলমান তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তার জায়গীর, জমিদারী সব বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিল। মোটের উপর স্বভাবতঃ এবং কৃত্রিম উপায়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে ইংরেজের সঙ্গে মুসলমান তখন সহযোগিতা করবার কথা ভাবতেই পারে না। তার সামাজিক হীন-মর্যাদা আর অর্থনৈতিক অবস্থারও দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। এই ভাগ্যবিপর্যয়ে মুসলমান আমীর বা পদস্থ ব্যক্তিগণ অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও জোরের সঙ্গে প্রাচীন পন্থা আঁকড়ে ধ'রে শরাফতী বজায় রাখার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। মারাঠার উত্থান বা হিন্দুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে মুসলিমবিদ্বেষের বিষ রয়েছে, এ কথা চতুর ইংরেজের বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। এই সুযোগে সেই বিষটা আরও জোরদার করে তুলবার চেষ্টা তাঁরা করলেন বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আওতায় টেনে নেবার উস্কানি দিয়ে। এমন অবস্থায় মুসলমান জনসাধারণ কি করবে? তারা দেখল, হিন্দুরা বাংলা ভাষার ভক্তি করতে লেগে গেছে; আর মুসলমান আমীররা অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে উর্দু, ফার্সী কেতাব দিয়ে আমীরী বা শরাফতী বজায় রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে এমনকি বাংলাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করাও তারা শরাফতীর খেলাফ বলে প্রচার করছে। ইংরেজ হ'লো দেশের রাজা; ইংরেজের সমর্থক হিন্দুরা মাঠ, ঘাট, নদী-নালার মালিক, আর মুসলমান প্রধানেরা স্বদেশে পরবাসীর মত অবস্থায় পড়ে দিল্লী, বোখারা, সমরকন্দ, ইরান-তুরান,

হেজাজের স্বপ্নে বিভোর। এমন অবস্থায় মুসলমান জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ মুন্সীমোল্লারা বাংলা ভাষার মুসলমানী করে ফেললেন। পণ্ডিত-বাংলা যেমন সংস্কৃত শব্দালংকারে উৎকট ও হাস্যকর, মুসলমানী বাংলাও তেমনি আরবী-ফার্সী শিরস্ত্রাণে বিচিত্র কৌতুককর হয়ে উঠল। পণ্ডিত বাংলার বিষয়বস্তু হলো বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস; কিন্তু মুসলমানী বাংলার বিষয়বস্তুতে সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান একরকম বাদ পড়ল, রইল ধর্মের নামে আমীর হামজা, হাতেমতায়ী, গাজী-কালু, আহকাম-আরকান এবং হাশরের ময়দানের বিবরণ, আর লায়লী-মজনু, ইউসুফ-জোলেখার প্রেমকাহিনী। পণ্ডিত-বাংলা বিষয়গুণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, এবং সংস্কৃত শব্দালংকারের প্রাদুর্ভাব কমে গিয়ে আস্তে আস্তে সুবোধ্য হয়ে উঠল; অন্যদিকে মুসলমানী বাংলা বিষয়বস্তুর দূরবর্তিতায় আর অনেকাংশে অপটু রচনার ত্রুটিতে সাহিত্য পর্যায় থেকে বাদ পড়বার উপক্রম হ'লো। অর্থাৎ সমাজের এক বৃহৎ অংশের রসপরিবেশনে সক্ষম হয়েও মোটের উপর পুঁথিসাহিত্য নিম্নস্তরের গ্রাম্যসাহিত্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারল না। রুচির পার্থক্য এবং সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে মুসলমান শিক্ষিতেরাও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বেশী অনুরাগ প্রদর্শন করেন নি। অথচ, এ কথাও সত্য যে, পুঁথিসাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার যেটুকু অঙ্কন চেষ্টা রয়েছে, মুসলমান শিক্ষিতেরা তাও করেন নি। ভাগ্যবান অনুগৃহীতদের অনুকরণে তাঁরা প্রচলিত আরবী-ফার্সীও সযত্নে বাদ দিয়ে সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা লিখে প্রশংসা অর্জন করবার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তখন এই ছিল স্বাভাবিক। পূর্বে নবাবী আমলের পদস্থ মুসলমানেরাই ছিলেন সমাজের চালক বা আদর্শ। তাঁরা ইংরেজী বয়কট করলেন, বাংলাও অবহেলা করলেন। এইভাবে শীঘ্রই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের দলভুক্ত হয়ে, অধিকন্তু ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহে বঞ্চিত হয়ে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। কাজে কাজেই কিছুদিন পরে, যখন চতুর্দিক সব ঘাঁটি পরহস্তে চলে গিয়েছে, তখন বিপদ বুঝে আবার অগ্রবর্তীদের পিছনে পিছনে ছুটতে বাধ্য হলেন। মোটের উপর এই সময় থেকেই আবার নবজাগরণের সূচনা। এ বিষয় আমরা একটু পরে আলোচনা করব। তার আগে বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের দুই-একটা সত্যিকার গৌরবময় দানের কথা উল্লেখ করে নেওয়া যাক।

বাংলা বাউল-ভাটিয়ালী, দেহতত্ত্ব ও মারফতী গান সংকীর্ণ ধর্মমতের ঊর্ধ্বে উঠে সহজ ভক্তি ও প্রেমের মাহাত্ম্যে অসাধারণত্ব অর্জন করেছে। নিরক্ষর হয়েও কোনও কোনও কবি গভীর সাধনমার্গের কথা যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁদের অসাধারণ অভিজ্ঞতা আর ধর্মের মূলীভূত সত্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। লালন শাহ্, ইলাল শাহ্, শেখ মদন, তিনু ফকির, পাগলা কানাই—এঁরা ছিলেন 'গীত-মার্গের মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির' সহজ পথের সন্ধানী। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এঁদের অযত্নে প্রশংসা করেছেন। সরল স্বাভাবিক প্রকাশই এঁদের সকলের বৈশিষ্ট্য। শেখ মদন এবং লালন শাহ্ ফকিরের এক-একটি গানের নমুনা দেওয়া যাচ্ছে;

শেখ মদন বলছেন :

তোমার পথ ঢাকিয়াছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।
ডুবে যাতে অঙ্গ জুড়ায়

তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়,
বলতো গুরু কোথায় দাঁড়ায়—
তোমার আত্মে সাধন মজল ভেসে।
তোর দুয়ারেই লাগান তালা—
পুরাণ কোরান তসবি মালা,
ভেখ-পন্থই ত প্রধান জ্বালা,
কাইন্দা মদন মরে খেদে।

বিশ্বমানিকের পথে চলতে চলতে এঁদের মনের ভেদজ্ঞান দূর হয়েছে। লালন শাহ্ ফকির বলেছেন :

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে
কেমনে খুলে' সে ধন দেখব চক্ষেতে।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলেম জন্ম-কানা
না পাই দেখিতে।
এই মানুষের আছে রে, মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনিতে।

এর মধ্যে আছে, হাদিসের সেই বিখ্যাত বাণীর প্রতিধ্বনি—'নিজেকে চিনেছে যে আল্লাকে চিনেছে সে।' মোটের উপর দেখা যায়, এই সব সাধক পুরুষ ধর্মমূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন—প্রাণহীন অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিতে চান নি। আর একটা ভাব এই দেখা যায় যে, ধর্মের নামে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করবার এঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। হিন্দু-মুসলমানদের মিলনভূমি এই পূর্ববাংলার মাটিতে ধর্মের নামে যে সব অন্ধ গোঁড়ামি সময় সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এই সব সাধকের দল তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন—আত্মার একত্বের অনুভূতির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে। পূর্ববঙ্গের মাঝি মাল্লা যখন দাঁড়ের তালে তালে ভাটিয়ালী গান ধরে :

মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি ত আর বাইতে পারলাম না।
(আমি) জনম ভৈরা বাইলাম বৈঠা রে—
তরী ভাটায় না উজায় না।
ওরে আমি হাল কভই ধরি,
তবু তলেতে জল মানে না।
বাদাম ভাঙা ধসা, তক্তা ফাটে—
নাও ত পার্ পারনি মানে না—

—তখন মন ভেসে চলে কোন সুদূরের পানে। তখন আর তর্ক নয়, বিরোধ নয়, পূর্ণ সমর্পণ। বাংলার কৃষ্টিতে বৌদ্ধ, হিন্দু আর মুসলমান এই ত্রিধারার অপূর্ব সমন্বয় হওয়াতেই এমন সম্ভব হয়েছিল।

ইসলামিক যুগের বিশ্বাস বা ক্রিয়াকলাপ— ইসলামী পরিভাষায় 'শা' আএর'। এর দ্বারা বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। ক্ষতির কারণ হয় তখনই, যখন আমরা অন্তর্নিহিত প্রধান ভাব লক্ষ না করে, বাহ্যরূপ নিয়ে বেশী মাতামাতি আরম্ভ করি। ভাষার ক্ষেত্রেও যখন আমরা মূল বক্তব্য ছেড়ে কাব্যালংকার নিয়ে মাতামাতি আরম্ভ করি, তখন ব্যাপারটা সুশোভন হয় না। লক্ষী প্যাঁচা, কার্তিকের মত চেহারা, কেষ্ট আলাপ, বিদুরের ক্ষুদ, ধনুর্ভঙ্গ পণ এসব দেখেই চটে গিয়ে যদি আমরা লিখতে শুরু করি যোহরা প্যাঁচা, ইউসুফের মত চেহারা, সুলেমানী আলাপ, আবু যর-এর ক্ষুদ, গুর্জভঞ্জপণ, বা ঐ রকম আর কিছু তা' হ'লে বড় জোর হাসির খোরাক হ'তে পারে, কিন্তু মুসলমানী বাংলাও হবে না, ভাবের ব্যঞ্জনাও প্রকাশ করা যাবে না।

মুসলমানী বাংলা কেবল শব্দ বদল ক'রে হবে না— মুসলমানের বিশেষ সমস্যা হচ্ছে ইসলামী ভাবসম্পদ নিয়ে সরস সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, যা আনন্দ যোগাবে আর আদর্শের সন্ধান দেবে। লোকের মনের গভীর অনুভূতি থেকেই এর জন্ম হবে। স্বাভাবিকভাবে যেসব শব্দ দেশের লোকে ব্যবহার করে এবং বুঝতে পারে, সেই সব শব্দ দিয়েই সাহিত্য রচনা করতে হবে। পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলার সাহিত্যে এ দিক দিয়ে মুসলমান লেখকেরা সাধারণতঃ কিছু দুর্বলতা দেখিয়েছেন বটে কিন্তু এখন আর ভয়ের কারণ নেই। নবীন সাহিত্যিকেরা ধীরে ধীরে চোখ খুলছেন দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ পুঁথিগত বা বনিয়াদি ভাবের দিক থেকে তাঁরা বাস্তবের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাট্য, সমালোচনা, প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক গবেষণা প্রভৃতি নানা দিকেই এঁদের নজর পড়েছে। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই, তাড়াহুড়া ক'রে জোর ক'রে ভাষায় মুসলমানীত্ব বজায় রাখতে হবে না। সাহিত্যে কৃত্রিমতার স্থান নেই। আমরা নিজেদের চিনতে পারলেই যে সাহিত্য স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠবে, তাই হবে আমাদের জাতীয় সাহিত্য। আসলে সাহিত্য সাহিত্যই—লোকের উপভোগ্য। এর মালমসলার কিছু বিশিষ্টতা হ'তে পারে দেশকালপাত্র ভেদে। বিভিন্ন পাত্রের রস পরিবেশন করা যেতে পারে কিন্তু রসের ছাপ পাত্রের দ্বারা নয়, রসের প্রকৃতি দ্বারাই নির্ণীত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই কয়েক বছরে যে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের থেকে কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যাচ্ছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে আরও দানা বাঁধবে। অনেক নতুন সাহিত্যিকের মধ্যে উদ্দীপনা আর প্রতিশ্রুতি দেখা যাচ্ছে। এঁদের চেষ্টায় ভাল ফসল ফলবে, আবার কিছু আগাছারও সৃষ্টি হবে। আগাছার জন্য চিন্তার কারণ নেই। ওগুলো আপনা থেকেই (অর্থাৎ জাগ্রত জনসাধারণের অনাদরেই) মরে যাবে, আর সু-সাহিত্য উৎসাহ পাবে।

এখানে বলা আবশ্যক, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং গবেষণামূলক সাহিত্যের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্য সকলের দ্বারা সব কাজ হ'তে পারে না। আপন আপন প্রকৃতি এবং অবস্থা অনুসারে লেখক সাহিত্যের আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু বেছে নেবেন। সাহিত্য বিশেষ সাধনাসাপেক্ষ, আর তা' পেশ করতে হয় সমঝদার পাঠক সমাজের কাছে। কাজে কাজেই তার জন্য প্রস্তুতির দরকার। এই প্রস্তুতির মানে খানিকটা পড়াশুনা, রচনারীতির মশ্‌খ্, আর বেশীর ভাগ নিজের অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা আর চিন্তা। যে-কোনো বিষয়েই লেখা যাক না কেন, সে সম্বন্ধে নিজের মনে স্পষ্ট অনুভূতি থাকা চাই, নইলে কথার সূত্র অসংলগ্ন হ'য়ে রচনা অর্থহীন হ'য়ে পড়বার সম্ভাবনা। বক্তব্য না থাকলে বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, একথা বিশেষ ক'রে না বললেও চলে।।

আগেই বলা হয়েছে, ধর্মীয় ব্যাপারাদি মূল থেকে প্রচুর পরিমাণে অনুবাদ করা আবশ্যক। আবার সে সব বিষয়ে মৌলিক রচনাও বাদ দিলে চলবে না। ধর্ম বিষয়ে জোর দেওয়ার একটি বিশেষ কারণ এই যে, সাধারণভাবে এশিয়াবাসীর এবং বিশেষ করে বাঙালীর মানসিক গঠনে ভক্তিভাবের প্রাবল্য আছে। ধর্মের আশ্রয়েই ভক্তিভাব পরিপুষ্ট হয়। তাই ধর্ম এদেশীয় লোকের কর্মপ্রচেষ্টার একটা প্রবল উৎস। ধর্মের নামে সহজে উত্তেজনা আর উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, এবং তার পরিচয়ও আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। সব ভাল জিনিসের প্রতিই লোকের মনে মমতা আর মোহ থাকে। কিন্তু ধর্ম যখন ভাবের থেকে বিচ্যুত কতকগুলো ফরমুলায় পরিণত হয় তখন সে এক মারাত্মক শক্তি হ'য়ে দাঁড়ায়, যে শক্তিতে হিংসা-দ্বেষ, অত্যাচার-অবিচার, মারামারি, কাটাকাটির সূত্রপাত হয়। তাই, আচরণের মূল উৎস, চরিত্রের দৃঢ়তার প্রধান অবলম্বন যে ধর্ম, তার প্রকৃত স্বরূপ কি, এর মধ্যে কোন অংশের গুরুত্ব কতটুকু, এ বিষয়ে জনগণের মনে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। মূল ধারণা স্পষ্ট থাকলে, অপ্রধান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। এদিক দিয়ে সাহিত্যের দায়িত্ব রয়েছে। ধর্মভাবকে মধ্যযুগীয় বা প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না। বরং বুদ্ধি দিয়ে একে মার্জিত করে নিতে হবে। আসলে বুদ্ধি এবং সাধনা দিয়ে লাভ করতে না পারলে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের যে প্রাপ্তি, তার অপর মূল্য যাই হোক না কেন, ব্যবহারিক মূল্য প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। তাই সাহিত্যিকের একটি কর্তব্য হচ্ছে, ধর্মপ্রাণতা আর ধর্মান্ধতার মধ্যে পার্থক্য কি তা স্পষ্ট ক'রে লোকের সামনে তুলে ধরা। অবশ্য এ অতি কঠিন কাজ। এর প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে ধর্মীয় তথ্যসংগ্রহ যেমন আবশ্যক, তেমনি তার মূল্য যাচাই ক'রে বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ও ঠিক ততটা বা তার চেয়েও অধিক প্রয়োজন।

বাংলা ভাষায় কোরান-হাদিসের তর্জমা, আউলিয়া, দরবেশদের জীবনচরিত, মুসলিম দর্শনসম্বন্ধীয় পুস্তক, নবীকাহিনী, ফেকা-ফরায়েজের বই রচিত হয়েছে। কিন্তু পাঠকসমাজে তার প্রচলন তেমন হয় নি। এর কারণ কতকটা সাধারণ অশিক্ষা, কতকটা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও অপপ্রচার, কতকটা এই সব বই-এর দুষ্প্রাপ্যতা বা অপ্রাচুর্য এবং বোধ হয়, অনেকাংশেই এগুলোর সাহিত্যিক অনুৎকর্ষ। তাই, এ বিষয়ে আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক আছে; ধর্ম তার মধ্যে একটি দিক। অবশ্য ধর্মের মর্মকথা বা আদর্শ সব কাজের ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তবে সাধারণ আদর্শ, যা সব ধর্মেই একরকম, সেগুলোকে কোনও বিশেষ ধর্মের অন্তর্বর্তী ব'লে না ধরলেও ক্ষতি নেই।

আজকাল আলেম বা আল্লামা বলতে আমরা যে শুধু আরবী-ফার্সী ভাষার বিশেষজ্ঞ বুঝে থাকি, এমন কি বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও সব লোকের কাছে সব বিষয়ের ফতোয়া নিতে উৎসুক হয়ে উঠেছি, এটা বড় সুলক্ষণ নয়। এই ধরনের আলেমদের সামাজিক মূল্য এখনও যথেষ্ট আছে, কিন্তু ঐ মূল্যের সীমার দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র প্রভৃতির মারফত আমাদের সাহিত্যিকরা দেশের লোকের চোখ ফুটিয়ে দেবেন। মোট কথা, জীবনের সবদিকেই সাহিত্যিকদের সত্যদৃষ্টির সন্ধানী আলোক ফেলতে হবে। আমি মাত্র কয়েকটা দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছি। আরও অনেক দিকে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। জনসমাজকে উপেক্ষা ক'রে শুধু

রাজামহারাজাদের নিয়ে সাহিত্য রচনা যেমন একপেশে, তেমনি শুধু কুলিমজুর আর কলকারখানার সাহিত্যও একঘেয়ে।

সাহিত্যে কেউ উপেক্ষিত হবে না। সুপুষ্ট সাহিত্যে যেমন যুবক-যুবতীর প্রেম-কাহিনী বা মনস্তত্ত্ব থাকবে তেমনি শিশুর রঙিন স্বপ্ন, কর্মীর কর্মচাঞ্চল্য, আর বৃদ্ধের অভিজ্ঞতাও স্থান পাবে। বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যকে মোটের উপর সমৃদ্ধই বলতে হবে। কিন্তু মুসলিম সাহিত্যিক এ পর্যন্ত সংখ্যায় অল্প থাকায় সবক্ষেত্রেই তাঁদের দানের পরিমাণ সামান্য। ক্রমে ক্রমে এ ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। আশার কথা, চোখের সামনে প্রাণের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে। দেশের নবীনেরা এগিয়ে আসছেন। এঁরা সাহিত্যকে সার্থক করে তুলবেন, সঙ্গে সঙ্গে নব-উত্থিত পাকিস্তান সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।*

* ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাহিত্য অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ : (অগ্রহায়ণ ১৩৫৯)।

# বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার সাহিত্য প্রসঙ্গে

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার, অন্যান্য মানবীয় প্রচেষ্টার মত সাহিত্যেরও একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে; কিন্তু সে উদ্দেশ্য এমন সরস আর প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করবে যে লক্ষ্যটা যেন অতিমাত্রায় লক্ষণীয় হয়ে পাঠক বা শ্রোতার রস ভোগের বিঘ্ন না জন্মায়। এটা যে বিশেষ বাহাদুরী কাজ তা' না বললেও চলে; কিন্তু এরও সদুপায় আছে। মানুষের একটা সহজাত অহঙ্কার রয়েছে যার ফলে সে একান্ত আপনজন ছাড়া অন্যের উপদেশ বা নির্দেশ (ভাল হলেও) সহজে গ্রহণ করতে চায় না। কাজে কাজেই লেখককে পাঠকের 'আপনজন' হ'তে হ'বে। 'আপনজন' হওয়ার কৌশল হচ্ছে ভালবাসা,— যার প্রকাশ হয় সহানুভূতি আর সম্যক পরিচয়ে। সহানুভূতি থাকলে রুক্ষভাষা কলমে বা মুখে আসে না; সম্যক পরিচয় থাকলে কোথায় কি রকম বা কত ওজনের অলঙ্কার (স্তুতি, ব্যাজ, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি) সহনীয় হ'বে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। কাজে কাজেই একটা সুপরিমিত ভাষা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। এই স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে ফাঁকি চলে না। একজন যে ভাষা অনায়াসে ব্যবহার করেন অন্যে অনেক চেষ্টাতেও তা অনুকরণ করতে পারে না। এইখানেই হ'ল সাহিত্যিক ওস্তাদের মার। আসল কথা লেখকের অভিজ্ঞতা আর ব্যক্তিত্বের রসে রসান্বিত হয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই বিশিষ্ট প্রকারের। তাই কোনও সত্যিকার সাহিত্যিকের রচনা আরেকজনের অনুরূপ হয় না। নকল সাহিত্যিকের মেকি কোনও একটা বেমানান বিশেষণ, ক্রিয়া, ভাববিরোধী পদ বা অনাবশ্যক আড়ম্বরের শিথিলতা দ্বারা অনায়াসেই সাহিত্য রসিকের কাছে ধরা পড়ে যায়। সমালোচকের স্কেল-কম্পাসের মাপ-জোখের চাইতে হয়ত শেষ পর্যন্ত রসিকজনের সহজাত বুদ্ধিই অধিক সূক্ষ্ম নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয় কথা এই সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে কেবল সাহিত্যিকের নিজস্ব গুণপনা থাকলে চলে না— সেই সঙ্গে চাই উপযুক্ত সাহিত্যিক পরিবেশ। পরিবেশ বলতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা চাই-ই, এ ছাড়া আরও চাই একটি সমঝদার পাঠকগোষ্ঠী যারা সামাজিক, ব্যক্তিগত বা অন্যবিধ পূর্ব-সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য-মিথ্যা বা ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা রাখে। যে জন্য [illegible] ফলে মধ্যযুগের সত্যদ্রষ্টা সাধকগণকে ইকুইজিশনের অশেষ প্রকার নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, পয়গম্বরগণকে প্রবল বিরোধিতা ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল— সেই যুগ একেবারে যে বর্তমান তথাকথিত সভ্যসমাজেও অবর্তমান এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। যুগে যুগে সাহিত্যিকেরা নতুন পরিবেশে নতুন চিন্তা ছড়িয়েছেন, কিন্তু অনেক পুঁথিপুঁজি অনুশাসন [illegible] বাহকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদেরও অনাচ্ছন্ন মন নিয়ে সত্য অনুধাবন ক'রে সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করতে হবে; এর জন্য প্রচুর সৎসাহস আর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হবে। যে-কোনও একটি নতুন পথ

করতে গেলেই সাহিত্যিক রক্ষণশীলেরা বা পেশাদার সমালোচকেরা মারমুখো হয়ে উঠবেন। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রতিরোধের সার্থকতা আছে— সংগ্রামের দ্বারা প্রত্যয় এবং ঐকান্তিকতার যাচাই হয়। বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে কষ্ট ক'রে যা পাওয়া যায় তাই সত্যিকারের প্রাপ্তি— এইভাবে জয় ক'রেই সত্য এবং সুন্দরকে অর্জন করতে হয়। এ না হ'লে প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফুরণ হ'তে পারে না।

চিন্তানায়ক হিসাবে সাহিত্যিকেরাই দেশবাসীর স্বাভাবিক নেতা। অতএব তাঁদের দায়িত্বও সমধিক! তাঁরা দেশের চিন্তা-ধারা আত্মস্থ ক'রে দেশবাসীর কাছে ঐসব চিন্তার সাহিত্যিক রসরূপ প্রকটিত করেন। পারিপার্শ্বিক অস্ফুট চিন্তাকে স্ফুটতর ক'রে আদর্শকে আর একটু উন্নত বা মার্জিত ক'রে ক্রমাগত দেশের রুচি চিন্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রসর ক'রে দেন। দেশবিভাগের পর আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি এখনও দানা বেঁধেছে ব'লে মনে হয় না। কোনও বিশেষ সমস্যার নামোল্লেখ না ক'রে সাধারণভাবে বলতে চাই, আমাদের মনোনীত নেতৃবৃন্দ যাতে নির্লিপ্ত সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারেন সে জন্য বর্তমান সমস্যাদির আলোচনামূলক সাহিত্যও সৃষ্টি করতে হ'বে। এগুলো গতানুগতিক সংবাদ-সাহিত্যের চেয়ে কিঞ্চিৎ অনাবিল ও উচ্চাঙ্গের হওয়া চাই; তাহ'লে হয়ত দেশে সত্বর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উদয় হ'তে পারে। আশা করি, নবীন-প্রবীণ সকল সাহিত্যিকই নির্ভয়ে দেশের গঠনমূলক সৎসাহিত্য সৃষ্টি করে দেশের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

প্রায়ই দেখা যায়, সহজ হাততালির মোহে অনেক প্রতিভাশালী লেখকও সৃষ্টির উৎকর্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন দেওয়া ছেড়ে দেন; ফলে অচিরেই তাঁরা সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসেন, অথচ প্রতিভার গুমর ত্যাগ করেন না। জনসাধারণের সাহিত্যিক ভাল-মন্দ বিচার করবার একটা চলনসই মত থাকলে এভাবে প্রতিভার অপমৃত্যু হ'তে পারত না। অনেক বাজে বইয়ের বেশ কাটতি হয়, অথচ উচ্চ সাহিত্যিক মর্যাদাসম্পন্ন বই বিকোয় না। কাজে কাজেই অনেক সময় এই পাঠকদের মন-মর্জি মত সাহিত্য সৃষ্টি করবার লোভ প্রবল হয়। আদর্শের বাহক হিসাবে তরুণ সাহিত্যিকদের এ সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হবে। বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে প্রচুর সাধনার সংযোগ না হ'লে সুসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। মনের ভাবকে সাহিত্যিক বেশে ভূষিত ক'রে, তবে তো লোকের সামনে হাজির করতে হবে। তাই মার্জিত ভাষা, উপযুক্ত শব্দ-চয়ন, সঙ্গত শব্দালঙ্কার ও প্রচলিত বাগ্‌বিধির সুষ্ঠু প্রয়োগ— এইগুলো হচ্ছে সাহিত্যিকের কাঁচামাল। কাঁচামাল বা সাজসরঞ্জাম ভাল হ'লে অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হ'য়ে গেল, মনে করা যায়। কাজেই এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি বেশ চলনসই রকমের গল্প, কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধের মূল্য সামান্য একটু ত্রুটিতেই প্রায় অর্ধেক কমে যায়। বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্য কয়েক রকম ত্রুটির একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি:

প্রথম— দ্বিত্ব-দোষ। যেমন— আধিক্যতা; মতদ্বৈধতা; দারিদ্র্যতা; প্রসারতা; সৌজন্যতা, ঐক্যতা, [illegible]; হৃদয়ের অন্তর্দাহ; বিবিধ সমস্যাগুলি; কতিপয় সাহিত্যসেবিগণ; [illegible] কৃপার পাত্র ইত্যাদি।

দ্বিতীয়— শব্দের অপপ্রয়োগ। যেমন—ভীষণ ভাল; যুগপৎভাবে; সুবেশ পরিহিত; গোলাপ-জল; প্রভুদের; উপন্যাস-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র আমাদের 'প্রতীক্'; ছেলেটির

'আত্মবিশ্বাস' ছিল যে, আকুল কণ্ঠে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ সে ডাক শুনবেনই; ধূমকেতুরা সূর্যের রাজ্যের আনাচে কানাচে থাকিয়া সূর্যকে 'ঘুরিয়া' বেড়ায়; তিনিও মানুষ, মানুষেরই তিনি 'মহত্তম' 'পরিণাম'; আনন্দ কর। অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, 'দীপদান', 'ধূপদান', ভূমিদান কর; কিন্তু সেই শুভ বা অশুভক্ষণে মুসলিম জাতির 'অস্তিত্ব' কোথায় দাঁড়াইবে? ভয়ে ভয়ে কেউ হালের গরুটা বেঁচে ফেলে দেয় সিকিদামে 'খুঁটা'; জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাই কায়েদে আজমকে 'একক' করিয়া রাখিয়াছিল। আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন ইত্যাদি।

তৃতীয়— যুক্তি-বিরুদ্ধতা। যথা— সকলকে তুল্যাংশে বণ্টন করিয়া দিয়া একাংশ নিজে গ্রহণ করতেন; ভারতে পাঠান সুলতানদের সীমানা আমার চেয়ে আর কেউ বাড়াতে পারে নি; একদিন হঠাৎ বাতির আলো পড়ে সেই সমস্ত কাগজ পুড়ে গেল; তিনি রৌপ্য দ্বারা আকাশ ও ভূমণ্ডলের এক সমতল গোলক নির্মাণ করেন; এই সামরিক বিমানশিক্ষার ঘাঁটিটি আফগানিস্তান থেকে প্রায় মাইল দশকে দূরে হবে ইত্যাদি।

চতুর্থ— রূপকের অসঙ্গতি। যথা— "তাহার জীবন-মঞ্জুষা হইতে আলোক সংগ্রহ করিয়া এই নব-প্রলুব্ধ জাতি সভ্যতার দীপালী উৎসব সাজাইয়া তুলিতে পারিবে।"

পঞ্চম— কৃত্রিমতা। যথা— "তাঁহার বিজ্ঞান-উৎসাহ আফগানিস্তান হইতে তাহাকে ভারতে লইয়া আসে"; "সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।" ইত্যাদি।

ষষ্ঠ— প্রচলিত বাগ্‌বিধির খেলাপ। যথা— মন্ত্রের সাধন কিংবা আত্মবিসর্জন।

সপ্তম— ব্যাকরণ-দুষ্টি। যথা— চরিত্রবানরাই সম্মানী; 'সে'-ই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র; মৃত্যুমুখ কিংবা অর্ধমৃত জাতি; কি ইতর কি ধনী; বর্ষাতে তার রূপ ভয়ঙ্করী ইত্যাদি। খুটিয়ে খুটিয়ে আরও অনেক উদাহরণ বের করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজন নাই। আশা করি, উল্লিখিত উদাহরণগুলোর দোষ-ত্রুটি লক্ষ করে বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য যে-সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ একান্ত উপযোগী, কিছুদিন ধ'রে তাই ব্যবহার করবার সজ্ঞান চেষ্টা করলে ভাষাগত ত্রুটি বহুল পরিমাণে সংশোধিত হ'য়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে হালী, দাগ, গালিব প্রভৃতি উর্দু কবিগুরু নিয়মিতভাবে শাগরেদদের কবিতায় 'ইসলাহ' বা সংশোধন ক'রে দিতেন। একথা বাঙালী লেখকদের কাছে যতই অদ্ভুত মনে হোক, বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে আমার মনে হয় কি গদ্যে, কি পদ্যে, এর সত্যিই প্রয়োজন আছে। বিভাগ-পূর্ব বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকেরাই। তাই এর নিয়ন্ত্রণের ভারও ছিল স্বভাবতঃ এঁদের উপরেই। কাজেই মুসলিম-মানসের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত সুসাহিত্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। মুসলিম সাহিত্যিকেরাও এ সময় বাধ্য হ'য়ে বাংলা ভাষার প্রচলিত হিন্দু ছাঁদেই সাহিত্য রচনা করেছেন। বিভাগোত্তর যুগে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী বাংলা সাহিত্য গড়ে তুলবার অবাধ সুযোগ পেয়েছেন। এখন এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু কোনো পাল্টা ব্যবস্থা দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। অর্থাৎ— ইতিপূর্বে হিন্দু সাহিত্যিকেরা প্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ বাদ দিয়ে অধিক মাত্রায় সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়েছেন, এই অজুহাতে বর্তমানে আমাদেরও যে সংস্কৃতমূলক প্রচলিত শব্দ বাদ দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানী করতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। কিছুদিন আগে এই রকম একটা মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছিল বটে; তবে বর্তমানে স্বাধীনতার প্রথম উল্লাস প্রশমিত হ'য়ে আবহাওয়া একটু প্রশান্ত হ'য়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তাই ব'লে আমরা যে প্রয়োজনীয়

আরবী-ফার্সী শরীয়তি শব্দ, অথবা যে কোনও বিদেশী ভাষার থেকে সহজবোধ্য বা প্রচলিত ভাবনুগত শব্দ গ্রহণ করব না, তা নয়। মোট কথা, আমাদের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ইসলামী আদর্শ সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হ'বে। তা' করতে গিয়ে যে-সব আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী, তুর্কী, পর্তুগীজ ইত্যাদি ভাষার শব্দ ব্যভহার করবার আবশ্যক হবে, সেগুলোকেও আমরা বাংলা শব্দ বলেই গণ্য করব। এগুলোর উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে হ'য়েছে সেটা বড় কথা নয়; বরং শব্দগুলো যে বাংলা ভাষার মধ্যে বেমালুম খাপ খেয়ে গেছে, সেইটেই বড় কথা। বলা বাহুল্য, এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় খাপ খাইয়ে নিতে হ'লে প্রতিভার দরকার। নিকট অতীতে কবি নজরুল এ ব্যাপারে যে সহজ সৌকুমার্য-বোধের পরীক্ষা দিয়েছেন তা' আমরা অনায়াসে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ ক'রে তাঁর আরদ্ধ ধারাকে আরও কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ সুলক্ষণ এই দেখা যাচ্ছে যে, পারিপার্শ্বিক জীবন বা সমাজের প্রতি নজর রেখে নানা বিষয়ে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখা হচ্ছে। এখন মধ্যবিত্ত বাবু-সাহিত্য বা সখের-সাহিত্য সৃষ্টি না ক'রে সাধারণ লোকের জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য, সাহিত্যে এই গণ-মুখিতা বিভাগপূর্ব যুগেই কিছুটা আরম্ভ হ'য়েছিল; বর্তমানে বাংলার তরুণ সাহিত্যিকের চেষ্টায় বেশ দ্রুত গতিতে বাংলা সাহিত্যে এই ফাঁকটা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মোটামুটি বলতে গেলে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে হতাশার বিশেষ কারণ নেই— তবে লেখার পেছনে আর একটু যত্ন এবং সাধনা থাকলে সাহিত্যিক আবর্জনার ভাগ কিছু কম হ'ত। তবে প্রাণের যে দুর্বার জোয়ার এসেছে, তার খর-স্রোতে নিশ্চয়ই সকল আবর্জনা ভেসে গিয়ে খাঁটি সাহিত্য আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

# পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক প্রবন্ধসাহিত্য

যে-কোনো সাম্প্রতিক বিষয় আলোচনা করে তার সঠিক পরিচয় দেওয়া স্বভাবতঃই কঠিন। কারণ, আমরা যার মধ্যে লিপ্ত থাকি, তার সমগ্র রূপ দেখতে পাইনে। আমাদের সংস্কার স্বার্থবোধ প্রভৃতি নানা বিষয় একত্র জড়িত হয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মায়। তাছাড়া অনেক বিষয় এমন আছে যার ইঙ্গিত প্রথমে প্রচ্ছন্ন থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়। সে স্থলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-কোনো পূর্বাভাষেই সন্দেহের অবকাশ থাকে। এসব জেনেশুনেও ঐতিহাসিক সর্বদাই ঘটনার বিশ্লেষণ ক'রে তার ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়ে থাকেন।

সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গেলে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব নিয়েই লিখতে হয়। এর জন্য সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ক'রে তার সম্যক আলোচনা করা দরকার। কিন্তু সময় আর অবসরের অভাবে তা' সম্ভব হয় নি। প্রবন্ধের বই অল্পই প্রকাশিত হয়। একেতো অধিকাংশ লেখকই প্রবন্ধ লেখেন কম, তার উপর প্রবন্ধ পুস্তকের খরিদ্দারের অভাব। তথ্য সংগ্রহ করতে হ'লে মাসিক, দৈনিক বা অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়। সব সাময়িকপত্র, এমন কি তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলোও যোগাড় করা বেশ কঠিন। আমি মোহাম্মদী, দিলরুবা, ইমরোজ, মাহেনও, নওবাহার, দ্যুতি, বেগম, সওগাত, সৈনিক এবং আজাদ মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ-ষাটখানা পত্রিকা যোগাড় করে প্রবন্ধ লেখক এবং তাঁদের লেখার লিস্ট করেছিলাম। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, সিলেট, রাজশাহী, প্রভৃতি মফঃস্বল শহর থেকেও কয়েকখানা কাগজ বের হয়, সেগুলো ব্যবহার করবার সুযোগ পাই নি। তবু আশা করি, উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই উল্লিখিত পত্রিকাগুলোর কোনো না কোনোটাতে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। এখানে প্রবন্ধকারদের নাম বা তাঁদের লিখিত প্রবন্ধের তালিকা দিতে চাইনে। তার বদলে কেবল মোটামুটি বিষয়বস্তুর সংখ্যাঘটিত বিবরণ দিয়েই বর্তমান পূর্ববাংলার প্রবন্ধ লেখকদের মনের গতি কোনদিকে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু তাতেও মুশকিল আছে। একে তো প্রবন্ধ নানান রকমের হয়। সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, রসরচনা, সমালোচনা, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রবন্ধ, শিক্ষা-ভাষা-হরফ সমস্যা, চিত্রকলা, নাট্যকলা, শিশুসাহিত্য, লোকসাহিত্য, পুঁথিসাহিত্যের আলোচনা, ধর্ম, দর্শন, ঐতিহ্য, অনুবাদ, গবেষণা— এসবই প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। অবশ্য তা সাহিত্য হওয়া চাই। কিন্তু বিষয়বস্তুর পার্থক্যে সাহিত্যের মাপকাঠি বদলায়, অথচ কিভাবে কতটুকু বদলায় তার কোনও ব্যক্তিনিরপেক্ষ সর্বগ্রাহ্য মাপকাঠিও নাই।

দ্বিতীয়তঃ উপরে প্রবন্ধের যেসব রকমারীর কথা বলা হ'ল তা' আবার পরস্পর সংশ্লিষ্ট। শ্রেণী বিভাগ করতে হ'লে যে কোনও রচনা নিঃসন্দেহে কোনও বিশেষ শ্রেণীতেই পড়া

আবশ্যক। এজন্য অনেক স্থলেই কিছুটা আপোস করতে হয়। উদাহরণ দিলেই কথাটা আরও পরিষ্কার হ'বে। ধরুন, একটি প্রবন্ধের নাম "জ্যোতির্বিদ্যায় মুসলিম প্রভাব"। প্রবন্ধটা কি বৈজ্ঞানিক না ধর্মীয় না বিশুদ্ধ গবেষণামূলক ? আর একটি প্রবন্ধ যেমন "ফ্রান্সে মুসলিম প্রভাব"—এটি কি ঐতিহাসিক, না দার্শনিক না ধর্মীয় ? অথবা "নজরুল কাব্যে তৌহীদ"—এটায় কি নজরুলকাব্যের আলোচনাই প্রধান, না তৌহীদের ব্যাখ্যা বা তার পরিপোষক উদাহরণই প্রধান? এইভাবে "ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র"—এটা কি ইসলামিক শরীয়তের ব্যাখ্যা, মুসলিম সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতিদের বাস্তব কর্মপন্থার পরিচয়? মোটের উপর লেখকের মনের প্রবণতা কোন দিকে এবং কোন দিকে তিনি বেশী জোর দিয়েছেন তার উপর নির্ভর করছে প্রবন্ধের আসল প্রকৃতি।

আর এক ধরনের উদাহরণ দেওয়া যাক। "আধুনিক ইরাকী সাহিত্য",—"অতীত ও বর্তমান তুরস্ক", "আরব রসায়নের উৎস"— এসবের সঙ্গে হয়ত পূর্ববাংলার সাধারণ পাঠকের সম্পর্ক অবশ্যই গৌণ। তবে কি এগুলো নিতান্তই জীবন সম্পর্কচ্যুত পণ্ডিতি আলোচনা? বোধহয়, তাও নয়। বাংলার মুসলমান সমাজকে (উভয় বাংলার কথাই বলছি) ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, উচ্চপদ, ব্যবসায় বাণিজ্য, ধনদৌলত, মান-সম্ভ্রম সব খুইয়ে অতীতের দিকে যেয়েই সান্ত্বনা খুঁজতে হয়েছিল। তাই তারা বড্ড বেশী অতীতের দোহাই পড়তে বাধ্য হয়েছে। বঙ্কিমী যুগে, বা হিন্দুত্বের নব-জাগরণের দিনেও গোটা হিন্দু সমাজে এই মনোবৃত্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। আজও হিন্দু সমাজ ইউরোপকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেবে বলে স্পর্ধা করে থাকে। এরমধ্যে স্পর্ধার উপযুক্ত কারণ একটু আধটু থাকলেও এর আস্পর্ধাটাই বেশী প্রকট নয় কি? গরীব যদি ধনী আত্মীয়ের পূর্ব-পুরুষের গুণকীর্তনে একটু আধিক্যই করে থাকে, তবে তা যতটা উপহাসের বিষয়, তার চেয়ে অনেক বেশী করুণ। তাই ব্রিটিশশাসিত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে আরব, ইরাক, ইরান, মিসর, স্পেনের দিকে তাকিয়ে ঐসব দেশের গৌরব আত্মসাৎ করবার প্রয়াসকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু অস্বাভাবিক এই যে, তাদের বাড়ীর কাছে যে গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র হিমালয় আপন মহিমায় বিরাজ করছে, কিংবা চামেলী, গন্ধরাজ, শিউলী, কুমুদ, পদ্ম, নীরব সৌন্দর্যে ফুটে রয়েছে এদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। এগুলো যেন হেলায় হিন্দুকে বিলিয়ে দিয়ে এরা তাকিয়ে আছে নীল দরিয়া, ফোরাত, আলবুর্জ এবং বসরইগুল, রায়হান বা হেনার দিকে। এই করুণ অবস্থার জন্য তাদের স্বদেশে পরদেশীর মনোভাব দায়ী, তাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু অতীতে প্রতিবেশী সম্বন্ধে হিন্দুর সহানুভূতিহীন তাচ্ছিল্যও যে কতকটা দায়ী নয় একথা কে বলবে? যা'হোক, অতীতে যা হয়ে গেছে তা' নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। আজ ব্রিটিশ অধিকার চলে গেছে, ভারত আর পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি মোটামুটি একই রয়ে গেছে—এতদিনের অভ্যাস বদলাতে সময় লাগবে। আশা করা যায় পূর্ববাংলার মুসলমান অচিরেই নিজেদের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দাঁড়াতে পারবে, তখন হয়ত আরব, ইরান, কাবুল, তুর্কী-ই পাকিস্তানকে ধনী আত্মীয় বলে বরণ করে নেবার জন্য ব্যগ্র হবে। তার জন্য যে সাধনা দরকার পূর্ববাংলায় এ-যুগের সাহিত্যিকরা তার গতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করছেন। এ চেষ্টায় প্রথম প্রথম ভুলত্রুটি হবে, পরে শোধরাতে শোধরাতে উপযুক্ত পথের সন্ধান মিলবে। অতীতের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করে কেউ কোনো দিন বড় হ'তে পারে না। তাই আজ ইসলামী কৃষ্টির মূল উৎস কোরান-হাদিসের দিকে স্বভাবতঃই দৃষ্টি পড়েছে।

আর সব দেশের মুসলমান রাজা-বাদশারা ইসলামের যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তারও খোঁজ পড়েছে। সেইসঙ্গে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপন পরিবেশের দিকেও তরুণ সাহিত্যিকেরা তাকাচ্ছেন। তাঁরা বৃহৎ জনগণকে আর উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাচ্ছেন না। যুক্ত বাংলায় বিরাট মুসলমান সমাজ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পায় নি। এর জন্য হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সাহিত্যিকেরাই বেশী দায়ী তাও অস্বীকার করবার যো নেই। বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটি বিশেষ করে পূর্ববাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের চেষ্টাতেই সংশোধিত হয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতির ধারক এক বীর্যবান নতুন বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠবে। ভাল কথা, প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগের কথা হচ্ছিল। অনেক কাটছাটের পর পূর্ববাংলায় সাম্প্রতিক প্রবন্ধ সাহিত্যকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করে মোট দেড়শ প্রবন্ধের মধ্যে কয়টি কোন শ্রেণীতে পড়ে তার একটা ফিরিস্তি তৈরী করেছিলাম। (আশা করি সাহিত্যের আসরে এই নিরস সংখ্যাতত্ত্বের জন্য ক্ষমা করবেন)।

১ম শ্রেণী : ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি— প্রবন্ধ সংখ্যা ২০
২য় শ্রেণী : মুসলিম ঐতিহ্য— প্রবন্ধ সংখ্যা ৩০
৩য় শ্রেণী : ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা— প্রবন্ধ সংখ্যা ২৫
৪র্থ শ্রেণী : সাহিত্য, সমাজ, সমালোচনা, গবেষণা, অনুবাদ— প্রবন্ধ সংখ্যা ৪৫
৫ম শ্রেণী : শিশুসাহিত্য, লোকসাহিত্য, রসরচনা, আর্টঘটিত—প্রবন্ধ সংখ্যা ৩০

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, শ্রেণীগুলো এরকম মিশ্র করবার কারণ কি? জওয়াব এই যে, যেগুলোর মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে, সেগুলোকে এক পর্যায়ে ফেলা হয়েছে যাতে কোনো বিশেষ প্রবন্ধের স্থান নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা কম হয়। প্রথম শ্রেণীতে ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগতে পারে। এর কিন্তু কারণ এই যে,ইসলাম ধর্মে ব্যাপকভাবে জীবন ধারণের সমস্ত প্রধান প্রধান দিকেই, শুধু নীতির ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে। তাই রাষ্ট্রনীতি ইসলামিক স্টেটে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এখানে কিন্তু ধর্মের অর্থ অধর্মের উল্টো। অর্থাৎ রাষ্ট্রও ন্যায়বিচার এবং সমদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার বিশ্বাস, যদি নামের নেশা না থাকত, তাহলে একে সমদর্শী বা সমঅধিকারমূলক রাষ্ট্র বলা চলত। কার্যতঃ Secular State এবং Islamic State একভাবেই চলছে এবং চলতে বাধ্য।

মুসলিম ঐতিহ্য বলে একটা আলাদা শ্রেণী স্বীকার করা হয়েছে। এর কারণ আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তুরস্কের রাজনৈতিক বিবর্তন; সিসিলিতে মুসলিম প্রভাব, ইসলামের সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রতিভা— এই শ্রেণীর প্রবন্ধের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ইসলামের ঐতিহ্য কোথায় কি রূপ নিয়েছে তাই দেখানো। এরকম প্রবন্ধের সংখ্যাও ৩০, সুতরাং এগুলোকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা বোধ হয় অন্যায় নয়।

ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা— এসব নিয়ে মনোজ্ঞ সাহিত্য রচনা করা কঠিন। তবু জাতীয় প্রয়োজনে যেসব আলোচনার উদ্ভব হয়েছে এবং অনেক লোকে যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাকে অসাহিত্য বলে ঠেকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। প্রবন্ধের অন্যতম গুণ প্রসাদ-গুণ— অর্থাৎ অব্যর্থ শব্দচয়ন করে নিজের মনের কথা পরিষ্কারভাবে অন্যের মনের দরজায় পৌঁছিয়ে দেওয়া। অধিকাংশ রচনাই এই বিচারে উৎরে গেছে। ভাষা সমস্যা, হরফ সমস্যা, ব্যাকরণ সমস্যা, শিক্ষকদের বেতন সমস্যা, ছাত্রদের নকল সমস্যা, শিক্ষানীতি প্রভৃতি বিষয়ও এই পর্যায়ে পড়েছে।

সাহিত্য, সমাজ, সমালোচনা, গবেষণা, অনুবাদ এই পাঁচমিশালী জিনিসকে একটি শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। সাহিত্য বলতে 'রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতা' বার্নার্ড শ' ইবসেন 'অসূয়া' বা ঐরকম কতকটা বিশুদ্ধ (?) সাহিত্য ধরা হয়েছে। সমাজ, সমালোচনা, গবেষণা, অনুবাদ প্রভৃতির অর্থ সুস্পষ্ট। তবে কোরান হাদিসের অনুবাদ ঐসব বিষয়ের প্রবন্ধ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সংখ্যা ৪৫। হয়ত সমাজমূলক বিষয় আলাদা করা যেত। কিন্তু সমাজ নিয়েই তো সাহিত্য। কাজে-কাজেই কোনটা 'সাহিত্য' আর কোনটা 'সমাজ' তা নিয়ে গোল বাধবার প্রবল সম্ভাবনা থাকত।

শিশুসাহিত্য, লোকসাহিত্য, রসরচনা আর আর্টঘটিত প্রবন্ধগুলো এক সঙ্গে রাখা গিয়েছে। হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গরচনা, সরস আলোচনা, পুঁথিসাহিত্য এবং সিনেমা, নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ এই পর্যায়ে স্থান পেয়েছে।

মোটের উপর এই তালিকা থেকে বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকরা চোখ মেলে চেয়েছেন। অবশ্য পর্যাপ্ত সৃষ্টি এখনও হয় নি, নিখুঁৎ সৃষ্টিও কমই হয়েছে, কিন্তু মনের আকুলি বিকুলির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আজকের এই গুণী সম্মেলনে পূর্ববাংলার সাহিত্যের গতি বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ সম্বন্ধে কয়েকজন চিন্তানায়ক আগেও মতামত প্রকাশ করেছেন, তবু হয়ত পুনরুক্তি চলতে পারে। তাই আমি সাধারণ দুই একটা কথা নিবেদন করব। প্রথম কথা বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত না হ'লে সাহিত্যিক তাঁর রচনায় নিজের মনের ছাপই প্রকাশ করে থাকেন। সেই অসঙ্কোচ প্রকাশই স্বাভাবিক আর সুন্দর সৃষ্টির একটা বিশেষ লক্ষণ। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মীর মশাররফ, নজরুল প্রত্যেকের লেখায় বিশেষত্ব রয়েছে। সে বিশেষত্ব ভাবে, ভাষায়, মানসিক গঠনে, জীবনের মূল্যবোধে। সকলের লেখায়ই পারিপার্শ্বিকের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু এর চেয়ে আরও গভীর ছাপ রয়েছে ঐতিহ্যের। ঐতিহ্যকে বলা যেতে পারে এমন এক পারিপার্শ্বিক যা বহু যুগের অভ্যাসের ফলে একেবারে আত্মস্থ বা হজম হয়ে গেছে। হয়ত রক্তকণিকা বা জীব কোষের গঠনেও তার প্রভাব পড়েছে। এই ঐতিহ্যকে চাপা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি চলে না। হিন্দু-মুসলিম এই দুই বৃহৎ সমাজের ঐতিহ্য যে কেবল কোঁচা-কাছা-ধুতি-টিকি বা লুঙ্গী-আচকান-টুপি-দাড়ির মধ্যেই আছে তা নয়। তাদের মানসিক প্রকৃতিতেও মিশে রয়েছে। অবশ্য মিলও রয়েছে প্রচুর। মানুষে মানুষে মিল ত থাকবেই, হৃদয়বৃত্তিতেও বোধহয় পনর আনা মিল আছে। এই মিল ভাষা, রীতিনীতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অসাম্য প্রভৃতির ভিতর থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাইতেই তো সার্বজনীন সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়। নইলে একদেশের সাহিত্যের আদর অন্যদেশে হ'তে পারত না। কিন্তু অমিলও যে রয়েছে তা অস্বীকার করে লাভ নেই। সাহিত্য সার্বজনীন হবে, কিন্তু বিশিষ্ট পরিবেশকে আশ্রয় করেই হ'বে তার প্রকাশ। এই পরিবেশটুকুর জন্যই সাহিত্য রূপ পায়, আর রূপের বাস্তবতার উপরেই ভাবের রং উজ্জ্বল হয়ে ফোটে।

এই সাধারণ কথা মনে রেখে যদি আমরা বিভাগপূর্ব বাংলার সাহিত্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব মোটের উপর এ সাহিত্য হয়ে পড়েছে একটা বিশেষ শ্রেণীর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্র, এর অবশ্য কারণ আছে। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন বা সাহিত্য বিচারের তুলাদণ্ড যাঁদের হাতে থাকে তাঁদের মনোমত সাহিত্যই সৃষ্ট হয় ও স্বীকৃতি পায়। বিগত ২০/৩০ বছর যাবৎ এর একটা প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে, সমাজের নিম্নস্তরের দিকেও অনেক

দুঃসাহসিক তরুণের দৃষ্টি পড়েছে। (মনে রাখবেন এই তরুণদের অনেকেই এখন প্রৌঢ়। এখানে বয়সের তারুণ্যের চাইতে মানসিক তারুণ্যের কথা ভেবেই 'তরুণ' শব্দটা প্রয়োগ করেছি)। তবু এদের অধিকাংশই হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বৃহৎ মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা আশানুরূপ দৃঢ় না হওয়ায় বাংলা সাহিত্য মোটামুটি হিন্দু ঐতিহ্যেরই বাহন হয়ে রয়েছে। মুসলিম লেখকের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁদের অবহেলা এবং শিক্ষা ও কৃষ্টির ব্যাপারে তাঁদের পশ্চাদ্বর্তিতা যে এ জন্য বিশেষভাবে দায়ী, তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এই কারণেই হিন্দুদের কথা দূরে থাক, অনেক শিক্ষিত মুসলমানও মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত নন। এরা এ ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন উর্দুওয়ালা ভাইদের উপর। তাঁরা মাল সরবরাহ করবেন আর এঁরা গলাধঃকরণ করবেন, এই ছিল প্রথা। কিন্তু এঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যেই স্বাভাবিকভাবে (এবং সম্মানজনকভাবে) জাতীয় সংস্কৃতিবোধ জন্মাতে পারে।

সুখের বিষয় পূর্ববাংলার তরুণগণ আজ সে ত্রুটির বিষয় অবহিত হয়েছেন তাই আজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে কোরান, হাদিসের তর্জমা হচ্ছে, আউলিয়া-দরবেশদের কাহিনী লিখিত হচ্ছে, মুসলিম ঐতিহ্যের খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। এই কারণেই আগে লেখেছেন, সমুদয় প্রবন্ধের এক-তৃতীয়াংশই ধর্ম এবং ঐতিহ্যমূলক। জোর করেই বলা যায় বাংলাভাষা সম্বন্ধে পূর্ববাংলার তরুণদের নবজাগ্রত আত্মীয়তাবোধ পশ্চিমবঙ্গীয় ভ্রাতৃদের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। এর প্রমাণ এঁরা রক্তের অক্ষরে লিখে দিয়েছেন। এঁরা যখন ধর্মীয় বিষয়গুলো বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবেন, তখনই দেশের লোকের সত্যিকার ঐতিহ্যবোধ জন্মাবে। তখন বলিষ্ঠ আত্মচেতনায় পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এক নবজাগরণ সূচিত হবে।

ভাষার আঙ্গিকের দিক দিয়ে প্রথম প্রথম কিছু আতিশয্য হতে পারে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই সহনীয়। ক্রমে ক্রমে অবশ্য ব্রেক কসা গাড়ীর মত যথাস্থানে এসেই থামবে। তখন বাড়াবাড়িটা মসৃণ হয়ে যাবে, আবার কোনও কোনওটা হয়ত বাড়াবাড়ি বলে আর মনেই হবে না। এখানে বিশেষ করে শব্দচয়নের কথাই ইঙ্গিত করছি। বাংলা ভাষায় শতকরা কয়টা আরবী-ফার্সী-উর্দু-ইংরেজী শব্দ থাকবে, এ হিসাব করে কখনও সাহিত্য রচনা হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে যা আসে আসুক, তা টিকবে। অস্বাভাবিকভাবে যা আসবে তা আবর্জনার মত অনায়াসে ধুয়ে মুছে যাবে। এজন্য বিশেষ ঘাবড়াবার কারণ নেই। সব ভাষার থেকে প্রয়োজনমত শব্দ গ্রহণ করেই তো জীবন্ত ভাষার ঐশ্বর্য বাড়ে। রামমোহনের ভাষার থেকে বিদ্যাসাগরের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা, নজরুলের ভাষা— ক্রমশঃ সহজের দিকে গতি নিয়েছে। বর্তমান ডেমোক্রেসির যুগে এই স্বাভাবিক। উদক না বলে জল বললে কিংবা জল না বলে পানি বললে সাহিত্যের বিকৃতি হয় না। বরং স্বাভাবিকভাবে যেখানে যেটা খাটে সেইটে ব্যবহার করাই সু-সাহিত্যিকের লক্ষণ। পানি-গামছা না জল-গামছা, পানি-খরচ না জল-খরচ— এ নিয়ে তর্ক করা বোধহয় বাজে তর্ক। কিন্তু জলযোগকে পানিযোগ; পানিকৌড়ীকে জলকৌড়ী; জলচৌকিকে পানিচৌকি; পানিফলকে জলফল, জল-পানিকে জল-জল; পানি-পানি বা পানিজল করতে গেলে হয়ত কেবল গায়ের জোরই প্রকাশ পায়। যদিও এতে বাঙালীর 'শারীরিক বিক্রমের' কোনো লক্ষণই নেই। পূর্ব বাংলা যদি এখন (বা যথাসময়ে) কলকাতার দিকে তাকিয়ে না থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার দিকে একটু ঝোঁক দেয় তবে তাতে যে কোনো হাস্যরসেরই সৃষ্টি হবে এ কথা মানা যায় না। মোট কথা

পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকরা এখন একটু অবাধে সাহিত্যচর্চা করবার বা তার উপযুক্ত বিশিষ্ট আঙ্গিক সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেই। এ-কে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর আল্লা-রসুলের হামলা বলে মনে করলে চলবে না। পরস্পর সহনশীলতার ভিত্তিতে এইভাবে বাংলা ভাষার হিন্দু-মুসলিম দুইটি ধারাও পাশপাশি থেকে উভয় বাংলার ভাষাকেই সমৃদ্ধ করবে। আর এই সাহিত্যিক সহনশীলতার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিমের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি না হয়ে উন্নতিই হবে। বাস্তবিকপক্ষে 'সাহিত্য' যদি হয়, তবে তা ইংরেজী, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্মান বা চীনা ভাষায় হলেও বাঙালী তার রস ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে অনিবার্যরূপেই পূর্ব আর পশ্চিম বাংলার ভাষার প্রকাশভঙ্গীর সামান্য কিছু বেশ-কম হবেই। গোপাল হালদারের 'তেরশ' পঞ্চাশের ভাষায় বলতে হয়, তাতে "ভরসা কি?" মোটের উপর পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে, এরা আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছে, এদের স্বাধীন ধারায় এরা সাধ্যমত এগিয়ে যাবেই। তাদের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এর প্রয়োজন আছে এবং তাতে বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিই হবে। এদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের আশীর্বাদ ও সদুপদেশও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। বন্ধুভাবে সহানুভূতির সঙ্গেই তা' করতে হ'বে। আমার আশা আছে পশ্চিম বঙ্গীয় সাহিত্যিক মুরব্বি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা পূর্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে খুশী হয়েই তাদের যথাযোগ্য সাহায্য করবেন।*

* শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায় প্রবন্ধ সাহিত্য বিভাগে পূর্ববঙ্গীয় প্রতিনিধির ভাষণ।

সওগাত

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫১

# পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য

পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলবার ভার পড়েছে ঘটনাচক্রে আমার উপর এ-কে একটা বড় রকমের প্রকৃতির পরিহাস বলেই মনে করতে হবে। তার কারণ, একখানা মাসিকপত্র বা ম্যাগাজিন হাতে পড়লে আমি সচরাচর প্রবন্ধগুলোই পড়ি; বিশেষ কারণ না ঘটলে কবিতা বা গল্পের দিকে মন দিই না। বিশেষ কারণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ আর সুপারিশ।

ছেলেবেলা থেকেই 'সদা সত্যকথা কহিবে' গুরুজনের এই উপদেশটা মনের মধ্যে এমন গুরুতরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে মিছিমিছি গল্প বানিয়ে বলাকে রীতিমতো কুবাক্য আর কুকার্য বলেই মনে করতাম; অনেক পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, সব মিথ্যা কথাই মিছে নয়, আর কোনো সত্য কথাই একেবারে সত্যি নয়। এ পরিবর্তন হয়তো বিশেষভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবেই হয়েছে।

যা হোক, মানুষেরও যে সৃষ্টির অধিকার আছে, একথা এখন বিনা দ্বিধায় স্বীকার করি; মানুষের এ সৃষ্টি কতকটা খোদার উপর খোদকারী বটে। অর্থাৎ মানুষ যা হতে চায় কিন্তু হতে পারে না বা করতে চায় অথচ বাধা পায়, সেই ইচ্ছার ছাপ পড়ে সাহিত্যে। বিশেষ করে কথাসাহিত্য মানুষের অপূর্ণ ইচ্ছা বা অপূরণীয় আদর্শের ছাপ স্বচ্ছন্দে বহন করে বলেই তা এত আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু খোদার নিয়ম-কানুনগুলো এমন অনড় যে তার উপর খোদকারী করতে হলে খোদার সৃষ্টিটা আগে ভাল করে মনের মধ্যে পরিপাক করিয়ে নিতে হবে, তারপর তার থেকেই উপাদান নিয়ে পরস্পর সঙ্গতি রেখে সেগুলো মনোরম করে সাজাতে হবে। যার তার দ্বারা একাজ সম্ভব নয়, তবে যে-সে-ই এ-কাজে হাত দেয়। কেউ বা সদা সত্য কথা বলতে গিয়ে এক নৈরাশ্যজনক ব্যর্থ সৃষ্টি করে বসে যার মধ্যে খোদার সৃষ্টির রহস্যবোধটারই অভাব। আবার কেউবা সদা সত্য কথা বলতে গিয়ে এমন গাঁজাখুরী গল্প বানায় যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য আর চটকদার বলেই বেশী করে উদ্ভট। সত্য কথা বলতে গেলে, আদিখ্যেতা নেই এমন সার্থক গল্প বা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তবে সবদিক দিয়ে বিচার করলে মাঝারীর চেয়ে উঁচুদের জিনিস— যা সর্বসাধারণের পাতে দেওয়া চলে— তার অভাবও নেই। যাক্, আমার মতো গল্প বেরসিকের পক্ষে সুকুমার আর্টের সূক্ষ্ম বিচার শোভা পায় না। তাই পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য সম্বন্ধে দুয়েকটা স্থূল কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

কথাসাহিত্য বলতে সচরাচর কথিকা, ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস আর নাটকই বোঝায়। কথা ও কাহিনী পদ্যে লিখলেও তাকে কথাসাহিত্যের মধ্যে ধরা যেতে পারে। এই হিসেবে পল্লীগাথা বা পালাগানও বোধ হয় কথাসাহিত্য। কিন্তু ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, আত্মচরিত প্রভৃতি এত দূরের কুটুম্ব যে ওগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও ক্ষতি নেই।

কথাসাহিত্য জাতীয় বই বের করেছেন অল্প কয়েকজন মাত্র। তবে মাসিক পত্রিকা বা বিশেষ সংখ্যার দৈনিক পত্রিকাগুলো ঘাটলে অনেক চলনসই গল্প চোখে পড়ে। সকলের সব

বই-এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া বোধহয় "পাঁড় গল্পখোরের" পক্ষেও সুকঠিন, আমার পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। ভাগ্যিস কিছুদিন এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম, সেই সূত্রে কয়েকখানা বই "সমালোচনার জন্য" বিনামূল্যে পেয়েছিলাম, এখনও মাঝে মাঝে পাই। ভদ্রতার খাতিরে আর কর্তব্যের খাতিরে সেগুলো আগাগোড়া পড়তেই হয়। এর বাইরেও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দুই-একখানা বই নিয়ে সময় সময় পড়বার সুযোগ হয়। তা ছাড়া পাঠ্যবই-এর বাইরে অপাঠ্য বই নিজের পয়সায় কিনে পড়া যে প্রায়ই ঘটে উঠে না একথা খাঁটি বাঙালী মাত্রেই স্বীকার করেন। এ-ব্যাপারে আমি অবশ্য খাঁটি বাঙালীত্বের জোর দাবী করতে পারি। যা হোক, যে দুই-একজন ভদ্রলোক তাঁদের বই পড়বার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের বই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ না করলে অভদ্রতা হবে। কিন্তু যাঁরা তা করেন নি, অর্থাৎ যাঁদের সমৃদ্ধ রচনা আমার হস্তগত হয় নি, তাঁদের বই সম্বন্ধে দুয়েক কথা বলতে না পারায় তাঁরা কিন্তু আমাকে দুষতে পারবেন না।

উপন্যাস আর বড়গল্পকে এক পর্যায়ে ফেলাই সুবিধা— কারণ, তাতে বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয় একটু কমে। পাকিস্তান হওয়ার পরে প্রকাশিত কথাসাহিত্যের মোটামুটি তালিকা এই :

**উপন্যাস বা বড়গল্প** : ১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ— লালসালু; ২. হামেদ আহমদ— অপূরণীয়; ৩. আশরাফুজ্জামান— ক. মনজিল, খ. আকাশ পর্বত নদী ও সমুদ্র; ৪. আকবর হোসেন— ক. অবাঞ্ছিত, খ. কি পাইনি; ৫. মাহবুবউল আলম— মফিজন; ৬. কাজী আফসারউদ্দীন— চরভাঙাচর; ৭. এম. এ. হাশেম খাঁ— আলোর পরশ।

**গল্প** : ১. শাহেদ আলী— জিবরাইলের ডানা; ২. আহমদ ফজলুর রহমান—এক টুকরো জমি; ৩. আলাউদ্দীন আল আজাদ— ক. জেগে আছি, খ. ধানকন্যা; ৪. শওকত ওসমান— জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প; ৫. হামেদ আহমদ— ক. মানুষ ও পৃথিবী, খ. তিল ও তাল; ৬. সরদার জয়েনউদ্দীন— নয়ান ঢুলি; ৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন (২য়)— পথ জানা নাই, ৮. অবনী নন্দী— বিভ্রান্ত কসর; ৯. নূরুন্নাহার— বোবা মাটি; ১০. নূরজাহান বেগম— সোনার কাঠি; ১১. মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী—মায়ের কসম।

এ ছাড়া আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করবার মতো, মহীনউদ্দীন আহমদ, এরশাদ হোসেন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আঃ মুঃ মির্জা আবদুল হাই, অকিঞ্চন দাস, আনোয়ার রহমান, খলিলুর রহমান চৌধুরী, মিন্নাত আলী, আজিজুল হক, কাজী ফজলুর রহমান, ইব্রাহীম খাঁ।

**নাটক** : ১. জসীম উদ্দীন— মহুয়া; ২. এম. আকবর উদ্দীন— নাদীর শাহ; ৩. শওকত ওসমান— ক. আমলার মামলা, খ. কাঁকরমণি, গ. তস্কর ও লস্কর; ৪. আসকার ইবনে শাইখ (ওবায়েদ আসকর)— ক. বিরোধ, খ. পদক্ষেপ, গ. বিদ্রোহী পদ্মা, ঘ. দুরন্ত ঢেউ; ৫. আবু জাফর শামসুদ্দীন— শনিগ্রহ; ৬. ওবায়দুল হক— ক. এই পারে, খ. দিগ্বিজয়ী চোরাবাজার; ৭. মোফাখখারুল ইসলাম— দুর্বীন; ৮. নুরুল মোমেন— নেমেসিস।

**পালাগান** : ১. রওশন ইজদানী— ক. চিনুবিবি, খ. রঙ্গিলাবন্ধু; ২. মফিজউদ্দীন আহমদ— পতিতাদের নতুন জারী; ৩. জসীমউদ্দীন— বেদের মেয়ে (গীতিনাট্য)।

**রসরচনা** : ১. আবুল মনসুর আহমদ— সত্যমিথ্যা; ২. আসহাব উদ্দীন আহমদ— ধার।

অবশ্য সকলেই স্বীকার করবেন এই বাছোয়ারী লিস্টের সবগুলো বই-ই সুসাহিত্য হবে, তার সম্ভাবনা খুবই কম। আর আমিও অনায়াসে স্বীকার করে নিতে পারি, —আপনারা মনে মনে প্রার্থনা করছেন, আমি যেন আবার এদের সমালোচনা জুড়ে না দিই। আরও একটি

কথা এই যে, লিস্টগুলো সময়-অনুসারে বা গুণ-অনুসারে সাজানো হয় নি। গুণাগুণ বিচার করতে হলে কৌতূহলী অবশ্য নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে দেখবেন।

তবে পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য কি মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্যের দল স্বীকার না করলেও সাহিত্যিকদের প্রায়ই দল থাকে। অর্থাৎ সম-ভাবুকেরা কেমন করে যেন সুযোগ পেলেই একসঙ্গে জুটে যান, এবং নিজেদের ধ্যানধারণার অনুরূপ সাহিত্য গড়ে তুলতে পরস্পরের সহায়ক বা অন্ততঃপক্ষে উৎসাহদাতা হয়ে পড়েন। সাহিত্যিকদের এই রকম জোট বা দল থাকা ভালই, কিন্তু দলাদলি থাকাটাই ক্ষতিকর। পূর্ববাংলায় দেখতে পাই দলও আছে, দলাদলিও আছে। বোধ হয় পশ্চিমবাংলায় বা পৃথিবীর অন্যত্রও এ ব্যাপারটা অল্পবিস্তর আছেই। আমি তিনটে প্রধান দলের কথা জানি— পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, তমদ্দুন মজলিশ আর রেনেসাস সোসাইটি। দলগুলোর নাম থেকেই ওদের মনোভাবের খানিকটা পরিচয় হয়ত পাওয়া যাচ্ছে।

সাহিত্য-সংসদের তরুণরা আমার মতো একজন বৃদ্ধকে সভাপতি করেছেন। এতে খানিকটা আশ্চর্য হবার কারণ আছে বৈ কি। কারণ অন্যদলের কাছ থেকে অনেকবার শুনেছি এই দলের ছেলেরা নাকি একদম গোল্লায় গেছে— প্রবীণদের পাত্তাই দিতে চায় না। আমার বিশ্বাস অধিকাংশ প্রবীণই নিজেদের পুরানো মূলধন আঁকড়িয়ে বা চোখ রাঙিয়েই সাহিত্য-দরবারে রাজত্ব চালাতে চান। তরুণদের নতুন আইডিয়া তাঁদের চোখে বেঁধে তার মধ্যেও যে কোনো সার পদার্থ থাকতে পারে, এ ধারণাই তাঁদের হয় না।

জীবনের সবক্ষেত্রেই এই তো চিরন্তন ঘটনা। কোনও দিকে অতিপ্রবণতা দেখা দিলেই আর সবদিক সহজে চোখে পড়তে চায় না। আমার প্রথম প্রথম মনে হ'ত তরুণেরা বড্ড বেশী শ্লোগানের পক্ষপাতী, তার মানে তাঁরা রুশো-ভল্টেয়ার-শোপেন-হাওয়ার-মার্কস-লেনিন প্রভৃতির মতামত কপচাতেই বেশী মজবুত, সেগুলো তলিয়ে বুঝবার প্রবৃত্তি তাঁদের মোটেই নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম এঁদের অন্ততঃ শতকরা ৩০ জন বেশ স্থিরবুদ্ধি এবং বাইরের জগতের সঙ্গে যেমন পরিচয়, ঘরের কাছের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেও তেমনি বেশ সচেতন। এঁরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে রাজনীতি বা ধর্মের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। এই দলের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল আজাদ, সরদার জয়েন উদ্দীন আর হাসান হাফিজুর রহমানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য শাখায়ও অনেকেই আছেন; কোনো বিশেষ দলভুক্ত নন, অথচ এই তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মনের মিল আছে বলেই ধারণা জন্মে এমন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মুনীর চৌধুরী, আবুল মনসুর আহমদ, আসহাব উদ্দীন আহমদ এবং নূরুল মোমেন বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন; অবশ্য কোনো বিশেষ দলের সবগুলো লোকেরই যে ধারণা ঠিক একই রকম তা' হতেই পারে না। যাঁদের নাম করলাম, তাঁরাও হয়ত সাহিত্য-সংসদের কোনো কোনো আদর্শের সঙ্গে একমত নন। এই সংসদের যদি কোনো অতিমাত্রিক ঝোঁক থাকে, সে বোধ হয় সমাজতন্ত্রের আদর্শের দিকে— ইসলাম যার প্রবর্তক আর বর্তমান যুগে পার্থিব দিক দিয়ে কম্যুনিজম যার ধারক। এঁরা আসলে সুষ্ঠু জীবনের যান্ত্রিক, তাই বস্তুবাদী। তমদ্দুন মজলিসেও অনেক উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক আছেন। এঁদের সংগঠন কুশলতাই বেশী উল্লেখযোগ্য। মফস্বলেও অনেক জায়গায় এঁদের শাখা আছে। রাষ্ট্রভাষা, ইসলামের আদর্শ এবং ঐতিহ্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ে এঁরা পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। সাময়িক দিকের চেয়ে রাজনৈতিক দিকেই এঁদের দৃষ্টি

বেশী পড়েছে। এঁদের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিকে'র মতামতগুলো ভালই, কিন্তু আমার মনে হয় ভাষায় যেন সংযমের অভাব রয়েছে— কোনো বিষয়ে অতিমাত্রিক ঝোঁক হলে তা' হ'য়ে থাকে। তমদ্দুন মজলিশের সাহিত্য শাখার আর একটি মুখপাত্র আছে, 'দ্যুতি'। 'দ্যুতি'তে-উপরোক্ত রাজনৈতিক ঝোঁক তেমন প্রকট নয়। এঁদের মধ্যে পালাগানে রওশন ইজদানী, নাটকে আসকার ইবনে শাইখ (ওবায়েদ আসকার) এবং গল্পে শাহেদ আলী ও নুরুন্নাহার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আমার মনে হয় রাজনৈতিক পরিবেশ আর একটু স্থিরভাব ধারণ করলে, কিংবা এরা রাজনীতি প্রবণতা আর একটু কমিয়ে দিলে এঁদের দ্বারা অনেক উপাদেয় সৃষ্টি সম্ভব হবে।

পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের বাংলা নাম, আর তমদ্দুন মজলিশের আরবী নামের পাশে রেনেসাঁস সোসাইটির ইঙ্গ-ফরাসী নাম দেখে মনে হয় এঁরা যেন সাধারণ বাঙালী বা সাধারণ মুসলমানদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য বেশ খানিকটা ব্যগ্র। কিন্তু এঁদের সাহিত্য বা সমালোচনার যে ধারা দেখেছি, তাতে মনে হয়, এরা যেন তমদ্দুন মজলিশকে তমদ্দুন শিখাতে চান, আর পাকিস্তান সাহিত্য সংসদকে 'বি-পাক' অর্থাৎ বিশেষভাবে 'পাক' করতে চান। এই উক্তির হেতু এই যে, এঁদের মুরুব্বীয়ানা কথায় ঝাঁঝ অনেক বেশী— যে ঝাঁঝে তমদ্দুনের 'তাহ্‌জীব' রক্ষাও হয় না আর পাকিস্তানের সাহিত্যিক আদর্শেরও মর্যাদা বোঝা যায় না। এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই যে ঐ এক ধরনের তাও বলা যায় না। এঁদের অনেকের মনেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব এত বেশী যে ঠিক টাল সামলাতে পারছেন না। তবু সাধারণভাবে সবার মনেই যেন একটা ধারণা জন্মেছে যে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দ বসালেই বা খোর্মা-খেজুর, ফোরাত-দজলা, শিরী-ফরহাদ আমদানী করলেই ইসলামী ভাবধারা পূর্ববাংলার লোকদের গলার ভিতর দিয়ে মর্মস্থলে পৌছবে। সম্ভবতঃ কবি ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১ম) এবং তাঁর সহকর্মীরাও এই দলের অগ্রণী। ফররুখ আহমদ প্রতিভাবান কবি; তাঁর আগেকার লেখা 'সাতসাগরের মাঝি' বিখ্যাত কাব্য, তাঁর গীতিকবিতার হাতও মন্দ নয়। কিন্তু অতি ঝোঁকে সাহিত্যের অপমৃত্যু হয়, একথাটা ভুলে গিয়ে তিনি হয়ত নিজের প্রতিভার প্রতি অবিচার করছেন।

এই তিনটি দল ছাড়া আরও ছোটখাট দল আছে। কেউ কেউ দ্বিদল, ত্রিদল বা সর্বদলীয়, আবার কেউ বা একদম অদলীয়ও আছেন। শেষ পর্যায়ে বোধ হয় আবুল কালাম শামসুদ্দীন (২), মাহবুবুল আলম, মঃ আকবর উদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রভৃতি আছেন। তা ছাড়া নাম উল্লেখ করতে গিয়ে কারো কারো দল-বদল করে ফেলেছি কি না, সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারছি না, বিশেষতঃ বহু দলীয়দের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা খুবই বেশী।

আর একটা কথা বলেই শেষ করব। কথাটি এই যে আমি কথা সাহিত্যে গুণাগুণ বিচার করবার পুরোপুরি অধিকারী নই। তবে যে চেষ্টা করলাম, তাতে আমার আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও সবক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠা বজায় রাখতে পেরেছি কি না বলতে পারিনে। কাজেই আপনারা [illegible] নিরিখ দিয়ে বক্তব্যটা গ্রহণ করবেন।

['সাহিত্য মেলা'— শান্তিনিকেতন, ১৩৫৬]

# সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-প্রতিভা মহাসাগরের মত বিস্তীর্ণ। তাই ঝিনুক দিয়ে সাগর সেঁচবার চেষ্টা না করে কেবল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব।

মাইনর স্কুলে থাকতে পড়েছিলাম পাঠ্য-বইয়ে উদ্ধৃত দু'টো কবিতা— 'খাঁচার পাখী ছিল খাঁচায়,' আর 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী'। যা হোক প্রথমটি পড়ে বেশ আমোদ লেগেছিল— গল্পের আমোদ; আর পাখী দুটো যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কিন্তু লেখক সম্বন্ধে বালকমনে কোনও উচ্চ ধারণা হয়নি; কারণ, সবই ত স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, এতে আর বাহাদুরী কি? দ্বিতীয় কবিতাটি পড়ে বেশ ভালো লাগলো, কী কথার গাঁথুনি, কী প্রশান্ত দেশপ্রেম, আর কী শ্রুতিমধুর রচনা। বেশ সমীহ হল, হেডপণ্ডিত মশায় সমাসাদি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, আর কবিতাটা মুখস্থ করালেন। একটা লেখার মত লেখা বটে, যার-তার কাজ নয় এমন লেখা। এ হল ১৯১১ সালের আগেকার কথা।

এরপর হাইস্কুলে পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে ছিল 'কথাসার', 'সীতার বনবাস' আর মনি গঙ্গোপাধ্যায় : 'কাদম্বরী'। একেবারে জমজমাট ক্লাসিক্যাল আবহাওয়া। 'কাদম্বরী'র একটা সুদীর্ঘ ভূমিকা ছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখা। ক্লাসে সেটা পড়া হ'ল না বাড়ীতেই পড়ে নিলাম; একেবারে অবাক লাগল। ভাষা ছিল কোমলে-কঠোরে মিশানো, আর যুক্তি ছিল শাণিত। সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা, এর মধ্যে প্রবন্ধটা আর দ্বিতীয় বার পড়বার সুযোগ হয়নি তবু এখনো মনে আছে,—কাদম্বরীর গল্পের শ্লথগতির সঙ্গে কালোয়াতি গানের 'চলন্ত রাজকুমারী'র তানাশ্রিত আবর্তিত গতির তুলনা। মোট কথা, রাজসভার 'তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী' বা গগনের 'জলধর পটল' সংযোগের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটাই আমার মনোহরণ করেছিল বেশী। পরবর্তীকালে, অলক্ষ্যেই আমার রচনার ভাষাও যে এই ভূমিকার প্রথম বিস্ময় দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে তা এই স্মৃতিকথা লিখবার সময় আজকেই হঠাৎ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি। অবশ্য পরে এই প্রথম দোলার পোষকতাও হয়েছে।

কলেজ-জীবনে 'সবুজপত্রে'র মারফত রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনার সঙ্গে আর একটু পরিচয় হয়। কথ্যভাষার ব্যবহার এবং ইংরেজী বাক্যরীতির আংশিক অনুকরণ প্রথমে একটু বে-খাপ্পা ঠেকলেও অল্পদিনেই কান-সওয়া হয়ে গেল। একটি প্রবন্ধ পড়লাম ("পদ্মায় যখনও রেলপুল হয়নি" বলে আরম্ভ)—তাতে ছিল লোকের মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার মধ্যে সমতলতা আর অবাধ চলাচল সম্বন্ধে সুপ্রযুক্ত আলোচনা। আমার মন তাতে পুরাপুরি সায় দিল। এই হ'ল আমার গোপন শিষ্যত্ব। প্রায় ঐ সময়েই আর একটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর কোন সামাজিক মেলামেশা নেই, আছে কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজনের সম্পর্ক। প্রাণের স্পর্শহীন মুখের ডাকে তারা যে সব সময় সাড়া দেবেই এ আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এমন

সকলনভাবে আর কোনও সাহিত্যিক মুসলমান সমাজের কথা এবং হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক মানবীয় সম্প্রীতির কথা ভেবেছেন বা প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

কলেজে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, শিশু-সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদির সঙ্গে সাধ্যমত পরিচয় রাখবার চেষ্টা করেছি, আর মুগ্ধ হয়েছি তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দেখে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতও অনেক শুনেছি, এক সময় কিছু অভ্যাসও করেছিলাম,—যেমন অনেকেই করে থাকে। সে-সময় থিয়েটার সঙ্গীত আর ডি.এল. রায় ও রজনী সেনের গানের খুব প্রচলন ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের অজস্র ধারা। 'আমার মাথা নত করে দাও', 'জীবন যখন শুকায়ে যায়', 'সকল জনম ভরে', 'সে কোন বনের হরিণ', 'আমি লইয়া থাকি আমি তাই', 'কেন যামিনী না যেতে', 'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি', 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', 'অন্তরে দেহ আলো', 'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে', 'মন্দিরে মম কে আসিল রে', 'আমি চঞ্চল হে', 'আমার একটি কথা বাঁশী জানে', 'নিশীথ রাতের বাদল ধারা', 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে', 'জনগণমন-অধিনায়ক'—প্রভৃতি শত শত গানের প্লাবনে দেশের লোকের চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেল।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ একবার ঢাকায় আসেন। তখন আমি সদ্য ঢাকা ইউনি-ভার্সিটিতে অধ্যাপক হয়েছি। সন্ধ্যার ঠিক আগখানে কবি আসলেন সেক্রেটারীয়েট মুসলিম হলের (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের) প্রাঙ্গণে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ, শ্বেতশুভ্র-মণ্ডিত আলখাল্লা-পরিহিত সৌম্যমূর্তি দেখে মনে হল, চৌথা আসমান থেকে ঈসা পয়গম্বর যেন আবার আবির্ভূত হলেন। তিনি ছেলেদের সঙ্গে কিছু গল্পগুজব করবার পর আমাদের অনুরোধে একটি গান গাইলেন—"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে"। সত্যিই সে-সময় পশ্চিম আকাশে রক্তিম রবি অস্তমিত হচ্ছিল। কবি পশ্চিম দিকে মুখ করেই বসেছিলেন, বোধ হয় অস্তায়মান সূর্য দেখেই তিনি গানটা ধরেছিলেন। ঐ পরিবেশে অনুরাগরঞ্জিত স্বভাবমধুর ধ্বনির ব্যঞ্জনায়, আর সুঠাম দেহের ঈষৎ আন্দোলনভঙ্গীতে যে কী মর্মস্পর্শী সঙ্গীতসুধা নিঃসৃত হয়েছিল তা বর্ণনার অতীত। ঐ দিন মনে হয়েছিল, জীবনে যেন এক সুমহৎ সার্থকতার স্পর্শ পেলাম।

১৯৩৭ সালে আমার একখানা প্রবন্ধ-পুস্তক পাঠিয়েছিলাম কবির কাছে। আশা করতে পারিনি যে, কবি এই ক্ষুদ্র উপহারের প্রতিও কিছু মনোযোগ দিবেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কবির সেক্রেটারী জানালেন, 'বইখানা কবির হস্তগত হয়েছে। পরে উনি নিজেই আপনাকে চিঠি দিবেন।' কয়েকদিনের মধ্যেই কবির আশীর্বাদবাণী পেলাম। কবি আমার ভাষার সরলতা, স্বাভাবিকতা আর মত প্রকাশের সাহসিকতার কথা উল্লেখ করে আরও লিখবার উৎসাহ দিলেন। কবি তো আর জানেন না, আমি তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহজের সাধনা করেছি, আর সাহসিকতার বল পেয়েছি। আজ রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে অমর কবির অক্ষয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

০৩.২.৬১

## রবীন্দ্রসাহিত্যে সূফীপ্রভাব

রবীন্দ্রসাহিত্য বিরাট মহাসাগরের মত। তার কোথায় কি আছে, কোথায় কত গভীরতা এসব নির্ণয় করা যেমন-তেমন কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কোনও এক কবিতায় তিনি তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে অজানা বন্ধুকে যা বলেছিলেন, তার মর্মার্থ অনেকটা এই : হে বন্ধু, লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাকে চিনি কিনা? আমি গর্ব করে বলি 'হাঁ চিনি।' কিন্তু তারা যখন জিজ্ঞাসা করে তুমি কেমন? তখন কি যে বলব, বুঝতে পারিনে; কেবল বলি 'কি জানি?' তারা তখন বিদ্রূপের হাসি হেসে চলে যায়। দেখো, আমি যে তোমাকে একেবারে চিনিনে তাই বা কেমন করে বলি? কত সকাল-সন্ধ্যা-দুপুরে আভাসে-ইঙ্গিতে হৃদয়ে তোমার স্পর্শ পেয়েছি, অভিভূত হয়েছি, কিন্তু নিশ্চয় করে তো কিছুই বলতে পারিনে। সোজা কথা, আমি চিনিও আবার চিনিও না।

আমার অবস্থাও আজ ঠিক তাই। ভেবেছিলাম অনেক কথাই বুঝি জানি, কিন্তু কাজের সময় তার প্রমাণ দিতে গিয়ে শরম পাই। প্রথমত, পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরে যা সব পড়েছি, তার আবছায়াটা মনে আছে—আর খুব সম্ভব তাঁর সমগ্র রচনার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ এখনও পড়বার বাকী রয়েছে। আর যা পড়েছি তা-ও পড়ার মত পড়তে পারি নি। দ্বিতীয়ত, সূফীপ্রভাব বলতে সত্যি কি বোঝায়, তাও স্পষ্ট করে ধারণা করতে পারি নি। তাই একটা যেমন-তেমন ধারণা খাড়া করেই আরম্ভ করতে হবে।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন কোনও পরমপুরুষ বা জীবনদেবতা বা চিরপরিচিতা মানসী—যাকে চিরকাল ধরে অনুভব করলেও পুরোপুরি বোঝা যায় না, তার অনুসন্ধান সূফী মনোবৃত্তির গোড়ার কথা, আর সেই পর্যায়ের ভাব যে সাহিত্যে বিধৃত হয়, তাই সূফী-সাহিত্য বা সূফী-প্রভাবিত সাহিত্য। এইখানে প্রশ্ন জাগে—তাহলে কীর্তন, বৈষ্ণব-সাহিত্য, মুর্শিদা, ভাটিয়ালী, বাউল ইত্যাদির সঙ্গে সূফী-সাহিত্যের পার্থক্য কোথায়? এসব দার্শনিক মতবাদের সূক্ষ্মতার ভিতরে প্রবেশ না করে শুধু এইটুকু বলতে চাই, এদের ভিতরে হয়তো আঙ্গিকের পার্থক্য আছে, গভীরতার পার্থক্য আছে, ভাবাদর্শের পার্থক্য আছে, তবু এদের ভিতর আত্মীয়তার সূত্র রয়েছে,—সেই গভীরের অতল অন্বেষণা। এই গভীরকে পাবার সুদূরের পিপাসাকেই আমি বিভিন্ন নাম না দিয়ে একটা নাম দিয়ে চিহ্নিত করব—সূফী মনোভাব। অবশ্য অন্য নামও দেওয়া যেত। মৌলানা রুমীকে (১২০৭-১২৭৩ খৃঃ) সূফীদের আদি কবি ধরলে দেখা যায় বৈষ্ণবসাহিত্য তার অন্ততঃ দুই শতাব্দী পরে জন্ম নিয়েছে। তাইতো জ্যেষ্ঠ হিসাবেও সূফীদের অগ্রবর্তী দাবী রয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী আরও অনেক প্রাচীন, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কীর্তন ও বাউল, আমরা বর্তমানে যে-রূপে পাচ্ছি, তা ঠিক কখন প্রবর্তিত হয়েছিল তা' আমার জানা নেই। বাংলা ভাষায় বর্তমানে আমরা যে ভাটিয়ালী ও মুর্শিদা গানের সঙ্গে পরিচিত তার উৎপত্তিকালও অন্ধকারে আচ্ছন্ন; হয়তো দুই শতাব্দীর

অধিক পূর্বে নয়। আর এও দেখা যায় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেই বাংলাদেশে রুমীর মসনবী, শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ-বোস্তাঁ-পান্দনামা, দেওয়ান-ই হাফিজ-এর গজল ইত্যাদি বেশ চালু হয়ে পড়েছিল। সুতরাং বাংলাদেশের মানসাচিত্তে ফার্সী কালচারের একটা স্পষ্ট ছাপ থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ করে, বাংলার জনসাধারণ রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মহাগ্রন্থকেও লৌকিক ভাষায় পেয়েছিল, মুসলিম শাসনের আগে নয়। তার আগে পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি জনসাধারণের মধ্যে কত গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল তা' বলা যায় না।

যা'হোক, এখন রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী, কণিকা, ছোটগল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে যে-সব স্থলে উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'সুফীভাবের' সমগোত্রীয় ভাবের সাক্ষাৎ মেলে, তার থেকে অল্প কয়েকটি নমুনা দিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। অবশ্য হাজার চেষ্টা করেও অসম্পূর্ণতার হাত এড়ানো যাবে না—আগের থেকেই সাফাই দিয়ে রাখা ভাল।

*ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ, ১ অক্টোবর ১৮৯১।*

'পৃথিবী যে আশ্চর্য সুন্দরী এবং প্রশস্তপ্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধেবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ। এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয় রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আমি তারমধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।'

কবির মনে এই অসীমের ধ্যানস্তিমিত সান্ধ্যনির্জনতা তাঁকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সূত্রে গ্রথিত করেছে। এর জের টেনে পৃথিবীটা যে কত সুন্দর, উপভোগ্য আর তার স্নেহ-প্রীতি যে কত মনোরম তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন কবি এইভাবে :

*ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ, ২০ আশ্বিন ১২৯৮।*

'উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত করে স্বেচ্ছা-রচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাইনে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে, ভালবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালবাসা পেয়ে, মানুষের মত বেঁচে এবং মানুষের মত মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মত হাওয়া হয়ে, যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।'

এটি 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,' 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরমধ্যে অসীমের প্রত্যক্ষ সন্ধান না থাকলেও একটা জীবনদর্শন আছে, দীন ও দুনিয়ার 'হাসানাত' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। কথাগুলো রুমীর কাছে কেমন লাগবে বলা যায় না, কিন্তু ওমর খৈয়ামের কাছে অবশ্যই ভাল লাগবে। এতে মিথ্যা বা অযথা বাহ্যিকতার উপর কটাক্ষ আছে; আর এতে উচ্চারিত হয়েছে—'মানুষকে ভালবাসব' আর যদি কেউ ভালবাসে সেটাও ভালবেসে হাসিমুখে গ্রহণ করব' জীবনের এই দুই মহাবাণী।

*ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ, ১৩ আগস্ট, ১৮৯৪।*

'যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ— ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেইদিকে কাজ করছে। অথচ সেই শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় একটা জগৎ জগৎ-ব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিকে কাজ করছে। ...যে-সমস্ত তর্ক-যুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাবমত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিসটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়,— অনুভব করায়, ভালবাসায়। আমার সব অনুভূতির মধ্যে ঐ রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। ...আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালবাসাই রহস্যময়ের পূজা। কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব।'

এখানে যেন কেউ একজন আছেন, তিনিই আমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করিয়ে নেন, অনেকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। এটি তাঁরই করুণা—এই অনুভূতির চমৎকার প্রকাশ রয়েছে। এ যেন 'ওহী' যার দ্বারা মৌমাছিরা ফুলে ফুলে মধু কুড়িয়ে পথ চিনে নিজ আবাসে ফিরে আসে, আবার 'ওহী' দ্বারাই ওরা সুন্দর মধুচক্র রচনা করে। এই মহান শক্তির অস্তিত্ববোধ অবশ্যই সুফী-সাধনা ও চিন্তার অঙ্গীভূত। 'আমারে করো তোমার বীণা!' 'আমার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে আছে', 'সে যে আসে, আসে, আসে', 'তব সিংহাসনের আসন হ'তে এলে তুমি নেমে', 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে' প্রভৃতি অনেক গানের মধ্যে এভাব ঝংকৃত হয়েছে। পবিত্র কোরানেও স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, 'আমি তোমাদের প্রধান শিরার থেকেও অধিক নিকটবর্তী।'

*ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ, ৪ অক্টোবর ১৮৯৫।*

'আজ থেকে বোধহয় শরৎকালটা ঠিক রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ...আমার মনটা এই আলোকে স্তব্ধতায় এই নির্মল শুভ্র স্বচ্ছ আকাশে একেবারে পূর্ণ হয়ে গেছে। কে একজন যাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, এই মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ নদী এবং ওপারের প্রকুল্ল কাশবন শোভিত বালির চর, আমার কাছে একটি সুদূর পূর্ব স্মৃতির মত মনোহর লাগছে। ...যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী বলছে— "কিসের তোমার ঘরকন্না এবং আত্মীয়তাবন্ধন—আমি তোমার অনন্তকালের সাধনা, তোমার সহস্র জন্মপূর্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জগতের অসংখ্য খণ্ড পরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র পরিচিতা—কোনো কারণেই আমার দুর্লভ সঙ্গ তুমি অবহেলা করো না"।'

এখানে কবির প্রবাসসঙ্গিনী যাদুকরী শারদশোভা যেন কবির হৃদয়ে আবির্ভূতা হয়ে সহস্র জীবনের অপার রহস্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কবি আরও বলছেন :

'এ জীবনে আমার যা কিছু গভীরতম তৃপ্তি এবং প্রীতি, সে কেবল এই রকম নির্জনে সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়—খণ্ডভাবে মিশ্রভাবে

সংসার থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। আমার জীবনের অন্তস্থলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে, কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ গলানো খাঁটি সোনাটুকু, আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃত শস্য।'

এ প্রসঙ্গে মৌলানা রুমীর একটি বয়াতের কথা মনে পড়ে :

> জুমলা মা'শুক আস্ত, আশিক পর্দায়ে,
> যিন্দা মা'শুক আস্ত, আশিক মুর্দায়ে।

অর্থাৎ :

> প্রিয়াস্পদ অখণ্ড পরিপূর্ণ রূপিণী,
> প্রেমী তার একটি স্তর বা পর্দা মাত্র,
> প্রিয়াস্পদ সদা জাগ্রত, প্রেমী তো অচেতন—
> তাকে জাগালে তবেই সে জাগে।

এইভাবে মৃতকে যে জন জীবনদান করেন, কবি তাঁর সেই প্রিয়তমের সুকোমল স্পর্শ পেয়ে ধন্য হচ্ছেন।

*মঙ্গলবার ৪ পৌষ, ১৩১৪।*

আবরণের জন্যই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশন-বসনের ভাবনা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে—তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে তার সীমা নেই—সে কাকে যে বলে শরীর, কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয়, কাকে যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা, কাকে যে বলে অসীম তা ঠিকানা নেই—এই সমস্ত সংস্কারের স্তরা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্তভাবে জগতের সম্ভ্রম লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই...বলছে, 'তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি হয়ে দেখো, শিশু যে-রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে, তেমনি করে নির্মল দেখো।' কাকে দেখবো তাঁকে, যাঁকে কখনো দেখা যায় না, তাঁকে না—যাঁকে চোখে দেখা যায়, তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যার থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে।...রূপের ঝরণা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্ত রূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।...আজ যা দেখছি, এই যে চারদিকে আমার যে কেউ আছে, যা কিছু আছে, এদের একদিন যে কেমন করে, এক পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারিনে—কিন্তু এটুকু জানি আমাদের এই চোখে দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে [illegible] তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি।

এখানে কবি চোখ বুজে মনের আবর্জনা দূর করে, 'রূপসাগরে ডুব দিয়ে' দেখবার কথা বলছেন, তার আভাস পাই আমরা [illegible] একটি বাক্যে—'চোখ তাকালে আঁধার দেখি, বুজলে সকল হয়', আর [illegible] 'কাঁপীর [illegible]' কথা :

> ক. [illegible]
> [illegible]।

অর্থাৎ, ([illegible]) [illegible] পেলেন, দেখ সে বিরহ-বেদনার [illegible] করছে।

খ.  তন্ ও জাঁ, ও জাঁ ও তন মসতূর নিস্ত
লায়কে কস্‌রা দিদে জাঁন মসতূর নিস্ত।

অর্থাৎ, দেহ থেকে আত্মা বা আত্মা থেকে দেহ তো সংগোপন বা প্রচ্ছন্ন নয়—কিন্তু বাধা এইখানে যে, আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করা (এখনও) মানুষের ভাল করে রফতো (দরইয়াফত) হয় নি।

গ.  ফিক্‌রত আযমাজী ও মুসতাক বলি বুওয়াদ
ঝুঁ আয়ই দূরসত্ মুশকিল হল বুওয়াদ।

অর্থাৎ, তোমার চিন্তা এখনও অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এর থেকে মুক্ত হ'লেই দৃষ্টির ক্ষীণতা আর থাকবে না, মুশকিল আসান হবে।

এইসব ভাব, অসীমের সঙ্গে সসীমের সম্পর্ক স্থাপনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা, সসীমের সীমা প্রসারণের বা অসীমের সঙ্গে মিলনের প্রয়াস, এগুলো অবশ্যই সূফীভাব। প্রাচ্যদেশে জন্মগ্রহণ করে কেউ মরমীভাব এড়িয়ে যেতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু রহস্য, সৃষ্টিরহস্য এসবই আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্গত—বাল্যকাল থেকেই বেহেশতের সুখ, দোজখের শাস্তি, পুলসিরাত বা বৈতরণী পার হওয়ার আবশ্যকতার কথা শুনতে শুনতে অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে সকলেরই ঔৎসুক্য জন্মে থাকে। তাতে আবার রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন দিওয়ান-ই-হাফিজের অমর গজলের অনুরাগী, তাঁদের বাড়ীতে নানা ভাষাভাষী অতিথির সমাগম হ'ত, গানের আসরও বসত। আর সেই যুগের বৃদ্ধেরা প্রায় সকলেই ফার্সী জানতেন, কারণ কিছুকাল আগেও ফার্সীই ছিল রাজভাষা। বিশেষতঃ কবীর, দাদু, বুল্লাশাহ এবং বঙ্গদেশেও লালন শাহ, পাগলা কানাই, মদন বাউল প্রভৃতি সাধকগণ পল্লীগানের মধ্য দিয়ে মানুষের সহজ ধর্ম প্রচার করে গেছেন—যাকে বিশেষভাবে ইসলামী সাম্যনীতি ও একেশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবিত পৌরাণিক ধর্মের রূপান্তর বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সাধক কবীরের একশত গানের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। পাশ্চাত্য মহলের বিচারে কবীর ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী কবি এবং রুমী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মরমী কবি বলে স্বীকৃত। রুমীর মসনবীতে গীতিধর্ম আর মরমীধর্মের একত্র সমাবেশ হয়েছে। বৈষ্ণব কবিতাও বিশেষভাবে গীতিধর্মী। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও গীতিধর্মের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় মরমীভাবের সংমিশ্রণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে উল্লেখ করেছেন (শিলাইদহ, ৮ মে, ১৮৯৩) যে, তিনি কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলেন না—এইটেই তাঁর জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এর থেকে অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়, কবিতাতেই তাঁর সবচেয়ে বড় বিস্তার। তবু অন্যান্য সমুদয় ক্ষেত্রেই তিনি কিছু না কিছু নতুনত্ব সঞ্চারিত করেছেন। জীবন ভরে তিনি অসীম আগ্রহ ঔৎসুক্য ও ধৈর্যের সাথে সত্যের সন্ধান করেছিলেন বলেই তিনি জীবন্তভাবে লোকাতীত ভাবাদিও প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাই রবীন্দ্ররচনায় বৈষ্ণবীয় গীতিধর্মিতার সাথে সূফীয় অতীন্দ্রিয়তার উজ্জ্বল ছবির একত্র সম্মিলন হয়েছে।

প্রতীকধর্মী নাটকগুলোতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত ভাব ও অনুভব প্রকাশের তাগিদে কবিকে মরমী ভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছে। অবশ্য এইসব ভাব সাধারণ কথায় বোঝানো সহজ নয়। কারণ, হয়তো কবির মনে কোনো অস্পষ্ট অথচ অখণ্ড প্রবলভাবের উদয় হয়েছে যা সাধারণ অভিজ্ঞতানির্ভর—যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তার উপযুক্ত ভাষা তৈরী হয় নি। রবীন্দ্রনাথের মত ভাষার ঐন্দ্রজালিককেও এসব ক্ষেত্রে উপমা, রূপক প্রভৃতির আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

মূলত এসব ব্যাপার অনির্দেশ্য—এক একজনের কাছে এর এক এক রকম অর্থ প্রতিভাত হয়। আর রঙ্গমঞ্চে এইসব ভাব ফুটিয়ে তুলতে হলেও অসাধারণ দক্ষ নাট্যাভিনেতার প্রয়োজন। এই কারণে সাধারণ নাট্যমঞ্চে, সাধারণ দর্শকের কাছে এসব নাটক অনেকখানি অসার্থক হয়ে পড়ে। তবু নিগূঢ় মৌলিকভাবের অঙ্কন হিসেবে এগুলো উচ্চস্থানের অধিকারী। লেখার যুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী বহুকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ এইরূপ প্রতীক ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে শারদোৎসব, ডাকঘর, রক্তকরবী ও রাজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্প—নিশীথে, সুভা, হৈমন্তী, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতির যেন একসঙ্গে দু'টি ধারা বয়ে চলেছে—একটা মানবলোকের দৈনন্দিন ঘটনাস্রোত দুঃখ-কষ্ট-ব্যর্থতা-প্রতারণা প্রভৃতি, আর-একটা যেন মানবাতীত রহস্যলোকের সঙ্গে কোলাকুলি ও সমঝোতা। দু'য়ে মিলে যেন মানবজীবনের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে। এই সুদূরের সুরটির জন্য এগুলোকে সুফীধর্মী বলে চিহ্নিত করা যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই সর্বাধিক পরিমাণে সুফীয় ভাবপ্রবাহ অনর্গল ধারায় নির্গত হয়েছে। এগুলোর ব্যাখ্যা করে উদাহরণ দিতে গেলে প্রবন্ধে কুলোবে না। তাই, অল্প কয়েকটি গীতিকবিতা ও গানের দু'-একটি কলি উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হব। আশা করি, এতেই সঙ্গীতরসিকদের পুরো কাব্যরূপ বা সঙ্গীতটা মনে পড়ে যাবে।

১. হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহপ্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি?
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান?

২. দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে
এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে
আমার পরাণ পলকে পলকে
চোখে চোখে তব পরশ মাগে॥

৩. যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি
ডাকো ডাকো।
তোমা হতে দূরে যে যায়—তারে তুমি
রাখো রাখো।
তৃষিত যেজন ফিরে তব সুধা-সাগরতীরে
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা
করাও হে পান॥

৪. বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে লও খেয়ার নেয়ে।
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি
ঘুচিয়ে এলেম কান্নাহাসি,
সন্ধ্যা বায়ে ক্লান্ত পায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।

৫. তুমি মোর আনন্দ হয়েছিলে আমার খেলায়
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি—আমি তোমার গান তো গাইনি।

৬. সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

৭. জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই—
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম—এমন ধন
আর নাহি যে তোমা সম।
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা—
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

৮. আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী
বলো কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি সুধাই ওগো বিদেশিনী, তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কি জানি কি আছে তোমার মনে।

৯. এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে
(তার) হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে।
নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে বাঁশিতে তান দাও হে পুরে
যে তান দিয়ে অবাক কর গ্রহ-শশীরে।

১০. তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যেন সদা পাই।

১১. আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন খ্যাপা সে
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন বাতাসে॥
গেল রে গেল বেলা পাগলের একি খেলা
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি, কেঁদে মরি
কোন হুতাশে॥

১২. যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায়
নিত্য বাজে।
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি॥

১৩. দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥...
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে॥

১৪. আমার একটি কথা বাঁশি জানে বাঁশিই জানে।
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥

# নজরুল-জীবন-কথা

কবি নজরুলই বাংলাদেশের বর্তমান সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক জাগৃতির প্রধান কবি। তাঁর পূর্ববর্তীরা মোটের উপর উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর জন্যই সাহিত্য রচনা করে গেছেন এবং কেবল তাঁদেরই কাছ থেকে সম্মান লাভ করেছেন। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ সে-সাহিত্য দ্বারা ততটা উদ্বুদ্ধ হয় নি। কিন্তু নজরুলের আবির্ভাবে সহসা যেন সাহিত্যের একটা নতুন দিক খুলে গেল। অসহযোগ আন্দোলনের মহাপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণ কবি নজরুলের ভিতরে যেন যুগ-বাণী খুঁজে পেল। জনগণের অস্পষ্ট আবেগ বা প্রাণচাঞ্চল্য যেন কবির মনোহর প্রাণমাতানো অথচ দৃঢ় বলিষ্ঠ ভাষার ভিতরে অপরূপ সার্থকতা লাভ করলো। তাই, নজরুল সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন।

কেমন করে এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো তা বুঝতে হ'লে নজরুলের বাল্যজীবন এবং প্রকৃতির দিকে লক্ষ করা দরকার। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে (১৮৯৯ ইংরেজীতে) কোনও এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। অর্থাভাবের জন্য ছেলেবেলায় তাঁর পড়াশুনার তেমন সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু ছেলেবেলায় তিনি নিজ গ্রামের মোক্তারবেশ কাজী ফজলে করীম সাহেবের কাছে ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন। নজরুলের বুদ্ধি প্রখর ছিল বলে মৌলবী সাহেব তাঁকে স্নেহ করতেন আর সেইজন্য এই ছেলে বলেই নজরুলও বেশখানিকটা মনোযোগ দিয়েই ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর এ শিক্ষা গজল-গান ও কাব্য রচনায় খুব কাজে লেগেছিল।

বর্ধমান অঞ্চলে "লেটো" নামে এক ধরনের আমোদ-প্রমোদের চলন আছে। জিনিসটা যাত্রাগান আর কবির লড়াই, এ দুয়ের এক রকম মিশ্রণ। এতে গ্রাম্য কবিরা কাব্যে নাটক রচনা করেন আর গ্রাম্য অভিনেতারা তাকে রূপায়িত করেন। দুইদলের মধ্যে কাব্যের লড়াই চলে এবং মধ্যস্থিত দ্বারা দলের শ্রেষ্ঠতা নির্ণীত হয়। কবি নজরুলের চাচা ছিলেন এ অঞ্চলের একটি দলের শ্রেষ্ঠ বা "গোদা" কবি এবং বালক নজরুল ছিলেন তাঁর উপযুক্ত সাগরেদ। নজরুল সম্বন্ধে তাঁর বরাবরই উচ্চ ধারণা ছিল। কৌতুক করে তিনি তাঁকে 'বেঙাচি' বলে ডাকতেন এবং প্রায়ই বলতেন,— "আমার বেঙাচি বড় হলে সাপ হবে।" "গোদা কবির" এ ভবিষ্যদ্বাণী কতদূর সফল হয়েছে তা দেখে বাঙালী জনসাধারণ আশ্চর্য হয়েছে।

মোটকথা ছেলেবেলা থেকেই অর্থ উপার্জনের জন্য নজরুলকে "লেটোর" দলে গান বাঁধতে এবং নাটক লিখতে হয়েছিল বলে পরবর্তীকালে সুরকার এবং সে সময়ে কবিরূপে তাঁর যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছিল। হয়ত এ জন্যই তিনি জনসাধারণের এত আপনার লোক হ'তে পেরেছিলেন। এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাল-কৈশোর অল্প বয়সেই নজরুলের তাঁর কাব্য-রচনা এত ভাল হতে শুরু হ'তে লাগলো যে, তিনি সিয়ারসোল, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া— এই তিনটি গ্রামে বড় বড় "লেটোর" দলে নাটক রচনার ভার পেয়ে গেলেন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক এবং 'মেঘনাদবধ' নামে একটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন।

বাল্যকালে নজরুল ইসলাম অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। এমন কি কৈশোর ও যৌবনেও সে দুরন্তপনা বা খামখেয়ালীর ভাব স্পষ্ট লক্ষ করা যেত। গ্রামবাসীরা তাঁর দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি অনেক রকম সাহায্য করে তাঁকে রানীগঞ্জের নিকটবর্তী শিয়ারশোল রাজ স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু লেটোর দলের স্বাধীন নজরুল স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে শীগগিরই হাঁপিয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসানসোলে চলে যান এবং এক রুটির দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কাজ করতে লেগে যান। এখানে খুব ভোরে উঠে তাঁকে রুটির ময়দা মাখতে হ'ত এবং সারাদিন দোকানে বসে রুটি বেচতে হ'ত। তিনি কোনোদিন পরিশ্রমে কাতর ছিলেন না এবং রুটির দোকানে নানা রকমের লোকের আনাগোনা ছিল বলে বোধহয় লোকচরিত্রের বৈচিত্র্য উপভোগ করতে পারতেন। কাজে কাজেই দোকানে ঠায় বসে থাকবার এক ঘেঁয়েমি তাঁর কাছে দুর্বহ মনে হয়নি। বিশেষতঃ রাতের বেলায় যা সামান্য অবসর পেতেন, সে সময়টা প্রাণভরে পুঁথি পড়ে কাটিয়ে দিতেন।

এই সময়ে কাজী রফিজউদ্দিন নামে মৈমনসিংহ জেলার এক ভদ্রলোক আসানসোলের দারোগা ছিলেন। তিনি নজরুলের চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি দেখে, তাঁকে সঙ্গে করে স্বগ্রামে নিয়ে যান এবং কাজীর সিমলা গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন। এখানেও স্কুল তাঁর ভাল লাগতো না। ভাল মানুষের মতো বাড়ী থেকে স্কুলে যাবার নাম করে বেরোতেন বটে, কিন্তু সারা দুপুর নদীতে মাছ ধরে, রাখালদের সঙ্গে খেলা করে, লোকের ক্ষেত নষ্ট করে ঘুরে বেড়াতেন। স্কুলে যাবার মাঝপথে এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তাতে হুঁকো কল্কে ঝুলানো থাকতো। সেখানে সঙ্গীদের নিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ধূমপান চলতো। আর স্কুলের ছুটি হলে ফিরতি ছাত্রদের সাথে বই কাঁখে করে শান্ত-শিষ্ট ছেলেটি হয়ে আসতেন। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় বাংলা রচনার বদলে চমকিত করে পদ্য রচনা লিখে তিনি পরীক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিলেন। যা'হোক, এইভাবে এখানে এক বছর কাটিয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরে এলেন। তারপর বছর খানেক ভবঘুরির পর নিজের ইচ্ছেতেই স্কুলে ভর্তি হয়ে কিছুদিন বেশ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলেন। এই সময় বেধে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। তিনি কাউকে না জানিয়ে যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়ে সাধারণ সৈনিকভাবে মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ করতে চলে যান। সেখানে কিছুদিনের মধ্যে কর্মদক্ষতার গুণে তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বাংলার মাটির সহজ সুরতানের সাথে এবার মার্চের সুর সংযুক্ত হ'ল। কবি নজরুলের কয়েকটি অননুকরণীয় কবিতার ছন্দের গতি ও মৌলিক শব্দবিন্যাসের সূত্রসূত্র এখানেই খুঁজে পাওয়া যায়।

এই হোল নজরুল সাহিত্যের প্রকৃতির মূল। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের যুদ্ধের ডাইরি বা সাহিত্যে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। তখনই অনেকে তাঁর মধ্যে বিপুল সম্ভাবনার বীজ দেখতে পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে তিনি মোসলিম ভারত, সওগাত, প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি নানা কাগজে অজস্র কবিতা প্রকাশ করেছেন। নিজেও কিছুদিন ধূমকেতু নামে একখানি বিদ্রোহী সাপ্তাহিক পত্রিকা চালিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু'র আবির্ভাবকে এইভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন :

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন।"

এই সময় ধূমকেতুতে লিখিত "আগমনী" নামে একটি কবিতা গভর্নমেন্টের কাছে আপত্তিকর বলে বোধ হওয়াতে নজরুল ধরা পড়ে হুগলী জেলে শাস্তিভোগের জন্য প্রেরিত হলেন।

এইখানে নজরুল :

"(এই) শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল,
(এই) শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।"

—এই মন্ত্রে জেলের অন্য কয়েদীগণকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। জেল কর্তৃপক্ষও শক্তির মাত্রা চড়াতে লাগলেন। পরিশেষে নজরুলও চরমপন্থা অর্থাৎ অনশনব্রত অবলম্বন করলেন। এই সময় কবিকে, দেশবন্ধু প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পত্র ও টেলিগ্রামযোগে তাঁকে অনশন ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অনেক বন্ধু-বান্ধব কিন্তু অনুরোধ করেও কবিকে সম্মত করাতে পারেন নি। অবশেষে চল্লিশদিন পর কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন।

জেলে থাকাকালেও নজরুল বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা পাঠাতেন। কিন্তু একমাত্র প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া কেউ মূল্য দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কথা চিন্তা করেন নি। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বসন্ত" নাটিকাটি "শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম— স্নেহভাজনেষু"— এই পাঠে উৎসর্গ করেন। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, হিন্দুসমাজের সাহিত্যিক মনীষীরা তাঁকে কতটা সম্মান ও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। হুগলী জেল থেকে তাঁকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এর কিছুদিন পরে তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহিত জীবনে তিনি কয়েক বছর হুগলী ও কৃষ্ণনগরে কালযাপন করেন, শেষে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি 'লাঙল' পত্রিকায় 'সাম্যের গান', 'চাষীদের গান', 'সব্যসাচী' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা লিখে উক্ত পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। নজরুলের জাতীয়তা-উদ্বোধক কবিতার মধ্যে—

"অগ্রপথিক হে সেনাদল,
জোরকদম চল্ রে চল্।" (জিঞ্জীর)
"চল্ চল্ চল্! ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্" (সন্ধ্যা)

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে, রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার"।

—প্রভৃতি সুবিখ্যাত কবিতায় যে অকৃত্রিম উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্যই যেন চমক মেরে 'অর্ধচেতনদের' জাগিয়ে তোলে। নজরুল পৌরুষের কবি, বলদৃপ্ত কবি, বলদৃপ্ত যৌবনের কবি। বিদ্রোহী কবিতায় তিনি চির-উন্নত শির-বীরের যে বন্দনা গেয়েছেন, তার ঝঙ্কার অনুরণনের ভিতর দিয়ে বিশ্বসাহিত্যকেও স্পন্দিত করে তুলেছে। যৌবনের দুর্নিবার শক্তি ও অবশ্যম্ভাবী জয় সম্বন্ধে কবির মনে সন্দেহমাত্র নেই। তাই তিনি গেয়েছেন—

"এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ
কে রোধিবে এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ

> যে সিন্ধুজলে ডাকিয়াছে বান— তাহার তরে এ চন্দ্রোদয়,
> বাঁধ বেঁধে ঘির আজো নালা ডোবা, চাঁদের উদয় তাদের নয়।"

এখানে শেষ দুই লাইনে কবি দুঃসাহসিক নবযুগের আহ্বান করেছেন— "পচা অতীত" নিয়ে পড়ে থাকলে আর চলবে না। এই কথাই আর একটু পরিষ্কার করে পরে বলেছেন—

> "জিঞ্জীর পায়ে দাঁড়ে বসে চিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল
> আকাশের পাখী! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল!"

যে কোনোও রকমের বন্ধনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মুক্তির স্বাদ লাভ করাই শক্তিমান যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম। তাই নজরুল গেয়েছেন—

> "গাহি তাহাদেরি গান
> বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।
> গুমরি কেঁদে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
> ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুটি চেপে।

এ সমস্তকেই তাঁর "বিদ্রোহী" কবিতার ভাষ্য বলা যেতে পারে। কবির ফরিয়াদ সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিখিল বেদনায় বিধাতার বিরুদ্ধে। তাই বলেছেন—

> "মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, (আমি) সেইদিন হব শান্ত
> যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না।
> অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
> বিদ্রোহী রণক্লান্ত (আমি) সেইদিন হব শান্ত।"

যৌবনশক্তেই তিনি পরাধীনতার বন্ধন মোচন করতে চান, সংস্কারের জগদ্দল পাথর ভেঙে চুরমার করতে চান, জগৎসংসারে, ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাই সর্বদেশের মুক্তি-সাধক বীরপুরুষেরাই তাঁর অতি আপনার জন। তাই চিরজীব জগলুল, রীফ সর্দার আবদুল করীম, খালেদ, আমানুল্লাহ, আনোয়ার, "পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই" তাঁর এত প্রিয়। "কত পারস্য, কত রোম গ্রীক রুশ"-এর জাগরণ দেখে কবির মনে আর আনন্দ ধরে না— এ সবের ভিতরে কবি যেন নিজের দেশেরও মুক্তির ইঙ্গিত দেখে আশান্বিত হয়েছেন।

দেশের মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমান ও নারীর সমবেত প্রচেষ্টার দিকে কবি নজরুল বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি মানবতার সাধক, সম্প্রদায় হিসাবে মানুষকে ভাগ করে দেখা তাঁর কাছে অনাবশ্যক কুসংস্কার বলে গণ্য। তাই তিনি গেয়েছেন—

> "হিন্দু না ও মুসলিম, ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
> কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।"

প্রাণের স্রোতে নজরুল সমস্ত সংস্কার, কলুষ কালিমা ভাসিয়ে দিয়ে খুশী মনে যে উৎসবময় বেহেশতের কল্পনা করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

> "আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় প্রাণের বুলন্দ দরওয়াজায়
> "তাজা-ব তাজা"র গাহিয়া গান চির তরুণের চির মেলায়।
> আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।"

দেশের নবজাগরণের অগ্রদূত নজরুল ইসলাম বলিষ্ঠ আশাবাদী। তিনি দিকে দিকে স্বাধীনতার বিজয়-কেতন দেখে উল্লসিত। বিশেষ করে মৃতপ্রায় ভারতীয় মুসলিমদেরও তিনি আশার বাণী শুনিয়েছেন— ভোরের সানাই বেজে উঠেছে, নিদমহলার আঁধার পরে উষার

আজান শুনা যাচ্ছে, কারবালাতে বীর শহীদান আঁজলা ভরে প্রাণ নিয়ে এসেছে আর ভয় নেই— নওজওয়ানীর সুরখ্‌নুরে আসমান জমীন রঙীন হতে চলেছে।

ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের ১৯২৭ সালের বার্ষিক অধিবেশনে, কবি তরুণদের সম্ভাষণ জানাচ্ছেন এইভাবে—

"প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু,
ভাঙ্গা ঐ দেউল চূড়ে উঠল বুঝি নৌ চাঁদের কালি।
খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরী,
লাল এ লায়লী লোকে মজনু হরদম চালায় পিয়ালী।"

নজরুল প্রকৃতই সব্যসাচীর মত ডাইনে বাঁয়ে সমান লক্ষ রাখতে পেরেছেন— তিনি হিন্দু ও মুসলিম পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন! জনসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ফার্সী শিক্ষা এবং লেটো গানের পালা রচনা— ছেলেবেলাকার এইসব প্রস্তুতি তাঁর কবিতায় এবং জীবনেও বিশিষ্টতা দান করেছে। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে; একদিকে যেমন—

"এল কি অলখ পথ বেয়ে তরুণ হারুন আল-রশীদ,
এল কি আল-বেরুণী-হাফিজ, খৈয়াম, কায়েস, গজ্জালী।
শানাইয়া ভায়রোঁ বাজায় নিদমহলায় জাগল শাহজাদী,
কারুণের রূপার পুরে নূপুর পায়ে আসল রূপওয়ালী।" (জিঞ্জীর)

অন্যদিকে তেমন—

"আমি ইন্দ্রাণী সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,
মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধির।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধনহারা ধারা গঙ্গোত্রীর।"

(অগ্নিবীণা)

এ পর্যন্ত কবির স্বদেশী কবিতা এবং গীতিকবিতার কথাই বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ভক্তি-রসের কীর্তন এবং ইসলামী সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুলের দানের কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি গানের পর গান রচনা করে, তাতে নিত্যি নতুন সুর দিয়েছেন। গানের অজস্রতায় নজরুল রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন— এমন কি শোনা যায় পৃথিবীতেই অপর কোনও কবি এত গান রচনা বা এত গানে সুর যোজনা করেন নি। এ নৈপুণ্যও তাঁর বাল্যশিক্ষার ফল। কবিতায় যেমন তিনি রবীন্দ্রযুগের মানুষ হয়েও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সঙ্গীতেও তেমনি উর্দু, ফার্সী সুর, শব্দ এবং ঢং-এর সমাবেশ করে বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভাষা ও ভাবের তেজোময় লালিত্যে এবং আকস্মিক সুরবৈচিত্র্যে নজরুলসঙ্গীতের তুলনা নেই। নজরুল যদি আর কিছু না লিখে শুধু 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'এর গানগুলি রেখে যেতেন, তবু তাঁর যশ অমর হয়ে থাকত। নজরুলকে গান রচনা করতে দেখেছি— একদিকে হার্মোনিয়ামে সুর দিচ্ছেন, অন্যদিকে সেই সুর আশ্রয় করে বাণী নির্গত হচ্ছে, আবার বাণীর ভাবরূপকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য সুর নব নব মূর্ছনায় ফেটে পড়ছে। গানের ভিতর দিয়ে আমরা প্রধানতঃ তাঁকে প্রেমের কবি ও ব্যথার কবি রূপে দেখতে

পাই। নজরুলের শিশুপুত্র বুলবুল চার বৎসর বয়সে বসন্ত রোগে মারা যায়। সেই বেদনার ধাক্কায় নজরুল নিখিল বেদনাকে আরও নিবিড়ভাবে অনুভব করেন। তাই তিনি গেয়েছেন—

"এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছে জলে কমল
এ যে ব্যথারাঙ্গা হৃদয়, আঁখিজলে টলমল।"

নজরুলের গান সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা যায় এই যে, তিনি কেবল গজল বা ঠুংরী গানই রচনা করেন নি, ওস্তাদী ধরনের খেয়ালগানও বহু রচনা করেছেন। এক সময় মুর্শীদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে তাঁর কলিকাতাস্থ বেনেপুকুরের বাসায় উপস্থিত হয়ে তিনি রীতিমত অধ্যবসায়ের সাথে ওস্তাদী সঙ্গীত অভ্যাস করেন। কেবল তাই নয়, নির্ঝরিণী, বেনুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা নাম দিয়ে কয়েকটি রাগিণীও সৃষ্টি করেন। এর থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর অধিকার কতখানি ছিল সে বিষয় আন্দাজ করা যায়।

কবিতা এবং গান ছাড়াও নজরুল উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক এবং শিশু-সাহিত্য লিখেছেন। এ সমস্তের পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবরে কুলোবে না।

কবি নজরুল তিনবার ঢাকায় এসেছেন। তখন তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয়েছিল। অমন দিলখোলা হাসির হররা খুব কমই দেখা যায়। তাঁর হাসির তোড়ে সমস্ত মজলিশ গুলজার হয়ে যেতো, হরদম চা আর পান জোগাতে পারলে তিনি বেদম গান গাইতেন। আবার দাবার গুঁটি নিয়ে বসলে ঘন্টার পর ঘন্টা দাবা খেলেই কাটিয়ে দিতেন, কিংবা হাত পেতে সামনে দাঁড়ালে তিনি একের পর এক রেখা বিচার করে ভাগ্য গণনা করতে লেগে যেতেন। খেয়ালী নজরুল কখন কোথায় যাবেন, আর কখন ফিরবেন সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কাজেই তাঁর খাওয়া দাওয়ার সময় কখনও তাঁকে বিচলিত হতে দেখি নি। তিনি সত্যিই ছিলেন অনিয়ম "উচ্ছৃঙ্খল।" কিন্তু এই অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরেও শিশুর মত সরল স্নিগ্ধ প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর কবিমনে দৈন্য নেই—সত্যিই সাম্যবাদী মন। আয় ব্যয়ের হিসাবনিকাশ তাঁর কাছে তুচ্ছ। যখন নিজের সম্বল ফুরিয়ে গেছে, তখন অকুণ্ঠভাবে বন্ধু-বান্ধবের সম্বল ব্যবহার করবেন, এই তাঁর কাছে অতিশয় স্বাভাবিক বলে মনে হয়। পৃথিবীর হিসেবী-দৃষ্টিতে এজন্য তাঁকে অনেক সময় নিন্দনীয় হতে হয়েছে, কিন্তু এসব ব্যাপারে তিনি কখন ভ্রূক্ষেপই করেন নি।

আমার মনে হয়, কবি আজন্ম স্নেহ-কাঙাল। স্নেহ ভালবাসা তিনি যাচ্ঞা করে ফিরেছেন— বহুস্থানে, পেয়েছেনও বহুলোকের কাছ থেকে— অপর্যাপ্ত। কিন্তু তাঁর অতলস্পর্শ সর্বস্বখোয়ানো প্রেমিক মন তাতে তৃপ্ত হতে পারে নি। সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে সহজ অধিকারে কেউ তাঁকে আপন করে নিতে পারে নি। এ আক্ষেপ, বেদনা, অভিমান তাঁর পূজারিণী', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', 'আড়াল' প্রভৃতি গীতি-কবিতায় এবং বহু সঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

নজরুলের দানে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত হয়েছে। তাঁর সঙ্গীত আবৃত্তি এবং দেশাত্মবোধক কবিতা বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। তাঁর সাহিত্যের চুল-চেরা বিচার করবো না— কেবল এইমাত্র বলবো যে তাঁর ডঙ্কায় ঘুমন্ত বাংলা জেগে উঠেছে, তাঁর কাব্যমাধুরীতে গোটা সমাজ আনন্দ পেয়েছে, তাঁর সঙ্গীতমূর্ছনায় দেশবাসী রসাপ্লুত হয়েছে। এই যথেষ্ট। যেখানে জাগ্রত জনগণ আনন্দে, রসে অভিষিক্ত হয়েছে, সেখানে চিন্তার খোরাক খতিয়ে দেখা বা তাঁর যশের স্থায়িত্ব নির্ণয় করতে বসা মুলতুবি থাকুক। তবে দুঃখ এই যে, তিনি শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁর দানের উৎস বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। প্রার্থনা করি, তিনি নিরাময় হয়ে আরও দীর্ঘকাল সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্লাবনে বঙ্গভূমি অভিষিক্ত করুন।

পাই। নজরুলের শিশুপুত্র বুলবুল চার বৎসর বয়সে বসন্ত রোগে মারা যায়। সেই বেদনার ধাক্কায় নজরুল নিখিল বেদনাকে আরও নিবিড়ভাবে অনুভব করেন। তাই তিনি গেয়েছেন—

"এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছে জলে কমল
এ যে ব্যথারাঙা হৃদয়, আঁখিজলে টলমল।"

নজরুলের গান সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা যায় এই যে, তিনি কেবল গজল বা ঠুংরী গানই রচনা করেন নি, ওস্তাদী ধরনের খেয়ালগানও বহু রচনা করেছেন। এক সময় মুর্শীদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে তাঁর কলিকাতাস্থ বেনেপুকুরের বাসায় উপস্থিত হয়ে তিনি রীতিমত অধ্যবসায়ের সাথে ওস্তাদী সঙ্গীত অভ্যাস করেন। কেবল তাই নয়, নির্ঝরিণী, বেনুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা নাম দিয়ে কয়েকটি রাগিণীও সৃষ্টি করেন। এর থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর অধিকার কতখানি ছিল সে বিষয় আন্দাজ করা যায়।

কবিতা এবং গান ছাড়াও নজরুল উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক এবং শিশু-সাহিত্য লিখেছেন। এ সমস্তের পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবরে কুলোবে না।

কবি নজরুল তিনবার ঢাকায় এসেছেন। তখন তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয়েছিল। অমন দিলখোলা হাসির হররা খুব কমই দেখা যায়। তাঁর হাসির তোড়ে সমস্ত মজলিশ গুলজার হয়ে যেতো, হরদম চা আর পান জোগাতে পারলে তিনি বেদম গান গাইতেন। আবার দাবার গুঁটি নিয়ে বসলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাবা খেলেই কাটিয়ে দিতেন, কিংবা হাত পেতে সামনে দাঁড়ালে তিনি একের পর এক রেখা বিচার করে ভাগ্য গণনা করতে লেগে যেতেন। খেয়ালী নজরুল কখন কোথায় যাবেন, আর কখন ফিরবেন সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কাজেই তাঁর খাওয়া দাওয়ার সময় কখনও তাঁকে বিচলিত হতে দেখি নি। তিনি সত্যিই ছিলেন অনিয়ম "উচ্ছৃঙ্খল।" কিন্তু এই অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরেও শিশুর মত সরল স্নিগ্ধ প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর কবিমনে দৈন্য নেই—সত্যিই সাম্যবাদী মন। আয় ব্যয়ের হিসাবনিকাশ তাঁর কাছে তুচ্ছ। যখন নিজের সম্বল ফুরিয়ে গেছে, তখন অকুণ্ঠভাবে বন্ধু-বান্ধবের সম্বল ব্যবহার করবেন, এই তাঁর কাছে অতিশয় স্বাভাবিক বলে মনে হয়। পৃথিবীর হিসেবী-দৃষ্টিতে এজন্য তাঁকে অনেক সময় নিন্দনীয় হতে হয়েছে, কিন্তু এসব ব্যাপারে তিনি কখন ভ্রূক্ষেপই করেন নি।

আমার মনে হয়, কবি আজন্ম স্নেহ-কাঙাল। স্নেহ ভালবাসা তিনি যাচ্ঞা করে ফিরেছেন— বহুস্থানে, পেয়েছেনও বহুলোকের কাছ থেকে— অপর্যাপ্ত। কিন্তু তাঁর অতলস্পর্শ সর্বস্বখোয়ানো প্রেমিক মন তাতে তৃপ্ত হতে পারে নি। সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে সহজ অধিকারে কেউ তাঁকে আপন করে নিতে পারে নি। এ আক্ষেপ, বেদনা, অভিমান তাঁর পূজারিণী', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', 'আড়াল' প্রভৃতি গীতি-কবিতায় এবং বহু সঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

নজরুলের দানে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত হয়েছে। তাঁর সঙ্গীত আবৃত্তি এবং দেশাত্মবোধক কবিতা বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। তাঁর সাহিত্যের চুল-চেরা বিচার করবো না— কেবল এইমাত্র বলবো যে তাঁর ডঙ্কায় ঘুমন্ত বাংলো জেগে উঠেছে, তাঁর কাব্যমাধুরীতে গোটা সমাজ আনন্দ পেয়েছে, তাঁর সঙ্গীতমূর্ছনায় দেশবাসী রসাপ্লুত হয়েছে। এই যথেষ্ট। যেখানে জাগ্রত জনগণ আনন্দে, রসে অভিষিক্ত হয়েছে, সেখানে চিন্তার খোরাক খতিয়ে দেখা বা তাঁর যশের স্থায়িত্ব নির্ণয় করতে বসা অবান্তর থাকুক। তবে দুঃখ এই যে, তিনি শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁর গানের উৎস বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। প্রার্থনা করি, তিনি নিরাময় হয়ে আরও দীর্ঘকাল সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্লাবনে বঙ্গভূমি অভিষিক্ত করুন।

# মানুষের কবি নজরুল

সকল কবিই তো মানুষের জন্য কাব্য লিখে থাকেন। তাহলে আর 'মানুষের কবি' বলে কবিকে বিশেষিত করবার তাৎপর্য কি? প্রথমেই এ-কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আমরা সামাজিক কারণে মানুষকে নানা ভাগে ভাগ করে থাকি, যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইংরেজ, ধনিক, বণিক, শ্রমিক, আশরাফ, আতরাফ, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, রাজা, প্রজা, উজির, নাজির ইত্যাদি। কোন কোন কবি এইসব শ্রেণীর এক বা একাধিক বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে বা মনে মনে প্রধান বলে গণ্য করে কাব্য লিখে থাকেন। এঁরা হচ্ছেন শ্রেণীবিশেষের কবি। আর যাঁরা শ্রেণীবিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে সকল মানুষের জন্য কাব্য লেখেন তাঁদেরকে মানুষের কবি বলা যায়। নজরুল ইসলাম শ্রেণী-প্রাধান্য স্বীকার করেননি। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার ও সম্ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন এবং সকল মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম, বীরধর্ম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এজন্য তাকে 'মানুষের কবি' বলে আখ্যাত করা যায়।

নজরুল ইসলাম জীবনে জাত-বিচার মানেননি—ইসলামের প্রধান শিক্ষা সাম্যের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। জাত-বিচারের ক্ষুদ্রতাকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছেন :

> জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
> ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
> হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির প্রাণ,
> তাই তো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে এক শ' খান।

(জাতের বজ্জাতি, 'বিষের বাঁশী')

ইসলামী শিক্ষার বিধান তিনি উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন :

> আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
> নাহি বড়-ছোট সকল মানুষ এক সমান,
> রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
> কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
> সকল কালের কলঙ্ক তুমি, জাগালে হায়
> ইসলামে তুমি সন্দেহ।

(ঈদ মোবারক, 'জিঞ্জীর')

এখানে, যেসব ভাগ্যবান সচরাচর নিজেদের 'বড়ত্ব' নিয়ে ছোটদের ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কবির তিক্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় যে বড়ত্বের বড়াই নেই, কবি সেই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

আবার যে-সব ভাগ্যবান বড় হয়েও বড়াই করেন না, তাঁদের প্রতি নজরুলের অপরিসীম শ্রদ্ধার নমুনা দেখুন :

মানুষেরে তুমি করেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।
বন্ধু গো প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করতে গিয়া
উঠে না উর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া।

(ওমর ফারুক, 'জিঞ্জীর')

ওমর ফারুকের মানব-প্রীতি কবিকে কী অপরূপভাবে বিমুগ্ধ করেছে, এবং উপরের কবিতায় কী অপূর্বভাবে তা প্রকাশ হয়েছে! হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে নজরুল সব উঁচু-নীচু সমান করে দিতে চান। তাঁর ধর্মই হৃদয়ের প্রেমধর্ম যে-প্রেম মানুষের কল্যাণে উৎসাহিত হয়ে উঠে। তাই তিনি লিখেছেন :

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজপ্রাণ।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই—
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

(সাম্যবাদী, 'সর্বহারা')

মানব-প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম এসে হৃদয়-কন্দরে মিলিত হয়েছে। বিশ্ব সেখানে কোলাকুলি করে। এই হচ্ছে কবির বাণী এবং ইসলামের মর্মের রূপ।

আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে সামাজিক বা কুলমর্যাদার মিথ্যা অহংকার। কবি এই ভেদাভেদ মিলিয়ে দিতে চান। তিনি 'যুগবাণী'তে লিখেছেন, "সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচুনীচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব-মানবতার যুগে যিনি এমনি করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি।"

এখানে মনুষ্যত্বের অর্থ হচ্ছে মানব-প্রীতি আর পুরুষকারের অর্থ হচ্ছে বীরধর্ম। নজরুলের মধ্যে আমরা একাধারে প্রেমের কোমলতা আর বীরত্বের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। ইসলামের ভিতর কবি দেখেছেন এক বিশ্বব্যাপী আযাদীর আহ্বান। তাই তিনি বলেছেন :

অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনি ক' দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙ্গিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন, ভয়, লাজ
এল যে কোরান, এল যে রে নবী ভুলিনি সে সব আজ।

(আজাদ, 'নূতন চাঁদ')

কোরানের এই মুক্তিবাণী—তৌহিদের যা মর্মকথা, সেইদিকে কবি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। আমার মনে হয়, অন্য কোন কবিই তৌহিদের এই 'অবন্ধনরূপ' এত স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারেননি। এইটি নজরুলের একটি বিশেষ দান। বন্ধন-লাজ-ভয় জয় করবার সাধনা যাঁরা করেছেন সেই বীরদের গান নজরুল গেয়েছেন :

গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

সেদিন নিশীথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে-যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথ জাগি।

আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে-জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব-জগতের দূর-সন্ধানী অসীমের পথচারী,
যার ভয়ে জাগে সদাসতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী।

(আমি গাহি তার গান, 'সন্ধ্যা')

নজরুল বর্তমানকে যা পেয়েছেন, তার থেকে এক উন্নততর নতুন বর্তমান গড়ে তুলবার প্রয়াসী। মানবতার কল্যাণ-রথ সর্বদা সামনের দিকে চালাতে হবে, পিছে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে কোন লাভ নেই। তাই তিনি বলতে পেরেছেন :

যাক্ রে তখ্ত তাউস,
জাগ্ রে জাগ্ বেহুশ,
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য, কত রোম গ্রীক রুশ;
জাগিল তারা সকল
জেগে ওঠ্ হীনবল,
আমরা গড়িব নতুন করিয়া ধুলার তাজমহল।

(চল্ চল্ চল্, 'সন্ধ্যা')

নজরুল আশার কবি—শুধু বৈষয়িক ক্ষেত্রে নয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও। নজরুলের প্রেমিকা হচ্ছেন এক "শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত সুন্দরী"। সর্বদাতার মিলনের জন্য কবি অগ্রসর হচ্ছেন, এক কূলে নৌকা না ভিড়লেও আর এক কূলে ভিড়তে পারে। সকল কূলই সেই এক প্রেমময়ীর। নজরুলের একটা গান আছে :

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে কেউ
ভুলিতে গায় গীতি ॥

কেউ শীতল জলদে হেরে
অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার
শুষ্ক কুঞ্জবীথি ॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার
চির দুঃখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে, চায়
নব চাঁদের তিথি ॥

এখানে আশাবাদী নজরুলের মনের টান কোন্ দিকে, তা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভেদাভেদ চূর্ণকারী মানবতার কার্যকে আমরা ভালোবাসি। কবি বহুবার বলেছেন, "শ্রদ্ধা আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু ভালবাসাই দুর্লভ।" তাঁর আশা ধ্বনিত হয়েছে 'পূজারিণী'র কয়েকটা লাইনে :

ভেবেছিনু বিশ্ব যারে পারে নাই,
তুমি নেবে তার ভার হেসে,
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন অবহেলে,
শুধু ভালবেসে।

কবির এ আশা পূর্ণ হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্য যে কোনো কবির চেয়ে মানুষের কবি নজরুলকে যে তাঁর গুণগ্রাহী স্বদেশবাসী অনেক বেশী অন্তরঙ্গ বলে অনুভব করে থাকেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯৫৯

# নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা

কবি নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবি বলে পরিচিত। এর প্রধান কারণ তাঁর 'বিদ্রোহী' নামক অসাধারণ শক্তিমত্তার কবিতা। তাছাড়া রাজ-বিদ্রোহ, সমাজ-বিদ্রোহ, ধর্ম-বিদ্রোহ, এককথায় প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ অভিযান-সূচক অজস্র কবিতা ও গদ্যরচনা তাঁকে 'বিদ্রোহী' কবি বলে চিহ্নিত করেছে। অবশ্য 'বিদ্রোহী' কবিসত্তার একটি দিক মাত্র; এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট আরও অনেক দিক আছে। আজ প্রধানতঃ কবির 'বিদ্রোহী' দিকটা নিয়েই সামান্য আলোচনা করব।

পৃথিবীটা অনেক পুরাতন। সুতরাং ইতিহাস ঘেঁটে যে কোনও ভাবের পূর্বাভাস বা নজীর বের করা যাবে তা খুবই স্বাভাবিক। এতে 'নতুনের' মর্যাদা হানি হয় না। তবু কেউ কেউ এ ধরনের চেষ্টাও করছেন। অবশ্য নতুনের যদি কোনো বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকে, তবেই তা সার্থক। নজরুলের বিদ্রোহে কিছু বিশিষ্টতা আছে কিনা তা-ই বিচার্য।

ঋগ্বেদে দেবী সূক্তে ঋষিকন্যা বাক্ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে বলে উঠেছিলেন,*—'আমি রুদ্রগণরূপে ও বসুগণরূপে বিচরণ করি, আমি আদিত্যসমূহরূপে এবং সকলদেবরূপে (বিচরণ করি) আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি; আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করি; আমি অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ধারণ করি।' এখানে বাক্ নিজের সত্তার সঙ্গে পরম ব্রহ্মের একাত্মতা অনুভব করে নিজেকে পরম ব্রহ্মের সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী বলে জ্ঞান করছেন। তাই তিনিই একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশরবি, বিশ্বদেব। তিনি সূর্য ও পবনকে, ইন্দ্র ও অগ্নিকে এবং সূর্যের রথের বাহক অশ্বিনী কুমারদ্বয়কেও চালনা করেন। এই 'অহংব্রহ্ম' সূচক সূক্ত বিদ্রোহের নয়, আত্মচেতনার। মনসুর হল্লাজের 'আনাল হক'-ও উপরোক্ত 'অহংব্রহ্মের'ই অনুরূপ। হয়তো বা এর মধ্যে 'ফানা-ফিল্লাহ' বা বৌদ্ধ 'নির্বাণের' ধারণাও যুক্ত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ মানবজাতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেছেন : 'অবতারদের মধ্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ ও খৃষ্টেরা "আমি"-রূপ অনন্ত-বিস্তৃত প্রচণ্ড মহাসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গমাত্র।'—অর্থাৎ বিগত, সমাগত, অনাগত সমস্ত মনুষ্যকুল মিলে এক অখণ্ড বিপুল সম্ভাবনাময় প্রবল সত্তা; সকল মানুষই তার অনন্ত সাধনার গৌরবের ভাগী। এখানেও শক্তির প্রকাশ, বিদ্রোহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের :

> ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
> ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ,
> আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

---

* অহং রুদ্রেভির্ব সুভিশ্চরাম্য হমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহংমিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।

কিংবা—

শিকল-দেবীর ওই যে পূজা-বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদী।
ঝড়ের মতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশ খানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলা-ঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত আয় রে আমার কাঁচা।

এখানে সমাজসংস্কার এবং বিদ্রোহের আহ্বান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কবি নিজে যেন রণে অবতীর্ণ হ'তে চাচ্ছেন না, তাই তরুণদের আকুল স্বরে ডাক দিয়েছেন পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙে বীরের মত বেরিয়ে আসবার জন্য। পাশ্চাত্য কবি সাহিত্যিক বা কর্মীদের দৃষ্টান্ত থেকেও অবশ্য নজীর দেখানো যেতে পারে; কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব থাকায় সে চেষ্টা আর করব না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নজরুলের যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে তাই দেখা যাক।

প্রথম পর্যায়ে :

বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির
ওই শিখর হিমাদ্রির।

কবি এখানে শুধু ব্যক্তি হিসেবে নিজের অপরাজেয় উন্নতশিরের কথাই বলছেন না, বরং সমস্ত দেশবাসীকে বা বিশ্ববাসীকে আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন। এখানে 'মম শির' মানে সমগ্র মানবজাতির শির। কবি নিজের ভিতরে যে শক্তি অনুভব করেছেন, তাই সঞ্চারিত করতে চাচ্ছেন সকলের ভিতরে। হিমাদ্রিশিখরে যে দেবতাদের অধিষ্ঠান, তাদের শক্তি প্রকাশিত হয় অগ্নি-বজ্র-প্লাবন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রূপে। মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় কবির ক্ষমতা এদের শক্তিকেও পরাজিত করে।

এ শুধু কথার কথা নয় গভীর আত্মপ্রত্যয়ের বাণী :

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক, দ্যুলোক, গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি
বিশ্ব-বিধাত্রীর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজ-টীকা
দীপ্ত জয়শ্রীর।

বল বীর

আমি চির-উন্নত শির!

এখানে 'রুদ্র ভগবান' কথাটা রয়েছে, এর এক অর্থ, সংহার-মূর্তি শিব, আর এক অর্থ একাদশ সংখ্যার গণ-দেবতা। দুই অর্থই খাটে। প্রথম অর্থে ধ্বংসের মধ্যে মঙ্গলের, দ্বিতীয় অর্থে হয়তো সংঘবদ্ধ জনসমাজের বিপুল ক্ষমতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশ্ববিধাতা মহাকাশ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, ভূলোক, দ্যুলোক, গোলোক এবং আরশ নির্মাণ করেছেন। আমি রুদ্র ভগবান (পৃথিবীর বুকে) নতুন সৃষ্টি সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি দ্বারা বিশ্ববিধাত্রীকে চমৎকৃত করে দিই। আমার জয় হয়েই রয়েছে, আমার ললাটে দীপ্ত জয়শ্রীর রাজ-রাজটীকা ঝলমল করছে।

এতক্ষণ কেবল শক্তির চেতনা আর আত্মবিশ্বাসের কথাই হ'লো। এখন এই শক্তির প্রকাশ কেমন ক'রে হ'বে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তারই বর্ণনা হচ্ছে :

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি নাকো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি,
আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—চির উন্নত মম শির!

বিশ্ববিধাত্রীর 'বিদ্রোহী' পুত্রের এই ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ডের হেতু কি, ক্রমে ক্রমে তা প্রকাশ পাবে। এখানে বলা হচ্ছে, বিশ্ববিধাত্রী মানুষের মনোরাজ্যে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্যায় রকম অসামঞ্জস্যের বীজ বপন করে রেখেছেন যার ফলে পৃথিবীতে শাসন, শোষণ, উৎপীড়ন চলছে, তারই বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ। তাই নিয়ম কানুন শৃঙ্খল ভাঙবার কথা উঠেছে। আইনের নামে যে অনিয়ম চলেছে সে সব দণ্ড ভণ্ড করে দিতে হবে। জীবনানন্দের প্রাচুর্যে কবি সমস্ত বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করে দিতে চান। তাই তৃতীয় পর্যায়ে বিবিধ উপমায় কবি বলেছেন :

আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘূর্ণি
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই,
আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল;
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি ছমকি
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি,
ফিং দিয়া দিই তিন দোল;
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,

আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি শাসনত্রাসন, সংহার
আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—আমি চির-উন্নত শির!

এই ভাঙনের মধ্যে একটা খেয়ালী রূপও রয়েছে, সে খেয়ালীপনা প্রায় উন্মত্ততার শামিল। ভাঙচুরের পালা আরম্ভ হলে বেছে বেছে সন্তর্পণে ভাঙা হয়ে ওঠে না। কালবৈশাখীর মত নির্বিচারে ভাঙাই প্রশস্ত। তাই বলা হয়েছে 'আমি উষ্ণ চির-অধীর'।

এই মাথা গরমের নামই হচ্ছে উন্মাদ ক্ষ্যাপা—যেমন ক্ষ্যাপা হচ্ছে ভোলানাথ।

এরপর চতুর্থ পর্যায়ে ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে গড়বার কথাও এসেছে। সুন্দর আর ভয়ঙ্করের অপরূপ মিলন সাধিত হয়েছে। একহাতে চাঁদের স্নিগ্ধতা আরেক হাতে সূর্যের প্রখরতা। যে যজ্ঞ, সেই অগ্নি, আবার সেই পুরোহিত। যে ভাঙে সেই গড়ে। শক্তিমানের লীলা এমনি করেই প্রকাশ পায়। তাই এ পর্যায়ে যেন মহাপরাক্রান্ত বিদ্রোহীর বিচিত্র বিশ্বরূপ বর্ণিত হয়েছে :

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, 'আমি পুরোহিত' আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তূর্য!
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—চির উন্নত মম শির!

এখানে সৃষ্টি ও ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা-বারিধির মন্থনবিষ পান করার কথাও রয়েছে। বিশ্ববাসীর সাথে সীমাহীন সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে চরম ত্যাগ আর দুঃখ বরণের ভিতর দিয়ে। বিশ্বকে ধ্বংস বা মহাপ্লাবনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি গঙ্গোত্রীর প্রবল ধারাও আপন শিরে ধারণ করেছেন।

পঞ্চম পর্যায়ে প্রলয়ের ঈশান-বিষাণ আর ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কারের সঙ্গে ধর্মরাজের ন্যায়দণ্ডের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ত্রাসের সঙ্গে প্রাণ-খোলা হাসি, বারিধির কলকল্লোলের সঙ্গে ঊর্মির নর্তনও শোনা যাচ্ছে। যথা :

আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি প্রাণ-খোলা হাসি-উল্লাস,—আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,

আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস।
আমি কভু প্রশান্ত, কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল!
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল!

উপরে বিশ্বামিত্র-শিষ্য দুর্বাসার কথা বলতে নিম্ন শ্রেণীর জনগণের গৌরব ঘোষণা করা চলে; বিধিদাতা বিধাতার মতই 'বিদ্রোহী'ও কখনও প্রশান্ত কখনও অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী।

এ পর্যন্ত প্রধানতঃ স্বর্গীয় দেবতাদের সঙ্গেই যেন বোঝাপড়া চলেছে। এইবার কবির দৃষ্টি পড়েছে, মর্ত্যের মানুষের দিকে। কুমারীদের বন্ধনদশা, স্বজন প্রেমধর্মে সামাজিক বাধা, বিধবার ক্রন্দনশ্বাস, গৃহহারা পথিকের বঞ্চিত ব্যথা, প্রত্যাখ্যাত অবমানিত হৃদয়ের বিষজ্বালা—অর্থাৎ প্রেমের হিন্দোল হাওয়া, মলয় অনিল, পূবালী বায়ু এইসব অভিজ্ঞতার বাহেন হয়ে বিদ্রোহী বীর সহসা নিজেকে চিনেছেন, তাঁর সকল বাঁধ খুলে গেছে, তাই ষষ্ঠ পর্যায়ে দেখতে পাই :

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী 'তন্বী-নয়নে বহ্নি'
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের!

স্বাধীন জীবনানন্দের বাধাস্বরূপ এইসব সামাজিক বা নৈতিক বাঁধন একেবারেই অসহ্য। তাই বিধির বিধান উল্টে দিতে কবি বদ্ধপরিকর। কবির 'বিদ্রোহী' ভাবের সঙ্গে এ ব্যাপার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যময়। কিন্তু অনেকে বিদ্রোহী কবিতায় কুমারীর বেণী, তন্বীনয়নে বহ্নি, ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, চপল মেয়ের ভালবাসা, যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচল কাঁচলি নিচোর-এর প্রাসঙ্গিকতা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁদের মতে বিদ্রোহের বীরত্বের মধ্যে এসব প্রেম-গুঞ্জন অত্যন্ত বে-মানান হয়েছে। তাঁরা বলেন, কবি ঝোঁকের মাথায় কেবল কতগুলো অর্থহীন কথার মালা সাজিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় এঁরা নজরুলের বিদ্রোহের সর্বব্যাপী রূপটাই ধরতে পারেন নি। শুধু বিধাতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝঞ্ঝা, টর্পেডো, মাইন, মহামারী, ঈশান, বিষাণ আর ইস্রাফিলের শিঙার হুংকার ছাড়াই বড় কথা নয়—সমস্যার কথাই আসল। অন্ততঃ উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলো, বিশেষ করে কিশোর কবির মনে অঙ্কিত হয়েছে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে একযোগেও সমাধান চাই। সকল শাসন শোষণ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ ঐসব সুবিধাভোগী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যাদের আস্পর্ধা দিয়েছেন একচোখো বিশ্ববিধাতা! তাইতেই তো স্বর্গীয় দেবতাদির উপর কবির আক্রোশ। বাস্তবিক পক্ষে ষষ্ঠ পর্যায়ের ভিতর দিয়ে এবং আরও পরে কবির কর্মসূচীর ইঙ্গিত রয়েছে। এই কর্মসূচি সফল করতে প্রথমেই গণজাগরণ দরকার। তাই সপ্তম পর্যায়ে কবি অচেতন চিত্তে চেতন সঞ্চার করবার জন্য আর বিশ্ব-তোরণে 'মানব বিজয়-কেতন' প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নানা প্রকার অসমসাহসিক কাজ করতে উদ্যত হয়েছেন। যেমন :

আমি উত্থান, আমি পতন,
আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী,
মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য করতলে,
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা
বাহন আমার হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে।
ধরি বাসুকীর ফণা জাপটি,
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি।
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট,
আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল!

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে সকলকে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হবে। পুরুষ-রমণী, কিশোর-কিশোরী এমন কি শিশুরাও মায়ের কোল থেকে ছুটে যাবে সংগ্রামে। চঞ্চল দেব-শিশুর এই তাৎপর্য। সম্ভবতঃ দাঁত দিয়ে বিশ্বমায়ের অঞ্চল ছেঁড়ার আর একটা তাৎপর্য আছে : দেবতাদের পলিটিক্স বা ক্ষমতার লড়াইয়ে দেখা যায়, অনেক সময়ে দেব একদিকে আর দেবী অন্যদিকে। এমন অবস্থায় প্রায়ই দেবতারা হার মেনে যান, নইলে দেবী অপ্রসন্ন হবেন যে! কিন্তু আমাদের বিদ্রোহী ছাড়বার পাত্র নন। দেবীর স্বামীরা না হয় খাতির করলেন, কিন্তু তাঁদের ধৃষ্ট শিশুরা দাঁত দিয়ে বিশ্বমাতার আঁচল কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে। কাজেই অপাত্রে পক্ষপাতকারিণী দেবীদের জারি জুড়ি আর খাটবে না। এহেন সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধে তাঁদের হারতেই হবে।

অষ্টম পর্যায়ে অর্ফিয়াসের বাঁশরীর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। কবির কাব্যের সঙ্গীতধ্বনিতে বিরাট বিক্ষুব্ধ সিন্ধুও ঘুমিয়ে পড়বে। বোধহয় ইঙ্গিত এই যে, মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত অত্যাচারীরা নিস্তেজ হয়ে পড়বে আর ঐ বাঁশরীর তানেই উদ্বুদ্ধ জনগণের রুদ্ররোষের সম্মুখে বন্ধনকারা সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে :

আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ
নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

এখানে দেখানো হয়েছে একটি মহাজনসম্মত যুদ্ধকৌশলে শত্রুকে কোনো উপায়ে দুর্বল করে নিয়ে তারপর সুযোগ বুঝে আক্রমণ করা।

নবম পর্যায়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এই যুদ্ধ দেখে ভয় পাবার কিছু নেই এর থেকেই সঞ্জাত হবে কল্যাণ, যেমন শ্রাবণের প্লাবন-বন্যার পলিমাটিতেই দেশ উর্বরা হয়। মর্ত্যবাসীর ভোগের জন্য স্বর্গীয় দেবতাদের হাত থেকে জোর করে যুগল কন্যা (লক্ষ্মী-সরস্বতী) কেড়ে নেওয়া হবে।

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া,

কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে
যুগল কন্যা!

দশম পর্যায়ে বলা হয়েছে মনুষ্য জাতি মৃন্ময়, অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়। এরাই জগদীশ্বর ঈশ্বর পুরুষোত্তম সত্য। প্রাচীনকালে আত্মার উপরেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হ'ত, দেহটা থাকত অবহেলিত। বর্তমানে দেহটাও বেশ জোরের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে; তাই জনজাগরণের কবি গাইছেন :

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।

এই অমরত্ব, ব্যক্তির দিক থেকে দেখলে আত্মিক—আবার সমগ্র মানব সমাজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কায়িক। ব্যক্তির মরণ আছে কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মানুষের মৃত্যু নেই। কবির মনের একটা বিশিষ্ট ভাব এই যে, মানুষ নিজেকে বৃহৎ মানবজাতির অঙ্গ বলে বিচার করবে। তাহলে আর মৃত্যুভয় থাকবে না। মৃত্যুভয়ই আসল মৃত্যু। কবি বলেছেন :

আমি মানব দানব দেবতার ভয়
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য।

জগদীশ্বর-ঈশ্বরের তাৎপর্য প্রথম পর্যায়েই ব্যক্ত হয়েছে। পুরুষোত্তম বাক্যাংশের দুই অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে বীর্যবন্ত সত্য—জয় যার হবেই। আরেকটি হচ্ছে বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠতম শিখরে অবস্থিত সত্য। ইতর জীবের ক্রমোন্নতির শেষ ধাপ যেমন মানুষ, তেমনি মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত ভ্রমান্ধকারের অবসান হয়ে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে সেই সত্য। পরিশেষে একাদশ পর্যায়ে বিদ্রোহীর আদর্শ বর্ণনা করা হচ্ছে :

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব
অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম
রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রাজসিক ক্ষাত্রশক্তির অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধেই বিশেষ করে পরশুরামের কুঠারাঘাত উদ্যত হয়েছে যুগে যুগে। কবি অধীন বিশ্বকে কর্ষণ করে মহানন্দে নতুন স্বাধীন বিশ্বসৃষ্টি করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। এ বিদ্রোহ চলতেই থাকবে, যতদিন না

অত্যাচার অবিচার শাসন-শোষণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়। এর আগে কখনও বিদ্রোহী রণক্লান্ত হবে না।

স্বভাবত মনে হয়, এখানেই সমাপ্তি হ'তে পারত কিন্তু কবি এখানে ইতি না করে আরও এক পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছেন। দেখা যাক, তার কোনও সার্থকতা আছে কিনা। কবি বলছেন :

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে
ঐঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা
খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে
এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির বিদ্রোহী বীর—
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা
চির-উন্নত শির!

কবি এখানে বলতে চাচ্ছেন, এই যে এত বিদ্রোহের কথা, সংকল্পের কথা বলা হ'লো, এর সফলতা সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। খেয়ালী বিধির বিশ্ব-বিধানের ত্রুটি সংশোধন করবই করব। অন্যে না হয় বিদ্রোহী ভৃগুর মত ভগবান বুকে পদচিহ্ন অঙ্কিত করে তাকে জাগিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করব; আর যদি তাতেও না হয়, তবে আমি স্রষ্টা-সূদন হয়ে নিজের বলেই শান্ত উদার স্বাধীন বিশ্ব সৃষ্টি করব।

এতক্ষণ মোটামুটিভাবে কবির বিদ্রোহ বার্তার তাৎপর্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হ'লো। সাদা কথায় কবির কাব্যময় উপলব্ধি বর্ণনা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই অনেক স্থলে কল্পনার রথকে মাটির উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিতে হয়েছে। এজন্য আমি কবির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। গদ্যভাবাপন্ন মানুষ যেমন করে কাব্যের সর্বনাশ করে তার রসাস্বাদন করবার চেষ্টা করে, আমি হয়তো তাই করেছি। তবু আশা করি, অন্ততঃ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা যে বিভিন্নভাবের অসঙ্গত সমাবেশে একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে পরিণত হয় নি, এ-কথাটা বুঝাতে পেরেছি। এতে বাগ-বাহুল্য বা ভাবের পুনরুক্তি থাকতে পারে,—সে হচ্ছে কবির হৃদয়-মথিত বহুবিচিত্র আবেগের বল্গাহীন প্রকাশ, খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এ কবিতায় ফিলজফি ফলাবার চেষ্টা নেই—পৌরাণিক কাহিনীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে আপনা-আপনি অতি মনোরমভাবে কবির বাণী পরিস্ফুট হয়েছে। অনবদ্য ছন্দ আর ভাবানুগত ধ্বনি-মাধুর্যে গরীয়ান 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যের একটা অতি বিশিষ্ট কাব্য। অনেকের মতে, বিশ্বসাহিত্যেও এর তুলনা নেই।

# নজরুল-কাব্যে ইসলামী ভাবধারা

নজরুল ইসলাম মানবতার কবি, কাজে কাজেই যৌবনের কবি, স্বাধীনতার কবি, শক্তিমত্তার কবি, প্রেমের কবি। হিন্দু-মুসলিম, ইহুদী-খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই এইসব ভাব বিকশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। সর্ব দেশের সর্ব কালের কবিগণই এইসব ভাবকে নিজেদের অনুভূতি আর ব্যক্তিত্বের রঙে রঞ্জিত করে পাঠকদের মনোরঞ্জন করেছেন। সমাজ এবং কবি-মানসের বৈশিষ্ট্যের জন্যই পুরানো ভাবও নিত্য-নতুন হ'য়ে দেখা দেয়; তাই তো প্রকৃতির প্রাচুর্যের মতো কবিতায়ও রয়েছে অজস্রতা।

কিন্তু পাঠক-সমাজ অনেক সময় কবিতার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে এতে তাদের জাতীয়, ধর্মীয় বা সামাজিক বৈশিষ্ট্য কতখানি ফুটে উঠেছে তাই নিয়ে বিচার ক'রে থাকেন। অমুকের কবিতায় হিন্দুত্ব ফুটে উঠেছে কি না, মুসলমানত্বের হানি হয়েছে কি না, তাসাউফের জৌলুস আছে কি না— এইসব কথাই কখনও কখনও প্রধান হ'য়ে দেখা দেয়। এর যে কিছুই মূল্য নেই, তা নয়। কিন্তু কথা এই যে, কাব্যরসের দিক থেকে লেখকের বা পাঠকের মন যদি সরে গিয়ে বিশেস সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করে, তাহলে সেটাকে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। তবে সুখের বিষয়, নজরুল ইসলাম কাব্যরস ক্ষুণ্ন না ক'রেও, মানবীয় ভাবধারার যে বিশেষ অংশকে আমরা সচরাচর ইসলামী ভাবধারা ব'লে থাকি, তার বলিষ্ঠ অথচ সুন্দর পরিচয় দিতে পেরেছেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটাই একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

শব্দচয়নে নজরুল ইসলাম যে অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দ বেমালুম মিশ খাইয়ে দিয়েছেন, তা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন। এ দিক দিয়ে ইনি বর্তমান যুগে এমন এক আদর্শের সৃষ্টি করে গেছেন, যার অনুবর্তন করলে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণও ইসলামিক ভাবধারা বেশ অনায়াসে প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভাব-ই বিশেষভাবে ইসলামী হ'তে পারে, শব্দকে ইসলামী বা অন-ইসলামী বলা বড় জোর আংশিক সত্য। যেমন,

> নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
> "আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া"!
> কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
> সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে।
>
> —(অগ্নিবীণা,)

এখানে কথার ইন্দ্রজালে কারবালার একটা ভয়াবহ করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। কাব্য-সৌন্দর্যের ছাপ লেগে রক্ত-স্নাত কারবালার, ফোরাত এবং সীমারের ছোরার তলায় ফাতেমা-নন্দন হুসায়নের চিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে। কয়েকটা অবাংলা শব্দ থাকায় কারবালা প্রান্তর যে বাংলার বাইরে, বোধ হয় সেই কথাটাই বিশেষ ক'রে বলা গেল। হয়ত দুই একটা শব্দ

বদলিয়ে দিলেও ইসলামী ঐতিহাসিক চিত্রের বিশেষ হানি হ'ত না। কিন্তু কবি এমন অপরূপভাবে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন যে, এর একটা শব্দও বদলাতে ইচ্ছা করে না। এমন কি 'লা'ল' শব্দটা কতকটা অপরিচিত হ'লেও, ওরম মানে যে 'যাদু-মণি', তা' আর বলে দিতে হয় না। কবির হাত দিয়ে কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হ'য়ে বেরিয়েছে বলেই যেন ওর অর্থ স্বতঃ প্রকাশ। যা'হোক, নজরুলের অব্যর্থ শব্দচয়ন এতই প্রসিদ্ধ যে, সে সম্বন্ধে আর কিছু বলবার দরকার করে না।

উপরে 'মহররম' কবিতাটির থেকে যে উদাহরণ দেওয়া গেছে, তা মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হ'লেও এর একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। সব দেশেই অন্যায় অত্যাচারীর সঙ্গে ন্যায়ের সেনার সংগ্রাম হ'য়ে থাকে, আর জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে, মর্মন্তুদ ঘটনা-প্রবাহের আবর্ত সৃষ্টি ক'রে ইতিহাস অগ্রসর হয়। এই হচ্ছে আসল কাব্যিক উৎস। এর মধ্যেকার বিশেষ ইসলামিক পরিবেশ অবশ্যই আনুষঙ্গিক। তবু এর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই কাব্য প্রাণবন্ত হয়। কবি যেখান থেকে খুশী সেখান থেকেই উপকরণ সংগ্রহ ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু উপকরণ যেখান থেকেই নিন, তাকে প্রাণবন্ত করতে পারলেই প্রকৃত কাব্য হ'তে পারে, নচেৎ নয়। নজরুলের প্রতিভার স্পর্শে ঐতিহাসিক উপকরণ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে বলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

নজরুলের ঐতিহাসিক কাব্যের মধ্যে 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার' 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ্', 'উমর ফারুক' বিখ্যাত! এর সঙ্গে হয়ত রণভেরী 'শাতিল আরব', 'কোরবানী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতারও উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলোকে কেবল প্যান-ইসলামিক দৃষ্টিতে দেখলে একটু অবিচার করা হবে। বর্তমানের নির্জীব নির্যাতিত মুসলমান মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াক এটা অবশ্য চেয়েছিলেন নজরুল। কিন্তু এসব কবিতার ভিতর দিয়ে বিশেষ ক'রে প্রকাশ পেয়েছে নজরুলের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর বন্ধন-ছেদনকারীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তাই এগুলোর ভিতরে সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। শুধু মুসলমান নয়, দুনিয়ার যে-কোনো স্বাধীনতা-প্রিয় অত্যাচার-প্রতিরোধকামী সংস্কার-মুক্ত সজ্জন তাঁর কবিতা পড়ে আনন্দ অনুভব করবেন। নজরুল ইসলাম নানা পাত্রে রস পরিবেশন করেছেন, কিন্তু প্রায় কোথায়ও পাত্রের উগ্রগন্ধে রসের বিকৃতি ঘটান নাই। তাঁর এই বিশেষত্বের কথা স্মরণ করলেই তাঁর প্রতিভার বিরাটত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

"ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অ-সুর পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।"
"খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজদিল ঐ দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া!
হুররো হো! হুররো হো!
দস্যুগুলোয় সামলাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই!"

—(অগ্নিবীণা)

এর মধ্যে কবির যে উদ্দাম আবেগ প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা অন্য কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। এ আবেগের কারণ— 'দস্যুগুলো' সাফ হ'য়ে গেছে ব'লে নয়, কারণ

মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্বে মারে।
মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে
হে অতি-মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।

—(জিঞ্জীর)

এখানে রাজতন্ত্রী শাসনে কি কি কৌশলে নির্যাতন চালানো হয়, আর ছলে-বলে-কৌশলে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করার চেষ্টা করা হয়, তার বর্ণনা দেবার সাথে সাথেই এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য জগলুলের মতো অসাধারণ লোকের আবির্ভাবের কথাটিও বর্ণিত হ'য়েছে। তাছাড়া অতীত ইতিহাসের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কথাও বলা হয়েছে। তাই শেষ চার ছত্রে আশার বাণী শোনান হয়েছে :

শ্যেন সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হ'ল পার, ফেরাউন ফিরিল না 'নীল' নদী হ'তে।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়ত দেখিব কা'ল
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল।

—(জিঞ্জীর)

স্মরণ রাখা উচিত, পবিত্র কোরআন শরীফেও বারংবার প্রাচীন অত্যাচারীদের পতন আর সত্যের প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের কথা শুনিয়ে হযরত মোহম্মদের (দঃ) মনে সাহস জোগান হয়েছিল। কবিও সেই পন্থা অনুসরণ করেছেন। 'আমানুল্লাহ' কবিতায় কবি লিখেছেন :

'আমানুল্লা'রে করি বন্দনা, কাবুল রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান।
ঐ বাদশাহী তখতের নীচে দীন-ই-ইসলাম শরমে, হায়!
এজিদ হইতে মুরু ক'রে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়।
বুকের খুশীর বাদশাহ্ তুমি, শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই— তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদরে হিন্দু, নয় কাফের
প্রতিমা তাদের ভাঙ নি, ভাঙ নি আনি ইঁট মন্দিরের।
দেখিয়াছি শুধু কাবুলীর সেনা, কাবুলী দাওয়াই, কাবুলী হিং
তুমি দিয়ে গেলে কাবুল-বাগের দিল-মহলের চাবির রিং।

—(জিঞ্জীর)

এখানেও মুসলমান নয়, রাজা নয়, কবির বন্দনীয় হচ্ছেন সহজ মানুষ, —যে মানুষ ইসলামের সাম্যমন্ত্রে হৃদয়ে হৃদয়ে সবার সঙ্গে একান্ত হয়ে মিশতে পারে।

'ওমর ফারুক' কবিতায় ইসলামের কয়েকটা সুন্দর আদর্শ ঐতিহাসিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে অতি চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এখানেও পয়গম্বর, নবী ও রসুলের চেয়েও কবি বেশী আপন ব'লে বুকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন 'মহামানব'কে।

পয়গাম্বর নবী ও রসূল— এঁরা ত খোদার দান!
তুমি রাখিয়াছ হে অতিমানুষ, মানুষের সম্মান!
কোরান এনেছে সত্যের বাণী সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ— তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।

উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন।
ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি' তারি শুভ আগমন।
খোদারে আমরা করি গো সেজদা, রসূলে করি সালাম,
ওঁরা ঊর্ধ্বের— পবিত্র হ'য়ে নিই তাঁদের নাম।
তোমারে স্মরিতে ঠেকাই না কর, ললাটে ও চোখে মুখে,
প্রিয় হ'য়ে তুমি আছ হতমান, মানুষ জাতির বুকে।
তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করো নিক কারে ভয়;
সত্যব্রত তোমারে তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
হে শহীদ বীর, এই দোয়া করো আরশের পায়া ধরি—
তোমার মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি।
মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহি না, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিশ্বাস পড়ে।

এই অপূর্ব-সুন্দর কবিতার উদ্ধৃত অংশ থেকে বুঝা যাচ্ছে প্রেমিক কবি নজরুল মানুষের কল্যাণকেই ইসলামের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মেনে নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের কোমলতা, সত্যে অটলতা, আর নির্ভীকভাবে ন্যায়ধর্মের সংরক্ষণে শহাদৎ বরণ করাকেও এর অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছেন।

'শাতিল আরব' 'কোরবানী, 'রণভেরী' প্রভৃতি কবিতাও শক্তির উদ্বোধনই কবির মূল সুর। বাঙালীর মিহি সুরের সঙ্গে সাহসিক কবি শক্তিমত্তার সুর জুড়ে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটা মস্তবড় অভাব পূর্ণ করেছেন।

ওরে আয়!
ঐ মহাসিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
ওরে আয়!
ঐ ইসলাম ডুবে যায়।
যত শয়তান সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়গান শোন গায়।
আজ সখ ক'রে জুতি-টক্করে
তোড়ে শহীদের খুলি দুশমন পায় পায়—
ওরে আয়!
মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুসী লেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই।
মোরা দুর্মদ তরপুর মদ
খাই ইশকের, ঘাড় শমশের ফের নিই বুক নাঙ্গায়।
লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,
মরি জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা অসি বুকে ধরি হাসি মুখে মরি' জয় স্বাধীনতা গাই।
ওরে আয়!
ঐ মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরী শোনা যায়।

—(অগ্নিবীণা)

এখানে 'ইসলাম ডুবে যায়' বাক্যটা থাকলেও পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে, ইসলাম ন্যায়ের প্রতীক, উদ্ধত জালিমগণই মানবতার শত্রু। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।
ইরাক বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার" বলিয়া ফেলিবে তপ্তনীর।
রক্তক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোঁটা ভক্তবীর
শহীদের দেশ! বিদায় বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

—এখানে, আলী হায়দরের বীরভূমির পরাধীনতা ঘুচাবার জন্য সমব্যথায় ব্যথী বাঙালীও শাতিল আরবের তীরে 'ইরাক বাহিনী'তে যোগ দিয়েছেন, এতে কবির আনন্দ আর ধরে না।

'কোরবানী' কবিতায় হজরত ইব্রাহীমের শ্রেষ্ঠ ত্যাগধর্মের মহিমাই বর্ণিত হয়েছে, শুধু আচার-অনুষ্ঠান মাত্র নয়।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
জোর চাই, আর যাচ্ঞা নয়,
কোরবানী-দিন আজ না ওই?
বাজ্না কই? সাজ্না কই?
কাজ না আজিকে জানমাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?
বল্-যুঝ্বো জান ভি পণ!"
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ—কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।
—(অগ্নিবীণা)

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, নজরুল ইসলামের ইসলাম একটা মহান জীবন্ত আদর্শ, কোনও দেশে বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ নয়। এতে লোকহিত, মানবপ্রেম, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা, সমদর্শিতা এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে জান-মাল কোরবানী করবার মতো সহাসরে উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

শেষের দিকে নজরুলের ধর্ম এবং উপলব্ধি কিছু অধিক প্রবল হয়েছিল ব'লে মনে হয়। 'নতুন চাঁদে' বহুস্থানে ইসলামিক একত্ব, সাম্য, শান্তি, ও সমর্পণের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর আশা এই যে, আমাদের বহুধা বিচ্ছিন্ন দেশেও প্রকৃত ইসলাম রূপায়িত হবেই :

শান্তির রাহে আল্লাহের মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের
পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে, সাত আসমান দোল খাবে
জয়গানে॥
এক আল্লার জয়ঘানে মহামিলনের জয়গানে, "শান্তি"
"শান্তি" জয়গানে।
চাঁদ আসিছে যে নতুন চাঁদ! অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে

মিলিয়া চলিব তার পথে দলে দলে।
রবে না ধর্ম জাতির ভেদ রবে না আত্মকলহ ক্লেদ
রবে না লোভ রবে না ক্ষোভ অহঙ্কার
প্রলয় পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
একের লীলা এ দুজন নাই তাঁহারি সৃষ্টি সবই ভাই,
কত নামে ডাকি সর্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি না ক, নিজেরে তাই নাহি চিনি।
এককে মানিলে রহে না দুই একসবে সেই এককে ছুই
এক সে স্রষ্টা সব কিছুর সব জাতির
আসিছে তাহার চন্দ্রালোক এক বাতির।

—এখানে কবি সমস্ত মানুষকে এক মহামিলন ক্ষেত্রে একক ধর্মে আহ্বান করছেন। সূফী ভাবধারার অনুসরণ ক'রে আল্লাহ্‌র স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন :

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয়ে রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!-
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যেমন কেবলি রচেন মায়া!

'আর কত দিন' নামক কবিতায় সাধক নজরুল বহু স্থানে তাঁর প্রিয়তমকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কখনও 'কোটি তারকার কীলক-রুদ্ধ অম্বর দ্বারে" কখনও মাটির পৃথিবীতে, সাগরজলে, সূর্যালোকে, ব্যোমপথে বাণীর সাগরে, কখনও বা 'জৈতুনী রওগণে', জলপাই বনে তাঁর নিষ্ঠুর বাঞ্ছিতকে খুঁজে ফিরছেন। ভোরের প্রাক্‌কালে পরম বন্ধুর বোর্‌রাক আসবেই আসবে।

প্রকৃত মুসলিম এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নোয়ায় না। এই কথার ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

যে ছেলে মেয়ে এই দুনিয়ায় আজাদ মুক্ত রহে
তাদেরই শুধু এক আল্লার বান্দা ও বাঁদী কহে!
তারাই আনিবে জগতে আবার নতুন ঈদের চাঁদ
তারাই ঘুচাবে দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ।

তৌহীদ ও ইসলাম সম্বন্ধে কবির ধারণা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায় :

কে পিয়েছে সে তৌহিদ সুধা পরমামৃত হায়?
যাহারে হেরিয়া পরাণ পরম শান্তিতে ডুবে যায়।
আছে সে কোরান মজিদ আজিও পরম শক্তি ভরা
ওরে দুর্ভাগা, এক কণা তার পেয়েছিস কেউ তোরা?
খুঁজিয়া দেখিনু মুসলিম নাই, কেবল কাফেরে ভরা—
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতি জরা।

প্রকৃত মুসলিমের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলছেন :

আল্লাহ্‌ আর তাহার মাঝারে কোন আবরণ নাই
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই— দেখেছ তাহারে ভাই?
চায় না ক যশ চায় না ক মান, নিত্য নিরভিমান

এই মায়াবিনী ধরার স্পর্শ লেগেছিল যাহা গ্লানি কলুষ
সে-কলুষ লেগে ধরার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না এই মানুষ,
পূত জমজম-পানি দিয়া তাহা ধুইয়া ফেলার— তার আদেশ,
তুমি ফেরেশতী তোমাতে ধরার রহিল না আর মলিনা-লেশ'।

ইসলামিক কালচারের মর্মকথা কি, আর কেমন ক'রে তা কাব্য ও সাহিত্যে পরিবেশন করতে হয়, কবি নজরুলের রচনায় তার একটা উন্নত আদর্শ পাওয়া যায়। বর্তমানে ইসলামী সাহিত্যের বা ইসলামী কবিতার নাম দিয়ে কেউ এমন প্রপাগাণ্ডামূলক রচনা ছাপছেন, যা রসাশ্রিত না হওয়ার সাহিত্য বা কাব্য নামে পরিচিত হতে পারে না। আশা করি, কৃতী সাহিত্যিক ও কবিগণ নজরুলের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই ধারাকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলতে চেষ্টা করবেন।

# ভাষা-সংস্কৃতি

# রাষ্ট্রভাষা ও পূর্বপাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা

কোনো দেশের লোকে যে ভাষায় কথা বলে, সেইটিই সে দেশের স্বাভাবিক ভাষা। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে আবার বাংলাদেশের ভাষা সম্বন্ধে সমস্যা ওঠে কি করে? সত্য সত্য এইটেই মজার কথা—যা স্বাভাবিক, তা অনেক সময় জটিল বুদ্ধি দিয়ে সহজে বোঝা যায় না। একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করছি।

ধরে নেওয়া যাক, কোনো দেশের শতকরা ৯৯ জন বাংলা ভাষায়, আর বাকি শতকরা ১ জন মাত্র ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। আরও মনে করা যাক, এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা বাণিজ্যসূত্রে বা শাসক হিসাবে সে দেশে গিয়ে প্রতিষ্ঠাবান হয়েছে এবং অল্প শিক্ষিত বা অল্প বিত্তশালীদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে। তাই এরা সে দেশের লোকের প্রতি ও তার ভাষার প্রতি স্বভাবতই অশ্রদ্ধাবান। সে দেশের ভাষা শিক্ষা করে তাদের সঙ্গে কাই-কারবার করা এরা অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় বলে মনে করে, আর তাতে এদের আত্মসম্মানেও আঘাত করে বৈকি! অবশ্য, বিজিত জাতি বা শোষিত অধমর্ণের আত্মসম্মান থাকে না, আর তা শোভাও পায় না। বিশেষত বিজেতা বা উত্তমর্ণের ভাষা শিক্ষা করে তাদের সঙ্গে দহরম মহরম রাখতে পারলে তাদের সন্তুষ্টি সাধন করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জনের পথও প্রশস্ত হয়। আর একটা প্রধান কথা, এইভাবে দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে নিজেদের বিরাট পার্থক্য সংরক্ষণ ও স্মরণ করে যথেষ্ট মর্যাদা অনুভব করা যায়। বিজেতা উত্তমর্ণের অনুগৃহীত এই সৌভাগ্যবানেরাই দেশের নেতা এবং জনগণের নামে সমুদয় সুবিধা ভোগের অধিকারী। বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় ইহা স্বাভাবিক, কারণ 'মূঢ়-মূকদের' বঞ্চিত করায় ভয়ের কারণ নেই বরং না করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র।

এই হলো মোটামুটি বাংলাদেশের এবং বিশেষ করে বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষাসমস্যার মানসিক পটভূমি।

পাঠান রাজত্বে রাজভাষা ছিল পোস্তু, আর মোগল আমলে ফার্সী। মোগল-পাঠানেরা বিদেশী হলেও এদেশকেই জন্মভূমি-রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং দেশের অবস্থা জানবার জন্য দেশীয় ভাষাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে পাঠানরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় অনূদিত হয়,—তা ছাড়া ভাগবত এবং পুরাণাদিও রচিত হয়। এর আগে বাংলা ভাষা নিতান্ত অপুষ্ট ছিল, এবং ভাষা জনসাধারণের ভাষা বলে পণ্ডিতদের কাছে অশ্রদ্ধেয় ছিল। তখনকার পণ্ডিতেরা কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষার আবরণে নিজেদের শুচিতা ও শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করতেন। রাজসুলভ উদারতার সঙ্গে গৌড়ের পাঠান সুবাদারগণ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধাচরণ অগ্রাহ্য করত সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য (এবং হয়তো সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও গল্প-পিপাসা নিবৃত্ত করবার জন্য) এই সকল পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত রচনা করান। বলা বাহুল্য দেশীয় কালচারের ধারা রক্ষা করবার পক্ষে

এবং দেশবাসীর নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই সব পুস্তকের তুলনা নাই। কতকটা এই কারণেই আজ ভারতবর্ষের সামান্যতম কৃষকরাও এক-একজন দার্শনিক বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। বাস্তবিক দেশবাসীর ভাষা বৈদেশিক শাসকের উৎসাহ পেয়েছিল বলেই বাঙালীরা আত্মস্থ ছিল এবং ইসলামী সভ্যতার থেকে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় গ্রহণ করে নিজেদের জীবন ও সভ্যতাকে পুষ্টতর করতে পেরেছিল। অন্যদিকে, মুসলমান শাসকগণ এবং জনসাধারণও হিন্দু ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে কাল অনুযায়ী ইসলামের নব নব বিকাশ সাধন করে কার্যক্ষেত্রে স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের উদারতা ও সর্বোপযোগিতাই প্রমাণিত করেছে।

মোগল যুগে বিশেষ করে আরাকান রাজসভার অমাত্যগণ, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। মুসলমান সভাকবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল বাংলা কবিতা লিখে অমর কীর্তি লাভ করেছেন। এঁদের ভাষা সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, উর্দু, প্রাকৃত প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু এঁরা জোর করে কোনও নির্দিষ্ট ভাষা থেকে বিকট বিকট শব্দ আমদানী করতে চেষ্টা করেন নি, তৎকালীন জনসমাজের নিত্য ব্যবহৃত বা সহজবোধ্য ভাষাতেই তাঁরা কাব্য রচনা করে গেছেন। মোগল পাঠানেরা মূলে বৈদেশিক হলেও এই দেশকেই তাঁরা স্বদেশ করেছিলেন। তাঁদের রাষ্ট্রভাষা পোস্তু বা ফার্সী রূঢ় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এদেশীদের আদর্শকে গ্রাস করতে চায় নি, বরং এদেশীয় ভাষাকে রাজকীয় উৎসাহ দিয়ে মোগল পাঠান বাদশাহ ও সুবাদারেরা এদেশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই দেশবাসী রাজভাষা শিক্ষা করেও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন, এমনকি বৈদেশিক ভাবধারায় সিঞ্চিত ক'রে তার শ্রীবৃদ্ধিও সাধন করেছিলেন।

এর পর এল ইংরেজ রাজত্ব। কিছুদিন পরে, ইংরেজী হলো রাষ্ট্রভাষা। হিন্দুরা সানন্দে নতুন প্রভু ও তার ভাষাকে বরণ ক'রে নিল, কিন্তু মুসলমানেরা নানা কারণে তা' পারল না। রামমোহনের যুগেও তাঁর উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি, হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে তুলনায় মুসলমানই ভদ্রতায় বিচারবুদ্ধিতে এবং কার্যপরিচালনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উপরোক্ত কারণ এবং রাজকীয় ভেদনীতির ফলে আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সমুদয় ব্যাপারে মুসলমান তলায় পড়ে গেল এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও হিংসার সৃষ্টি হলো। বাংলা ভাষাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতেরা একে সংস্কৃতের আওতায় নিয়ে কেবল হিন্দুসভ্যতার বাহন করে তুলল। আর মুসলিম অর্ধশিক্ষিত মুন্সীরা আরবী-পার্সীবহুল এক প্রকার ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করল। দুই দিকেই বাড়াবাড়ি হলো। কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোরে পণ্ডিতি বাংলা টিকে গেল, মুন্সীয়ানা বাংলা লুপ্ত হ'লো। অবশ্য বর্তমান গণপ্রাধান্যের যুগে ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতি বাংলাও সরল হয়েছে।

কিন্তু আজ ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে—১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়, ১৮৩০-৪০ সালে ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা, ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের শোচনীয় পরিণাম, সব গ্লানিকে সার্থক করে ১৯৪৭ সালে জাতীয় জয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের সামনে বিরাট কর্তব্য আর গুরু দায়িত্ব উপস্থিত হয়েছে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার ফলে আশা করা যায় যে, দেশের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, অশিক্ষা

এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর হয়ে সাধের পূর্ব পাকিস্তান আবার গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে সামাজিক বৈষম্য দূর করা, বৈদেশিকের শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করা, এবং জাতীয় সম্পদ যাই থাক, শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে তার সুবিনিময়ের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। শুধু ইংরেজের প্রভাব কিছুটা খর্ব হ'লেই হবে না—ইংরেজের স্থান যেন বৈদেশিক বা অন্য প্রদেশীয় লোকে দখল ক'রে না বসে সে বিষয়ে লক্ষ রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন। কুচক্রী লোকেরা যা'তে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, ভাষার বাধা সৃষ্টি ক'রে নানা অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মানসিক বিকাশে বাধা না জন্মাতে পারে সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে।

ভাষার বাধা একটি জাতিকে কিভাবে পঙ্গু করে রাখতে পারে তার উদাহরণ তো আমরাই,—অর্থাৎ ভারতের হিন্দু-মুসলমান এবং বিশেষ ক'রে পূর্ব বাঙলার মুসলমানেরাই। ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হ'লো এবং শিক্ষার বাহনও হ'লো। ফলে, প্রচুর মানসিক শক্তি ব্যয় ক'রে পাঁচ বছরের জ্ঞান দশ বছর ধরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা হলো; কিন্তু বৈদেশিক ভাষার ফলে সে জ্ঞানও নিতান্ত ভাসা ভাসা বা অস্পষ্ট হয়ে রইল। ছাত্রদের মুখে উপলব্ধিবিহীন লম্বা লম্বা কোটেশন বা গালভরা বুলি শুনা যেতে লাগল। আরও এক বিষয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল। সে হচ্ছে ভারতবর্ষে বৃটিশের শিক্ষানীতি। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্য বিষয় এমনভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, যাতে কার্যকরী শিক্ষার বদলে কতকটা মন-বুঝানো মত পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত হয় মাত্র। তাই দেশে বি.এস-সি; বি.এল. এবং এম.এস-সি; বি.এল-এর সংখ্যা অল্প নয়, অথচ বৈজ্ঞানিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নগণ্য। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষায় লাভও যে কিছু হয়েছিল তাও অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের এই সাধারণ পঙ্গুতার উপরেও বিশেষ করে পূর্ব বাঙলার মুসলমানের আড়ষ্টতার আরও দু'টি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাঙলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষাসম্পর্কিত মনে করে বাঙলার পরিবর্তে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ। ফলে বাঙালী মুসলান বাদশাহদের প্রবর্তিত ফার্সী সভ্যতা ভুলে গেল, আর বাঙলা ভাষার সাহায্যেও ইসলামী ঐতিহ্য বজায় রাখবার চেষ্টা করল না। উর্দুর সপক্ষে যতই ওকালতী করা যাক, সেটা যে আসলে পরকীয় ভাষা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর নাড়ীর সঙ্গে যোগ না থাকায় উর্দু ভাষার সাহায্যে ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নি, কারণ ভাসা ভাসা দু-চারটা বুলির সংযোগে জাতীয় বা ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা বাস্তবিকই অসম্ভব। পুঁথি-সাহিত্যের সাহায্যে যা কিছু রক্ষা হয়েছিল, তাতে বাঙালী মুসলমান চাষীর মনের ক্ষুধা অনেকটা পরিতৃপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু শিক্ষাভিমানীদের অবহেলা বা অশ্রদ্ধার ফলে সাধারণ জনসমাজ সে সম্পদও প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। তাতে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার সভ্যতা বলতে যেন কোনো জিনিসই নাই, পরের মুখের ভাষা বা পরের শেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী, বিদেশীই যেন তার আপন! তাই তার উদাসী ভাব, পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর, আর নিজের প্রতি নিদারুণ আস্থাহীনতা। পশ্চিমা চতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জানে যে, বৃহৎ পাগড়ী বেঁধে বাঙলাদেশে এলেই এদের পীর হওয়া যায়, কমের পক্ষে মৌলবীর আসন গ্রহণ করে বেশ দু-পয়সা রোজগারের যোগাড় হয়। শহরে দোকানদার যেমন করে গ্রাম্য ক্রেতাকে ঠকিয়ে লাভবান হ'তে পারে, এ যেন ঠিক সেই অবস্থা। বাস্তবিক বাঙালী মুসলমান

'বাঙাল' বলেই শুধু পশ্চিমা কেন, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।

এই দৈন্য ও হীনতাবোধের আসল কারণ, আমরা মাতৃভাষা বাঙলাকে অবহেলা করে ফাঁকা ফাঁকা অস্পষ্ট বুলি আওড়াতে অভ্যস্ত হয়েছি। এই সব কথা আমাদের অন্তর-রসে সিঞ্চিত নয় ব'লেই আমরা কথার মধ্যে জোর পাইনে। বর্তমানে ইংরেজের প্রভাব কমে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র অতিরিক্ত হিন্দুপ্রভাব থেকে মুক্ত— মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট বাংলা ভাষা রচিত হবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। মুসলিম ভাবধারার ঘাটতি পূরণ ক'রে নিয়ে মাতৃভাষাকে পুষ্ট এবং সমগ্র রাষ্ট্রকে গৌরবান্বিত করবার দায়িত্ব এখন আমাদের উপর। এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ব'সে বলেছে যে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী ভাবে ভরে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে তো তা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পরিবেশন করবার দায়িত্ব মুখ্যত মুসলমান সাহিত্যিকদেরই বহন করতে হবে। তাই আজ সময় এসেছে, মুসলমান বিদ্যার্জন করে পুঁথি-সাহিত্যের স্থলবর্তী বাংলা-সুসাহিত্য সৃষ্টি ক'রে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন : তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতাবোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধর্না দিয়ে আমাদের কোনো কালেই যথার্থ লাভ হবে না। আল্লার কাছে উর্দু বেশী আদরের কিংবা বাংলা হতাদরের সামগ্রী নয়। উর্দু আরবী থেকে গৃহীত বলেই যে উর্দু ভাষা মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা একথাও যথার্থ নয়। গোড়ায় উর্দু মোগল-রাজ্যের নানা দেশীয় সৈনিকের তৈরি একটি খিচুড়ি ভাষা ছিল, কিন্তু তাই বলে অশ্রদ্ধেয় নয়। আরবী, ফার্সী, প্রাকৃত প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে উর্দু ভাষা সমৃদ্ধ। কালে কালে অবশ্য মৌলভী ও পণ্ডিতের টানাটানিতে আরবী-উর্দু এবং সংস্কৃত-উর্দু দুই রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তা' ছাড়া লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, হায়দ্রাবাদ এসব জায়গার উর্দুর মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উর্দুতে মৌলিক সাহিত্যের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ হয়তো সামান্য, কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যে উর্দু সত্যিই সমৃদ্ধ। আমি উর্দু ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্যসত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি, উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহর মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে ক'রে ভাবে মাতোয়ারা, অথচ বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এই সব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই; ব্যাপারটা শুধু ধ্বনিজ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মোহে আমরা আর কতদিন আবিষ্ট থাকব? আমাদের জগৎ-সংসারের দিকে তাকাতে হবে, তার জীবন-স্রোতের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে। সুতরাং স্বপ্নচালিতের মত, বা কলের পুতুলের মত না চলে মানুষের মত চলতে হবে। আমাদের মোহাবেশ কাটাতে হবে, চোখ মেলে বিষয় ও ব্যাপারের যাচাই করে নিতে হবে। সেই চলাই হবে আমাদের প্রকৃত স্বাধীন চলা। এর একমাত্র সহায় হচ্ছে মাতৃভাষার যথোপযুক্ত চর্চা এবং জীবনে যা কিছু সুন্দর, লোভনীয় বা বরণীয় মাতৃভাষার মারফতেই তা সম্যক অর্জন করা। আমাদের এই মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের প্রকৃত উন্নতি হ'তে পারে না।

অবশ্য সম্পূর্ণ জীবন বলতে আত্মকেন্দ্রিক জীবন বুঝায় না, দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনযাত্রাই বুঝায়। কাজে কাজেই ভিন্ন ভাষাভাষীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য ভিন্ন ভাষাও

শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু এ শিক্ষা, মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ শিক্ষার পটভূমির উপর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, মাতৃভাষার পরিবর্তে কিছুতেই নয়। বলা বাহুল্য, আমাদের আশে পাশে যে সব লোক বাস করে, অর্থাৎ আমরা আমাদের পরিপার্শ্বস্থ যে সব লোকের মধ্যে বাস করি, তাদের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক নিকটতম—কাজেই তাদের দাবীই অগ্রগণ্য, দূরবর্তীদের দাবী এর পরে। তাই মাতৃভাষায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর, প্রয়োজন মত অন্য ভাষা শিক্ষা করতে হবে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু মাতৃভাষা, পরে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর শেষ তিন-চার বছর এর সঙ্গে প্রয়োজন মত অন্য একটি বা দুটি ভাষা জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে এইসব দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষার শিক্ষাও দ্রুততর এবং অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হবে।

শিক্ষার বাহন অবশ্যই মাতৃভাষা হবে। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে, হয়তো ইংরেজী ভাষাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। কিন্তু এর উপর অত্যধিক জোর দেওয়া এখন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। রাষ্ট্রের ভিন্নপ্রদেশীয় লোকদের বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে আমার বিবেচনার পণ্ডিতি ও মৌলবী-উর্দুর মাঝামাঝি ধরনের উর্দুই সবচেয়ে বেশী উপযোগী হবে। এই দিক দিয়ে বর্তমানে উর্দু ভাষারও সংস্কার করা আবশ্যক। বৃথা অহমিকা বা অন্ধ গোঁড়ামী ত্যাগ করে এক যোগে কাজ করলে বোধ হয় উর্দু ও হিন্দীর পার্থক্য কমিয়ে পাকিস্তান ও ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের উপযোগী একটি বলিষ্ঠ অর্থাৎ সহজ Lingua franca বা সার্বভৌম ভাষা সৃষ্টি করা যেতে পারে। ম্যাট্রিকুলেশনের শেষ তিন-চার শ্রেণীতে এ ভাষা শিক্ষা দিলে বোধ হয় ছাত্রেরা মোটামুটি ধরনের ব্যাপক কালচারের অধিকারী হ'তে পারে; আর যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষা শেষ করে, তারাও অকারণ ভাষা-নিষ্পেষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শুধু মাতৃভাষার সাহায্যেই আবশ্যক জ্ঞান ও স্বকীয় কালচারের স্বাদ পেতে পারে।

শিক্ষার বাহন ও সার্বভৌমিক ভাষা ছাড়াও ভাষা-সমস্যার আর একটা দিক আছে—সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা কি হবে। এতদিন ইংরেজ প্রভু ছিল, কাজেই রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী ছিল, অর্থাৎ রাজভাষাই রাষ্ট্রভাষা ছিল। রাষ্ট্রভাষা বলতে অবশ্য বুঝায়, আদালতে কোন ভাষায় রায় লেখা হবে—কোন্ ভাষায় শিক্ষিত হলে সরকারী উচ্চপদ পাওয়া যাবে, রাষ্ট্রের চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবিজে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে, ইত্যাদি। এক কথায় কোন ভাষায় শিক্ষার জন্যে সরকার থেকে সবচেয়ে বেশী ব্যয় বরাদ্দ হবে, এবং কোন ভাষায় শিক্ষিত হলে রাষ্ট্রের চক্ষে অধিক শিক্ষিত বলে বিবেচিত হবে।

অতএব পূর্ব পাকিস্তানের রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাঙলাই হওয়া স্বাভাবিক এবং সমীচীন। কোনও কোনও পরমুখাপেক্ষী বাঙালীর মুখেই ইতিমধ্যে উর্দুর ঝনৎকার শুনা যাচ্ছে। কিন্তু এঁদের বিচারবুদ্ধিকে প্রশংসা করা যায় না। আগেই উর্দুর মোহ এবং তার কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। এ সমস্ত উক্তি 'কলের মানুষের' অবোধ অপুষ্ট মনেরই অভিব্যক্তি। এতে বাঙালীর জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। এর ফলে এই দাঁড়াবে যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ-রাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অমনিই পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচি-রাজের কবলে যেয়ে পড়বে। ধর্মের অন্ধ উন্মত্ততায় মেতেই অনেকে উর্দু-উর্দু হুঙ্কার ছাড়ছেন; কিন্তু আগেই বলেছি বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়ে না হলে প্রকৃত ধর্মবোধ বা ঐতিহ্যজ্ঞান কখনও বাঙালীর অন্তরে প্রবেশ করবে না। এর জন্য চাই অনুবাদ কমিটি গঠন করে অন্য ভাষা থেকে অবিলম্বে ধর্ম ও সভ্যতার যাবতীয় প্রধান প্রধান বিষয়ের ভাষান্তরকরণ। এই কর্তব্যে উদাসীন থেকে পরের

উচ্ছিষ্ট ভোজন করে পেটও ভরবে না তৃপ্তিও হবে না। জাতির স্থায়ী মঙ্গল এ ভাবে কখনও হবে না। উর্দুকে শ্রেষ্ঠ ভাষা, ধর্মীয় ভাষা বা বনিয়াদী ভাষা বলে চালাবার চেষ্টার মধ্যে যে অহমিকা প্রচ্ছন্ন আছে তা আর চলবে না। নবজাগ্রত জনগণ আর মুষ্টিমেয় চালিয়াত বা তথাকথিত বুনিয়াদী গোষ্ঠীর চালাকীতে ভুলবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী চাকুরী করতে হ'লে প্রত্যেককে বাংলা ভাষায় মাধ্যমিক মান পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষানবিশী সময়ের পরে অযোগ্য এবং জনসাধারণের সহিত সহানুভূতিহীন বলে এরূপ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে।

সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমানই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তবু আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বাভাবিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি হবে। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু বা পোস্তু এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হবে। এ ব্যবস্থা মোটেই অশোভন নয়; রাশিয়ার মত বা কেনাডার মত আধুনিক ও উন্নত দেশে বহু রাষ্ট্রভাষার নজির আছে। রাশিয়ার পরস্পরসংলগ্ন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে যদি একাধিক রাষ্ট্রভাষা হ'তে পারে, তা'হলে পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলার মত হাজার দেড় হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে অবশ্যই দু'টি রাষ্ট্র ভাষা হতে পারে, এবং তাই স্বাভাবিক। রাশিয়ার জনমতের প্রাধান্য আছে, অর্থাৎ জনগণই প্রকৃত রাজা তাই জোর করে ভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার মত মনোবৃত্তি সেখানে মাথা তুলতে পারে না। আমাদের দেশেও, নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে, জনগণ প্রমাণ করবে যে তারাই রাজা—উপাধিধারীদের জনশোষণ আর বেশিদিন চলবে না। বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চলবে না। বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তা'হলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য।

'সওগাত'
১৯৪৭

# বাংলা ভাষা-সমস্যা

বেশ কিছুদিন আগে বাংলা বানান-সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, প্রথমে কলকাতায়, তারপর পূর্বপাকিস্তানেও বেশ খানিকটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু, তার থেকে যে-সব সমাধান বেরুল সাহিত্য-রথীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, তাতে দেখা গেল, ব্যাপারটা ছিল অনেকটা পর্বতের মুষিক-প্রসবের মতো, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া মাত্র, অর্থাৎ আরম্ভে তোড়জোড় মাত্র,—আসলে কোনও সাংঘাতিক সমস্যাই ছিল না।

বর্তমানে আবার ব্যাপক আকারে সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্মনীতি—সমুদয় পেরিয়ে একটা কোলাহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ব'লে মনে হয়। এবারে শুধু বানান-সমস্যা নয়—গোটা ভাষা-সমস্যা! এর উদ্দেশ্য কি ভাষাকে অসংস্কৃত ক'রে সংস্কৃত করা, না অক্ষর বর্জন ক'রে সরল ক'রে নেওয়া, না শব্দ বদল ক'রে এর স্বাভাবিক প্রকাশকে খর্ব করা,—তা' হট্টগোলের মধ্যে ভাল ক'রে বোঝা যাচ্ছে না।

আমার মনে হয়, বাংলা ভাষায় বা বর্ণমালায় এমন কিছু দোষ বা কাঠিন্য প্রবেশ করেনি, যার জন্য আতঙ্কিত হবার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, দেশজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজী, পর্তুগাল, তুর্কী, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি যে-সমস্ত বিদেশী শব্দ এক সময় একটু আলগা ভাবে ভাষায় ঢুকে পড়েছিল, সেগুলোর ব্যবহার বিরল হ'য়ে পড়েছে, তা' আর ধ'রে রাখা যায়নি। এমনকি, অনেক খাঁটি বাংলা শব্দ, যেমন—সত্য অর্থে 'সাচ্চা,' জাহাজ অর্থে 'বুহিত', সুপারী অর্থে 'গুয়া', চিল অর্থে 'সাচান' প্রভৃতি, বিশেষ ক'রে আগেকার গৃহস্থালীর দ্রব্যাদিও সম্পূর্ণ ব্যবহার-বহির্ভূত হ'য়ে পড়েছে। আজকার লোকে সেগুলো কি রকম ছিল, তা' স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই কালের নিয়ম। প্রত্যেক দেশেই এমন হয় ঃ অনেক নতুন শব্দ আসে; পুরনো শব্দ লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেজন্য ভাষার জাত যায় না, ভাষা কাফেরও নয়, মুসলমানও নয়। দেশের লোকে যা' বা যেমন, স্বভাবত যেভাবে তারা কথা বলে, তাই হচ্ছে ভাষার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের উপর গ'ড়ে ওঠে সাহিত্য, নানা স্তরের যত স্তরের লোক আছে তত স্তরের সাহিত্য ও ভাষা। রূপকথা, ছড়া, ধাঁধা, লোককাহিনী, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, আইন, অফিস, আদালত, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমালোচনা, কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, ডিটেকটিভ রোমাঞ্চ প্রভৃতিতে নানা প্রকারের ভাব ও উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং এ-সবের ভাষায়ও পার্থক্য থাকবেই। এ-সব পার্থক্যকে নস্যাৎ ক'রে এক রকম আদর্শ-ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব। একথা মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা উভয়ের জন্যই খাটে।

সবচরাচর ই-ঈ, উ-ঊ, ব-ব, ণ-ন, শ-স-ষ, র-ড়, চন্দ্রবিন্দু এবং সংযুক্ত বর্ণ নিয়েই বেশী কথা ওঠে। বাংলা ভাষায় দিন ও দীন, করি, কড়ি ও করী, ভাবি ও ভাবী, কুল ও কূল, পুত ও পূত, ধনি ধনী ও ধ্বনি, মড়া ও মরা, আমরা ও আমড়া, শাপ ও সাপ, অংশ ও অংসে,

সত্য, সত্ত্ব ও স্বত্ব, পরশ ও পরষ, শশা ও হসা, দীপ ও দ্বীপ, বীণা ও বিনা, বাণী ও বানি বা বান্নী, বান ও বাণ, মন ও মণ, শাপ ও শান, মরণ ও শরণ, স্বর্গ ও সর্গ, বর্শা ও বর্ষা, স্বন ও শন, ষাঁড় ও সার, শক্ত ও সক্ত, শ্বাস ও শাঁস, বাঁদী ও বাদী, কাঁটা ও কাটা, দাঁও ও দাও, চাঁই ও চাই, কাশী ও কাঁসি, ভারী দাঁড়ি ও দাড়ি, বাড়ি ও বারি, শাড়ি ও শারি, অন্য ও অন্ন, প্রভৃতি বহু শব্দের অর্থে পার্থক্য রয়েছে। ন, ণ ও চন্দ্রবিন্দু; র, ড় শ, ষ, স; উ, ঊ; ই, ঈ; ব,ব—ফলা প্রভৃতিকে এক ক'রে ফেলার কথা বলার আগে বহুবার চিন্তা ক'রে দেখতে হবে, তার কতটা সমীচীন, আর কতটা সমীচীন নয়। এ যেমন লিখন-পদ্ধতির কথা, তেমন উচ্চারণ-পদ্ধতিরও কথা। এ দু'দিক থেকে খতিয়ে দেখলে মনে হয়, লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশী। বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। বলা বাহুল্য, এস্থলে ব-বর্ণ ও ফলার মধ্যে পার্থক্য আছে। ভাষায় য, র, ল, ব এই চারটি ফলার বহু ব্যবহার রয়েছে। অতএব বর্ণ হিসাবে অন্তঃস্থ বর্ণের 'ব' বাদ দিলেও, ফলার ব-গুলি সংরক্ষণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ফলার এই 'ব' এর উচ্চারণ আরবী স্বরবর্ণ ওয়াও এর অনুরূপ। উপরে যে উচ্চারণগুলো দেওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই এরূপ সুপারিশ করা যায়।

বাংলা ভাষায় লিখন-রীতিতেই ই-কার এ-কার ও ঐ-কার ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, ও কার ও ঔ-কার ব্যঞ্জনবর্ণের উভয় দিকে আর ঋ-কার নীচে বসে। উচ্চারণের দিক দিয়ে অবশ্যই এ ব্যবস্থা কিছুটা অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু, এর সংশোধন করতে হ'লে এগুলোর বদলে নতুন চেহারার '—কার' চিহ্ন উদ্ভাবণ করতে হবে। তবে, এভাবে সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যকে বর্জন করলে নবীনদের কিছুটা সাময়িক সুবিধা হ'লেও পরবর্তীকালে এদের পক্ষে একটু আগের পুঁথি পাঠ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। গবেষকরা হয়ত কিছু ক্লেশ স্বীকার ক'রে শিখে নিতে পারবেন। কিন্তু, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই এর সাথে সাধারণ পাঠকের সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে, গবেষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে নতুন লিখন পদ্ধতি অবলম্বন করলে অন্যায় করা হবে।

সুখের বিষয়, হালে ঋ কার রেফ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণের নিম্নে বা ঊর্ধ্বে না দিয়ে লাইনো মুদ্রায়ণে এগুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণের পরে দিয়ে কিছুটা ছাপার কাজের সুবিধা ক'রে নেওয়া হয়েছে। এটা ভাল কথা। এভাবে ধীরে ধীরে সইয়ে নিয়ে হরফের আকৃতির ছোটখাট সংস্কার করায় কোন আপত্তি নেই। টাইপ রাইটারের বদৌলতে আজকাল ত্ত, স্থ, দ্ধ, জ্ঞ, হ্ন, জ্ঞ, ইত্যাদি স্থলে দ্ত, স্থ, দ্ধ, গ্জ, হ্ন, জ্ঞ, গ লেখা আরম্ভ হয়েছে। এইভাবে যান্ত্রিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে করতে এ-সব কতকটা চোখ-সওয়া হ'য়ে যাচ্ছে এবং ক্রম-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ছোট-ছোট সংস্কার-ক্রিয়া চলতে থাকবে।

ভাষার এইরূপ স্বাভাবিক বিবর্তনই ভাল, কারও নির্দেশে জোর ক'রে অস্বাভাবিক উপায়ে ভাষা-সংস্কার, বানান-সংস্কার বা লিখন-সংস্কার করতে গেলে সর্বক্ষেত্রেই অরাজকতার সৃষ্টি হবে। তালগোল পাকিয়ে শিশুশিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

বাস্তবিক পক্ষে, বাংলা বর্ণমালা বহু স্বর-যুক্ত এবং এর ব্যঞ্জনবর্ণগুলোও অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবে সহজ নিয়মে বিন্যস্ত। কোনও দেশের বর্ণমালা দিয়েই মুখের কথার আবেগ, উচ্ছ্বাস, হর্ষ, বিষাদ, কৌতুক, দ্বিধাগ্রস্ততা, ব্যাজস্তুতি পরিহাস, অবজ্ঞা প্রভৃতির পরিপূর্ণ প্রকাশ হতে পারে না। তবু বলা যায়, এক দিকে দিয়ে বাংলা ভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট। বাক্যাংশের ঝোঁক ও মাত্রাটুকু অবশ্যই মাথে না খুললে কোন ভাষাতেই আনা যায় না। তবু, বিদেশীরাও বাংলা

ভাষার শুধু স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ শিখে নিয়েই যতটা শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারেন, ততটা আর কোনও ভাষায়ই সম্ভব নয়। এটা একটা অভিজ্ঞতার পরীক্ষিত সত্য। তা ছাড়া আমরা যখন দেখছি আরবী ভাষাতে মাত্র তিনিটি স্বরবর্ণ, আর আরবীয় (জবর),—(জের), '(পেশ), অর্থাৎ আকার, ইকার ও উ-কার মাত্র, এর সবগুলির মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা সহজসাধ্য নয়, এমনকি আরবের আহলি যবানদের পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, এবং ইংরেজী ভাষায় bad, bar, bare, father, fall, infallible, me, met, come, comet mercy, indeed, although, design, folk, nation, knowledge, health, healthy, knell, psaltery, psalm, psychology প্রভৃতিতে বিবিধভাবে উচ্চারিত স্বরবর্ণ, অনুচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণ, বিভিন্ন অক্ষর সমাবেশের বিভিন্ন উচ্চারণ ইত্যাদি দেখতে পাই, আর আরবীয়েরা বা ইংরেজরা এসব অসঙ্গতি, অসুবিধা বা অনুচ্চারিত অতিরিক্ত অক্ষর বর্জনের জন্য অথবা অতিরিক্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ করবার জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়, তখন আমরা কেন অতি সামান্য কারণে অসামান্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করছি, বুঝে ওঠা দায়। আমরা দুনিয়ার আর সব কাজকর্ম ফেলে বিশেষ ক'রে সাহিত্য সৃষ্টির কথা না ভেবে, ওঝার মতো লেগে গেছি ভাষার থেকে ভূত তাড়াতে, অথচ ভূতটা আমাদের কামড়িয়েছে, না আর কোনও ক্ষতি করেছে, সেদিকে তাকাবার অবসর পাচ্ছি না।

ভাষা আপন গতিতে চলবে, কালের স্রোতে দেশী-বিদেশী লোকের সংস্রবে এসে ভাষার শব্দসম্ভারের হ্রাস বৃদ্ধি হবে, এমনকি বাক্যরীতিও পালটে যাবে,—এসব হয়েছে ও আরও হবে। কিন্তু, তার জন্য সবুর করতে হবে, সময় মতো তা' আপনা-আপনি সময়োচিত রূপ নেবে। এর জন্য প্রতিভাবানেরাও যথেষ্ট সহায়তা করবেন। কিন্তু পণ্ডিতদেরই হোক, সমাজপতিদেরই হোক, অথবা রাজনীতিকদেরই হোক, কারও নির্দেশ মত ভাষায় কোনও স্থায়ী সংশোধন বা সমৃদ্ধি লাভ হয় না—হবে না। এরূপ অবাঞ্ছিত ও আত্মঘাতি হস্তক্ষেপের ফলে দেশবাসীর চিন্তাশক্তিতে বাধা পড়বে, ভাবের স্বাধীনতা ব্যাহত হবে, ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যজনিত আনন্দের অভাব হবে। মোট কথা, সাহিত্যে মৌলিক চিন্তার বিলুপ্তি ঘটবে, আর এ ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে হয়ত কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে। আমরা চাই ভাষার যথারীতি অগ্রসরতা, তার স্থলে লাভ হবে নিষ্ফল পশ্চাদবর্তিতা। আমাদের সাহিত্যিকদের পণ্ডিতদের এবং সংশ্লিষ্ট দেশবাসী ও দেশ-নেতাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, মুখের কথা ও অন্তরের কথা এক হোক, এই কামনা করি।

# বাংলা ভাষার সংস্কার

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, বাংলা ভাষায় এমন কী দোষ আছে, যার জন্য সংস্কার আবশ্যক? ইংরেজি, উর্দু, আরবী, সংস্কৃত, লাটিন, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষার সংস্কারের কথা বড় একটা শুনা যায় না। তবে বাংলা ভাষায়ই বিশেষ করে এমন কী অসুবিধা আছে, যার জন্য এতটা হট্টগোল করে এর সংস্কারের জন্য কমিটি নিযুক্ত করতে হয়েছে?

সংস্কৃত, লাটিন, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শূন্যের কোঠায়। ইংরেজি, উর্দু আর আরবীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলা ভাষার যে-সব ত্রুটি সংস্কার করার সুপারিশ হয়েছে, সেই সেই ত্রুটি এইসব ভাষায়ও রয়েছে, এমনকি, প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। আরবীতে মাত্র তিনটি স্বরবর্ণ, আ, ই, উ; তবু স্বরবর্ণ বাড়াবার প্রস্তাব শুনা যায় না। ইংরেজিতে পাঁচ-ছয়টি স্বরবর্ণ হলেও কোনটিরই খাস উচ্চারণ নাই—যেমন i-এর উচ্চারণ 'bird, bite ও but-এ বিভিন্ন : e-র উচ্চারণ he, bet, meet ও jeer এ বিভিন্ন; u-এর উচ্চারণ but ও put-এ বিভিন্ন; o-র উচ্চারণ got, both, blood, good-এ বিভিন্ন; a-র উচ্চারণ bad, fate, far, fan এ বিভিন্ন; এবং y-এর উচ্চারণ martyr, myth ও hypothesis-এ বিভিন্ন। আমেরিকায় এর কিছু সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে বটে কিন্তু খাস ইংল্যাণ্ডে এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য শুনা যায় না। উর্দুতে আরবী বর্ণমালার উপর প্রয়োজন মত পে, টে, চে, ড়ে, জ্যে প্রভৃতি অক্ষর নেওয়া হয়েছে এবং ফার্সীর মত এ এবং ও উচ্চারণ গ্রহণ করা হয়েছে। আবার বাংলার মত খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ফ, ভ প্রভৃতি উচ্চারণেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এ বিষয়ে উর্দু ভাষা বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নাই। তবে, উর্দু পড়বার সবচেয়ে বড় বিভ্রাট এইখানে যে, আগে শব্দের মানে না জানলে কোথায় যের, যবর, পেশ হবে, তা বুঝবার যো নাই : شعر শব্দ শের, না শীর, না শায়র। خديجه নামটি খোদেজা, না খাদিজা, না খেদিজা, খোদায়জা হবে, এ বড় মুশকিলের কথা। এ'রাব বা স্বরচিহ্ন দেওয়া না থাকলে উর্দু পড়বার জন্য আগে থেকে ভাষাজ্ঞান থাকা চাই। এসব দিক দিয়ে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতেই হবে। কেবল বর্ণমালা, আকার, ই-কার প্রভৃতির চিহ্ন আর যুক্তাক্ষরের রূপ শিখে নিলেই বাংলা যথেষ্ট নির্ভুলভাবে পড়তে পারা যায়। যথেষ্ট বললাম এই জন্য যে, কোন সহজ সঙ্কেত দিয়েই একদম পুরোপুরি ধ্বন্যাত্মক বানান সম্ভব নয়। ইংরেজি ভাষায় যুক্তাক্ষরের রূপ একরকম নেই বললেই চলে, এ দিক দিয়ে বাংলা, আরবী ও উর্দুর উপর এর শ্রেষ্ঠতা আছে। উর্দু ও আরবী বললাম এই জন্য যে, শব্দের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানের দরুন অক্ষরের চেহারা বদলায়। এই অসুবিধার অবশ্য একটি সুবিধাও আছে—অর্থাৎ কম জায়গায় তাড়াতাড়ি লেখা হয়। এ সম্পর্কে ইংরেজি বা রোমান বর্ণমালার একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা যায়— এতে ছোটহাতের আর বড়হাতের লেখায় অক্ষরের দুই রকম রূপ

হয়। গ্রীক বর্ণমালায়ও ছোটহাতের ও বড়হাতের দুই রকম অক্ষর ব্যবহৃত হয়। তবে, বলা আবশ্যক, বৈজ্ঞানিক সঙ্কেত ও গণিতব্য ফর্মুলার জন্য এর আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়েছে।

আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব দিতে গেলে দেখা যায়, অন্য ভাষায় কোন সংস্কার হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা দিয়ে বিচার করলে চলবে না। সংস্কার যে সর্বত্র একই সময়ে আরম্ভ হবে, এমন কোনও কথা নাই। আবার আর এক দেশে সংস্কার হচ্ছে না, সুতরাং আমরাই বা কেন করব, এ-ও কোন যুক্তি নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরাসী বিপ্লবের পর মেট্রিক প্রণালীর প্রবর্তন হল। কোনও দেশ তা গ্রহণ করলো, আবার কোনও কোনও দেশ (যেমন ইংল্যাণ্ড) তা করল না। সমস্ত বিজ্ঞানজগৎ বলছে মেট্রিক প্রণালীর দৈর্ঘ্য, ওজন, মুদ্রা প্রভৃতি সুবিধাজনক। এখন ইংল্যাণ্ড যদি সে-সুবিধা গ্রহণ করতে না চায়, তাহলেও সেই কারণ দেখিয়ে অন্য দেশ বলবে না, মেট্রিক প্রণালী অবলম্বন করা অনুচিত।

প্রত্যেক পরিবর্তনেই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু অসুবিধা হয়ে থাকে। তাই হরেদরে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে—সুবিধার ভাগই বেশী, না অসুবিধার ভাগই বেশী, এর বিচার করা দরকার। ভাষা-কমিটির সুপারিশ আলোচনা করলে, আমরা সে বিষয় বুঝতে পারব। এঁরা প্রচলিত স্বরবর্ণের অ, আ, ই, উ, ও, এ রেখেছেন; ঈ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, ঐ, ঔ বাদ দিয়েছেন; আর একটা নতুন স্বরবর্ণ অ্যা যোগ করেছেন। যেগুলো বাদ দিয়েছেন তার মধ্যে ৠ ঌ, ৡ অপ্রচলিত, আর অন্যগুলো অনাবশ্যক। ই-কার আর উ-কারের হ্রস্ব-দীর্ঘ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় বটে কিন্তু বাংলায় নিয়মিতভাবে এর ব্যবহার নাই। অনেক হ্রস্ব-উচ্চারিত ধ্বনির প্রচলিত বানানে দীর্ঘ-স্বর আর দীর্ঘ-উচ্চারিত ধ্বনির বানানে হ্রস্ব-স্বর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঋ-কের +ই, ঐ-কে ই+, এবং ঔ-কে ও+উ রূপে অনায়াসে লেখা যায়। এই কারণে অক্ষর সংক্ষেপের জন্য এই যুক্ত স্বরগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে আই, আউ, এই, অউ প্রভৃতি অনেক রকম হ্রস্ব-স্বর আমদানী করা যায়। কমিটির মত এই যে, কতকগুলো ছেড়ে দিয়ে একই রকমের অন্য কতকগুলো গ্রহণ করার মধ্যে যুক্তি নাই,—আছে কেবল অভ্যাসের সমর্থন।

ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ঙ, ঞ, ণ, য, ষ, স, ক্ষ, ঢ়, ৎ ঃ এবং অন্তস্থ 'ব' বাদ দেওয়া হয়েছে। দুই জ, দুই ন, দুই ব এবং তিন শ-এর মধ্যে একটা করে রাখবার সুপারিশ করা হয়েছে। তার কারণ দেখান হয়েছে এই যে, এদের বিভিন্ন উচ্চারণ কার্যতঃ বাংলায় নিয়মিতভাবে রক্ষিত হয় না। যেমন 'শকট' আর 'সকল', এখানে 'শ' দুটোর মধ্যে উচ্চারণে পার্থক্য নাই। সেই রকম শৃগাল আর বিশ্রী; ষাঁড়, শাঁড়াসী আর সাঁওতাল-এসব ক্ষেত্রেও একই উচ্চারণ বিভিন্ন 'শ' দ্বারা করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বড়ই বিভ্রমের সৃষ্টি করে। ঞ, ঢ়, এর প্রয়োগ কদাচিত হয়, ঙ-র উচ্চারণ ং দিয়েই চলতে পারে; ৎ হস্ যুক্ত ত মাত্র; ক্ষ ও বিসর্গের উচ্চারণ অন্যভাবে অনায়াসে লেখা যেতে পারে, এজন্য এগুলো বর্জন করা হয়েছে। নতুন ব্যঞ্জনবর্ণ একটাও যোগ করা হয়নি।

স্বরবর্ণে 'অ্যা' যোগ করবার কারণ দেখান হয়েছে যে, এক, ব্যাট, ট্যাক্স, ব্যাং, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক প্রচলিত শব্দে এই স্বরটি ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণেও যাকাত, নামায, যয়নাব, যেব্রা, যের-বার, যবরদস্ত প্রভৃতি অনেক শব্দে ইংরেজি Z বা আরবী ز র উচ্চারণ করতে হয়; আবার স্ত্রী, শ্রী, পুস্তক, মস্তক, স্নান, স্পাই, ইস্পাহান, শ্রেয় শ্রাবণ, স্রোত, শ্লোক প্রভৃতি অনেক শব্দ ইংরেজি S বা আরবী ص এর উচ্চারণ করতে হয়। এখানে Z এর জন্য অন্তস্থ 'য'

আর S এর জন্য 'স' রেখে দেওয়া চলত। কিন্তু ভাষা-কমিটি তা না করে জ এর নীচে ফোঁটা দিয়ে Z, এবং ছ এর নীচে ফোঁটা দিয়ে S এর উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন। এ বিষয়ে কমিটির একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, আমাদের ছেলেরা স কে S এর মত উচ্চারণ করে পড়বে; তার ফলে, বর্তমান বানানে ছাপা প্রচলিত বইএ সে, সকল, সব-কে ছে, ছকল, ছব বলে পড়া শুরু করবে। সেই রকম Z এর বদলে অন্তস্থ য চালু করলেও ঐ রকম ব্যাপার হবে। এই ব্যাখ্যা যে একেবারে লা-জওয়াব, তা বলা চলে না। পূর্ববঙ্গের লোক প্রায়ই চ, ছ, জ, ঝ এর উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গের মাপ-কাঠি অনুসারে শুদ্ধভাবে বলতে পারে না এরা উচ্চারণে চ.াচ া, ছ াগল, জ.জ, ঝ.ড় বলে থাকে। বাস্তবের খাতিরে এ রকম উচ্চারণ স্বীকার করে নিলে হয়ত চ, জ, ঝ এদের প্রত্যেকটার নীচে ফোঁটা দিয়ে চ., ছ., জ, ঝ করা যেতে পারত। এখন কথা হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় এ পার্থক্যটুকু কি অগ্রাহ্য করা উচিত, না স্বীকার করাই উচিত? এ বিষয়ে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। আমার বিবেচনায়, চ ছ জ ঝ এর প্রত্যেকটির নীচে যদি ফোঁটা দেওয়া না হয়, তাহলে S এর উচ্চারণ 'স' দিয়ে আর Z এর উচ্চারণ 'য' দিয়ে দেখালেই বোধ হয় সহজ ও সঙ্গত হত।

আ-কার ই-কার প্রভৃতি স্বর-চিহ্ন প্রত্যেকটিই বর্ণের ডান দিকে বসবে। বর্তমান ই-কার, এ-কার, ঐ-কার বর্ণের আগে বসে তাতে 'কে' বলতে ক-য়ে একার না এ-কারে ক বসেছে, এ নিয়ে প্রথম শিক্ষার্থীর বেশ গণ্ডগোল বাধতে পারে। আবার ও-কার ও ঔ-কার আগে-পিছে বর্ণকে ঘিরে রাখে, এ ব্যবস্থা যে অসঙ্গত, অন্ততঃ অসমঞ্জস একথা সহজ বুদ্ধিতেই আসে। অভ্যাসের বশে অনেক সময় অসঙ্গতি আমাদের চোখে ঠেকে না। তবু অসঙ্গতি যত কম থাকে, ততই ভাল। ভাষা-কমিটির সুপারিশ অনুসারে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর তুলে দেওয়া হয়েছে, কাজেই দুইটা ই-কার আর উ-কার এখন অনাবশ্যক। বর্তমানের দীর্ঘ ঈ-কারটাকেই 'ই'-কার এবং হ্রস্ব-উ-টাকেই 'উ'কার রূপে ব্যবহার করবার প্রস্তাব হয়েছে। এ-কার বর্ণের ডান দিকে বসবে, এবং এ-র চেহারা হবে উল্টান এ-কার কিংবা মাথা-ওয়ালা ১-এর মত। আমার বোধ হয়, সংখ্যা লিখবার সময় এতে কিছু গোলমাল হবে। 'এ'র লেজটুকু কেটে দিয়ে মাথা আর ধড়টুকু রাখলেই বোধ হয় সুবিধা হত। তাহলে 'কে' লেখা হত ক' এইভাবে। সমস্ত স্বরচিহ্নই ডান দিকে লিখলে টাইপ করাতেও সুবিধা হয়। আমার মনে হয় টাইপ করবার সময় এ-নিয়ম বহাল রেখে, হাতে লিখবার সময় উ-কার বর্ণের নীচে লিখলেও ক্ষতি নাই। এতে অন্ততঃ খানিকটা জায়গা বাঁচবে। ভাষা কমিটি ঔ-কার বর্জন করে তার এ-কারের টানটুকু বাদ দিয়েই বাকীটুকু অর্থাৎ জটাওয়ালা আকারটুকু দিয়েই ও-কার লিখবার ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দিক দিয়ে তাঁদের এ-সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

বর্তমানে গু, শু, রু, রূ, হু, হৃ, প্রভৃতি লিখবার সময় স্বরচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধরে। ভাষা কমিটি উ-কার আর ঊ-কার উঠিয়ে দিয়ে, এবং উ-কার যোগে বর্ণের কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে এ-সমস্যার মীমাংসো করেছেন। ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যোগ হয়ে বর্তমানে ক্ষ (ক্ষমা), ঙ্ক (অঙ্ক), ঙ্গ (অঙ্গ), হ্য (বাহ্য), [illegible], ট্ট (অট্টালিকা), দ্ধ (বদ্ধ), ন্ধ (অন্ধ), ন্ত (অন্ত), ক্র (চক্র), ঞ্জ (অঞ্জল), ঞ্জ (গঞ্জনা), গ্ম (বাগ্মী), শ্ম (রশ্মি), হ্ম (ব্রাহ্ম), জ্ঞ (অজ্ঞ), ত্র (অত্র-তত্র), হৃ (সোহ্রাব), হ্ন (অপরাহ্ন) প্রভৃতি অনেক জায়গায় বেশ গোলমেলে রকমের যে মিশ্র-ব্যঞ্জনের সৃষ্টি হয়, তা ক্ষতিকর কিনা বলা যায় না, কিন্তু অস্বস্তিকর বটে এ বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হবেন। ভাষা-কমিটি এর এক সহজ সমাধান দিয়েছেন, অর্থাৎ এক

ব্যঞ্জনের সঙ্গে আর এক ব্যঞ্জন মিশতেই পারবে না। এতে গুরুতর ব্যঞ্জন-সমস্যা লঘুতর হয়েছে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হসন্ত চিহ্ন আমদানী করতে হয়েছে। এই হসন্তগুলো চাপিযুগে (।) ব্যঞ্জনের মিল দেখিয়ে দিচ্ছে, অথচ একটি আর একটির জায়গায় জবর-দখল করতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করছে। হস-অস্ত্রের গুণে এ-ব্যাপার সম্ভব হলেও আজকালকার কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার যুগে অত্যধিক জায়গা জুড়ে যাচ্ছে। অল্প জায়গায় বেশী কথা লেখা যায়, এ-ও বাংলা লেখার একটা গুণ ছিল। যা'হোক দুই কূল রক্ষা করা যখন অসম্ভব হয়, তখন আপোসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, টাইপ করবার ও ছাপবার সময় ভাষা-কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা সুবিধাজনক। লিখবার সময় ক্ত, ণ্ট, ন্ত্র, ক্র, ক্র, ম্প, ঙ্গ, ক্য প্রভৃতি অরূপান্তরিত বা স্বল্প রূপান্তরিত সংযুক্ত বর্ণ একটির নীচে একটি লিখলেও চলতে পারে। এতে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যধিক বিচ্ছিন্ন হবে না, এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্যও আমাদের ছেলেদের কাছে অত্যন্ত পৃথক বলে মনে হবে না। আমরা হ্ম কিংবা জ্ঞ লিখতে হ-এর নীচে ম কিংবা জ-এর নীচে ঞ লিখতে পারব। টাইপের বা ছাপার বই পড়তে হলে বর্তমানে হস-চিহ্ন অনেক বেশী লাগবে সন্দেহ নাই। তবে আশা করা যায়, কিছুদিন অভ্যাস করলেই হস্-চিহ্ন ছাড়াই 'স্ত্রী', 'ষ্টেশন' প্রভৃতি চিনতে ভুল হবে না।

আর একটি কথা। বোধ হয় র-ফলা, রেফ এবং ঋ-কার রাখলেও ক্ষতি নেই। অবশ্য আমি আপোসের কথা বলছি। তৃণ আর ত্রীণ; ধর্ম আর ধরম; ক্রয় আর করয়—এর মধ্যে প্রথমটার বানানই সহজ বলে মনে হয়। প্রস্তাবিত বানানে পদ্য আর পদ একভাবেই লেখা হবে, তাতে য-ফলার বিশিষ্ট 'হয়' উচ্চারণ নষ্ট হবে। এ-বিষয় বিচার-বিবেচনা করে দেখবার মত।

ণত্ব-ষত্ব, এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ তুলে দিলে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীনতা থেকে অনেকখানি নিষ্কৃতি পেল মনে করা যেতে পারে। ব্যাকরণ ভাষার উপরে আধিপত্য করতে আসলেই গণ্ডগোল, এর কাজ চলতি ভাষার প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়তা করা—অর্থাৎ যেসব নিয়ম ভাষায় ও ব্যবহারে চলিত আছে, সেগুলো শ্রেণীবদ্ধ করে চোখের সামনে তুলে ধরা। ব্যাকরণ প্রকৃতপক্ষে সংগ্রাহক, এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক পন্থা ও পারিপাট্য থাকতে পারে, কিন্তু তা কোনও মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না।

প্রবীণ সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ভাষা-কমিটির প্রস্তাবিত সুপারিশের আর একটি বিশিষ্ট গুণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যুক্তাক্ষর থাকায় আমাদের নূতন কবিদের অনেকেরই ছন্দপতন দোষ সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখন যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের জোড় ছাড়িয়ে দিলেই তাঁদের পক্ষে ছন্দ-দোষ ধরতে পারা অনেক সহজ হবে। একথা সত্য হলেও হতে পারে।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব বানান-রাজ্যের অরাজকতা নিবারণ করবার কথাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কোন, কোনো, কোনও; হোলো, হল, হলো, করত, করতো, কোরতো, কোত্তো, কত্ত প্রভৃতি বিকল্প রীতির উল্লেখ করে বলেছেন, ভাষা-কমিটি এর একটা নির্দিষ্ট পন্থা দেখিয়ে দিলে ভাল হতো। চাঁদা আর চান্দা সম্বন্ধেও বিশেষ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন একটা পরিবর্তনের সময়, এ সময় লোকে কিছুদিন স্বাধীনভাবে লিখে গেলে মন্দ হয় না। পরে এসব বানান একটা সুনির্দিষ্ট রূপের অভিমুখী হলে তখন সেটাকে ব্যাকরণে বদ্ধ করে ফেলা যাবে। আগের থেকেই ব্যাকরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়ত সঙ্গত হবে না।

অন্য দেশ বা অন্য ভাষা এ-সব সমস্যা (বা অনুরূপ সমস্যা) নিয়ে চিন্তা করুক আর নাই করুক, মোটের উপর আমার মনে হয় প্রস্তাবিত সংস্কার প্রশংসার যোগ্য। এ সম্বন্ধে উপরে যৎকিঞ্চিৎ যা মন্তব্য করা হয়েছে, তা এর মূল আদর্শের অনুবর্তী, পার্থক্য কেবল কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে।

শুনেছি ভাষা-কমিটির রিপোর্ট অনেক দিন হলো দাখিল করা হয়েছে, তবু এ সম্বন্ধে পুরো বিবৃতি বা গবর্ণমেন্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কোনও নমুনা দেখা যাচ্ছে না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, এর সঙ্গে পূর্ব-বাংলার সকলেই সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট। অতএব, সংবাদপত্রাদির মারফত এর বহুল প্রচার হওয়া দরকার। তাহলে দেশবাসী প্রয়োজন মত নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে। তাতে অনেক বিষয়ের সুমীমাংসা হয়ে যেতে পারে।

কোনও কোনও সাহিত্যিক-বন্ধু প্রস্তাবিত সুপারিশকে অতীতের সঙ্গে (অর্থাৎ অতীত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে) অতিমাত্রায় বিচ্ছেদ বলে মনে করেছেন। তাঁদের অভিমতও বিবেচনা করে দেখবার মত। ভাষা-কমিটি রিপোর্টে লিখেছেন, অতীতের সঙ্গে অতি-বিচ্ছেদ না ঘটান তাঁদের একটি মূলনীতি ছিল, এবং সে-জন্য যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে তারা সুপারিশ করেছেন। তাঁদের মতে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল-সাহিত্য বুঝবার পথে কোনও অসুবিধা হবে না। সামান্য যা অদল-বদল হয়েছে, এটুকু যারা আয়ত্ত করতে পারবে, তারা ইচ্ছা করলে পরে (হয়ত স্কুলের নবম-দশম শ্রেণীতে) প্রাচীন বানান-পদ্ধতিও শিখে নিতে পারবে। পুথির বানান অনেকাংশে প্রচলিত বানানের চেয়ে পৃথক, কিন্তু তাতে পুথি পড়তে কোনও কষ্ট হয় না। যে-সামান্য পরিবর্তন অনুমোদন করা হয়েছে, সে-পরিবর্তনটুকু থাকার দরুন প্রস্তাবিত ভাষাকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক বাংলা ভাষা বলে মনে করা যায় না। ভাষাবিদ ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব কতকগুলি এমন প্রমাণ প্রয়োগ করে অক্ষর সংস্কারের সমর্থন করেছেন যে, তিনি আশা করেন যে, পরিণামে পশ্চিমবঙ্গের লেখকগণও এই সংস্কার অনেকাংশে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। বিশেষতঃ স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে, স্বাধীন স্বাভাবিক ভাষায়, অবাধে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যও অচিরে এমন এক পর্যায়ে উঠতে পারবে, যাতে পুরাতন সাহিত্যের কিছু কিছু বাদ দিলেও সাহিত্যরস ভোগের বিশেষ অঙ্গহানি হবে না। এমন আশা করা অবশ্যই ভাল। তবে সবদিক আলোচনা করে লাভ-ক্ষতির হিসাবনিকাশ করে কাজ আরম্ভ করাও বুদ্ধিমানের কাজ—একথাও অস্বীকার করা যায় না।

'মাসিক মোহাম্মদী'
ফাল্গুন ১৩৫৭

# বাংলা ভাষার নতুন বিন্যাস

প্রবন্ধের শিরোনাম শুনেই পণ্ডিতেরা মনে মনে হাসবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন, "নতুন বিন্যাস" আবার কেমন?—গুরুচণ্ডালী দোষ ঘট্‌ল যে। হয়, "নব বিন্যাস", না হয় "নয়া সাজ", বা ঐরকম কিছু হওয়া উচিত। আমার জওয়াব এই যে, নতুন ব্যবস্থায় 'গুরু' আর 'চণ্ডালের' মধ্যে তেমন গুরুতর ব্যবধান রাখা আর চলবে না। এইদিক দিয়েই বাংলা ভাষার সংস্কার অনেকদিন ধরে চলে আসছে, এখনও চলবে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা ত সাধারণের ভাষা একঘরে করে "সংস্কৃত" নিয়েই মত্ত থাকতেন; কিন্তু গৌড়ের মুসলমান সুবাদারদের এবং আরাকান রাজ্যের মুসলমান অমাত্যদের উৎসাহ ও পোষকতায় "সর্ব্বনেশে" কাশীরাম-কৃত্তিবাস এবং চণ্ডিদাস, দৌলত কাজী, আলাওল, 'গুণরাজ' খাঁ (মালাধর বসু), সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ প্রভৃতি অগ্রণীগণ জনগণের মনোমন্দিরে আসন ক'রে নিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ "রৌরব" নরকের ভয় উপেক্ষা করেও সংস্কৃতের কুঞ্জবন থেকে ফুল আহরণ করে গৃহ-সজ্জায় লাগাতে কুণ্ঠিত হ'লেন না; আর কেউ কেউ আরবী-ফারসীর সম্পদ ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে সাধারণ গৃহস্থের আটপৌরে কাজে সেসব লাগাতে দ্বিধাবোধ করলেন না। বাস্তবিকই, এঁদের চেষ্টায় বাংলার কাব্য হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের মিলনভূমি হ'য়ে দাঁড়াল। এতে যেন লোক-শিক্ষার এক সদর রাস্তা খুলে গেল। উদাহরণ দিলে বোধ হয় কথাটা স্পষ্ট হবে।

কবি ফয়জুল্লাহ (পঞ্চদশ শতক)—
কোন্ নালে আসে প্রাণ, কোন্ নালে রয়।
কেমন সংযোগে আত্মা পরিচয় হয়॥
কোন্ ক্ষণে করে মন আমলে গমন।
কোথায় বৈসয়ে পঞ্চ তন্ত্রের সাধন॥

কবি জৈনুদ্দীন (ষোড়শ শতক)—
রসুল-বিজয় বাণী অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ-মনে আনন্দ অপার॥
শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্য্যবন্ত হৃদি।
শাহা মোহাম্মদ খান্ সর্ব্বগুণনিধি॥
তাঁর পাদপদ্ম বন্দি' ধ্যানে ধরি সার।
হীন জৈনুদ্দীন কহে পাঁচালী পয়ার॥

**মোহাম্মদ এয়াকুব—**

লোহু ভরা দুই হাত এমাম উঁচা করে।
এমামের লোহু গেল আসমান উপরে॥
আসমান উপরে লোহু ছিট্‌কিয়া লাগিল।
সিঁদুরিয়া মেঘ হ'য়ে আসমানে রহিল॥
আজিতক সেই মেঘ ওঠে আসমানে।
শহীদ হোসেনের লোহু জান সর্ব্বজনে॥

**কাজী দৌলত—**

দেখ ময়নামতী, প্রথম আষাঢ় চৌদিগে সাজে গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিয়া পথিক আইসে নিজ মন্দির॥
যার ঘরে কান্ত সেই সোহাগিনী পূরে মনোরথ কাম।
দুর্ল্লভ বরিষা তামসী রজনী নির্জ্জন সঞ্চিত ঠাম॥

**সৈয়দ আলাওল—**

কামের কোদণ্ড ভুরু অলকা-সন্ধান।
যাহারে হানয় বালা লয় যে পরাণ॥
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই ত্যজিল কুসুম-শর ধনু॥
ভুরুচাপ গুণাঞ্জন বাণ-কটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য॥
কদাচিৎ গগনে উদিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরুভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ তনু॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল॥
প্রভারুণ-বর্ণ আঁখি সুচারু নির্ম্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল॥
কাননে কুরঙ্গ জলে শফরী লুকিত।
খঞ্জন-গঞ্জন নেত্র, অপাঙ্গ রঞ্জিত॥
পুণ্যফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হইবে অমর॥

—(পদ্মাবতী)

**শেখ মদন—**

(তোমায়) পথ চ্যাক্যাছে মন্দিরে মসজেদে॥
(ও তোর) ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
(আমায়) রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

ডুব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়, তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়,
বল্ তো গুরু কোথায় দাঁড়ায়—
(তোমার) অভেদ সাধন মরল ভেদে॥
তোর দুয়ারেই নানান তালা,—পুরাণ কোরাণ তসবি মালা,
ভেখ-পথই ত প্রধান জ্বালা,
কাইন্দা মদন মরে খেদে॥

**মনসুর বয়াতি—**
তালাক-নামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি॥
আমার খসম না ছাড়িবে পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে॥
(মৈমনসিংহ গীতিকা)

**আবদুল গাফফার—**
জ্বিন পরিজাত কিম্বা দৈত্য যদি হয়।
মনুষ্য যে সেই সবে দেখিতে না পায়॥
তবে যারে দেখা দেয় পায় সে দেখিতে॥
নতুবা কেহ না দেখা পায় কোনো মতে॥
এ বাক্যে প্রভুর নাম করিয়া স্মরণ।
পরি-পরে নূর বখ্ত কৈল আরোহণ॥
সেই স্থান হৈতে পরি রাজ সূতে নিয়া।
বাতাস ভরেতে উড়ি ফেরেন ভ্রমিয়া॥
সবে অপরূপ দেখে বাক্য নাহি সরে মুখে
মনে অতি লাগিলেক ধন্ধ।
মনুষ্য সে কি প্রকারে, উড়িতেছে শূন্য ভরে
কভু ইহা না হয় পছন্দ॥
(নুরবখ্ত নওবাহার)

**কবিকঙ্কণ—**
সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সুজনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।
ধর্ম্মরাজা মানসিংহ বিষ্ণু-পদাম্বুজে ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মোহাম্মদ শরীফে।

উজির হলো রায়জাদা ব্যাপারীরা ভাবে সদা
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হ'লো অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি॥

বিদ্যাপতি—
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে।
আছইতে আছলা কাঞ্চন পুতলা।
ভুবনে অনুপম রূপগুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা॥
বাম করে কপোল লুলিত কেশভার॥
কর নখে লিখু মহী আঁখি জলভার॥

কৃত্তিবাস—
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যুঅস্ত্র রবে তব ঘরে॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ।
ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥
বর গুণে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকিতে কন॥

কাশীরাম দাস—
ভারতের কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরু তাহা সকল সংসার॥

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলা কাব্য-সাহিত্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই হিন্দু-মুসলিম কবিগণের সম্মিলিত চেষ্টায় হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টি-সমন্বিত হ'য়েছিল। আপাত-বৈষম্যের উর্ধ্বে শাশ্বত ঐক্যবোধ জাগাবার চেষ্টাও হ'য়েছিল। ভাষা ছিল সরল ও স্বাভাবিক—আরবী-ফারসী শব্দ অসংকোচে সংস্কৃত-মূলক শব্দের সঙ্গে মিশে বাংলায় পরিণত হয়েছিল।

গদ্যসাহিত্য সে যুগে প্রায় ছিল না বললেই চলে। কেবল দলিল-দস্তাবিজ আর চিঠিপত্রের মধ্যেই যা' নমুনা পাওয়া যায়; তাতে দেখা যায়, আরবী-ফারসী কায়দা বা বাক্যরীতি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা থেকে একটা উদাহরণ তুলে দেই—"শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অলি জানবে শ্রীমত্যা রাইকিশোরী দেব্যা নাবালিকা জওজে ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় সাকিন তকিপপুর, জেলা হুগলী, পরগণে আরশা।

বকলম শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার আমমোক্তার

সাং [illegible]

ইহার সংস্কৃতানুযায়ী বাংলা করিতে হইলে এরূপ কিছু করিতে হইবে,—"আরশা পরগণার অন্তর্গত হুগলী জেলার মধ্যে তকিপপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় যে মৃত ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ে অপ্রাপ্ত ব্যবহারা বিধবা বর্নিতা শ্রীমতি রাইকিশোরী দেবীর রক্ষক ও কার্য্যকারক আছেন, তাঁহার সেই কার্য্যকারত্বরূপে ও স্বকীয় সাধারণ প্রতিনিধি কর্মচারী জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী বেলডিহী গ্রাম নিবাসী আমি শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার ঐ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁহার স্বীয় পক্ষে ও ঐ কার্যকারকত্ব পক্ষে লিখিয়া দিলাম"। "এরূপ করিলেও কেবল সংস্কৃতে বাঙ্গালী পণ্ডিতের বোধগম্য হইবে না। অন্য উদাহরণের প্রয়োজন নাই। পারশী ভাষায় বাংলার যে বিশেষ রূপান্তর হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।" এরপর গুটিকয়েক পরিবর্তনের নির্দেশ আছে, তাও উদ্ধৃত করছি :

১. বিশেষণ পদ অনেক সময় বিশেষ্যের পরে বসিতেছে। যথা—শ্রীমতি রাইকিশোরী দেবী, দেবী নাবালিকা; কানুন চাহরম।
২. সম্বন্ধ পদ সম্বন্ধের পরে বসিতেছে। যথা—অলি জানবে অমুক— (অমুকের পক্ষে কার্যকারক)
৩. নূতন পদ্ধতির বহুবচন। যথা—নদীয়া জেলায় বলে—মাগীন, ছোঁড়ান।
৪. সাকিন, মোকাম, বকলম, বনাম, মারফত, দরুন, বাবতে প্রভৃতি বহুবিধ ও বহুসংখ্যক যোজক অব্যয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ অব ক্ষুদ্র একটি কথায় প্রকাশ করিতেছে।
৫. তাহাতে ভাষা কিছু দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে।
৬. আক্কেল-সেলামী, বেগারের দৌলৎ, হাকিম ফেরে হুকুম ফেরে না, প্রভৃতি ছোট ছোট বাক্য প্রবিষ্ট হইয়া ভাষার ফুটকি বিভাগের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।
৭. আধুনিক রাজধর্ম-সম্পর্কীয় নানা ফারসি শব্দ ভাষায় সংযুক্ত হইয়া বঙ্গভাষাকে কার্যকরী মূর্তি ধারণ করিবার উপযুক্ত করিয়াছে, বিষয় কার্যের উপযুক্ত করিয়াছে।
৮. রূপাদি বর্ণনে ধারাবাহিক অত্যুক্তি কথন প্রথা প্রচারিত হইয়াছে; 'ইউসুফ-জোলেখা'—আদি গ্রন্থের রূপ বর্ণনের সহিত বিদ্যার রূপ বর্ণনের তুলনা করিবেন, আর কত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা ফার্সীজ্ঞ পাঠক বিলক্ষণ জানেন।

"যে মুসলমানেরা পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর এই বঙ্গে একাধিপত্য করিয়াছেন; ধর্মে মানিকপীর, সত্যপীর, ওলাবিবি, বনবিবি চালাইয়াছেন; ধর্ম-সংস্কারে দশ সংস্কারের উপরে সমাধি সংস্কার চালাইয়াছেন; কৃষিবিশ্বাসে মামদোভূতকে প্রত্যেক কবরস্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন; যে 'যবন' সাধারণ বাঙ্গালীর নয়নপথে পরীকে, জ্বিনকে, আকাশমার্গে উড়াইতেছিলেন; যে 'যবন' বাঙ্গালী দেহের উপরার্ধের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন; আহার-পদ্ধতির উন্নতি শিক্ষা দিয়াছেন; সমস্ত ভূভাগের বন্দোবস্ত নিজমতে করিয়াছেন; আয়ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি নিজমতে প্রচার করিয়াছেন; সেই 'যবন' যে বাংলা ভাষার রীতির কিছুমাত্র পরিবর্তন করেন নাই, একথা কে বিশ্বাস করিবে? বাংলা ভাষার রীতি 'যবন' শাসনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।"

বঙ্কিমবাবুর দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে বাঙ্গালী জীবনে মুসলমান শাসকদের প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক রেখাপাত করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটি কথাও এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ অন্যায় হবে না—সেটি এই যে, 'যবন' শব্দ এখানে অবজ্ঞার্থে বা হীনার্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং শ্রদ্ধার সঙ্গেই "বিদেশীয়", শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইংরাজ রাজত্ব শুরু হবার কিছু আগের থেকেই নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সংস্কৃতের চর্চা চরমে উঠে। পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে শুদ্ধি করতে লেগে গিয়েছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর, পণ্ডিতেরা সিবিল-সার্বিসের সাহেবদের শিক্ষার জন্য বাংলা গ্রন্থাদি রচনা করেন। সেই সময়ে সযত্নে বাংলা ভাষা থেকে আরবী-ফারসী শব্দের বহিষ্করণ হয়। মুসলমানেরা ইংরেজীকে তখন হারাম করায়, ইংরেজের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে পারেনি। কাজেই—বাংলা ভাষার উপর হিন্দু পণ্ডিতদের একাধিপত্য জন্মে গেল এবং বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা বলে পরিচিত হ'তে লাগল।

এই সময় সকলেই যে সংস্কৃতবহুল বাংলা লিখতেন এমন নয়। কয়েকটা উদাহরণ দিলে তখনকার বাংলা গদ্যের রূপ বোঝা যাবে।

১. হায়দর বখ্‌শের রচিত "তোতা-ইতিহাস" (১৮০১) :

"যখন সূর্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন খোদেস্তা মনের দুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজেস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কই তুমি এখন স্তব্ধ কেন আছ? খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য রাত্রিতে আপন মনোদুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না। এমন দিন কবে হইবে যে, আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব?"

—এ বাংলা অতি সহজ ও স্বাভাবিক।

২. রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১) : "শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ। আমার সহিত হস্তী বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নহবতখানা; তাহাতে অনেক অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে যন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে। নহবতখানার উপরে বাড়ি ঘর। সেস্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদগর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

—এর ভাষাও বেশ পরিণত। আন্দাজ মাফিক ফারসি আর সংস্কৃত শব্দ আছে। কিন্তু পণ্ডিত হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার "সাহেব"দের সুশিক্ষার জন্য একে 'সুসংস্কৃত' করেন।

৩. রামরাম বসুর "লিপিমালা" (১৮০১) : "অন্যের দিগকে নীতিভ্যাসে ক্ষমতাপন্ন হওয়া নহে। বরং তাহাতেই অন্তে মরিবেক, এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্বাহ নিষ্পত্তির মনোযোগ করিবা। নগরহাটের রাজা নীলমাধব বিধর্কের উপর দৌরাত্ম্য করে অতএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত তুরগারূঢ় প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরী দমন হয়। সেই এইখানের পুষ্টি।"

—এঁর আগের বইখানা সহজ বলে পণ্ডিত নিন্দা করেছিল; কাজেই এবারে রামরামবাবু যথেষ্ট কসরত ক'রে পাণ্ডিত্য জাহির করেছেন। কি পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে তা' দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

৪. কেরী সাহেবের "কথোপকথন পুস্তক" : "হালো ঝি-জামাই খাগি কি বলছিস; তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ী রাঁড়ীর কথা। তিনকুল খাগি। তোর ভালড়ার মাথা খাই। হালো আলেড়া খাগি তোর বুকে কি বাশ দিয়েছিলাম হাড়ে। উত্তর—থাক্‌লো ছার কপালী পিসেখাগী থাক। তোর পিদের ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেল্যাম কিছু ভালমন্দ হয় তবে কি তোর ইটা-ভিটা কিছু থাকবে। তখন তোমার কোন্ বাপে রাখে তা দেখব। হে ঠাকুর তুমি

যদি থাক, তবে উহার তিন ব্যাটা যেন সাপের কামড়ে আজ রাত্রেই মরে। হা বউ রাঁড়ী তোর সর্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।"

প্রত্যুত্তর—"ওলো তোর সাপে আমার বাঁ পার ধুলো ঝাড়া যাবে। তোর ঝি-পুত কেটে দেই আমার ঝি-পুতের গায়। যালো যা, বারোদুয়ারী ভারানী হাটবাজার কুড়ানি, খানকী, যা তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুঁদলী?"

—কেরী সাহেবের এই সংগ্রহের বাহাদুরী আছে। সম্ভবতঃ কেউ এরূপ বলতে পারবেন না, এতে সংস্কৃতই প্রধান, না ফার্সীই প্রধান।

**৫. হাণ্টার সাহেবের "বাংলার জাতিভেদ"** (১৮৪০) : "হিন্দু লোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্য দেশের বিদ্যাও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিংবা শুনে তথাপি তুচ্ছ করিয়া আদর করে না। অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে না।"

—এখানে অব্যয়ের ব্যবহারে কিছু দোষ ঘটলেও রচনা বেশ ঝরঝরে।

**৬. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী"** : "নবাব সিরাজদ্দৌলা মহারাজ দুর্লভরাম হুকুম দিলেন যে আমার বেগমদের নাকের নথ পর্যন্ত যত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া যে যে সরদারেরা আপন বেরাদরীদের দরমাহ যত বাকী বলে তাহাদিগকে তাহাই দেও, হিসাবের অপেক্ষা করিও না, পশ্চাৎ হিসাব হইবে, এইরূপে আজি দুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত সকল ফৌজদের বেবাক দাদনি করিয়া সকল সরদারদিগকে হুকুম দিও যে চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে যেন সকলে আপন আপন বিরাদরী সমেত আসিয়া উপস্থিত হয়।"

রাজকার্য সংশ্লিষ্ট এই ব্যবহারিক ভাষাও নিতান্ত সরল ও স্বাভাবিক। কিন্তু সে সময় দেশের হাওয়া উল্টো দিকে বইতেছিল বলে ভাষার আদর হয়নি। এমনকি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের রচনায় পাণ্ডিত্য না দেখে অনেকে এর নিন্দা করেছিল। তাই তিনি বিদ্যা প্রকাশের জন্য "প্রবোধচন্দ্রিকা" নামক আর একখানা পুস্তক লেখেন। তাতে আছে :

"তাদৃশ রাজধর্ম—বিপরীতকারী শিশ্নোদর মাত্র-পরায়ণ স্বভাগ্তার পরিপূর্ণার্থে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে কৃত সুরাপান বৃশ্চিকদষ্ট ভূতাবিষ্ট বনের ন্যায় ব্যাকুল হয়।"—

এবার বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করে কার সাধ্য। এইভাবে বাংলা ভাষা এক অদ্ভুত আকার ধারণ করছিল।

ওদিকে আবার মুসলমান পুঁথি সাহিত্যিকেরা উল্টোটান টানছিলেন। যথা :

"শোন হে মোমিন সবে, হযরত দাউদ যবে,
গেরেপ্তার ছিলেন বালাতে।
বেছের উম্মত হৈয়া, এক গোরো নেকালিয়া,
রহে গিয়া দরিয়া ধারেতে।
তওরাতের আমল ছেড়ে, সয়তানি দাগায় পড়ে,
নাফরমানি করিতে লাগিল।
হপ্তা বিচে শনিবারে, জেনো কাম নাহি করে,
এ হুকুম তৌরাতে আছিল।
কারবার বেচা-কেনা, শেকার করিতে মানা,

হারাম আছিল শনিবারে॥
ইমান বুঝিতে সার, আল্লাহ-পাক সবাকার,
ফরমাইল মাছ সবাকারে॥
ফজরেতে শনিবারে, এসে দরিয়ার ধারে,
কোদা কাদা করো সেইখানে।
সাম তক সেখা রবে, তার পরে চলে যাবে,
আপনার মোকাম যেখানে॥"

আবদুল ওহাব কৃত 'কাসাসোল আম্বিয়া' থেকে এলোপাতাড়ি এক পৃষ্ঠা খুলে উপরে উদ্ধৃত করা হ'য়েছে। অনেক স্থানে এরচেয়েও কঠিন কঠিন শব্দ আছে। যাইহোক, আমার উদ্দেশ্য শুধু এইকথা বলা যে, বাংলা ভাষা এইভাবে দুই-ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেল। আর, হিন্দু লেখকদের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশী থাকাতে পণ্ডিতি বাংলা টিকে রইল, মুন্সী বাংলা অনাদরে লোপ পেতে লাগল। মুসলমান শিক্ষিতেরাও পণ্ডিতি বাংলার নকল করতে লাগলেন, পুঁথির বাংলার দিকে মুখ তুলে চাইলেন না। এর একটি ফল এই দাঁড়াল যে, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে মুসলিম ঐতিহ্য জড়ো হয়েছিল, শিক্ষিত মুসলমানেরা তা ভুলে যেতে লাগল; অশিক্ষিতের মধ্যে কিছু কিছু চর্চা রইল বটে; কিন্তু তাও নিকৃষ্ট রুচির কবলে বিকৃত হয়ে পড়ল। এ স্থানে যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমান বাধ্য হ'য়েই প্রতিষ্ঠিত রীতিকে আদর্শ বলে স্বীকার করে নিল। তাই তাদের বিকাশ হতে পারে নাই। এই হেতু সর্বদা একটা অপকর্ষ ভাব প্রবল থাকাতে মীর মশাররফ কিংবা নজরুল ইসলামের মত বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে খুব অল্পই জন্মেছে। বলতে কি, আবার দিকদিয়ে মীর মশাররফ, কবি কায়কোবাদ, মুন্সী জেনাবউদ্দীন—এঁরাও পণ্ডিতি আদর্শেই রচনা করে গেছেন।

যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই মুসলমান শিক্ষিতদের মধ্যে জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছিল। এই সময় তাঁরা ধর্মাদি বিষয়ে মন দিয়ে বাংলা ভাষায় আপন ঐতিহ্যের ছাপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টা তেমন কার্যকরী হয় নাই। তার কারণ, পাঠকের অসাহচর্য আর লেখকের সাহিত্যজ্ঞানের অনটন। তবু তাঁরা গবেষণামূলক প্রাথমিক কাজ যা' করে গেছেন, তারজন্য আমরা অশেষ প্রকারে ঋণী এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাও ঋণী থাকবে। এদিক দিয়ে মওলানা আকরম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কবি কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জামান, এয়াকুব আলী চৌধুরী, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, কাজী আকরম হোসেন, মৌঃ আজহার আলী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, মৌঃ তসলীমউদ্দীন, মওলানা রুহুল আমীন প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য। আরও স্মরণীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং ভাই গিরীশচন্দ্র সেনের কথা। এই শেষোক্ত সেন মহাশয় সমগ্র কোরআন শরীফের প্রথম বাংলা তর্জমা করেছেন। সমগ্র মেশকাত শরীফ এবং তাজকিরাতুল আউলিয়াও তিনি বাংলা গদ্যে তর্জমা করেছেন। এছাড়া হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত মোহাম্মদ এবং এমাম হাসান ও হোসায়নের জীবনচরিত রচনা করেছেন।

তাপসমালা, গুলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ এবং দেওয়ান হাফিজের অনুবাদ করেছেন, আবার [illegible] বাক্যাবলী এবং দরবেশদিগের সাধনপ্রণালী, দরবেশদিগের ক্রিয়া, দরবেশদিগের উক্তি, [illegible] প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণীত করে অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। তাঁর অদ্ভুত কর্মশক্তি, আর প্রতিভার [illegible] কাছে সহজেই মাথা হেঁট হয়ে আসে।

উপরে যা' বলা হ'ল তার থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষায় যে ইসলামিক ঐতিহ্যের কিছুই নাই একথা সত্য নয়। বরং ঐ ধরনের অনেক রচনা ও পুস্তক রয়েছে; কিন্তু সাধারণ অশিক্ষা আর ঔদাসীন্যের দরুন সেসব উপযুক্তভাবে সমাজমধ্যে চালু হয়নি। ঔদাসীন্যের একটি প্রধান কারণ এই যে, আমরা ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই, বিশেষ ক'রে জ্ঞানকে মনের মধ্যে প্রকৃতভাবে গ্রহণ করার আন্তরিকতা এবং আদর্শ অনুসারে আমল করবার মত উৎসাহ বা দৃঢ় সংকল্প নাই। তাই, ব্যবহারিক ধর্ম প্রায়ই সামাজিক ঠেকাঠেকি, মসজিদ, ঈদগাহ বা মাদ্রাসা নিয়ে পাল্টাপাল্টি, তালাক বা কুফরী ফতোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি এইসবের মধ্যেই শেষ হয়। পরস্পর ভাই-ভাই রূপে একে অন্যের অভাব মোচনের চেষ্টা, পরের স্বার্থ বা সম্পত্তির প্রতি নির্লোভ দৃষ্টি, কারো মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে সদুপদেশ দিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার ফয়সালা করা, একত্র মিলেমিশে কাজ করবার অভ্যাস এসবের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। সচরাচর আমাদের ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে—অজ্ঞদিগের ধর্মোন্মত্ততা সৃষ্টি করে তার সুযোগে মতলব হাসিল করে নেবার জন্য ভোট সংগ্রহ বা পার্টি গঠন দ্বারা প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিলাভ করবার উদ্দেশ্যে। আজকাল তাই দেখা যায়, ধর্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতির একটি প্রধান অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম যে এর থেকে স্বতন্ত্র বস্তু একথা যেন আজকাল আমরা বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিনে।

ধর্ম আমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন—চরিত্রগঠনের প্রধান সহায়, জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্যের নির্দেশক, মানুষের সঙ্গে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। এর দ্বারা সুখে-শান্তিতে পরস্পর মিলেমিশে থাকবার শিক্ষা ও অভ্যাস হয়। তাই, জাতীয় সাহিত্য ধর্মাদর্শশূন্য হ'লে তার কোন মূল্যই থাকে না। আজকাল জনসমাজে একটা সাধারণ ধারণা হ'য়ে গেছে বা জন্মাবার চেষ্টা হচ্ছে যে, বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা—ওতে ইসলামের ঐতিহ্য কিছুই নাই, সুতরাং এ-ভাষা বর্জন করাই উচিত। ইংরেজ আমলে শিক্ষায় সম্মানে সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, ধন-সম্পদে বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমানের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, একথা অস্বীকার করার যো নাই। তাই তাঁদের রচিত সাহিত্যে তাঁদের ধর্ম বা সমাজরীতির প্রাধান্য হবে একথা বলাই বাহুল্য। তবু তাঁরাও ইসলামিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে গবেষণা করে গেছেন, তার মূল্য সামান্য নয়—এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সম্মিলিত বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুর চেয়ে বেশী ছিল। যদি এই জন-সমাজ জাগ্রত থাকত, এর নেতৃত্বের ভুল না হ'ত, এরা মাতৃভাষাকে উপযুক্ত সম্মান করত তা'হলে অবশ্যই হিন্দু-মুসলিম উভয় কৃষ্টিধারার মিশ্রণে বাংলা ভাষা আরও সমৃদ্ধ হত। নিদ্রিত বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা ছিল এই যে, হিন্দু তাঁদের জন্য ভাববে আর সাহিত্য সৃষ্টি করবে; আর পশ্চিম দেশের মাওলানারা তাদের আত্মার খবরদারী করবে আর তাদেরকে বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়ে দেবে। এরকম সমাজের মৌলিক দান সাহিত্যেই হউক বা যেকোনও ক্ষেত্রেই হউক, সে যে অতিশয় নগণ্য হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু পূর্বে যা হয়নি তা' যে চিরকালই হবে না, এর কোনও কারণ নেই। পাকিস্তান লাভের পর বাঙ্গালী মুসলমান কিছুটা জাগ্রত হয়েছে। তাদের উন্নতির অনেক বাধা দূর হয়ে গেছে। উন্নতি ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে বাঙ্গালী-মুসলমান মাতৃভাষা থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন থাকায়, সময় মত ইংরেজী ভাষার চর্চা না করায় এবং উর্দু-ফারসী প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ধর্মীয়তা প্রকাশে স্বভাবতঃই অক্ষম হওয়ায় তার দুর্দশা চরমে উঠেছিল। কিন্তু

কাছে সে ভদ্রলোকই ছিল না, আর পশ্চিমদেশীয় মুসলমানের কাছে সে মুসলমানই ছিল না। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর পূর্বতন অপকর্ষবোধ দ্বারা চালিত হ'লে চলবে না। এবার জন-সাধারণকে নিজ সাহিত্যসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, ধর্ম্মবোধ মনে-প্রাণে গ্রহণ করবার সাধনা করতে হবে—আপন ভাবনা আপনি ভাবতে হবে, আপন মুক্তি আপনিই পেতে হবে।

এরজন্য জাতীয় ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্টতরভাবে মাতৃভাষার উপর ফেলতে হবে। এর ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা ও ধর্মীয়বোধ জন্মাবে সেই হবে আসল জিনিস। তখন ফরমূলা, শ্লোক, বয়েত বা আয়াত কানের কাছে দিয়ে বেরিয়ে না গিয়ে কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করবে। বিদেশীয় ভাষার যে ধর্ম্মশিক্ষা হয়, তার পনের আনাই ধোপসই হয় না। হিন্দুদের যদি কৃত্তিবাস-কাশীদাস না থাকতেন, তা' হ'লেই প্রকৃত 'সর্বনাশ' হত। অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজ আমলে তাঁদের যে অভূতপূর্ব জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা না-হয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা "গঙ্গা, গঙ্গৌ, গঙ্গভ্যাম" এর মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে মরত। আর বাঙ্গালী মুসলমান যতই পান্দনামা, গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ বা হাফিজ-খাইয়াম-রুমী আওড়াক না কেন; যতই উচ্চঃস্বরে ইকবালের তিরানা, আস্‌রারে খুদী বা বাঙ্গে দারা আবৃত্তি করুক না কেন—এতে বড় জোর মন-ভুলানো রকম একটু উত্তেজক ভাব আসতে পারে; কিন্তু এতে জীবন-যাত্রার আসল পাথেয় হিসাবে বিশেষ কিছুই সাহায্য হবে না। তাই, আমি বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে এইসব ভাব আত্মসাৎ করার উপর এত জোর দিচ্ছি।

পশ্চিমদেশীয় মুসলমানকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি—তাঁরা উপযুক্ত নেতৃত্বে ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে, বিশেষভাবে মুসলিম জাতির (এবং সাধারণভাবে জগতের) সমুদয় ভাব-সম্পদ মাতৃভাষা উর্দুতে অনুবাদ করে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। তাই, তাঁদের উপকর্ষবোধ জন্মেছে, তাঁরা সাবালক হ'য়ে আত্মনির্ভরশীল হ'য়েছেন। বাঙ্গালী মুসলমান যে পদে পদে জীবনক্ষেত্রে হটে যাচ্ছেন, তার নিদর্শন এইখানেই। এঁরা গাফেলতী করেছেন, মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে আপন ঐতিহ্য প্রকাশ বা উপভোগ করবার সুযোগ করে নেননি। তাই এঁরা যেন মেরুদণ্ড ভাঙ্গা জীব—সর্বদা লাঠি ধরে বোঝা মাথায় করে আস্তে আস্তে চলতে বাধ্য হচ্ছেন, তাও আবার পরের ইঙ্গিতে। পশ্চিমদেশীয় মুসলমানদের মত বলিষ্ঠ হতে হলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, দেশ-ভ্রমণ, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে এই ঐতিহ্য জ্ঞান ও ধর্ম্মবোধ অর্জন করে তাঁদের সমকক্ষ হওয়া।

এখন নানা দেশীয় বিবিধ ভাষাভাষী লোক পূর্ব পাকিস্তানে একত্র হচ্ছেন; তাঁদের সংস্পর্শে ভাষায় অনেক নতুন শব্দ আপনি এসে যাবে, জোর ক'রে অপ্রচলিত বা পূর্ব প্রচলিত শব্দ আমদানী করতে হবে না। আমাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে হ'তে হবে একাধারে বাস্তবদর্শী আর আদর্শ অভিসারী। সমাজের চিত্র যেমন আছে, স্বাভাবিকভাবে তেমনি দেখাতে হবে; কিন্তু তারমধ্যে যে সাহিত্যিক মনোবৃত্তি প্রকাশ পাবে, তা' হবে কল্যাণমুখী। এই মনোবৃত্তির ছোঁয়াতেই সাহিত্য বৈশিষ্ট্যলাভ করে, এতেই পাঠকের চিত্ত জয় করে। শুধু অনুস্বার-বিসর্গ দ্বারা সংস্কৃত হয় না, আয়েন-গায়েন দ্বারা যেমন আরবী হয় না, সেইরকম শুধু হরফ বা লফজ দিয়েই সাহিত্য হয় না। এরজন্য উচ্চ ভাব থাকা উচিত। আর কল্যাণবোধক মনোবৃত্তি পিছন থেকে ক্রিয়া করা চাই।

এখন আবার গুরু-চণ্ডালীর কথায় ফিরে আসি। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে কল্যাণ আনতে হলে, তা' বোধগম্য হওয়া উচিত। কিন্তু একটা সত্য কথা এই যে, আমাদের দেশে সংস্কৃত বা

আরবি সম্বন্ধে বেশ খানিকটা মোহ আছে। কারণ, তা' ধর্মগ্রন্থের ভাষা। দশ-এগার বছর আগে একবার ঢাকায় কোন এক মসজিদের সামনে লোকে লোকারণ্য দেখে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম,—একজন আহ্‌লে-আরব এসেছেন। তিনি মসজিদে আরবি ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাই শুনবার জন্য এত উৎসাহ আর ভীড়। বুঝলাম, লোকগুলো আসলে তামাসা দেখবার জন্য বা অদ্ভুত কিছু শুনে জীবন সার্থক করবার জন্য সমাগত হ'য়েছে, ধর্ম-উপদেশ লাভের জন্য নয়। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে একটা উট কিংবা দুম্বা দেখলেও হয়ত দেখবার জন্য ঐরকম ভিড় হত। সে যাহোক, মনের কোণে ধর্ম ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা ভালই; কিন্তু তার মাত্রাবোধ থাকা চাই এবং উপকারিতার দিকটাও লক্ষ্য রাখা মন্দ নয়। আরবদেশের লোক আরবীতে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে হয়ত তাঁর মনে কোনরকম গর্বের ভাব না-ও আসতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের লোক ঐরকম আরবীতে বক্তৃতা যাঁরা দিতে পারেন, তাঁকে অতিশয় ক্ষমতাবান লোক এবং তাঁদের অন্য সবাইকে কৃপার চক্ষে দেখে থাকেন। কারণ, অন্যেরা অজ্ঞ, অন্ততঃ শরীয়ত বিষয়ে। এ অবস্থা উৎপন্ন হয় অতিরিক্ত প্রভেদের থেকে—দেশের লোকেরাই তাঁকে এত উচ্চ ক'রে তুলে ধরেন যে, তাঁর মনে উচ্চানুভূতি না জন্মেই পারে না। তবে সুখের বিষয়, ঐ প্রকার লোকদের অনেকে সত্যি সত্যিই চরিত্র মাহাত্ম্যেও যথেষ্ট শ্রদ্ধার যোগ্য। তবে কথা এই যে যাঁরা আরবি জানে না, তাঁদের মধ্যেও অনেকে চরিত্র মাহাত্ম্যে ঐ প্রকার শ্রেষ্ঠ হ'লেও লোকের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। এজন্য বুজুর্গী দেখাবার যেন একটু সাংসারিক প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়।

সাহিত্যের কাজ হবে জ্ঞান বিস্তার করে নিম্নাধিকারীকে উচ্চাধিকারীর পর্যায়ে উন্নয়নে সাহায্য করা—যাতে জনসমাজের মধ্যে পার্থক্য, অন্ততঃ ভাষা বুঝতে পারা না-পারার পার্থক্য কমে যায়। তাই রচনা এমন ভাষায় হবে, যা সাধারণের পক্ষে নিতান্ত সহজবোধ্য না হলেও একান্ত দূরায়ত্ব যেন না হয়। এখানে একটা কথা ওঠে যে, বিষয়-মর্যাদা অনুসারে ভাষার রীতি ও মান পরিবর্তন করতে হয়। জনসমাজ যখন গভীর অজ্ঞতায় হাবুডুবু খাচ্ছে তখন উচ্চ বিষয়ের রচনা লিখে কেমন করে তাদের বুঝান যাবে?

কথাটা ভাববার মত। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিজ্ঞান হয়ত নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়, তবু বি-এ. এম-এ. ক্লাসেও বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে থাকি তা' ইংরেজীর চেয়ে বেশী বোধগম্য হয় বলে ছাত্রেরা বলে থাকে। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি উর্দু ভাষায় বিজ্ঞানের ভাল ভাল সাবেক বই অনুবাদ করছেন। আশা করা যায়, সেগুলো ছাত্রদের বুঝবার মতও হয়েছে। এ ব্যাপার চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, রামরাম বসু আর মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার দু'জনেই কেমন সুন্দর সহজ ভাষায় রচনা করতে পারতেন, আবার কিরকম উৎকট দুর্বোধ্য ভাষারও নমুনা রেখে গেছেন। আমরা দেখছি, জনমত আর আর সমশ্রেণীস্থ পণ্ডিতদের মতামতের উপর তাঁদের ভাষা নির্ভর করেছে। আমরাও হয়ত ইচ্ছা করলে একটু নীচের পর্দায় সুর বেঁধে অনায়াসে লিখতে পারি, যদি তাতে সহকর্মী অন্যান্য সাহিত্যিকদের কাছে মর্যাদাহানির সম্ভাবনা না থাকে। আমার বোধ হয়, যাঁরা সমাজের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, তাদের তরফ থেকেই এই সরলীকরণ শুরু হওয়া উচিত। এতে অমর্যাদার কিছু নাই। আপাততঃ নিম্ন পর্যায়ের জন্য জনাব ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী "শেরে বাংলা" শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। পরে এর উপর ভিত্তি করেই উচ্চতর সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। আপাত-দৃষ্টিতে নিম্নাধিকারী আর উচ্চাধিকারীর মধ্যে

যতটা প্রভেদ আছে বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু ততটা নাই। এই প্রভেদের বেশীর ভাগই কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে; অর্থাৎ কোনও কোনও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন গ্রামের লোকের কাছে ইংরেজী বচন আওড়িয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে উৎসুক হন, তেমনি সাহিত্যিকদের মধ্যেও হয়ত যে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ রয়েছে তার উদ্দেশ্য, অনেকাংশে ইতরজনের থেকে ব্যবধান রাখবার কিঞ্চিৎ যত্ন। এই 'ইতরজন' যখন সোজা বাংলা বুঝতে পারবে তখন হয়ত এরাই এমন জোরালো সাহিত্য সৃষ্টি করবে যে, তাতে সোজা বাংলার শব্দ-সম্ভারের অতিরিক্ত সামান্যতম শব্দ ব্যবহার করেই প্রায় সবরকম ভাব প্রকাশ করতে পারবেন। সাধারণ লোকের মনে দুর্বোধ্য জিনিসের প্রতি একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে—তাই দুর্বোধ্য হয়ে সেই শ্রদ্ধা আদায় করবার একটা লোভ জন্মান আশ্চর্য নয়। এস্থলে এক মুন্সী সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আচ্ছা, আপনি যে পশ্চিম থেকে পড়ে আসলেন, তা বলুন ত কার লেখা সবচেয়ে ভাল?' তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'উরফীর লেখাই সর্বশ্রেষ্ঠ।' কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন—'আর সবের লেখা ত কিছু বোঝা যায়, কিন্তু উরফীর লেখা এত কঠিন যে আমাদের মুদাররেসেরাও সবটা ভাল করে বুঝেন কি না সন্দেহ।' আমার বিশ্বাস সাহিত্যক্ষেত্রে এই হিংটিংছট মনোবৃত্তি ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট কাজ করে।

এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে গুরুগিরির মোহ ত্যাগ করে জনবোধ্য সহজ বাংলা লিখতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তাঁর উৎসাহের জন্য তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়েছেন। আলালী সাহিত্য এখনও আদর পাচ্ছে।

অপর অভিযান চালিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি গুরু আর চণ্ডালকে একাসনে বসিয়ে অস্পৃশ্যতা নিবারণের সাহায্য করেছিলেন। প্রথম সংখ্যা বঙ্গদর্শনের সূচনা থেকে একটা উদ্ধরণ দিচ্ছি। বঙ্কিমবাবু লিখেছেন :

"একণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন "ফিলটার ডৌন" করিবে। একথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। ... সে যাহা হউক, আমাদের দেশের লোকের এই জলবৎ বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমন ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে; কিন্তু যদি এই দুই অংশের ভাষা এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে? প্রধান কথা এই যে একণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণীর এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছু মাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান ও কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।"

কি সুন্দর সহজবোধ্যভাবে কথাগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্কিমবাবু ইচ্ছা করলেই মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'সমর্থ' পত্রিকার উপর টেক্কা মারতে পারতেন। তাতে তাঁর

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সাময়িকভাবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত। কিন্তু তিনিই প্রথমে 'এচুকেশন' 'কলটর' 'ভরসা' 'শিবান' 'কাজেকাজেই' 'তিজিয়া উঠা' এসব শব্দকে সাহস করে 'তৎপর্য' 'অধঃশ্রেণী' 'সিক্ত' 'কৃতবিদ্য' 'সহৃদয়তা' 'প্রতিবন্ধক' প্রভৃতি গুরুতর শব্দের পাশে বসিয়েছেন এ নিয়ে সেকালে তাঁকে যথেষ্ট হাসি-মশকারা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু এই সাহসের গুণেই তিনি সেকালের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন করে বিরাট দেশসেবের কাজ করে যেতে পেরেছেন। এই সাহসই তাঁর প্রতিভার পরিচয়, এজন্যই তিনি গুরুস্থানীয় সাহিত্যসম্রাট রূপে ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সরলতার দিকে।

আর অভিযান চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সাহস ক'রে গম্ভীরভাবের রচনার মধ্যেও কথ্যভাষায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন; বাক্যরীতিও অনেক অগ্রপশ্চাৎ করেছেন। এসবের জন্য তাঁকে অশেষ ব্যঙ্গ আর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে; তাঁর কাব্যিকতার নকল করে রসিক লোকে 'হু বন্দনা', 'অংবংশং' প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রত্যয়ে দৃঢ় ছিলেন—নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

তাঁর "অন্তরের অনুভূতি আর আত্মপ্রসাদ" তাঁকে সব সমালোচনা উপেক্ষা করবার সংশয়হীন সাহস জুগিয়েছিল; তাই, তিনি বিশ্বকবিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছেন। তিনি গুরু আর চণ্ডালের মধ্যেকার ব্যবধানের কয়েকটি পর্দা ছিন্ন করেছেন।

তাঁর ভাবপ্রকাশের সাহসিকতার একটি নমুনা দেই :

"যে কারণেই হউক, যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সে দিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্ত ওদের শয়তানী। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে,—যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে পার্থক্য থাকে, সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত স্বাভাবিক সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না। ... হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে-আবরু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্ব স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীদের দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই।—আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানদের জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়েছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর না হয় তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে পরস্পরের পার্থক্যের উপর সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।"

এ ভাষার সরলতায় সাহিত্য-রসের কোন হানি হয়নি।

আর অভিযান চালিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। তিনি যেন বাঁশী বাজানোর আসরে মাদল বাজাতে বাজাতে আসলেন। বাংলার ভাবের বাগিচায় আর ধানের ক্ষেতেই আশেপাশে

বাগদাদী খোরমা, বাসরাই গুল, ইরানী আঙুর আর কাবুলী মেওয়া ফলালেন অথচ দৃশ্যটা বেখাপ্পা হল না—ফলও উপাদেয় হল। তাঁকেও অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইতে হয়েছে। কিন্তু মনের ভিতর থেকে যাঁদের প্রেরণা আসে, বাইরের বাধা তাঁদের কিছুই করতে পারে না। প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ এমন সঙ্গতভাবে আর জোরালোভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহার করলেন যে, অচিরেই তা সকলের স্বীকৃতিলাভ করলো। তাঁর—

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল
আজো তোর ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল॥
আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় ঝুরছে নিশিদিন,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল-গাওয়া মৌমাছি বিভোল॥

কিংবা—

আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়, প্রাণের বুলন্দ্ দরওয়াজায়
তাজা-ব-তাজার গাহিয়া গান চির-তরুণের চির মেলায়,
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।
যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়, সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর যেতে নারে সেই হুর পরীর
শরাব শাকীর গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।
সেথা হরদম খুশীর মৌজ, তার হানে কালো আঁখির ফৌজ,
পায়ে পায়ে সেথা আর্‌জি পেশ, দিল্ চাহে সদা দিল্-আফ্‌রোজ,
পিরাণে পরাণ বাঁধা সেথায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।

কিংবা—

সস্তা-দরে দস্তা-মোড়া আসছে স্বরাজ বস্তা পচা,
কেউ বলে না "এই যে সেহি" আসলে "যুদ্ধ দেহি"র খোঁচা।
গুণীরা খায় বেগুন পোড়া, বে-গুণে চড়ে গাড়ি ঘোড়া,
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে।
দে গরুর গা ধুইয়ে॥

এ যেন ভাষার বন্ধন-মুক্তির আনন্দ-নির্ঝর ছুটে চলেছে। ইতর-ভদ্র সকলেই এখানে নিমন্ত্রিত, প্রাণভরে রস-সাগরে অবগাহন করে নেবার জন্য।

মোটের উপর, আমার মূল বক্তব্য এই যে, দুইদিক থেকেই গুরু আর চণ্ডালের মনের ফাঁক বন্ধ করবার চেষ্টা করতে হবে। গুরু একটু নীচে নেমে এসে চণ্ডালকে খানিকটা টেনে তুলবেন, চণ্ডালও অসঙ্কোচে সাহিত্যগুরুর হাত ধরে আনন্দে এগিয়ে চলবেন। এইভাবে পরস্পরের মন বুঝাবুঝি হবে, সহজ হৃদ্যতা আর সহানুভূতি জন্মাবে। একক ঐশ্বর্যে দীপ্যমান হয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে জ্বলজ্বল্ করলে তাতে মর্ত্যের বিশেষ লাভ নেই। যথেষ্ট সহানুভূতি, আলো আর উত্তাপ দিয়ে ধরার মাটিতে সোনার ফসল ফলাতে হবে।

উদাহরণ স্থলে সাহিত্যের ভাষা, সামাজিক ভেদ, শাস্ত্র-শকুনের লোভ আর জ্ঞান-মজুরের আমলহীনতার বিষয় যে ইঙ্গিত করা হয়েছিল তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে

উন্নতি বিধান করবার চেষ্টা মনের কোণ থেকে যাতে সাহিত্য রচনার প্রেরণা যোগায়, সেদিকে একটু সচেতন হতে হবে। বাংলা ভাষায় মুসলিম কৃষ্টির যেটুকু অভাব ছিল বা আছে, সেটুকু পূরণ করতে হবে—হিন্দু কৃষ্টি বর্জন ক'রে নয়, তামাদ্দুনের সৃষ্টি করে উভয় সংস্কৃতির পরিপুষ্টিতেই স্বার্থকর পরিপুষ্ট ভাষার সৃষ্টি হবে। লোকের বোধগম্য ভাষার দিকে যতদূর এগুনো যায় তা' এগুতে হবে। যেসব শিষ্ট শব্দ সমাজে ব্যবহৃত আছে, অথচ সাহিত্যে চলন নাই, সাহিত্যের দরবারে ছাড়পত্র দিয়ে সেগুলো স্বীকার করে নিতে হবে। আবার এ ব্যাপারে অধীর হলেও চলবে না—সাহিত্যে সামান্য একটু অগ্রবর্তি হ'য়ে পথ দেখাবে বটে; কিন্তু সংযোগ-সূত্র ছিন্ন ক'রে বহু যোজন দূরে চলে যাবে না; অনুবাদসাহিত্যে ব্রতী হ'তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক সৃষ্টিও করতে হবে। দেশের বর্তমান রুচি ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য গড়তে হবে অর্থাৎ পুরাতনকে হু-বহু প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা না করে নতুন আলোকে পরখ করে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এতে হয়ত পুঁথিসাহিত্যের বিষয়বস্তু আর উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে, কিন্তু ভাবে অংকিত বর্তমান রীতিসঙ্গত হতে হবে। এ না হলে বর্তমান পাঠকের মনে ধরবে না।

ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, লোকসাহিত্য সংগ্রহ এ-সবের দিকে জোর দিতে হবে।

আমার বক্তব্য শেষ হ'ল। এখন একটা কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। ভাষার ব্যাকরণ সংস্কার, বানান সংস্কার, লিপি বদল ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই বললাম না, তার কারণ কি? আমার বিবেচনায় এগুলো অপ্রধান জিনিস। ব্যাকরণ সংস্কৃতের অনুগামী না হ'য়ে বাংলারীতির অনুযায়ী হবে; বানান ধ্বনিমূলক হবে, অক্ষরের যেটা অনাবশ্যক তা' বাদ দিয়ে আবশ্যক হ'লে নতুন অক্ষর নিতে হবে। লিপি বাংলা লিপিই থাকবে। কেউ গোটা প্রদেশের চলিত রীতি হঠাৎ জোর করে বদলাতে পারবে না। এসব দিকে লোকের একটু-আধটু দৃষ্টি পড়েছে। জন-সমাজে যখন অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন শিক্ষিত হবে, তখন বানানের ণত্ব, ষত্ব, ব্যাকরণের জটিলতা এসবের আপনা-আপনি মীমাংসা হয়ে যাবে।

মাহেনও
ভাদ্র ১৩৫৭
আগস্ট ১৯৫০

# একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব-বাংলার ইতিহাসে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৫২ সালে এই তারিখে পূর্ব-বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তানের) ছাত্র-সমাজ ও জনসাধারণ চেয়েছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের মুখের ভাষা বাংলাও উর্দুর সঙ্গে সমমর্যাদায় রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হোক। এর জওয়াবে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বললেন, "উর্দু ছাড়া আর কোনও ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে না," আর নূরুল আমীন সরকার নিরস্ত্র বাংলাভাষী ও বাংলা রাষ্ট্রভাষা-অভিলাষীদের উপরে সঙ্গিনের ধার ও বন্দুকের লক্ষ্য পরখ করলেন। কিন্তু এ আন্দোলন এতেও থামেনি—কয়েকজন অমর শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে উর্দুভাষী সংখ্যালঘুরাই বাংলার সঙ্গে উর্দুকেও সম-মর্যাদায় রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য আন্দোলন করবে সেস্থলে বাংলাভাষীরাই ওরূপ আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছিল। এরকম উল্টো কারবার পাকিস্তানের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে—এখনও তার জের চলছে।

সব দেশেই জনসাধারণ চায় বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি সমদৃষ্টিমূলক ন্যায়-ব্যবস্থা হোক। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিষম দৃষ্টির ফলে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে পর্বত-পরিমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। আগে ও শাসন-কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার অসম দৃষ্টির কথা স্বীকারই করেন নাই,—সে-স্থলে বর্তমান সরকার অন্ততঃ এ-ব্যাপারে মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবু কার্যত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ঠেকানো যায়নি, আর এর উপরে তেমন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। এরূপ বৈষম্য উচ্চশিক্ষা ও সরকারী, আধা-সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও রয়েছে। এর ফলও শুভ হতে পারে না।

পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান যে একই দেশ এবং এর সমুদয় অংশের যুগপৎ উন্নতিতেই এর আসল উন্নতি—একথা অনেক সময় বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারেও শাসক-গোষ্ঠী ও জনসাধারণের কারোরই তেমন মনোযোগ দেখা যায় না। শাসন-ব্যবস্থার গোটা কাঠামোটাই এমন হয়ে পড়েছে যে, দেশের লোকেও ভাবতে পারে না যে দেশ তাদেরই, এবং এর সমগ্র উন্নয়নের চেষ্টা করা তাদেরই মৌলিক দায়িত্ব। বর্তমানে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, দেশটা যেন শাসক-বর্গেরই খাসমহল, শাসক-গোষ্ঠীই শুধু দেশপ্রেমিক, আর তাঁরা যেটা ভাবেন সেইটাই ঠিক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মরহুম তমিজুদ্দিন খাঁ ও মুহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্ উভয়েই সমজাতীয় উক্তি করেছেন যার মর্ম হচ্ছে, "মুসলিম লীগ এবং একমাত্র মুসলিম লীগই দেশের উন্নতি করতে পারে, তা ছাড়া আর কেউ তা পারে না।" আর কায়েদে মিল্লাতও দেশের উন্নতির মূল বলে ধরেছিলেন যুক্তির জোর না শাসনের জোরকেই; কিন্তু কই, যুক্তির জোরে ও শান্তির সমস্যার মীমাংসা হচ্ছে না।

কর্তাব্যক্তিদের এসব কথায় মনে হয় দেশের লোকের সাথে দেশের উন্নতির যেন কোন সম্পর্ক নেই। এ-সব আপ্তবাক্যের মধ্যে কিছু কিছু সত্য থাকতে পারে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল নই। অবশ্য বৃটিশ আমলে এবং এর আগেও অবস্থাটা প্রায় এই রকমই ছিল; দেশ চলতো রাজা-মহারাজা, নওয়াব-বাদশাহদের, আর তাদের আশ্রিত জমিদারদের: ওঁরা নিজেদের পোষিত-লাঠিয়াল, বরকন্দাজ এবং ফৌজ-পুলিশ-জেলখানা ইত্যাদির মারফতে নিজেদের ইচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করতেন। আন্তর্জাতিক বা সর্বশ্রেণীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে, প্রকৃতই আমরা রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পন্থার যে-পর্যায়ে আছি তাকে কোনক্রমেই উন্নত বলা যায় না।

আজকাল গণতন্ত্র বা জনতন্ত্র বলে একটা বহু-অর্থবাচক, তথা বিভ্রান্তিকর শব্দ আবিষ্কৃত হয়েছে—যা আসলে সামন্ত-তন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, আদর্শ গণতন্ত্র এখনও সম্ভব কিনা তাই সন্দেহ। কারণ, আমাদের দেশের লোকের চরিত্র এমনই যে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি যা বলবেন, শতমুখে তারই প্রতিধ্বনি উঠবে। আবার অপর একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যদি বর্তমান ক্ষমতাসীন ব্যক্তির (অর্থাৎ আইয়ুব খাঁর) হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারেন, তাহলে তিনি যেমনই হন না কেন, তাঁর স্তুতি জনগণের ঠোঁটে ঠোঁটে বিপুল উল্লাসে ধ্বনিত হতে থাকবে। প্রধানতঃ এই কারণে আমাদের কর্তৃপক্ষের চারদিকে এমন একটা চাটুবাদীর মোহনীয় আবরণের সৃষ্টি হয় যে, তার যাদুকরী প্রভাবে আমাদের কর্তা-ব্যক্তিরা প্রকৃত জনমতের সংস্পর্শে আসতে পারে না; আর তাঁদের পরিবেষ্টনকারী আবরণ খাঁটি না মেকি, সে-চিন্তাও কখনও তাঁদের মনে আসে না; পরিতুষ্টি, বিশেষ করে আত্মতৃপ্তি এমনই মোলায়েম জিনিস। যতকাল যে-দেশে নিরক্ষর লোক শতকরা ৮০ জনেরও অধিক, সেখানে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত বিত্তশালী, প্রভাবশালী লোকেরাই ত ভাব ও আদর্শ যোগাবার মালিক; আর বিপুল জনতা তাদের পিছনে পিছনে জয়-জয়কার করা ছাড়া আর কিই-বা করতে পারে? এমন অবস্থায় গণতন্ত্রের অর্থই হলো আমলাতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব। কাজে কাজেই আদর্শ গণতন্ত্র যখন অসম্ভব, অথচ গণতন্ত্রই হলো উন্নত জাতির ফ্যাশন, তখন এর একটা সুন্দর নাম দিতেই হবে। সেই নাম হলো নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র; এ ছাড়া আমি উপায়ও দেখিনে। তবে সময় সময় মনে হয়, এর আরও সুসঙ্গত নাম হলো "হুগতন্ত্র", যার মূল ভাব হলো যুগের হাওয়ায় ভাবের তরী যেদিকেই যায়, সেদিকেই হাল দিয়ে মতের দিক। অবশ্য দুরন্ত কালবৈশাখী বাত্যায় যদি পাল অত্যন্ত ফুলে উঠে, তাহলে হাল ও পাল দু'টোই বেশ ঠিকমত করে তরী চালান কঠিন,—তখন পাল নামিয়ে শক্ত মাটির উপর পা ফেলে ফেলে গুণ টানতে হয়, তাতেও না কুলালে শক্ত কাছি দিয়ে মোটা গাছের গুঁড়ির সাথে শক্ত করে নৌকা বেঁধে ফেলতে হয়।

আমার মনে হয় বর্তমান গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণটা দেশের পরিচালকদের (অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলের) পক্ষে অতিশয় কঠোর ও দুর্বহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ফলে, একদিকে যেমন এক একুশে ফেব্রুয়ারীর স্থলে, ঠিক পূর্ব কারণে না হলেও অনুরূপ কারণে দেশের বহু শহরে বহু একুশে ফেব্রুয়ারীর বিস্ফোরণ ঘটছে। অপরদিকে তেমনই বিরোধী দলের লোকেরাও দেশেরই সম্পত্তি, বাড়িঘর, মোটর-ট্রাক পুড়িয়ে বা দোকান-পাট ভেঙে ও লুটতরাজ করে দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করতে ব্রতী হয়েছে। মনে হয় নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ আরও আরও কমাতে না পারলে দৈত্যদানার হাত থেকে অব্যাহতি নেই—সকল, বড় [illegible]। [illegible]

বুঝে দেশের লোক হাজার বিভ্রান্ত বা অযোগ্য বলে কথিত হলেও তাদের মতামত অনুসারেই শাসনকার্য চলতে দেওয়া ভাল। হয়ত বেশী কড়াকড়ি করতে গেলে অবস্থা ক্রমান্বয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। শোষিত ও বিক্ষুব্ধ জনগণ বা তাদের নেতাগণ যুগের বশেই হোক বা হুজুগের বশেই হোক, একটা অদ্ভুত পরিবর্তনও এনে ফেলতে পারে। তাই যদি হয়—অবশ্য নাও হতে পারে—তখন সেটা হবে নির্বুদ্ধিতার খেসারত। ঠেকে শেখারও একটা মূল্য আছে বৈ কি।

কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ভয়ঙ্কর জরুরী কথা রয়েছে—সেটা হ'ল, আমাদের দেশের আশে-পাশে আরও দেশ রয়েছে, তারাও ত সুযোগ বুঝে এ-দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তখন সদ্য-অর্জ্জিত অস্থিত স্বাধীনতার মর্যাদা (বা অস্তিত্ব) রক্ষা করার জন্য দেশের সকল জিন্নাহ্, লিয়াকত, আইয়ুব, তমিজ, ফাতিমা, ভুট্টো, ভাসানী, আজম, আখতার হামিদ, শাহাব, মুসা, ওয়ালী খাঁ, আসগর, মুর্শিদ, মুজিব; কায়ানী, ফজলুল হক, ব্রোহী এবং অন্যান্য নেতা-উপনেতা, শিক্ষক-ছাত্র, কবি-সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। একটু আশ্বাসের কথা এই যে দেশের রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে। গত সতের বছরের আবেদন-নিবেদনের পর ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব-পাকিস্তানের ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়েছে; সান্ধ্য-আইন যথা-সম্ভব তুলে নেওয়া হচ্ছে, বিরোধী দলের নেতাদেরকেও গোল-টেবিল বৈঠকে আহ্বান জানানো হয়েছে, আর সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটা বর্তমান বিধি-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যেগুলো দেশের জনগণের মনঃপূত নয় তা আস্তে আস্তে তুলে নেওয়া হবে। এতে মনে হয় অচিরেই দেশের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের মধ্যে একটা ন্যায়সঙ্গত বোঝাপড়ার ফলে বর্তমান কু-বাতাসের অবসান হবে সুবাতাসের সূচনা হবে—শীতের অন্তে বসন্ত-সমাগমের মত।

আমি রাজনীতি ও শাসননীতি সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ; তবু সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় বর্তমানে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হ'ল—গরীবের হাতে পয়সা নেই; পেটে ভাত নেই। তারা সরকারী-বেসরকারী করভারে জর্জরিত, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতায় উপায়হীন ও ক্রয়-ক্ষমতাহীন। তাই মনে হয় গোল-টেবিল বৈঠকের আলোচনায় দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শোষণকারীদের হাত থেকে গরীবের রক্ষা করবার একটা সুরাহা বের করবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তা কি হবে? আমরা ত আন্দোলন শুনে আসছি সি.এস.পি.দের মাইনে বাড়াও, সেই অনুপাতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসারদের মাইনে বাড়াও, গবর্নর এম.এন.এ., বি.ডি. প্রেসিডেন্ট এদের সবার মাইনে বাড়াও ইত্যাদি। কিন্তু এ-সবের টাকা আসবে কোথা থেকে? "কেন? জনসাধারণের কাছ থেকে—আরও বর্ধিত হারে কর আদায় করে।" এমনিতেই ত গবর্ণমেন্ট, ওয়াসা, ইউনিয়ন বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটির কর, খাজনা, শুল্ক তহরী ইত্যাদির বাবদ বৃটিশ আমলে যে-পরিমাণ দেয় কর ধার্য ছিল তার চতুর্গুণ করভারে সাধারণ লোকে একদম যাঁতাপেষা হয়ে পড়েছে। তার উপরে আরও আদায় বৃদ্ধির চেষ্টায় এরা সব একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়াবে। ফলে, ক্ষুধিত মানুষের দ্বারা লুটপাট, রাহাজানি ও ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হবে। এ-অবস্থায় শিল্পপতিদের কাছ থেকে এবং একচেটিয়া বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গভর্নমেন্ট অর্থ আদায় করতে পারেন, শতকরা সাড়ে সাত বা আট-এর উপরে এঁদের যত লাভ হয় সেগুলো গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। আর আইন করা যেতে পারে যেন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি শতকরা ১০ ভাগের অধিক লাভ করতে

পারবে না। গরীবদের নির্যাতন করে শুল্ক-রাজস্ব ইত্যাদি আদায়ের যে-ব্যবস্থা আছে, সেইসব বা তার অনুরূপ ব্যবস্থা দ্বারাই হয়ত এ-কাজ সমাধা করা যেতে পারে।

পেটে খাওয়ার পরেই হচ্ছে—প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক জন-শিক্ষা চালু করে দেশের নিরক্ষর লোকদের মাথায় কিছু সাধারণ জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া। চেষ্টা করলে আগামী ১০/১২ বছরের মধ্যেই দেশের সমুদয় কিশোর-কিশোরীরা অন্ততঃ সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারে। তাই আমি আশা করি :

(১) শিক্ষা খাতে বর্তমান অর্থের দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ করে সুপরিকল্পিতভাবে তার সদ্ব্যবহার করা হোক; (২) পূর্বাঞ্চলে সপ্তম স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত সমুদয় পাঠ একমাত্র বাংলা ভাষায় দেওয়া হোক; (৩) অষ্টম স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে একাদশ স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে উর্দু শিক্ষা দেওয়া হোক; (৪) ইংরেজি শিক্ষা ঐচ্ছিক এবং নবম শ্রেণীর পূর্ব পর্যন্ত ওর পাঠ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক; (৫) মাধ্যমিক শিক্ষার বেতন ও পাঠ্যপুস্তকের মূল্য হ্রাস করা হোক; (৬) উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী বাংলা পুস্তক প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন বোর্ড ও একাডেমীগুলিতে লেখক-সংঘ ও সম্পাদক নিযুক্ত করা হোক; (৭) উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্তির জন্য বর্তমান ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের প্রাধান্য লোপ করে বাংলা ভাষা-জ্ঞানের প্রাধান্য দেওয়া হোক। এইভাবে একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের স্মৃতি ও আদর্শের প্রতি মর্যাদা দিলেই শোভন হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

## একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিন্তা

একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙলার ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই দিন ঢাকা শহরের ছাত্রগণ এবং সাধারণভাবে যাদের মাতৃভাষার প্রতি দরদ আছে এরূপ বহু নাগরিক ও পল্লীবাসী বুকের রক্ত দিয়ে তাদের মায়ের মুখের বুলিকে মর্যাদার আসনে বসাবার দাবী উত্থাপন করেছিল। তখনও পূর্বপাকিস্তান নাম চালু হয়নি। বঙ্গের জনবহুল বৃহত্তর অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ভারত সরকারও নিজেদের ক্ষুদ্রাংশের নাম পশ্চিম-বাঙলা রেখে পাকিস্তানী অংশকে শুধু বাঙলা বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের পূর্বাঞ্চল জনবহুল হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের অধিকর্তারা পাকিস্তান বলতে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানই বুঝতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের করাচী লাহোর পেশোয়ার পরিদর্শন করিয়েই তাঁদের পাকিস্তান ভ্রমণ সমাপ্ত করে দিতেন, পাকিস্তানের যে আর-একটা অঞ্চল রয়েছে সে-কথা তাঁদের মনেই পড়ত না।

পাকিস্তান অর্জনের সময় যদিও কায়েদে আজমের তৎপরতা, কর্মদক্ষতা ও দৃঢ়তার ফলে বাঙলার লোকেরাই সর্বান্তঃকরণে একযোগে মুসলিম তাহজীব-তমুদ্দুন সংরক্ষণের জন্য ভোট দিয়েছিলেন, তবুও তৎকালীন প্রভাবশালী পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ ভাবতেন কেবল পশ্চিম-পাকিস্তানের তথা পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দই যেন নবার্জিত পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, একমাত্র তারাই দেশপ্রেমিক মুসলমান, আর বাঙলার লোকেরা হিন্দুর ভাই, হিন্দুয়ানীই তাদের মজ্জাগত, সুতরাং তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এমনকি আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে খুন-খারাবীর উত্তেজনা-প্রদানকারী প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কোনও আলেম ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে অবাধে নিজের অনুগত কর্মীদের সহযোগে অনবরত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছেন তার কোন রোক-টোক নাই।

পূর্বাঞ্চলের ছাত্রেরা ও সর্বসাধারণ যখন বাংলা ভাষাকেও উর্দু ভাষার সাথে সমমর্যাদায় রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে তখন স্বয়ং কায়েদে আজম পর্যন্ত ঢাকার ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিপুল জনসমাগমের সম্মুখে বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন "Urdu and nothing but Urdu shall be the state language of Pakistan." এই ঘটনার পর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত কোন এক সভায় কায়েদে আজমের কাছে ছাত্রেরা প্রতিবাদ করাতে তিনি ছাত্রদের বিশেষভাবে তিরস্কার করেছিলেন। এরপর বহুদিন যাবৎ অন্যান্য নেতারাও এমনকি বাংলাদেশের কোনও কোনও নেতাও এই মতের প্রতিধ্বনি করেছিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের আমলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই আন্দোলন স্তব্ধ করবার জন্য ছাত্র-আন্দোলনকারীদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। নূরুল আমিন সাহেব এই দুর্ঘটনার জন্য কদাপি ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই। তবে পরবর্তীকালে তিনি এর জন্য দায়ী নন বলে সাফাই গেয়েছেন বটে।

যা হোক এইসব ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পাকিস্তানেও বর্তমানে নবীনে-প্রবীণে শাসকবর্গ ও শাসিতের মধ্যে এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিশেষ গ্লানিকর মতবিরোধের অস্তিত্ব রয়েছে। বর্তমানে যারা ছাত্র আছে, ভবিষ্যতে তারাই দেশের নেতা হবেন; কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে বা অবস্থার চাপে বা অন্য কোন কারণে মনে হয়, ছাত্র থাকতে থাকতেই এঁদের অন্ততঃ এক বিশিষ্ট দল রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন। দেশ চালানোর জন্য যে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, চরিত্রগঠন (বা অন্য কথায় শৃঙ্খলা ও পরমত-সহিষ্ণুতা) প্রয়োজন; নিপুণ শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, ব্যবসা-পরিচালক, শিল্প-পরিচালক, উকিল, মোক্তার, জজ, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বৃত্তিধারী অসংখ্য জনদরদী লোকের আবশ্যক, সে-চিন্তা ও সেজন্য কালক্ষয় করবার ইচ্ছা যেন অন্তর্হিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় মনে হচ্ছে বর্তমান ছাত্রবৃন্দের পূর্ববর্তী ছাত্রদলের কিয়দংশে মানবীয় কর্তব্য, লোকহিতের কথা ভুলে গিয়ে সম্ভবতঃ শুধু আপনস্বার্থ আত্মতোষণমূলক ব্যাপারেই অধিকতর লিপ্ত ছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগে ৩০৩ জনের যে লিষ্ট বের হয়েছে তাদের বিচার এখনও হয়নি, তবুও এদের অর্ধাংশও যদি দোষী বলে সাব্যস্ত হয় সেটা হবে নিতান্তই করুণ উদঘাটন। আমি আজীবন শিক্ষাকর্মে লিপ্ত ছিলাম, ছাত্রদের সঙ্গে অনেক মেলামেশাও করেছি, একাডেমিক শিক্ষা দিতেও পারৎপক্ষে ত্রুটি করিনি, তবু নিজেকে দোষী বলে মনে হচ্ছে—সব ছাত্রের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তির উদ্বোধন করতে সক্ষম হইনি এটা নিদারুণ ব্যর্থতা।

পরম্পরাক্রমে ছাত্ররাই দেশোদ্যানের উৎকৃষ্ট ফসল। কিন্তু চারা-অবস্থাতেই যদি এই ফসল ভাবে আমি ফলবান হয়েছি, তাহলে সে হবে অলীক চিন্তা। অনেক ক্ষেত্র-কর্ষণ, মৃত্তিকা-চূর্ণন, পরিপোষক সার, মাটির রস, আকাশের সূর্যতাপ চাই আগে, তবে ত পাওয়া যাবে প্রতীক্ষিত ফল।

কিন্তু প্রতীক্ষার সময়টা অবহেলায় কাটালে আর কি সে-সময় ফিরে পাওয়া যাবে? কেমন করে ধরবে ফল? বোধ হয় এই বোধেই নজরুল গেয়ে উঠেছিলেন :

"ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফল-পতাকা?"

দেশের তরুণ-সমাজ, ছাত্রদল আর প্রবীণ-সমাজ, উলামা, রাজনৈতিক, সমাজকর্মিগণ আজ রাস্তায় রাস্তায় গাড়ী-বাড়ী পোড়াচ্ছেন, স্কুল-প্রাঙ্গণে বা পল্টন ময়দানে গলাবাজী লাঠালাঠি ও চাকুবাজী করেছেন, ব্যবসায়ীরা ভেজাল-খাদ্যের বিষ ছড়াচ্ছেন, আর পুলিশ বসে বসে তামাসা দেখছেন, এমন অবস্থায় ভেবে পাওয়া যায় না দেশ কোনদিকে চলেছে। এ যেন বাত্যায় তাড়িত নৌকার মত ইতস্ততঃ ছোটাছুটি; কোন লক্ষ্য নেই। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হলে ইসলামিক নীতি বা গণতান্ত্রিক নীতির কোনটাই হয় না।

যেখানে 'আমি প্রধান, তুমি কিছুই নও', 'আমি যা বলি তা যদি না মান তবে তোমাকে জাহান্নামে পাঠাব' ইত্যাকার ভাব, সেটা ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ মাত্র। বিশ্বযুদ্ধের নিধন-যজ্ঞের পর মনে হয়েছিল এসব 'বাদ'-এর মৃত্যু হয়ে এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তা নয়। এখন দেখা যাচ্ছে :

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় তারে দিয়েছ তুমি ছড়িয়ে।

সত্যি তাই দেখছি পৃথিবীব্যাপী বিক্ষোভ, কুরুক্ষেত্র, কারবালা, গ্যালিপোলি, লেনিনগ্রাড, [illegible] ও ভিয়েতনাম জেগে উঠেছে সর্বত্র।

শহীদ বরকতের ঘটনায় ছিল এক বৃহৎ আদর্শ, তেমন বৃহৎ আদর্শের খাতিরে সংগ্রামকে 'জেহাদ' বলা যায়, এতে যাঁরা প্রাণ দান করেন তাঁরা সত্যিই শহীদ, সার্থক এঁদের মৃত্যু। কিন্তু বেটীশেট, আরামবাগ, রাজশাহী ও পল্টন ময়দান প্রভৃতি স্থানের সাম্প্রতিক ঘটনায় তেমন কোন আদর্শই দেখা যায় না—কেবল স্বার্থ, স্বমতের প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতাদর্পই' যেন এ-সবের নিয়ামক; এসব হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুর উত্তেজনার কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিকেই 'শবে কদর' বললে যেমন 'শবে কদর' 'বেকদর' হয়ে যায়, তেমনি করে প্রত্যেক উত্তেজনাকেই জেহাদ বললে বা প্রত্যেক উপলক্ষেই হরতাল করলে প্রকৃত জেহাদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়, আর হরতাল বে-তাল হয়ে পড়ে।

তাই বলি ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আলোচ্য বিষয় হবে, সাম্প্রতিক কালে আমরা মাতৃভাষা বাঙলার উন্নয়ন বা শ্রীবৃদ্ধির জন্য কি করেছি, কি করা কর্তব্য, কি করতে পারিনি এবং কেমন করে এর প্রকৃত সেবা করা যায়। সেইসব আলোচনা ও কর্মপন্থা অবলম্বন করাই প্রকৃত উপায়, এইভাবেই শহীদ বরকত ও তাঁর সহকর্মী অন্যান্য শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ করা উচিত।

জেগে আছি

একুশে সংকলন ১৯৭০

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অল্প কিছুদিন আগেও আমাদের দেশের আবহাওয়া এমন ছিল যে জীবনের সবদিক আলোচনা করতে লোকে ভয় পেত। মনে হয় জনসাধারণ এবং লেখক-গোষ্ঠী এখন একটা নৈতিক সাহস ফিরে পেয়েছে, যার ফলে মানুষের রুদ্ধ চিন্তা বা আবেগ আর বক্র পথে চলতে বাধ্য হবে না, বরং সহজ স্বাভাবিক পথে চলেই সুপরিণতি লাভ করবে। অর্থাৎ সে চিন্তা যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে দেশবাসী তা' গ্রহণ ক'রে পুষ্ট হবে; আর যদি জনসাধারণের কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়, তবে তা' স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হ'য়ে আবর্জনা দূর হবে। বাস্তবিক পক্ষে আড়ষ্ট চিন্তার চেয়ে বড় শত্রু আর কিছুই নাই। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ চিন্তার স্বাধীনতা ফিরে পাবার আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। আশা করি, রাষ্ট্রনায়কেরা এ কথা বুঝতে পারবেন এবং চিন্তা-নায়কদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিবেন।

সাহিত্য হচ্ছে জীবনের চিত্র আর আদর্শ। জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আজকাল রাষ্ট্রনীতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রেছে। এ খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, গোত্র, সম্প্রদায়,— এই ভাবে মানুষের সংঘবদ্ধতার পরিধি বাড়তে বাড়তে বর্তমানে রাষ্ট্রে এসে ঠেকেছে। তাই এখন জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাতের যুগ চলছে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন ক'রে মানব-সভ্যতা বাঁচাবার চেষ্টা শুরু হয়েছে; কিন্তু রাষ্ট্রগত মনোভাব এখনও এত প্রবল যে এর সফল পরিণতি স্বরূপ বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের এখনও বহু শতাব্দী দেরী আছে। আমি রাষ্ট্রের জটিলতা সম্বন্ধে মোটেই অভিজ্ঞ নই। তবু মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় যে, আদর্শ রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত সম্প্রদায়, গোত্র, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি প্রত্যেকেরই পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং এরা সানন্দে নিজেদেরই স্বার্থে পরস্পরের সহযোগিতা ক'রে যার যার কাজ ঠিক ঠিক মত করে যাবে। রাষ্ট্র যেন একটা প্রকাণ্ড মেশিন, এর স্ক্রু, বল্টু, ব্যাটারী, চাকা, ইঞ্জিন সবই নিখুঁত হবে, আর একক উদ্দেশ্য নিয়ে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবে।

এর কোনো অঙ্গই অনাবশ্যক নয়। আমরা সমাজের সাধারণ মানুষকে ইতর বলে গণ্য করি, যারা পরিশ্রম ক'রে জিনিস উৎপাদন করে তাদেরকে হেয়জ্ঞান করি। এই আমাদের সামাজিক ব্যাধি। অবশ্য, সব মানুষ কখনও সমান হয় না, সকলের সব রকম কাজ করবার যোগ্যতাও থাকে না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই পরস্পর সংশ্রব, সহযোগিতা বা সমঝোতা দরকার। প্রত্যেকেরই ক্ষমতার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকা চাই, প্রত্যেকেরই কাজের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া চাই। নবযুগের সাহিত্যিকেরা বাস্তবের পটভূমিতে আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে এই সব বিষয়ে সুস্থ জনমত সৃষ্টি করুন। এজন্য ইসলামের সাম্য ও মানবতাবোধ বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আমাদের হাতে পড়ে তা-ও হ'য়ে পড়েছে ন্যায়-নীতি-বর্জিত স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র। অতর্কিতে আমরা ধর্মীয় আলোচনার কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আকস্মিকও নয়। তার কারণ, সাহিত্য, রাজনীতি আর ধর্ম— এরা প্রত্যেকেই মানব-

জীবনের সর্বাংশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তাই, সাহিত্যকে অনেক সময় রাজনীতি আর ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করা হ'য়ে থাকে। রাজনীতির কথা আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখন ধর্ম সম্বন্ধেও দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

ধর্মের সংরক্ষকদের প্রধান অভিযোগ এই যে, অনেক সময় সাহিত্য নাকি ধর্মের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধান্বিত নয়। এর মূলে রয়েছে নতুন আর পুরাতনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। আসলে কিন্তু সাহিত্যও বিকাশশীল, ধর্মও বিকাশশীল। এ কথা স্বীকার ক'রে নিলে আর বিরোধই থাকত না। কিন্তু ধর্মকে ফলমূলায় ফেলে, তা-ই শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন অধিকাংশ ধর্মধ্বজী। এঁদের সঙ্গেই সাহিত্যিকের বিরোধ। এঁরা ভুলে যান যে হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু হয়ে হযরত নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) এবং মুহম্মদের (দঃ) ভিতর দিয়ে ইসলাম ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের সমসাময়িক কালে, ইসলামের তৎকালীন রূপই ছিল তার পরিপূর্ণ রূপ। আবার এদের প্রত্যেকের জীবনেই ক্রমে ক্রমে ইসলামের বীজ অঙ্কুরিত, মঞ্জুরিত, পল্লবিত ও ফলায়িত হয়েছে। এতে দেশ-কালের ব্যবধানে রূপের কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে বটে, কিন্তু মূল আদর্শ অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই আদর্শটুকুই ইসলামের বীজ— অর্থাৎ তৌহীদ— তস্‌লীম যার থেকে জন্মে একমাত্র আল্লার প্রতি পূর্ণ নির্ভর, গায়েব-আল্লার নিগ্রহের বিরুদ্ধে অভয়, মানব কল্যাণের সাধনা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং অন্যান্য সদগুণ। একই বীজ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাটিতে বিবিধ বৃক্ষের জন্ম দিয়েছে। ধর্মের এই বিবিধ প্রকাশের দিকে চোখ বন্ধ ক'রে আমাদের অনেক আলেম ধর্মকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে ক্ষুদ্র করে ফেলেছেন। সাহিত্যিকও ধর্মকে নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে বুঝে দেখতে চান। তিনি মনে করেন, ধর্মকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না, প্রত্যেককে আপন আপন জীবনে তা অর্জন করতে হয়। কিন্তু অর্জন করতে গেলে কিছু কিছু বর্জনও করতে হয়। বিশ্ব-প্রকৃতিতেও আমরা তাই দেখতে পাই,— নতুন পাতা গজাবার আগে কতক পুরানো পাতা ঝরে পড়া চাই নইলে আবর্জনা বাড়ে, ভার দুর্বহ হয়। অনেক আলেম মনে করেন হযরত মুহম্মদ (দঃ) পর্যন্ত এসেই ইসলামের যা' কিছু সম্ভাবনা সব পরিপূর্ণতা লাভ ক'রেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা হয় নি।

কোরান শরীফের পবিত্র বাণী— "আল্ ইয়াউমু আক্‌মালতু লাকুম্ দিনাকুম্, ওয়া আৎমামতু আলায়কুম নি'মতী, ওয়া রাজীতু লাকুমুল ইস্‌লামা দীনা" (অদ্য তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের ধর্ম-ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের দান সমাপ্ত করিলাম এবং তোমাদের নিমিত্ত 'ইসলাম' অর্থাৎ "পূর্ণ সমর্পণ"— কেই ধর্মবিশ্বাস হিসাবে মঞ্জুর করিলাম)।

এখানে হযরতের সময়কার পরিপূর্ণ ধর্ম-ব্যবস্থাই উদ্দেশিত হয়েছে। বারংবার "তোমাদের নিমিত্ত" বা "তোমাদের প্রতি" বাক্য ব্যবহারের এই ইঙ্গিত বলেই মনে হয়। এর পরেও ইসলামের আরও বিকাশ হবে, নতুন নতুন ক্ষেত্রে নতুন নতুন ফসল ফলবে; ফোকাহ উসুল, এজ্‌মা কিয়াস প্রভৃতি প্রয়োগ ক'রে এই সব নতুন ফসলকে ধর্মের বীজের সঙ্গে বা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। ইসলাম এক অনন্ত-প্রসারী বৃক্ষ। এর "মূল ঠিক আছে এবং ক্ষয় নাই" বললেও যথেষ্ট হয় না। এই সঙ্গে আরও বলতে হয়, এর বিকাশেরও সীমা নাই।

উপরোক্ত আয়াতটিতে যে "ইসলাম"কে আল্লাহ মঞ্জুর করেছেন সেটা ইসলাম সম্প্রদায় নয়, ইসলামের আদর্শ। অথচ অনেক আলেমকে বলতে শুনেছি, এই আয়াত দ্বারা ইসলাম

সম্প্রদায়কেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হ'য়েছে। আমি বলি, তা' নয়, এখানে বরং ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম বলা হ'য়েছে।

কারণ আল্লার প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভর করার ধর্মই ইসলাম। এ ধর্ম কোনো সম্প্রদায় বা দেশের মধ্যে আবদ্ধ নয়। "পরিপূর্ণ নির্ভর" স্বীকার করে না, এমন ধর্মই নাই। আমার মনে হয় বর্তমান যুগে দৃশ্যতঃ ইসলামের সম্প্রদায়ভুক্ত না হ'য়েও বহু সৎলোক ইসলাম অর্জন করেছেন। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ত্যাগ করে আদর্শগত দৃষ্টিতে দেখলে হয়ত আমরা বিশ্ব-শান্তির ক্ষেত্রে আরও বেশী সাহায্য করতে পারব।

ইসলামের আর এক অর্থ "শান্তি"। এর ইঙ্গিত হচ্ছে, আল্লার প্রতি পূর্ণ নির্ভর করলে, বিশ্বাসী সকলকে আপন ব'লে গ্রহণ করা সহজ হয়। সকল মানুষের সঙ্গে শান্তি সদ্ভাব বজায় রেখে চলার যে সাধনা, তাই ইসলাম। আমি ধর্মশাস্ত্র বিশারদ নই, তবু সাধারণ মানুষের সহজ বুদ্ধিতে কয়েকটা কথা বললাম। আমার মনে হয়, বিরোধের পথে বা আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের পথে জয়ের সম্ভাবনা নাই; ইসলামের অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে জ্ঞানের পথে আর শান্তির পথে।

এই জ্ঞানের কোনও সীমা নাই। জ্ঞানী বা আলেম-সমাজ মন্থন করবেন এই সাগর। তাই ইসলামের সুধী সমাজকে বনি ইস্রাইলের পয়গম্বর সমাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। "উলামাউ উম্মাতি কা আম্বিয়ায়ে বনি ইস্রাইল।"

সুসাহিত্যের মারফতে এই পথেই ইসলাম বিশ্ববাসীর স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা অর্জন ক'রে বিশ্বশান্তির বাহক হ'তে পারে। এই অপেক্ষাকৃত অনাবিষ্কৃত পথে চলেই হয় ত আমাদের নতুন যুগের সাহিত্যিকেরা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারেন।

সাহিত্যের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা বলা হ'ল, এখন কিছুটা ঘরের খবর নেওয়া দরকার। বিভাগ-পূর্ব বাংলাসাহিত্যে "মুসলিম সংস্কৃতি"র খুব অভাব ছিল, বর্তমানে তা' পূরণ করা দরকার— এইটেই বোধ হয় পূর্ববাংলার বাংলাসাহিত্যের গতিনির্দেশের সবচেয়ে বড় কথা। কাজে কাজেই কথাটা একটু তলিয়ে দেখা মন্দ নয়। প্রথম কথাই হ'ল সাহিত্যে "মুসলিম সংস্কৃতি" বলতে কি বুঝি? অর্থাৎ অন্ততঃ অন্য একটা সংস্কৃতির সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়, তা নির্ণয় করা দরকার। আমাদের ঘরের কাছেই অন্য সংস্কৃতি বলতে হিন্দু সংস্কৃতি বুঝায়। কাজেই এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। হিন্দু-মুসলিম প্রায় হাজার বছর ধ'রে বাংলাদেশে পাশাপাশি বাস করেছে, এখনও করছে। বাহ্যত দেখা যায়, পূজা-পার্বন দেব-দ্বিজে ভক্তি, অবতারবাদ, পুনর্জন্মে বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ, জাতিভেদ, গোমাতার প্রতি ভক্তি,— এগুলো হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ। আর, এক আল্লায় বিশ্বাস, ঈদ-বকরীদ, মহরম-মিলাদ উৎসব এবং নামাজ-রোজা-হজ্জ প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন, পীর-মুর্শিদে ভক্তি, আশরাফ-আতরাফে ভেদ, তকদীর, গোমাংস ভক্ষণ এগুলো মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ। বইএর পাতা খুঁজলে হিন্দুরা দেখতে পারেন "একমেবাদ্বিতীয়ম" বাণী, গোমেধ যজ্ঞ, নীচবংশীয় গণের ব্রাহ্মণত্ব অর্জন, এবং এই রকম আরও অনেক কিছু; আর মুসলমানেরা দেখাবেন মহরম ও মিলাদ উৎসবের বেদাতী, পীর-মুর্শিদে ভক্তির কুফরী, আশরাফ-আতরাফ ভেদের নিষেধবাণী তকদীর ও তদবীরের বাহাস এবং আরও কত কি। কিন্তু বইএর পাতার থেকে জীবনের দিকে তাকালে উপরে যা বলা হ'য়েছে মোটামুটি তা-ই দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে দেব-দ্বিজে ভক্তির সঙ্গে পীর-মুর্শিদের ভক্তি, জাতিভেদের সঙ্গে আশরাফ-আতরাফ ভেদ, অদৃষ্টবাদের

সঙ্গে তকদীরবাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। অদৃষ্টবাদের কৈফিয়ত হিসাবে হয়ত হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে, মুসলমান ধর্মে অদৃষ্টকে সর্বশক্তিমান আল্লার ইচ্ছা বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। হিন্দু পূজা-পার্বনে ঢাক-ঢোল-সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যাপক আয়োজন হয়, আর মুসলমানের ঈদ-বকরীদ এর চেয়ে অনেক সাদাসিধা ধরনের হয়। মহরমের তাজীয়া, মর্সিয়া গান এবং আহাজারীতে ধুমধাম থাকলেও অনেক মুসলমান এগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করেন। তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে, প্রধান তফাৎ হচ্ছে হিন্দুর অনেকেশ্বরবাদ আর গো-পূজার সঙ্গে মুসলমানের একেশ্বরবাদ ও গোমাংস ভক্ষণে। এখানে বৈপরীত্য এত বেশী যে, কোনো আশেপাশের কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু সাহিত্যিক প্রকাশের দিক দিয়ে এই বিভেদের ক্ষেত্র অতিশয় সঙ্কীর্ণ বলতে হবে। নিছক ধর্মবিশ্বাস বা ব্যবস্থামূলক সাহিত্য স্বভাবতঃই সার্বজনীনত্বের দাবী করে না।

সংস্কৃতি বলতে অবশ্য ধর্মীয় ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক ব্যাপার ছাড়াও আরও অনেক জিনিস বুঝায়। তবু ধর্মীয় প্রভাবই বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের জীবনে সবচেয়ে গভীর আর ব্যাপক। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা সাহিত্য-ব্যাপারে অনেকটা নিষ্ফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডাল-ভাত আর গোশ্‌ত-রুটির বর্ণনায় পার্থক্য থাকতে পারে, স্বাদও ভিন্ন, কিন্তু এতে সাহিত্যরসের আস্বাদে বিশেষ পার্থক্য হবার কথা নয়। তবে বাঙালী বা বিহারী হিন্দু পুরোহিতকে গোশত-রুটি খাইয়ে, কাবুলী বা পেশোয়ারী পাঠানের সামনে ডাল-ভাত এনে দিলে বেমানান হয়। প্রহসনে হয়ত উপযুক্ত অবস্থায় তা চলতেও পারে, কিন্তু অন্যত্র নিশ্চয়ই রসভঙ্গ হবে।

এখন মূল প্রশ্নে আসা যাক, বিভাগপূর্ব বাংলা নাটক-নভেলে বা মননসাহিত্যে মুসলমানের চরিত্র খুব বেশী অঙ্কিত হয় নি, কাজে কাজেই বিশেষ মুসলিম কৃষ্টি সংযোজন করবার সুযোগও ঘটেছে কম। আর, এ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন প্রধানতঃ হিন্দু সাহিত্যিকেরাই। সুতরাং তাঁরা নিজেদের পরিবেশ এবং পৌরাণিক কাহিনী থেকে উপকরণ নিয়েছেন বেশী। তাঁদের হাতে স্বভাবতঃই উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারে দেবদেবীর পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। ইংরেজ আমলে যখন বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন হয়, তখন মুসলমান ছিলেন গায়ের হাজির। এর কারণ যাই হউক, বাংলা গদ্যের কাঠামোতে প্রথম থেকেই হিন্দু ধর্মের দেবদেবী সংশ্লিষ্ট ইঙ্গিতের প্রাচুর্য এসে গিয়েছিল। মুসলমান লেখকেরা যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন সাহিত্য বিচার করবার কর্তা ছিলেন হিন্দু সাহিত্যিকেরাই। তাঁদের প্রভাবে মুসলমানের লেখাও সংস্কৃত ঘেঁষা হ'য়ে পড়ল। ঐ যুগের কর্ণধার স্বরূপ মীর মশররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ প্রভৃতি লেখকের প্রশংসায় বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতি যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তার মূলকথা এই— মুসলমানের হাত দিয়ে যে এমন লেখা বেরোবে তা অভাবনীয়; বলতে কি, ভাষা এত উৎকৃষ্ট হয়েছে যে মুসলমানের লেখা ব'লে ধরাই যায় না। তাই মুসলমান লেখকেরাও হয়ত ধরা পড়বার ভয়েই একটু বুঝে সুঝে শব্দ প্রয়োগ করতেন। মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রথম সাহসিকতা প্রকাশ করলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। তিনিও প্রথম প্রথম অনেক বিদ্রূপ সহ্য করলেন বটে, কিন্তু পরওয়া করলেন না। অবশেষে তাঁরই জয় হল, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দসম্ভারে এবং মুসলিম কীর্তিকাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠল।

বলা বাহুল্য মানুষের মুখের ভাষা হিন্দুও নয় মুসলিমও নয়। ভাষায় যে বুলি বলান যায়, সেই বোল-ই ফোটে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে সুদূর অতীতে মৌলবী

গিরীশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষায় কোরানের প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করেন। তা ছাড়া হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী, সম্পূর্ণ মেশকাত শরীফের তরজমা, পান্দ-নামার পদ্য অনুবাদ তাপসমালা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে ইসলামী সংস্কৃতি পরিবেশন ক'রে গেছেন। এ ছাড়া সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, কাজী এমদাদুল হক, মুন্সী রেয়াজউদ্দীন, মোজাম্মেল হক, মৌলানা ইসলামাবাদী, মৌলবী আকরম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, বরকতউল্লাহ, কাজী আকরম হোসেন, আবদুর রহমান খাঁ, ডাঃ আবদুল কাদের, আবু জোহা নূর আহমদ, ফররুখ আহমদ, আবুল ফজল প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইসলামী সংস্কৃতিমূলক পুস্তকাদি লিখেছেন।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে এত সব থাকতেও অভিযোগ কেন? এ কথার হয়ত সঙ্গত উত্তর এই যে, বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট ধর্মীয় সাহিত্য অর্থাৎ কোরান শরীফ, হাদিস, ফেকাহ এবং ওয়াজ-নসিহত জাতীয় পুস্তক থাকলেও উর্দু সাহিত্যের মত প্রচুর নয়, তাই আরও চাই। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে, বলতে হয়, অনুবাদের ভিতর দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবার ক্ষমতা কম লোকেরই আছে। কাজে কাজেই বাঙালী পাঠকের মনে ধরবার মত পুস্তকের অভাব রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে রাখা ভাল যে উর্দু সাহিত্যে বিচারের মাপকাঠি এখনও নিম্নস্তরেই রয়ে গেছে। তাই উর্দু পুস্তকের কাটতি বেশী হয়। এই কথাই একটু ঘুরিয়ে বললে এই দাঁড়ায় যে, উর্দু সাহিত্য গণমনের উর্ধ্বে একটা আজব কিছু নয়; কিন্তু বাংলা সাহিত্য হ'য়ে পড়েছে ভদ্রলোকের সাহিত্য,— এর সঙ্গে গণমনের তেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই। এ কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে নতুন সাহিত্যিককে নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে সহজবোধ্য সাধারণ স্তরের সাহিত্যও সৃষ্টি করতে হবে। এইভাবে জন-মনকে সাহিত্যের আস্বাদ দিয়ে জাগ্রত ক'রে ক্রমান্বয়ে উন্নত ক'রে তুলতে হবে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে, গণসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'য়েছে। আর হিন্দু সমালোচকদের মুখ চেয়ে থাকবার আবশ্যকতা না থাকায় মুসলিম ভাবধারা ও জীবন-ইতিহাস পরিবেশন করবার সুযোগও বেশী হয়েছে। কিন্তু অবাধ সুযোগের একটা দোষও আছে— তাতে আধিক্য দোষ ঘটতে পারে। কাজে কর্মে অনেক স্থলে হচ্ছেও তাই। কোনো কোনো লেখক গদ্যে পদ্যে বেপরোয়াভাবে আরবী-ফার্সী শব্দের আমদানী ক'রে মুসলিম কৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখবার চেষ্টা করছেন। আসলে কিন্তু শব্দের মধ্যে ইসলাম নাই, ভাবেতেই ইসলাম। আর দুর্বোধ্য অর্থাৎ অপ্রচলিত বিদেশী শব্দ আমদানী ক'রে সাহিত্যকে জনগণের ধরা-ছোঁওয়ার আরও বাইরে নিয়ে যাওয়া মোটেই সুবুদ্ধিসঙ্গত নয়। যে শব্দ বাংলার লোকে ব্যবহার করছে, তা বাংলা হোক, উর্দু-ফার্সী হোক, ইংরেজী হোক, তা' বর্জন করবার কোনোই সঙ্গত কারণ নাই। হয়ত আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের চাকচিক্যে ভুলিয়ে বাংলার ধর্ম-প্রাণ মুসলমানদের মনে এক প্রকার অবোধ মোহের সৃষ্টি করা যেতে পারে; কিন্তু তাতে সাহিত্যও হবে না, লোকের ধর্মও স্পর্শ করবে না। সুতরাং তা' নিষ্ফল। এইভাবে মুসলিম সাহিত্য সৃষ্টি করবার অতি-আগ্রহে সাহিত্যরসের বিঘ্ন হবে। ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার সাহিত্য হয়ত হ'তে পারে, কিন্তু তা সৃষ্টি করা খুব কঠিন। কারণ, উদ্দেশ্য প্রকট হ'য়ে পড়লেই তা আর সাহিত্য পদবাচ্য হবে না। তা'ছাড়া ধর্মীয় সাহিত্য সমগ্র সাহিত্যের একটা অংশ বই তো নয়।

আসলে ইসলাম একটা মহান মানবীয় আদর্শ। কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গেই এর ভাবগত বিরোধ থাকতে পারে না; প্রথাগত সামান্য একটু আধটু বিরোধ থাকতে পারে মাত্র। আমরা শেকস্‌পীয়র, বায়রন প্রভৃতি লেখকের রচনা পড়ে আনন্দ পাই। তার মধ্যে গ্রীক দেব-দেবীর পরোক্ষ ইঙ্গিত অনেক রয়েছে, তবু তা' পড়ে কোনো খৃষ্টানের মনে ধর্মীয় ক্লেশ বা গ্লানি উপস্থিত হয় না। ভাষার সৌষ্ঠবের জন্য যে সব অলঙ্কার ব্যবহার করা হয় তাকে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাব্যের সৌন্দর্য্য বলে স্বীকার করতে দোষ কি? সচরাচর দেখতে পাই, যে বিষয়ে আমাদের যত বেশী দৈন্য রয়েছে, তাই ঢাকতে আমরা তত বেশী আগ্রহান্বিত হ'য়ে থাকি। মনের মধ্যে ধর্ম-প্রতিষ্ঠিত থাকলে আর বাইরের উগ্রতার প্রয়োজন হয় না। হয়ত কথাটা ঠিক পরিষ্কার ক'রে বুঝাতে পারছিনে। তাই দুই একটা উদাহরণ দেই :

—"লু হাওয়া বাজায় সারেঙ্গী বীন্ খেজুর পাতার তারে, বালুর আবীর ছুঁড়ে মারে স্বর্গে গগন পারে।"— (মরুভাস্কর, নজরুল)। এখানে কেউ যদি "সারেঙ্গী-বীণের" বাজনা শুনেই বা "আবীর" ছুঁড়বার কথা শুনেই বলে বসেন, এসব শরীয়তের খেলাফ বা হিন্দুয়ানী কথা, তা' হ'লে কি ধর্মের প্রতি "অতি-ভক্তি"র পরিচয় হয় না?

চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ—
কোথা হ'তে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান।
নাহি বুঝিয়াও আমি সে দিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধরে মোর অনাদৃতা সীতা।
কানন-কাঁদানো, তুমি তাপস-বালিকা
অনন্ত কুমারী সতী; তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা ছলে; চিরমোনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা!
নীরবে সয়েছ সবি—
সহজিয়া! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর
জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি। (পূজারিণী, নজরুল)

এই চমৎকার প্রেম-চিত্র 'অনাদৃতা সীতা', 'অনন্ত কুমারী সতী', 'শাপভ্রষ্টা দেব-বালা', 'জয়লক্ষ্মী' প্রভৃতির উল্লেখ মাত্রই অনেক অতি-খুঁতখুতে শরীয়তবাদী হিন্দুত্বের ছোঁয়াচ দেখে শিউরে ওঠেন, অথচ বিদেশী "লায়লা-মজনু" "শিরী-ফরহাদ", কিম্বা "জোহরা" সুন্দরী তাঁদের কোনো ভাবান্তর ঘটায় না। স্বদেশকে পরদেশ আর বিদেশকে আপন দেশ ভাববার এই মনোবিকার আমাদের অনেককেই পেয়ে বসেছে। আমার মনে হয়, এই অহেতুক সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে না পারলে আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টি খুলবে না, আর দৃষ্টি না খুললে সাহিত্যিক বোধই জন্মাবে না। ইতিহাস বা পৌরাণিক কাহিনী কোনো দেশের শ্রদ্ধেয়, আর কোনও দেশের অশ্রদ্ধেয়, এ ধারণা আমার কাছে নিছক ছেলে মানুষী ব'লে মনে হয়। তার পরের উদাহরণ দু'টোর কোনোটাই ইসলাম বিরোধী নয়। একটা আরব দেশের সূর্যোদয়কালীন 'লু' হাওয়ার চিত্র; আর একটা প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক আকর্ষণের বর্ণনা। প্রথম চিত্রটা তো খাস আরবের; আর দ্বিতীয় চিত্রে বর্ণিত অবস্থায় যে মুসলিম যুবক-যুবতী বা কিশোর-কিশোরী কোনো দিন পড়েন না, তাই বা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি?

আমার মনে হয়, ইসলামের সারমর্ম কি— এ কথা অনেকের মনেই এখনও অস্পষ্ট আছে। তাই, ইসলামী সাহিত্য সৃষ্ট হ'তে এখনও বিলম্ব আছে। আগে মানুষ তৈরী হবে, দৃষ্টি

সাফ হবে, তার পরে তো' সাহিত্য! তবে এখন রচনা বন্ধ রাখতে হবে, তা বলি নে। আসল-মেকির যাচাই হ'তে বেশী দিন লাগবে না। আপাততঃ অনুবাদ, জীবন চরিত, ইতিহাস আর প্রবন্ধই হবে মুসলিম সংস্কৃতিমূলক সাহিত্যের প্রধান বাহক।

ইসলামী সাহিত্য আসতে যদি দেরীও হয়, তাতে ক্ষতি নেই; কিন্তু সাহিত্য হওয়া দরকার। গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্যের আভাস দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমানী পরিবেশের বাস্তব দিকে স্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে। লিখতে লিখতেই আত্মপ্রত্যয় জন্মাবে, আর রচনারও ক্রমোন্নতি হবে। পদ্যই হোক আর গদ্যই হোক, সহজ ভাষাই হোক আর পণ্ডিতি ভাষাই হোক, ভাষা দুরস্ত করতেও যথেষ্ট সাধনার দরকার।

সাধনার দ্বারা শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ আয়ত্ত হয়, আর চিন্তা ও অনুভূতির দ্বারা তাতে প্রাণ সঞ্চার হয়। অনেক সময় লক্ষ করেছি, লেখকের মনে ভাব আছে, বলবার কথাও আছে, কিন্তু সামান্য অসাবধানতার জন্য ভাষা ঠিক লাগসই হচ্ছে না। সাহিত্য রচনা একটা বড় শিল্প, এর সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া চাই। নইলে এই একটা অবগুণেতেই অনেক সদ্‌গুণ নষ্ট হ'য়ে যাবে। অবশ্য সকলের পক্ষে সাহিত্যের সব দিকেই হাত দেওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। তাই আসুন যার যার প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে আমরা নবীনে প্রবীণে মিলে সাহিত্য সৃষ্টি করতে লেগে যাই। তাতেই কাজ হবে— হয়ত ভবিষ্যতের জন্য আপাততঃ একটা বুনিয়াদ বা কাঠামো সৃষ্টির কাজ হবে।

আমার ক্ষমতা স্বল্প আর আপনাদের ধৈর্য্যও অসীম নয়। তাই অনেক জরুরী কথা বলা হ'ল না। সাহিত্য আর সংস্কৃতি দিয়ে জীবনকে সরস করবার সাধনা দিয়ে যে-সব সাহিত্যিক ও শিল্পী অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদেরকে আমি মোবারকবাদ জানাই। তাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক বিষয় শিখেছি, আর ভবিষ্যতে অনেক শিখব বলে আশা করি। এখন এই বিক্ষিপ্ত ভাষণের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চেয়েই বিদায় নিচ্ছি।*

* মানিকগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ হইতে পরিমার্জিত করিয়া এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইল।

# সংস্কৃতি ও সভ্যতা

সাধারণভাবে বলতে গেলে যুগ-যুগের অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার ফলে জীবন-যাপনের যে বিশিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে, তারই নাম 'সংস্কৃতি'। 'সংস্কৃতি' কথাটির সঙ্গে অপূর্ণতার পরিপুষ্টি বা জীর্ণতার পরিমার্জনার ভাব মিশানো রয়েছে, অর্থাৎ সংস্কৃতি যে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, বরং সমাজের ভিতর থেকেই উদ্ভূত একটি জীবন্ত শক্তি, তারই দিকে ইঙ্গিতে রয়েছে। এর প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলা ভাষায় কৃষ্টি, কালচার, সভ্যতা, ঐতিহ্য, তমদ্দুন, তাহ্‌যীব প্রভৃতি শব্দের প্রচলন আছে। 'কৃষ্টি' ও 'কালচার' বলতে সাধনা ও চর্চা দ্বারা ক্রমোন্নতি বুঝায়; 'সভ্যতা' বলতে কালচারের বিশেষ বিশেষ স্তর সূচিত হয়, আবার, অন্য অর্থে এর দ্বারা আদব-লেহাযও বুঝায়; 'ঐতিহ্য' বলতে বিশেষ মানবগোষ্ঠীর গৌরবময় ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনী বা কীর্তিস্তম্ভাদির প্রতিই প্রধানতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়; তাহ্‌যীব সাধারণত আদব-লেহায, শিষ্টাচার প্রভৃতি ব্যবহারিক মাধুর্য বা ভব্যতার দিকেই ইঙ্গিত করে, আর 'তমদ্দুন' বা নাগরিক সভ্যতা রাজদরবারের চাকচিক্য বালাখানা, বিলাস-ব্যসন বা অন্য প্রকার শহুরেপনার দিকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করে। অবশ্য প্রয়োগ-ক্ষেত্রে উল্লিখিত শব্দগুলো অনেক সময় আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মোট কথা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, তাহ্‌যীব, তমদ্দুন প্রভৃতি শব্দ দিয়ে যে মিশ্রভাব প্রকাশ করা হয় তা' বেশ ব্যাপক— এবং সেই কারণেই কিছুটা অস্পষ্ট। মোট কথা, মানুষের চিন্তা, কল্পনা, কর্মক্ষমতা প্রভৃতির সমন্বয়ে জীবন-ধারণের জন্য, অত্যাবশ্যকই হোক বা তার আনন্দ ও সৌন্দর্য-বর্ধনের জন্যই হোক, যত প্রকার বিশ্বাস, অনুষ্ঠান, সরঞ্জাম বা প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সমর্থন লাভ ক'রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বা শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে, সে-সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম তমদ্দুন বলতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তওহীদ, বেহেশ্‌ত-দোযখ, মালায়েকাত প্রভৃতি; অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সিয়াম, সালাত, হজ্, যাকাত প্রভৃতি; সরঞ্জামের ক্ষেত্রে পাগড়ী-টুপি, পায়জামা-তহ্‌বন্দ, জায়নামায-তসবীহ্ প্রভৃতি; এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি বুঝায়। অবশ্য এ-ছাড়া আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু আরবের খেজুর, খোর্মা, সুর্মা, উষ্ট্র, ফোরাত, পারস্যের গোলাব, আঙ্গুর, সোরাহী, সাকী; সমরকন্দ-বোখারার তরমুজ, খরমুজা, বা 'খালে-হিন্দুত্তম্'; পাকিস্তানের ডাল-ভাত, গোশ্‌ত-রুটি, শাড়ি-দোপাট্টা প্রভৃতিকে ইসলামী তমদ্দুন বলে গণ্য না করে বরং এগুলোকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা প্রাদেশিক কালচার বলে গণ্য করাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। অবশ্য, ধর্মীয় ও দেশীয় (বা রাষ্ট্রীয়) কৃষ্টি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এইভাবে জাতীয় ঐতিহ্য, শ্রেণিক কৃষ্টি প্রভৃতিও স্বীকার করতে হয়। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, হিন্দু, মুসলিম প্রভৃতি ধর্মীয় (বা জাতীয়) ঐতিহ্য গ্রীক, ইরানী, ব্রিটিশ মার্কিন, রুমীয়, ভারতীয়, পাকিস্তানী প্রভৃতি দেশীয় বা রাষ্ট্রীয় কালচার; দ্রাবিড়, আর্য মোঙ্গল প্রভৃতি গোত্রীয় ঐতিহ্য; জমিদার, কৃষক, মিল-

মালিক, ধনিক, কুলিমজুর, প্রভৃতি শ্রেণিক কৃষ্টি; এইভাবে যুগ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও সভ্যতাকে আরণ্য, ভূস্বামিক, সাম্রাজ্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যায়। বলা বাহুল্য, একই ব্যক্তি ধর্ম দেশ, জাতি, ও শ্রেণী-হিসাবে বিভিন্ন তাহ্‌যীব-তমদ্দুনের অধিকারী হতে পারে।

সামাজিক, আর্থিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় প্রভৃতি নানা কারণে এইসব বিভিন্নতা ঘটে থাকে। কিন্তু মানুষ যেমন মানুষই, অর্থাৎ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগ, স্নেহ-ভক্তি, জন্ম-মৃত্যু সকলেরই সমান, তেমনি বিভিন্ন কালচারের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও মিলও রয়েছে যথেষ্ট। জীবনধারণের জন্য কৃষিকার্যের সাজ-সরঞ্জাম উদ্ভাবন, তৈজষপত্র গঠন, সন্তানপালন, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, পণ্য বিনিময় ইত্যাদি প্রয়োজন সব দেশেই রয়েছে, তবে দেশের আবহাওয়া, প্রকৃতিক সম্পদ, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা কারণে অল্প-বিস্তর বিভিন্নতা ঘটেছে। এই বহির্জাত বিভিন্নতার অন্তরালে দেখা যায়, মুলতঃ একই জৈবিক প্রেরণা ও প্রয়োজনে দেশে দেশে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই সমতা কম কথা নয়। এগুলো সকল সভ্যতার মূলীভূত নিদর্শন। সভ্যতার বাহ্যরূপ বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ও প্রেরণার দিক দিয়ে সভ্যতার সামগ্রীও স্বগোত্রীয়। অতএব সরঞ্জাম-ঘটিত পার্থক্য নিয়ে বিভিন্ন কালচারের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধের হেতু নেই।

যুগে-যুগে মানুষ জানতে চেয়েছে—আমি কোথা থেকে এলাম? কে আমার সৃষ্টিকর্তা? কি আমার পরিণতি, প্রকৃতির ঝড়ঝঞ্ঝা রৌদ্রবৃষ্টি প্রভৃতি শক্তির উৎস কোথায়? এরাই আমার নিয়ামক, না আমিই এদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারি? রোগ-শোক জরা-মৃত্যুর কারণ কি? এসব থেকে বাঁচবারই বা উপায় কি? ইত্যাদি। শ্রেষ্ঠ মানুষেরা নিজ নিজ প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রেরণা অনুসারে এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে' বিভিন্ন দেশে এইসব প্রশ্নের বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন বা পেয়েছেন। অন্যেরা সেসব মনে মনে বুঝে দেখেছে, তারপর নিজেদের জ্ঞান-বিশ্বাস মতো সেইভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছে। এখানেও বাঁচবার চেষ্টা আর অজানিতকে জানবার চেষ্টা নিখিল মানুষের একই প্রকার। এর থেকে বিধির বিচিত্র বিধানে অবশ্যম্ভাবীরূপেই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ঈমান বা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। এই দর্শন, বিশ্বাস ও ধর্মগত কালচারের পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত হয়েছে। এসবের লক্ষ্য একই—সত্যের উদ্‌ঘাটন এবং উন্নত জীবনযাপন। কিন্তু জড়পদার্থের মতো মানুষের চিন্তারও জড়ত্ব আছে। অভ্যাস দ্বারা একই পরিবেশে আবদ্ধ থাকার দ্বারা, অন্ধ অহমিকার দ্বারা, কিংবা স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চিন্তায় কাঠিন্য এসে পড়ে। তখন মনে নানাপ্রকার বদ্ধমূল সংস্কার জন্মে, এবং অন্যবিধ সংস্কারের সঙ্গে—এমনকি উন্নততর যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই এইসব সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অশেষ নির্যাতন সহ্য করে, তবে নূতন সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। জগতের ইতিহাস এইভাবে একই সঙ্গে ধর্মীয় অগ্রগতির ইতিহাস এবং সংগ্রামের ইতিহাস।

প্রাচীনকালে দেশভ্রমণ অতিশয় কঠিন ও বিপদসঙ্কুল কার্য ছিল। তবু দেখা যায়, সব ধর্মেই তীর্থভ্রমণকে বিশেষ পুণ্যজনক কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নানা দেশের বা অঞ্চলের অভিজ্ঞতার দ্বারা চিন্তার জড়ত্ব নিরসন করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে দূরাঞ্চলের অধিবাসীদের মনোভাব ও আচার-ব্যবহারও প্রশান্ত মনে অবধান করবার অভ্যাস অর্জন করা।

বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে দেশভ্রমণ সহজ হয়েছে। এর ফলে একদেশদর্শিতা এড়াবার পথও প্রশস্ত হয়েছে। তাই এখন বহুদেশদর্শিতার আলোকে ধর্মীয়, নৈতিক ও দার্শনিক বিষয়াদি আলোচনা করে এ-সবের মূলীভূত ঐক্যের দিকে যথাযথ গুরুত্ব দেবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, বহু স্থলে লোকেরা শাস্ত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়ে ক্রমশঃ উচ্চতর বা আধুনিকতর মতবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটা অবশ্যই শুভলক্ষণ। এর গতি দেখে মনে হয়, আগামী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ধর্ম-বিষয়ের অনুষ্ঠানাদি দেশভেদে বিভিন্ন থাকলেও, হয়ত মূল বিশ্বাস সম্পর্কিত ব্যবধান দ্রুত কমে আসবে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বারা এ-কাজ ত্বরান্বিত হতে পারবে। ...ধর্মই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বৃত্তি; এই কারণেই বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহে—ধর্ম ও সংস্কারের সংমিশ্রণে এমন একটি সহজ-দাহ্য মিশ্রণ বা যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে, যা একটু অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করলেই দাবানল সৃষ্টি করে মহা-অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে।

দ্রাবিড়, আর্য, সেমেটিক প্রভৃতি সভ্যতার বিবরণ বা বৈশিষ্ট্য বর্তমানে পুস্তকের পাতায় স্থান পেয়েছে—কার্যতঃ এগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা দেশীয় কৃষ্টির সঙ্গে মিশে গিয়েছে বললেই চলে। আবার যান্ত্রিক যুগের প্রভাবে দেশীয় কৃষ্টির মধ্যেই শ্রেণিক-সংস্কৃতির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যে, ইতিহাসে, সর্বত্রই স্বদেশ-প্রীতিকে অতিশয় বড় করে ধরা হয়েছে—মানবপ্রীতি এই স্রোতে ভেসে গিয়েছে। তাই পরদেশ-আক্রমণকারী বিজয়ী সম্রাট এযাবৎ মাত্রাতিরিক্ত সম্মান পেয়ে এসেছে। পৃথিবীতে ধর্মের লড়াইয়ের চেয়ে রাজ্যের লড়াই-ই বেশী হয়েছে। (অনেক সময় অবশ্য ধর্মের আবরণেও রাজ্যের লড়াই সংঘটিত হয়েছে।) বর্তমান যুগে যন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান দেশ দুর্বল দেশগুলোকে করতলগত করে যথেচ্ছ শোষণ চালাচ্ছে, নিজেদের দেশে জীবনযাত্রার মান বাড়াচ্ছে, অথচ অধীন দেশকে মাথা তুলতে দিচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশ নামমাত্র স্বাধীনতা অর্জন করলেও আফ্রিকার উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপ প্রায় পুরোদমেই চলেছে। সাম্রাজ্য-বিস্তার কিংবা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে দু'দুটো রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর মানুষের কিছুটা শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে বলে মনে হয়। তাই আন্তর্জাতিক আদালতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দলীয় স্বার্থবুদ্ধি লেগেই রয়েছে। সবল আর দুর্বল রাষ্ট্রের অধিকার যতদিন সমানভাবে রক্ষিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বশান্তির স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করতে হলে অনুন্নত দেশগুলো যাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যোগাড় করে কাঁচামাল থেকে নিজেদের দেশেই মূল্যবান ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে না পারে, এদিকে বিজ্ঞানোন্নত দেশগুলোর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। সওদাগরী কারসাজি দ্বারা কাঁচামালের মূল্য হ্রাস করার বা নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা সর্বদা লেগেই রয়েছে। এতে দেশে-দেশে জীবনযাত্রার মানে আকাশ-পাতাল পার্থক্য স্থায়ী ক'রে রাখার কাজ হচ্ছে। এমন অবস্থায়, অর্থাৎ মানসিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, স্থায়ী শান্তির আশা একেবারেই দুরাশা। অতীতে ধর্মীয় তমদ্দুনের লড়াইয়ে যত লোকক্ষয় হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় সভ্যতা বা দেশীয়-ধনিক সভ্যতার লড়াইয়ে আধুনিক যুগে তার চেয়ে বহুগুণ অধিক নরহত্যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ধর্মীয় লড়াইয়ে তবু উভয় পক্ষের মনেই এক-একটা আদর্শ থাকত। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রীয় জোটের লড়াইয়ে লোভ আর লুণ্ঠনই একমাত্র আদর্শ—তাই এর বর্বরতা আর জঘন্যতাও অধিক বিকৃতি।

সংস্কৃতির নামে ভয়াবহ সংঘবদ্ধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বর্তমান যুগেই প্রবল আওয়াজ উঠেছে। বিরোধের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে মিলনের ক্ষেত্র প্রসারিত করাই বর্তমান যুগের জীবন-মরণ সমস্যা। তাই বিরোধের বিষয়গুলো সদ্ভাব রক্ষা করে খোলাখুলি আলোচনার দ্বারা ন্যায়ভাবে সমাধান করে ফেলা উচিত। বিশেষতঃ বিরোধ বা সংঘর্ষ যখন ধর্মীয় সংস্কৃতিই হোক বা স্বদেশীয় সংস্কৃতিই হোক, বা ধনিক-বণিক সংস্কৃতিই হোক, কোনোটারই অপরিহার্য অঙ্গ নয়,—কেবল অজ্ঞানতা আর অপ্রেম থেকেই এদের জন্ম—তখন দেশে-বিদেশের শান্তিকামী সুধীবৃন্দের আলাপ আলোচনা এবং যথাস্থানে তাদের প্রভাব বিস্তারের ফলে নিশ্চয়ই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা হতে পারে। স্থায়ী শান্তি আধ্যাত্মিক বা আত্মিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়; স্বার্থবুদ্ধিই সকল বিরোধ এবং অশান্তির মূল, এমনকি বর্তমান সভ্যতার নাশকও হতে পারে—এসব কথা সব দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদেরাই সাধারণ লোকের সামনে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে পারেন।

বর্তমান অবস্থা-দৃষ্টে বিরোধের কথা একদম চেপে যাওয়া সঙ্গত নয় মনে করেই, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নামে সংগ্রাম সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সুখের বিষয় সাক্ষাৎ প্রয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এমন বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে যেখানে বিরোধের কল্পনাও মনে আসে না, আপনা-আপনি হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, অপরের সঙ্গে আত্মিক মিলনের অনুভূতি জাগ্রত হয়। তেমন ক্ষেত্র,—নির্মল সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কারুশিল্প ইত্যাদি—এসবের ভিতর দিয়েই প্রাণখোলা মেলামেশা ও আদান-প্রদানের সম্যক সুযোগ ঘটে এবং যে-কোনো জাতির সমস্ত সার্থক সাধনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মনোবৃত্তির সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে সংস্কৃতির পরিবর্তন হলেও এর আসল খাঁটি রূপটি চেনা যায়। আমাদের দেশের সংস্কৃতির মূলে রয়েছে সহজ-সরল জীবনযাপনের ইচ্ছা—অতিরিক্ত স্পৃহা বা লোভ ত্যাগ করে অপরের সঙ্গে মিলে-মিশে সম্মানিতকে শ্রদ্ধা করে সৃষ্টিকর্তার মনের মতো কাজ ক'রে পুণ্য অর্জন করে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া; তারপর অনন্ত ভবিষ্যৎ জীবনে যথোপযুক্ত ফল ভোগ করা। মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ আছে,—এই ধারণায় দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে; তাই আল্লাহর দিদার লাভ করাই ধার্মিকজনের লক্ষ্য। এই আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি দ্বারাই আমাদের সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়ে থাকে। তবে মানুষের দুর্বলতা, জ্ঞানের অভাব, সাধ্যের অপ্রতুলতা প্রভৃতি তো ক্রিয়া করবেই। সকল গ্রামবাসীর পুঁথিপাঠ, প্রাচীন বীর্যকাহিনী স্মরণ, রসুলে-করীমের জীবনের টুকরো-টুকরো ঘটনা দিয়ে মিলাদ পাঠ, ওয়াক্তিয়া জমাত ও ঈদ-বকরীদ-এর মিলন—মারেফতী, ভাটিয়ালী, কাওয়ালী গান প্রভৃতির দ্বারা পরমাত্মার স্পর্শ লাভ করবার আগ্রহ—আনন্দে, উৎসবে, শোকে, দুঃখে, সর্বঅবস্থায় মঙ্গলময় আল্লাহর বিধানের উপর নির্ভর—এইসব আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত। লৌকিক ক্ষেত্রেও সারি-গান, জারিগান, পালাগান কাজরী গান, লাঠিখেলা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জীবনোপলব্ধি করবার যাবতীয় সাধনা, এমনকি বিশিষ্ট রন্ধন-প্রণালী, ভোজন-প্রণালী, সালামের পদ্ধতি, বাসগৃহ-নির্মাণ, সমাজ-ব্যবস্থা—সব কিছুকেই সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ উপাদান বলে মনে করা যায়। এইসব উপাদান সংরক্ষিত করে রাখা কর্তব্য। কারণ অতীতের সঙ্গে সংযোগের এইগুলোই সবচেয়ে বড় সূত্র। অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে লক্ষ্যশূন্য হবার ভয় থাকে। অবশ্য অতীতকে যে কিছু কিছু বর্জিত করে নিতে হবে না এমন নয়। এবং

সেই হচ্ছে অতীতের প্রতি সবচেয়ে বড় সম্মান প্রদর্শন : অতীতকে আমরা আত্মস্থ করব কিন্তু বর্তমানোপযোগী করে নেব। উন্নতির পন্থাই এই। অতীতকে না বুঝে বা বুঝবার চে না করেই অগ্রাহ্য করা যেমন বিপজ্জনক, আবার, তার দোষত্রুটি বুঝতে পেরেও চোখ বুঁ উদাসীন হয়ে থাকা তেমনি আত্মহত্যার সামিল। জগৎ এগিয়ে চলেছে। জগতের গতির স সঙ্গে অতীতও বর্তমানের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে যাবে। কেবল এইভাবেই আমরা উজ্জ ভবিষ্যতের ভূমিকা সৃষ্টি করতে পারব।

মাহে-নও
চৈত্র ১৩৬৪

# সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান

স্থানীয় প্রগতি মজলিসের উদ্যোগে, আর আপনাদের সহযোগিতায় এই ঐতিহাসিক শহরে যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহৃত হয়েছে, তাকে আমি এক জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি : তাই আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। এই সম্মেলনে সাহিত্য ও চারুকলার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের দিকেও আপনাদের দৃষ্টি পড়েছে দেখে মনে হয় আপনারা 'সংস্কার' অতিক্রম করে সংস্কৃতির এক ব্যাপক আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন : এ হয়ত 'প্রগতি মজলিসের' উপযুক্ত কাজ হয়েছে। তবু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সাধারণের মনে এক রকম দৃঢ় সংস্কার আছে যে বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে সংস্কৃতিকে চুরমার করে দেওয়া। তার সংস্কৃতির গঠনে বিজ্ঞানের কোন হাত আছে কি না আজকের দিনে একটু ভেবে দেখা দরকার।

আমরা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতি, সেমেটিক-আর্য সংস্কৃতি, প্রস্তরযুগীয় লৌহযুগীয় মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি নানাভাবে ভাগ করে সংস্কৃতির বিবর্তন বা রূপান্তর বুঝতে চেষ্টা করে থাকি। ধর্ম, দেশ, কাল, জাতি প্রভৃতির প্রভাব আমাদের চিন্তায় এবং কর্মে প্রতিফলিত হয়—এটা পরীক্ষিত সত্য। তাই আমরা সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ণয় করবার জন্য ঐসব শ্রেণীবিভাগ করে থাকি। এটা অবশ্যই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি : নানাভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করে সেইসব গোষ্ঠীর মধ্যে আচারগত, ব্যবহারগত, এবং চিন্তাগত পার্থক্য লক্ষ্য করে যদি দেখা যায় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকেদের মধ্যে গড়পড়তা যে পার্থক্য তার চেয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশী, তাহলে সেরূপ পার্থক্যকে আকস্মিক না বলে প্রকৃত পার্থক্য বলতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে মাপ-জোখ করতে হয়, সামাজিক বা ব্যক্তিক ব্যবহারাদি সম্পর্কে তার প্রয়োগ করা সহজ নয়। যে স্কেল,ওজন বা গণনা দিয়ে মানুষের দৈর্ঘ্য, বাণিজ্য-সামগ্রীর ওজন, আদমশুমারী বা পশুশুমারী করা যায়, তা দিয়ে মানুষের ভয়, আসক্তি, ক্রোধ, সামাজিকতা, জীবন-সংগ্রাম, যৌনবৃত্তি প্রভৃতির পরিমাপ করা কিছু অসুবিধাজনক বটে। তবু এসব ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দিন দিন তার উন্নতিও হচ্ছে। বিজ্ঞান, বিশেষতঃ শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছে যার ফলে মানস-ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ কতকটা সুগম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দুই-একটা সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

আগে এক ধারণা ছিল জন্মকালে আমাদের মন একদম সাফ থাকে অর্থাৎ তাতে কোনও রকম সু বা কু-প্রবৃত্তির লেশমাত্র থাকে না। সেই পরীক্ষার শ্লেটের উপর যেমন ইচ্ছা তেমনই দাগ কাটা যায়। আর একটি ধারণা ছিল, আদম-হাওয়ার প্রাথমিক পাপের ফলে প্রত্যেকেই জন্মপাপী, সুতরাং এই স্বাভাবিক পাপ-প্রবৃত্তি নিরোধ করে চিৎ-ক্ষেত্রে সুপ্রবৃত্তির বীজ বপন করাই জীবনের সাধনা। কিন্তু গবেষণা দ্বারা দেখা গেছে, অনুবীক্ষণ-দৃষ্ট ক্ষুদ্রতম জীব বা এমিবারও কতকগুলো বিশেষ প্রবণতা আছে, রুচি-অরুচি আছে— যার দ্বারা তার সমুদয়

ক্রিয়াকলাপ নির্ণীত হয়। অবশ্য আমরা বলতে পারিনে এমিবা যা করে জ্ঞাতসারে করে কিনা। কিন্তু মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়, যে-সব কণিকা দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধিত হ'তে পারে তাদের দিকে এমিবা অগ্রসর হয় এবং তাদের ঘিরে ফেলে আত্মস্থ করে নেয়। আর যে-সব কণিকা তার পক্ষে হানিকর তাদের থেকে সে দূরে সরে যায়। মানুষের প্রতিটি জীবকোষে ক্রমোসোম রয়েছে, তার গঠন এবং প্রকৃতি কোনও দুই জনের মধ্যে সম্পূর্ণ এক রকম দেখা যায় না; এমন কি একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যেও নানা আকস্মিক কারণে এর বিভিন্নতা ঘটে। যমজ সন্তানদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, সামাজিক প্রভাব ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা করে দিলেও কতকগুলো মূল বিষয়ে—যেমন অপরাধপ্রবণতা, যৌন-প্রবৃত্তি, প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রভৃতিতে এদের মধ্যে বিশেষ সৌসাদৃশ্য থাকে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার ফল কিছুটা থাকলেও চরিত্রের আসল বুনিয়াদ জন্মের সঙ্গেই অথবা ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে যায়।

মানুষ সামাজিক জীব এবং পৃথিবীর যা কিছু উন্নতি তার অধিকাংশই সামাজিক উত্তরাধিকারের ফল—এই বলে আমরা গর্ব অনুভব করে থাকি। তবু শেষ-মেষ একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষা-দীক্ষায় আমাদের মনের উপরকার খোলসটার কিছু পরিবর্তন দেখা যায় মাত্র, আমাদের প্রধান মৌলিক বৃত্তিগুলো যেমনকার তেমনি থেকে যায়। হবার মধ্যে হয় এই যে, এইসব বৃত্তি নিরুদ্ধ না হয়ে কোনও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। কোন্ কোন্ বৃত্তি কি কিভাবে বিকল্প প্রকাশ লাভ করতে পারে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের প্রকৃতিতে যেসব মূল প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হয়ে আছে সেগুলো মানব-সভ্যতার ইতিহাসে কোনও না কোনও সময়ে জীবন-যুদ্ধের মরণ-বাঁচন সমস্যায় আমাদের কাজে লেগেছে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা দলগত জীবনের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করেছে। জন্ম থেকেই যে-সব মূল বৃত্তি সচরাচর লক্ষিত হয় সেগুলো এই :

ক. বেঁচে থাকবার তাগিদ; এর সঙ্গে প্রভুত্ব লাভ, আত্মরক্ষা, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতিও জড়িত।

খ. সামাজিক বৃত্তি; এর সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, সহানুভূতি, বিশ্বস্ততা, পরার্থ-পরতা প্রভৃতির সংস্রব আছে।

গ. কোমলবৃত্তি বা মাতৃবৃত্তি; এর সঙ্গে নিরাশ্রয় বা দুর্বলের প্রতি আনুকূল্য, বাৎসল্য, যৌনবৃত্তি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট। কিন্তু মানুষের এইসব বৃত্তি মৌমাছি বা পিপীলিকার সহজাত বৃত্তির মত সর্বদা একভাবে প্রকাশিত হয় না। দেখা গেছে, ফেরাউনদের যুগ থেকে এ পর্যন্ত মৌমাছি ও পিপীলিকার ব্যবহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও হু-বহু এক রকম রয়ে গেছে। কিন্তু জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ করবার ধারা অনেক বদলে গেছে। অর্থাৎ আমরা অন্যবিধ উপায়ে আমাদের প্রাথমিক ক্ষুধা মিটাবার উপায় আবিষ্কার করে চলেছি। অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের সংস্কার বা সংস্কৃতির রূপান্তর হয়ে থাকে। আরও মনে রাখতে হবে, আমাদের মূলবৃত্তিগুলি প্রয়োগ-ক্ষেত্রে অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে, তাই এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবার প্রয়োজন হয়। সভ্যসমাজের এই রীতি, এর রকমারিতে সংস্কৃতির বিভিন্নতা ধরা পড়ে।

আগেই বলা হয়েছে, এই সামঞ্জস্য বা শৃঙ্খলাবিধান করতে গিয়ে মূলবৃত্তি নিরোধ না করে বরং তার জন্য ভিন্ন প্রকাশ-পথ খুলে দেওয়া যায়। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন অভ্যাস অবলম্বন করেই একটি সমাধা হয়। বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক

নিরাপত্তা বৃদ্ধির উপায় আবিষ্কার হওয়াতে আমাদের কোনও কোনও আদিম-বৃত্তির প্রবলতা হ্রাস করবার সুযোগ মিলেছে। এর ফলেই আমরা বর্তমান মূল্যবোধের অনুগত করে আদিম-বৃত্তিগুলির কতকটা সামঞ্জস্যময় অনুপাত নির্ণয় করতে পারি। এ না হলে অন্যের সঙ্গে বোঝা-পড়া করা কিংবা নিজেরই বিভিন্ন প্রবণতার সমন্বয় সাধন করা অসম্ভব হ'ত। এইখানে বিজ্ঞানের দানের মর্যাদা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিকের সাধনায় জ্ঞানবৃদ্ধি এবং জীবন-সৌকর্যের মাল-মসলার পর্যাপ্ত ঘটেছে বলেই আমরা আমাদের বাহ্যক্রিয়াকলাপ, আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিক বা সামাজিক আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছি। এই সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োগ করতে হয় তাই ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে। অন্য কথায় বলা যায় সৃষ্টিধর্মী বা বিকাশধর্মী বিজ্ঞান যে উপকরণ এনে দেয় তাই নিশ্চিন্ত ও সুস্থিরভাবে উপভোগ করবার জন্য ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করে।

আমরা যাকে আদর্শ বলি, সে হচ্ছে মূলতঃ আমাদের বিভিন্ন আদিম বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন সম্বন্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও দ্রষ্টাদের নির্দেশ। এই আদর্শের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু জীবন যেমন এগিয়ে চলেছে, আদর্শকেও মোটামুটি তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। সবখানেই দেখা যায় বিরুদ্ধ শক্তির সংবর্ধনা না হলে কোনও কিছুই ভালো করে বুঝা যায় না বা উপভোগ করা যায় না। জ্ঞানতঃ উপভোগ করতে হলে আমাদের সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে। তাই গতির মধ্যেও যেমন স্থিতির অবকাশ চাই, স্থিতির মধ্যেও তেমনি গতিকে আত্মস্থ করবার উদার ক্ষমতা থাকা চাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কিসে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রায়ই বলে থাকি মানুষ যুক্তিবিচার করতে পারে, অন্য প্রাণী তা পারে না। কোনও ইতর জীব নিজের ব্যবহারের কৈফিয়ত দেবার কথা ভাবে না, কিন্তু মানুষ নির্লিপ্তভাবে তার কার্যকলাপ এবং মানসিক চিন্তা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মতামত গঠন করতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় মানুষের এই আত্মপ্রসাদ একদম ফাঁকা না হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরাও কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির বশে চিন্তা-ভাবনা না করে অনেক কাজ করে থাকি। ক্ষুধায় আহার, বিপদে আত্মরক্ষা বা পলায়ন, যৌবনোন্মেষে সম্ভোগ-তৃষ্ণা এসব সহজাত বৃত্তির হয়ত কারণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা না জেনেও মানুষের কাজ করতে বাধে না। আসলে, এমন অবস্থায় সে সহজাত প্রবৃত্তি বা অন্ধ আবেগের বশেই কাজ করে থাকে। কাজ করে চিন্তা করা, আর চিন্তা করে কাজ করা এক জিনিস নয়।

আমরা অনেক কিছুই অভ্যাসমত করে থাকি। আমরা কত কষ্ট করে হাঁটতে শিখি, কথা বলতে শিখি, নামতা শিখি, সাইকেল চালাতে শিখি—পরে এসব এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে অনায়াসেই করে থাকি। অনেক দৈনন্দিন কাজ—যেমন সকালে উঠে হাত-মুখ ধোওয়া, জামা-কাপড় পরা, এমনকি পবিত্র কোরান তেলাওয়াৎ পর্যন্ত এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে যন্ত্রের মত আমরা ঐসব করে থাকি। এর পিছনে ভাবনার লেশমাত্রও থাকে না। অবশ্য জীবনের প্রত্যেক খুটিনাটি কাজ ভেবে করতে হলে অনেক কাজ করাই হত না। কিন্তু একথাও ঠিক যে অভ্যাসজাত মানসিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে অনেক কিছুরই আসল তাৎপর্য শেষে আর আমাদের মনেই উদয় হয় না। যেসব সাধনায় মানসিক সক্রিয়তার প্রয়োজন, সবক্ষেত্রেও প্রায়ই অভ্যাসের ফলে মনের জড়তা এসে যায়; তাতে সাধনার আর কোনও কারণের দিকে আবার মন আকৃষ্ট হয়।

আমাদের আচার-ব্যবহার, ভাল-মন্দের ধারণা, এসব সাধারণতঃ পিতামাতার প্রদত্ত শৈশব-শিক্ষার ফল। সেসময় বিচার প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না এবং যাদের উপর একান্ত-ভাবে জীবন নির্ভরশীল সেই পিতামাতার প্রতি সহজ আনুগত্যের ফলে তাঁদের মতামত আমরা যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করি এবং তাকে প্রামাণ্য বলে ধরে নেই। বাল্যের এইসব মতামতের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে আমাদের ক্রোধ উপস্থিত হয় এবং সচরাচর আমরা বিরুদ্ধবাদীকে পাগল ঠাউরিয়ে থাকি। অনেক সামাজিক আচার-বিচার সম্বন্ধেও আমাদের এমন সংস্কার জন্মে যায় যে অন্য প্রকার আচার-ব্যবহার অনেক সময় হাস্যকর বলে মনে হয়। আমাদের সামাজিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতামত প্রায়ই আমরা অন্ধভাবেই অনুসরণ করে থাকি। ধর্ম সম্বন্ধেও একথা খাটে। বিচার করে দেখতে গেলে এগুলোকে অন্ধ সংস্কার না বলে উপায় নেই। হয়ত মনে ভাবি আমরা সংস্কারমুক্ত, ভূত মানিনে। কিন্তু আঁধার রাতে ছাতিম গাছের তলা দিয়ে যেতেই হয়ত প্রাণের মধ্যে কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠে। এতে বুঝা যায়, আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যা ভাবি, কিংবা লোকের কাছে যেমন দেখতে চাই সেটা অনেক সময়ই বিচারে টেকে না।

দেখা যাচ্ছে আমাদের মানসিক গঠনে সহজাত বৃত্তি, অভ্যাস, সামাজিক রীতি, শৈশবকালীন সংস্কার, কুসংস্কার প্রভৃতি ভিত্ত করে রয়েছে। এসবের সাধারণ লক্ষণ এই যে, এইসব সংস্কারের সম্বন্ধে আমরা নিজেদের মনে এক রকম নিঃসন্দেহ। কাজে-কাজেই এগুলোর প্রতি আমাদের অন্ধ আসক্তি আছে। এখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিচারের স্থান বেশ সংকীর্ণ। তবে যেসব ব্যাপার গভীর সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, বা যার সঙ্গে আমাদের স্বার্থের কোনও যোগাযোগ নেই সেসব ক্ষেত্রে বিচার-ক্ষমতা বা যুক্তি অবাধে কাজ করতে পারে। মোট কথা, যেখানেই আমাদের আবেগের প্রাচুর্য, সেখানেই আমাদের চিন্তা ব্যবহারে অযৌক্তিকতার প্রাদুর্ভাব। আমরা যদি সব রকম অন্ধ-সংস্কারের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারতাম, তাহলে বিশ্বমানব-সমাজে পরস্পর বুঝা-পড়া কত সহজ হত! আর অতীতের আদেশ এবং সামাজিক নির্দেশের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে অবস্থা বিচার করবার সুযোগ পাওয়ায় ব্যক্তিত্বের স্ফুরণও সহজ হত।

জীবনদর্শনের দ্বারা অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় একথা অস্বীকার করবার যো নেই, কারণ, একই অবস্থায় পড়ে কেউ হয়ত একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে, আবার কেউ হয়ত সহজেই সামলে নেয় বা সামান্যই প্রভাবিত হয়—এ আমরা সচরাচর দেখে থাকি। জীবনদর্শন অবশ্য জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মে। কিসে কেমন ফল হয় তাই বহু বার দেখে দেখে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা প্রধান, কোনটা অপ্রধান, কি করণীয় আর কি বর্জনীয় এইসব বিষয়ের ধারণা জন্মে। এই বাছবিচার করে আমরা নিজেদের চরিত্র আর প্রবৃত্তি অনুসারে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকি। আর জীবনের সার্থকতা বা নিষ্ফলতাও কর্ম দ্বারাই যাচাই করা হয়। আজকার পৃথিবীতে জনগণকে সুনিয়ন্ত্রিত করে কল্যাণপথে চালনা করবার বিশেষ প্রয়োজন; সকল দেশের সকল জাতির সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত পার্থক্যের দিকে লক্ষ না করে [illegible] ক্ষেত্রে মিলিত হোক, এ প্রার্থনা করি।*

দিলরুবা
৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা : ১৩৫৯

* কুমিল্লা পূর্ব-পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

# আলোচনা-সমালোচনা-ভূমিকা

এবার শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। গত পাঁচ বছরের পূর্ববাংলার প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল। দায়িত্ব অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছিলাম, কিন্তু নানা কারণে মনের মত করে তা সম্পাদন করতে পারি নি। যা'হোক, সাহিত্যিক কসরত প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না,— প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবসম্পদে পুষ্ট শান্তিনিকেতনটা একবার নিজের চোখে দেখা, আর দশ-পাঁচজন চিন্তা-নায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া।

ভিসা অফিসের হাঙ্গামা দিকদারী পার হয়ে শেষকালে ঠিক রওয়ানা হবার আগের দিন ভিসা হস্তগত করে কলকাতা গেলাম। তারপর শিয়ালদা থেকে বেলা গোটা দশেকের সময় এক্সপ্রেস ট্রেনে বোলপুর রওয়ানা হলাম। রেলগাড়ীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে একথা বলা উচিত যে ঐ ট্রেনে অনেক নামকরা সাহিত্যিক শান্তিনিকেতনে 'সাহিত্য-মেলায়' যোগ দেবার জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওদুদ সাহেব এবং গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার পূর্বেই পরিচয় ছিল। অপরিচিতদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে। ওদুদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের সঙ্গে ট্রেনেই পরিচয় করিয়ে দেবেন কিনা। আমি আপত্তি করাতে পরিচয় তখনকার মত বন্ধ রইল। যদি জিজ্ঞাসা করেন, আপত্তির কি কারণ? তা'হলে হয় ত ঠিক জওয়াব দিতে পারব না। তবে মনের অস্পষ্ট ভাবটা ছিল এই রকম— পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের চেষ্টা সচরাচর ব্যঙ্গকৌতুক বা করুণার উদ্রেক করে থাকে; কিন্তু অপরিচিত সাহিত্যিক-সাহিত্যিকাদের সঙ্গে বর্বরবার আলাপন প্রচেষ্টা কি রসের উদ্রেক করে, সে বিষয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমত অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে তাড়াতাড়ি পা বাড়ান কি ভাল? তাছাড়া পরিচয় ব্যাপারে আমার একটা বদ্ধ-সংস্কারও আছে : পাঁচ মিনিটে ২০ জনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল; হয় ত নমস্কার, সালাম-আলায়কুম বা মাথা নাড়া গোছের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হল; কিন্তু সেটা কি পরিচয়? পরিচয় হয় তখন, যখন দুই পক্ষেই গরজ বা আগ্রহ থাকে। তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বা যোগাযোগ চাই।

গঙ্গার ব্রিজ পার হয়ে বর্ধমান ডিঙ্গিয়ে প্রায় দেড়টা দু'টোর সময় বোলপুর ষ্টেশনে পৌছান গেল। অনেক আদর-আপ্যায়ন এবং হৃদ্যতার পরিচয় তখন পাওয়া গেল অভ্যর্থনা কর্তৃপক্ষের কর্মী ও কর্মিনীদের কাছ থেকে। বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন প্রায় ২/৩ মাইল হবে। অল্পক্ষণেই আমরা যার যার নির্দিষ্ট বিশ্রাম ভবনে পৌছে গেলাম। ঐ বাড়ীতে আমরা ছিলাম পাকিস্তানের চারজন আর হিন্দুস্থানের দুইজন। পাকিস্তানীদের মধ্যে বাউলকবি মনসুরউদ্দীন এবং তরুণ কবি শামসুর রাহমান ছিলেন। আর ভারতীয় দুই জনই বিখ্যাত নাট্যকার—পূর্ব বাংলার লোক, এখন কলকাতার বাসিন্দা। একজন শচীন সেনগুপ্ত, পূর্ববাস

খুলনা জেলায়, আর একজন তুলসী লাহিড়ী, পূর্ববাস রংপুরে। এঁদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমেছিল, তা "শুধু পথিকে পথিকে পথের আলাপনই" নয়, কারণ, এ-তে হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়, মনের সঙ্গে মনের কোলাকুলি– হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর বা মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের পরিচয়ের চেয়ে উঁচু।

এখানে আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন কয়েকটি ছাত্র আর ছাত্রী। এঁদের সকলের নাম মনে নেই বলে কারোরই নাম উল্লেখ করলাম না। এঁদের শোভন স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আর সেবাযত্নের নিখুঁৎ পরিপাটী দীর্ঘকাল স্মরণ রাখার মত। মনে পড়ে প্রায় বিশ বছর আগে শান্তিনিকেতনের মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো এক লেখিকার একটা ঝাঁঝালো সমালোচনা পড়েছিলাম। তাতে তিনি এঁদের শুধু ফ্যাশন দুরন্ত বিলাসিনীরূপে চিত্রিত করেছিলেন। বাস্তবে কিন্তু দেখলাম অন্য রকম— অত্যন্ত অনাড়ম্বর, গৃহকর্মে সুপটু, পরিবেশনে কুশলা এবং আলাপে রুচিশীলা। শান্তিনিকেতনের পরিবেশের সঙ্গে এঁরা যেন বেমালুম মিশে গেছেন। দুই একজনকে দেখলাম বেশ ফুলের কদর বুঝেন— খোঁপায়, কানে, যেখানে যেমন সাজে প্রকৃতির অকৃপণ দানের সদ্ব্যবহার করতে জানেন।

শুধু যে ছাত্র-ছাত্রীরাই তত্ত্বাবধান করেছিলেন তা নয়, কর্তৃপক্ষীয়েরাও একাধিকবার সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসাবাদ এবং আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা রায়, বীণা দে, প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখা করতে এসেছিলেন। একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝা গেল যে এঁদের মধ্যে বেশ একটা সহজ সামঞ্জস্য জন্মেছে, যার ফলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ নির্বিরোধে সব কাজই হয়ে যাচ্ছে— কোনটারই ত্রুটি হচ্ছে না, যেন সুরে বাঁধা বীণার বিভিন্ন তারের ঝঙ্কারে রাগিণীর পূর্ণরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। একদিন জোছনা রাত্রে ছাদের উপরে বসে তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কবিতা আর সঙ্গীতচর্চা হয়েছিল, দৃশ্য কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র উদ্ঘাটনের মত। আমার ধারণা ছিল, বোলপুরে বুঝি ছোট ছোট পাহাড় আছে। কিন্তু আসলে একটা উঁচু টিলাও চোখে পড়ল না। তবে মাটি লাল, আর জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের মত শক্ত হয়ে গেছে। লাল মাটি আর লাল রাস্তা দেখে মনে পড়ল, "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ"— সত্যি মন ভুলাবার মত।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বোটানি বিভাগের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শান্তিনিকেতনের কোথায় কি আছে মোটামুটি দেখে নিলাম। সকলের আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে বাড়ীখানা তৈয়ার করেছিলেন তারই নাম "শান্তিনিকেতন"। এই থেকেই সমস্ত পল্লীটার নাম হয়েছে শান্তিনিকেতন। দেবেন্দ্রনাথ এই বিশেষ স্থান কেন নির্বাচিত করেছিলেন তার একটা ইতিহাস আছে। লর্ড এস. পি. সিংহের পিতৃকুলের সঙ্গে মহর্ষির বন্ধুতা ছিল। একবার তিনি পাল্কী করে বোলপুর থেকে ৮/১০ মাইল দূরবর্তী সেই বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছিলেন। যাবার সময় পথে এই নির্জন জায়গাটার বিজন সৌন্দর্য তাঁর ভাল লেগে যায়। তাঁর বন্ধু ছিলেন ঐ অঞ্চলের জমিদার। তাঁকে বললেন, ঐ জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয়েছে, ঐখানে তিনি বাড়ী তৈরী করে অবসরযাপন করবেন। সে কেমন ক'রে হয়? ওখানে তো চোর-ডাকাতের আড্ডা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সংকল্প ত্যাগ করলেন না। তাঁর আগ্রহ দেখে বন্ধু ঐ স্থানটা (প্রায় ২ বর্গমাইল) তাঁর কাছে বিক্রয় করেন। তারপর তৈরী হয় 'শান্তিনিকেতন' এবং তার পাশে গড়ে ওঠে 'আম্রকুঞ্জ', 'ছাতিমতলা' প্রভৃতি। আম্রকুঞ্জে

বার্ষিক বসন্ত উৎসব হয়; ছাতিমতলার বেদীতে বসে মহর্ষি উপাসনা করতেন। ঐখানে আরও বড় মণ্ডপঘর আছে, তার নাম তালধ্বজ। তালগাছটা ঘরের মধ্যস্থল ভেদ করে ছাতার মত শোভা পাচ্ছে; বোধহয় 'তালচ্ছত্র' নাম দিলে বেশ খাটত। তালগাছটার বন্ধন দশা দেখে মনে হয়েছিল ওটা বোধহয় আসলে এক দৈত্য ছিল। কবে কোন রাজকুমারী হরণ করে মাথার জটাজুটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই অপরাধে কোনো রাজর্ষি অভিশাপ দিয়ে একে তালগাছে পরিণত করেন। পাছে আবার কখন মন্ত্র বলে জ্যান্ত হয়ে পালিয়ে যায়, এই ভয়ে তার পদমূলে গৃহের মায়া সৃষ্টি করে কঠিন বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন।

এখন ওখানে পাকা রাস্তা, ঘর-বাড়ী, পানির কল, বিজলী বাতি, এইসব হয়েছে। আগে কিন্তু জংলা জায়গা ছিল, শাল, মহুয়া, বৈঁচি প্রভৃতি পাহাড়ী গাছ ছাড়া অন্য গাছ অল্পই ছিল। এখন দেশ-বিদেশের অনেক রকম গাছগাছালি আমদানী করা হয়েছে, রীতিমত পানি সরবরাহের ফলে স্থানটা বেশ শ্যামল-শ্রী ধারণ করেছে। একটু দূরের উষর ভূমি লক্ষ করলেই বুঝা যায় আগেকার অবস্থা। রাস্তায় পাথরের মত শক্ত ছোট ছোট লাল 'খোয়া' দেখে জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো কি ইটের চূর্ণ? শুনলাম তা নয়— ওগুলো খোয়াই— অর্থাৎ বৃষ্টির পানিতে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে মাটির ভিতর থেকে আপনা থেকেই দানার মত শক্ত শক্ত খোয়াগুলো বের হয়। বুঝলাম প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও মিল রয়েছে। মনের অগোচরে চিন্তার কণাগুলো লুকিয়ে থাকে। স্বভাব সঙ্গত শিক্ষার বারিপাতে মনের চিন্তাগুলো আপনা আপনিই দানা বাঁধে— ইট ভাঙ্গার মত হাড় ভাঙ্গা খাটুনি ছাড়াই মহত্তের সংস্পর্শে এ ব্যাপারটি ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ নামকরণে ওস্তাদ ছিলেন। 'উদীচী', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'কোণার্ক' এগুলো উত্তরায়ণের উত্তর এবং পূর্বদিকের কয়েকখানা ছোটঘরের নাম। 'উদীচী'তে উদয় সূর্যের প্রথম আলো পড়ে। 'পুনশ্চ'তে কি হয় ঠিক বুঝতে পারলাম না। 'শ্যামলী'র সর্বাঙ্গ এমন কি ছাদ পর্যন্ত শ্যামল মৃত্তিকায় তৈরী, কিন্তু তার উপরে যে রঙের আলেপ আছে, তা শ্যামল নয়, ঘোর কৃষ্ণ। বোধহয় শ্যাম এবং কৃষ্ণ আসলে অভিন্ন বলেই এই ব্যবস্থা। 'কোণার্ক' এক কোণে পড়ে রয়েছে অভিমানিনী বধূর মত। 'তালধ্বজে'র কথা আগেই বলা হয়েছে।

আম্রকুঞ্জের মত একটি শালবীথিও রয়েছে। বহু যত্নে সাজান এইসব কুঞ্জ আর বীথি। এক জলদ্বীপ আছে, ছোট্ট একটা জলাশয়ের মধ্যে। কেটা সেতুর উপর দিয়ে জলদ্বীপে যাওয়া যায়। জলে আছে কলমী, কুসুম, পদ্ম প্রভৃতি জলজ ফুল আর দ্বীপে আছে 'মালাঞ্চ' নয়— শুধু একখানি ঘর। অনেক সময় সুন্দর 'যামুমণি' ঐ ঘরখানিতে বসেই লণ্ঠন জেলে 'জাগরণের' কত 'বিভাবরী' যাপন করেছেন, মানসসুন্দরীর ধ্যানে বা কাব্যলক্ষীর নির্মাল্য রচনায়।

তেহরান থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ পারস্য মডেলে এক দৃষ্টিশোভন বাগিচা তৈয়ার করেছেন। সেখানে নানা জাতীয় ফুলফুলের গাছ আছে। রঙ্গন, অশোক, পলাশ, কাঞ্চন, সোনাঝুরি, নীলমণি লতা, কুরক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগে জানতাম পলাশ বুঝি কেবল অনুরাগ-রাঙাই হয়, কিন্তু তার বেদনা হলুদ রূপের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল এখানে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হয়েছে এক রকম বাবলা জাতীয় গাছ, যার পাতা রেশোলী নিশান ওড়ে, আর ঝরাফুলে জমিতে সোনার আস্তরণ বিছিয়ে যায়। কবি এর নাম দিয়েছেন 'সোনাঝুরি'। 'কুরক' এক রকমের ভায়োলেট রঙ-এর ফুল। 'নীলমণিলতা' এসেছিল বিলেত থেকে; কবির দেওয়া নামেই এ ফুলের রঙ আর সৌন্দর্যের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে।

শান্তিনিকেতনের পাঠ্য তালিকা, বিষয় বিভাগ প্রভৃতির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারি নি। একেত অন্য কাজে বা হুজুগে সময় কম ছিল, দ্বিতীয়তঃ ছুটির সময় বলে অফিসগুলো বন্ধ ছিল; কাজেই কর্তৃপক্ষীয়েরাও মেলার আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উদ্যোগ করে এ-সব সংগ্রহ করে দিতে পারেন নি। মোটামুটি বুঝলাম, এখানে বি.এ. পর্যন্ত কলাবিভাগের প্রচলিথ সব বিষয়েই অধ্যাপনা হয় এবং বি. টি. পড়বার ট্রেনিং স্কুল আছে। বাংলা বিভাগে নিশ্চয়ই এম.এ. পর্যন্ত পড়বার বন্দোবস্ত আছে। কিন্ডারগার্টেন এবং প্রাইমারী শিক্ষারও ভাল ব্যবস্থা আছে। স্কুলঘর এবং আসবাবগৃহের দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকা রয়েছে, যাতে ছোট ছেলেমেয়েদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। চিত্র এবং ভাস্কর্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় হয় রাস্তায় চলতে চলতে আর দেওয়ালের লেখায়। 'দেওয়ালের লেখা' পড়তে পারা অবশ্য খুব বড় একটা গুণ। চোখ খোলা রাখলেই এ-গুণের উন্মেষ হয়। যতদূর বুঝলাম আর্টের ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দের মিল রাখবার আনুষঙ্গিক চেষ্টার কার্পণ্য হয় নি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল রয়েছে। আর অধ্যাপকদের জন্যও ছোট ছোট অনেক পাকা বাড়ী রয়েছে। আমরা কমের পক্ষে ত্রিশ চল্লিশজন অতিথি গিয়েছিলাম; কিন্তু তাতে স্থানের অসঙ্কুলান হয় নি। দেড় মাইল দূরে আছে শ্রীনিকেতন। সেখানে কৃষি ও বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্য উন্নয়নমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা। বক্ষের মধ্যে একটু আধটু ঘুরে যা দেখা যায় দেখলাম। একটা দেওয়ালে পরিষ্কার হরফে একটা কবিতা লেখা রয়েছে যাতে এই প্রতিষ্ঠানের মূল ভাবটা ফুটে উঠেছে। কবিতাটি এই :

ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে;
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে ডাকদিল যে গানে গানে।
দিক হ'তে ঐ দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা
জন্ম মরণ ওরি হাতের অলস সূতোয় গাঁথা।
ওরে হৃদয় গলা জলের ধারা, সাগর পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে।

সত্যিই তো ধরণী ফুলের হাসিতে, পাখির গানে, আমাদেরকে ডাক দিচ্ছে ওর কোলে টেনে নেবার জন্য। পাশ দিয়ে ময়ূরাক্ষী আত্মহারা হয়ে সাগর পানে ছুটে চলেছে। সাগরের সঙ্গ লাভ হ'লে তাকে তো আর নদীর মৃত্যু বলা যায় না; সেইতো জীবন।

সাহিত্য-সভাগুলোর অধিবেশন হয়েছিল 'সঙ্গীত ভবনে'। উঁচু একটা মণ্ডপ, তার সামনে মস্ত বড় প্রাঙ্গণ, তাতে তিন-চার হাজার লোক অনায়াসে বসতে পারে। মণ্ডপটিতে ঢালা বিছানা; আর মধ্যস্থলে সভার পরিচালকদের জন্য ছোট ছোট তিনটি বেদী, আর ঠেশ দেবার জন্য বড় বড় তাকিয়া। মণ্ডপের পিছন দিকে অর্থাৎ প্রাঙ্গণের উল্টো দিকে বারান্দা, তার আরও পিছনে সঙ্গীত ভবনের অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ। প্রাঙ্গণ থেকে যাতে পিছনের লোক চলাচল না দেখা যায় সেজন্য বরাবর নীলাম্বরীর টানা পর্দা দেওয়া হয়েছিল। পর্দার ঠিক উপরে আর নীচের দিকে সুদৃশ্য শিল্পকার্য দেখা যাচ্ছিল। মোটের উপর পরিবেশ মনোজ্ঞ, কিন্তু থিয়েটারী নয়।

প্রতিদিন সভা আরম্ভের আগে আগে আশেপাশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে একটু আধটু আলাপ হ'ত। বলা বাহুল্য, আমি এ ব্যাপারে বেশী সুবিধে করতে পারি নি। কারণ দশজনের

মধ্যে খামখা চেঁচানো কিংবা অন্যকে চেঁচাতে বাধ্য করা বিশেষ রুচিকর ব্যাপার নয়। আমি প্রধানতঃ চোখটাই খোলা রেখেছিলাম, কানের ব্যবহার বিশেষ করে সঙ্গীতের জন্য রিজার্ভ ছিল। রোজই তিন-চারটে করে গান হ'ত কিন্তু তা যেন মোটের উপর কেমন প্রাণহীন বলে মনে হ'ল। নিশ্চিতই এটা কানের দোষ হবে, গানের ততটা নয়। সভাস্থলে সচরাচর এমন দুই চারজন থাকেন যাঁদের পরিচয় জানবার জন্য প্রবল আগ্রহ হয়। ইন্দিরা দেবী, বীণা দে, লীলা রায়, রথীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, আবদুল ওদুদ, নরেন্দ্র দেব, প্রভাত মুখোপাধ্যায় এঁরা এই পর্যায়ের লোক। এঁদের কেউ কেউ ঊর্দ্ধ গগনের লোক, কেবল শাহীন পাখীরাই সে ঊর্দ্ধে উঠে তাঁদের পরিচয় পেতে পারে। অন্নদাশঙ্কর, আবদুল ওদুদের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। লীলা রায় আর বীণা দে সহজ হৃদ্যতায় অনায়াসে পরকে আপন করে নিতে পারেন। নরেন্দ্র দেবকে ভারিক্কি লোক বলে বোধ হল, আর সামনে এগোবার তেমন সুযোগও হ'ল না। এটাকে আমি ক্ষতি বলেই বিবেচনা করি। প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঋষিকল্প লোক। তবু কোথাও যেন তাঁর সঙ্গে একটা গভীর আত্মীয়তা বোধ করছিলাম। ইনি এমন লোক যাঁকে দেখলেই মনে হয় সকলের চির চেনা। দাড়ীর আকর্ষণে (!) আমরা দুইজনে পরস্পর সান্নিধ্য লাভ করবারও সুযোগ পেয়েছি। মনে হচ্ছিল এই শান্ত সমাহিত লোকটার মধ্যে যেন রবীন্দ্রনাথের আত্মার সৌন্দর্য অধিষ্ঠিত রয়েছে। আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন মুকুল দে, আর্টিস্ট, প্রবীণ লোক, মিশুক আর রসিক। এঁর লেখিকা কন্যা মঞ্জরী দে একখানা বই 'নবমী' উপহার দিয়েছিলেন। তাতে বুঝলাম আর্টিস্টের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের মনের সংমিশ্রণ হয়েছে। কলেজের ছাত্রী গৌরী দেবী ভাষণ সংগ্রহ করছিলেন, বক্তৃতার সারাংশ লিখছিলেন এবং অতিথিদের অভ্যর্থনাদি ব্যাপারে যেন জেনারেল ম্যানেজারের কাজ করছিলেন। তাঁর কাছে এবং তাঁর সহকর্মী-সহকর্মিনীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অন্নদাশঙ্কর এবং লীলা রায়ের সদাশয়তার কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা যায় না। কাজেই সে চেষ্টা করব না। দোলের দিন বৈকালে তাঁর বাড়ীতে এক বাউল কবির গান শুনলাম, মোহিত হয়েই শুনলাম, না শুনেই মোহিত হলাম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। বোধহয় কৃত্রিম রাগ বিস্তারের চেয়ে সহজ গ্রাম্য গানই আমার মত গ্রাম্য লোকের বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। নিধুবনে হরির সঙ্গে হোলি খেলার গান আর গৌরাঙ্গের প্রেমের ইস্কুলে পড়বার আহ্বান, সত্যিই সহজ বাঙালী মনকে উদাস করে দেয়। ঐ দিনই সকাল বেলা দোলের মহফিলে একটা ছোট চক্রে সমবেত সঙ্গীত হচ্ছিল, তাও আকর্ষণীয় হয়েছিল। খবরের কাগজে দোলের পিচকারীর ব্যাপার নিয়ে মারামারির সংবাদ জানা যায়। এ ব্যাপারটা বড়ই অপ্রীতিকর। এর কারণ একদিকে মাত্রাবোধের অভাব, অন্যদিকে রসবোধের অভাব। সৌমাত্রিক হ'লে উৎসব যে কত প্রীতিপ্রদ হতে পারে তা দেখতে পেলাম শান্তিনিকেতনে গোলাবী-আপেলী মুখের আবীর মাখা হাসিতে, বাঙালী ইজিপসিয়ান আমেরিকান যুবকের রঙ্গীন দেহের ত্বরিত গতিতে, সীমন্তিনীদের সীমন্তও পদপ্রান্তের রক্তরাগে অধ্যাপকদের লাল কপালের অকুঞ্চিত ভঙ্গীতে আর দাড়িয়ালদের মেহদী রাঙ্গা দাড়ীর জৌলুসে। দোলের দিনই রাত্রিকালে চিত্রাঙ্গদা নাটকের অভিনয় দেখলাম। নাট্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের রূপ উৎসারিত হয়ে উঠছিল। নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রয়েছে বলেই মনে হ'ল। ঘটনা সংস্থানে গানগুলোও চমৎকার লাগল। বাস্তবিক এক এক পরিবেশে এক এক জিনিস এমন জমে ওঠে যে অন্য পরিবেশে তার সে আকর্ষণী শক্তি আর থাকে না।

আগেই বলেছি, আমি বরাবর দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলাম। তাই কে কি প্রবন্ধ পাঠ করলেন বা অভিভাষণে কে কি বললেন সে সবের কিছুই বলতে পারব না। শীঘ্রই হয়ত সাহিত্য-মেলার বিবরণ বের হবে আর তার এক কপি হস্তগত হবে, এই আশায় রয়েছি। শ্রোতাদের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ ক'রে একথা পরিষ্কার বুঝলাম যে, পাকিস্তান থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের রচনা সবগুলোই ওখানে বেশ সমাদৃত হয়েছে। মনে হয় এদিকে কি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা না হচ্ছে সে সব খবর ওদিকে খুব অল্পই যায়। তাই এঁরা আগ্রহের সঙ্গে আমাদের বিবরণ শুনলেন; আর আমরাও যে কিছু একটা করছি, আর তা যে তাঁদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্যও নয়, একথা অনেকেই স্বীকার করলেন। বিশেষ করে শচীন সেন মশায় বললেন, প্রবন্ধ সম্ভারে আমাদের বিষয় বৈচিত্র্য তাঁদের চেয়ে বেশী বই কম নয়। পূর্ববাংলার সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তাঁদের সংশয় হয়ত অনেকটা কেটে গেছে। তাঁদের তরফ থেকে আমরা সাহিত্যিক সহযোগিতার প্রত্যাশা করতে পারি, সকলেই একথা বিশেষ করে বললেন। চিন্তার ক্ষেত্রে এই যে একটা সহানুভূতি আর সহযোগিতার ভাব, এর মূল্য সমান নয়। আমরা কি চাই, আমাদের আদর্শ কি, এ সম্বন্ধে আমাদের সুষ্ঠু ধারণা থাকা দরকার, তাঁদেরও দরকার। অন্ততঃ আর্ট এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমকক্ষের মত মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হলে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়। আশা করি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রকম মিলনের সুযোগ আরও সুপ্রচুর হবে।

সওগাত
বৈশাখ-জৈষ্ঠ ১৩৬০

# আমি যদি আবার লিখতাম—'সঞ্চরণ'

১৯৩৭ সালে ভারত আর্ট প্রেস, ঢাকা থেকে 'সঞ্চরণ' নামে আমার একখানা বই বের হয়েছিল,--আয়তন ১৬ ফর্মা, দাম দেড় টাকা। বইখানা সম্বন্ধে হয়ত, বর্তমানে স্কুল-কলেজের ছাত্রমহলে এমনকি শিক্ষকমহলেও শতকরা পাঁচজনও নাম পর্যন্ত শোনেন নাই। সুতরাং এ-বইয়ের প্রসঙ্গ আমার কাছে ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের মত ব্যাপার। ১৬ ফর্মার বই, বর্তমান বাজারে হয়ত পাঁচ টাকার মতো দাম হতে পারতো। অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আগেকার দিনে সস্তা সাহিত্যেরই চল ছিল। বইখানা উৎসর্গ করা হয়েছিল "অসীম প্রতিভাশালী সুরশিল্পী কবি কাজী নজরুল ইসলামের" নামে। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ নয়, নীরেট গদ্যপুস্তক, সাতাশটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলোকে রম্যরচনা, ছোট প্রবন্ধ, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সমাজ-চিত্র, ধর্ম এবং সাহিত্য—এই কয়েকটি পর্যায়ে ফেলা যায়। রম্যরচনার সবগুলো মনোরম হয়নি (অবশ্য, সর্বসম্মতভাবে তা হওয়াও কঠিন ব্যাপার); ছোট প্রবন্ধ পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্কলকদের চেষ্টায় এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে, সঙ্গীত সম্পর্কিত রচনা কারও কারও খুব ভাল লেগেছে, আবার অনেকেরই এ-সম্বন্ধে কোনও গরজ নেই; বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় রচনার টেকনিক্যাল প্রবন্ধটি বাদ দিয়ে অন্য দুটো স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে পুনঃপুনঃ স্থান পেয়েছে; আর সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধের প্রায় প্রত্যেকটিই বিপুল আলোড়ন ও আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। একটু নতুন দৃষ্টিতে সমাজকে দেখলে, আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অকপটে মতামত ব্যক্ত করলে, সনাতনী সমাজপতিদের ধৈর্য-চ্যুতির কথাই বটে। তাই সমাজ ও সাহিত্যকে ধর্মের গণ্ডীর ভিতরে টেনে এনে, সামাজিক আনন্দ-উৎসবকে উচ্ছৃঙ্খলতা; সমাজ বা ধর্মকে যাচাই করে হৃদয়ঙ্গম করবার অশ্রুতপূর্ব প্রস্তাবকে অর্বাচীনতা; ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে মুসলিম সাহিত্যিকদের তুলনামূলক সমালোচনাকে পরধর্ম-প্রীতি বা স্বধর্ম-বিদ্বেষের এইসব ভূঁইফোঁড় কাফেরের চেয়েও অধম তরুণ লেখকদের বিরুদ্ধে ফতোয়াজারী করে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ অজ্ঞ-সমাজকে লেলিয়ে দেবার মত লোকের অভাব হয়নি।...এসবও ঐতিহাসিক কথা। অবশ্য, এজন্য সনাতনীদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরাও নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি মোতাবেক কাজই করেছিলেন। কাজেই, সে সময় স্বাধীন চিন্তা বা মুক্তির বুদ্ধির ধারকদের পক্ষে বর্তমানের চেয়ে আরও অনেক ভয়াবহ অবস্থা ছিল, তা বোধ হয় আর বিশেষ করে বলে দিতে হবে না। নবীনের দিক থেকেও যে একটুও আধিক্যের সম্ভাবনা ছিল না, এমন কথাও জোর করে বলা চলে না।

মোট কথা, রচনাকালের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই 'সঞ্চরণে'র বিচার করতে হবে। এর রচনা-কাল ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৪/৩৫ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ গড়পড়তা ১৯৩০/৩১ সাল বলে মনে করা যেতে পারে। এই সুদীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে সমাজের চেহারায়, সাধারণ মনোবৃত্তিতে, রাজনৈতিক অবস্থায়, সাহিত্যিক চেতনায় এবং অপেক্ষাকৃত

নির্বিরোধে স্বকীয় সভ্যতা অনুসরণের সুযোগে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন আমার বয়সও ছিল বর্তমান বয়সের অর্ধেকের কাছাকাছি। কাজেই এখন "আমি যদি আবার লিখতাম" তা'হলে কেমন উৎরাতো বলা শক্ত। 'সঞ্চরণ' আবার আগাগোড়া পড়ে দেখলাম—৩০/৩৫ বছরের ছোকরা লিখেছে বেশ! এখনকার তুলনায় ভাষায় বাঁধুনি স্থানে স্থানে একটু কটোমটো হলেও, সজাগ কল্পনাশক্তি, চিন্তা ও যুক্তির প্রাখর্য, আর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের নিখুঁত বর্ণনায় কিছুমাত্র কমি দেখা যায় না;—বরং মনে হয়, এখন আর অতখানি আবেগ দিয়ে ঐসব কথা লিখতেই পারতাম না। বর্তমান পরিবেশে হয়ত ঈশ্বর, নমস্কার, ঠাকুরমা, দেবালয়, স্বর্গ, ইন্দ্রজাল, ভারত না লিখে যথাক্রমে আল্লা, সালাম, দাদী (বা নানী), মসজিদ, বেহেশ্ত, জাদু, পাক-ভারত—ইত্যাদি লিখতাম। ঐশ্বরিকের বদলে স্থানবিশেষে হয়ত খোদায়ী লিখতে পারতাম, কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে ঐ কথাটা বেমানান হলেও 'আল্লিক' বা 'আল্লাকীয়' ইত্যাদি প্রত্যয়ান্ত পদের কথা ভাবতেও পারতাম না। মোটকথা, বর্তমানে লিখলে ভাষাটা হয়ত একটু মানানসই রকম সহজ বা চোস্ত হতো কিন্তু রচনার তেজস্বিতা বা গতিশীলতার দিক দিয়ে খুব সম্ভব উৎকর্ষ না হয়ে কিছুটা হানিই হতো।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো, তা অবশ্য বর্তমান ভাষার নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এখন বই থেকে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে নবীন লেখকের চিন্তা মোটামুটি কোন্ কোন্ বিষয়ে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কোনও প্রকার মন্তব্য ছাড়াই তার নমুনা দেওয়া যাক :

১. **রম্যরচনা** — ('নবীন সাহিত্যিক') : "(ভবতোষবাবু) বিলাতে দুই-তিন বৎসর যাবৎ সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে সদর্পে দেশে ফিরলেন। ফিরে দেখেন, এখনও সেই রবি-চন্দ্রের রাজত্ব। মাঝে মাঝে অনেক তারা ফুটেছে, কিন্তু কেউ তাদের লক্ষ্য করে না। ভবতোষবাবু বাঙালীসমাজকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে রবি-চন্দ্রের চেয়ে এই তারারাই বড়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক জাত তাঁর এইসব যুক্তিকে 'চোখের দেখা'র চেয়ে বড় বলে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না। এতে তিনি বিষম চটে গিয়ে সাহিত্যের সমালোচক হলেন।"

২. **ছোট প্রবন্ধ** — ('অহঙ্কার') : "একটুতেই সাহস হঠকারিতায়, আত্মোৎসর্গ আত্মহত্যায় ও প্রতিযোগিতা হিংসায় পরিণত হতে পারে; আবার অতি সহজেই সমালোচনা পরচর্চায়, প্রশংসা চাটুবাদে, তেজ ক্রোধে ও ধর্মপ্রীতি ধর্মান্ধতার স্তরে নেমে আসতে পারে। সেইরূপ ক্ষমা ও দুর্বলতা, সঞ্চয়শীলতা ও লোভ, বিনয় ও কপটতা, লজ্জা ও আড়ষ্টতা, এদের মধ্যে সীমা-রেখা খুব সুনির্দ্দিষ্ট নয়। আবার সৌন্দর্যবোধ ও রূপতৃষ্ণা, প্রেম ও মোহ, অনুসন্ধিৎসা ও পরকীয় রহস্যোদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টা, পাত্রভেদে বা মাত্রাভেদে একই প্রকার চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।"

৩. **সঙ্গীত** — ('বাঙালীর গান') : "রাগরাগিণীর সুর বিস্তার, তাল-লয়ের নিখুঁত হিসাব, গমক, মীড়, মূর্চ্ছনা, তেহাই প্রভৃতির দ্বারা মনোহরভাবে রাগিণীর মূর্তি প্রকটিত করিয়া তুলিবার কৌশল আমাদের দেশে ওস্তাদদের ভিতর বেশ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ব্যবহৃত হার্মনী বা কর্ড না থাকাতে, মনে হয় আমাদের সঙ্গীত কিছু অপুষ্ট-নিবিড়তা থাকিলেও ইহাতে ব্যাপকতা নাই; ইহাতে গীতিকাব্যের মাধুর্য আছে, কিন্তু মহাকাব্যের বিশালতা নাই। তারের যন্ত্রে চিকারী ও জুড়ির সাহায্যে সুরকে পুষ্ট করিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহা অতি সামান্য।"

৪. বিজ্ঞান — ('বাদ্যযন্ত্রের স্বরভঙ্গী') : "ফুসফুস হইতে বায়ু নির্গত হইয়া স্বর-সূত্রের উপর পড়ায় শব্দ উৎপন্ন হয়। (স্বর সূত্রে) দুইটি পর্দার রীড পাশাপাশি সংলগ্ন থাকে। স্বর সূত্রের রীড দুইটি বন্ধ হইবার সময় যদি সামান্য একটু ফাঁক থাকে, তবে স্বর কর্কশ হয়। সর্দি-কাশির সময় বা অধিক চেঁচাইলে স্বর সূত্রের ফাঁক সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া গলা ভাঙ্গিয়া গিয়া সাঁই সাঁই আওয়াজ বাহির হয়। সুকণ্ঠ ব্যক্তির সুর সূত্রের পাশাপাশি রীড দুটি সম্পূর্ণরূপে গায় গায় লাগিয়া থাকে। মুখমণ্ডল, নাসিকা প্রভৃতি গহ্বরের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্বর সহধ্বনিত হইয়া নানারূপ সুরভঙ্গী বা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং সুগঠিত মুখগহ্বরের উপরও সুরের মিষ্টতা অনেকখানি নির্ভর করে। আবার, বিভিন্ন প্রকার মুখ ব্যাদান ও জিহ্বার অবস্থানের ফলে সহধ্বনিত সুরের পরিবর্তন হয় বলিয়া অ-আ-ই-উ প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরবর্ণ উচ্চারিত হয়।"

৫. সমাজচিত্র — ('আনন্দ ও মুসলমান গৃহ') : "মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এককথায় মনোরঞ্জন-কর ললিতকলার কোনও সংশ্রবেই থাকবে না। মুসলমান পুরুষেরা কেবল কাজ করবে আর ঘর শাসন করবে; মেয়েরা কেবল রাঁধবে-বাড়বে আর বসে বসে স্বামীর পা টিপে দেবে,—তাছাড়া খেলাধুলা, হাসিতামাসা বা কোনও প্রকার আনন্দ তারা করতে পারবে না, সবসময় আদবকায়দা নিয়ে দুরস্ত হয়ে থাকবে। মুসলমান বাপের সামনে হাসবে না, বড় ভাইয়ের সামনে খেলবে না, গুরুজনের অন্যায় কথারও প্রতিবাদ করবে না,—এমনকি কচি ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত মার খেলেও চেঁচিয়ে কাঁদবে না। ... আনন্দ? কোথায় আনন্দ? কি হবে আনন্দে? মুসলমান ত বেঁচে থাকতে আনন্দ করে না,—সে মরে গিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করে পেটভরে খাবে আর হুরপরীদের নিয়ে অনন্তকাল ধরে আনন্দ করবে। এই তার সান্ত্বনা।"

৬. ধর্ম — ('নাস্তিকের ধর্ম') : "বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান আমাদের জীবনের কত সামান্য অংশ। এর বাইরে যে অসীম কর্ম-কোলাহল, তার মধ্যেই ধর্মভাবের প্রকৃষ্টতর বিকাশ। ধর্মভাব হৃদয়-মনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থেকে সমস্ত সাধনা ও ধর্মকে অনুরঞ্জিত করে।..."

৭. সাহিত্য — ('বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ') : "পূর্বেকার সাহিত্য নিত্যবস্তুর সন্ধান করিত, বর্তমান সাহিত্য ক্ষণিক-লভ্যের মোহটাকেও অমূল্য বলিয়া স্বীকার করে। পূর্বে যে সমস্ত অনৈতিক বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাদের অনেকগুলোই লোকে আর তত দূষণীয় বলিয়া মনে করে না। কাজে কাজেই পূর্বে যে সমস্ত কাজ লোকে গোপনে করিলেও মনে মনে সঙ্কুচিত থাকিত, অতি-আধুনিক যুগে তাহা প্রকাশ্যে করিয়া বাহবা লইতে চায়। পূর্বকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টিতে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখা যাইত, কিন্তু অতি আধুনিক সাহিত্যে এইরূপ পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি লেখকদের মানসিক অপরিপক্বতা, না স্পষ্টতার প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞা, না অস্পষ্টতার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ—একথার মীমাংসা করা বর্তমানে সুকঠিন।"

এইবার উপসংহারে বলতে চাই, ৩০ বছর পরেও দেখতে পাচ্ছি, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে একই ব্যক্তি-মানসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে,—কোথায়ও যুবক কাজী সাহেব আর বৃদ্ধ কাজী সাহেবের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই। এর প্রধান কারণ বোধ হয় অকৃত্রিমতা বা সাহিত্যিক সততা। শেষ পর্যন্ত এই সুর অব্যাহত থাকুক, এই আমার আন্তরিক কামনা।

বেতার কথিকা
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

# মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা'

জনপ্রিয়তা সার্থক সাহিত্যের একটা বড় লক্ষণ। এই লক্ষণ দিয়ে বিচার করলে মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন প্রণীত পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস 'আনোয়ারা' নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। সম্প্রতি (বাংলা ১৩৫৬ সালে) এ বই-এর ত্রয়োবিংশতি সংস্করণ কলিকাতার ৩০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ ওসমানিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে প্রথম প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তবে, আমার মনে আছে, স্কুলের ছাত্রাবস্থায় প্রথম এই বইখানা পাঠ করি। ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যেই এ বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থকার নজিবর রহমান সাহেব পাবনা জেলার অধিবাসী। ১৯১৭ সালে এক বন্ধুর বাড়ীতে 'আনোয়ারা'-লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমার বন্ধুটী ছিলেন তাঁরই প্রতিবেশী। মোঃ নজিবর রহমান সাহেব অত্যন্ত সমাজ-দরদী ব্যক্তি ছিলেন—মুসলমান সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ-সমন্বিত পুস্তকাদি লিখবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে কোনো পুরানো কাহিনী ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে বলে এই ঘটনার উল্লেখ করলাম।

জানা গেছে, এ যাবত 'আনোয়ারা'র প্রায় দেড় লক্ষ কপি নিঃশেষিত হয়েছে। বোধহয় একমাত্র 'বিষাদ-সিন্ধু' ছাড়া আর কোনো বাংলা বই-এর এত কাট্‌তি হয়নি। এর কারণ অনুধাবন করলে দেখা যায়, সে সময়কার বাংলা সাহিত্যে সাধুভাষার যে মানদণ্ড ছিল, 'আনোয়ারা' সেদিক দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ; কাজেই ভাষার উৎকর্ষের দিক দিয়ে সুধীসমাজের কাছে বইখানা সমাদর পেয়েছে। সে সময়ের ভাষা ছিল বঙ্কিমী ভাষা,— অর্থাৎ স্থানে স্থানে সংস্কৃতের প্রাধান্য থাকলেও এতে সহজ বাংলা শব্দেরও প্রাচুর্য ছিল। রাজশাহীর বিজ্ঞানাধ্যাপক এবং সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক পঞ্চানন নিয়োগী বইখানার সমালোচনায় গ্রন্থকারকে লিখেছিলেন :

"পুস্তকখানির ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা, মুসলমানী বাংলা আদৌ নহে। তবে আপনি মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ফার্সী কথাও ব্যবহার করিয়াছেন, যথা : আম্মাজান, কলেজা, দুনিয়া, বরকত, খোশ-এলহান প্রভৃতি। হিন্দু পাঠকবর্গের নিকট এই সকল শব্দ অবোধ্য হইলেও, এই সকল শব্দ ব্যবহার আদৌ অন্যায় হয় নাই ; কারণ, মুসলমান সমাজে এই সকল শব্দ নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালা ভাষার এক-চতুর্থাংশ শব্দ আরবী-ফার্সী হইতে প্রাপ্ত। আরও মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালা শুধু হিন্দুর মাতৃভাষা নহে, মুসলমানের মাতৃভাষাও বটে।"

—প্রফেসর নিয়োগী 'খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা' আর 'মুসলমানী বাংলা' বলতে কি বুঝাতে চান, তা' স্পষ্ট হয়নি। হয়ত তাঁর নিজের মনেই কথাটা তাল পাকিয়ে গেছে। যা'হোক বুঝা যাচ্ছে,

সে সময় দু'—চারটে ফার্সী শব্দের আমেজ অধিকাংশ হিন্দু পাঠকের কাছেই দুর্বিষহ বোধ হ'ত। নজরুল ইসলামের কল্যাণে আজ বাংলা ভাষার সে যুগ কেটে গেছে। এখন গ্রন্থকারের ভাষার দুই-একটা নমুনা দেখান যাচ্ছে।

(১) "কিন্তু যখন সে ... আনোয়ারাকে দর্শন করিল তখন তাহার রূপের গর্ব একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল ; বাস্তবিক বালারুণ-রাগ-রঞ্জিত বিকাশোমুখ পদ্মিনীর সহিত যেমন কীটগর্ভ, শুষ্কদল, দলিত জবার তুলনা সম্ভবে না, সেইরূপ সৌন্দর্য-প্রতিমা সরলা-বালা আনোয়ারার সহিত যৌবনোত্তীর্ণা বিকৃত-সুন্দরী গোলাপজানের উপমাই হয় না ; কিন্তু না হইলেও গোলাপজান নিজ রূপের সহিত সতীন-কন্যার রূপের তুলনা করিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল।"

(২) "তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, এদেশে যাহারা উচ্চকুলোদ্ভব বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন আরবী-ফার্সী বিদ্যাশিক্ষায় একরূপ উদাসীন অথচ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভেও বিশেষ মনোযোগী নহেন ; পরন্তু কেবল কুলের দোহাই দিয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করেন।"

(৩) "শিশির-মুক্তা-খচিত নব-বিকশিত প্রভাত-কমল বালার্ক-কিরোণোদ্ভিন্ন হইলে যেমন সুন্দর দেখায়, আনোয়ারার মুখ-পদ্ম সেই সময় তদ্রূপ দেখাইতেছিল।"

উপরের উদাহরণগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, লেখকের বর্ণনায় কবিত্ব আছে, আর সামাজিক অবস্থা-বিচারে তাঁর দৃষ্টিও প্রখর।

এই শেষোক্ত গুণ থাকাতেই তিনি বেশ নিখুঁতভাবে সমাজকে চিত্রিত করতে পেরেছেন, এবং এইটেই বইখানির বিশেষ গুণ, যার জন্য এর এমন জনপ্রিয়তা লাভ হয়েছে। মোট কথা, সমাজে শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন, বহু-বিবাহের কুফল, স্ত্রৈণতার দোষ, স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সমঝোতা, কুল-গর্বের অন্তঃসার-শূন্যতা, চাকুরীজীবনের বিড়ম্বনা, স্বাধীন ব্যবসায়ের সুখ, গ্রাম্য দলাদলি, স্বার্থান্ধের হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতা, গুণ্ডা-বদমাইশের ষড়যন্ত্র, প্রকৃত সতীত্বের গৌরব, ধর্মজীবনের মাহাত্ম্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বিচিত্র ঘটনা-সমাবেশে চমৎকার আলোচনা ক'রে গ্রন্থকার বইখানা সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে পেরেছেন।

বাস্তবিক, প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে আরম্ভ ক'রে 'বিবাহ-পর্ব' এবং 'ভক্তি-পর্ব' পর্যন্ত বেশ উৎরেছে— অর্থাৎ রস-সমন্বিত আলোচনা তত্ত্বজ্ঞানের বাড়াবাড়ি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। কিন্তু 'পরিণাম পর্বে' এসে শেষরক্ষা হয়নি বলে মনে হয়। আমার সন্দেহ হয়, যে পাঁচজন বিখ্যাত সাহিত্যিক "পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক এই পুস্তকখানি পরিবর্তিত ও সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন"— বলে' গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তাঁদেরই কারো কারো অতিরিক্ত প্রভাব হয়ত 'পরিণামে' কার্যকরী হয়েছে। এই অংশে নাটকীয় ভঙ্গীর প্রাধান্য, নামাজ-রোজা সম্বন্ধে অনাবশ্যক দীর্ঘ বক্তৃতা, আনোয়ারা ও নূরুল ইসলামের মধ্যে কতকটা আতিশয্যমূলক ভক্তি-বিটলে ভাবের কথোপকথন প্রভৃতি দ্বারা বইখানার সাহিত্যিক মূল্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই অংশে কেবল শাড়ী বিক্রয় উপলক্ষে পাট কোম্পানীর টাকা চুরির তথ্য উদ্‌ঘাটন অংশটা চমৎকার হয়েছে। সন্দেহ-আন্দোলিত নূরুল ইসলামের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আনোয়ারার তৎকালীন ব্যবহারের মধ্যে বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক ন্যাকামোর গন্ধ পাওয়া যায়। মোটের উপর, আমার বিবেচনায়, পরিণাম-পর্ব একটু সংক্ষিপ্ত ক'রে উল্লেখিত দোষগুলো সংশোধন করতে পারলে 'আনোয়ারা' বর্তমানের মাপকাঠিতেও বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বেশ উচ্চস্থান পেতে পারে।

'পরিণাম-পর্ব' ছাড়া অন্যত্র লেখকের সূক্ষ্ম রস-বোধ আর ঘটনা-সমাবেশ-কৌশল বেশ প্রশংসনীয়। বঙ্কিমী যুগের রীতি অনুসারে গ্রন্থকার নায়ক-নায়িকাকে মোটের উপর আদর্শ চরিত্র ক'রে সৃষ্টি করেছেন। নাটকীয়ভাব এবং অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা (যাকে আমি ন্যাকামো ব'লে অভিহিত করেছি) এ-ও অনেকটা কালের প্রভাবেই হয়ে থাকবে। আমজাদ, হামিদা, তালুকদার সাহেব, দাদী মা—এঁরাও আদর্শ পাত্র-পাত্রী। অবশ্য, কতকগুলো আদর্শের পরিচয় দেওয়াই বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্য; আঁধার পটে উজ্জ্বলকে বেশী ক'রে প্রতিভাত করবার জন্যই হয়ত গোলাপজান, ভুঞাসাহেব, দুর্গা, আব্বাস, রতীশ, দাও প্রভৃতির অবতারণা হয়েছে। সে যাই হোক্, নূরুল ইসলাম আর আমজাদের চেহারার সাদৃশ্য ব্যবহার ক'রে, ভোলার মাকে নৌকোর কাছে পাঠিয়ে যে কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তা বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

আমজাদের অকস্মাৎ কলেরা হওয়া অবশ্য আশ্চর্য নয়; কারণ সে সময় কলকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। কিন্তু নূরুল ইসলামের যক্ষ্মার তেমন সহজ হেতু পাওয়া যায় না। এখানে প্লট দুর্বল হয়েছে। পল্লীগ্রামের পরিবেশে যে-রকম ফুলশয্যা আর পুষ্পোৎসবের প্রাধান্য দেখান হয়েছে, তা অবাস্তব ব'লে মনে হলেও নিতান্ত মন্দ লাগে না।

মোটের উপর, 'আনোয়ারা' উপন্যাসের কোনো-কোনো অংশ সম্বন্ধে কিছু আপত্তি তোলা গেলেও, এতে প্রশংসার বিষয় অনেক আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। বিশেষ ক'রে, সমসাময়িক কাল বিবেচনা করলে, ভাষা-সৌষ্ঠব আর ঘটনা-বিন্যাসের পারিপাট্যে লেখক যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তিনি পারিবারিক আর সামাজিক উপন্যাসের ভিতর দিয়ে মুসলমান সমাজাদর্শ বাংলা সাহিত্যে পরিবেশন করবার অগ্রদূত হিসেবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই বিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন, আজও তা' অবিসংবাদিতভাবে অতিক্রান্ত হয়নি; এই তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যের সম্পদ

# ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল-প্রবাহ'

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বাংলাদেশে মুসলমান হৃত-সর্বস্ব হয়ে অগৌরবের দিনযাপন করছিল, অশিক্ষা, কুসংস্কার, নিরাশা, দারিদ্র্য যখন পাথরের মতো সমাজের বুকের উপর চেপেছিল, সে-সময় সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন মুক্তপ্রাণ দৃষ্টিমান মনীষী সমাজ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বাংলা ভাষায় গদ্য-পদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই মুসলিম জাগরণের উদ্‌গাতাদের মধ্যে সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী অন্যতম। ইনি বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন—ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, মুসলিম ঐতিহ্য, শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি তাঁর বক্তৃতা আর রচনার বিষয়বস্তু ছিল। তাঁর মতো অক্লান্ত-কর্মী, শক্তিশালী মুসলিম-দরদী সে-সময় বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। বিশেষতঃ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বলে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচনা এখন দুষ্প্রাপ্য; কাজেই তিনি যে সম্পদ দান ক'রে গেছেন তা এখন বিস্মৃতপ্রায়। এই বিস্মৃত-সম্পদের মধ্যে 'অনল-প্রবাহ' নামক কাব্যগ্রন্থখানা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়। বলাবাহুল্য, আমাদের নয়া রাষ্ট্রে মুসলিম ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত সিরাজীর রচনা পুনরুদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন।

'অনল-প্রবাহ' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৪ সনে, অর্থাৎ ইংরেজী ১৯০৭ সালে, যখন স্বদেশী আন্দোলনে দেশ আন্দোলিত হচ্ছিল। কলকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের 'নব্যভারত' প্রেস থেকে বইখানা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাল্যকালে এই বই পড়ে' মনে কী বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন এর অনেক কবিতা মাইকেল-নবীন-হেমচন্দ্রের কবিতার মতো আবৃত্তি করা হতো।...

বইখানার উৎসর্গ-পত্রে কবি 'অনল-প্রবাহ' নামের সার্থকতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন।

ইসলামের গৌরবের বিজয়-কেতন,
হে মোর আশার দীপ নব্য যুবগণ।
মোসলেমের অভ্যুত্থান　　ইসলামের জয়গানে
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন।
জাগাতে অতীত স্মৃতি,　　জাগাতে জাতীয় প্রীতি,
'অনল-প্রবাহ' খানি করিয়া রচন
বড় আশে বড় সাধে　　দিনু তোমাদের হাতে:
হউক অনলময় অলস জীবন।

মুসলিমের দুর্দশায় কবির চিত্ত ব্যথিত হ'য়েছিল। সেই ব্যথার বাণী শতদল হ'য়ে ফুটেছে এই কবিতায়। আন্তরিকতায় এর তুলনা হ'তে পারে শুধু বিদ্রোহী-কবি নজরুলের কবিতার সাথে। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আগমন-পথ সহজ করবার জন্য সিরাজী সাহেব যেন ঝাড়-জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে রাজপথের সৃষ্টি ক'রে গেছেন।

'অনল-প্রবাহ' কাব্যে মোট নয়টি কবিতা স্থান পেয়েছে—'অনল-প্রবাহ', 'তূর্যধ্বনি', 'মূর্চ্ছনা', 'বীরপূজা', 'অভিভাষণ', 'মরক্কো-সঙ্কটে', 'আমীর-আগমনে', 'দীপনা' ও 'অভ্যর্থনা'। এর সবগুলোই জাতীয় জাগরণের কবিতা। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এর ভাষা ভাষাবেগের পরিচয় দিচ্ছি :

দেখ দেখ চেয়ে', নিদ্রার বিঘোরে
কত উচ্চ হ'তে কত নিম্নস্তরে
গিয়াছ পড়িয়া, দেখ ভাল ক'রে
ফিরায়ে অতীতে নয়ন দু'টি।
তাই দেখ চেয়ে', অবনী মণ্ডলী
লয়ে নানা জাতি হ'য়ে কুতূহলী
বিজয়-উল্লাসে জয়-রব তুলি'
বাধা-বিঘ্ন আদি পদযুগে দলি'
তোমাদের তরে পিছনেতে ফেলি'
উন্নতির পথে চলেছ ছুটি' ॥ —('অনল-প্রবাহ')

এর ভাষা অতিশয় স্পষ্ট, কোনোরকম ঘোর-প্যাঁচ নেই। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং কায়কোবাদের ভাষার সঙ্গে এর সৌসাদৃশ্য রয়েছে। "তোমাদের তরে পিছনেতে ফেলি"—এখানে 'তরে' শব্দটার প্রয়োগ লক্ষণীয়। বর্তমানে অবশ্য বাক্যরীতির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পুরানো কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলে এ-কথা বুঝা যায়।

কোথায় তোদের বিজয়ী-বাহিনী,
কোথায় তোদের গৌরব-কাহিনী,
এল এ কি ঘোর আঁধার যামিনী।
দেখি না গৌরব-আলোক-রেখা।
পাঠানের তেজঃ মোগল-বিক্রম—
ইরাণের চারু বিলাস-বিভ্রম,
আরবীর সেই প্রতাপ প্রচণ্ড,
কোথায় তাহার সভ্যতা-মার্তণ্ড—
কিছুই যে আর যায় না দেখা ॥
চেয়ে দেখ অই কত হীন দাস
কল্পনার বলে রচি' উপন্যাস,
মিথ্যা কলঙ্কের করিয়া বিন্যাস
করিছে তোদেরে কত উপহাস;
শ্রবণে সে-সব নাহি কি বাজে?
—('অনল-প্রবাহ')

অনলের জাতি তোরা যে অনল,—
তবে কেন আজি অলস দুর্বল?
জাগরে সকলে ধরি' পূর্ববল,
আলস্য-জড়তা চরণে দলি'।—('অনল-প্রবাহ')

এ-সবের ভিতরে কবি যেন তাঁর স্বদেশবাসী মুসলিম সমাজকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছেন। পুরানো গৌরবের স্মৃতিতে আত্ম-উদ্বুদ্ধ হয়ে তেজ, বিক্রম, চারুকলা, সভ্যতা, সাহিত্য-সেবা, আত্মসম্মান-বোধ অর্জন ক'রে অক্লান্ত চেষ্টায় অন্যান্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমান তালে চলবার আহ্বান কবির উদাত্ত কণ্ঠ থেকে অনর্গল উৎসারিত হচ্ছে।

'তূর্যধ্বনি'তে ইউরোপীয় শক্তি কিভাবে মুসলিম শক্তি ও রাজ্যগুলোকে গ্রাস করেছে, তার জ্বালাময়ী বর্ণনা আছে :

যে যেখানে আছ আজি সবে মিলে হও সম্মিলিত,
এক পতাকার নীচে মহামন্ত্রে হও রে দীক্ষিত!
সোলতান, আমীর, শাহ্ তিনে মিলে হ'য়ে সম্মিলিত
সুষুপ্ত ইসলাম-শক্তি করো আজি পুনঃ জাগরিত?
ইসলাম কংগ্রেস এক সবে মিলি' করিয়া স্থাপন
উদ্ধার করহ তব দস্যু-হৃত স্বর্ণ সিংহাসন।

—('তূর্যধ্বনি')

এখানে প্যান-ইসলাম এবং সমুদয় মুসলিম রাজ্যের একতার বাণী প্রকাশিত হ'য়েছে। 'মূর্চ্ছনা'য় কবি অলস নিদ্রায় বিভোর বঙ্গীয় মুসলিমদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন :

রে বঙ্গ মোসলেম। নয়ন মেলিয়া
জগতের পানে দেখ না চাহিয়া।
দেখ এবে ধরা নব জ্ঞানালোকে
উন্নতির পথে ছুটিছে পুলকে।
তোমাদের তরে পশ্চাতে ফেলিয়া—
দেখ কত দূর গিয়াছে ছুটিয়া;
পদে যারা ছিল এবে তারা শিরে,
এ বিষম দৃশ্য হৃদে সহে কি রে?

'মূর্চ্ছনায়' কবি প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা নিতে বলছেন, কিন্তু দৃষ্টি প্রসারিত করতে বলছেন সামনের দিকে। নবজ্ঞানালোকে আলোকিত না হ'লে কিছুই লাভ হবে না। যারা অতীতের আফিম খাইয়ে সমাজকে ঘুম পাড়াতে চায়, তাদের সঙ্গে কবির কত প্রভেদ!

'বীর-পূজা'য় বখতিয়ার খিলজীর বীরত্ব-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 'অভিভাষণ'-এর শেষে কবি প্রার্থনা করেছেন :

হে এলাহি আজি কর আশীর্বাদ,
ঘুচুক মোদের কলহ বিবাদ;
প্রাণে প্রাণে আজি উৎসাহ-অনল
দেহ জ্বালাইয়া ভীষণ প্রবল।
দেহ সবে জ্ঞান, দেহ সবে শক্তি,
জাতির উদ্ধারে দেহ অনুরক্তি;
বিনীত মিনতি এই চরণে।

দেহ মনুষ্যত্ব দেহ তেজঃ বল,
রাখিও না আর অলস দুর্বল,

বিবেক-বিজ্ঞান উঠুক জ্বলিয়া,
আপনার স্থান লউক খুঁজিয়া
তোমার কৃপায় নিজ বিক্রমে।

এখানে কবি খোদার রহমত কামনা করছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজ বিক্রমে উন্নতি করতে হবে, সেকথার উপরেও জোর দিচ্ছেন।

'মরক্কো-সঙ্কটে' কবি বলছেন :

কোথা আর্য মোহাম্মদ! শত সূর্য তেজে দীপ্ত,
মর্ত্যে আসি হের আজি কি বিপদ ঘনীভূত!
সর্ব-বিঘ্ন-বিমর্দিনী সঞ্জিবনী শক্তিদানে
জাগাও জাগাও, তাত! নিদ্রিত মুসলিমগণে।
স্বরগ হইতে আজি কর দেব! এ ঘোষণা,
নমাজ রোজায় শুধু মুক্তি আর হইবে না।
গাজী ভিন্ন কোনজন এ যুগে পাবে না ত্রাণ,
প্রাণদানে অশক্ত যে— সে ত নহে মুসলমান।
শত্রুন্তপ মহাযোদ্ধা বজ্রদৃঢ় তেজঃদীপ্ত
যে হইবে, সেই বটে ঈশ্বরের মহাভক্ত।

—('মরক্কো-সঙ্কটে')

এখানে বীর-কবি ঘোষণা করছেন, কেবল নামাজ-রোজা করলেই সাচ্চা মুসলমান হওয়া যায় না, প্রয়োজন হ'লে তাকে বীর মোজাহিদ হতে হবে। বজ্রদৃঢ় তেজঃদীপ্ত বীরই কবির চোখে প্রকৃত মুসলমান নাম ধারণ করবার উপযুক্ত।

ভাষা সম্পর্কেও লক্ষ্য করতে হবে; এখানে 'আর্য মোহাম্মদ', 'তাত' এবং 'দেব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে খাফা হ'লে চলবে না। 'আর্য' শব্দের অর্থ—সৎকুলোদ্ভব, সজ্জন, শ্রেষ্ঠ, পূজ্য, মান্য, 'দেব' শব্দের অর্থ— বেহেশ্‌তের অধিকারী, মান্য বা পূজ্যব্যক্তি; আর 'তাত' শব্দের অর্থ শুধু পিতা-পিতৃব্য নয়, এর অন্য অর্থ—পবিত্র ব্যক্তি, মান্য, পূজ্য। ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের বিচার করা কর্তব্য। মতবাদের দাস হয়ে সাহিত্য-সেবায় বিঘ্ন আছে।

যাহোক, বর্তমানে সাহিত্যিক মাপকাঠি কিছুটা পরিবর্তিত হ'লেও, মহাপ্রাণ, সত্য-সাধক, নির্ভীক-চিত্ত, সমাজ-দরদী কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অমূল্য দান সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য।

বাংলা সাহিত্যের সম্পদ

# আলাপ

জনাব মাহবুব-উল-আলম আর শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আলাপ' পড়ে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন পাশের ঘরে বসে আলাপ করছেন, আর আমি যেন আড়ি পেতে শুনছি। বলা বাহুল্য, তাঁরা শুনিয়ে শুনিয়েই আলাপ করছিলেন, তবু আড়ি পেতে শোনাতে রস আছে।

আলাপের বিষয়বস্তু হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের (বা পাক-ভারতের) হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক সম্বন্ধ। আলাপের মধ্যে লেখকদের বৈশিষ্ট্য—মিল এবং অমিল—বেশ ফুটে উঠেছে। অন্নদাশঙ্করের চিঠিগুলো চিঠিই। কিন্তু আলম সাহেবের কতক চিঠি, কতক প্রবন্ধ; কতক কথ্য ভাষায় লেখা, আর কতক লেখ্য ভাষায়, আবার একই লেখায় কথ্য ভাষার মধ্যে লেখ্য ভাষা মিশানো। এর থেকে হয়ত অনুমান করা যায় যে, অন্নদাশঙ্কর কি বলবেন আর কেমন করে বলবেন সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়; কিন্তু আলম সাহেব অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত। অন্নদাশঙ্কর স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন আগে তিনি কি ভাবতেন, বা পরে মত কতটা বদলালো; আলম সাহেব মত বদলেছেন কি না, সে সম্বন্ধে তাঁর কোন স্বীকৃতি নেই। তবে তিনি একটু বে-কায়দায় পড়ে গিয়েও যেন নিজের মত প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করেছেন, অথচ, ভাবতে ভালবাসেন যে তিনি নিজের কোনো লেখাকে কখনো justify করেন না। এই তুলনা বাঞ্ছিত কি অবাঞ্ছিত, ঠিক বলতে পারিনে; কিন্তু লেখকরাই সে-তুলনার সুযোগ করে দিয়েছেন। যুক্তনামে বই প্রকাশ করায় এবং কোন্ অংশ কার লেখা তার স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দেওয়ার এই অসুবিধে—তাতে দুর্বল পক্ষের দুর্বলতা বেশী করে ফুটে ওঠে।

সে যাই হোক, বইখানা বেশ উপভোগ্য হয়েছে। লেখক দুইজনই অকপট মনের, তাঁদের চিন্তা-ধারার ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক মূল্য আছে। আলম সাহেবের বর্ণনা চমৎকার, অনুভূতি তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি প্রখর আর ভঙ্গী রসাল। রসের মধ্যেও বেদনার হাহাকার শুনা যাচ্ছে। অন্নদাশঙ্করের বর্ণনা সাহিত্যিক, যুক্তি তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি সজাগ আর ভঙ্গী প্রেমময়। এ-প্রেমের মধ্যে আছে শুধু ক্ষমা নয়, অনুযোগ আর ভর্ৎসনাও আছে। আলম সাহেব মূলতঃ 'আদিম ও অনাহত' (?), অন্নদাশঙ্কর সুমার্জিত, অথচ সহজ মানুষ। আমার মনে হয়, সাধারণভাবে বলতে গেলে হয়ত বর্তমানে বাংলার মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে এ-ই পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে।

বইখানাতে অনেক চিন্তার খোরাক রয়েছে। অন্নদাশঙ্করের উল্লিখিত বিবিধ-তথ্য, সমস্যা আর সমাধানের মূলসূত্রগুলো বিশেষ মূল্যবান। এঁরা দুইজনেই মানুষকে হিন্দু-মুসলমান দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখতে না-রাজ। তাই, হিন্দুত্ব-মুসলমানিত্ব যার মধ্যে ডুবে যায়, এমন মানবিকতা প্রতিষ্ঠার সাধক। মানুষের নিত্যকালের এই সাধনা হয়ত কিছুটা এগিয়ে এসেছে; সময় সময় মনে হয় পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কালের ঠোকর খেয়ে আবার সোজা পথেই এগিয়ে যায়।

আলম সাহেবের সারা জীবনের কল্পনা ছিল কোনো দ্বীপে গিয়ে এমন উপনিবেশ স্থাপন করা, যেখানে হিন্দু-মুসলমান থাকবে না, সকলে হবে বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর জীবনে হিন্দু-সমাজের থেকে আঘাতের উপর আঘাত এসে তাঁর কল্পনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতির তাড়নায় এটা-কে তিনি হিন্দু-সমাজের এক মৌলিক প্রকৃতিই বলে মেনে নিয়েছেন। তাই তাঁর ক্ষোভের অন্ত নেই। অন্নদাশঙ্কর আশাবাদী। তাঁর মনেও দারুণ দুঃখ, কিন্তু বিশ্বাস করেন যে, 'হিন্দু-সমাজের' অনুদারতা আর বেশীদিন টিকতে পারবে না। 'সেক্যুলার রাষ্ট্র' দ্বারা এর প্রথম সোপান তৈরী হয়ে গিয়েছে।

ব্যক্তি-মন, রাষ্ট্র-মন আর সমাজ-মন সম্বন্ধে আলম সাহেব তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভারতে ও পাকিস্তানে ব্যক্তিমন সুস্থ। "কিন্তু সঙ্কট হয়েছে সমাজমন আর রাষ্ট্রমন নিয়ে। ভারতে সমাজমন মুসলমানের বিরোধী, পাকিস্তানে কিন্তু সমাজমন হিন্দুদের বিরোধী নহে। এদিকে ভারতে রাষ্ট্রমন মুসলমানের বিরোধী নয়, কিন্তু পাকিস্তানে রাষ্ট্রমন হিন্দুদের বিরোধী। ...এই বিরুদ্ধতা খণ্ডনে উদ্যোগী হওয়া আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের চিঠিপত্র প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে সাহায্য হতে পারে। এই বিরুদ্ধতার বিশ্লেষণও প্রয়োজন। সংক্ষেপে মনে হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রমনের বিরোধিতা অপেক্ষাও ভারতের সমাজমনের এই বিরোধিতা অধিকতর ভয়াবহ। পাকিস্তান নূতন করে তার একখানি ঘর করছে। এটা স্বাভাবিক যে সে এই রকম সব খুঁটি দিতে চাইবে যেগুলি তার পরীক্ষিত এবং যাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। কিন্তু, পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিয়ে সে ইতিমধ্যে হিন্দু-সমাজকে সুযোগ দিয়েছে তার নিজস্ব ধারায় একবার উঠে দাঁড়াতে। অবশ্য, রাষ্ট্রের দিক থেকে এর পরও অনেক কথা বলার থেকে যায় সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। কিন্তু ভারতে, যেন পাঁচ শ বছর তার ঘাড়ে চড়ে থাকার গোস্তাখীর জন্যে, মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের এ অসুস্থতা সাময়িক। কিন্তু ভারতের এই অসুস্থতা যেন মৌলিক।"

এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পৃথক 'নির্বাচনের' কথাটা যেন অনেকটা গোঁজা--মিলের মতই ঠেকে।

অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন "আমরা ইচ্ছা করলেই রাষ্ট্রের নাম রাখতে পারতাম হিন্দুস্তান। কিন্তু তেমন ইচ্ছা আমাদের হয়নি। আমাদের নেতারা ষাট বছরের সংগ্রামের ফলে যা পেয়েছেন তা সকলের সাহায্যে পেয়েছেন। ...আর সবাইকে বঞ্চিত করে হিন্দু যদি একাই সবটা গ্রাস করে, তা'হলে ধর্মে সইবে না'..."আপনাদের রাষ্ট্রের নাম রেখেছেন পাকিস্তান। সেখানে কেবল 'পাকদের স্থান' 'না-পাকদের স্থান নেই।' 'না-পাক'রা যদি সেখানে থাকে তবে 'জিম্মী' হয়ে থাকবে। এই তাদের চিরকালের বরাত॥" এখানে 'জিম্মী' সম্বন্ধীয় কথাটার গুরুত্ব অত্যধিক। আশা করা যায় গঠনতন্ত্রে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে। কিন্তু অন্নদাবাবু নাম-মাহাত্ম্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে কিছু সত্য থাকলেও, হয়ত যুক্তির চেয়ে আবেগই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমানের পক্ষে একটা জুৎসই (অর্থাৎ ভাবোন্মাদনা জাগাবার মত) নামের প্রয়োজন ছিল। আর হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, যাঁরা এ রাষ্ট্রে থাকবেন তাঁরা সকলেই পাক, না-পাক কেউ নন এ আশ্বাস স্বয়ং কায়েদে আযম দিয়ে গেছেন।

"গান্ধীকে যে-শক্তি হত্যা করেছে সে একটি ব্যক্তি নয়। সে আমাদের সমবেত গোঁড়ামির দু'হাজার বছরের বদ্ধমূল অন্যায়। ...যে-শক্তি গান্ধীর মত মহাত্মা পুরুষের প্রাণনাশ করেছে,

তার প্রতি আমার লেশমাত্র মমতা নেই। মমতা এখানে দুর্বলতা। গত চার বছর ধরে আমি এই নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছি। কাকে বোঝাব বেদনা? কে বুঝবে?"–অতি চমৎকার ভাব, স্থিতধী ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করবেন।

"আমি স্থির করেছি যে আমাদের নেতারা জাতিভেদ তুলে দেবার জন্য প্রাণপণ না করা পর্যন্ত আমি নাগরিকতা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কিছু লিখবো না। কেননা দেশের বর্তমান অবস্থায় গ্রামে ফিরে কুটির-শিল্পের চর্চা করলে জাতিভেদ আবার দানা বাঁধবে। পল্লী-সমাজকে বর্তমান অবস্থায় রেখে পল্লীর উন্নতির কথা ভাবা ভুল। কেননা এর মধ্যে গোঁড়ামির বীজ নিহিত রয়েছে। গোঁড়ামিকে উচ্ছেদ করতে হবে। গোড়াসে ফার্স্ট" কথাটা ভাববার মত। নাগরিকতা আর যান্ত্রিকতা সত্যিই ত জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার প্রতিষেধকরূপে কাজ করতে পারে। আমি আগে কোনদিন এ লাইনে চিন্তা করিনি।

"এবার...পাকিস্তানের কথা বলি। আপনার 'আকাশ মাটি ও সময়' যে ধারার নির্দেশ দিচ্ছে সেই ধারাই প্রকৃত ধারা।...সেক্যুলার স্টেট প্রতিষ্ঠা করতে হবে, রাজনীতিকে ধর্মের তাবেদারী থেকে মুক্ত করতে হবে, গোঁড়ার দলকে প্রথমে রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে হটাতে হবে। কায়েদে আজম গোঁড়া ছিলেন না। মরহুম লিয়াকত আলী সাহেবও গোঁড়া ছিলেন না।...জয়েন্ট ইলেকটোরেট প্রবর্তিত না হলে গোঁড়ার দলকে হটানো সম্ভবপর মনে হচ্ছে না। ...অনেক ভালো হবে যদি জয়েন্ট ইলেকটোরেট প্রবর্তিত হয়, হিন্দুরা মুসলমানদের ভোট দেয়, মুসলমানেরা গোঁড়াদের হটায়। এক পক্ষের গোঁড়ার দল হটলে অপর পক্ষের গোঁড়াদের বিরুদ্ধে কাজ করার লোক পাওয়া যাবে। মুসলমানেরাই ভোট দিয়ে সাহায্য করবে হিন্দু-সংস্কারপন্থীদের। জয়েন্ট ইলেকটোরেট এই জন্যে চাই ...।"

এখানে সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর এই বিশেষ উদ্দেশ্যে জয়েন্ট ইলেক্‌টোরেটের সহযোগিতার যে সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন, এমন আমি ইতিপূর্বে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা আর কারো মুখে শুনিনি। এর তুলনায় মাহবুব-উল-আলম সাহেবের, পৃথক নির্বাচনের যুক্তি বা উক্তি অনেক হাল্কা বলে বোধ হয়। তবে ইসলামিক স্টেট বা শরীয়তি স্টেট সম্বন্ধে হয়ত অন্নদাশঙ্কর ভুল বুঝেছেন। আর ভুল বুঝবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে! তার মধ্যে প্রধান এই যে আমাদের নেতৃবৃন্দ দুই-একটা ফাঁকা বুলি আওড়ান ছাড়া শরীয়তি স্টেট কি এবং কি নয় এ সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি। আরও বিশেষ কথা এই যে অতীতে শরীয়তের ধারণার বিভিন্নতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছে। তাই শরীয়ৎ বলতে কি শীয়া শরীয়ৎ না সুন্নি শরীয়ৎ, হানাফী শরীয়ৎ না চিশতীয়া শরীয়ৎ, আহমদী শরীয়ৎ না আহলে-হাদিসী শরীয়ৎ, ইসমাইলী শরীয়ৎ না ওহাবী-শরীয়ৎ বুঝার তা নির্দেশ করা বড় শক্ত। হয়ত এই কারণেই নেতারা কতকটা আমতা আমতা করে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এই সেদিন পাঞ্জাবে যে-সব কাণ্ড হয়ে গেল—ধর্মের নামে আহমদী সম্প্রদায়ের উপরে হামলা—এর শেষ কোথায়, কেউ বলতে পারে না। কর্তৃপক্ষ শেষে যে বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করেছিলেন, অর্থাৎ উদারনৈতিক কর্মপন্থা, যে-পন্থা কোনও বিশেষ ফেরকার পোষকতা করে না—সেইটেই আসল শরীয়তি নীতি। সব শরীয়তের মূল-দেশেই রয়েছে ইনসাফ, রহমত, এহসান বা ন্যায়বিচার; দয়াশীলতা, হিতকর্ম ইত্যাদি। সেক্যুলার স্টেটের সঙ্গে এখানে শরীয়তি স্টেটের কোনও পার্থক্য নেই। আমার মনে হয়, অতীতে আমাদের স্বল্প-শিক্ষিত আলেম-সম্প্রদায়কে খুশী করার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত তোয়াজ করা হয়েছে, এখন একটু ব্রেক কষা দরকার।

তা না হলে সামান্য ছুতোনাতা নিয়ে যেমন দাড়ী রাখা, মোচ-ছাঁটা-না-ছাঁটা, পর্দা-বেপর্দার মসলা, সুদ-রেশওয়াতের ফতোয়া, জীবরীলের ছবি আঁকা, বা নাটকে হজরত মোহাম্মদের পার্ট অভিনয় করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দেশে অনাসৃষ্টি হতে পারে। তাই সুষম মত গঠন বা গোঁড়াঠেকান ব্যাপারের উপর অন্নদাশঙ্কর যে জোর দিয়েছেন, তা ঠিকই হয়েছে, হিন্দুস্তান-পাকিস্তান উভয় স্থানেই এটা জরুরী সমস্যা। এজন্য মনে হয় নেতারা শরীয়তি রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ফাঁকা আওয়াজ দিয়েছেন, সেই হয়ত ঠিক। সংজ্ঞায় যাকে সহজে বাঁধা যায় না, এমন কথার ব্যাখ্যা এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। প্রশ্ন হ'তে পারে তবে তেমন কথা রাখবারই বা কি দরকার? এর জওয়াব নেতারাই ভালো দিতে পারেন, কারণ, জনমতের উপর তাঁদের কব্জা রাখা প্রয়োজন এবং গালভরা বুলি দিয়েই জনগণকে সবচেয়ে সহজে ভুলান যায়। এটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, যুক্তির ব্যাপার নয়।

পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আসবে, এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর এখন অনেকটা নিঃসন্দেহ হয়েছেন, দেশবিভাগকেও এখন তিনি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন, ভিসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও এখন তাঁর ধাঁধা কেটে গেছে। এ-সব সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরপেক্ষ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন চিন্তাশক্তির দৌলতে। যে-দেশে এমন লোক রয়েছেন সে-দেশ ধন্য—কারণ তাঁর সংস্রবে এসে আরও এমন লোকের সৃষ্টি হবে। আমাদের মাহবুব-উল-আলম সাহেবও মানুষের সঙ্গে মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসী। তাঁর সমভাবুক আর কেউ নেই, এমন নয়, অনেকেরই নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এঁরা বিক্ষিপ্ত। আশা করি, আলম সাহেবের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে এ-বিষয়ে আমাদের চেতনা তীক্ষ্ণতর হবে, আর তার ফলে শান্তিময় বিশ্ব-রচনার দিকে আমরা কয়েকপদ অগ্রসর হব। ভারত-পাকিস্তান সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের আর একটি অভিমতের কথা উল্লেখ করব। তিনি বলেছেন—"পাকিস্তানের দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল বলে পাকিস্তানে আমাদের আপত্তি ছিল। সে আশঙ্কা আর নেই। তার বৈদেশিক নীতি ভারতের বৈদেশিক নীতি-বিরুদ্ধ বলে আশঙ্কার কারণ ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান মোটের উপর একই বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। এখন বাকী আছে মাত্র একটি ক্ষোভ,—পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবস্থা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের সংখ্যালঘুদের অবস্থা। আর দু'এক বছরের মধ্যে এ বিষয়ে একটা স্থিরতার ভাব আসবে। পাসপোর্ট প্রবর্তনের ফলে মানুষ স্থির হয়ে এক জায়গায় বসবে, যার যেখানে মন বসে।..."

আমি রাজনীতিক নই। কিন্তু এতটুকু পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করবে, এ ধারণাটা সত্যই আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। যা' হোক আক্রমণের আশঙ্কা যখন চলে গেছে, তখন আর এ নিয়ে ঝগড়া নেই। আর একটি কথা—পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা। কোন্‌টা ক্রিয়া আর কোন্‌টা প্রতিক্রিয়া এ-সব কথার মীমাংসা নেই, সুতরাং উত্থাপন না করাই ভাল। আমার মনে হয়, ভারতীয় সংবাদপত্রের মারফতেই অনেক রকম আজগুবি খবর বা অবস্থার কথা লোকের মনে জমে বসছে এবং তার দ্বারা সাহিত্যিকেরাও মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। পাকিস্তানেরও সে-সব পত্রিকা সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা বলে না, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। তবে পাকিস্তানে পত্রিকার সংখ্যা কম, আর সাংবাদিকতার ব্যবসাদারী মারপ্যাচে বোধ হয় ভারতীয় বনেদী পত্রিকা বেশী সিদ্ধহস্ত। যা-হোক, আমার এ কথা উল্লেখ করবার কেবল এই উদ্দেশ্যে যে আপোষের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এসব বিতর্কের কথা পারতপক্ষে না তোলাই ভাল।

অবশেষে মাহবুব-উল-আলম আর অন্নদাশঙ্করকে অশেষ ধন্যবাদ দিই। তাঁদের আলাপ শুনতে পেয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি, আনন্দও পেয়েছি। তাঁদের প্রেমের ডাক সার্থক হোক, বিশেষ করে সাহিত্যিক মহলে। সর্বশেষে অন্নদাশঙ্করের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেই শেষ করছি :

"দেশভাগ হয়েছে বলে জনগণ ভাগ হয়েছে এ ধারণা আমি পোষণ করিনে। তবে জনগণের কতক অংশ পাগল হয়েছে এটা জাজ্বল্যমান সত্য। পাগলামী চিরদিন থাকবে না।...হাজার বছর ধরে আমরা পরস্পরকে ধনবান করেছি, তার সাক্ষী আমাদের সঙ্গীত, আমাদের সাহিত্য, এমনকি আমাদের রন্ধনকলা। হাঁ, মারামারিও করেছি, কিন্তু ভালবাসাবাসিও কি করিনি?...বাহির থেকে যারা দেখে, তারা আমাদের হৃদয়টা দেখতে পায় না। সেখানে প্রেমের পরিমাণ প্রচুর; সবচেয়ে গোঁড়া মুসলমান আর সবচেয়ে গোঁড়া হিন্দুর মধ্যেও। আর যাঁরা গাইয়ে-বাজিয়ে, আঁকিয়ে-লিখিয়ে, ফকির-দরবেশ, বাউল-সন্ত, তাঁদের হৃদয়ে প্রেম ছাড়া আর কী আছে? যতই রাগ করি আর যতই যাই করি, ভাল না বেসে থাকতে পারি কই!"

**ইমরোজ**
**বৈশাখ ১৩৬০**

# বাঙ্গালী মুসলমানের কাব্য-সাধনা

১৯৪৫ সালে কলকাতার নূর লাইব্রেরী থেকে 'কাব্য-মালঞ্চ' নামে একখানা কবিতা-সঞ্চয়ন-গ্রন্থ বের হয়েছে। এর সম্পাদনা করেছেন আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম। উভয়েরই শক্তিমান লেখক হিসাবে খ্যাতি আছে। সঞ্চয়ন গ্রন্থখানি নিয়ে আজ কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে। আলোচ্য পুস্তকে শুধু মুসলমান লেখকদেরই কবিতা সংকলিত হয়েছে। সুতরাং এর একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে-সমস্ত রস-সৃষ্টি ক্ষণকালের প্রশ্রয়ের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যকালের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের সঙ্গে সর্বদা চেনা-শোনা থাকলে সাহিত্যবিচার করবার অধিকার জন্মে ও আনন্দ ভোগ করবার শক্তি খাঁটি হয়ে ওঠে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি সংকলনের প্রয়োজন এই কারণেই।" এর থেকে বুঝা যাচ্ছে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিই সংকলনের যোগ্য। আর শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি? না, যেগুলির খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ক্ষণকালের 'প্রশ্রয়ের' উপর নির্ভর করে না, বরং নিত্যকালের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এই ধরনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যাঁর দ্বারাই লিখিত হোক না কেন, রচনায় নমুনা স্বরূপ বা রসের আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হয়ে সাহিত্য বুঝবার এবং উপভোগ করবার সহায়তা করে। এই কঠিন বিচারে সংকলনের কোন্ কবিতাটি টিকবে আর কোন্‌টি টিকবে না বেছে বার করা বড় সহজ না হলেও হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ নেই বরং নিরাশ হবার কারণ থাকতে পারে। মানুষের ভাবরাজ্যের অবচেতনার বোধ হয় একটা নিশ্চল ঐক্য আছে—তাইতেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারি। এরই উপরে ঘটনা বিক্ষুব্ধ বৈচিত্র্য বিরাজ করে; এই বৈচিত্র্যও মনোহর। এই বৈচিত্র্যের সাহায্যেই আমরা যেন নিশ্চল অবচেতনাকে একটু নাড়া দেই, আবার ঐ নিশ্চল নির্বিশেষ ভাবের পটভূমিতেই বিক্ষুব্ধ বৈচিত্র্যকে বুঝতে বা অনুভব করতে পারি। অন্য কথায় আমরা নিত্যকালের পটভূমিতে ক্ষণকালের বৈচিত্র্য অনুভব করি অথবা ক্ষণকালের বৈচিত্র্যের দোলায় নিত্যকালকে কিছুটা আন্দোলিত করে নিত্যকালের রস সম্ভোগ করি, বিষয়টাকে যেভাবেই দেখি তাতে আসে যায় না। অর্থাৎ প্রকৃত রসসৃষ্টিতে ক্ষণকাল ও নিত্যকালের মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই—এরা পরস্পর সম্পূরক। আসল কথা এই, লেখক ক্ষণকালকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে নিত্যকালকে দোলা দিচ্ছে না, রসসৃষ্টির প্রকৃত পরখ ঐখানেই। ক্ষণকালের অর্থাৎ বর্তমানের বিষয়বস্তু নিয়েই সৃষ্টি হয় এমন সৃষ্টি, যে ক্ষণকাল পেরিয়ে তার আবেদন নিত্যকালে পৌছায়। এই রকম সৃষ্টিই হয় সার্থক আর সংকলনের যোগ্য। ইতিহাসে আবর্জনা থাকতে পারে, কিন্তু রস-সংকলনে আবর্জনা বর্জনই বাঞ্ছনীয়। এই হিসাবে দেখতে গেলে অবশ্যই বলতে হয়, অনেক আবর্জনাও আলোচ্য পুস্তকে সংকলিত হয়েছে।

এর কারণ, সম্পাদকেরা হয়ত একাধারে রস-সংকলন এবং ইতিহাস দিতে চেয়েছেন। শুধু মুসলমান লেখকদের কবিতা সংগ্রহের এমন একটা ঐতিহাসিক মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা

বোধ করেছেন যে তাঁরা বিশেষজ্ঞের মত ভাব ও রচনা-রীতির ক্রমবিকাশের নমুনা হিসাবে মুখ্যতঃ সময়ানুক্রমিকভাবে বর্তমান পাঠককে বিশেষ বিশেষ কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত কবিতাসমুদ্রে এর অনেক কবিতা হয়ত নিখোঁজ হয়ে যেত; আর তাতে মুসলমান-সমাজের বিশিষ্ট চিন্তাধারা বা সাধনা কোন্ পথে চলেছে তার নির্দেশ মিলত না।

বর্তমান বিক্ষোভের যুগে বা সমাজ-চেতনার যুগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্পষ্টভাবে আপন-আপন ভাবধারা সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় এসেছে। তাই মনে হয় সম্পাদক আবদুল কাদির বিশেষ সময়োপযোগী কাজই করেছেন। তাঁর কথায় বুঝা যাচ্ছে, এই সংকলন একাধারে রস-সঞ্চয়ন, ইতিহাস এবং সমন্বয়-প্রচেষ্টা। কাজেই এই তিন দিকেই দৃষ্টি রেখে এর বিচার করতে হবে।

এই বিচার-সৌকর্যের জন্য আবদুল কাদিরের 'মুসলিম সাধনার ধারা' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমুদয় কাব্য-সংকলনখানাই, ধরতে গেলে, এই প্রবন্ধে প্রকাশিত উক্তির সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আবদুল কাদির প্রথমেই পুরাকালীন বৌদ্ধ সদ্ধর্মী, সহজিয়া ও নাথ-পন্থীদের সঙ্গে মুসলমান পীরপন্থীদের মত বিশ্বাস ও ধর্ম-সাধন-প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেছেন "সেকালের শ্রাবকদিগের ন্যায় একাদশ শতাব্দীতে গ্রাম্য গায়েনরা নাথ-যুগিগণের গৌরব-গাথা গাহিয়া বেড়াইত, নাথ-গীতিকাগুলি তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পঞ্চদশ শতকের শেখ ফয়জুল্লাহ এবং উনবিংশ শতকের আবদুস শুকুর মাহমুদ এই নাথ-মহান্তগণেরই মাহাত্ম্য প্রচারক।" শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়' এবং শুকুর মাহমুদের 'গোপীচান্দের সন্ন্যাস' থেকে উদ্ধৃত কবিতাগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী। 'রসুল-বিজয়' কাব্যের কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই শেখ চান্দের একটি কবিতা সংকলনে স্থান পেয়েছে। এতে রসুলের মাতা হজরত আমেনার রূপবর্ণন বেশ চমৎকার হয়েছে। এরপর সপ্তদশ শতকের কবিগুরু কাজী দৌলত-এর 'সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী' থেকে দুইটি মনোরম কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। সুবিখ্যাত কবি আলাওল-এর 'পদ্মাবতী' এবং 'সপ্তপয়কর' থেকেও চার-পাঁচটি উৎকৃষ্ট কবিতা সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া সেকালের 'জ্ঞান-প্রদীপ', 'ওফাতে রসুল', 'শবে মেরাজ', 'নবীবংশ', 'তোহফা', 'সেকেন্দরনামা', 'সয়ফুল মুলুক বদিয়জ্জামাল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। মহরমপর্বে গীত 'মর্সিয়া সাহিত্যে'র আদি-লেখক মোহম্মদ খানের 'মাকতুল হোসেন' এবং পরবর্তী যুগে মোহাম্মদ এয়াকুবের রচিত 'সহি বড় জঙ্গনামা'র কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এইসব পুস্তকে ঐতিহাসিকতার চেয়ে কল্পনাস্ফুরণের দিকেই কবিদের অধিক দৃষ্টি ছিল, তারও প্রমাণ দিয়েছেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু'ও এই কারণে পরবর্তী মুসলমান সম্প্রদায়ের আক্রমণের বিষয় হয়েছিল, কিন্তু 'বিষাদ-সিন্ধু' তার সাহিত্যিক গুণে এখনও বেঁচে আছে। এর পর আসে এক প্রতিক্রিয়ার যুগ। মুন্সী জনাব আলীর 'শহীদে কারবালা' ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে রচিত।

তিনি লিখেছেন :

মহরমের বুনিয়াদ শিয়া লোক হ'তে
বাংলার মুসলমান ভাবিত সেমতে।
জারি ও মার্সিয়া যত গাহিত সকলে

সে কথা না পাওয়া যায় হাদিসে দলিলে।
সেই মার্সিয়ার ভাবে কোনো শায়েরেতে
মোক্তাল হোসেন লিখে দিলেন ফার্সিতে।
বাংলার জঙ্গনামা তর্জমা তাহার
দেশে দেশে জারী খুব আছে যে প্রকার।
কেননা তাহাতে যত বেদলীল বাত
নাহি মিলে সত্য কিছু দীনের হালাত॥

তবে, এই ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় প্রচার সাহিত্যের প্রভাব এড়িয়েও 'ফাতেমার সুরতনামা', 'সখিনা-বিলাপ', 'আমীরজঙ্গ', 'এমাম সাগর', 'মোহররম পর্ব', 'এমাম-যাত্রা নাটক', 'এমাম-বধ নাটক', এবং 'হানিফার লড়াই', 'জৈগুনের পুঁথি', 'সহি সোনাভান', 'পবনকুমারী', 'সূর্যউজাল বিবির কেচ্ছা' প্রভৃতি রঙিন কল্পনামূলক জনপ্রিয় পুঁথি রচনা সম্ভব হয়েছে। এসবের থেকেও কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এর থেকে মুসলিম জনচিত্তের দু'টি ধারা বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে এই সত্য ও সুন্দরের দ্বন্দ্ব আজও ঘোচে নাই।

পাগলা কানাই, লালন শাহ, শেখ মদন, হাসন রেজা প্রভৃতির বাউল ও মুর্শিদাগানের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক প্রকৃষ্ট চেষ্টা দেখা যায়। এ-সমস্ত গানেরও কিছু কিছু সংকলিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে অর্থাৎ ওহাবী আন্দোলন দ্বারা যে-সমস্ত মুসলমানের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল তাদের মধ্যে মুন্সী মেহেরউল্লাহ, মুন্সী রেয়াজউদ্দীন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি "ওঠো, জাগো, হায় মুসলিম, হায় ইসলাম" ধরনের সাহিত্য রচনা করে গেছেন। কিন্তু তা ক্ষণকাল পেরিয়ে নিত্যকালের সন্ধান না পাওয়ায় আজ অনাদৃত। তবু এঁদেরও শ্রেষ্ঠ নমুনা ঐতিহাসিক কারণে কিছু কিছু সংকলিত হয়েছে। তারপর কবি কায়কোবাদ, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীনের কবিতাও যোগ্যতার বলেই স্থান পেয়েছে। হয়ত এইখানেই সংকলন শেষ করলে ভাল হ'ত। এ-পর্যন্ত যে-সব কবিতা সন্নিবিষ্ট অতি-আধুনিক বর্তমানকে ঘাঁটিয়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। হয়ত তাঁরা বর্তমান গতিপথ নির্ণয়ের তথ্য সংগ্রহের খাতিরে বা কোন কোন নবব্রতীকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে এইসব কবিতাও সংকলনে স্থান দিয়েছেন। আমি একথা বলি না যে পূর্ববর্ণিত কবিতাগুলির চেয়ে এগুলি কাব্যাংশে নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে, তবে একথা ঠিক যে বর্তমানের কুজ্‌ঝটিকা পরিষ্কার না হলে এর অধিকাংশেরই প্রকৃত যোগ্যতা নির্ণয় করা কঠিন। এই কঠিন কাজে স্বভাবতঃই অনেক ত্রুটি হয়েছে, তবু আবদুল কাদির যথাসাধ্য বিচার-বিবেচনার সঙ্গে এই সুকঠিন কার্যও নির্বাহ করতে চেয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ সমালোচকের পথ সুগম করে দিয়েছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

ইমরোজ
চৈত্র ১৩৬০

# 'দীউয়ান-ই-হাফিজ'

দীউয়ান-ই-হাফিজ (কাব্যানুবাদ)— অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন অনূদিত। আজাদ প্রকাশনী, ৫১, হোসেনী দালান রোড, ঢাকা-১। প্রচ্ছদশিল্পী ঃ আবদুর রহমান চুগতাই, লাহোর ও এ. রউফ, ঢাকা। ডিমাই অক্টেভো সাইজ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০ + ২৪০ + ২০। দাম ঃ ৬.৫০ টাকা।

অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন সাহেব বাংলার বিশিষ্ট কবি ও প্রবীণ সাহিত্যিক। তাঁর সর্বপ্রথম গদ্যগ্রন্থ 'ইসলামের ইতিহাস' ভাষার সংহতি ও লালিত্যে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর নওরোজ, পল্লীবাণী, আমরা বাঙ্গালী, করীমা-ই-সাদী, মসনবী রুমী, ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ, সরলতা স্বাভাবিক কাব্য-মাধুর্য ও পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ—এই কয়েকটি গুণে রসিকজনের চিত্তহরণ করেছে। সম্প্রতি ইনি 'দীউয়ান-ই-হাফিজ' গ্রন্থে ইরান-কাননের সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুম চয়ন করে বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছেন। এই পুস্তকের সুলিখিত 'পরিচিতি'-তে দীউয়ান-ই-হাফিজের, তথা পারস্যের কাব্যরীতি ও গজলের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের কথা দৃষ্টান্ত-সহকারে উল্লেখ করে এবং সাকী, আশেক, মা'শুক, বুৎ, পীর, মোল্লা, যাহিদ, সুফী প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কাব্যখানার মর্ম গ্রহণেও বিশেষ সহায়তা করেছেন। আর, কাব্যের পদ্যানুবাদ কি কি কারণে কঠিন এবং তিনি মূলের কোন কোন বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন, সে সম্বন্ধে বলছেন : "কাব্যানুবাদ হইলেও সর্বত্র মুল ফার্সী ছন্দে অনুবাদের চেষ্টা করি নাই, কারণ সেরূপ করিতে গেলে ভাবের প্রাধান্য অপেক্ষা ছন্দের কসরতটাই বেশি বড় হইয়া পড়ে। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ করা হইয়াছে, তবে বাংলা ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য ক্বচিৎ কোনও কোনও স্থানে সামান্য পরিবর্তন না করিলে চলে নাই।"

পাক-ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পূর্বে মুসলিম শাসনকালে ফার্সীই রাজভাষা ছিল। এই কারণে আমাদের ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে ফার্সীর সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে। ইংরেজ-আমলেও অন্ততঃ ১৮৩২ সাল পর্যন্ত ফার্সীই রাজভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি আমরাও হাইস্কুলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ক্লাসিকাল ভাষা হিসেবে ফার্সী পড়েছি, — কোনও কোনও স্কুলে অবশ্য ক্লাসিকাল ভাষা হিসাবে আরবী পড়বারও ব্যবস্থা ছিল; তবে ফার্সী পড়া হত সব সাধারণ হাই স্কুলেই। এখন সে অবস্থার পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয়, এর ফলে বর্তমান যুগের ছাত্ররা ইসলামী ঐতিহ্যের একটি বিশেষ গৌরবজনক অধ্যায়ের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর আংশিক প্রতিবিধানস্বরূপ, আকরম হোসেন সাহেবের বাঙলা অনুবাদ 'দীউয়ান-ই-হাফিজ'-এর যথেষ্ট কৃষ্টিগত মূল্য রয়েছে।

এই গ্রন্থে মোট ২৪০টি গজলের, অর্থাৎ কবি হাফিজের গজলসমূহের প্রায় অর্ধেকের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। গজলগুলো মূল গ্রন্থের মতো 'রদীফ' বা অন্তঃমিল অনুসারে সাজান

হয়েছে। আরবী বর্ণমালার ২৮টি অক্ষরের মধ্যে মোট ১৫টি অক্ষরের 'রদীফ' এতে স্থান পেয়েছে। এতে দেখা যায়, 'দাল'-এর 'রদীফ' ৭৬টি, 'তে'র ৩৩টি, 'মীম' ও 'ইয়া'র ৩২টি করে এবং 'শীন' ও 'নূঁ'-এর ৯টি করে 'রদীফ' এসেছে ; বাকী অক্ষরগুলোর 'রদীফ' সংখ্যা আরও কম। একে হয়ত মূল দিওয়ানের দৈবাৎ-ঘটিত নমুনা (random sample) বলে ধরে নেওয়া যায়।

অনুবাদে মূল গজলগুলোর প্রত্যেকটির প্রথম দুই লাইনের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে যাঁরা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অনুবাদের যথার্থতা বিচার করতে চান তাঁদের সুবিধা হবে। তাছাড়া, যে ৪৮০টি 'মিসরা' (চরণ, বা অর্ধ-রদীফ) উপরে মূল ফার্সীতে লেখা রয়েছে, সেগুলোর অনুবাদ-রীতি লক্ষ্য করলেও এ সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে, অনুবাদটা বাঙলা হয়েছে কিনা, সেটা বিচার করবার জন্য গজলের ক্রমিক সংখ্যাসহ কয়েক স্থান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে :

"প্রিয়ার ঘরে কি আর আমার আরাম আয়েশ ?
সারাক্ষণই
ঝংকারে যে ঘণ্টা ধ্বনি, — 'হাওদা বাঁধো।
চল্‌নেওয়ালা।'
আঁধার রাতি ঢেউ-এর ভীতি, তুফানও তাই
তেমনি ভীষণ,
বুঝবে কি আর মোদের দশা তীরে যারা
রয় নিরালা।"-১

"দিল বুঝিবা হাত-ছাড়া মোর দিল-দরদী
খবরদার।
হায় হায় হায় গোপন কথা ছড়িয়ে পড়ে
চতুর্ধার। ...
উভয় লোকের আরাম আয়েশ বাখান শুধু
দুই কথার,—
সুহৃদ সনে হৃদ্যতা আর অরি-র তরে
সদব্যাভার।"-৩

"আশ্‌না গণের খোশ খেয়াল আর দুশমনদের
মনের আশা,
তেমনি স্বরক যেমন ধারা চটের চাট আর
জরির জোড়া।
কাঁচা সোনার তুলা বচন ছড়ায়ো না
মিছে হাফিজ,
এ শহরের পোদ্দারেরা জালিয়াত সব
আগাগোড়া।"-২৭

"কইনু তারে, 'মদ ও পীরান শরীয়তের
রীতি নহে।'
কইল মোরে 'ইটিই বটে মাতাল পীরের
অনুশাসন।"
কনুই তারে রাঙা ঠোঁটে বুড়ার আবার
লাভ কি বল ;
কইল মোরে, 'চুমটি তারে দানে আবার
নব জীবন।'
কনুই তারে, 'হাফিজ নিতুই মগে দোয়া
তোমার লাগি ;'
কইল মোরে, 'তেমনি মাগে সপ্তাকাশের
ফেরেশতাগণ।"-১০৭

এ-রকম বহু উৎকৃষ্ট স্তবক ছড়িয়ে রয়েছে এ বইয়ের সর্বত্র। লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রত্যেক গজলে বাঙলা তর্জমাতেও জোড়-সংখ্যক চরণে মিল রাখা হয়েছে ; আর ছন্দের স্বচ্ছন্দ-গতি, ভাষার প্রাঞ্জলতা, এবং ফার্সী-বাঙলা শব্দের মধুর মিলন চমৎকার মানিয়েছে। এ-তে যে কতখানি কাব্যশক্তি, কল্পনা-প্রসার, ভাষাজ্ঞান আর কল্পনা-রসিক চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা যাঁরা অন্য ভাষা থেকে দুই-চার লাইন কাব্যানুবাদ করবার চেষ্টা করেছেন, কেবল তাঁরাই ভালো বুঝতে পারবেন। যেখানেই একটু খটকা লাগে, সেখানেই মূল গজলে দেখা যাবে ফার্সী মোহাবেরা (বাগ্‌বিধি), বাঙালির কাছে অপরিচিত নাম-পদ, বা পৌরাণিক উপাখ্যানাদির উপস্থিতি। সে-সব স্থলে পাদ-টীকায় সম্ভবমত বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ভাবানুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তর্জমার দ্বারা ভাবের গুরুতর ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েনি। তবে, মনে রাখা ভাল, হাফিজের কবিতার ব্যঞ্জনা অতিশয় গভীর, কখনও বা দুই-তিন রকম মানে হতে পারে। তাই, কোনও সময় পাঠক মূলের একরকম অর্থ করতে পারেন, আর অনুবাদকারী হয়ত অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন,— এটা খুবই স্বাভাবিক। এ-সব স্থলে কোনটি সঠিক অনুবাদ, তা নির্ণয় করা যায় না ; আবার বাঙলাতে সবরকম সম্ভাব্য মানেই একই ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যাবে, তা-ও আশা করা যায় না। এই কারণে দুই-এক স্থলে আমার মনে একটু একটু যা' খটকা লেগেছে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাছাড়া আমার ফার্সী জ্ঞানও খুব সীমাবদ্ধ, সন্দেহ স্থলে লোগাৎ দেখে মানে করেও নিশ্চিত হওয়া যায় না।

প্রথম দুই চরণের অনুবাদ যে সর্বত্রই সুখ-পাঠ্য হয়েছে তা' বলা না গেলেও অন্ততঃ শতকরা পঁচানব্বইটিই যে ভাবানুগত হয়েছে তা বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ ৫নং গজলটির মুখ-পাতটা দেখা যাক :

আগর আঁ তুর্কে শিরাজী বদস্ত আরদ দিলে মা-রা
বখালে হিন্দুওয়াশ বখ্‌শম সমর-কন্দ ও বোখারা রা।

এর অনুবাদ হয়েছে,

"আজ যদি ওই শিরাজ হুরী দেয় ফিরিয়ে
পরাণ আমার

সমরকন্দ আর বোখারা দেই নজর তার লাল
গালের তিলটার।"

এখানে মূল গজলের ভাবটাই যেন (বর্তমান যুগে) কেমন নাটুকে নাটুকে ঠেকে, (হয়ত, বুঝবার ত্রুটিতেই); আর ভাবানুবাদটাও পড়তে গিয়ে শেষের দিকে কেমন যেন ঠোকর খায়। অজানিত পরিবেশই বোধ হয় এর প্রধান কারণ। এখানে 'হিন্দু" অর্থে 'কালো' হওয়াও বিচিত্র নয়। যাহোক এসব স্থলে একটু-আধটু অস্পষ্টতা হজম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে বোধ হয়, শতকরা পাঁচটাও এই ধরনের দৃষ্টান্ত মিলবে না।

মোটকথা, জীবন-সায়াহ্নে এসেও অক্লান্তকর্মী আকরম হোসেন সাহেব জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিংড়িয়ে যে পরিপুষ্ট কাব্যসম্ভার তৈরি করে স্বদেশবাসীর হাতে তুলে দিলেন, তার মধ্যে তাঁর পূর্ব সাহিত্যকৃতির সমস্ত গুণই বর্তমান রয়েছে ; অধিকন্তু এর বলিষ্ঠ সাবলীল গতি ও রসাশ্রিত সাধন-ধর্ম আমাদের বিস্ময় ও আনন্দের বস্তু। তাই আমরা এই নবতম দানকে মোবারকবাদ জানাই, আর তাঁর সাহিত্য ও কাব্য-প্রতিভা অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করুক এই কামনা করি।

মাহে-নও
ফাল্গুন ১৩৬৮

# রূমীর মসনবী

জনাব মনিরুদ্দীন ইউসুফ সাহেব সম্প্রতি মৌলানা রূমীর 'মসনবী'-শরীফের পরিচয়-সূচক এখানা পুস্তক রচনা করেছেন। ডঃ এনামুল হক সাহেবের বিস্তারিত ভূমিকা, আর ইউসুফ সাহেবের নিজের লেখা অবতরণিকা থেকে সেই যুগের পটভূমি এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতির সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মে। এই পূর্বাভাষ মসনবীর মর্ম-গ্রহণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তা'ছাড়া গ্রন্থকার তাঁর নির্বাচিত মসনবীগুলো ভাবানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে আবহ-ব্যাখ্যা দিয়ে পড়তে পড়তে মৌলানা রূমীর ভাব-সম্পদ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

মসনবী শরীফে বক্তব্যের একতা থাকলেও কাহিনীর একত্ব নাই। বোধ হয় এই কারণে বইয়ে সূচিপত্র দেওয়া হয়নি। তবু ভেবেচিন্তে ভূমিকা ও অবতরণিকার পরে কাহিনীগুলোর একটা সূচীপত্র দিয়ে দিলে মন্দ হত না।

মসনবীর কাহিনীগুলো মুখ্য নয়, এসবের ভিতর দিয়ে গূঢ় সত্যের আভাস দেখা যায়, তাই হল আসল বস্তু। মানবজাতিকে শুনাবার জন্য মৌলানার মনে যে চিরন্তন-বাণী, সঞ্চিত ছিল তাই প্রকাশ পেয়েছে মসনবী কাব্যে। বলাবাহুল্য এর মূল সুর ঐশীপ্রেম। আল্লাহ থেকে পৃথক হয়ে মানবাত্মার যে আকুলি-বিকুলি, প্রেম-সঙ্গীত, মিলনাভিলাষ,— তাই প্রকাশ পেয়েছে এতে অজস্র ধারায়, বিচিত্র ভঙ্গীতে।

বাংলা ভাষায় মসনবী-শরীফের এরকম ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর চোখে পড়ে নাই। তাই এ পুস্তকখানা পাঠ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলাম-জগত ও হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে মৌলানা রূমীর মৌলিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। কিন্তু লেখক যে মৌলানার কাব্যে "দেহ-আত্মার" অভিন্নতার বাণী দেখতে পেয়েছেন, আমি ঐরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার তেমন কোনও অকাট্য যুক্তি বা উক্তির সন্ধান পাইনি। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে অনুভূতিজগতের, আর আমি কেবল কতকগুলো খণ্ডিত মসনবী ও তার তর্জমা মাত্র দেখেছি। কাজেই জোর করে কোন প্রতিবাদও করতে পারছি না। লেখক প্রমাণস্বরূপ (সূরা ও আয়াত সংখ্যার উল্লেখ না করেই) উল্লেখ করেছেন, "পরকালে আল্লাহ আবার তাদের দেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একত্রিত করিয়া বিচারের জন্য উত্থিত করিবেন।" কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে এরূপ কথা আক্ষরিকভাবে গ্রহণীয় নয়, এগুলো রূপক আয়াত (আয়াতে মুতাশাবেহাত)। এরূপ আয়াত অবলম্বন করে বাগবিতণ্ডা করার নিন্দা কোরানেই উল্লিখিত আছে। এগুলোকে কোরানের ভাষায় 'আহ্‌ওয়া' বা 'যন'— অনুমান বা কল্পনা বলা হয়েছে। যাহোক এসব ব্যাপারে (মূঢ় তত্ত্ব বা সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচারে) আমার অধিকার না থাকায় মৃদু প্রতিবাদ উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হলাম।

ফার্সী থেকে বাংলা তর্জমা মোটামুটি ভালই হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে মূলের সঙ্গে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। অনেক স্থলে, যেখানে ভাবার্থ দেওয়া হয়েছে, সেখানে মূলের অনুগত

থেকেই আরও সুন্দর বাংলায় তর্জমা করা যেত, আর তাতে অর্থটাও হয়ত আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। কিন্তু পাঠকের পক্ষে সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে এই যে, মসনবীগুলো বাংলা হরফে লেখার ফলে প্রচুর ছাপার ভুল ঢুকেছে। এক শব্দের অক্ষর আর এক শব্দে গায়ে বসেছে। লিপান্তরের ভুল হয়েছে ; আর বিশেষ করে বহুবচনজ্ঞাপক চন্দ্রবিন্দু একস্থান হতে অন্যস্থানে গিয়ে বসেছে। এইসব কারণে মূলে কি ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হলে ফার্সী অক্ষরে লিখিত মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার প্রয়োজন হয়। এর চেয়ে ডঃ এনামুল হক সাহেবের ভূমিকায় যেমন ফার্সী বাণীগুলো ফার্সী হরফে লেখা হয়েছে। এ বইয়েও মসনবীগুলো ফার্সী অক্ষরে লিখিত মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার প্রয়োজন হয়। এরচেয়ে ডঃ এনামুল হক সাহেবের ভূমিকায় যেমন ফার্সী বাণীগুলো ফার্সী হরফেই লেখা হয়েছে এ বইয়েও মসনবীগুলো ফার্সী হরফে লিখলেই ভুল বুঝবার সম্ভাবনা কম হত। যাঁরা ফার্সী জানেন, তাঁরা আরও অধিক উপভোগ করতে পারতেন, আর যাঁরা ফার্সী জানেন না তাঁরা বাংলা হরফে সাপের মন্ত্রের মত কতকগুলো বাণী (তাও অশুদ্ধভাবে) মুখস্থ করবার প্রলোভন থেকে অব্যাহতি পেতেন।

অন্ততঃ একস্থলে লেখক মূল ফার্সীর মর্ম অনুধাবন করতে না পারায় আনুমানিক অর্থ ধরে, সেজন্য মৌলবীকেই দায়ী করেছেন। এ অবশ্য বে-আদবী, নিতান্ত অন্যায়। যেমন (পৃঃ ৩০) :

جمله معشوق است عاشق پردهٔ
زنده معشوق است عاشق مردهٔ

এ শ্লোকটি হেঁয়ালী নয়। এর অর্থ হতে পারে :

"প্রেমাস্পদ (মাশুক) (সমগ্র রাগিণীর মত) অখণ্ড সত্তা ; প্রেমিক (সেই রাগিণীর) একটি পর্দা মাত্র। প্রেমাস্পদ (মাশুক) চিরন্তন ; মিলনপ্রয়াসী (আ'শিক) নশ্বর জীব।" এই সুরই বোধ হয় মসনবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। বাঁশীর রোদন, চক্ষু-কর্ণের সীমার ওপারে মনের ক্রন্দন, দেহ ও প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক— ইত্যাদির ভাব এই কেন্দ্রিক ভাবের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে।

জনাব ইউসুফ নিজে কবি হয়েও মসনবীর গদ্যানুবাদ করেছেন। এটা সুবুদ্ধির কাজই হয়েছে। যেকোনও বিপ্লবাত্মক কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় কঠিন। তাই তিনি নিছক অনুবাদে সন্তুষ্ট না থেকে, 'মৌলবী'-র গূঢ়ভাবে বিস্তৃত ভাষ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমার মনে হয় এই ভাষ্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যাদি, ইসলামী আদর্শের সহিত গ্রীক দর্শনের মিশ্রণ, গুরুবাদ সম্পর্কীয় আলোচনা— বেশ উচ্চাঙ্গের হয়েছে। তাতে মসনবীর ভাবধারা অনুসরণ করার পথ সুগম হয়েছে। এইটিই গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্ব। প্রতীকী কাহিনীগুলোর মর্ম ব্যাখ্যাও মনোরম হয়েছে। বিশেষ করে 'মৌলবী'-র মত একজন প্রথিতযশা সাধক ও দ্রষ্টার মসনবীতে মোটামুটি কি কি বিষয়বস্তু রয়েছে তার একটা সাধারণ পরিচয় দিয়ে বাঙালি পাঠকদের বিশেষ উপকার করেছেন— এতে ইসলামী ঐতিহ্য বুঝবারও সুবিধে হয়েছে। আর বর্তমানে আমাদের সমাজে গুরুবাদের যে প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে সম্বন্ধে মৌলানা রুমীর মত একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের চিন্তাধারার সম্পর্কে আসলে এর প্রকৃত রূপ কি

গুরুভক্তি কতদূর চলতে পারে, আর কোথায় এর সীমারেখা টানতে হবে, সে ধারণা স্পষ্ট হয়। কোরান শরীফের কোনও কোনও আয়াতের খণ্ডাংশ বিকৃত ব্যাখ্যা করে শাসকবর্গ ও পীরগণ নিজ নিজ স্বার্থের দেওয়াল দৃঢ় করছেন। প্রধানতঃ কোরানের যে সূরা অবলম্বন করে উপরওয়ালাকে তোয়ায করবার দাবী করা হয়, তার শেষাংশের দিকে লক্ষ্য করে লেখক মন্তব্য করেছেন, "এই নির্দেশ .... সামাজিক সমস্যাদি সমাধানের এক ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ উপায় মাত্র। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও আনুগত্য ইসলাম স্বীকার করে না এবং কোনও ব্যক্তির উপরই সে ঐশ্বরিক প্রভুত্বের মর্যাদা আরোপ করতে পারে না। কাজেই এই আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, কোনও তর্কিত সমস্যায় আল্লাহর আদেশ যাতে সমাজ-জীবনে কার্যকর হয় তজ্জন্য 'উলিল আমর্'-এর (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের) আনুগত্য করা বিশ্বাসীদের কর্তব্য।"

এ পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল। বিভিন্ন বিষয়ক্ষেত্র থেকে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে :

(১) এইসব গুরুবাদী সম্প্রদায় খৃষ্টান ত্রিত্ববাদ ও সম্ভবতঃ ভারতীয় উৎস "হামাউস্ত" (সোহং বা অবতারবাদ) তত্ত্বকে ইসলামী চিন্তার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। অবতারবাদ ব্যতিরেকে 'ইমাম-বাদ'-কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। .... পরম শ্রদ্ধেয় জুনায়াদ বাগদাদীর শিষ্য মনসুর হল্লাযের "আনাল হক্ক্" বাণীকে হামাউস্ত-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে মুসলমান ধরিয়া লইয়াছে। (পৃঃ ৩৮)

(২) নানা উপাখ্যানের ভিতর দিয়াই তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করিতে চাহিলেও মূলতঃ তিনি ছিলেন কবি এবং গীতিকবি। তাই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে তাঁর আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বসিত কবিমনের গীতিকবিজনোচিত মেজাজটি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রুমী যদি হাফেজের মত কেবলমাত্র গীতিকবিই হইতেন, তবে কাহিনী হইতে এই সকল প্রয়াণের মধ্যে শুধু স্বগতোক্তিই ধ্বনিত হইত। কিন্তু রুমী একজন প্রথম শ্রেণীর গীতিকার হওয়া সত্ত্বেও দার্শনিক ছিলেন। (পৃঃ ৪৩)

(৩) প্রাচীরের ছায়া যেমন দীর্ঘতর হইয়া পুনরায় ছোট হইতে হইতে প্রাচীরের নীচেই ফিরিয়া আসে, কণ্ঠস্বর যেমন পর্বতের গাত্রে প্রতিহত হইয়া উচ্চারণকারীর কাছেই প্রত্যাবৃত হয়, তেমন প্রত্যেক কর্মের প্রতিফলও কর্মীর কাছে ফিরিয়া আসিবে। (৫০ পৃঃ)

(৪) অনুবাদ : বুদ্ধি জিবরাইলের মত বলে, হে মুহম্মদ (সঃ) শুনুন, আমি যদি আর একপদও অগ্রসর হই তাহা হইলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব। স্বর্গীয় দূত জিবরাইলের সঙ্গে কবি বুদ্ধিকে উপমিত করিয়াছেন। বুদ্ধি সম্পর্কে মৌলানার অভিমত যে বিরূপ নয় তাহা এই উপমা প্রয়োগেই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে বুদ্ধিকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। বুদ্ধি স্বর্গীয় জিবরাইলের মতই সত্যের সংবাদ বহন করে ও মেরাজের পথ প্রদর্শক হয়। তবু মানবাত্মার চূড়ান্ত সম্ভাবনার সামনেই তার গতিপথ সীমিত। (পৃঃ ১০৬)।

(৫) ফুল যেমন কুঁড়ি হইতে পুষ্প-পরাগে বিকশিত হইয়া নিজেকে সফল করে, মানুষকেও তেমনি হইতে হইবে। কেন বিকশিত হইতে হইবে, পূজার জন্য দেবতার পায়ে নিবেদিত হইতে হইবে কিনা তাহা জানিবার প্রয়োজন ফুলের নাই। এই জানায় তার বিকাশের আনন্দই মাটি হইবার সম্ভব। (পৃঃ ১২৪)

(৬) বৈরাগ্য ও তোপবাদ এই দুই মনোভাবের একটিও ইসলামী মনোভাব নয়— রুমীর এই মত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সর্বজনীন দায়িত্ব— পার্থিব জীবনের এইসব

দারিদ্র যথাযথভাবে পালন করিতে গিয়া ক্ষুদ্র অহংসত্তা হইতে ব্যক্তির যে মুক্তিলাভ ঘটে ও জীবন সম্পর্কেও তারমধ্যে যে এক বিশ্বজনীন নূতন অনুভূতির জন্ম হয়, তারই বিকাশ ইসলামের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার সাধনাই ধর্মের সাধনা। ইহা একান্তভাবেই বৈরাগ্যের পরিপন্থী ও জীবনের সহায়ক। (পৃ. ১৩৫)

(৭) চির অশান্ত মানবাত্মার এই বিরহবোধ যার মধ্যে জাগিয়াছে, মসনবী কাব্য তারই জন্য। তারই জন্য এর অসংখ্য কবিতা কাহিনী ও সাদৃশ্য-উপমা। তারই জন্য আত্মিক শিক্ষক ও জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের অনসন্ধানের সমস্যা। মসনবী কাব্যের পাঠকের চোখে জাগিয়া উঠিতেছে অতিক্রান্ত এক দীর্ঘ পথরেখা ; সেই পথের পাশে জাগিয়াছে অজ্ঞানতা ও লোকাচারের অন্ধকার অরণ্যানী, সেই পথে আছে নরকসদৃশ প্রবৃত্তির ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড ; ছলনা, মোহ, লোভ ও লালসার জাল পাতা রহিয়াছে সেই পথের দুধারে। কিন্তু পাঠকের মনে সেই অতিক্রান্ত পথের যে স্মৃতি জাগে তা ভয় কিংবা আত্মনিগ্রহ নয়, সেই স্মৃতি ফোরাতের অমল জলধারার মত,— সুগন্ধবাহী দখিনা বাতাসের মত। সেই স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে এক মধুর বেদনা, এক অপার্থিব পরম আকাঙ্ক্ষা। (পৃঃ ১৬৮)

এই উদাহরণগুলোর থেকে প্রকাশ পাচ্ছে লেখক-কবির ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, মনোভঙ্গী এবং মৌলবীর মসনবীর সুরের সঙ্গে সহস্পন্দনশীল একটি মরমী প্রাণ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের একটা বিস্মৃত-প্রায় সুরকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন বলে আমি কবি মনিরুদ্দীন ইউসুফ সাহেবকে স্বাগত জানাই।

সাহিত্য পত্রিকা
শীত ১৩৭৩

# কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

**কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ : কাজী আবদুল ওদুদ।** ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য— বারো টাকা।

সুবিখ্যাত মনন-সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ'-এর প্রথম খণ্ড বিগত আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কবিগুরুর বাল্য ও কৈশোরের জীবন পরিচয় এবং কিশোর বয়সের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য 'বনফুল' (১৮৭৪ খ্রিঃ) থেকে আরম্ভ করে, নব যৌবনের 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'-র যুগ পার হয়ে, পরিণত যৌবনের 'এবার ফিরাও মোরে'-র যুগের 'নৈবেদ্য' পর্যন্ত কবির ভাব ও ভাষার বিবর্তন দেখান হয়েছে। বাস্তবিক, কবির, স্বদেশীয় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, ও বৈদেশিক অভিজ্ঞতা তাঁর মানসিক গঠনে কিভাবে ক্রিয়া করেছে, তার তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ উদঘাটনের ফলে বইখানা বাংলা সাহিত্যে কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান বলে গণ্য হবে। বইখানার আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠা। শীঘ্রই এর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবে, তাতে কবিগুরুর চল্লিশোর্ধ বয়সের সাহিত্যসৃষ্টি জীবন-দৃষ্টি ও বিবিধ কৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা থাকবে। আমরা সেই খণ্ডের জন সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

রবীন্দ্রসাহিত্য মহাভারতের মতই বিশাল, তাই এই সাহিত্যের যথাযথ বা যথাযোগ্য পরিচয় দেওয়া, কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন রসগ্রাহী মনীষীরই করায়ত্ত। ওদুদ সাহেব সারা জীবন অতিশয় শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা করেছেন, বহুকাল এ বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন, আর দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের (বিশেষ করে কবিগুরু গ্যেটের) জীবন ও রচনার সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। তাই কতকটা উচ্চগ্রাম থেকে যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পেরেছেন। কোন কোন স্থলে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের মতের সহিত তাঁর মত ঠিক মেলে নাই। সেসব স্থলে তিনি যুক্তি তথ্য ও উদ্ধৃতি দিয়ে আত্মমত সমর্থন করেছেন। অবশ্য কাব্য-সাহিত্যই হোক বা অন্যপ্রকার রসবস্তুই হোক, পাঠকের রুচি ও প্রকৃতি ভেদে স্বাদের পার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় নানা মুনির নানা মত ও ব্যাখ্যা সঙ্গে পরিচয় করলে, আমার মত সাধারণ পাঠকের সুবিধার কথা বৈ কি? আমরা অথরিটি কোট করে সগর্বে আমাদের মনের মত যেকোন মতকে অতিশয় প্রবলভাবে প্রকাশ করতে পারব।

গ্রন্থখানিতে বহুসংখ্যক বাছা বাছা উদ্ধৃতির মধ্যদিয়ে কবিগুরুর মনোভাবের নিজস্বতা, প্রকাশের মনোহারিতা, হৃদয়ের সহজ প্রীতি, জাতীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ প্রভৃতির সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারলাভ হয়। এইভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পড়বার-বুঝবার ও উপভোগ করবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কবিগুরুর জীবন-কথা, পত্রালাপ, কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার সাহায্যে গ্রন্থকার একটা সামঞ্জস্যময় চিত্র

গড়ে তুলেছেন, যাতে করে কবি ও কবির কাব্যকে সামগ্রিকভাবে জানবার পথ সুগম হয়। কবির রচনা বুঝবার অনেক সূত্র কবি নিজেই তাঁর বিবিধ রচনার ভিতর, বিশেষ করে, চিঠিপত্রে রেখে গিয়েছেন। এইসব অবলম্বন করে গ্রন্থকার বেশ বৈজ্ঞানিক পন্থায় দোষ-গুণ উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর থেকে পাঠকেরাও সম্ভবত সুষ্ঠু সমালোচন-রীতি সম্বন্ধে অনেকটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন ; অন্তত আমি নিজে এতে বেশ কিছুটা উপকার লাভ করেছি,— একথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। মোটকথা, উদ্ধৃতির গুণে কবির জবানী কবি-মনের সৃষ্টি-লীলার পরিচয় পাই, আর কবির জীবন যেমন অলক্ষ্য, অথচ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, আমর যেন নিজ নিজ জীবনেও তার খানিকটা আভাস দেখতে পেয়ে আনন্দিত হই। গ্রন্থকার— 'মন্দ নয়, ভাল, বেশ ভল, অপূর্ব সুন্দর' প্রভৃতির লক্ষণ উল্লেখ করে বিভিন্ন রবীন্দ্র-রচনার যথাস্থান নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। কবির দেওয়া ব্যাখ্যা পড়ে একরকম ভাল লাগতে পারে ; আবার আর একরকম ভালোলাগা আছে, সে হচ্ছে পাঠক নিজের সহজাত অনুভব শক্তি দিয়ে যতটুকু অন্তরে গ্রহণ করতে পারে। আমার দুটোতেই লোভ হয়। অবশ্য নিজের মনে যে সহজ ছাপ পড়ে, তা-ও ফেলবার মত জিনিস নয়, আর ভাগ্য-ক্রমে তা যদি কবির ব্যাখ্যার সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়, তাহলে দ্বিগুণ উল্লসিত হই, আর বেশ খানিকটা গৌরব অনুভব করি। অনুভূতি-জাত কাব্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, 'ব্যক্তিগত অনুভূতির দাম কাব্যে কম নয় ; তবে যে অনুভূতির অন্তরে রয়েছে একটি গভীর সত্য, যার প্রকাশ সাধারণত মহত্তর হয়' (পৃষ্ঠা-৩০৮)। এই ধরনের পরখ-দণ্ড (বা মাপকাঠি) উল্লেখ করে করে করে তার সাহায্যে ওদুদ সাহেব উৎকর্ষের মাত্রা নির্ণয় করতে চেয়েছেন। বাস্তবিক, উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাপকাঠি অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক যুগের চেয়ে এত অধিক অগ্রবর্তী ছিলেন যে অনেকেই তাঁকে ঠিক মত বুঝতে পারেননি। বোধ হয় এই বিশেষ কারণেও সময় তাঁকে বাধ্য হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে— আর, বড়র কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যা সহজেই গুরুগিরির মত হয়ে পড়ে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে কবিগুরু ছেলেবেলা থেকেই নিজের চিন্তা-ভাবনা লিখে রাখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এটা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে। লিখতে লিখতেই চিন্তার স্পষ্টতা আসে, আর লিখতে হলে বিষয় আর ভাবনা দুয়েরই প্রয়োজন হয়। কবির স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে অশেষ কৌতূহল আর নিয়মিত লিখবার অভ্যাস যুক্ত হওয়ায়, যৌবনে পদার্পণ করতে করতেই তিনি সমসাময়িক যশস্বী লেখকদের সমকক্ষ, এমনকি অবাধ চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রায় সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে ওদুদ সাহেব বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকল গল্পের, সকল কাব্যের, সকল পত্রের, সকল কথার, সকল ভাবের হুলিয়ানামা দেবার দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছেন। কাজটা কঠিন হলেও তিনি এতে বহুলাংশে সফল হয়েছেন বলতে হবে।

লেখকের প্রকাশভঙ্গিতে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (বা বাঁকামি) আছে। সেটা অবশ্য প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। তাঁর ভাষা পড়লেই বিনা দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় কার লেখা। এ-টি সুবিদিত কথা, উদাহরণ দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তিনি মোহিত লাল মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনার উপরে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, আর কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমভাবুক হিসাবে প্রধানত কালিদাস, গ্যেটে, হাফিজ, রুমী,

কীট্‌স্‌ ও টলস্টয়ের কোন কোন রচনাংশ উল্লেখ করে (বা-না করেও) এঁদের সঙ্গে কবির সাযুজ্য দেখিয়েছেন।

কবি হয়ত বিশেষকে উপলক্ষ করেই বহু কাব্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে বিশেষকে অতি আগ্রহে টেনে-হেঁচড়ে সভাস্থলে দাঁড় করাবার চেষ্টা আমার কাছে তেমন ভাল মনে হয় না। সেই ব্যক্তি-বিশেষ অনামিকা থেকে গেলেই বা কি? তিনি যিনিই হোক না কেন, তিনি, কাব্যের মধ্যদিয়েই আমাদের কাছে অতি পরিচিত। বিশেষ করে, এ সম্ভাবনাও কখনো এড়ান যায় না যে, একাধিক গরবিনী মনে মনে ভাবতে পারেন, "কবি তাঁর উর্বশী বা বিজয়িনী বা অপর কবিতা আমাকে উদ্দেশ্য করেই লিলেছেন।" এমন ক্ষেত্রে এঁদের আশা কল্পনা নির্বাপিত করে দিয়ে যদি বলা হয, খুব সম্ভব, কবির এই কবিতার উৎস হচ্ছে অমুক দেশের এক পাথরের মুর্তি বা অমুক লাস্যময়ী রূপসী তাহলে নিষ্ঠুরতা হয় না কি? অবশ্য কবি যদি নিজেই এমন কথা ফাঁস করে দিয়ে থাকেন (যা আমার কাছে প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়) তাহলে স্বতন্ত্র কথা। কবি নিজেই বিভিন্ন কালে একই কবিতা বা কাব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা ভাব-রূপ নির্দেশ করেছেন ; এর কোনটাই হয়ত অগ্রাহ্য করবার মত নয়। কবির কাব্যে বা অন্যান্য রূপ-সৃষ্টিতেও অনেক বিষয় শুধু আভাসে ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়। ও-গুলোর চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা স্থির নির্দেশন অনেকটা অহেতুক বা অলস কৌতুহলের মতই মনে হয়। আবার, গান্ধারীর আবেদন-এর মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাস থেকে 'ইংরেজ' 'ভারতবাসী' ইত্যাদি ভাব-রূপ আমদানী করবার তেমন আর্টিস্টিক হেতু দেখতে পাইনে।

পাঠকের সুবিধার দিক দিয়ে দেখলে বইখানার একটি ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে। সে হচ্ছে, সুচিপত্রের কার্পণ্য। এমন একখানা বৃহদাকার পুস্তকে— বিশেষতঃ প্রামাণিক গ্রন্থে ধরুন, কেউ যদি জানতে চায় 'বন্দীবীর' বা 'সতী' সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অভিমত কি, তাহলে, তা' খুঁজে বের করতে তাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে। কোন কবিতা বিষয়বস্তু কোন বইয়ে আছে, তা' মনে রাখা বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও হয়ত বেশ কঠিন। তাই, সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য বইখানা আরও অনেক পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করলে হয়ত এর উপকারিতা বৃদ্ধি পেত। তবু, বলতেই হবে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন ব্যাপারে এবং সুচয়িত বহুবিশিষ্ট অংশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থখানা বিশেষ কার্যকরী হবে। এমন একখানা মূল্যবান রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করে ওদুদ সাহেব সাহিত্য রসিক পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০

## নজরুল রচনা-সম্ভার

কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত নজরুল ইসলামের কয়েকটি (১) কবিতা ও গান, (২) নাটিকা, (৩) প্রবন্ধ ও আলোচনা, (৪) অভিভাষণ ও (৫) চিঠিপত্রের একটি সংকলন গ্রন্থ পাঠ করে বিশেষ আনন্দ লাভ করলাম। ইতিপূর্বে এগুলো কবির বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, বা পুরাতন সাময়িক পত্রিকাদির পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে ছিল বলে পাঠক-সাধারণের পক্ষে সহজ-লভ্য ছিল না। এখন আমাদের প্রিয় কবি নজরুল ইসলামের এইসব রচনা একত্র গ্রথিত হওয়াতে নজরুল-সাহিত্যের সামগ্রিক প্রকৃতি নির্ণয়ের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। সম্পাদক এজন্য অবশ্যই সমুদয় বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কবি নজরুলের একজন বিশিষ্ট বন্ধু হিসেবে আবদুল কাদির সাহেব যথার্থ বন্ধুর কাজই করেছেন। তাছাড়া কবি-পরিচিতিতে নজরুলের জীবন ও সাহিত্য, কাব্য, গীতিকবিতা, সঙ্গীত, ছোটগল্প প্রভৃতির উপর স্বচ্ছ আলোকপাত করে অমর কবির জীবনদর্শন ও সাহিত্যদর্শের মর্ম অনুধাবন করতেও যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

কবিতা, গান, নাটিকা প্রভৃতি সংগ্রহ করতে ইংরেজি ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অনেক পুরাতন পত্রিকা,— নবযুগ, জয়তী, সওগাত, অভিযান, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রবাসী, বঙ্গনূর, মিল্লাত, সাধনা, ছন্দা, মোহাম্মদী, প্রাতিকা, কৃষক প্রভৃতি এবং ১৯৫৮ সালের দৈনিক ইত্তেফাক— ঘাঁটতে হয়েছে ; আর বহু সাহিত্যানুরাগী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও পত্রালাপ করতে হয়েছে। এসব গবেষণার কাজ যে কত ক্লেশ-সাধ্য, তা ভুক্তভোগীরা অবশ্যই জানেন।

সংগৃহীত কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও অভিভাষণের অনেকগুলোতেই পরিণত বয়সের নজরুলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাতে পারমার্থিক তত্ত্বের প্রাধান্য ঘটেছে। এসব রচনা ১৯৪১ সাল বা তার কিছু আগে-পরের রচনা। রুগ্ন নজরুলকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা নাকি বলেছিলেন, কবির মস্তিষ্কের কতকগুলো কোষশিরা শুকিয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে তাঁর তৎকালীন মনোভাবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে কিনা, তা এখন জানবার তেমন সুযোগ হয়ত নেই। কবির 'মধুরম', 'যদি আর বাঁশী না বাজে' প্রভৃতি অভিভাষণে মৌনতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এ সময়টা তিনি যেন তাঁর "সর্ব-অস্তিত্ব, জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ" তাঁর পরম-সুন্দরের কাছে নিবেদন করবার জন্য একান্ত উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছেন। এ রহস্য কে ভেদ করবে?

আবার প্রায় ঐ সময়েরই 'শ্রমিক মজুর' কবিতায় আমরা যেন সাবেক নজরুলেরই উগ্ররূপ দেখতে পাই :

> "ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমরা পরো
> হ্যাট্, প্যান্ট, কোট ;
> শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা

তাদের বলি "হি-গোট"।
মজুরের ভাষা বিঁধিবে অঙ্গে
খেজুর কাঁটার মত?"
গলা কেটে রস খাও, হবে না ক
অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত?" (পৃঃ ৬)

"রচিয়া ধর্মশালা অধর্মী ধর্মেরে দেয় গালি,
রাম রাম ওরা শেখায় মাখায়ে
মানুষেরে চুণকালি।" (পৃঃ ১৭)

"নহে আল্লাহর বিচার এ ভাই, মানুষের অবিচারে
আমাদের এই লাঞ্ছনা, আজি বঞ্চিত
অধিকারে।" (পৃঃ ১৭)

মনটা কতখানি তিক্ত হলে এইসব ঝাঁজালো কথা আসে, তা সহজেই অনুমেয়। কবি নিজেকে শ্রমিক ও মজুরদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দিয়েছেন ; তাই খেজুরের কাঁটার মত শানিত বাক্য ব্যবহার করেছেন সেইসব অত্যাচারী, ভণ্ড, প্রবঞ্চকদের প্রতি, যারা সাধারণ মানুষের গলা কেটে রস খায়। এখানে মজুরের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ভাষায় যে প্রবল ঘৃণা ও আক্রোশের প্রকাশ হয়েছে, তাকে 'সুসভ্য' 'সংযত' সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করা সঙ্গত নয়— বোধ হয় এখানে "হি-গোট"-ই সু-প্রযুক্ত শব্দ। নজরুল নিজেই 'আর্ট-এর প্রশ্নে নিম্নোক্ত কৈফিয়ৎ দিয়েছেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর 'চিঠির উত্তরে :

"এই সৃষ্টি করলে আর্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে"— এমনিতরো কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বল্গা কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল— একথা মানতে আর্টিষ্টের হয়ত কষ্টই হয়। প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে।"

"এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুরতাললয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে,— ও কান্না হাত-তালি দেবার মত কান্না হল না বাপু, একটু আর্টিষ্টিকভাবে নেচে নেচে কাঁদ ! সকল সমালোচনার উপরে যে বেদনা তাকে নিয়েও আর্টশালা রক্ষী— এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চীৎকারে হুইটম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।"— এই কৈফিয়ৎ বা যুক্তির সারবত্তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে সব রচনা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে তার সবগুলোই কি উৎকৃষ্ট হয়েছে? অনুৎকৃষ্টগুলো বেছে বা কেটে-ছেঁটে দিলে কি চলত না ? এর উত্তর এই যে, কোন কবি বা সাহিত্যিকেরই সব লেখা কখনও উৎকৃষ্ট হয় না,— উৎকর্ষের উঁচু-নীচু থাকবেই। নজরুলের লেখা এখন কেটে-ছেঁটে শুদ্ধি করবার দিন গত হয়ে গেছে। প্রথম প্রকাশকালে যদি কিছু শোধরান হয়ে থাকে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু উপরে আমরা দেখেছি, নজরুলের আর্টের মাপকাঠি ঠিক গতানুগতিক নয় ; তাই গতানুগতিক সম্পাদক বা সমালোচকরা ওতে হাত দেবে, এটা কবির অভিপ্রায় নয়। কাজেই বর্তমানে সেটা অ-কর্তব্য। বিশেষ করে কবি বাঙলা ভাষাভাষী সকলের অতিশয় প্রিয়। প্রিয়জনকে দোষগুণ-শুদ্ধই গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া

ভাষার বাঁধুনি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। আমরা আশাকরি, নজরুল ইসলাম বহু শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। আজকের দিনে হয়ত মনে হতে পারে, তাঁর গদ্যে (বা পদ্যে) কোনও কোনও স্থানে দুই-একটা শব্দ এদিক-ওদিক করে দিলে বা একটু বদলে দিলে ভাল শুনায়। কিন্তু কিছুকাল পরে নিশ্চয়ই বাক্যরীতির পরিবর্তন হবে। (রামমোহন রায় কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করলেই একথা স্পষ্টই বুঝা যায়।) আগামী অর্ধ শতাব্দীতে না হলেও এক শতাব্দীর মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের বর্তমান ভাষা-ব্যবহার-রীতি বদলে যাবে, তখন এ ভাষার একটা ঐতিহাসিক মূল্য হবে। তখনকার ঐতিহাসিকরা অবশ্যই নজরুলের আসল রূপটাই দেখতে ভালবাসবেন, নকল রূপ বা সাজানো রূপ নয়। তাঁরা নজরুলের অকৃত্রিম ভাষা থেকেই বুঝতে পারবেন, সাহিত্যে তাঁর কি স্বাতন্ত্র্য ছিল, প্রকাশভঙ্গীর প্রগলভতার মধ্যেও কি অসাধারণ স্বাভাবিকতা ছিল ; আর তখনকার দিনে ভব্যতার আনুগত্য-বর্জিত এই ভাষাই যে আর্টের প্রকৃষ্টতর রীতি বলে গণ্য হবে না তাই বা কে বলতে পারে?

নজরুল ইসলামের অভিভাষণগুলোর মধ্যে অনেক কাজের কথা ও গঠনমূলক কথাও রয়েছে। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে :

"আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবী আছে— এ শিক্ষাই ইসলামের।" (স্বাধীন চিত্ততার জাগরণ, পৃঃ ১২৮)। ঈদের শিক্ষার এই সত্যিকার অর্থ আর কোন সাহিত্যিক এতখানি প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন বলে আমার ত মনে পড়ে না।

"জরাগ্রস্ত সেনাপতিদের বাহন আজ দেশের যুবশক্তি। এই যুবকদের কাঁধে চড়ে এঁরা যশঃখ্যাতি—ঐশ্বর্যের ফল পেড়ে খাচ্ছেন। বাহক যুবকবৃন্দ তার অংশ চাইলে বলেন— আমরা ফল খেয়ে আঁটি ফেললে সেই আঁটিতে যে গাছ গজাবে তারই ফল তোমরা খেয়ো। এই আঁটির আশায় যুবকদের কণ্ঠ করার জয়গান করে চেঁচাতে চেঁচাতে আজ বাঁশের চাঁচাড়িতে পরিণত হয়েছে।" (আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ, পৃ. ১৩৪)।

'পচা অতীতে'র ভক্ত-বাহী বর্তমান যুবক ছাত্রদলের আচরণ কবির কাছে বড়ই বিসদৃশ ঠেকেছে। তাই কী জোরালো কাব্যোচিত ভাষায় কবি বিদ্রূপবাণ হেনেছেন। নজরুলের অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই বাণী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষীয়েরা যদি ছাত্রদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে হয়ত শিক্ষার মান অনেকটা উন্নত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবন-গঠন ত্বরান্বিত হতে পারে।

"চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে কবি নজরুলের প্রীতি উৎসারিত হয়ে উঠেছে সমুদয় প্রতিশ্রুতিশীল নবীন সাহিত্যিকের প্রতি। বাস্তবিক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম তাঁর যুগের নওজওয়ান সাহিত্যিকদের মধ্যমণি ছিলেন। তিনি নবীন ও প্রবীণ বহু সচেতন সাহিত্যিকের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন, তাঁদের প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন, নিজের ধ্যানধারণার কথা জানিয়েছেন, এবং অনেককেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আনোয়ার হোসেনকে লিখিত পত্রে কবি বলেছেন, "ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতা মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর আর সেথা কবি জন্মাল না।" (পৃঃ ১৫৪)। এখানে কবি আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মৌলভী ও কাব্য-সমালোচকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লিখিত পত্রে কবি বড় বড় কবির কাব্য পড়ার সুপারিশ করছেন এই বলে যে তাতে "কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার ধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে পারার যে উদ্বেগ, তা সহজ হয়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। নইলে তার সৃষ্টির বেদনা মনের মধ্যেই গুমরে মরে।" এরপর কবি নিজের লেখা সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং, তা আমার লেখায় পাবে। অবশ্য, লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার। ঐ খানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী লেখা হয়ে গেল। .... সূর্য যখন ঘোরে তখন তাকে দেখি আমরা শুভ্র জ্যোতির্ময়রূপে। সূর্যের চলাটা প্রতারণা করে আমাদের চোখকে— তার বুকের রং দেখতে দেয় না সে। কিন্তু ইন্দ্রধনু যখন দেখি, ওতেই দেখতে পাই ওর গোপন প্রাণের রং। ইন্দ্রধনু যেন সূর্যের লেখা কাব্য।" এখানে কবি কী সুন্দরভাবে কবি ও কাব্যের মধ্যেকার সূক্ষ্ম-পার্থক্যের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই তত্ত্বটা বুঝতে না পারলে অনেক সময় কবিকে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা হয়ে পড়ে। কবির অনেক চিঠিপত্রের ভিতরে তাঁর কাব্য-রূপই আমরা দেখতে পাই। হয়ত কবি কোনও কাব্য লিখলেন দৃশ্যতঃ কোনও এক নারীকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, এই কাব্য লিখলেন দৃশ্যতঃ কোনও এক নারীকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, এই কাব্য বিশেষ করে ঐ নারীকে লক্ষ্য করেই নয়, বরং কবি মনে জাগরিত কোনও "শাশ্বত-প্রতীক্ষমানা অনন্ত-সুন্দরী"-কে লক্ষ্য করে। আমার বিশ্বাস, কবির অনেক প্রেমাসম্পদাই হয়ত মনে করেন, "অমুক বিশেষ কবিতাটি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।" অবশ্য, তাঁদের মধ্যে এক বা একাধিক নারী-ই হয়ত উক্ত কবিতা-রচনার প্রত্যক্ষ উপলক্ষ হতে পারেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর লিখিত 'চিঠির উত্তরে' কবি নজরুল হিন্দু পাঠক সমাজ ও মুসলমান পাঠক সমাজের মধ্যেকার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কি না কশাঘাত করেছেন সমাজকে, — তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নাই। সংস্কার ত দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেই এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দু জাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসম সাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।" (পৃঃ ১৮৫)—এর উপর টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এটা যে একটা বিষম সমস্যা, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এ-লেখা প্রায় ২০/২৫ বছর আগেকার, কিন্তু বর্তমান অবস্থা-ই যে এরচেয়ে উন্নততর, এমন ত মনে হয় না।

অনেক পত্রে কবি যে বিরূপ অর্থ-কষ্ট ও উদ্বেগের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন, তার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। কোনও পত্রে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের সংঘাত আর বন্ধুদের উপর অকপট নির্ভরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবির অসীম ধৈর্য আর (নির্যাতন-কারীর প্রতিও) উদার ক্ষমার অনেক নিদর্শন এই চিঠিপত্রের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। আরও চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে পারলে সম্ভবতঃ কবির জীবনের আরও বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত হবে।

প্রস্থকার আশা দিয়েছে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে আরও কিছু কিছু নতুন বৃত্তান্ত সংযোজিত হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'কবি পরিচিতি' বেশ সুলিখিত হয়েছে। তবে এখানেও

উদ্ধৃতি দিতে গেলে লম্বা দাস্তান হয়ে পড়বে। তাই সে চেষ্টা আর করলাম না। পাঠক অনায়াসে বইখানার প্রত্যেক পাতায় উদ্ধৃতিযোগ্য বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ দেখতে পাবেন। দেশের তরুণরা চোখ মেলে চেয়েছেন। এইটেই শুভবুদ্ধি জাগবার বা কুসংস্কার ত্যাগ করবার প্রথম সোপান। আমার মনে হয়, এইসব তরুণ লেখকই জন-জীবনে উন্নততর আদর্শের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারবেন।

সওগাত
ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫১

## ক্রান্তিকাল

ক্রান্তিকাল (প্রবন্ধ-পুস্তক) —আবদুল হক প্রণীত : পরিবেশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলোবাজার, ঢাকা-১১০০। ডিমাই সাইজ, ১৩৬ পৃষ্ঠা। দাম : ৩ টাকা।

আবদুল হক সাহেবের 'অদ্বিতীয়া' নাটক অনেকের প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, নাট্যকার হক সাহেবের চেয়েও প্রবন্ধকার হক সাহেবই অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আলোচ্য পুস্তকের প্রবন্ধগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আধুনিক মনোবৃত্তি, প্রচুর তথ্যের সমাবেশ, পারিপার্শ্বিকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বলিষ্ঠ যুক্তি ও সমৃদ্ধ ভাষা। প্রবন্ধগুলোকে চারটি প্রধান পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় : (১) সাহিত্যিক পরিবেশ ও মনোবৃত্তি, (২) সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, (৩) কতিপয় সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ, এবং (৪) গতিশীল সমাজ ও সাহিত্য।

প্রথম পর্যায়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক' প্রবন্ধে বেশ সরল এবং দরদভরা ভাষায় আমাদের সমাজের 'সাহিত্য-বাতিক' রোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে : সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে ধনবান স্বত্বাধিকারীদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ও লেখকের স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী অন্যবিধ সাহিত্য বা অসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হতে বাধ্য হওয়ার নিদারুণ দুঃখ হতাশার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী 'সাহিত্যিক মূল্যবোধ' প্রবন্ধে ভাবানৈক্য-দল (রেজিমেন্টেশন), নূতনত্বে সন্দেহ ও ভয়, স্বাধীন পরিবেশের অপ্রতুলতা, সামাজিক অনুভূতির স্থূলতা, আত্ম-সমালোচনার অভাব, কঠোর সাধনায় অনুৎসাহ, পরিণত সমালোচক ও সমঝদার পাঠকের অনস্তিত্ব ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। 'সাহিত্য ও দেশপ্রেম' সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত ও শাসক সম্প্রদায়ের বাংলা সাহিত্যে অশ্রদ্ধার কথার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি'' প্রবন্ধে সাহিত্যিকের সুকোমল মনোবৃত্তি, তীক্ষ্ণ শালীনতাবোধ প্রভৃতি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, রাজা, মন্ত্রী ও সমাজনেতারা যদি সাহিত্যিক রসের অধিকারী হতেন তাহলে তাঁরা অনেকভাবে দেশের শাসন ও নেতৃত্ব করতে পারতেন। 'গ্রন্থাগার' রচনাটিতে গ্রন্থাগারের অনেক গুণের কথা বলা হয়েছে : যেমন, নানা ধরনের বই পড়লে ছেলে-মেয়েদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়, কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয়, 'ভাষা সাহিত্য ও মননশীলতার প্রবহমান ধারার সঙ্গে' পরিচয় হয়, এর ফলে হয়ত প্রতিভারও জন্ম হতে পারে,— যা আমাদের সমাজে নিতান্তই বিরল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে : 'নাটক ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, আমাদের দেশে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে নাটক অপুষ্ট রয়েছে, তার কারণ, এদেশে এর সাহিত্যিক মূল্য একদম বাদ দিয়ে শুধু এর অভিনয়-যোগ্যতা আর দর্শকের হাত-তালির দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এ নীতির দোষ দেওয়া যায় না ; তবু বলতেই হবে, নাটকের জন্য অন্যান্য দেশে যেমন জনসাধারণের রুচির উন্নয়ন করা হয়ে থাকে, আমাদের দেশের লোকসমাজ অনুরূপ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে সিনে-নাট্যের সংযোগ

এর তুলনা করা হয়েছে। 'অনুবাদ নাটক' প্রবন্ধটিতে বিদেশী সার্থক নাটকের অভিনয়যোগ্য অনুবাদের সুপারিশ করা হয়েছে, বিদেশীয় পরিবেশকে বঙ্গায়িত না করেই উপস্থিত করবার যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শিত হয়েছে। 'কালের প্রেক্ষণা' প্রবন্ধে সাহিত্য, নাট্য, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতির মূল্যায়নের পরিবর্তন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য-নির্ভর আলোচনা করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে : মেকি সাহিত্য হয়ত কিছুদিন বেশ জনপ্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু পরিণামে তা' বাসি হয়ে যাবেই ; পক্ষান্তরে সু-সাহিত্য প্রথমে (হোক জনমনের অপ্রস্তুতিহেতু) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও কালক্রমে পাঠকদের মানসিক পরিণতি সাধিত হলে, তখন আবার তা স্বীকৃতি পাবেই ; তবে এরজন্য উপযুক্ত গবেষক থাকা চাই। 'কবিতার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে বর্তমান বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতার কথা বলা হয়েছে, এর শিল্পসর্বস্বতারও উল্লেখ রয়েছে। আবার 'বিশুদ্ধ' কবিতার রস-গ্রহণের জন্য পাঠকদের প্রস্তুত হবার কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ না বুঝেও রস-গ্রহণ করতে হবে, শিল্পসর্বস্ব হলেও তার রস-গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এই 'বিশুদ্ধ' কবিতাটা কী পদার্থ, তার রস-বস্তু কোথায় অবস্থান করছে, একথাটা ভাল করে বুঝে উঠতে পারলাম না,— হয়ত এর কোনও সূক্ষ্মসূত্র থাকতেও পারে।

তৃতীয় পর্যায়ে : 'দুজন কবি-প্রসঙ্গে' সনেট রচয়িতা সুফী মোতাহার হোসেন ও রেয়াজউদ্দীন চৌধুরীর কয়েকটি কবিতার গুণাগুণ বিচার করে, এই বিশেষ দিকে ও এঁদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। অতঃপর 'আনোয়ারা' উপন্যাস ও 'আবদুল্লাহ্' সমাজচিত্রের সমালোচনা বেশ বিস্তারিত, সঙ্গত, যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তবে, 'আনোয়ারা' গল্পাংশের গোটা সাতেক অবাস্তবতার ফিরিস্তির মধ্যে 'কারেন্সী নোট' 'জলে ডুবিয়ে রাখা'-ও একটি। কিন্তু কারেন্সী নোট পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হলে যে কোনও সামান্য বুদ্ধির লোকও হয়ত নোটের তাড়া বেঁধে, তার সঙ্গে কিছু একটা ভারী বস্তু বেঁধেই পানিতে ছেড়ে দেবে, একথা হয়ত স্পষ্ট করে উল্লেখ না করলেও একে বিশেষ সাহিত্যিক ত্রুটি বলে ধরা যায় না। 'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী' ও 'নজরুলের গল্প ও উপন্যাস'-এর সমালোচনা ও গুণ-গ্রাহিতা নানা দিক দিয়ে বেশ উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় হয়েছে। 'নজরুলের সমাজচিন্তা প্রবন্ধে নজরুলের স্বাভাবিক মানব-কল্যাণ বৃত্তির আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানতঃ সম্প্রতি প্রকাশিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও চিঠিপত্র অবলম্বন করে। এটিও তথ্যবহুল ও সুলিখিত হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে 'রাসেল ও যাজক সম্প্রদায়'-এ বেশ মজার মজার কুসংস্কারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সমাজের রক্ষণশীল দল চিরকাল কিভাবে সমাজের উন্নতি ও সংস্কারের বাধা দিয়ে থাকে তার অনেক কৌতুককর তথ্য এতে আছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ (বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে) লেখকের হঠাৎ ইকবালের কথা মনে হয়েছে। কেন ? নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, কাজী আবদুল ওদুদ, শরৎ চ্যাটার্জির লেখায় বহু সামাজিক ও পৌরাণিক নাটকে ধর্মধ্বজীদের কারসাজি ও স্বার্থসিদ্ধির কাহিনীর একটাও কি মনে পড়ল না? মোটকথা, বুদ্ধি-দীপ্ত লেখকের এই একদেশদর্শিতা আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে। 'নব্য মুসলিম সমাজ' প্রবন্ধেও চলন্ত জগতের বিকাশশীল ধর্ম ইসলামের আনুষঙ্গিক পর্দা, সুদ-বীমা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সামাজিক নিয়মের ক্রমপরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধটা অন্যান্য প্রবন্ধের চেয়ে বেশ খানিকটা ঝাঁঝাল হয়েছে। এতে হয়ত প্রবন্ধগুলো অন্তর্গত সামঞ্জস্যের কিছু হানি হয়ে থাকবে। 'সাহিত্যিকের সমস্যা' শীর্ষ শেষ প্রবন্ধে

সাহিত্যিকের জীবিকার্জনের প্রশ্ন নিবেদিত হয়েছে। তাছাড়া বলা হয়েছে সাহিত্যিক পরিবেশ বজায় রাখবার জন্য তাদের আর্থিক প্রয়োজন অন্যের চেয়ে অধিক। এ প্রবন্ধটিও তথ্য-সমৃদ্ধ। তবু মনে হয়, 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক' ও 'সাহিত্যিক মূল্যবোধে'র মধ্যেই এর প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে। তাই, এটিকে সহকারী বা পরিপোষক প্রবন্ধ বলা যেতে পারে।

প্রবন্ধগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, লেখক পারিপার্শ্বিক ঘটনাদি ও বৈদেশিক সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন দ্বারা অনেক তথ্য ও জ্ঞান সঞ্চয় করে, সরল ভাষায় নিজের মতামত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এই সঙ্গে স্থানে স্থানে বেশ খানিকটা শ্লেষ ও উত্তাপ থাকলেও মোটের উপর তাঁর ধীর-যুক্তিবাদিতা স্বীকার করতেই হবে। ভাষায় বৈশিষ্ট্য আছে, কচিৎ একটু মুদ্রা-দোষও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা এত সামান্য যে প্রবল চিন্তাস্রোতে তা' কোথায় ভেসে যায়, মনকে স্পর্শ করবার অবকাশ পায় না। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সে সবের নিদান কোথায়, প্রতিকার কি, ইত্যাদিও যথাসম্ভব প্রদর্শিত হয়েছে। নিছক চিন্তা হলে হয়ত বক্তব্য অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ত ; কিন্তু প্রচুর দৃষ্টান্তের আশ্রয়ে চিন্তাগুলো বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ একটা মস্ত সুবিধা বা লাভ। একটি স্থলে লেখকের ভাষা আমার কাছে অসরল বা কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে। সে বাক্যটি এই : "সাহিত্যের ইতিহাসের এই বহুলব্ধ অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন রসজ্ঞদের গ্রহণশক্তির খর্বতা অন্যদিকে তেমনি সৎসাহিত্যিকের মৃত্যু-নিরপেক্ষতা এবং বহুবিচিত্র প্রকাশরূপ সপ্রমাণ করে।" (পৃঃ ৫৬) এখানে খুব সম্ভব, 'মৃত্যু-নিরপেক্ষতা' শব্দের অপ-প্রয়োগেই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। নজরুলের ভাষায় জিজ্ঞাসা করা যায়—

"কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে
শোভিত নাকি কপোল ও কালো তিল নহিলে।"

বাক্যটা উল্লেখ করা গেল, তিলকে তাল করবার জন্য নয়, বরং মধুর বৈষম্যের দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই।

পরিশেষে বক্তব্য, বইখানা পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। একখানা সুখপাঠ্য প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানাই।

মাহে-নও
কার্তিক ১৩৭০
অক্টোবর ১৯৬৩

# ইন্দো-পাক সঙ্গীতের ইতিহাস

ইন্দো-পাক সঙ্গীতের ইতিহাস। অধ্যাপক আবদুল হালীম, এম.এ., পিএইচ.ডি. প্রণীত, মূল্য ৩.৫০ টাকা। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২; এসিয়াটিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক—গ্রন্থকার।

বইখানা বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী ভাষায় লিখিত তেরটি প্রবন্ধের সমষ্টি। এর কোনও কোনওটি বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার লেখা, আবার কোনও কোনওটি পুস্তক প্রকাশের দুই-এক বৎসর আগেকার। বিষয়বস্তু পাক-ভারতীয় সঙ্গীত, সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ, সঙ্গীতগ্রন্থ, সঙ্গীতরীতি ইত্যাদি। প্রতি পৃষ্ঠায় সঙ্গীতের প্রতি গ্রন্থকারের গভীর অনুরাগ, তথ্য-সংগ্রহে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার এবং যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রবন্ধাবলীর একত্র সমাবেশে রচিত বলে, বইখানিতে স্বভাবতই অনেক তথ্য একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে—প্রধান কথাগুলো ভাল করে মনের ভিতর বসবার সুযোগ পেয়েছে।

সঙ্গীতের মত মনোহর আর্টের প্রতি জনসাধারণের ভালবাসার আকর্ষণ থাকলেও বোধ হয় হাজার-করা নয়শ' নিরানব্বই জনই এতে প্রকৃতপক্ষে অনুরাগী নয়, এমনকি, তাদের রসাস্বাদেরও বোধ নাই। তাই, সঙ্গীতের মানোন্নয়ন করতে হলে শিশুশিক্ষায় কিছু সঙ্গীত ও সুর-সহযোগে আবৃত্তির ব্যবস্থা থাকা চাই। গ্রন্থকার একথা উল্লেখ করেছেন—বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে এ-বিষয় সংযোজিত হয়েছে তা-ও বলেছেন। এ-টি আশার কথা বটে, কিন্তু কয়েকটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছাড়া সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সঙ্গীত-শিক্ষা ব্যাপারে কোনই অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। পাক-ভারত উপমহাদেশে কোথায় কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, গ্রন্থকার তার তালিকা দিয়েছেন; কিন্তু এ ব্যাপারে পাকিস্তানে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা যায় না। এমনকি, আর্ট কাউন্সিল যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, তা-ও প্রায় ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে বর্তমানে সঙ্গীত-সাধনা কি স্তরে আছে, তার কি পরিমাণ পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে; এবং ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি মার্গ-সঙ্গীতে কোন্ কোন্ গুণী, কোন্ কোন্ যন্ত্রী, কোথায় কিভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ (Essays on History of Indo-Pak Music by Dr. Abdul Halim M. A. Ph-D] দিয়ে গ্রন্থকার তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ বর্ধন করেছেন, আর প্রতিষ্ঠিত গুণিগণকেও বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত করে দিয়েছেন। এতে উভয় অঞ্চলের গুণীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারে, এমন আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। অন্তত শিক্ষানুরাগী তরুণ শিল্পীরা কোথায় কার কাছে গেলে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে রেয়াজ করবার সুবিধা পেতে পারেন, এ সম্বন্ধে অনেকটা সুস্থির ধারণা করে নিতে পারবেন।

বলাবাহুল্য, বইখানাতে পাক-ভারতের কেবল মার্গ-সঙ্গীতের বিবরণই দেওয়া হয়েছে। উন্মার্গ সঙ্গীতের দ্বারা যাতে তরুণ যুব-সম্প্রদায় অতি মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে না পড়েন, সেজন্য গ্রন্থের শেষদিকে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রথমত সিনেমা-সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয়ত উৎসব-আনন্দের ক্ষেত্রে মিলিটারী ব্যাগপাইপ বা স্কটিশ ব্যাণ্ড আমদানীর আধুনিক রুচির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। বিবাহ উৎসবাদির মত ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের দেশীয় যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের উপযোগিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। জাতীয় গৌরবের দিক দিয়ে গ্রন্থকারের মত অবশ্যই গ্রহণীয়। এইবার এই তথ্য-বহুল গ্রন্থখানিতে যেসব বিষয়ে উল্লেখ আছে, তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কারণ বিশেষজ্ঞের লেখা হলেও তিনি সাধারণ পাঠকের বুঝবার মত করেই সহজ ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন।

প্রথমেই সঙ্গীতের শ্রেণী বিভাগের কথা উঠে পড়ে। তা এই : ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগের থেকেই বেশ উৎকর্ষ ছিল। এরমধ্যে উত্তমশ্রেণীর সঙ্গীত ধ্রুব-পদ, ধ্রুপদের অর্থাৎ যেসব পদ বা শ্লোক আবৃত্তি করবার বা গাইবার নির্দিষ্ট নিয়ম বাঁধা ছিল, যার নড়চড় করা দূষণীয় মনে হ'ত। অবশ্য, কায়দা-কানুনগুলো যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁরা শিল্পমাধুর্য ও গাম্ভীর্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই তা করেছিলেন। কিন্তু সবাই ত আর শিল্পী নয়, তাই গায়ক ও বাদকেরা একে একরকম গাণিতিক ফরমূলা বা সূত্রের পর্যায়ে এনে ফেলেছিলেন। আবার যখন গায়ক ও বাদকের মধ্যে আড়াআড়ি চলতো, তখন এঁরা আপন আপন সূত্র ধরে অন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দুন, চৌদুন, সওয়াইয়া, দেড়িয়া প্রভৃতি দ্রুতলয়ে বাহাদুরী দেখাতেন। ফলে সঙ্গীত আপন সৌকুমার্য হারিয়ে হয়ে পড়ত একটা বড় রকমের প্রাণহীন কসরত। আর এক-কথা এই যে, দেবতা ও মহাপুরুষদের প্রীতির উদ্দেশ্যেই বিশেষ গাম্ভীর্য বজায় রেখে ধ্রুপদ গীত হত। সুতরাং হালকা লয় এর সঙ্গে সুসমঞ্জস ছিল না,—ধামার, তেওরা, চৌতাল, মধ্যমান, আড়াঠেকা প্রভৃতি বহুবিধ কূটতালে বিলম্বিত লয়ে এবং প্রত্যেকটি স্বরে বেশ কিছুক্ষণ স্থিতি করে এক একটি গান দেড় ঘণ্টা-দুই ঘণ্টা বা আরও অধিকক্ষণ ধরে গাওয়াই কৃতিত্বের বিষয় বলে গণ্য হ'ত।

এই গানের সঙ্গে আরব ও পারস্যের সঙ্গীতরীতির যথেষ্ট মিল ছিল। লাল খাঁ বার্নি কর্তৃক রচিত পারস্য ভাষায় লিখিত "মৌজে-মুসিকী" (=সঙ্গীত-তরঙ্গ) নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে, অন্ততঃপক্ষে ২২টি ভারতীয় রাগ (রামকেলী, ভায়রোঁ, পূরবী, মালকৌষ, সারং, বিহাগড়া, নট নারায়ণ, ধানেশ্রী প্রভৃতি) পারসিক রাগের অনুরূপ। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে পারসিক রাগগুলির নামও উল্লেখ করা হ'য়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানেরা যখন এদেশে আসেন, তখন এঁরা ভারতীয় সঙ্গীতের অনুরূপ একটি সঙ্গীতরীতির অধিকারী ছিলেন।

অবশ্য পার্থক্যও ছিল। ভারতীয় সঙ্গীত ছিল প্রধানত দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত, কিন্তু আরব্য-পারস্য সঙ্গীত ছিল মানবীয় ভাব ও অনুভূতির প্রকাশক—মুসলমানের সাহচর্যেই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভূত উৎকর্ষ হ'য়েছে। বিশেষ করে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে সুবিখ্যাত পার্সী ও হিন্দী কবি এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ নায়ক আমীর খসরু ভারতীয় ও আরব্য-পারসিক উভয় পদ্ধতিতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সঙ্গীতে 'নায়ক' উপাধিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এর নীচেই গন্ধর্বের স্থান। যিনি বর্তমান ও অতীতকালের সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক উভয়দিকেই পারদর্শী তিনিই 'নায়ক'। আর যিনি বর্তমান ও অতীতকালের শুধু ব্যবহারিক দিকে পারদর্শী তাঁর উপাধি 'গন্ধর্ব'। আশ্চর্যের বিষয়, আকবর বাদশার দরবারের বিখ্যাত গুণী তানসেনও নায়ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন গন্ধর্ব। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে পাক-ভারতের কয়েকজন নায়ক ও গন্ধর্বের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে :

নায়ক : গোপাল, আমীর খসরু, গোপাল (২), পাণ্ডে, লোহাং, করন (কর্ণ) মাহমুদ, বখশু, ভানু, বৈজু, চর্যু, ভারু, ধুন্দি ও গুণ সেন। লাল খাঁ কলাবন্ত ও রঙ্গ খাঁ কলাবন্তও বড় ওস্তাদ ছিলেন। এঁরা গন্ধর্বের চেয়ে উচ্চ ছিলেন, হয়ত প্রায় নায়কের সমকক্ষ ছিলেন।

গন্ধর্ব : বায বাহাদুর, তানসেন, হুসেন শাহ শর্কী, মীর্জা জুলকারনায়ন।

আমীর খসরুর জন্ম হয় ১২৫৪ সালে পাতিয়াল নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে। এঁর পিতা ছিলেন তুর্কি আর মাতা ছিলেন দিল্লীর এক আমীরের কন্যা। তেইশ বছর বয়স থেকেই আমীর খসরু কবি হিসাবে রাজসভায় স্থান পান।

আমীর খসরুর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ছিলেন সর্বপ্রধান। তাঁর রাজত্বকালেই সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তাঁর যশঃগৌরব বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। এই রাজদরবারেই ভারত-বিখ্যাত নায়ক গোপালের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়। নায়ক গোপাল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তাঁর ১২০০[1] অনুরক্ত শিষ্য পর্যায়-ক্রমে তাঁর পাল্কী বহন ক'রে গৌরব বোধ করত। একবার তিনি থানেশ্বরে কুরুক্ষেত্র-সরোবরে তীর্থস্থানে গমন করেছিলেন। তখন সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর নিমন্ত্রণে রাজসভায় এসে ক্রমান্বয়ে সাতদিন[2] নানাপ্রকার রাগরাগিণীর কর্তব প্রদর্শন করেন। এই কয়দিন আমীর খসরু অন্তরালে থেকে (সিংহাসনের নীচে লুকিয়ে) এ-সব শুনেছিলেন। অষ্টম দিনে[3] তিনি তাঁর দুই শিষ্য সামাৎ ও নিয়াযকে নিয়ে মজলিসে যোগদান করেন। খসরুর অনুরোধে প্রথমে নায়ক গোপাল গান করলেন, তারপর খসরুও তাল-মান-লয় সহযোগে ঠিক যেমন করে এ কয়দিন নায়ক গোপাল গেয়েছিলেন সে সমুদয়ের পাল্টা গান গেয়ে শুনালেন।

---

১. মতান্তরে ১৬০০ শিষ্য ("রাগদর্পণ" থেকে মৌলানা শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত। মুহম্মদ হাবীব কৃত "হজরত আমীর খসরু অব দিল্লী" দ্রষ্টব্য। আলীগড় ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন, D. B. Taraporevala & Co. Hornby Road, Bombay.)

২. মতান্তরে ছয় দিন হাওয়ালা (৩) মতান্তরে সপ্তম বৈঠকে হাওয়ালা ঐ;

৩. আমীর খসরু ক্রমান্বয়ে এগারটি রাজসভার সভাকবি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের নাম যথাক্রমে :

১. আলাউদ্দীন মুহম্মদ কুশীল খাঁ, ওরফে মালিক ফজ্জু [সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র ] ২. নাসীরউদ্দীন বাঘরা খাঁ [ বলবনের দ্বিতীয় পুত্র ] ; ৩. খান-ই-শহীদ সুলতান মুহম্মদ [বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ] ; ৪. আমীর আলী সরজন্দার [ অযোধ্যার সুবাদার] ; ৫. সুলতান মুইজউদ্দীন কায়কোবাদ [ বাঘরা খাঁর পুত্র ] ৬. সুলতান জালালউদ্দীন খলজী; ৭. সুলতান আলাউদ্দীন খলজী [১২৯৬] ৮. সুলতান শাহাবউদ্দীন ওমর [ আলাউদ্দীন খলজীর কনিষ্ঠ পুত্র ] ; ৯. সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ [ আলাউদ্দীন খলজীর তৃতীয় পুত্র] ১০. সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক ; ১১. সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক। মুহম্মদ তুগলকের সিংহাসন আরোহণের কয়েকমাস পরেই আমীর খসরুর মৃত্যু হয়।

গোপালের 'গীত'-এর স্থলে খসরু শুনালের 'কওল' ও 'বাসিৎ'; গোপালের 'মান'-এর স্থলে শুনালেন 'তিতালা' ও 'নক্‌শা'; 'আলাপ'-এর স্থলে 'নিগার'; সুত (সূত্র?)-এর-স্থলে 'তরানা'; এবং 'ছান্দ'-এর স্থলে 'বাসিৎ'। এ শুনে নায়ক গোপাল চমৎকৃত হয়ে গেলেন, সভাশুদ্ধ সকলে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল। এরপর খসরু স্বরচিত পদ গেয়ে শুনালেন, এবং নিজের উদ্ভাবিত নতুন নতুন রাগ-রাগিণী শুনিয়ে সকলকে মোহিত করে দিলেন। এইভাবে খসরু সঙ্গীতবিদ্যায় 'নায়ক'-এর সম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত হ'লেন।

সঙ্গীতের উপরে উল্লিখিত বিভাগ ছাড়াও নায়ক আমীর খসরু 'কলওয়ানা' 'গুল' 'হাওয়া' 'সুহেলা' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি যেসব নূতন রাগ সৃষ্টি করেছেন তারমধ্যে 'পনম', 'গারা', 'ফরগানা', 'মুজীর', 'মুওয়াফিক', 'সনম', 'সাযগারী', 'উশ্‌শাক', 'ইয়ামন', 'জিলাফ', 'সরফর্দা' প্রভৃতি এখনও প্রচলিত আছে। তালের দিক দিয়েও তিনি প্রায় সতরটি নতুন তাল সৃষ্টি করেছিলেন; তারমধ্যে 'খাম্‌সা', সওয়ারী, ফিরদস্ত, যৎ, পশ্‌তু, আড়া চৌতাল, সুর ফাক্তা ও ঝুম্‌রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি সেতার, ৺বলা, রবাব ও ঢোলক এই কয়েকটি বাদ্য-যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করেন।

গ্রন্থকারের মতে আমীর খসরুর আর একটি বিশেষ দান এই যে তিনি ধ্রুপদের জটিলতা ও গাম্ভীর্যের বাইরে ইন্দো-পাক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন যাকে সালঙ্কার ও চল-চঞ্চল সঙ্গীত বলা যায়। বর্তমানে এর নাম হচ্ছে খেয়াল। খেয়ালের স্বর দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়, সুতরাং এ হচ্ছে অধ্রুব-পদ সঙ্গীত। এতে মানবীয় ভাবের, বিশেষ করে প্রেম-পদের প্রাধান্য রয়েছে। ধ্রুপদের অস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ—এই চার অঙ্গের মধ্যে কেবল প্রথম দুটি অঙ্গেই খেয়ালের সৌন্দর্য বিকাশ সম্ভব হয়। এর তাল ও রাগিণীও অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। আমীর খসরু ধ্রুপদও গাইতেন, খেয়ালও গাইতেন। কিন্তু তাঁর সময়ে ধ্রুপদেরই প্রাধান্য ও প্রচলন অধিক ছিল। এর প্রায় একশ'-সওয়াশ' বছর পরে জৌনপুরের অধিপতি সুলতান হুসেন শাহ শর্‌কী (১৪৫৭-১৪৮৩) খেয়াল ঢং-এর প্রতি অধিক জোর দেন। বাস্তবিক এঁর প্রভাবেই দৃঢ়বদ্ধ ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা হ্রাস হ'য়ে বিমুক্ত মধুস্রাবী খেয়ালের সমধিক প্রচলন হয়। সুলতান হুসেন শর্‌কী সঙ্গীতে গন্ধর্ব ছিলেন। তিনি যে সকল রাগ-রাগিণীর প্রচলন করেন, তার মধ্যে জংলা, শ্যামা (চৌদ্দ প্রকার), টোড়ী (চার প্রকার), জৌনপুরী (=আশাবরী) এবং হুসেনী কানাড়া প্রধান। তিনি সঙ্গীতের একজন উৎকৃষ্ট পদ-কর্তাও ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালের মধ্যে পাক-ভারত সঙ্গীতের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছিল। জৌনপুরকে ত তখন ভারতের 'শিরাজ' বলে গণ্য করা হ'ত। এই সময় কাশ্মীরের রাজা সুলতান যয়নুল আবেদীন, গোয়ালিয়রের অধিপতি কিরাত সিংও সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জৌনপুরের ইব্রাহীম শাহ শরকী (১৪০১-১৪৪০) 'সঙ্গীত শিরোমণি' নামে একখানা পুস্তক সম্পাদন করেন। হুসেন শাহ্‌র কথা ত বলাই হ'য়েছে। কিরাত সিংহের পুত্র রাজা মানসিং তন্‌ওয়ার (১৪৮৬-১৫১৭) পাঁচজন সঙ্গীত-নায়কের তত্ত্বাবধানে 'মান-কৌতূহল' নামক একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করান। সে সময় ভারতীয় সঙ্গীতের উপর পারস্য প্রভাব পড়ায় অনেক নতুন নতুন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হ'চ্ছিল, আর এসবের কোনও নির্দিষ্ট রূপ না থাকাতে ওস্তাদে ওস্তাদে প্রবল মত-বিরোধ ছিল। তাই নায়ক বখ্‌শু, নায়ক ভান্নু, নায়ক মাহ্‌মুদ, নায়ক করন্‌ এবং নায়ক লোহাং-এর

অনুমোদিত 'মান-কৌতূহল' নিশ্চয়ই সঙ্গীতের অরাজকতা দূর করবার কাজে যারপর নাই সহায়তা করেছিল। 'মান-কৌতূহলে' সমসাময়িক কালের প্রায় সমুদয় রাগ-রাগিণীরই উল্লেখ আছে। কিছুকাল পর এর একখানা পার্সী তরজমা ক'রে তার নাম দেওয়া হয় 'রাগদর্পণ'। কথিত আছে, বর্তমানে ধ্রুপদের আমরা যেরূপ দেখতে পাই, তা রাজা মানসিংহেরই দেওয়া। এর আগে যে ধ্রুপদ গাওয়া হ'ত তা' সংস্কৃত ভাষায় রচিত হ'ত আর গীত, ছন্দ্ ও মান এই তিন প্রণালীতে গীত হ'ত।

মানসিংহের এই যুগান্তকারী প্রচেষ্টার ফলেই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ও কর্ণাটী সঙ্গীত পৃথক হ'য়ে পড়ল।

চিশ্‌তিয়া তরীকার মুসলিম মরমীগণ, এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভক্ত-কবিগণ ধর্ম-সাধনায় সঙ্গীত ব্যবহার করতেন। আমীর খসরু ও তাঁর শিষ্যদ্বয়ের 'কওল' সঙ্গীত, এবং মীরা বাই, বাবা রামদাস, সুরদাস ও স্বামী হরিদাসের ভজন, এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। মোগল যুগে আকবর বাদ্‌শাহ্‌র রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে একজন সভাকবির রচিত ধ্রুপদগান 'দুর্গা' রাগিণীতে গীত হ'য়েছিল। আকবরের রাজসভায় গোয়ালিয়র, মাশ্‌হাদ, তাব্রিজ ও কাশ্মীর থেকে বহু সংখ্যক যন্ত্রশিল্পী ও কণ্ঠশিল্পীর সমাগম হয়েছিল। এরমধ্যে ছিলেন মিয়া তানসেন (গন্ধর্ব), বাবা রামদাস, বাযবাহাদুর (গন্ধর্ব), নায়ক চর্যু, মিয়ালাল, সুবহান খাঁ, বিচিত্র খাঁ, তানতরঙ্গ খাঁ, মুহম্মদ খাঁ ধারী[১], দাউদ খাঁ ধারী, সুরদাস, রামদাস, পারবিন খাঁ, মীর সৈয়দ আলী, উস্তা ইউসুফ, প্রভৃতি দেশ-বিদেশের গুণিগণের সমাগম হ'য়েছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে নাদ আলী, বিলাস খাঁ (তানসেনের পুত্র), মির্জা যুলকারনায়ন (গন্ধর্ব) ও মিয়া আকীল ছিলেন।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবারে অনেক উচ্চ-গুণসম্পন্ন আর্টিস্টের সমাগম হ'য়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে এ সময় দেশে সুখ-শান্তি ছিল, আর সঙ্গীতও সুমার্জিত রূপ পেয়েছিল, এবং হুসেন শাহ শরকী কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত খেয়াল সঙ্গীতের যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হ'য়েছিল। তানের সাহায্যে মনোহর সুরবিস্তারের দিকে ওস্তাদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'য়েছিল। শেখ বাহাউদ্দীন (অমৃতবীণকার), শের মুহম্মদ (পদ রচয়িতা), লাল খাঁ গুণ-সমুদ্র (ধ্রুপদী এবং বিলাস খাঁর জামাতা ও শিষ্য), জগন্নাথ মহাকবি রায় (দক্ষিণী সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি), গুণসেন (ধ্রুপদী), খুশহাল খাঁ (গুণ-সমুদ্র), মিস্‌রী খাঁ, গুণ খাঁ প্রভৃতি সঙ্গীতবিশারদের দ্বারা সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবার অলঙ্কৃত হয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দশ বছর সঙ্গীতে উৎসাহ দান করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে গায়ক, বাদক, নর্তক, নর্তকী সকলেরই বিশেষ দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল। শুনা যায় বিরাট এক জনতা একসময় বাদশাহ্‌র প্রাসাদের নিকট দিয়ে একটি সুসজ্জিত তাবুত (শবাধার) নিয়ে যাচ্ছিল। বাদ্‌শাহ জিজ্ঞাসা ক'রে যখন জানতে পারলেন, যে 'সঙ্গীত'-কে দফন করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন, "বেশ গভীর করে কবর দিও, যাতে সেখান থেকে আর যেন কোনও শোর-শব্দ না উঠতে পারে।"

মোগল রাজত্বকালের শেষের দিকে বে-খবর বাদশা বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১৭১২) বিশেষ সঙ্গীতোৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত সভাসদ ছিলেন নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ) ধ্রুপদ, খেয়াল, তরানা (সম্ভবত হোলি ও সদ্‌রা) প্রভৃতি অত্যন্ত নিপুণভাবে বৈচিত্র্যময় করে গাইতে

১. 'ধারী'-রা যাযাবর সঙ্গীত-ব্যবসায়ী।

পারতেন। তিনি নিয়াযী কাওয়াল ও লালাবাঙ্গালীর সহযোগিতায় অজস্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, এবং অনেকগুলোর ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে পরবর্তী সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌র ১৭১৯-৪৮ নামও জুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং নিজে কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। বর্তমানে যে-সব 'খেয়ালের' প্রচলন আছে তার শতকরা ৭০ ভাগেই সদারঙ্গ কিংবা মুহম্মদ শাহ্ পিয়া সদারঙ্গিলে'র ভণিতা রয়েছে। অন্যান্য গায়কদের মধ্যে শেখ মুঈনউদ্দীন (বিখ্যাত 'খেয়ালী') এবং ফিরোজ খাঁ-ই (নে'য়মৎ খাঁর শিষ্য ও জামাতা) ছিলেন প্রধান।

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ ও রামপুরই উত্তর ভারতের প্রধান সঙ্গীত-কেন্দ্র হ'য়ে পড়েছিল। লক্ষ্ণৌ-এর নওয়াব-উজীর আসাফউদ্দৌলার শাসনকালে পাটনানিবাসী মুহম্মদ রাজা খান ১৮১৩ খ্রীঃ 'নগমা-ই-আসিফী' নামক একখানা পুস্তক রচনা ক'রে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নবযুগ সৃষ্টি করেন। প্রাচীন পন্থায় ছয়-রাগ ছত্রিশ রাগিণীর, এবং এইসব রাগ-রাগিণীর জনক, পুত্র, কন্যা, ভার্যা ইত্যাদি মিলে অসংখ্য রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়। ফলে রাগ-রাগিণীর শ্রেণী নির্দেশ করার জন্য অন্তত চারিটি বিভিন্ন মতের আবির্ভাব হয়। এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য রাজা খাঁ এক বৈজ্ঞানিক পন্থা উদ্ভাবন করেন। তিনি শুদ্ধ স্বরগুলোকে 'বিলাওল ঠাট' মেনে নিলেন, এবং 'খরজ' (=সা) ছাড়া অন্যান্য কড়ি, কোমল ও শুদ্ধ স্বর থেকে আরম্ভ ক'রে পর্দান্তরগুলো ঠিক রেখে আরও এগারটি ঠাট নির্দেশ ক'রে, এইসব ঠাটের ভিত্তিতে রাগ-রাগিণীর শ্রেণী বিভাগ করলেন। রাজা মানসিং তনয়ার 'মান-কৌতূহলে' তৎকালে প্রচলিত রাগ-রাগিণীর পঞ্চনায়ক সম্মত সঠিকরূপ নির্দেশ করেছিলেন, আর রাজা খাঁ 'নগমা-ই-আসিফী'তে বৈজ্ঞানিক ঠাট অনুসারে রাগরাগিণীর বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ করলেন। এ পর্যন্ত কেবল দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতেরই সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল, এখন উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর বিচারে একটা সুনির্দিষ্ট ধারার সন্ধান মিললো।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ও নৈতিক দুর্বলতার ফলে দেশের শাসন বৈদেশিকদের হাতে চলে যেতে থাকলো। এ অবস্থাতেই দেশের লোকে অসহায় অবস্থায় আমোদ-প্রমোদ, মোরগের লড়াই, যাত্রা-তর্জা, জুয়াখেলা ইত্যাদি সহজলভ্য ব্যাপার নিয়েই মত্ত রইল। ধ্রুপদের ত কথাই নাই, খেয়াল গাইতেও যথেষ্ট ধৈর্য ও রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন, তাই এঁরা আরও হাল্কা ঢং-এর সঙ্গীত—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী ও টপ্পার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। ঠুংরীকে বলা যায়, একপ্রকার নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমগীতি, যার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ-বর্ণনা, বিরহ-ব্যাকুলতা এবং অভিসারাদিই মুখ্য, এবং বিশেষ বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বহু ভঙ্গিম মনোরম সুরবিন্যাসেই কর্তব্যের বাহাদুরী ও চরম সার্থকতা। খেয়ালও প্রেম-সঙ্গীত, কিন্তু সেখানে সাধারণত ঐশী প্রেমের রূপক হিসাবেই মানবীয় প্রেমের বর্ণনা এবং সময়ে সময়ে সাক্ষাৎভাবেই ঐশী প্রেমের দৃঢ়সংবদ্ধ অথচ মনোরম প্রকাশ হয়। টপ্পার আবিষ্কারক শোরীমিয়া। এর সুর সিন্ধু, পেশাওয়ার ও পাঞ্জাবের উট-চালকদের 'ধূনের'-এর অনুসরণে রচিত। অর্থাৎ আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতকে কিছু মার্জিত করে শোরীমিয়া একে ভদ্র বা অভিজাত সমাজের গ্রহণযোগ্য রূপ দিয়েছিলেন। স্মরণ রাখতে হবে, ধ্রুপদ ও খেয়ালে সঙ্গীত-ব্যাকরণের রীতি-সম্মত বা শাস্ত্রীয়-নিয়ম মানতেই হবে, কিন্তু ঠুংরী ও টপ্পায় তেমন বাধ্য-বাধকতা নেই। অবশ্য, ঠুংরী ও টপ্পার আবির্ভাবে খেয়াল ও ধ্রুপদ উৎখাত হ'য়ে যায়নি। এরা সহ-অবস্থানের নীতি অবলম্বন করে যার যার মত বেঁচে রয়েছে।

নওয়াব ওয়াজেদ আলী (অযোধ্যার শেষ নওয়াব), ওস্তাদ ফৈয়াজ হোসেন খাঁ এবং রামপুর দরবারের নওয়াব কল্‌বে আলী খাঁ, উজীর খাঁ (বীণকার), পিয়ারে সাহেব (ধ্রুপদিয়া), ছুজা খাঁ (খেয়ালী), আলীরাজা খাঁ (কাওয়াল, কলওয়ানা গায়ক), ফিদা হোসেন (সরোদী), বিন্দাদিন (নর্তক ও পদকর্তা), ওস্তাদ মুশতাক হোসেন খাঁ (খেয়ালী), সাদেক আলী খাঁ বীণকার, আহমদ জান থিরাকওয়া (বিখ্যাত তবলচী), আজমবাই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গৌরব রক্ষা করেছেন।

এছাড়া মুহম্মদ আলী খাঁ জয়পুরী (হররঙ্গ), পণ্ডিত ভাতখণ্ডে (বোম্বাই)ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ আলী খাঁ বিখ্যাত ছিলেন, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সম্ভবত এঁর শিষ্য ছিলেন। দেখা যায়, বহু সংখ্যক লক্ষণগীতে ইনি খাঁ সাহেবের ঋণ স্বীকার করেছেন।

রাজা নওয়াব আলী খাঁ তাঁর মা'রিফ-উল-নগমা, দ্বিতীয় খণ্ডে, কয়েকজন বিখ্যাত ধ্রুপদীর ধ্রুপদ গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য খেদমত করেছেন। নওয়াব চম্মন সাহেব, নওয়াব জানী সাহেব, অবুবন খাঁ, নজির খাঁ, আমীর খাঁ, রাজা হোসেন খাঁ, জোহরাবাই, গওহরজান, ওস্তাদ ফৈয়াজ হোসেন খাঁ, পণ্ডিত কৃষ্ণরাও রতনঝঙ্কার, আসাদ আলী, লতাফৎ হোসেন, আল্লাদিয়া খাঁ, শমশাদ বাই, আবদুল করিম, রওশন আরা, হাদ্দু খাঁ, হস্‌সু খাঁ, কেরামত আলী খাঁ, মুসাদ্দক হোসেন খাঁ, হায়দর হোসেন, বেলায়েত খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েত খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, নবু খাঁ, বিসমিল্লাহ্ খাঁ, তালিম হোসেন খাঁ, সাদেক আলী খাঁ, আলী আকবর খাঁ, বাব্বু খাঁ, ছোটে খাঁ, প্রসন্ন বণিক, মল্লাং খাঁ প্রভৃতি নাম কণ্ঠসঙ্গীত, সুরসঙ্গীত ও বাদ্যসঙ্গীতে স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে উপযুক্ত স্বরলিপির অভাবে আমরা পূর্ব-সূরীদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে পারিনি। পাক-ভারতের প্রথম স্বরলিপির প্রবর্তক হিসাবে কলকাতার মহারাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম স্মরণীয়। আর বর্তমান শতাব্দীতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একক মহিমার অধিকারী। অতীতকালে রাজা মানসিং তেওয়ারী ও মুহম্মদ রাজা খাঁ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী ও শ্রেণীকরণ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য যা করেছেন, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও একক চেষ্টায় বর্তমান শতাব্দীতে সেই কাজ আরও পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর লক্ষণগীতে স্বরলিপির সাহায্যে রাগ-রাগিণীর ঠাট, স্বরের আরোহণ অবরোহণ ও তাদের বিশিষ্ট ভঙ্গী, বাদী-বিবাদী-সম্বাদী স্বরের পূর্ণতর বিবরণ,—ইত্যাদি দিয়ে সঙ্গীত-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামনে বর্তমান মার্গ-সঙ্গীতের একটা বোধযোগ্য ও প্রামাণিক আদর্শ তুলে ধরেছেন।

অধ্যাপক হালীম সাহেব তাঁর প্রবন্ধগুলোর ভিতর দিয়ে পাক-ভারতের অতীত ও বর্তমান সঙ্গীতের একটা সম্পূর্ণরূপ ফুটিয়ে তুলে একটা বিশেষ জরুরী কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। এছাড়া আমীর খসরু, সুলতান হুসেন শরকী, বাজবাহাদুর, মিয়া তানসেন, মির্জা যুলকারনায়ন এবং ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর জীবনকথার সাহায্যে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাঙ্গীতিক আদর্শের প্রতি আলোকপাত করেছেন। পুস্তকাদির অসংখ্য হাওয়ালা দিয়ে গবেষকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। মোট কথা সব কয়টি প্রবন্ধই সুলিখিত হ'য়েছে, আর বিশেষ বিশেষ দিকে নজর দেওয়াতে সবটা মিলে একটা সম্পূর্ণ ধারণা গ্রহণ করবার সুবিধা হ'য়েছে।

এ গ্রন্থে যেসব তথ্য পরিবেশন আর মত প্রকাশ করা হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ মতবিরোধ হওয়ার কথা নয়। তবে মনে হয়, ঐতিহাসিকের লেখা ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে সন-তারিখের উল্লেখ আরও (যথাসম্ভব) পূর্ণতর হ'তে পারতো, আর সময়ানুক্রমিকভাবে সুলতান হোসেন শরকীর নাম বাজবাহাদুরের আগে দিলে অধিক সঙ্গত হ'তো। পরিশেষে যে উৎকৃষ্ট লোক-পঞ্জী দেওয়া হ'য়েছে, সেইসঙ্গে গ্রন্থ-পঞ্জীও থাকলে সুবিধা হতো; অথবা লোকের নামের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রচিত গ্রন্থাদির তালিকা দেওয়া যেতে পারতো। গ্রন্থের বহিপৃষ্ঠ আর একটু আকর্ষণীয় করবার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গ্রন্থকার যে উন্নত পর্যায়ের মাল-মসলা পরিবেশন করেছেন, যে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ না করে উপায় নেই।

অধ্যাপক আবদুল হালীম সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

সাহিত্য পত্রিকা
শীত ১৩৬৯

# সত্যের সন্ধান

জনাব আরজ আলী মাতব্বর সাহেবের লেখা 'সত্যের সন্ধান' (যুক্তিবাদ) নামক পুস্তকখানা সম্প্রতি পড়ে দেখে আনন্দ লাভ করেছি। এতে আছে মানব মনের নানাবিধ জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তরের সন্ধান। কৌতূহলী সাজান মনে এসব প্রশ্নের উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলো সনাতন, আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে, আর এসবের জওয়াবও তৈরি হয়ে চলেছে। প্রশ্নগুলোর রকম এই আমি কে? কোথায় ছিলাম? কোথায় চলেছি? দেহটাই কি আমি? না আমার মন-প্রাণ-হৃৎপিণ্ড এবং চৈতন্যই আমি? দেহের মৃত্যু ও পচনেই আমার আমিত্ব খতম হয়, না তখনও মর-আত্মা বেঁচে থাকে? তবে সেই আত্মার স্বরূপ কি? আত্মা স্বরূপ না অরূপ? দেহের মধ্যে কোন পথে ঢোকে, আর কোন পথেই বা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়? মৃত্যুর পর দেহ, অস্থি, চর্ম, মেদ প্রভৃতি জ্বালিয়ে দিলে, না মাটিতে মজে গেলে, বা পশুপক্ষীতে খেয়ে ফেললে সেগুলো কেমন করে পূর্বের রূপ নিয়ে হাশরের দিনে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হবে? ... আল্লাহ কি? কেমন? কোথায়? স্বরূপ না অরূপ? সৃষ্ট না অ-সৃষ্ট? তাঁর স্থান ও কালের কি আদি-অন্ত নেই? তিনি কি সর্বত্র ব্যাপ্ত, সদাজাগ্রত, সর্বজ্ঞানী, এবং শুধু মুখের বাক্য বা আজ্ঞা দ্বারাই যা খুশী তাই সৃষ্টি করতে পারেন? এসব কেমন করে হয়? কেউ তাঁর ব্যবস্থায় বা অভিপ্রায়ে বাধা দিতে পারে না তাই বলে কি তিনি স্বেচ্ছাচারী? ... না, তিনিও তাঁর নিজের সৃষ্ট নিয়ম-পালন করেই চলেন, অর্থাৎ তাঁর সুন্নত বজায় রাখেন?

এসব প্রশ্নের ভেদ ওলী, দরবেশ, পয়গম্বরগণ যুগে যুগে প্রকাশ করেছেন... অবশ্য, আল্লাহর কাছ থেকে সাক্ষাৎভাবে ওহী পেয়ে, বা আল্লাহর ফেরেশতাদের কাছে সমাচার প্রাপ্ত হয়েই এঁরা এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করে থাকেন। এছাড়া বটতলার বাঙলা পুঁথিতেও এসব বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়— গল্পচ্ছলে জীবনাখ্যানরূপে, বিজয়কাব্য, ইউসুফ-জোলায়খা, শিরী-ফরহাদ, লায়লী-মজনু, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি আশেক-মাশুকের প্রেমকাহিনীতে পুঁথিলেখকেরা অবশ্যই আরও উঁচু দরজায় প্রামাণ্য হাদীস ও মূল কেতাবের হাওয়ালা দিয়েই সাধারণ লোকের কাছে এ-সবের ব্যাখ্যান করে থাকেন। বেদ-পুরাণ, তৌরাৎ, জবুর, ইঞ্জিল, কোরান এবং গীতা জাতীয় পুস্তিকাদিতে আল্লাহর আদেশ ও বিধি-বিধান পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ নিজেই কোরান-শরীফে উক্তি করেছেন, এমন কোনও জনপদ নেই যেখানে তিনি প্রেরিত পুরুষ পাঠায়ে হেদায়েত, অর্থাৎ 'সুপথ প্রদর্শন' করেননি।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বাণীসমূহ অবশ্যই ওলী-দরবেশ-পয়গম্বরগণের সহিত সাধারণ লোকেও, বুঝেই হোক, আর না বুঝেই হোক, বিশ্বাস করে, ব্যাস। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন না,— "কেন? কেমন করে?" তাঁরা 'বিল্ গায়েব' বিশ্বাস করেন ; অর্থাৎ সত্যটা গুপ্ত থাকলেও, অস্পষ্ট থাকলেও, অদৃশ্য থাকলেও, অনুপস্থিত থাকলেও তাঁরা যেন অনুভব করেন প্রত্যক্ষভাবে। সকল ধর্মগ্রন্থেই এবং কোরানেও রয়েছে— এই হচ্ছে কেতাব (সত্য সত্তার বা

প্রকৃত সমাচার); এরমধ্যে নেই কোনও সন্দেহের অবকাশ। যারা আল্লাহর ভক্ত ( যারা আল্লাহর বিশ্বাস করে আল্লাহকে মানে বা আল্লাহর ভয় করে) তাদের জন্য এই (কেতাবই) প্রকৃত পথপ্রদর্শক। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, "আমি সর্বজ্ঞানী, কি আমার জ্ঞানের সবখানি আমি কাউকেই দেইনি। (যেটুক দিয়েছি তার বেশি কেউ জানে না) তবে দুষ্টেরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে পর্দার আড়ালেও ঢুঁ মারতে চায়; তখন তারকা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে আমার ফেরেশতারা তাদের তাড়িয়ে দেয়। পুরো খবর কেউ জানে না।"

প্রকারান্তরে আল্লাহ বলেছেন

যেটুকু জ্ঞান মানুষকে দিয়েছি, তার অতিরিক্ত জ্ঞান তার থাকতেই পারে না। তবে, অতিরিক্ত জ্ঞান বলে তারা যা নিয়ে বড়াই করে, তা হচ্ছে তাদের মেকিওটি কল্পনা মাত্র। জ্ঞানাতীত কল্পনাও কোরানে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই হল প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু যেসব যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসু দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক পর্দা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখতে চায় তারাও হয়ত সত্যের কিছুটা ক্ষণিক আভাস পেতেও পারে কিন্তু তাতেই তারা সন্তুষ্ট নয়— তারা সীমিত জ্ঞান নিয়ে অসীমকে বেষ্টন করতে চায়। আমার মনে হয়, তাদের অসীম প্রয়াসও সুন্দর। ফেরেশতারা তাড়ালেও আল্লাহ্ হয়ত কিছু কিছু কৃপাবিন্দুও বিতরণ করেন। আদম-হাওয়ার ব্যাপারেও মনে হয় আল্লাহ্, আদম-হাওয়ার নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদনকে কৌতূহলী খোকা-খুকীর অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষণ বলেই ধরে নিয়ে তাদেরকে একবারে ত্যাজ্য জ্ঞান করেননি। মোটামুটি বলা যায় আল্লাহর এই স্নিগ্ধ কোমল কৃপাবলেই বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানসাধনা অব্যাহত রয়েছে, এবং যুগযুগ ধরে অল্প অল্প করে আল্লাহর আভাস বিকশিত হচ্ছে।

সহজ-সুন্দর বিশ্বাসের পন্থা ত্যাগ করে আলোচ্য গ্রন্থকার দুরূহ জ্ঞান ও বুদ্ধির পথে অরূপকে বা অপরূপ সুন্দরকে দেখতে চান বহুরূপী করে। অবশ্য এতে ইতস্তত ও সন্দেহের ছাপ থাকবেই একজনের কাছে যা সুস্পষ্ট, অপরের কাছে হয়ত তা' অস্পষ্ট-দ্বিধাদ্বন্দ্বপূর্ণ। তাই সম্পূর্ণ ঐকমত্য ঘটতে পারে না। এই কারণেই ধর্মে অদৃশ্য জগতের রহস্য ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে বহুসংখ্যক ফেরকা বা মতামতের উদ্ভব হয়েছে। নানা মুনির নানা মতকে সত্যের একটু আবছায়া বলে স্বীকার না করায় এর প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতকে অভ্রান্ত ও দ্বন্দ্বের অতীত মনে করাতেই পৃথিবীর ইতিহাসে যুগযুগান্তর ধরে রক্তপাত জবরদস্তি, সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ির কেলেঙ্কারী চলছে। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এক টানা-হেঁচড়ার কি শেষ নাই? কে দেবে এর উত্তর? কার কথায় সবাই একবাক্যে বিশ্বাস করবে? তবু লোকে আশা করেই আছে— এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন জগতের সর্বত্র শান্তি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে। তবে সে শুভদিন আসবে কি মানুষের চেষ্টায়? না ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়? আল্লাহ্ কিন্তু বলে রেখেছেন মানুষকে— তোমরা আল্লাহর কৃপাপ্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হয়োনা; আল্লাহয় যারা বিশ্বাস করে তারা কখনও আল্লাহর রহমতের উপর বিশ্বাস হারা হয় না। আমরা প্রত্যহ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, বিষয়-বৈভব ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হচ্ছে কোনও অনির্দেশ্য অজানা দেশে, যেখানকার বার্তা নিয়ে এযাবত কেউ ফিরে আসেনি। এই দুনিয়াটা কি এক মহামায়া? না এর বাস্তব মূল্য আছে? কে দেবে এর উত্তর। মানুষ চলেছে অসীমের সন্ধানে, কিন্তু আমাদের বিশ্বটার ত সীমা দেখা যাচ্ছে না। শত সহস্র কোটি মাইলের সুদূর তারকার পিছনেও দেখা যাচ্ছে আরও তারকা-পুঞ্জ নীহারিকা ইত্যাদি, বৈজ্ঞানিকের সতত চেষ্টা, দার্শনিকের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হেতু-নির্ণয় চেষ্টা এবং কবির

কল্পনা-বিস্তার-কোনও—টাকেই হীন বলা যায় না। এই সব দেখে মনে হয় কোন অবিনশ্বর শক্তি যেন আকাশ-বাতাস-সলিল, মৃত্তিকা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, মানুষ, জীন, পরী, দেও, দৈত্য, কালপুরুষ, সর্প, শয়তান, মকর, কর্কট, সপ্তর্ষি, তুলা, বৃশ্চিক নিয়ে জীবনমৃত্যুর খেলায় মত্ত হয়েছেন। এই মহা-খেলায় অন্ত দেখতে না পেয়ে পৃথিবীর কবি হতাশ হয়ে বলেছেন

আমার আমার বলে ডাকি, আমার এ — ও আমার তা'
আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার বাবা আমার মা।
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার বাড়ি আমার ভিটে আমার যা সব বড়ই মিঠে
এত সাধের দেহ ভবে তাও ত রেখে যেতে হবে
আপন আপন কর ভবে চক্ষু বুঁজলে কেউ কারো না॥

গণিতশাস্ত্রের একটা ধাঁধা হচ্ছে— ডাইনের 'অনন্ত' আর বাঁয়ের 'অনন্ত' সুদূরে গিয়ে একত্র মিশেছে। তাই প্রশ্ন জাগে মহা 'আদি' আর মহা 'অন্ত' কি বৃত্তাবর্তন করে একত্র মিশে গিয়ে সৃষ্টির এক একটা মহাচক্র রচনা করছে ?— কে জানে এর উত্তর?— আর সত্যই বা কোথায় ? কালকের 'সত্যে' আজ খানিকটা 'মিথ্যা' দেখা যাচ্ছে, আজকের 'সত্যে' কাল খানিকটা 'মিথ্যে' বেরিয়ে পড়বে, তবু সত্যের সন্ধান চলতে থাক যতদিন চলে।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই 'সত্যের সন্ধান'-এর রচয়িতাকে এই ভেবে যে তাঁর এই পুস্তক পাঠ করে এ যুগের লোক হয়ত কিছু আনন্দ পাবে, কিছু বিস্মিত হবে, আবার হয়ত আরও কিছু নতুন প্রশ্ন— উত্থাপন করবে। বিশুদ্ধ নির্মল সত্য থাকুক বা না থাকুক, কুছ পরোয়া নাই। তাতে আমাদের কি ? যাঁর, ভাবনা তাঁরই মাথায় থাক, আমরা নিশ্চিন্তে নিশ্চুপ থাকি।

---

সত্যের সন্ধান (যুক্তিবাদ) : আরজ আলী মাতুব্বর। প্রকাশক লেখক স্বয়ং লামচরী, পোঃ চরবাড়িয়া, বরিশাল।
প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৮০। দাম ৭.৫০ টাকা।

বই
মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮০
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

# আলবেরুনী

মধ্যযুগের মুসলিম গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে খারিজমী, আলবেরুনী, আবু সিনা, আল হাজেন, ওমর খাইয়াম, জাবির ইত্যাদির নাম বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে আলবেরুনীর বিশেষত্ব হল, ইনি আরবি, ফার্সী, গ্রীক, হিব্রু, আরামীয় ছাড়া সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। এমন একজন প্রতিভাবান ও মানবদরদী বৈজ্ঞানিকের জীবনাদর্শ ও চরিত্রকে লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অতি মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবু রায়হান আলবেরুনী কেমন জ্ঞান-পাগল কেতাব পড়ুয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় প্রথম পর্বেই পাওয়া যায়,— যখন তিনি কেতাবের পোঁটলা নিয়ে জুরজানের পথে চলবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়ে ঐ পোঁটলাটা বাঁচাবার জন্য ক্লেশ ও নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। আর ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে মানুষের মনে যে কত বিচিত্র ধারণা রয়েছে তারও পরিচয় পাওয়া যায় এ-বইয়ের সর্বত্র— ডাকাতের মুখে, রাজদরবারের আলেমদের শিক্ষা ও উপদেশদানের মধ্যে— আরব, পারস্য, গ্রীস, রোম ও হিন্দুস্থানের বিদ্বজ্জনের কথাবার্তার মধ্যে।

মানুষের মনে সহজেই পুরাতন বা সনাতন জ্ঞান পাথরের মত শক্ত হয়ে স্থিতি লাভ করে। যেসব সাহসী লোক সেই স্থিরতা সম্প্রসারণ করতে যান, তাঁরা রক্ষণশীলদের এবং তাঁদের দলবলের কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এসবের জন্য কত রকমের যে যুক্তিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ সংগ্রামের ভিতর দিয়েই জ্ঞানের উন্নতি হয়। মানবপ্রকৃতির এই স্থবিরতা ও জঙ্গমতার মধ্যে রাশ টেনে ধরবার কাজ করেন উদার-প্রকৃতির পরমত-সহিষ্ণু ব্যক্তিরা। সমাজে বাস করতে হলে কিছুটা আপোস না করে উপায় নেই। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রবলের সঙ্গে আপোস করে কত মনঃকষ্টে ও সতর্কভাবে আলবেরুনীকে চলতে হয়েছে, বর্তমান লেখক সেসবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, আর কি সূক্ষ্ম নৈতিক সততার সঙ্গে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বিচার করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এঁর মনে জ্ঞানের অহংকার নেই, ইনি সর্বদা সকলের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করতে উৎসুক ; আবার পাত্র-অনুসারে যথাযোগ্য জ্ঞানদান করতেও উদগ্রীব। এঁর মনে হিন্দু-মুসলিম বা আরবী-ইরানী, গ্রীক, হিন্দুস্থানী জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নেই,— জ্ঞান জ্ঞানই, যেখান থেকে পাওয়া যায়, সেখান থেকেই গ্রহণ করতে হবে। আর বাহ্যতঃ নৃশংস অত্যাচারী সুলতানদের মনেও যে জ্ঞান-লিপ্সা ও মহত্ত্বভাব লুকিয়ে থাকে, কেউ যে নিছক ভাল বা নিছক মন্দ নয় ; ভাল-মন্দ অনেকটা বাস্তব পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, আলোচ্য উপন্যাসে এসব চিন্তারও বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন—

(১) জুরজানের সুলতানের সঙ্গে কথোপকথন :

সুলতান— আপনি বলছেন, রাজাপ্রজাদের প্রতিনিধি। কিন্তু যাকে প্রতিনিধি বলছেন, তিনি ভালমন্দ যাই করুন না কেন, তার উপর কোনও কথা বলবার অধিকার তাদের নাই— সে যোগ্যতাও নাই।

আ. বে.— মুসলিম জগতের আদর্শ যাঁরা, সেই খোলাফা-য়ে রাশেদীন কিন্তু (নিজেদেরকে) প্রজাদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করতেন। শুধু মনে করা নয়, সেইভাবেই তাঁরা জীবনযাপন করে গেছেন। আপনি নিশ্চয় তাঁদের কথা জানেন।

সুলতান— হ্যাঁ জানি। কিন্তু তাঁদের আদর্শ শেষ পর্যন্ত আদর্শই থেকে গেল, বাস্তবে টিকে থাকতে পারল না। তাঁদের আমল শেষ হবার পর উম্মীয় বংশের রাজত্বের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কি আরব, কি মিশর, কি স্পেন, এ-আদর্শ কোথাও টিকে থাকতে পারল না। যা অচল তা চলে না, যা ভঙ্গুর তা ভাঙবেই।

(২) খারিজমের সুলতান মামুনের সঙ্গে কথোপকথন :

আ. বে.— আপনি আর সবার চেয়ে আমার প্রতি অনেক বেশি অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, সেজন্য আমি মনে মনে বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করি। অন্যেরাও হয়তো এজন্য মনঃক্ষুণ্ন হয়। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

সুলতান— আচ্ছা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন : আমার ধারণা ছিল জ্ঞান মানুষের মনকে প্রসারিত করে, উদার করে, আমার এই ধারণা কি ভ্রান্ত?

আ. বে.— কেন, একথা বলছেন কেন?

সুলতান— আমার দরবারে যে সমস্ত আলেম আছেন তাঁরা সবাই জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে এমন সংকীর্ণচিত্ততা এবং পরস্পর সম্পর্কে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পরিচয় পাই, তাতে স্তম্ভিত হয়ে যাই। বড় দুঃখও পাই। ... এসব কথা যে কারু কাছেই খুলে বলা যায় না, মনে মনেই হজম করতে হয়। ... আজ হঠাৎ বলে (আপনার কাছে) ফেল্লাম।

আ. বে.— আমরা মানুষ, বড় থেকে ছোট সবাই রক্ত-মাংসে গড়া, সবাই অল্পবিস্তর দুর্বলতার অধীন। সেইজন্য পরস্পরকে যতটা সম্ভব ক্ষমা করতে শেখা উচিত।

সুলতান— উহুঁ, আপনি এড়িয়ে গেলেন। এ ক্ষমা করা না করার প্রশ্ন নয়। আমার জিজ্ঞাসা, এ কেমন করে হয়, কেন হয়?

আমি জানিনে, এই সংলাপগুলো কি আলবেরুনীর নিজের রচনা, না গ্রন্থকার আলবেরুনীর জীবনচরিত ভাল করে পড়ে, আত্মস্থ করে নিজের মত করে এইভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। যদি শেষের অনুমানটাই ঠিক হয়, তাহলে আমি একে মনে করবো অসাধারণ কৃতিত্ব। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষ নাট্যকারের মত ভিনদেশীয় নাটকীয় চরিত্র এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার মত সাহিত্যিক এ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। তাইতেই আবার মনে হয়েছে, বইখানা ঠিক হুবহু অনুবাদ ত নয়ই— কারণ, এমন স্বাভাবিক চমৎকার বাংলায় ইংরেজি বা অন্যভাষা থেকে অনুবাদ করাও অতিশয় দুরূহ কাজ। তাই, আমার বিশ্বাস, লেখক বহুদিন ধরে, বহু পরিশ্রম করে অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপার আত্মসাৎ করে, ঘটনা কিছু সংক্ষিপ্ত করে, মূল সংলাপগুলোর মর্ম ঠিক রেখে অনুবাদ করেছেন। লেখক এ-বইয়ের মারফতে এমন একজন মহা-ব্যক্তিত্বশীল সাহিত্যিক, ভাবুক ও

লোক-প্রেমিককে বাংলা পাঠকদের কাছে পরিচিত করে দিয়েছেন যে, এই কাজটাকে আমি অশেষ পুণ্যের কাজ বলে মনে করি। আশাকরি, পাঠকসমাজ এ-বই পড়ে আনন্দ পাবেন আর আত্মোন্নতির মত মহৎ ফলও পাবেন।

আমি গ্রন্থকারকে সানন্দ অভিবাদন জানাই।

কাজী মোতাহার হোসেন

৩০শে মার্চ, ১৯৬৯

আলবেরুনী : সত্যেন সেন [ ভূমিকা ]
ঢাকা, জুলাই ১৯৬৯

# কুটজ

জনাব কাজী আশরাফ মাহমুদ বিরচিত 'কুটজ' মোট চব্বিশটি কবিতার সমষ্টি। কতিবাগুলো যেন এক একটা হোমিওপ্যাথিক ডোজ, চার লাইন থেকে ২৪ লাইন পর্যন্ত লম্বা। তবু এদের প্রভাব হৃদয়বৃত্তিকে রীতিমত আলোড়িত করে তোলে : লেখকের হৃদ্-স্পন্দনের আভাস পেয়ে পাঠকের হৃদয়-বীণায় জেগে উঠে সহস্পন্দন। কবিতাগুলো গীতিধর্মী— এদের জন্ম প্রেমে, প্রকাশ সঙ্গীতে, আর পরিণতি বিরহের অলক্ষ্য ফল্গু-ধারায়।

আলোচ্য গীতি-কবিতার বাণী হিন্দী হলেও তা সহজ-বোধ্য। প্রেমের ভাষা সর্বজনীন, তাই বুঝি এত সহজ আর ইঙ্গিতপূর্ণ। কবি তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতায় বলেছেন--

"বন্ধু ন পূছো মুঝসে মেরে
ইন্ গীতোঁ কা জনম-বিকাশ,
কিসী দিবস আ লিখ যাওয়েগা
স্বয়ং প্রেম ইনকা ইতিহাস।"

তবু, কবি-বাক্য আগ্রহ করে কৌতুহলী পাঠকের দৃষ্টি দিয়ে একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, কবিতাগুলো সাজাবার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে ; অর্থাৎ প্রেমের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই গীতগুলোরও জন্ম-বিকাশ ঘটেছে।

কোনও এক কবিতা-রাণীকে অবলম্বন করেই প্রথম গীত উদ্‌গত হয়েছে ; প্রেমের গীত হলেও যেন বলি বলি করেও সে প্রেম ব্যক্ত হয়নি। তবু কবির আশা এই যে অন্তর্যামী প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে প্রিয়তমার হৃদয়ে গড়ে উঠবে কবির জন্য একটি ক্ষুদ্র নিকেতন ; আর সেইটেই হবে রাজভবনের চেয়ে বা মণিমানিক্য ও শান-শওকতের চেয়ে অধিক মূল্যবান। কবির মনে এক সমগ্র জিজ্ঞাসা উঠলে,— 'প্রেমের কীমৎ কত ?' প্রেম কানে কানে বললো,— সর্বস্বসমর্পণ'। অমনি কবির মনে হল 'বাঃ বেশ সহজ তো ?' এই চিন্তা করবামাত্র বাণী এলো,— 'সহজ নয়। বড় কঠিন পরকে আপন করা, বড় কঠিন প্রেমরত্ন লাভ করা, বড় কঠিন অবিচল প্রেম রক্ষা করা, বড় কঠিন প্রেমিক হওয়া।'

কবির প্রেম-স্বরূপা বাহু-বন্ধনে ধরা দেবার পাত্রী নয়, কিন্তু প্রেম-বন্ধনে অনায়াসেই ধরা দিল। কিন্তু হায়, কবি কি তখন বুঝেছিলেন প্রেম কত বিষ-জ্বালায় ভরা!

এরপর এলো বিচ্ছেদ। বিদায়ক্ষণে কবির, 'মধুরা' জিজ্ঞাসা করলো, 'আবার কবে আসবে প্রিয়তম ?' আকুল কণ্ঠের এই সকরুণ ধ্বনিতে কবির সারা অন্তর ভরে উঠলো। কিন্তু মুখে বাণী ফুটল না, জিজ্ঞাসার জওয়াব দেওয়া হল না। এর কয়েক বছর পরে কবি আবার ফিরে আসলেন রামটেক শৈলশিখরে, যেখানে 'মধুরাণী'র সঙ্গে প্রথম প্রেম-মিলন হয়। কিন্তু— 'কোথায় মধুরাণী?' কবির অশ্রুজলে ভরা প্রশ্নের উগ্র মৌন জওয়াব আসে— 'সে তো চলে গেছে রাজস্থানের পিলানীতে।'

এখন কবির মনে পড়ে স্মৃতিভাণ্ডারের যত পুরানো কাহিনী। হায়, কে জানতো তাকে এইভাবে একা একাই জগতের সঙ্কট-সঙ্কুল কণ্টকপথে দুঃখের ঘন-ঘোর বাদল দিনে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে অবিরাম পথ চলতে হবে, আর বয়ে বেড়াতে হবে তার শ্রমক্লান্ত অবসন্ন তনু। কবি ভাবেন, হায় নিঠুরা প্রিয়া যদি একবার মাত্র তোমাকে আমার বেদন-গীতি শুনাতে পারতাম তা'হলে তোমার চোখেও বর্ষণ নামতো। তা' যখন হবার নয়, তখন আমাকে বধ করে ফেল, আমার ক্লেশের অবসান হোক। হায় বিধি ! তুমি কেন এমন নিদয়-নিঠুর হৃদয় সৃষ্টি করেছো, যে পরের দুঃখ বোঝে না। পরের প্রতি যার কণা-মাত্র কৃপা নাই ?

এরপর কবির হঠাৎ মনে পড়ে— 'হায়, আমি একি করছি ? কেবল নিজের কথাই যে ভাবছি।' প্রেমদেব ত বলেছিলেন, আমার প্রেম-সাধ তখনই পূর্ণ হবে যখন আমি করতে পারব আমার সর্বস্ব সমর্পণ ! সত্যিই ত, প্রেম অত সহজ নয়। তখন কবি নিজের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর প্রিয়ার দিক থেকে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করেন। তখন কবির মন গেয়ে উঠলো,

"সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই,
তুমি হও সব সুখের ভাগী"

কবি কখনও প্রার্থনা করেন, 'প্রভুবর আমার প্রিয়ার পথের সব কাঁটাকে আমার প্রণয়-মন্ত্রের উপরোধে ফুল করে দাও।' কখনও প্রার্থনা করেন, 'আমি মরে যাই তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার কবরের সিথানে একটি ফলকে লিখে রেখো 'প্রেম অমর'।' আবার কখনও অনুযোগ করেন, 'হে প্রভু, দেখতো আমাকে কি বিভ্রাটে ফেলেছ : যদি আমার সুভদ্রাকে না পেলাম, তবে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ? আবার, সুভদ্রাকে না দেখেই বা এজগত থেকে বিদায় নিই কেমন করে ?'

কবির মন এখন সুভদ্রার ধ্যানে ভরপুর,— জগৎ সুভদ্রাময়। তাকে পাবার আশায় বা না-পাবার আশঙ্কায় কবি-হৃদয় আন্দোলিত। কখনও মনে হয়, আজকের ডাকে বুঝি প্রিয়তমার চিঠি আসবে। আবার মনে হয়, যে-আঁখির কৃপা-দৃষ্টি লাভের জন্য জগৎশুদ্ধ সকলেই উদ্‌গ্রীব, সেদিন প্লাটফর্মে তো সেই যুগল আঁখি কেবল আমাকেই খুঁজে ফিরছিল। আবার কবে আমি এই চর্ম-চক্ষে সেই প্রিয় আঁখি দুটি দেখে জীবন সার্থক করতে পারব ?

কবির অন্তর কেঁদে ওঠে প্রিয়া-বিরহে। কবে পূর্ব-জন্মের শাপমোচন হবে ? পুনর্জন্মের মিলন-প্রভাতের আর কত দেরী ? তারপর, কবি যেন পৃথিবী থেকে শেষ-বিদায়ের দিন প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে বলছেন, 'হে বন্ধু, এ জীবনে ত আমার হৃদয়-ব্যথা তোমাকে কিছুই জানিয়ে যেতে পারলাম না। কিন্তু আর একদিন আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব। সেদিন আমার নিজের সমুদয় ব্যথা-বেদনার কাহিনী ত শুনাবই,— সেই সঙ্গে আরো শুনাব নিখিল-বেদনার এমন একটি উতরোল গীতি যার আকুল ক্রন্দন-ধ্বনিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয় কেঁপে উঠবে।

প্রেমের এই চিরন্তন ইতিহাস কবি গেঁথেছেন কয়েকটি কবিতার মালায়। বিরহী যক্ষ যেমন মেঘদূতের হাত দিয়ে এক আঁজলা কুটজফুল বা গিরিমল্লিকা পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশ্যে, কবিও তেমনি রামগিরি পর্বতের তটবর্তী রামটেকের মনোরম কুঞ্জভবন থেকে হৃদয়-কুসুম চয়ন করে পাঠাচ্ছেন রাজস্থানের পিলানী গ্রামে— যেখানে তাঁর 'কানী' নাম্নী কবিতারাণী, প্রিয়বালা, সুভদ্রা, রাণী, সুকুমারী, মধুবালা, বধুরা, মধুরাণী বা বঁধুয়া অবস্থান করছেন। এই হৃদয়-কুসুম-হারের সবগুলো ফুলই সমান সুন্দর। এগুলো পালাগানের মত করে একের পর একটি গাওয়া যেতে পারে। তাতে এক চমৎকার দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি হবে,— যেমন

রেখে গেছেন আমাদের পল্লীর আদিম স্বভাবকবিরা মন-কুসুমের বনমাল্য বিনাসূতের নিবিড় বন্ধনে।

কবির মর্মজাত এই কুটজগুচ্ছ অবশ্যই বাংলাদেশের মর্মজ্ঞ কাব্য-রসিকদের মর্মস্পর্শ করবে। এজন্য হাজার শুকরিয়া।

— কাজী মোতাহার হোসেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
২৮-৮-১৯৫৯

কুটজ : কাজী আশরাফ মাহমুদ [মূল হিন্দি-কাব্যের জন্য লিখিত ভূমিকা]
ঢাকা, নভেম্বর ১৯৫৪
চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

# শিক্ষা

## শিক্ষা-প্রসঙ্গে

কোন্ জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করবার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য। এসবের ভিতর দিয়ে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়; নৈতিক ও সামাজিক মানের পরিমাপ পাওয়া যায়; এবং কর্ম-ক্ষমতা, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, এক কথায় জাতীয় আদর্শের ভিত্তি-ভূমির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জাতীয় ঐতিহ্য অবশ্যই অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানের চেষ্টায় পরিপুষ্ট হয়। তা'ছাড়া এর ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য শিশু, কিশোর ও নওজোয়ানদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত ক'রে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার এত গুরুত্ব।

মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এরও আগে পিতামাতার মনোবৃত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈহিক দোষগুণ প্রভৃতির প্রভাব কিছুটা উত্তরাধিকার-সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে বয়স্কদেরও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই ধরনের শিক্ষার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ফলে, অনেক দম্পতিকেই সারা জীবন শিশুর পরিবেশ-সৃষ্টি এবং বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থায় অসংখ্য ভুল ক'রে শেষজীবনে পস্তাতে দেখা যায়। সম্প্রতি করাচীর উপকণ্ঠে 'তো'লীমে জামিয়া মিল্লিয়া'র কর্তৃপক্ষ সহজ উর্দুভাষায় বয়স্কদের জন্য কয়েকখানা বিশেষ ধরনের পুস্তিকা ছাপিয়েছেন। বাংলাদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা ব্যাপক এবং প্রচুরভাবে গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থাও আমাদের দেশে সন্তোষজনক নয়। উন্নত দেশে দুই থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়সের শিশুর শিক্ষায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এই বয়সে অনেক শিশু স্কুলে একত্র জড়ো হয়ে খেলাধূলা করে, নক্সা আঁকে, কাঠের বা মোটা-কাগজের টুকরো জোড়া দিয়ে অনেক রকম প্যাটার্ন বা আকৃতি তৈরি করে; চিত্র-বিচিত্র বইয়ের ছবি দেখে, কাঠের অক্ষর দিয়ে খেলা করতে করতে শব্দ তৈরি করতে শেখে, বস্তু গণনা করতে করতে সংখ্যার ধারণা লাভ করে, আশে-পাশের সাধারণ জিনিস ও পশু-পাখীর নাম শেখে, মজার মজার ছড়া আবৃত্তি করে। এই ধরনের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে দিয়ে সহজে ও স্বাধীনভাবে তাদের আপন-আপন স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর চর্চা হ'তে থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরা ধৈর্য ধ'রে অনেকটা অলক্ষ্যে প্রত্যেকটি শিশুর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে সেইসব দিকে ওদের বিকাশলাভের সুযোগ করে দেন। এইভাবে, বেত ও ধমকের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে এর কতকটা নকল আরম্ভ হয়েছে। আমরা বিলেতি পদ্ধতির স্কুলে কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে ইংরেজী বোল শেখাচ্ছি, আর এইসব ছেলেমেয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে নিজেদেরকে দেশের লোকের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিখছে। এতে উক্ত স্কুলসমূহের পরিচালকদের অর্থাগমের সুবিধে হচ্ছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট

ছেলেরা দেশের লোকের কাছে পর ব'নে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের বাল্যশিক্ষার কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকাতেই দেশের বড়লোকেরা বহু অর্থব্যয় করে এই ধরনের শিক্ষার সহায়তা করবার একটা মস্ত অজুহাত পেয়েছেন। আসল কথা, যতদিন আমরা মাতৃভাষাকে সম্মান দিতে না পারব, যতদিন আমরা বিদেশী ভাষাকেই উচ্চ চাকুরীর সোপান ব'লে জানব, যতদিন আমাদের কাজে দেশীয় ঐতিহ্যের চেয়ে বৈদেশিক চাক্‌চিক্যই অধিক মনোহর বলে বোধ হবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কার নিরর্থক হয়েই থাকবে।

শিশুর সাত-আট বছর বয়সে সাধারণত সংখ্যার ধারণা, সময়ের ধারণা এবং সাধারণ ব্যাপারে কার্য-কারণ সম্বন্ধেরও কিছু ধারণা জন্মে। ইতিপূর্বে জবরদস্তি করে তার কৌতূহলী বৃত্তি নিস্তেজ করে দেওয়া না হলে, এই বয়সেই এর প্রথম পাঠের সূচনা করায় ক্ষতি নেই। অবশ্য এ সময় মাতৃভাষায় হস্তলিখন, এবং ক্রমশ ১ থেকে ১০, ২০, ৪০ বা ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা এবং লিখন-পদ্ধতি শেখান যেতে পারে। এ বয়সে স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে। তাই সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে চার-পাঁচ খানা সহজ সাহিত্যপুস্তক, খানিকটা ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি এবং অমিশ্র ও মিশ্র যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ লঘুকরণ, ভগ্নাংশ, দশমিক, ঐকিক নিয়ম বেশ ভাল করে শেখান যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নামতা, ভাল ভাল বাংলা কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি মুখস্থ করান উত্তম ব্যবস্থা। সঙ্গীত, নামতা প্রভৃতি সমবেত কণ্ঠে উচ্চ স্বরে বারংবার অভ্যাস করালে উচ্চারণের ত্রুটি শোধরানোর সাহায্য হয়, আর অল্প সময়েই কাজ হয়। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক মহাশয় ব্যক্তি পশ্চিমের অনুকরণে বলতে শুরু করেছেন, না বুঝে মুখস্থ করান সেরেফ আহম্মকী। একথা অনেক বিষয়ে প্রযোজ্য হলেও সর্বত্র খাটে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বুঝাবার আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি কিন্তু সে বুঝ কাজে খাটাতে হ'লে অনেক অভ্যাসের দরকার। আমি দেখেছি আজকালকার অনেক বি-এ, এম-এ ক্লাসের ছাত্র ১৩-কে ১৫ দিয়ে গুণ করলে কত হয় তাও পুরো পাঁচটি লাইন অঙ্ক কষে এবং দুই দুটো কসি টেনে তবে বের করে! কিন্তু ঐ পর্যায়ে শিক্ষিত বা ওর চেয়ে অনেক অল্পশিক্ষিত প্রাচীন লোকে এক নিমেষেই উক্ত গুণফল বলে দিতে পারে। এতে প্রমাণ হয় না যে বর্তমান বি-এ, এম-এ'র চেয়ে ঐসব প্রাচীন ব্যক্তি অঙ্কশাস্ত্রে অধিক বিশারদ; কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে আজকাল ছেলেবেলায় আবশ্যক মত নামতা মুখস্থ না করার ফলে সারাজীবন ভরে অনেক সময়ের অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের জ্ঞানের মধ্যে এমন কতকগুলো বিষয় আছে প্রচলিত রীতি বা বিশ্বাসের উপরই যার প্রতিষ্ঠা। প্রথমে বিশ্বাস না করে তর্ক আরম্ভ করলে শিক্ষার অগ্রগতি হতে পারে না। 'ক' কেন আগে হবে 'গ' কেন আগে হবে না—এ কথা আগে হৃদয়ঙ্গম করে পরে বর্ণমালা শিখব বলে যদি কেউ অপেক্ষা করতে থাকে তবে সেই অতি-পণ্ডিত আহম্মককে হয়ত আজীবন নিরক্ষরই থেকে যেতে হবে। শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলো বিষয় এত বার ঘুরে ঘুরে আসে যে সেগুলো আগেই মুখস্থ করে রাখলে প্রয়োগ-ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়। মানুষের জীবনে যেমন কতকগুলো ব্যাপার সহজাত ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। নাকের উপর একটা মাছি বসলে যেমন লোকে কোনও ভাবনা-চিন্তার আগেই হাত দিয়ে মাছিটা তাড়িয়ে দেয় তেমনি অধিক ব্যবহার্য কতকগুলো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে হয়—যাতে সেগুলো প্রয়োজন মত অনায়াসে খোদ-ব-খোদ ব্যবহার করা যায়। অবশ্য যেসব বিষয় জীবনে ব্যবহার করার প্রয়োজনই হয় না বা হলেও তা যৎসামান্য—সেসব বিষয়ের কথা

স্বতন্ত্র। আবার উৎকৃষ্ট সাহিত্যে বা আর্টে এমন সব অসাধারণ জিনিস আছে যা সাধারণ লোকের পক্ষে ভেবে বের করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছে বিনা দ্বিধায় মাথা নত করাই সঙ্গত। ঐসব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদ মুখস্থ রাখলে চিত্ত সরস হয় আর জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সেসব স্মরণ করে মনে শান্তি সাহস বা উৎসাহ আসে। ইচ্ছে করে এমন সম্পদ হারানো বুদ্ধিমানের লক্ষণ বলে মনে করা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে সাত থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যেই ইসলামী শরা-শরিয়তের কতকগুলো অত্যাবশ্যক বিষয় মুখস্থ করার এবং বাকী কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় দশ বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা বা তার বর্ণমালা শেখান উচিত নয়। এগার ও বারো বছর বয়সে আরবী বর্ণমালা এবং আমপারা শেখান দরকার। এই বর্ণমালা আয়ত্ত হলে ছোট ছোট দুইএকখানা উর্দু বইও ছেলেরা এই সঙ্গে বা মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ে শেষ করতে পারে।

বর্তমানে ইংরেজী ভাষার উপর যতটা জোর দেওয়া হচ্ছে তা অযৌক্তিক ব'লে মনে হয়। বলা বাহুল্য মাতৃভাষার দাবি সর্বাগ্রে ও তারপর দ্বিতীয় ভাষারূপে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের সাধারণ ভাষা উর্দু শিক্ষণীয়। এই শিক্ষা সেকেণ্ডারী স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে দিলেই ভাল হয়। তারপর ইচ্ছামত কোনও কোনও ছাত্র সেকেণ্ডারী স্কুলের উচ্চস্তরেও পড়তে পারে কিন্তু সকল ছাত্রের উপরেই এ ভাষা অতদিন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা যুক্তিযুক্ত হবে না। সাধারণ ছাত্র সেকেণ্ডারী স্কুলের শেষ তিন বছরে ইংরেজী বর্ণমালা এবং সহজ বাক্যরচনা মোটামুটি শিক্ষা করবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে শেষ স্কুল-পরীক্ষান্তর পর্যন্ত যেতে যেতে সাধারণ সকল ছাত্রই দুই বছর আরবী বর্ণমালা ও দীনিয়াৎ শিক্ষা করবে, আরও দুই বছর বিশেষভাবে উর্দু বর্ণমালা ও উর্দু পঠন অভ্যাস করবে, আর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিন বছর ধরে ইংরেজী বর্ণমালা ও বাক্যরচনা শিক্ষা করবে। বাংলা ভাষার উপর অধিক জোর দেওয়াতে এই ভাষার ব্যাকরণ রচনাপদ্ধতি বাগ-বিধি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে একটা চলন-সই ধারণা জন্মাবে। তার ফলে দুই বছরেই উর্দু কথাবার্তা বুঝবার মত এমনকি সামান্য অভ্যাসে বলবার মত অবস্থা হবে; আর শেষের তিন বছরে যতটা ইংরেজী শিখবে তা মোটামুটি বর্তমান নবম শ্রেণীর শিক্ষার মত ত হবেই তার চেয়ে ভালও হতে পারে।

ইউনির্ভাসিটিতেও মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। তা হলে উচ্চশিক্ষার সহায়তার জন্য ইংরেজী জানবার প্রয়োজন হবে না, তবে যারা রাষ্ট্রদূত হবে, বা বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা লাভ করবে, তাদের জন্য প্রয়োজন মত ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, চীনা, রাশিয়ান প্রভৃতি বিবিধ ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সকল ছাত্রই রাষ্ট্রদূত বা বৈজ্ঞানিক হবে না। তা ছাড়া মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী হতে হলেও ইংরেজী জানা অপরিহার্য নয়,—সঙ্গে দোভাষী থাকলে তাদের মধ্যবর্তিতায় ভাষা আদান-প্রদান করা চলতে পারে। অবশ্যই উচ্চ কর্মচারী, উৎকৃষ্ট নাগরিক বা সফল ব্যবসায়ী হতে হলে কাল্‌চার বা তাহজীব একান্তই জরুরী। এই কাল্‌চার ইংরেজী ভাষাতেই আয়ত্ত করতে হবে,—তার কোনও মানে নেই। আসল কাল্‌চার বলে তাকেই যা লোকের মনেপ্রাণে প্রবেশ করছে। সে কালচার মাতৃভাষার ভিতর দিয়েই আত্মস্থ হয়ে থাকে। দুই-চারটা ইংরেজী, বাংলা, উর্দু বা আরবী বোলচাল শুধু কণ্ঠাগ্রে রাখলেই, সত্যিকার সভ্য মানুষ হওয়া যায় না। দীর্ঘদিনের বদ-অভ্যাসে আমরা এই সহজ সত্যটা ভুলে গিয়ে গতানুগতিক চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরে মনের 'জড়ত্ব' প্রমাণ করছি মাত্র।

আমাদের বর্তমান দাস-মনোবৃত্তির পরিবর্তন হলেই পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্ধারণ এবং তালিকা প্রণয়নের কাজ সুচারুরূপে চলতে পারবে। আমাদের দেশ আবহমান কাল থেকেই কৃষিপ্রধান রয়েছে—আরও বহুকাল যাবৎ এমনই থাকবে। অথচ কোন্ ঋতুতে কোন্ ফসলের চাষ হয়, কি কি ফল জন্মে, এসব উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় যায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বাড়ান যায় কিনা—এসব জীবন-সংশ্লিষ্ট জরুরী বিষয়ের আলোচনা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে আদৌ দেখা যায় না। মনে হয় যেন এসব এমন জিনিস যা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাবারই যোগ্য নয়। ইংরেজ আমলে আমাদের শিক্ষার ভিতর দিয়ে সর্বসাধারণকে তাচ্ছিল্য করবার যে মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে, আসলে এ ব্যাপারটি তারই এক উৎকট প্রকাশ। বর্তমানে অবশ্যই এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে, গতর খাটান পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে হবে, আর দেশের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

এতক্ষণে সেকেণ্ডারী এডুকেশন পর্যন্ত পঠনীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, যে শ্রেণীর জন্য পুস্তক লিখিত হচ্ছে তা' সেই শ্রেণীর মধ্যম রকম ছাত্র বা ছাত্রীর বোধগম্য হওয়া চাই। এদিক দিয়ে অনেক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকই সত্যি সত্যি অনুমোদনীয় নয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করতে হলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কী যে করা দরকার, তা বেশ একটু ঘোরালো হয়ে উঠছে। নৈতিকতার মান নেমে পড়ার ফলে, এবং কতকটা পাঠ্যপুস্তকের লেখক এবং বিচারকের বুদ্ধির ভ্রমে, অযোগ্য পুস্তকও যোগ্য বলে চালান হচ্ছে। বিশেষ করে বইয়ের ভিতরে কি আছে, তার চেয়ে রংচং কেমন, কাগজ, নক্সা প্রভৃতি কেমন, এইসব বাহ্য বিষয়ের উপরেই যেন অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। অবশ্য, শিশুর বই আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। কিন্তু তাই বলে শুধু বাইরেটাই নয়, বিষয়-বস্তু এবং বর্ণনার সরসতার দিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া উচিত। তা ছাড়া আমাদের দেশে ছাপা-বাঁধাই এবং কাগজের উৎকর্ষ কি পরিমাণ সম্ভব, সেটাও বিচার্য। এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই যে, যাঁরা সিলেবাস প্রণয়ন করেন, তাঁদের আমরা বিশেষজ্ঞ বলেই মানি; তবু অঙ্ক ও বিজ্ঞানের সিলেবাসে এবং অন্যত্রও সচরাচর এমন সব প্রসঙ্গ থাকে যা নানা কারণে ত্রুটিপূর্ণ। সিলেবাসের পৃষ্ঠা কখনই বিশেষজ্ঞদের বিদ্যা প্রকাশের ক্ষেত্র বলে গণ্য হতে পারে না। আমার মনে হয়, যেসব কারণে ভাল পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাও অনেক সময় উৎকৃষ্ট বই লিখতে সাহস পান না, তার একটি বড় কারণ সিলেবাসের অযৌক্তিকতা। সিলেবাস যতই রদ্দি হোক না কেন, তার অনুগত না হলে উৎকৃষ্ট বইও খারিজ হয়ে যাবে। তাই, বাধ্য হয়েই অনেক কটোমটো বা অপ্রধান খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করে পাঠ্যপুস্তককে রীতিমত ভয়াবহ করে তুলতে হয়। দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপার কিসে শোধরাবে, তার নির্দেশ দিতে পারছিনে। হয়ত এজন্য ধীরস্থির শিক্ষাবিদদের কনফারেন্স ডাকার প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃত ধীরস্থির বা সুস্থচিত্ত শিক্ষাবিদ বেছে বার করবে কে? বর্তমান সামাজিক অবস্থায় শিক্ষা সম্পর্কে এই একটা প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে বলতে হবে। অধিকন্তু পাঠ্যপুস্তকের বোর্ড এমন কতকগুলো নিয়ম করেছেন যার ফলে মর্যাদাসম্পন্ন লোকের পক্ষে পাঠ্যপুস্তক লেখা সম্মান-হানিকর হয়ে পড়েছে।

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে অবিলম্বে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য পরিভাষা সৃষ্টি হচ্ছে। সে-পরিভাষাও কালক্রমে আরও পরিবর্তিত করবার প্রয়োজন হবে। তাই মনে হয়, চলতে চলতে পথ সৃষ্টি করে নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

ইতিহাস বা ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষায় কিছুদিন আগে এমন অবস্থা ছিল যে আমরা ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাস জানি বা না জানি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশের ইতিহাস জানতেই হবে। আমরা নজরুল, রবীন্দ্রনাথ বা ইকবালের সঙ্গে পরিচিত থাকি না থাকি, শেক্সপিয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, কোলরিজ, কুপার প্রভৃতির কাব্য এবং তার সমালোচনা আয়ত্ত করতেই হবে। এ অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলেও যথোপযুক্ত সংস্কার এখনও হয়নি। অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও একই অবস্থা। আমরা ঘরের খবর জানি না, জানবার প্রয়োজনও বোধ করি না,— কিন্তু বৈদেশিক অর্থনীতি, তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন, দর্শন প্রভৃতি না জানলে দশের কাছে, অর্থাৎ উপরওয়ালাদের কাছে মান থাকে না। মোট কথা দেশকে ভালবাসতে হবে, নইলে দেশের উন্নতি হবে না। অন্য দেশের লোক দয়া করে এসে আমাদের দেশে রাশি-রাশি উন্নতি বর্ষণ করবে না, নিজেদেরকেই উদ্যোগী হয়ে দেশের উন্নতির জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হবে। তাতে নিজের উন্নতি হবে, দেশেরও উন্নতি হবে। দশজনকে সঙ্গে নিয়ে উঠতে না পারলে প্রকৃত উন্নতি হবে না, দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ স্থাপিত হবে না। কাজে কাজেই নিজেদের প্রাণের ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে হবে, দেশের লোককে আপন ভাবতে হবে, তবেই উন্নতি। আমরা বিদেশীর সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক রাখব, কিন্তু তাই বলে নিজের দেশে নিজেরাই বিদেশী বনে যেতে রাজী নই। যে-শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে ঘৃণা করতে শেখায় বা তাদেরকে শোষণ করবার প্রবৃত্তি জোগায়, সে-দুষ্ট শিক্ষা থেকে আমাদের শতহস্ত দূরে থাকা দরকার; তাই, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম নিজের মাতৃভাষা, তারপর পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান ভাষা, তারপর সব শেষে বিদেশীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ভাষা শিক্ষা করবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ করতে পারলেই আমাদের আত্মমর্যাদা বাড়বে, প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি হবে, আর বৈদেশিকদের সঙ্গেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান আসনে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা এবং উন্নতির এই একমাত্র পন্থা।

১৩৬৫

# শিক্ষা-পদ্ধতি

মাননীয় ভাইস-চান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সভ্যবৃন্দ, অধ্যাপক ও কর্মনির্বাহকগণ এবং উপস্থিত সুধী-মণ্ডলী;

আপনারা আজকের এই অভিষেক অনুষ্ঠানে কিছু বলার জন্য আহ্বান করে আমাকে বিশেষ সম্মানিত করেছেন। আপনাদের এই প্রীতির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। প্রীতি ও সৌহার্দ্য অনেক সময় অপ্রধানকেও প্রধান করে থাকে, তাই নিজের যোগ্যতার বিচার না করেই, আপনাদের প্রীতির প্রশ্রয়ে, শুধু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও বিশেষ ক'রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ কথা বলতে উদ্যত হ'য়েছি।

শিক্ষার উদ্দেশ্যই অবশ্য দেশ-কালের উপর নির্ভর করে। পাক-ভারতেও ইতিপূর্বে মাদ্রাসা ও টোলে একপ্রকার শিক্ষা ছিল। পরে বৃটিশ আমলে অন্য প্রকার শিক্ষার প্রবর্তন হয়, এবং কালে কালে তারও রূপ বদল হয়েছে। বর্তমানে স্বাধীন পাকিস্তানে যে শিক্ষানীতি চালু হয়েছে, তাও একেবারে অতীতকে অগ্রাহ্য করে হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে কেমন শিক্ষা-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, তার বিস্তৃত বর্ণনা আমরা রবীন্দ্র-রচনা থেকেই পাই। প্রাচীন কালে আফলাতুন, আরস্তু, সেকেন্দর বাদশা কেমন শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় গ্রীক সাহিত্য থেকে। মধ্যযুগে ফেরদৌসী, ইবনে খালদুন, মৌলানা রুমী, দান্তে, শেখ সাদী প্রমুখ বিশ্ব-শিক্ষকেরা কি ধরনের শিক্ষা পছন্দ করতেন, তাও জানা যায়, তাঁদের রচিত সাহিত্য থেকে। আমি এখানে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগৃতি যুগের ফ্রাঁসোয়া রাবেলেইর (Francois Rabelir, মৃত্যু ১৫৫৩) রচিত "দৈত্য-মানব গার্গানটুয়ার শিক্ষা-বিভ্রাট ও সংশোধন" থেকে কিছু অংশের সংক্ষিপ্ত-সার উল্লেখ করছি :

গ্রাংগৌশিয়া তাঁর পুত্র গার্গানটুয়ার বিচক্ষণ কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলেন, এমন মেধাবী ছেলের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক চাই। তাই তুবাল হলোফার্নিস নামক একজন বিখ্যাত তর্কবাগীশ ও ব্রহ্মবিদ্যাবিশদ (Sophist এবং Dr. of Theology)-কে গুরু নিযুক্ত করা হ'ল। ইনি এমন সুচারুরূপে A B C D শিখালেন যে ছাত্র ৫ বছর ৩ মাসের মধ্যেই প্রথম থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত এবং শেষের থেকে প্রথম অক্ষর পর্যন্ত গড় গড় করে আবৃত্তি করতে শিখলো। এ ছাড়া মাত্র ১৩ বছর ৬ মাস ২ সপ্তাহের মধ্যে নীতিকথা, ব্যাকরণ, পুরাণের অসত্যতা ও ঐশীগ্রন্থের সত্যতা সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞান আয়ত্ত হ'য়ে গেল। এই সঙ্গে অবশ্য গথিক কায়দায় হস্তলিপি কৌশলও শেখা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এর পর ১৮ বছর ১১ মাসের মধ্যেই টীকা-টিপ্পনীসহ প্রাচীনতম ন্যায়শাস্ত্র এবং পরমার্থ বিদ্যার যাবতীয় বিষয় এত গভীরভাবে আয়ত্ত হল যে এই কৃতি ছাত্র সমুদয় ধর্মগ্রন্থ ও সুসমাচারগুলো 'আদ্যন্ত' ও অন্ত্যাদি উভয়ক্রমেই অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতো। এর পর ১৬ বছর ২ মাসে বৃহৎ-

খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা অনুসারে যাত্রার শুভাশুভ দিন-ক্ষণ, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত-কাল, চন্দ্রের তিথি এবং জন্মদিনের গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও ফলাফল গণনা শিক্ষাও সমাপ্ত হল।

এমন সময় ১৪২০ সালের বসন্ত মহামারীতে হলোফার্নিসের মৃত্যু হওয়াতে জোবিন ব্রাইড অথবা জটার ক্লুটপোল গার্গানটুয়ার নতুন গুরু নিযুক্ত হলেন। ইনি শিক্ষা দিলেন লাতিন শব্দকোষ, দার্শনিক অভিধান, ধাঁধা ও জওয়াব (অথবা হেঁয়ালি ও সমাধান), বাইবেলের ভাষ্য, ধর্ম-সঙ্গীতবোধিকা, ভোজনটেবিলের আদবকায়দা, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর নীতিমালা, শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী মৌলিক গুণাবলী এবং ধর্মবেদী থেকে উচ্চারিত আদর্শ উপদেশাবৃত। কিন্তু পুত্র এত চৌকশ লেখাপড়া শিখলেও কেন যেন ক্রমে ক্রমে গ্রাংগৌশিয়ার মনে খটকা ঠেকতে লাগলো—বাবাজী যেন দিন দিন বে-ওকুফ, মেধামরা, খাপছাড়া, আর মাথা-পাতলা (কূরমগজ) হ'য়ে উঠছে। তাই তিনি একদিন তাঁর এক বন্ধুর কাছে কথাটা পাড়লেন। এই বন্ধু ছিলেন প্যাপেলোগস-এর ভাইসরয় ডন ফিলিপ। ইনি জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে কি কি পড়েছে, আর কার কাছে পড়ছে? সব কথা শুনে তিনি বললেন, "ওসব বই পড়ার চেয়ে ছেলে যদি কিছু না-পড়ে, সেও ভাল। আর ঐসব বিদ্যাদিগগজদের কাছ থেকে যা শিক্ষা পাওয়া যায়, তা নিতান্ত বাজে—ছাইভস্ম ছাড়া কিছু নয়। আমি বলতে পারি, আজকালকার ছেলে ভাল লোকের কাছে দু-বছর পড়েই অনেক কিছু শিখতে পারে। আমার বিশ্বাস, এই যে দেখছেন আমার ছোকরা ইউডেমন এখনও বারো বছরে পড়ে নি; ওর সঙ্গে আপনার ছেলে প্রতিযোগিতায় নামলে আমার মন্তব্য হাতে হাতে প্রমাণিত হ'য়ে যাবে।" এ কথায় গ্রাংগৌশিয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললেন, "ভাল কথা, প্রতিযোগিতা হোক।" এই বলে তিনি ডন ফিলিপের ছোকরাটাকে বিতর্ক শুরু করতে বললেন। একথায় ইউডেমনন ভাইসরয়ের অনুমতি নিয়ে মাথার টুপি হাতে করে অত্যন্ত অপ্রতিভ অথচ বিনীতভাবে গার্গানটুয়ার দিকে তাকিয়ে তার প্রশংসা কীর্তন করল, প্রথমে তার সুচরিত্র ও সৎস্বভাবের জন্য, তারপর তার জ্ঞান ও বিদ্যার জন্য, তৃতীয়ত তার বংশমর্যাদার জন্য, চতুর্থত তার সুগঠিত দেহসৌষ্ঠবের জন্য এবং সর্বশেষ তার মহামান্য পিতা যেরূপ স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে তার লালনপালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, সেজন্য তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে অনুগত কৃতজ্ঞ থাকার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করলো; এবং সর্বশেষে বললো—"একণে আমি বিশ্বপতির কাছে একটিমাত্র বর প্রার্থনা করছি তা হচ্ছে এই যে, আপনি আমাকে আপনার খেদমতগার করে নিন, যাতে আপনার পূর্ণ সন্তোষ বিধান করতে পারি।" বক্তৃতাটা এমন মনোজ্ঞভাবে যথাস্থানে জোর দিয়ে, এমন সুন্দর উপমা প্রয়োগ করে ও লাতিন ভাষায় নিখুঁত বাগভঙ্গী বজায় রেখে এমন সুকৌশল বাগ্মিতার সঙ্গে প্রদত্ত হ'ল যেন গ্রাক্কাস, সিসেরো অথবা সুপ্রাচীন লেপিডাসের বক্তৃতা।

এই ভাষণে নিতান্ত অভিভূত হ'য়ে গার্গানটুয়া কেবল রুগ্ন বাছুরের মত আর্তস্বরে গোঙাতে লাগলো, মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। এই ঘটনা দেখে গ্রাংগৌশিয়া ত প্রতিজ্ঞা করে বললেন,—"মাষ্টার জোবেলিন ক্লুট পলকে আর আস্ত রাখবো না।" যা হোক মহানুভব ডন ফিলিপ অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে তাঁর ক্রোধ শান্ত করলেন। গুরুমশাইয়ের বেতন চুকিয়ে দিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হ'ল, আর ডন ফিলিপ তাঁর বন্ধু গ্রাংগৌশিয়ার অনুরোধে ইউডেমনকে গার্গানটুয়ার অনুচর রূপে, আর ইউডেমনের শিক্ষক পনোক্রেটিসকেই গার্গানটুয়ার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। পনোক্রাটিসের কাজ কিন্তু সহজ

ছিল না। প্রথমে নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, ভোজন, পঠন, শরীর গঠন ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত অনেক বদ-অভ্যাসও সারিয়ে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। এ পদ্ধতির কর্মসূচী হল—

(১) ভোর ৪টায় শয্যাত্যাগ ও পরিচারক কর্তৃক গাত্র মর্দন। এই সময় সুকণ্ঠ ও সুস্পষ্ট স্বরে পবিত্র ঐশী পুস্তকের পাঠ শ্রবণ। পবিত্র গ্রন্থ পাঠের বক্তব্য, যুক্তি অনুসরণ করে গার্গান্টুয়া অনেক সময় উপাসনা, প্রার্থনা, সর্বশক্তিমান আল্লার মহিমা স্মরণ করতো এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম কৃপার জন্য শুকরিয়া আদায় করতো।

(২) এরপর নির্জন স্থলে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে ফিরে আসবার পথে তার শিক্ষক পুরাতন সবক পুনরাবৃত্তি ক'রে দুর্বোধ্য বিষয়াদি ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। গৃহে ফিরে আসার পর আকাশ পর্যবেক্ষণের পালা, আগের দিনের আকাশ আর আজকার আকাশের মধ্যে কোথায় কি পার্থক্য সূর্য ও চন্দ্র কোন্ মোকামে বা গৃহে প্রবেশ করছে—এই সব ছিল লক্ষ্যের বিষয়।

(৩) এরপর তার অঙ্গসজ্জা, চুল আঁচড়ান, নখ-চুল ছাঁটাই, সুরভি লেপন প্রভৃতি কাজ অনুচরেরাই করত। ততক্ষণে আগের দিনের পাঠ আবার শোনান হত। তারপর গার্গানটুয়া নিজেই আবৃত্তি করতে করতে মুখস্থ করে ফেলত, আর ঐ পাঠ সংক্রান্ত নীতিকথা, বিশেষ করে মানবীয় প্রয়োজনে লাগে এমন সব নীতি ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা হত। সচরাচর এ সব কাজ অঙ্গসজ্জা সমাধা হওয়ার সাথেই শেষ হত, কিন্তু সময় সময় বিতর্কমূলক বিষয় হলে ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত সময় লেগে যেত।

(৪) এরপর কম-সে কম ২/৩ পাঠ বা বক্তৃতা শুনবার পর টেনিস কোর্ট বা অন্য খেলার মাঠে যাবার পথে আবার পঠিত বিষয়ে পুনরালোচনা চলত। এর পর টেনিস খেলা, হ্যান্ডবল বা ত্রি-কৌণিক কাচ বল প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শরীরচর্চা হত। অবশ্য, ইচ্ছামত যে কোন খেলাই খেলা যেত, যতক্ষণ না রীতিমত ঘর্ম নির্গত হয় বা শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। তখন অনুচরেরা গা মুছিয়ে দিত, গা মলে দিত; তারপর শার্ট বদল ক'রে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এসে প্রাতঃরাশের জন্য অপেক্ষা করত। এই অপেক্ষমাণ অবস্থায়, পাঠ্যবিষয়ের কিছু বাদ পড়ে গিয়ে থাকলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হত।

(৫) এইবার ভোজনের পালা। এ সময় মধুর আলাপ ও কথাবার্তা চলতো। বিশেষ করে দ্রব্যের উৎকর্ষ, খাদ্যের পুষ্টিকর ক্ষমতা, শরীরের বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক উপাদান, বিভিন্ন রন্ধনপ্রণালী, দেহ-মধ্যে খাদ্যের গতি ও বিভিন্ন দেহরস দ্বারা তার পরিবর্তন, রক্ত ও মাংস শিরা-ধমনী, যকৃত, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির বিষয় ইত্যাদি আলোচনাই অধিক হত। খাওয়ার পর দাঁত মাজা, খেলাল ব্যবহার, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে হাত মুখ-চোখ ধোওয়া, ইত্যাদির পর আল্লার মহিমাসূচক স্তোত্র পাঠ করে ভোজনপর্ব শেষ হত। এর পর খানিকটা বিশ্রাম, তাস-খেলা, ঘুঁটি-খেলা ইত্যাদি।

(৬) এইভাবে পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীত এইসব মানবীয় বিষয়ে গার্গান্টুয়ার উৎসাহ বেড়ে গেল। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা, কিছুটা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাও চর্চা হ'ত।

(৭) এরপর আবার ঘণ্টা তিনেক প্রধান পাঠ্যপুস্তক নিয়ে পড়াশুনা চলত।

(৮) এরপর বৈকালে জিমনষ্টিকস্, বর্শাচালন, অশ্বধাবন, অসি-সঞ্চালন, মৃগয়া, সন্তরণ, নৌকা-চালন, পর্বতারোহণ, খাল-উন্নয়ন, দুর্গ-দেওয়ালে আরোহণ, রজ্জু-আকর্ষণ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় ক্রীড়াভ্যাস করা হত।

আবার বাদলের দিনেও একটা স্বতন্ত্র কর্মসূচী ছিল। যেমন—

(১) আবহাওয়ার দুরন্তপনা শুধরাবার জন্য আগুন জ্বালান হ'ত, তারপর স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আমোদজনক ব্যায়াম হিসাবে খড়ের আঁটি বাঁধা, চেলা ফাড়া, করাত দিয়ে তক্তা বানান, ধানগাছ আছড়িয়ে ধান বের করা, চিড়ে কোটা প্রভৃতি কাজে রত হ'ত।

(২) এরপর চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে আলোচনা চলতো। আবার ইচ্ছা হ'লে তারা স্বর্ণকার, পাথর-তরাশ, লৌহকার, ঝালাইদার, আলকেমী গবেষণাগার, মুদ্রা ঢালাইকক্ষ, ভেলভেট ও কার্পেটের কারিগর, তন্তুবায়, ঘড়িনির্মাতা, ছাপাখানা ও অন্যান্য কারখানার কাজ দেখে ও জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতো।

(৩) অথবা, তারা প্রকাশ্য বক্তৃতা, সরকারী সম্মেলন (convocation), বিখ্যাত অ্যাটর্নীদের বাগ্মিতা ও পক্ষ সমর্থনকৌশল, ধর্মতত্ত্ব প্রচারকের ভাষণ ইত্যাদি শুনতে যেত।

(৪) অথবা যাদুকর, জড়ি-বিক্রেতা বাদিয়া, বা সর্বরোগহর জিনিসপত্র-বিক্রেতাদের অনর্গল বক্তৃতা আর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে আমোদ পেত। গৃহে ফিরে এসে তারা সাধারণ দিনের চেয়ে অল্প আহার করতো।...এইভাবে পার্গানটুয়া দিনের পর দিন জ্ঞান, বিদ্যা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করতে লাগলো। তবে, এদের অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে জীবনটা একঘেয়ে না লাগে, সেদিকেও পনোক্রেটিসের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই প্রতিমাসে নির্মেঘ রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দেখে সরবোন্ শহরের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণে বহির্গত হত। তারা সারাদিন খুশীমত আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়ে নেচে-গেয়ে, ডিগবাজী খেয়ে, ছড়া কেটে, হরিণ বা খরগোশ তাড়িয়ে, চামচিকের বাচ্চা লুট করে, ঝিনুক ও শামুক কুড়িয়ে—অথবা খাঁদে-ভর্তি চিংড়ী ও বেলে মাছ ধরে গৃহে ফিরত। এইভাবে আরও ২৪ বছর শিক্ষার পর পার্গানটুয়া যৌবনের প্রারম্ভে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বল-বিক্রম, স্বাস্থ্য-সুরুচি প্রভৃতি সর্বগুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে।

শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী সম্পর্কিত বর্ণনা নিশ্চয়ই মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হ'য়ে গেছে। এজন্য আমি মনে মনে সঙ্কুচিত হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তবু, কিছুটা নকলই করবার লোভও সংবরণ করতে পারছিনে। শিক্ষা যে শুধু কোনও কোনও বিষয় মুখস্থ করা বা জীবন-সম্পর্ক-রহিত বড় বড় বাণী আওড়ানোই নয়,—এ কথাটি রোমের এ পত্রের থেকে অনায়াসে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আরও দেখা যাচ্ছে, আগেকার যুগে গুরু বা ওস্তাদেরাই ছিলেন শিক্ষার গোড়ায়। রাজা-বাদশা, জমিদার-মহারাজারা অবশ্যই গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ গুরুর আশ্রমে বা আচার্যের নির্জন পবিত্র পরিবেশে বিবিধ প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতো,—সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত শিক্ষার মাধ্যমে গুরু-শিষ্য ও শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে আলোচনা। ফলে সুরুচি, আদব-কায়দা, পরমত-সহিষ্ণুতা বা সুনীতিবোধ জন্মাত। দ্বিতীয়ত সেকালে জীবনযাপনের মধ্যে যেসকল গুণ বা উৎকর্ষ কাজে লাগতো সে সবের চর্চা সর্বাধিক প্রাধান্য পেত। তৃতীয়ত শারীরচর্চাকারী এবং পিতামাতা, গুরুজন ও জগৎ-পিতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশও বিশেষ আবশ্যক বলে স্বীকৃত হত।

একালে জীবন-যাপনের আদিম সরলতার স্থলে ক্রমশ বিলাসধর্মী সভ্যতা সার্বজনীন আদর্শে পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ, আগে যে-সব শিক্ষা কেবল রাজা-মহারাজা-জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকদের আয়ত্তে ছিল, এখন তা সর্বসাধারণের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। গ্রীক-রোম যুগে, এমনকি মধ্যযুগ পর্যন্ত, ক্রীতদাসেরা ত মানুষের মধ্যেই গণ্য হ'ত না। ভারতেও নীচবর্ণ কেবল উর্ধ্ববর্ণীয়দের পরিচর্যা ছাড়া আর কোনও কিছুরই অধিকার পেত না। কিন্তু এখন আর তা' সম্ভব হচ্ছে না। এখন সকলেই লেখাপড়া শিখতে চায়, এবং অবাধ সামাজিক উন্নতি চায়। এই গণতান্ত্রিক দাবীকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও আর তা সম্ভব হবে না। তাই এখন ব্যাপক ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছে। অধিক সংখ্যক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চাই; অথচ উপযুক্ত শিক্ষার গুরুতর অভাব ঘটেছে। বিশেষ করে একজন মহাপণ্ডিতই সব বিষয় শিক্ষা দিতে পারবে, তেমন অবস্থা আর নাই। এখন কর্ম-বিভক্তি ও বিষয়-বিভক্তির ফলে বিশেষজ্ঞের যুগ এসে পড়েছে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের যুগেও কিন্তু মানবীয়তামূলক শিক্ষা—অর্থাৎ গণিত, যুক্তিবিদ্যা, সঙ্গীত, ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, ধর্মবোধ প্রভৃতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে।

তাই নিম্ন শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে, অন্ততঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞ সামাজিক মানুষ হবার জন্যই, শুধু বর্ণপরিচয় নয়, অন্তত অষ্টম বা নবম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষাতেই খানিকটা গদ্য ও পদ্য সাহিত্য; কিছু পাটীগণিত-জ্যামিতি ও বীজগণিত; পাকিস্তান, ভারত ও ভূ-মণ্ডলের কিছু পরিচয়; কিছু ইতিহাস, সমাজ, নীতি, ধর্ম, পৌরাণিক কাহিনী; ড্রয়িং, ড্রিল, সঙ্গীত ও সাধারণ প্রকৃতি-পরিচয়ও হওয়া আবশ্যক।

এই সাধারণ ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কলেজীয় বা বিশ্ববিদ্যালয়িক উচ্চশিক্ষা। আগেই বলা হ'য়েছে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা। এই অভাব দূর করবার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া চাই এবং উপযুক্ত শিক্ষক আকৃষ্ট করবার জন্য উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক সম্মানেরও নিশ্চয়তা থাকা দরকার। অবশ্য, ভাল ছাত্রেরাই ভাল শিক্ষক হ'তে পারে। তাই মনে হয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রশংসনীয়ভাবে যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে এদের রুচি ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে, দেশের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইনজ্ঞ, কৃষিবিদ, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি সৃষ্টি করবার জন্য সরকারী সাহায্যে এদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বাস্তবিকপক্ষে নতুন উন্নয়নকামী দেশে এরূপ সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাই বোধহয় দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য সর্বাপেক্ষা আশু কার্যকরী পন্থা। আগেকার যুগে মহাপ্রাজ্ঞ শিক্ষকদের আশ্রমে উত্তেজনাহীন শান্ত পরিবেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একান্ত নিভৃত পৃথক পৃথক আলয়ের স্থলে বর্তমানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক ছাত্রাবাসের উদ্ভব হ'য়েছে; আর মহাপ্রাজ্ঞ গুরুকুলের স্থলে শিক্ষকমণ্ডলী বা অধ্যাপকমণ্ডলীর আবির্ভাব হ'য়েছে। কাজেই বর্তমানে অধ্যয়নের উপযোগী শান্ত পরিবেশ রক্ষা করবার দায়িত্ব বর্তেছে সমুদয় শিক্ষক ও ছাত্র-মণ্ডলীর উপর। পার্থানুটুয়ার শিক্ষা বহু-বিচিত্র হলেও একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সে-সবের ভিতরে আত্মোন্নতি—অর্থাৎ শারীরিক মানসিক আত্মিক সামাজিক ও পারমার্থিক সর্ববিধ উন্নতির—একান্ত কামনাই রয়েছে তার কেন্দ্রস্থলে; এটাই যেন পার্থানুটুয়ার কঠোর সাধনা বা তপ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক গুণ অর্জন করবার ক্ষেত্র হিসাবে রয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ। এখানে রয়েছেন সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ,—এঁরা শিক্ষকদের প্রতীক। আর রয়েছেন সহ-সভাপতি, উপসহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক; এ ছাড়া রয়েছেন ক্রীড়া, সাহিত্য, প্রমোদ, প্রকাশন, সাধারণ কক্ষ, মহিলা সাধারণ কক্ষ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক—এঁরা হচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি। হয়ত এঁদের নিজস্ব পরিচালনায় সাধারণ কক্ষের পরিবর্ধনরূপে বা আরেকটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে একটা ছোট ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগার ও পাঠাগারও থাকতে পারতো। অবশ্য, গ্রন্থাগার ও পাঠাগারে যে নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয় এতে কোনও সন্দেহ নাই। অপরাপর ক্ষেত্রেও যে শৃঙ্খলা ও সমঝোতা আবশ্যক, এ কথায়ও হয়ত কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে শান্তি, শৃঙ্খলা, সংযম—এগুলো হচ্ছে চরিত্রের বিভিন্ন অঙ্গ। সমাজে বাস করতে হ'লেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ থাকতেই হবে। এদের সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই সংযম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন, নইলে শান্তি থাকে না। শান্তির উল্টোটা হচ্ছে অশান্তি, উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা। এগুলি নিজের বশে রাখাই চরিত্র-সাধনা। অবশ্য তেজ, শৌর্য এগুলোও চরিত্রের অঙ্গ; কিন্তু তেজ ও উত্তেজনা এক নয়, শৌর্য ও ঔদ্ধত্যও সমার্থক নয়। আজকের ছাত্রেরাই আগামীকালের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। নেতৃত্বের প্রধান শর্ত হচ্ছে, অনুচরেরা তার উপর অনায়াসে নির্ভর করতে পারে অর্থাৎ তাকে অসঙ্কোচে বিশ্বাস করতে পারে। বিশ্বাস উৎপাদন করার শর্ত এই যে, অতীতে এই লোকটি কোনও বিশেষ অবস্থায় যেমনটি করা উচিত ঠিক তেমনটিই করেছে। চরিত্রের এই সামঞ্জস্য দ্বারাই অন্যের বিশ্বাস অর্জন করা যায়। শৃঙ্খলা ও মানসিক স্থৈর্য বা ধীরতাই এই বিশ্বাস উৎপাদনের হেতু। এইজন্য, ভাল পিতা, ভাল শিক্ষক, ভাল বন্ধু বা ভাল নেতা হ'তে হলে চাই উত্তেজনাবিহীন স্থৈর্য। শৈশব ও ছাত্রাবস্থাই এই শিক্ষার প্রশস্ত সময়।

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। শিক্ষাদান করতে হ'লেও রীতিমত নিষ্ঠার দরকার, যাদেরকে শিক্ষাদান করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজন অনুসারে ও তাদের গ্রহণ-ক্ষমতা বিচার করেই শিক্ষা দিতে হয়। এজন্য বাঁধা বুলি বা শুধু পুঁথির উদ্ধৃতি দিলে চলবে না। শিক্ষণীয় বিষয়ের কোন্ অংশ মৌলিক, কোন্ অংশ আনুষঙ্গিক তা ভাল করে বুঝে নিয়ে, মৌলিক অংশের উপর বিশেষ জোর দিয়ে ছাত্রদের বোধগম্যভাবে, সরল ও প্রত্যক্ষভাবে তা উপস্থিত করতে হবে। বিশেষ বিশেষ কৌশল প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করলেই সুশিক্ষা হয় না; এর চেয়ে মূল ভাবটি কি তা-ই ভাল ক'রে উদ্‌ঘাটন করতে পারলেই শিক্ষাদান অধিক ফলপ্রসূ হয়। আমার বিশ্বাস, সুযোগ্যভাবে শিক্ষা দিতে পারলে ছাত্রেরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা গ্রহণ করে থাকে। ছাত্রেরা যদি অশ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে তারা কিছুই শিখতে পারবে না। কোনও কোনও অতি বুদ্ধিমান ছাত্র মনে করে, "ওঃ মাষ্টারে কি আর বললো, এসব আমার জানাই আছে।" হয়ত অতীতে কোনও সঙ্গত কারণেই ছেলের মনে এমন ভাব হয়ে থাকবে। কিন্তু এই ভাব একবার মনের ভিতরে শিকড় গেড়ে বসলে, পরে সে সকল শিক্ষককেই অশ্রদ্ধা ক'রে নিজেকেই বঞ্চিত করবে মাত্র। তাই ছাত্রদের সাবধান হওয়া উচিত। অবশ্য, সকল শিক্ষকই যে ভাল পড়াতে পারেন তা নয়। তবে যিনি যতটুকু পারেন, তার কাছ থেকে তার অধিক আশা না ক'রে যেটুকু শেখা যায়, অন্ততঃ সেইটুকুও শিখে নেওয়া বুদ্ধিমান ছাত্রের কাজ।

শিক্ষকের পক্ষে একটা অসুবিধা হয়, ক্লাসের সকল ছেলে সমান নয়; কেবল উত্তম ছেলেদের উপযুক্ত করে পাঠ দিলে, মাঝারি ও অধোগণ্য ছেলেদের ক্ষতি হয়; আবার একেবারে অধম ছেলেদের বোধ্য করে পড়ালে, অধমদের লাভ হওয়া সন্দেহজনক, কিন্তু মাঝারি ও উত্তম ছাত্রদের বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। এজন্য ক্লাসের অবস্থা বুঝে মাঝারি ছেলেদের যোগ্য পাঠ দিলেই হয়ত সর্বাধিক ছাত্রের সর্বাধিক উপকার হয়। এখানে বলা আবশ্যক, ক্লাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত ছেলেদেরকেও, যে কারণেই হোক, ভর্তি করা হয়। এ কারণে এ-সব ছেলে হয়ত ক্লাসের পড়া কিছুই বুঝতে পারে না; কাজেই ক্লাসে বক্তৃতা শোনায় তাদের মন বসে না, ক্লাসে খুব কম, পরে ক্লাস করাই ছাড়ে। ফলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের শিক্ষায় কিছুমাত্র উপকৃত হয় না। বোধ হয় এরাই ক্লাসের বাইরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে এবং এর থেকেই নানাপ্রকার সমস্যার উৎপত্তি হয়। হয়ত এদের অনেকেই অনেক আগে থেকেই 'বেখাপ' (misfit) হ'তে হ'তে কোনও রূপে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। অনেক হয়ত প্রকৃতিগতভাবেই সর্বোচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত নয়; তবু দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি থাকাতে, অগত্যা গতানুগতিক শিক্ষার পথেই দুরূহ পদক্ষেপ করতে বাধ্য হচ্ছে। এটি আমাদের সমাজ-জীবনে, ইংরেজের প্রতি অন্ধতা প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন ব্যাধি। আমাদের সুযোগ্য ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। এই রকম কয়েকজন সুযোগ্য লোকের সমবায়ে কোনও কমিটি গঠন করে, এ সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা আমাদের একটি জাতীয় কর্তব্য হ'য়ে পড়েছে।

আমি শুধু এই আশা করি, আজকে যাঁরা সমুদয় ছাত্র-ছাত্রীর বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন, তাঁরা যেন সকলের সহযোগে, সকলের ইচ্ছা-অনুযায়ী কর্মনীতি সম্পন্ন করতে ব্রতী হন; আর যাঁরা প্রতিযোগিতায় হেরে গেছেন, তাঁরাও যেন দলভিত্তিক বিপর্যয়ের দিকে লক্ষ না করে সকলের উন্নতির জন্য প্রতিনিধিদের সহায়তা করেন। দল-নির্বিশেষে তাঁরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐতিহ্য সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য সমভাবে উদ্যোগী হউন, এই মহামিলন ক্ষেত্রে তাঁরা সকলে সম্মিলিত হ'য়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করে নিজেরাও সেই গৌরবের অংশীদার হউন।

২৫ জানুয়ারী ১৯৬১

# মাধ্যমিক শিক্ষা ও অঙ্ক

(আলোচনা)

ইমরোজ ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় অধ্যাপক আবদুল জব্বার সাহেব আমাদের দেশে বর্তমানে অঙ্ক-শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। বিষয়টি সময়-উপযোগী, আর শিক্ষা ব্যাপারে এর গুরুত্বও অস্বীকার করবার যো নাই। তাই, এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

অধ্যাপক সাহেব নিজের (ছাত্র-জীবনের আর শিক্ষক-জীবনের) অভিজ্ঞতা থেকে অঙ্ক-শিক্ষা-পদ্ধতির যে ত্রুটিগুলো দেখিয়েছেন, সংক্ষেপে তা' এই :

(১) নিতান্ত ছেলেবেলায়ই ধারাপাতের সাহায্যে শিশুকে কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, ছটাককিয়া, সেড়িয়া ইত্যাদি শিখিয়ে (বা মুখস্থ করা'য়ে) তাদের মাথা গুলিয়ে দেওয়া হয়। অথচ জীবনে এর অধিকাংশই কাজে আসে না।

(২) পাটীগণিতের প্রশ্নে সাধারণ বিধি প্রয়োগের বদলে অকেজো ধাঁধার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। উদাহরণ - খুঁটি বেয়ে শামুকের ওঠা-নামা সম্বন্ধে প্রশ্ন। তা'ছাড়া মহাভারতের মত বিরাট একখানা পাটীগণিতের মধ্যে এমন সব যুক্তির কসরৎ দেখান হয়, যা বীজগণিতের সাহায্যে করলে মাথা খরচ অনেক কম হয়। এ মাথা খরচের উদ্দেশ্য যদি বুদ্ধির বিকাশ হয়, তবে এরোপ্লেনের গতি, রেডিওর শব্দ, টেলিভিশনের ছবি ইত্যাদির সাহায্যে করলে তবু একটা কাজের কাজ হ'ত।

(৩) জ্যামিতির অঙ্কনে সেট স্কোয়ার আর প্রোট্রাকটরের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এ ব্যবস্থা অসঙ্গত। আর, জ্যামিতির সাহায্যে বীজগণিতের দুই-একটা গুণনের সূত্র প্রমাণ করা নিরর্থক। বীজগণিতের বইয়ে কথাটার একটু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হতে পারে।

(৪) বীজগণিতের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে লগারিথম্ যোগ করে দেওয়া দরকার।

লেখক খুব জোর দিয়েই কথাগুলো বলেছেন। তাই জোরালো কথার আনুষঙ্গিক অতিরঞ্জন কিছু হ'য়েছে বটে, কিন্তু মোটের উপর তাঁর অভিযোগ সঙ্গত। প্রবন্ধের কতকগুলো বিষয় ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে বলে, সেগুলো একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

(১) ধারাপাতের কড়া-ক্রান্তি, দুল-দন্তি, কাক-তিল অবশ্যই বিজ্ঞান-সম্মত বলে মানতে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা যে শূন্যের কোঠায় তাতেও কোন সন্দেহ নাই। কাহণ, পণ, বুড়ি, গণ্ডা, কড়া...এগুলো প্রথমে দ্রব্যগণনার একক ছিল বলেই মনে হয়। পরে মুদ্রাগণনায় ব্যবহৃত হয়। গণ্ডার সঙ্গে কড়া ও কাহনের যে সম্বন্ধ কাহণের সঙ্গে চৌক ও পণের সেই সম্বন্ধ। কাহণকে টাকা বল্‌লে, চৌক হয় চৌআনী আর পণ হয় আনী; সুতরাং বাধ্য হয়েই বুড়ি বা ৫ গণ্ডাকে পয়সা ধরতে হয়। টাকার থেকে গণ্ডার পার্থক্য বুঝাবার জন্য

গণ্ডার একটি হলেক্ ব্যবহার করা হয়। টাকার থেকে গণ্ডা যেন এক পুরুষ নীচে, সেইরকম গণ্ডা থেকে তিন আর এক পুরুষ নীচে...কিন্তু এরা সকলেই যেন একই গোত্রের। আবার কাহণকে 'মণ' বললে চৌককে সিকি মণ বা দশ সের (১ পশুরি), এবং কাহণকে 'বিঘা' বললে চৌককে সিকি বিঘা বা পাঁচ কাঠা বলতে হয়। এইভাবে সেরকে একক ধ'রে (১ দিয়ে নির্দেশ করলে) এর সিকিতে (চতুর্থাংশে) পোয়া, এবং আনীতে (ষোড়শাংশে) ছটাক ধরতে হয়; আবার, কাঠার হিসাবেও পোয়া কাঠা আর ছটাক এসে পড়ে। এই ভেলেস্‌মাৎ বিস্ময়কর, প্রাচীনদের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক আর শুভঙ্করের অতিশয় মনোরঞ্জক, তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু শিশুদের কাছে এই সূক্ষ্মতা যে অতিশয় তীক্ষ্ণ, ভয়ঙ্কর ও মর্মভেদী তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করবেন।

অধ্যাপক সাহেব পয়সাকে একক হিসাবে ব্যবহার করবার কথা বলেছেন। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু টাকাকে ১ দিয়ে প্রকাশ করলে, সঙ্গত বিচারে পয়সাকেও ১ দিয়ে প্রকাশ করাতে কিছু মুশকিল আছে—অর্থাৎ তাতে ভারতীয় পদ্ধতি বজায় থাকে না। ইংরেজী মতে টাকা, আনা, পয়সা শিরোদেশে লিখে নীচে নীচে শুধু এদের সংখ্যা লিখেই যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু আনার থেকে টাকা করবার সময় ষোলর নামতা মুখস্ত রাখতে হয়, যা ১৬ দিয়ে ভাগ করবার দরকার হয়। মিশ্র যোগ বা গুণকে এই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বাংলা মতে সিকি, দশক, গণ্ডা থাকাতে এইসব যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবু মনে হয়, সওয়াইয়া, দেড়িয়া, আড়াইয়া, বুড়িকিয়া এবং আনা, চৌক প্রভৃতির হাত থেকে উদ্ধার পেলে শিশুদের ভালই হবে। শেষে, আর একটু উচ্চশ্রেণীতে অভিজ্ঞতার সাথে সাথে অন্ততঃ কুড়ি পর্যন্ত সওয়াইয়া দেড়িয়া প্রভৃতি আপনা আপনি আয়ত্ত হ'য়ে যাবে, বা দরকার হ'লে আয়ত্ত করে নেওয়াও বেশী কঠিন হবে না; আর আনা চৌক লেখাও তখন অনায়াসে মশ্‌ক্ করে নেওয়া চলবে।

(২) পাটীগণিতের আয়তন কমানোর ব্যাপারে প্রবন্ধকারের সঙ্গে আমি একমত। যোগ-বিয়োগ-গুণন-ভাগের আসল প্রকৃতি কেমন, গোড়ার দিকে তাই নানারকম উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ কাজটি যত সহজ বোধ হয়, আসলে তত সহজ নয়। সাধারণ চার নিয়মের প্রয়োগ নির্ভুলভাবে শিশুদের আয়ত্ত করাতে হলে অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচ বছরের ধারাবাহিক শিক্ষার দরকার। এরই ভিতর সহজ সহজ লঘুকরণ, ঐকিক নিয়ম, গড়নির্ণয়, সরল, গ সা গু, ল সা গু, সুদকষা, মনকষা, কালাবধী, সাঙ্কেতিক নিয়ম, সময় ও কাজের অঙ্ক, দশমিক, মিশ্রণ, লাভ-ক্ষতি, অংশ-বণ্টন, শতকরা হিসাব প্রভৃতি অনেক কিছু শিখিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য, মনে রাখতে হবে, এসবের মধ্যে অনাবশ্যক প্যাঁচ খাটিয়ে আসল ব্যাপারটা যেন ঝাপসা করে ফেলা না হয়। জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে এবং শিশুদের অভিজ্ঞতা ও অনুরাগের সঙ্গে যোগ রেখে অঙ্ক নির্বাচন করা দরকার। কিন্তু এইখানেই গোল। সাধারণ শিক্ষকের উপর এ বিষয় ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ হচ্ছে যথার্থ ভাল গ্রন্থকারের কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, টেক্সট বুক কমিটি থেকে সাধারণতঃ যেসব সিলেবাস বের করা হয়, তার অনুগত হতে গিয়ে অনেক ভাল গ্রন্থকারও শিক্ষাবিজ্ঞান কল্পনা রূপায়িত করতে পারেন না। আর আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষকমণ্ডলীর ধারণা এই যে, বই যত বৃহৎ ও দুরূহ হবে, ততই ছেলেদের উপযোগী হবে। কাজে কাজেই অনেক সময় সংক্ষিপ্ত ও সহজ বই উৎকৃষ্ট হলেও পাঠ্য হ'তে পারে না।

অর্থাৎ যে দামে ৮০০ পৃষ্ঠার পাটীগণিত পাওয়া যায়, সেই দামে ৩০০ পৃষ্ঠার বই কে কেনে? তা সে বই যতই উৎকৃষ্ট বা সহজবোধ্য হউক না কেন? ফল কথা, আমরা ওজন বা আয়তনকে যতটা শ্রদ্ধা করি, গুণ বা উৎকর্ষকে ততটা অনুভব করতে পারিনে।

যাহোক, আগের কথায় ফিরে আসা যাক। চার-পাঁচ বছরে গোড়ার শিক্ষাটা পাকা ক'রে দিলে আর দুই বছরের মধ্যেই সমস্ত কঠিন অঙ্ক, খুঁটিনাটি বুদ্ধির অঙ্ক ছেলেরা করতে পারবে। বীজগণিতের সাহায্য ছাড়াই যেখানে সম্ভব, সেখানে তারা পাটীগণিতের নিয়ম ও চিন্তা পদ্ধতিতেই অঙ্ক কষতে পারবে। পাটীগণিতের চিন্তাধারা প্রাথমিক, কাজে কাজেই সেইটিই মনের সঙ্গে খাপ খায় বেশী। সেখানে বীজগণিত খাটাতে গেলেই ধারণা অনেকটা অস্পষ্ট থেকে যাবে। আমার মনে হয়, লাফিয়ে-ডিঙ্গিয়ে না যেয়ে সমস্ত মাটি মাড়িয়ে চললেই পথের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। দেশই যদি দেখতে হয়, আর গাড়িতে যদি চড়তেই হয়, তবে রেলগাড়ির চেয়ে গরুর গাড়িই ভাল।

পাটীগণিতে যোগ চিহ্ন, বিয়োগ চিহ্ন, সমান চিহ্ন, এইরকম অনেক চিহ্ন আছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যোগ চিহ্নকে যদি ভাগ চিহ্নের মত এবং ভাগ চিহ্নকে যোগ চিহ্নের মত বদলে দিই, তা'হলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে, এক একজন এক এক রকম চিহ্ন ব্যবহার করলে পরস্পরকে বুঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। পরস্পরকে বুঝাবার জন্যই আমরা ভাষা, সঙ্কেত, চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। তাই দশে মিলে যে-টা স্বীকার করে নিয়েছেন, সেইটাই মেনে নিয়ে তা' আয়ত্ত করা দরকার। দুইটা সংখ্যা বা রাশির মধ্যে of কিংবা (এর) চিহ্ন থাকলে রাশি দুইটি ব্র্যাকেটে আবদ্ধ হয়ে সহ-গতি লাভ করবে, এই ব্যবস্থা গণিতজ্ঞেরা মেনে নিয়েছেন। অনেক সময়ে ব্র্যাকেটের বাহুল্য না করে 'এর' দ্বারা প্রকাশ করলে নানা বিষয়ে সুবিধা হয়। তাই শিক্ষার্থীদের এইসব আদব-কায়দা (or convention) শিখতে হবে। অঙ্কের সমাজের এইসব নিয়ম-কানুন জানা না থাকার দরুন যদি কোন পরীক্ষার্থী ফেল করে, তবে তারজন্য অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখানো উপযুক্ত হয় না। এমনক্ষেত্রে সুপারিশ করতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

শিক্ষায় 'ব্যবহার' বা 'প্রয়োজন' ছাড়াও 'কৌতূহলে'র একটা বিশেষ স্থান আছে। চিন্তার উদ্বোধনের জন্য কৌতূহল উদ্রিক্ত করা চাই। এমন অনেক স্থল আছে যেখানে চেষ্টা চরিত্র করলে একটা 'ব্যবহারিক' উদাহরণ হয়ত তৈরী করা যায়, কিন্তু নিছক কৌতূহলমূলক উদাহরণই হয়ত সেখানে বেশী স্বাভাবিক। সমস্যাপূরণের একটা বিশেষ আনন্দ আছে। ছেলেদের কাছে ছোট ছোট সমস্যা বা হেঁয়ালী দিতে হয়, যা সে আনন্দের সঙ্গে করতে পারে, এবং পরোক্ষে তা'তে কোনও পঠিত বিষয়ের জ্ঞানও পাকা হয়। "কোন্ সংখ্যাকে ৭ দিয়ে গুণ করলে ৫৬ হয়"; "৫০ আর ৬০-এর মধ্যে কোন্ সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৫ অবশিষ্ট থাকে" ; "সবচেয়ে ছোট কোন সংখ্যাকে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেক বারই ১ অবশিষ্ট থাকে,"—এসব প্রশ্ন কৌতূহল-উদ্দীপক। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চার নিয়ম আর ল. সা. গু. সম্বন্ধে জ্ঞান পাকা হয়েছে কিনা, তারও পরখ হয়। যে শিশু কেবল পা বাড়াতে শিখেছে, তার হাত ধরে, "চলি, চলি, পা-পা" করে দু'-চার কদম হাঁটিয়ে নিলে তার আনন্দও হয়, সাহসও বাড়ে, আর "হাঁটা" যে কি বস্তু সে সম্বন্ধেও তার স্পষ্টতর ধারণা জন্মে।

কোনও দেশের শিক্ষাপদ্ধতি তার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ-সূত্র রক্ষা করেই তৈরী করা দরকার। আমরা এই সেদিন স্বাধীন হয়েছি: কিন্তু তাই বলে এক্ষুণি এরোপ্লেনের গতি,

রেডিওর শব্দ বা টেলিভিশনের ছবি আমাদের ছেলেদের (বা আমাদেরই) মনে-প্রাণে গেঁথে যাবে, এমনটা আশা করা যায় না। আকাশ দিয়ে এরোপ্লেন যেতে হয়ত অনেকেই দেখে থাকবে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার মত সাক্ষাৎ-পরিচয়—এরোপ্লেন, রেডিও, টেলিফোন বা টেলিভিশনের সঙ্গে—কয়জনের আছে? দেশের সে অবস্থা হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু তা' হবার আগে এখন এসবের সাহায্যে ছেলেদের অঙ্ক শিখাতে যাওয়া উপহাসের মত শুনায়। অবশ্য উপযুক্ত সময়ে তা' অবশ্যই উপযোগী হবে। অধ্যাপক সাহেবও হয়ত এই কথাই বলতে চেয়েছেন তাই সাগ্রহে ভবিষ্যতের জন্য একটি আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ আদর্শের অভিমুখে অবশ্যই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।

(৩) জ্যামিতিক অঙ্কন ব্যাপারে প্রবন্ধকার একটি বিষম ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। আমরা কেন সেট্ স্কোয়ারের সাহায্যে লম্ব টানব না, কিংবা প্রোট্রাক্টরের সাহায্যে কোন অঙ্কন করব না, তার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া ভার। আমরা যেন ইচ্ছা করেই নিজেদের খানিকটা শক্তি খাটাব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি। যেন আমরা রুস্তম পালোয়ান—অর্ধেক শক্তিতেই সাধারণ যুদ্ধ কাজ চলে যায়, তাই অপর অর্ধেক শক্তি আল্লার ব্যাঙ্কে হেফাজত রেখে দিয়েছি; সোহ্‌রাবের মত শক্ত পাল্লায় পড়লে তখন তা' উঠিয়ে নিয়ে কাজে লাগানো যাবে! এইরকম, পা-বেঁধে কোমর পর্য্যন্ত বস্তা-বন্দি হ'য়ে রেস্ দেওয়াতে অন্যের আমোদ হ'তে পারে, কিন্তু নিজের যে খুব বেশী পৌরুষ বা আমোদ বোধ হয় তা' তো মনে হয় না। অন্ততঃ সর্ব্বক্ষণের জন্য ত মোটেই নয়। ব্যবহারিক জীবনে আমরা স্বচ্ছন্দে দৌড়াব, আর পরীক্ষার হলে 'স্যাক্ রেস' দেব এ ব্যবস্থা যেন কেমন-কেমন বোধ হয়।

ক্ষেত্র-কালি সম্বন্ধে জ্যামিতিতে কতকগুলো উপপাদ্য আছে, তার উদ্দেশ্য, সম্ভবতঃ জ্যামিতির কতটা জোর তাই পরীক্ষা করা। এ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব না দিলেও হয়ত চলতে পারে। কিন্তু বীজগণিতের $(a+b)^2$ কিংবা $(a-b)^2$-এর সূত্রের চাক্ষুষ প্রমাণ জ্যামিতির সাহায্যে যেমন পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও নয়। আর আয়তক্ষেত্রের কালি নির্ণয়ে ত জ্যামিতির খাস অধিকারই আছে। তাই, এগুলো থাকাতে তেমন আপত্তিরও কারণ দেখিনে। একই জিনিস যদি দুই-তিন ভাবে করা যায়, তা' হ'লে অঙ্কের বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যেকার সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলেও জ্যামিতি যে ক্ষেত্রকালি ব্যাপারে পাটীগণিত কিংবা বীজগণিতের অধিকারের মধ্যে যবর-দখল করে বসে গেছে, তা বলা যায় না। বিশেষতঃ জ্যামিতির জীবনধারণের জন্যই উল্লিখিত উপপাদ্যগুলোর প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ—দুইটি জ্যা, বা দুইটি ছেদক পরস্পর কাটাকাটি করলে তাদের খণ্ডিতাংশের গুণফল-সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাগুলোর এবং ৩৬ কোণ অঙ্কনের সংশ্লিষ্ট প্রতিজ্ঞাগুলোর প্রমাণ এদের উপর নির্ভর করে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে এগুলো একটু পরিণত অবস্থায়ই পাঠন-যোগ্য। প্রবন্ধ লেখক ঠিকই বলেছেন, "বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে জ্যামিতির ধারাবাহিক যুক্তিধারা যতটা সাহায্য করে ততটা অন্য কোনও বিষয়ে করে বলে মনে হয় না।" পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং ক্ষেত্রকালি সম্বন্ধীয় কতকগুলো সম্পাদ্য ও উপপাদ্য সত্যি সত্যিই মানুষের বুদ্ধিবিকাশের উৎকৃষ্ট ফল। শিক্ষার একটু পরিণত অবস্থায় এর আস্বাদ লাভ করতে ক্ষতি কি?

(৪) লগারিথ্‌ম্‌-এর তালিকা ব্যবহার করে গুণ-ভাগ এবং ঘাত-মূল নির্ণয় করার কথা প্রবন্ধ লেখক যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। সঙ্গে সঙ্গে যদি সম্ভব হয়, তবে ভার্নিয়ার, ডায়াগন্যাল স্কেল এবং স্লাইডরুলের ব্যবহারও শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। হাতে-কলমে

মাপতে শিখলে বা সহজ প্রণালীতে ফল বের করতে পারলে ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় তাতে আর ভুল নাই। আমার মনে হয় লগারিথমের ব্যবহার পাটীগণিতের সম্পর্কেই ভাল খাটে; বীজগণিতের সাহায্যে লগারিথমের রাশিমালার তত্ত্ব জানতে হবে, একথা বোধ হয় প্রবন্ধ-লেখকের অভিপ্রেত নয়। কারণ, বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশনে যে মান চলিত আছে, তা বিবেচনা করলে লগারিথমের তত্ত্ব আপাততঃ অনধিগম্য বলেই বোধ হয়। পরে ক্রমে ক্রমে যদি মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয় তখন অবশ্যই এ বিষয় বীজগণিতের পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

অধ্যাপক সাহেব প্রবন্ধে সিলেবাস গঠন ব্যাপারে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা' প্রণিধানযোগ্য। নানাদিক বিবেচনা করে ছেলেদের আত্মবিকাশের দিক, ব্যবহারিক কার্যকারিতার দিক এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বৃত্তিসমূহে উপযুক্ত লোক তৈরী করার সম্যক বিবেচনা করে, সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে পারে। অন্যান্য দেশে শিক্ষাব্রতীগণ কিভাবে শিক্ষা সমস্যার সমাধান করছেন, তার খোঁজ রাখতে হবে ; আর এ দেশীয় অবস্থার সঙ্গে যোগ রেখে নতুন সমাধান করতে হবে। তার কারণ অন্য দেশীয় পরিবেশে যে ব্যবস্থা অতি সঙ্গত ঠিক সেই ব্যবস্থা আমাদের দেশে অসম্ভব, এমনকি অসঙ্গত হতে পারে।

ইমরোজ
আষাঢ় ১৩৫৭

# গণতন্ত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর যে-সব দেশে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, সেইসব দেশে সমাজের সর্বস্তরের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে, এবং ইহাকে জাতীয় জীবনের একটা অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই মনে করা হয়। কিন্তু সবসময় এমন অবস্থা ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও প্রায় সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা কেবল সমাজের বিশেষ সৌভাগ্যবান শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তখন আত্মসংহৃত হইয়া পার্থিব সমস্যাবলী হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিয়া যাইত। ভাগ্যবানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ভাব-রাজ্যের কঠিন কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃতি ও পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের জ্ঞানরাশি আয়ত্ত করিতেন, এবং খ্যাতনামা মনীষী ও সহপাঠীদের সংশ্রবে আসিয়া আপন আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করিতেন। দেখা যায়, অনেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই অধিক সংখ্যক রাজনীতিবিশারদ বা রাষ্ট্র-পরিচালকের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণেই এরূপ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। উপরোক্ত রাজনীতিজ্ঞ ও রাষ্ট্র-চালকগণ এমন সব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে জন্মগত উত্তরাধিকার এবং অনুকূল পরিবেশের ফলে স্বভাবতঃই নেতার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তাঁহাদেরই সন্তানগণ স্বতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য রহিয়াছে ; প্রথমতঃ গবেষণা ও জ্ঞানোন্নয়ন, দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপনা ও তরুণদের শিক্ষাদান। অতীতকালে দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ প্রথমটি হইতেই উদ্ভূত হইত। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান লক্ষ্যই ছিল জ্ঞানোন্নয়ন। তরুণেরা কৃষ্টি ও জ্ঞানার্জনের পরিবেশে কিছুকাল বাস করিবার ফলে আপনা আপনি উহা হইতে হিতকর বিদ্যা আত্মস্থ করিয়া লইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োগরহিত বিশুদ্ধ আলোচনা ও কর্মসূচীর ফলে অল্পাধিক মনঃসংযম স্বভাবতঃই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ছাত্রদের সমবেত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব বিকাশেরও সুযোগ উপস্থিত হয়। অধ্যাপকেরা অনেক সময় গবেষণাকেই একমাত্র উপযুক্ত কার্য মনে করিয়া শিক্ষাদান ব্যাপারটিকে অনেকটা আপদ বলিয়া গণ্য করিতেন। তথাপি তাঁহারা সাজাইয়া-গোছাইয়া যুক্তি-তর্কের সাহায্যে যেটুকু আলোচনা করিতেন, তাহাতেই জ্ঞানপিপাসু চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিত। কোনো বিশিষ্ট পণ্ডিত ভালোভাবে শিক্ষাদান করিতে না পারিলেও, যদি তিনি জ্ঞানলিপ্সা ও সত্যানুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিতে পারিতেন, তবে কেবলমাত্র তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াই শিক্ষার্থীদের যথার্থ উপকার হইত।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং জাতীয় জীবনের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরূপে সংস্পর্শ হইবে, সে ধারণাও সম্পূর্ণ বদলিয়া গিয়াছে।

অবশ্য নানা কারণে ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, বর্তমান যুগে মানুষের জীবনধারার মূল ভিত্তি স্বৈরতন্ত্র হইতে সরিয়া আসিয়া গণতন্ত্রের উপর স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় হইবে জাগতিক ব্যাপারাদি হইতে বিচ্ছিন্ন গজদন্তের শুচি-শুভ্র প্রাসাদবিশেষ এবং সেখানে সাধনার বিষয় হইবে কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সত্যের সন্ধান। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে; অতএব তাঁহাদের উক্ত মত উপেক্ষা করা যাইতে পারে। মোট কথা, যে কারণেই হউক, আর ব্যক্তিবিশেষের যত অপ্রিয়ই হউক এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে আবার যে কখনও এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যাইবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু ইহাতে একটি নতুন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, যাহা চিন্তা করিয়া বহু শিক্ষাবিদ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিপদটা এই যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী একীভূত করিয়া ফেলিলে প্রয়োজনের দিকটা অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপীঠ এবং সংস্কৃতি-সদন বলিয়া যে মূল্য আছে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকিতেই হইবে ; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হইতে সত্যানুসন্ধান এবং জ্ঞানোন্নতি অপসারিত হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি কেবলমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়, (সে শিল্প যতই উচ্চাঙ্গের বা প্রয়োজনীয় হউক না কেন) তাহা হইলে উহার দেহ বলিষ্ঠ মনে হইলেও উহা প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। ইহা প্রকৃতই বিপদের কথা। বর্তমানে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কেই যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহা এই যে, ইহার পরিকল্পনা এবং কার্যাবলী একদিকে পারিপার্শ্বিক সমাজ-প্রয়োজনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি ইহাকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপেও অব্যাহত রাখিতে হইবে ; অন্য কথায় সামাজিক প্রয়োজন বলিতে কেবল পার্থিব উন্নতিই নহে, পারমার্থিক উৎকর্ষও বুঝিতে হইবে। অতীতকালে, যখন স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং (যে কারণেই হউক) ব্যক্তিবিশেষ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধীশ্বর ছিলেন, তখন দেশের সকল সমস্যাই ছিল আভ্যন্তরীণ সমস্যা। তখন শাসকের ইচ্ছা ছিল অপ্রতিহত—উহা যুক্তিসঙ্গত বা লিখিত নিয়মাধীন হইবার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। এমনকি উহা ন্যায়-সঙ্গত না হইলেও চলিত। কাজে কাজেই তখনকার অধীশ্বর বা তাঁহার কর্মচারী ও উপদেষ্টাগণের পক্ষে কোনও বিশিষ্ট জ্ঞান বা শিক্ষা অপরিহার্য ছিল না।

তখনকার দিনে দেশের ঘটনাস্রোতের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ জ্ঞানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের দান প্রচুর হইলেও মানবেতিহাসের উপর ইহার প্রভাব অতি নগণ্য। তখন বিশ্ববিদ্যালয় বাঞ্ছিত হইলেও অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। গণতন্ত্রের যুগে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে—এখন ইহা শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, অপরিহার্যও বটে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গণতন্ত্রকে রূপ দিবার জন্য এবং ইহার সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্যও ততোধিক অপরিহার্য। গণতন্ত্রের সহিত বিবিধ প্রকার সমতার ধারণা জড়িত আছে। এইসব সমতার কোনো কোনোটি সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, 'সুযোগের সমতা'কে অত্যাবশ্যক বলিয়া মানিতেই হইবে। শিক্ষার দ্বারাই প্রখর বুদ্ধি এবং স্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষমতার বিকাশ সাধন করিয়া নেতৃত্ব লাভের

যোগ্য হইতে পারেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ শিক্ষার সুযোগ দান করে। সুতরাং যাহারা যোগ্যতার বিচারে এই শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হইবার ক্ষমতা রাখে, গণতান্ত্রিক দেশে তাহাদের সকলকেই সমান সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে। সে দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত সকলেই যাহাতে সন্তোষজনকভাবে নিজেদের নাগরিক অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, সেজন্য সুষ্ঠু প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সমধিক প্রয়োজনীয় যাহা শেষ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের শিক্ষাক্ষেত্র রূপে সুফলপ্রসূ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া সমাপ্ত হইবে।

স্থানীয় কোনো সাময়িক পত্রিকায় সম্প্রতি একটি অতি সঙ্গত ও নির্ভুল উক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল যে, জনসাধারণ তথ্যাভিজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত না হইলে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কার্যকরী হইতে পারে না। নিরক্ষরতা আর গণতন্ত্র অবশ্যই পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু নিরক্ষরতা দূর হইলেও বর্তমান জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কার্যকরীভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুনিয়ন্ত্রিত নেতার আবশ্যক। এমনকি নিরক্ষরতা দূর করিতে হইলেও এইরূপ বহু সুশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন।

স্বৈরতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তির শাসন আর শক্তির শাসন চলে। সেখানে শিক্ষিত চিন্তাবিদের তেমন আবশ্যক নাই—সেখানে প্রয়োজন শিক্ষিত সৈনিকের। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র এবং প্রগতির সৃষ্ট সমস্যাবলী সমাধানের জন্যই প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া লইতে হয়। গণতন্ত্র কার্যকরী করিতে হইলে যে সৈন্যদল আবশ্যক হয়, সে হইতেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুশিক্ষিত নেতার দল। বর্তমান অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক যুগে এখনও দেশরক্ষায় জন্য সৈন্যদলের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু শুধু দৈহিক নিরাপত্তা হইলেই চলিবে না; ইহা ছাড়া আরও অনেক জরুরী সমস্যাও রহিয়াছে যাহার সমাধান প্রয়োজন।

আমরা এক দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে বাস করিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ও এই পরিবর্তনের মধ্যে কাজ করিতেছে। যে-কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বর্তমানে যেন জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শুধু যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পন্থাই জটিল, তাহা নহে, আসলে বর্তমান যুগে আমাদের যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে সেগুলিই পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। সেগুলি এতই দুরূহ যে, উহার সন্তোষজনক সমাধান করিতে হইলে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান এবং তদনুযায়ী শিক্ষিত মনের আবশ্যক। শুধু রাজনীতিজ্ঞ ও শাসকবর্গের জন্যই নহে, শিল্পপতি এবং বণিকদের জন্যও এইরূপ বিশিষ্ট-জ্ঞান আয়ত্ত করা আবশ্যক। এখন আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। রাষ্ট্র-পরিচালকগণকে শুধু বহুদর্শী ও পারদর্শী হইলেই চলিবে না, কোনো বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য সে-সম্বন্ধে যথাযোগ্য জ্ঞানার্জনও করিতে হইবে। অবশ্য তাঁহাদের পক্ষে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ব্যাপারের সমুদয় বিভাগেই নৈপুণ্য অর্জন করা সম্ভব নহে। তাই, যে-সব বিষয়ের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সংস্কার-মুক্ত-সম্পন্ন কতিপয় সুদক্ষ উপদেষ্টার প্রয়োজন। শিল্পপতি এখন আর শুধু আঞ্চলিক জ্ঞান লইয়াই কিংবা আপন খেয়াল-খুশীমতো বলিয়াই সাফল্যের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালন করিতে পারেন না। উহা সম্ভব ছিল বিগত যুগের ক্ষুদ্র খণ্ডিত পৃথিবীতে। বর্তমানে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহার ভালো-মন্দ বিচার না করিয়াও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখন শিল্পপতি ও ব্যবসায়-পরিচালকগণকে কর্মীদের অভিপ্রায় বা মতামতের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রমিকেরা কি অবস্থায় জীবন-যাপন করিতেছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে এবং

তাহাদের দায়িত্ব কিছুটা নিজেদের স্কন্ধে বহন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া তাঁহাদিগকে গবর্ণমেন্টের বাধা-নিষেধের অনুবর্তী হইয়া এবং বর্তমান কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। অধিকন্তু, তাঁহাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভিন্নদেশীয় ব্যবসায় নীতি বা সাম্প্রতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে ; তাই কার্যকরীভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালন করিতে হইলে বর্তমানে বৈদেশিক অবস্থা এবং উহার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে-কাজ অতি সহজে মালিক বা পুঁজিপতি স্বয়ং নিম্নস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে অথবা বিনা সাহায্যেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন, তাহাই এখন শ্রমিক, গবর্ণমেন্ট, ট্রেড ইউনিয়ন, অংশীদার এবং দেশীয় ও বৈদেশিক ক্রয়-বিক্রয়-নীতি সমন্বিত একটি বিরাট সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। সমস্যাটি এত অভাবনীয় রূপে জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, বহু ক্ষেত্রে সাময়িক গোঁজামিল দিতে গিয়া অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, কিংবা অতি শীঘ্রই অগণিত নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। যাহা হউক বর্তমানে এই যে নূতন পরিস্থিতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে ইহার মুকাবেলা করিতেই হইবে। যে-সব দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে সর্বাধিক সফলতা লাভ করিয়াছে, সেইসব দেশের ব্যবসায় পরিচালক ও কার্যকারকগণের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা একটি লক্ষণীয় বিষয়। অবশ্য ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা বা বিশেষ জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। তথাপি সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা জ্ঞানের ও মনঃসংযমের পটভূমিকা সৃষ্টি করা হয়, যাহা ব্যবসায় জগতেই হউক বা গবর্ণমেন্ট পরিচালনায়ই হউক বিশেষ কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থায়িত্বের জন্য অবশ্য এমন শিক্ষিত শ্রমিকদল দরকার যাহারা আপন আপন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দাবী-দাওয়ার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে সে-সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হয়। শুধু তাহাই নহে পরিচালকদেরও উৎপাদন প্রণালী, নিয়োগ-কর্তা ও নিযুক্তদের মধ্যে মানবীয় সম্পর্ক, সাধারণ ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাদি এবং জাগতিক ব্যাপারের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক—ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দেশ যতই সমুন্নত হইবে এবং জনসাধারণ যতই শিক্ষিত হইবে, ততই ইহার শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক সমস্যা জটিলতর হইতে থাকিবে। এইসব সমস্যার সমাধানের উপযুক্ত লোক তৈয়ার করিতে হইলে তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নয়ন দ্বারা পরোক্ষভাবে এবং বিশেষ শিল্পজ্ঞান শিক্ষা দিয়া সাক্ষাৎভাবে শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু করিবার আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে কতকগুলি মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে গভীরতর জ্ঞানদান করে, কতকগুলি সমবেত কর্মপন্থার মূল্যবোধ জাগ্রত করিয়া নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষমতা জন্মায় ; এবং অপর কতকগুলি সংযম ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়। ইহার সবগুলিই শিল্প ও বাণিজ্যিক জগতে সফলতা লাভ করিবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। অনেক শিক্ষা-প্রস্তাবেই শিল্প-শিক্ষাকে দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া অভিহিত করা হয়। বর্তমান জগতে শিল্প-শিক্ষার মূল্য ও গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু কোনো দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতি কাজে লাগাইবার ফলে যে-সকল মানবীয় সমস্যার উদ্ভব হয়, শিল্প-শিক্ষায়তনে যথোচিত লক্ষ্য না রাখিলে তৎপ্রতি অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রায়ই দেখা যায়,

বর্তমান পরিকল্পনাকারীরা মনে করেন, অধিক সংখ্যায় শিল্প-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেই বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের প্রয়োজন মিটিবে। যাঁহারা নির্বিচারে পূর্বোক্ত মত পোষণ করেন তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি, কি কারণে জার্মানী ও আমেরিকার ন্যায় দুইটি বৃহৎ শিল্প-প্রধান দেশেও অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ শিল্প-শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে সাধারণ কৃষ্টি ও সাহিত্যাদি বিষয়েও খানিকটা শিক্ষার সংমিশ্রণ রাখা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষানীতিতে বর্তমানে একটি বিষয় লইয়া বিস্তর আলোচনা চলিতেছে। বিষয়টি এই—বিশ্ববিদ্যালয়েই শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, না শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে? এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এইসব আলোচনার মধ্যে দুইটি বিষয়ে সাধারণ মতৈক্য দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ ভালোই হউক আর মন্দই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে দেশের লোকশিক্ষা ব্যবস্থার এক অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া পড়িয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের এমন কিছু বিশেষ গুণ আছে, যাহা প্রায় সমুদয় শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার পরিপোষক হিসাবে মূল্যবান। শিল্পপতিরা এখন ক্রমশঃই শিল্প-বাণিজ্যে কর্মচারী নিয়োগের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকদিগকেই প্রাধান্য দিতেছেন, অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়কেও এই নূতন পরিস্থিতির সহিত খাপ-খাওয়াইয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল : ডক্টর ওয়াল্টার এলেন জেকিন্স সি.আই.ই., ডি-এস.সি.

অনুবাদ : ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন

মাহে-নও

চৈত্র ১৩৬১

মার্চ ১৯৫৫

# সমাজ

# বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন

মোটামুটি ধরিতে গেলে মানুষের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার মাত্রকেই সামাজিক ব্যবহার বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে হাটবাজারে বা পথে-ঘাটে কেনা-বেচা করা বা কথাবার্তা বলাকেও সামাজিকতার অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু আমাদের নির্বাচনশীল প্রকৃতি স্বভাবতই এগুলিকে সামাজিক আচরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়। সমাজের ভিতর অন্যকে টানিয়া আনিয়া তাহার পরিসর বৃদ্ধি করার চেয়ে, সমাজ হইতে সরাইয়া রাখিয়া তাহার আভিজাত্য বা শুচিতা রক্ষা করার দিকেই আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক। মানুষের প্রকৃতিই এই যে অন্য হইতে নিজের শ্রেষ্ঠতা কল্পনা করা যদি নিতান্তই অসম্ভব হয়, তবে অন্য হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য বা অবিমিশ্রতা কল্পনা করাও সুখদায়ক বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় অবিমিশ্রতা সহজেই পবিত্রতার গৌরবে ভূষিত হইয়া উঠে।

কেহই নিজেকে সর্বতোভাবে অন্য দশজনের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া বিশেষত্ব হারাইতে চায় না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা পারাও যায় না। এই বিশেষত্ব বাহ্যতঃ পোষাক-পরিচ্ছদে, ভাব-ভঙ্গীতে, কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এইগুলি সামাজিক রীতি বা সামাজিক আচরণ। কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা আপন আপন বিশেষত্বগুলি সগর্বে প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র হইলে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাহাতে পৃথিবীর কারবার চলা কঠিন হইয়া পড়ে। তাই সমাজে এমন একটা সংযত শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে সমাজ উদগ্র না হইয়া অনেকাংশে মোলায়েম এবং উপভোগ্য হইয়াছে। অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া অনেক আচরণ করিতে হয়। অনেক সময় অপরের মনঃকষ্ট হইবে ভাবিয়া অপ্রিয় সত্য গোপন করিতে কিম্বা অকঠোর করিয়া বলিতে হয়। আপাততঃ এগুলিকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ব্যক্তিত্বের দাবীর পক্ষে অবমাননাজনক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যে মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অনেক বেশী। নিজেকে খানিকটা উর্দ্ধে অথবা দূরে সরাইয়া না রাখিলে সহজভাবে ভদ্রতা আসেনা। অনেকে বলেন ইহাতে সমাজে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়। একথা কতকটা সত্য বটে তবু পরিমিত মাত্রায় হইলে এরূপ ভদ্রতা শুধু যে সহনীয় তাহা নহে বরং বাঞ্ছনীয় ও উপভোগ্য।

যাহাদের লইয়া সমাজ গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্র চাই। জীবন-যাত্রা যত জটিল ও ব্যাপক হইবে অপরের সঙ্গে সংযোগের উপলক্ষও তত অধিক জুটিবে। কর্ম-সূত্রে, ভাবনা-সূত্রে, রক্তের টানে বা দৈবযোগে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয়। ট্রামের কনডাকটর, কারখানার কুলি, অফিসের কেরাণী, কলেজের ছাত্র বা অধ্যাপক, হাসপাতালের রোগী, জেলের কয়েদী, জমিদার সম্প্রদায় এরা কোনো না কোনো সূত্রে আপন দলের অন্য সকলের সহিত যুক্ত। এইরূপ স্বভাবতঃই লোকের রুচি, অবস্থা, মনোবৃত্তি, কালচার প্রভৃতি নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠিত হইয়া উঠে। কখনও বা সমাজে সমাজে সংঘর্ষও

বাঁধিয়া যায়। যাহা হউক, নানা কৃত্রিম উপায়ে সমাজ গড়িয়া তোলা যখন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং উহাই সভ্যতার অঙ্গ, তখন তাহা লইয়া বাদানুবাদ না করিয়া এই অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। 'মানুষ সবাই সমান এবং পরস্পর ভাই ভাই'—এ সমস্ত আপ্তবাক্য কল্পনা ও ভাবজগতে খাটিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনে এ সব কথা অত সহজ নহে।

এবার বাঙ্গালীর বর্তমান সামাজিক জীবনের কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা ও অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই চোখে পড়ে বাংলার বহু-বিভক্ত জাতি। ঘোষ, বোস, ভট্টাচার্য, দাস, সেন, সাহা, কৈবর্ত এ সমস্ত তো আছেই তাহার উপর আবার খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি উপসর্গ জুটিয়াছে। অবশ্য শ্রেণীগত বা পংক্তিগত সামাজিকতা সবদেশেই চিরকাল হইতেই আছে। ইহা কতকাংশে কল্যাণকর বটে। কারণ নিম্নতর সমাজের সামনে উচ্চতর সমাজের একটা আদর্শ বর্তমান থাকাতে উন্নত হইবার জন্য সমাজে একটা কর্ম-স্পৃহা জাগিতে পারে। কিন্তু যে সমাজ চিরকাল ধরিয়া বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে দৃঢ়ভাবে সেই সেই শ্রেণীতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দেয়, সে সমাজের প্রত্যেকে আপন ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যোগ্যতানুসারে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার সুযোগ পাইলেও সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া মানুষের অধিকার লাভ করিয়া অবাধ উন্নতির সুযোগ পায় না। হিন্দু সমাজে বর্তমানে কোনো কোনো বিষয়ে অনুন্নত জাতিরা উন্নত জাতিগণের সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন বটে, তবু তাহাদিগকে সামাজিকভাবে উন্নত জাতির সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না।

হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী জীবনে ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এ সমস্তের মূলে ধর্মান্ধতা যে একেবারে নাই, তাহা নহে। সাধারণ মুসলমান বাল্যকালে এই শিক্ষা পায় যে একমাত্র তাহারাই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার অধিকারী; হিন্দুরা বিধর্মী কাফের, দোজখের আগুনই তাহাদের সমুচিত শাস্তি; তাহাদের সংসর্গ ত্যাগ করা যদি অসম্ভব হয়, তবে তাহাদের সহিত অগত্যা আদানপ্রদান করিতেই হইবে; কিন্তু তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিলে শেষবিচারের দিন, সেইসব বন্ধুর পংক্তিতে স্থান লইয়া নরকবাসের পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার হিন্দু বালক বাল্যকালে এই শিক্ষা পায় যে, গো-খাদক, অপবিত্র যবনেরা আসিয়া ঋষি-অধ্যুষিত ভারতভূমি কলঙ্কিত করিয়াছে, দেবদেবীর অসম্মান করিয়াছে, তাহাদের নারীজাতির মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে এবং আত্মীয়স্বজনকে বলপূর্বক ধর্মভ্রষ্ট করিয়াছে। উহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই কর্তব্য, না পারিলে অগত্যা উহাদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করিয়া সুযোগমত নির্যাতিত করিতে পারিলেও কতকটা আর্য-গৌরব রক্ষা পায়। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মুসলমান যে চেহারা লইয়া অর্থাৎ যে শিক্ষা ও সংস্কার লইয়া হিন্দুর সামনে সচরাচর প্রতিভাত হয়, তাহাতে তাহারা যে অন্য সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই, এমন কি মুসলমান ও ভদ্রলোক যে বিপরীতার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অধিক আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। তবে দুঃখের বিষয় বাংলা ইতিহাস ও সাহিত্য পর্যন্ত এই ধারণা প্রধূমিত করিতে সহায়তা করে। কোনো শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না। ব্যবহারিক ধর্ম সত্য সত্যই লোককে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ না করিয়া তাহাদের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদের বহ্নিই প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে। বাল্যকালের এই সমস্ত ধারণা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাটিয়া গেলেও মনের অতল তল হইতে শেষ কলিমাটুকু মুছিয়া ফেলা সাধারণ লোকের কর্ম নয়।

কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে কতকগুলি শহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মূলে ধর্মবিদ্বেষ হয়ত সামান্যই আছে। মূল কারণ, সম্ভবতঃ কতকগুলি তথাকথিত সমাজনেতার সাময়িক স্বার্থসিদ্ধিমূলক উত্তেজনা এবং নিরন্ন লোকের আহার সংগ্রহের জন্য আত্মপোষণমূলক অন্ধ প্রচেষ্টা। বাহ্যিক এই সমস্ত মুখ্য কারণ, ভিতরের ধর্মবিদ্বেষকে জাগ্রত করিয়া দিয়া মানুষকে কতদূর পশুভাবাপন্ন করিতে পারে, আমরা তাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অনেকে বলেন কিছুদিন পূর্বে হিন্দু-মুসলমানে বেশ সদ্ভাব ছিল; এমন কি তাহাদের মধ্যে খুড়া, জ্যেঠা, চাচা, দাদা, প্রভৃতি প্রীতি সম্বোধন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমার বিশ্বাস পরম প্রীতি হইতে স্বতঃউৎসারিত যে সম্ভাষণ, এ সম্ভাষণ সেরূপ ছিল না। বাঙ্গালা দেশে কৃষিজীবী মুসলমান অতিশয় দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তাহারা উদরান্নের জন্য ধনীর বাড়ীতে মজুর খাটিতে বা ধনী মহাজনের বাড়ীতে ধর্না দিয়া পড়িয়া থাকিতে বাধ্য। শিক্ষায় বা অর্থে তাহারা হিন্দুর সমকক্ষ নয়। এজন্য সম্মানজনক বন্ধুত্ব ভাব ইহাদের মধ্যে আসিতেই পারে না। যেখানে একপক্ষে কৃপা অন্য পক্ষে দীনতাস্বীকার, সেখানে স্থায়ী হৃদ্যতার আশা করা যায় না। বর্তমানে মুসলমানের ভিতর শিক্ষা বিষয়ে একটু চেতনার সঞ্চার হওয়াতে তাহারা ক্রমশঃ নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছে, এবং যেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক, সেখানে 'করিম'-এর স্থলে 'করিম চাচা'র সম্মান পাইয়া অতিরিক্ত উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে না। এখানকার কালধর্মেই স্বাতন্ত্র্য-বোধ প্রবল করিয়া দিতেছে। হিন্দু-মুসলমানের ভিতর প্রকৃত স্থায়ী মনের মিল তখনই হইবে, যখন পরস্পরের প্রতি অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং যখন পরস্পরের বন্ধুত্বে ইহারা গৌরববোধ করিতে পারিবে।

বাঙ্গালী সমাজে উৎসব-আনন্দে, তীর্থে, পূজাপার্বণে হিন্দু-নারীর স্থান চিরদিনই ছিল। এখন শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সর্ববিষয়েই পুরুষের সমকক্ষতা করিতেছেন। তাঁহারা শুধু গৃহে আনন্দ বিতরণ নয়, বাহিরে শুধু পুরুষকে উৎসাহ দান নয়, নিজেরাই সমস্ত কর্মে পুরুষের সহকর্মিণী ও সমস্ত ধর্মে পুরুষের সহধর্মিণী হইতেছেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলিম-মহিলারা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শিক্ষার চাঞ্চল্যে পর্দার কুহক কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে তাঁহাদের সত্বর মুক্তি নাই। অবশ্য মুক্তি অর্থে উচ্ছৃঙ্খলার কথা বলিতেছি না; তাহাদের বিকাশ ও পরিণতির কথাই বলিতেছি। হিন্দু-সমাজে নারী-শিক্ষা ও কথঞ্চিৎ নারী স্বাধীনতার ফলে ছেলেরা সুশিক্ষা পায় ও তাহাদের মধ্যে একটা সহজ সু-রুচি জন্মে। নারীসমাজের এই স্বাস্থ্যকর প্রভাব হইতে বঞ্চিত থাকা মুসলমান ছেলেদের পক্ষে (যুবক ও বৃদ্ধের পক্ষেও) সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। মুসলমান সমাজে এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার অর্থ, উক্ত দুই পরিবারের পুরুষেরা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবে, মেয়েরাও মেয়েদের মধ্যে পরিচিত হইবে; কিন্তু মেয়েদের ও পুরুষদের মধ্যে যে দেওয়াল, তাহা উত্তুঙ্গ হইয়াই থাকিবে। সমাজকে এইরূপে আধাআধি ভাগ করিবার ফলে, ইহার সংহতি ও শক্তি স্বভাবতঃই অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে।

বর্তমান প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষা বাঙ্গালী সমাজে নূতন আমদানী। এই জন্য উহা কিরূপ হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। ইতিমধ্যেই কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে— বিদুষী মহিলাদের অনেকের বিবাহবিমুখতা। এইরূপ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি-নিরোধ সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই হানিকর। বর্তমান

প্রণালীর শিক্ষাদ্বারা যে ছাত্র ও ছাত্রীদের সংযম শক্তি ও ব্রহ্মচর্যবৃত্তি অতিরিক্ত পরিমাণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, একথা মনে করিবার সম্ভবতঃ কোনো হেতু নাই। তবে শিক্ষায় কতকটা দায়িত্ববোধ উদ্বুদ্ধ করে বটে; তাহার ফলে পুরুষেরা উপযুক্তরূপ উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করিতে চায় না। আজকাল শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা সকলেরই চাল অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ সংস্থান তদনুরূপ হইতেছে না। এই অর্থনৈতিক কারণে, যাঁহারাই সন্তান-পালনে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহের ও সন্তান-জন্মের হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, মহিলাদের বিবাহবিমুখতার একটি কারণ উপযুক্ত বরের অভাব (উপযুক্ত বর বলিতে কন্যা অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত, ধনবান বা প্রচুর উপার্জনক্ষম, নিটোল স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ বুঝায়, যাহার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়)। আর একটি কারণ, শিক্ষিত পুরুষের আত্মপরায়ণতা আর শিক্ষিতা মহিলার নবোন্মেষিত আত্মজাগরণ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি। নারী এখন কতকটা নিজের শক্তি বুঝিতে পারিয়া পুরুষের অধীনতায় আত্মবিক্রয় করিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এতকাল ধরিয়া যে নারী নির্যাতিত ও অবমানিত হইয়া আসিতেছে, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে নারী ও পুরুষ কাহাকেও যদি অর্থনৈতিকভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে না হয়, তবে সমাজের বা পারিবারিক জীবনে বর্তমান রূপ একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। এ সমস্ত কোমল-স্পর্শ বিষয়ের আলোচনায় আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া এখন সাধারণভাবে বর্তমান শিক্ষার আরও দুই একটা প্রভাবের কথা উল্লেখ করিব।

পূর্বেই বলিয়াছি কাল্‌চারের সমতা সমাজ-বন্ধনের একটি প্রধান উপকরণ। কাল্‌চার জিনিসটা মানুষের মজ্জাগত; —কতকটা সংস্কার, কতকটা শিক্ষালভ্য। চেহারার লাবণ্য যেমন, জীবন-যাত্রা প্রণালীতে কাল্‌চারও তেমনি; প্রত্যেক কাজে প্রকাশ পায়, কিন্তু ঠিক বলা যায় না, কিসে তার বিশেষত্ব। সংস্কারগত কাল্‌চারই শিক্ষার দ্বারা মার্জিত হইলে ভব্য হইয়া উঠে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক শিক্ষাহীন হওয়াতে এই ভব্যতার মূল্য অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতদের নিকট অশিক্ষিতেরা একরূপ অপাংক্তেয়। তাহারা যে শুধু অবজ্ঞেয় তাহা নহে; অনেক স্থলে দেখা যয়, তাহারা শিক্ষিতদের স্বার্থসিদ্ধির কামধেনুরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষাটা যদি সর্বসাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক হয়, তবেই এ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, নতুবা নয়। শিক্ষিতের স্বার্থপরতা ও আত্মানুবর্তিতা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত মুসলমান সমাজেই উৎকট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিজীবী পিতা হয়ত অতি কষ্টে পুত্রের লেখাপড়া ও বিলাস-সামগ্রীর ব্যয় বহন করিতেছেন, আর পুত্র উৎকৃষ্টতম আহারে শরীর পুষ্ট করিয়া পিতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের উপর উদ্ধতভাবে কর্তৃত্ব করিতেছে এবং অবসরসময়েও সংসারের কাজকর্মের একটু সহায়তা করিবার ইঙ্গিত মাত্রেও নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিতেছে, এরূপ দৃশ্য খুব বিরল নহে। বাঙালী সমাজের শিক্ষিতেরা শুধু মস্তিষ্ক বা কলম চালনা করিবে, আর অশিক্ষিতেরাই কেবল হস্ত-চালনা বা পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে, ইহাই সনাতন রীতি। শিক্ষার প্রসার হইতেছে বটে, কিন্তু এই নীতির নড়চড় হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষিত সমাজের এই অপ্রেম ও নির্লিপ্ততা সমুদয় সমাজের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহির হইতে টানিয়া তুলিতে গেলে, যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, তাহাদের জড়ত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়; কারণ সহজভাবে উন্নতির ডাকে সাড়া না দিয়া তাহারা স্বভাবতঃই মনে করে ইহার ভিতর নিশ্চয়

তাহাদের বুদ্ধির অগম্য কোনো সর্বনাশজনক অভিসন্ধি রহিয়াছে। সমাজসেবার অন্যান্য নানাপ্রকার বিঘ্নের মধ্যে এটাও একটি বিশেষ বিঘ্ন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রগুলি সহর হইতে সরাইয়া পল্লীগ্রামে স্থাপন করা প্রয়োজন; তাহা হইলে দ্রুত গতিতে শিক্ষাবিস্তার হইয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ঘনিষ্ঠতর সমাবেশের ফলে পল্লীশ্রী বর্দ্ধিত হইবে। শুনিতে পাই, জার্মানীতে এই নীতি অনুসৃত হইয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে।

বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থায় একান্নভুক্ত পরিবার একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। এখন সে ব্যবস্থা একটু শিথিল হইয়াছে বটে, তবু যেটুকু আছে, তাহাও সামান্য নহে। পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সংসারের সহিত সম্পর্ক এখন পর্যন্ত একদম চুকাইয়া দেয় নাই। এক পরিবারের একজন একটু অক্ষম হইলে আর পাঁচজন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয় না, বরং সকলে মিলিয়া তাহাকে চালাইয়া লইবার চেষ্টা করে। ইহার ভিতর যে প্রীতি ও সহানুভূতি আছে, তাহা অধিককাল টিকিবে কি না কে বলিতে পারে? ক্রমশঃ লোকের অভাব এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এরূপ অবস্থায় নিকট-আত্মীয়েরাও বাধ্য হইয়া পর হইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাই তখনকার লোকে দল বাঁধিয়া কুটুমবাড়ী যাত্রা করিত। আর সমস্ত কুটুম্বের আদর-আপ্যায়ন স্বীকার করিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস সময় লাগিত। ঘরে তখন যথেষ্ট পরিমাণে খাবার থাকিত, আর এখনকার মত বিলাসজাত কৃত্রিম অভাবও ছিল না; কাজেই লোকে তখন অতিথিকে দুধে-মাছে বা ডালে-ভাতে খাওয়াইয়াই তৃপ্তি অনুভব করিত।

কিন্তু এখন লোকের বাড়ীতে অতিথি আসিয়া দুইদিনের স্থলে তিনদিন থাকিলেই অনেকের পক্ষে সত্য সত্যই দুর্বহ হইয়া পড়ে। দেশের অর্থকষ্ট দিন দিন যেরূপ ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সক্ষম অক্ষম সকলেরই নিজের শক্তির উপর নির্ভর করা প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। প্রয়োজনের অঙ্কুশ-তাড়নায় কতলোক জর্জরিত হইয়া অন্যের সহানুভূতিহারা হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে; আবার কেহ কেহ জীবনরক্ষার জন্য পূর্ণ শক্তির প্রয়োগ করিতে গিয়া আত্মশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন। এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসসম্পন্ন লোকেরাই সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল।

অর্থের যে প্রকার অনটন হইয়া পড়িয়াছে জীবনযাত্রা-প্রণালীতে সেই প্রকার ব্যয়সঙ্কোচ না করিতে পারিলে কেমন করিয়া চলিবে? বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অনেক আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সহজ-সরলভাবে চলিতে হইবে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মহার্ঘ খাদ্য ও পানীয়ের পরিবর্তে, অনায়াসলভ্য সস্তা খাঁটি ও পুষ্টিকর জিনিস ব্যবহার করিতে হইবে। শুধু আহার সম্বন্ধে কেন, আচ্ছাদন ও অন্যান্য আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও যথাসম্ভব সহজ হওয়া দরকার। বিশেষতঃ বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে গরীবের প্রতি যে সমাজসম্মত বোঝা চাপাইবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহা তুলিয়া দিতে হইবে; এই সঙ্গে সমগ্র সমাজের মনোবৃত্তি এমন হওয়া আবশ্যক যে প্রচলিত ব্যয়বহুল প্রথার অন্যথাচরণ করিতে গিয়া দরিদ্রকে যেন কোনো প্রকার দীনতা বা অবমাননা সহ্য করিতে না হয়।

সমাজে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কত সমস্যা রহিয়াছে, তাহা বর্ণনার দ্বারা শেষ করা দূরের কথা, কল্পনায়ও ধারণা করা অসম্ভব। তাই বাঙালীর সমাজজীবনের আর একটি মাত্র লক্ষণের বিষয় উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। এ বিষয়টি সাধারণ ধর্মবোধ। লোকের প্রকৃত ধর্মবোধ হৃদয়ে অবস্থান করে, পুস্তকে নয়। জাতির বর্তমান অবস্থাই তাহার ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিমাপক।

আমরা যদি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকি, তবে বুঝিতে হইবে, কার্যতঃ আমাদের ধর্মবোধ বা সুনীতিপরায়ণতা অতি সামান্য। ধার্মিক মুসলমান আখেরের আশায় নামাজ-রোজা করিতেছে, ধার্মিক হিন্দু প্রাচীন আর্য-কীর্তি "গৌরব-কাহিনী" প্রচার করিয়া "লুপ্ত পুরাতন গরিমা" উদ্ধারের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতেছে। ঠিক অন্তরের জিনিস হইলে ইহাতে অন্ততঃ কিছু না কিছু কাজ হইত। কিন্তু মুষ্টিমেয় জনকয়েকের কথা ছাড়িয়া দিয়া গোটা সমাজের কথা বলিতে গেলে দেখা যায় :— অনুষ্ঠানপ্রীতি হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানের ভিতর কিছু বেশী আছে, ঈশ্বরচিন্তা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বিরল, আর পাপভীতি কেবলমাত্র সাংসারিক লাভ-লোকসান বা সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে। অভাবের তাড়নায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে সমাজকে ছাড়াইয়া ব্যক্তির জয়ধ্বজা উড়িয়াছে অর্থাৎ আত্মানুগ-বুদ্ধি অতি-মাত্রায় সজাগ হইয়াছে; আর সনাতন নীতির অটল সৌধ এখন টলমলায়মান হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার দর্শন নিত্য পদার্থের অন্বেষণ করিত, নিত্য-সুখের নিকট পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনকার দিনে 'অনিত্য' আর তুচ্ছ নাই। ক্ষণিক আনন্দ আজকাল মুহূর্তের নিবিড়তার জন্যই মহা মূল্যবান। ভবিষ্যতের বিভীষিকা দেখিয়া যে দূরদৃষ্টি বর্তমানের আনন্দ উপেক্ষা করে, সেই বৃদ্ধ দূরদৃষ্টি এখন উপহাসের সামগ্রী। দূর ভবিষ্যতের ভয় বা আশার স্থলে, নিকট বর্তমানের আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, সমাজের সংযম ও শৃঙ্খলা বোধ অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তেমন ভীত হইবার কোনো কারণ নাই। এতকাল ধরিয়া আমরা সত্যের একটা দিক লক্ষ করিয়া আসিয়াছি, আর অন্যদিক তেমন উজ্জ্বলভাবে দেখি নাই। এখন সেই দিকটায়ই এ সুযোগে দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহাতে আগেকার মেকিটুকু যেমন ধরা পড়িবে এখনকার বাহুল্যটুকুও তেমনি পরিমার্জিত হইয়া সহজ পূর্ণতর পরিণতি লাভ করিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে শিক্ষা, রুচি, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষে মানুষে ভেদ চিরকালই থাকিবে। চিরকালই সমাজে শাসক ও শাসিত, চালক ও চালিত এই দুই শ্রেণীর লোক থাকিবে, কিন্তু একটি জাতির প্রকৃষ্টতম উন্নতির পক্ষে তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণতম সহযোগিতা আবশ্যক। তজ্জন্য পরস্পর প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় হওয়া চাই; আর সকলের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার অবসান হওয়া চাই। কালচারের বিভিন্নতা বা মনুষ্যত্বের পার্থক্যই বোধ হয় মানুষে মানুষে সত্যিকার পার্থক্য। আমরা বিষয়, সম্পদ, জাতিধর্ম বা বর্ণ হিসাবে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছি তাহা কাল্পনিক। এই শিক্ষা যখন আমাদের মনের ভিতর সহজ হইবে, তখনই আমরা সমগ্র সমাজকে একদেহ বলিয়া অনুভব করিতে পারিব, আর তখনকার সেই প্রীতি-বন্ধনের ভিতরই আমরা নিজেদের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে পারিব।

# উৎসব ও আনন্দ

সাধারণ দিনগুলির একঘেয়েমির মধ্যে উৎসবের দিনগুলো আনন্দ ও বৈচিত্র্য এনে দেয়। আর সব দিনে মানুষের মন সচরাচর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষুদ্র স্বার্থে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎসব দিনে মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করে; উৎসবের দিনে তার মনে হয়, সে একলা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তার আত্মীয়। তাই এত আনন্দ।

সব মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমাত্মীয়ের সহিত কোনো না কোনো সূত্রে উৎসবের যোগ থাকে। তাইতেই তো সকলে একযোগে একই উৎসবে যোগ দিতে পারে। ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধর্মগত যে সব বৈষম্য আমরা কৃত্রিম উপায়ে গড়ে তুলেছি, সে সমস্ত ভুলে মনকে অপরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে যে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় তাই উৎসবদিনের পরম সার্থকতা। হাজার হাজার লোকের আনন্দ দেখে স্বভাবতঃই সেই আনন্দে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়—নতুবা চিত্তের দৈন্যই প্রকাশ পায়। উৎসবের দিনে সবার মনে অলক্ষে এক ছন্দ বাজে। সেই ছন্দের ব্যাঘাত জন্মিয়ে ব্যক্তিগত সাম্প্রদায়িক বা ধর্মগত যে কোনো কারণেই হউক, আনন্দ-মিলনের ক্ষেত্রে কলহ-বিদ্বেষের সূচনা করা নিতান্তই আসুরিক ব্যাপার; অতএব তা নিন্দনীয়। মানুষের মধ্যে সত্যদৃষ্টির যতই প্রসার হবে উৎসবাদির বাহ্যরূপ ছাড়িয়ে তার অন্তর্নিহিত উৎসমূলের দিকে ততই অধিক দৃষ্টি পড়ায় লোকের আচরণ সুন্দর ও উদার হবে, সন্দেহ নাই। এরূপ চমৎকার প্রীতিবন্ধন যত শীগগীর ঘটে ততই মঙ্গল। এজন্য অন্ধভক্তির পরিবর্তে জ্ঞানালোকিত ভক্তির চর্চা করা আবশ্যক।

আমরা বহু সম্প্রদায়ের লোক কতকাল ধরে পাশাপাশি বাস করছি; তবু পরস্পরের উৎসবাদির সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। প্রমাণস্বরূপ, বড়দিন, ঈদুলফেতর ও সরস্বতী পূজার অন্তর্নিহিত কল্পনা ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে শতকরা ক'জনের সম্যক জ্ঞান আছে, খতিয়ে দেখলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। আমরা সচরাচর শিক্ষাপ্রণালীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে চাই। কিন্তু মূলতঃ পরস্পরের প্রতি অপ্রেমই এই ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ। পারিপার্শ্বিক ব্যাপারাদির প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি; এজন্য স্বাস্থ্যবান শিশুর মধ্যে এর সমধিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। রুগ্ন শিশু আপনার তাল সামলাতেই ব্যস্ত, এজন্য তার স্বাভাবিক কৌতূহলবৃত্তি চাপা পড়ে যায়। গোটা সমাজ সম্বন্ধেও তাই। আমরা সচরাচর ক্ষুদ্রতর আত্মস্বার্থে এত অধিক ব্যাপৃত থাকি যে, নিখিল মানবসমাজের বৃহত্তম স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে বারে বারে তার বিঘ্ন ঘটাই। পৃথিবীর অধিকাংশ অশান্তির এই প্রধান কারণ। যা'হোক, উৎসব-আনন্দাদির ভিতর দিয়ে আমরা পরস্পর অন্তরের যোগ-স্থাপন করবার সুযোগ পাই। এই সুযোগ অবহেলা করে হারানো বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

উৎসব এক বৃহৎ সামাজিক প্রদর্শনীর কাজ করে। সকলে সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-পর ভুলে, মিলনোন্মুখ প্রশান্ত মন নিয়ে সমবেত হয়। পরস্পর সামাজিক মেলামেশায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রটিগুলি যাতে প্রকাশ না পায় সেদিকে অবহিত হয়, আর অন্যের স্বভাব বা আচার-ব্যবহারের শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করতে উৎসুক হয়। এইভাবে উৎসব আমাদের সামাজিক রুচি-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবার সহায়তা করে। যেসব উৎসবে নরনারী সকলেই একত্র যোগ দিতে পারে, সে সব স্থলে বেশভূষার পারিপাট্য, ব্যবহারের শিষ্টতা প্রভৃতি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রতিযোগিতা হয়। এতে কারও কারও প্রচুর আড়ম্বর প্রদর্শনের অবকাশ ঘটতে পারে সত্য, কিন্তু মোটের উপর এর ফলে কলাকৌশলের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় সমাজ অধিকতর মনোরম হয়। নারীগণ স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ ক'রতে পারে ব'লে তাদের জড়তা দূরীভূত হয়ে আত্মনির্ভর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; আর অভিজ্ঞতার ফলে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ হওয়ায় দেহশ্রীতেও তার ছাপ পড়ে। পুরুষেরাও মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের স্বাভাবিক উগ্রতা ও রুক্ষতা প্রশমিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর উৎসবরীতির সাধারণ তারতম্য অনুসারে সেই সম্প্রদায়ের নরনারীর চরিত্রগত এই সকল বিশিষ্টতা সহজেই রক্ষা করা যায়।

উৎসবের দিনে লোকে বাহ্য পরিচ্ছন্নতার প্রতি যেমন মনোযোগী হয়, তেমনি দানধ্যান, সর্বজনে সমাদর ও সম্মান, বিশ্বের সহিত নিবিড় যোগানুভব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলীরও পরিচয় দেয়। তাইতেই তো উৎসব এত মধুর ও আনন্দময় হয়। জাতীয় জীবনের কোনো বিশিষ্ট গৌরবময় ঘটনা বা গুণী লোকদিগের মহৎ কীর্তি অবলম্বন ক'রেই উৎসবের প্রচলন হয়ে থাকে। এসব ঘটনা বা কীর্তি যে কেবলই সুখস্মৃতি জাগিয়ে তোলে তা' নয়, অনেক সময় মর্মন্তুদ করুণ ঘটনা অবলম্বন করেও উৎসবাদি হয়। মোটের উপর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত হওয়াতে উৎসবের দিনে আমরা জগৎকে অভিনব দৃষ্টিতে দেখে থাকি। গভীর আনন্দ বা শোকে সকলেই এক ভাবাপন্ন হয় ব'লে সবার সঙ্গে মিলন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। নব শস্য লাভ ও ঋতুর প্রাকৃতিক শোভার সহিতও কোনো কোনো উৎসবের যোগ আছে। এ সব স্থলে অবশ্য ধর্ম, সমাজ ও জাতিগত বিভেদের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এক দেশবাসী সকলেই ধর্ম, সমাজ ও জাতিনির্বিশেষে এই সব উৎসবে যোগ দিলে কতই সুখের হয়।

উৎসবাদি ক্রমশঃ আরও পরিপূর্ণরূপে সার্বজনীন হয়ে উঠে আমাদের অন্তঃকরণকে বিকশিত করুক, এবং মানুষে মানুষে প্রীতিবন্ধন জাগিয়ে তুলে জগৎকে সুন্দর ও শান্তিময় করুক, এই কামনা করি।

## আনন্দ ও মুসলমান গৃহ

জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ হাসি ও আনন্দ। যার প্রত্যেক কাজে আনন্দ ও স্ফূর্তি, তার চেয়ে সুখী আর কেউ নয়। জীবনে যে পুরোপুরি আনন্দ উপভোগ করতে জানে, আমি তাকে বরণ করি। কারণ, সংসারের স্থূল দৈনন্দিন কাজের ভিতর সে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে, যা তার নিজের জীবনকে সুন্দর শোভন করেছে এবং পরিপার্শ্বস্থ দশ-জনের জীবনকেও উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। এই যে এমন একটা জিনিসের সন্ধান, যার ফলে সংসারকে মরুভূমি বলে বোধ না হয়ে ফুলবাগান ব'লে মনে হয়, সে সন্ধান কিন্তু সকলের মেলে না। যার মেলে, সে পরম ভাগ্যবান। এইরূপ লোকের সংখ্যা যেখানে বেশী, সেখান থেকে কলুষ-কদর্যতা আপনা আপনি দূরে পালায়—সেখানে প্রেম ও পবিত্রতা বিরাজ করে।

আমরা যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সে-দিকেই একটা চমৎকার ছন্দ দেখতে পাই। জগতের সমস্ত কাজ, সমস্ত ঘটনা, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব'লে বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমষ্টি মিলে কি মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করে! একটা পাতা নড়লে কোনও শব্দই হয় না, কিন্তু সহস্র পাতা নাড়া পেয়ে কুঞ্জবনের মর্মরধ্বনি উৎপন্ন করে! একটা তরঙ্গের অভিঘাতে সামান্য শব্দমাত্র হয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বীচিমালার সমবায়ে কল্লোল-গীতির সৃষ্টি হয়। একটা বর্ণ দেখতে হয় তো মন্দ নয়, কিন্তু সাতটি বর্ণে কেমন সুন্দর ইন্দ্রধনু রচিত হয়! গ্রহ-তারকা, চন্দ্র-সূর্য কেমন মিল রেখে, যেন নেচে নেচে, অনন্তকাল থেকে অসীম শূন্যপথে কোন অনন্তের উদ্দেশে ছুটে চলেছে;—কি যে মন্ত্র এরা পেয়েছে, যে তিলেকের জন্যও এদের ছন্দঃপতন হয় না! প্রাণী-জগতেও দেখতে পাই, সকালবেলা পাখীরা মিলে কি 'চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীত' গায়, যা শুনে শত শত কবির ভাবধারা উছলে উঠেছে, এবং সহস্র সহস্র অকবি অন্তত ক্ষণেকের তরেও মোহিত হ'য়ে সে আনন্দ-সুধা পান করেছে। পশু-পক্ষীরা আহার-বিহার, সন্তানপালন এবং পরস্পর ঝগড়া-মারামারি ক'রে বেশ একভাবে জীবন কাটিয়ে দেয়,—তার ভিতরেও একটা শৃঙ্খলা রয়েছে। আর মানুষ—যা বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—যা আশা-আকাঙ্ক্ষায়, আদর-অভিমানে, বেদনা-পুলকে, কর্মে-ভাবনায় সদা বৈচিত্র্যময়—সেই মানুষের জীবন কি কখনও ছন্দ-বিহীন হ'তে পারে?—কখনই না। যিনি উদার প্রশান্ত দৃষ্টি দ্বারা জটিল মানব-সমাজের বহুমুখী প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এক গভীর একত্বের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি কবি অথবা দার্শনিক, তাঁর জীবনকে আবিলতা বা কুটিলতা স্পর্শ করতে পারে না। তিনি আনন্দের প্রতিমূর্তি—বিপদ তাঁর কাছে ফুল হ'য়ে সৌরভ ছড়ায়,—সম্পদ তাঁর জীবন-বীণায় মোহন সুরের ঝঙ্কার দেয়; অথচ কোনোটাই তাঁকে অভিভূত করতে পারে না। তাঁর বাণী আনন্দের স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করে চতুর্দিক উজ্জ্বল করে; আর তাঁর সাহচর্য অমৃত-রস সিঞ্চন করে ক্লিষ্ট তাপিতকে সঞ্জীবিত করে।

কিন্তু এই সব আদর্শ লোক আর কয়জন পাওয়া যায়? এক এক যুগে হয়তো দুই-চার জনের বেশী হয় না।

আমরা সাধারণ লোকে পৃথিবীর এই অপরূপ ছন্দ, আনন্দ ও নৃত্যের ভিতরেও যেরূপ নিরানন্দভাবে কাল কাটাই, সেটা বিস্ময়কর যতটা হোক না-হোক, শোচনীয় বটে। তবুও আশার কথা এই যে, সংসারে আনন্দ বৃদ্ধি করবার জন্য চিরকাল থেকে মানুষ অসীম অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করেছে, এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছে। আনন্দের উৎস হৃদয়ের প্রাচুর্য এবং তা থেকেই পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টি হয়। তাই আজ আমরা সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি লাভ করেছি। আবার আমরা যে সমাজ-বদ্ধ হয়ে বাস করি, এমন কি গৃহে যে আত্ম-পরিজন নিয়ে মিলেমিশে বাস করি, তাও বিপদে সাহায্য ও সমবেদনার জন্য, এবং সম্পদে আনন্দের ভাগী হবার এবং ভাগ দেবার জন্য। নইলে সমাজ বা গৃহ—কিছুরই তেমন প্রয়োজন হ'ত না।

যে-সমাজ প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারে, তার মধ্যে সঙ্কোচ, দ্বিধা বা ভীরুতার বন্ধন নেই—সে সমাজ বলবান স্বাধীন, প্রাণময়; সে-সমাজের গৃহে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে, বাহিরে প্রত্যেক কাজে তেজ ও উৎসাহ প্রকাশ পায়; তার মন সরস ও সচেতন। সেই সমাজের আনন্দরসেই প্রতিভার জন্ম হয়। আমরা একটু চোখ মেললেই দেখতে পাই, যাদের আনন্দ আছে, তারাই জীবন্ত—তারাই পৃথিবী শাসন করছে। যাদের আনন্দ নেই, তারা তো মৃত—তাদের এ বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকায় লাভ কি আছে? তাই আজ প্রাণ খুলে বলতে চাই, আমরা বাঁচার মত বেঁচে থাকব,—জীবনকে সার্থক করব, সুন্দর করব, উপভোগ করব, আনন্দ রসে অভিষিক্ত করব,—আমরা প্রতিভার জন্ম দিব, জগতে ধন্য হব, বরেণ্য হব।

মুসলমান-সমাজে আমরা আনন্দের অত্যন্ত অভাব দেখতে পাই। আমার মনে হয়, এই-ই মুসলমানের সবচেয়ে নিদারুণ অভাব। এই জন্য মুসলমান যেন অনেকটা কাটখোট্টা ধরনের হয়। উন্নত চিন্তা বা আনন্দের তৃপ্তিতে চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়, তা যেন এদের নেই,—এদের চেহারায় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এবং বিরক্ত লোকের ন্যায় কেমন একটা রুক্ষ ভাব বর্তমান।

মুসলমানের (অন্ততঃ বাঙালী মুসলমানের) এই সর্বনাশী অভাবের প্রধানতম কারণ—শিক্ষার অভাব। সুশিক্ষা না হলে সুরুচি জন্মে না;—সুরুচির অভাব যেখানে, সেখানে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলি বিকশিত বা চরিতার্থ হ'তে পারে না। এরূপ স্থলে সত্যিকার আনন্দ কিরূপে সম্ভব হবে? শিক্ষা মুসলমান পুরুষের ভিতরেই সামান্য,—নারীদের তো কথাই নেই। অধিকাংশ মুসলমান পরিবারেই দেখা যায় যে পরস্পরের ভিতর শিক্ষার অত্যন্ত অসমতা; এজন্য তাদের ভাব ও চিন্তাধারাতেও দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য। প্রধানত এই কারণেই গৃহ বলতে যা বুঝায়, মুসলমানের তা নেই। এখানে ভাই-বোন, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-কন্যা সকলে মিলে চিন্তার ক্ষেত্রে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বা জীবন-সমস্যার আলোচনায় এক হ'তে পারছে না। সকলেই যেন ফাঁকা-ফাঁকা—ভাসা ভাসা। এদের জীবন যেন একটা আশ্রয় বা অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছে না—ছায়াবাজির ন্যায় নড়াচড়া করছে বটে, কিন্তু আসলে তা প্রাণহীন।

গৃহহারা হ'লে লোকে তাকে লক্ষীছাড়া হতচ্ছাড়া বলে। মুসলমান সমাজটা বাস্তবিক তাই। গৃহশূন্য লোক একটু আনন্দের জন্য কত ব্যাকুল হয়, কিন্তু পায় না। এ-সমাজের লোকও একটু আনন্দের জন্য কত লালায়িত, লুব্ধ, তৃষ্ণার্ত, কিন্তু কোথায় পাবে? উন্নত রুচির

আনন্দের যেখানে অভাব সেখানে সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল আনন্দই চরম লক্ষ্য হয়। এজন্য দেখা যায়, কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাশবিক আনন্দ নিয়েই প্রায় পৌনে ষোল আনা মুসলমান মশগুল হয়ে আছে।

আগেই বলেছি, মুসলমানের শিক্ষার অভাবের কথা। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, জগতে তার তুলনা নেই। এ-ব্যবধান ইচ্ছা করলেই কিছু কমানো যেতে পারে, কিন্তু সচরাচর সে-ইচ্ছাটা যেন দেখা যাচ্ছে না। অনেক সময় অশিক্ষিতা বা অর্ধশিক্ষিতা স্ত্রীগণকে গর্বিত স্বামীর দল তুচ্ছ করে দূরে সরিয়ে রাখে,—যেন তারা মানুষই নয়, যেন বোঝালেও তারা কিছুই বোঝে না। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বেশীর ভাগ মেয়েই চমৎকার বুদ্ধি ধরে, তাদের কল্পনা ও ধারণাশক্তিও বেশ প্রখর;—অনেক সময় তারা স্বামীর পুঁথিপড়া উদ্ভট থিওরীকে সহজ ব্যবহারিক বুদ্ধি দ্বারা বেশ উড়িয়ে দিতে পারে। তাই স্ত্রী অল্প-শিক্ষিতা হ'লেও স্বামী যত্ন করলে ধীরে ধীরে তাকে বেশ চলনসই করে নিতে পারে—আস্তে আস্তে তার কুসংস্কারগুলি দূর ক'রে তার মনকে উদার ক'রে তুলতে পারে এবং বাইরের আলো-বাতাসের সঙ্গে একটু পরিচয় ঘটিয়ে তার জ্ঞানের পরিসর যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে,—এমন কি কিছু সাহিত্য-রসও আস্বাদন করাতে পারে; এবং তা' হলে গৃহহীনতার বিরাট শূন্যতা কতকটা ভরাট হয়।

মুসলমানের যে গৃহ নেই, তার একটা কারণ, আনন্দের উপকরণের অভাব। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এক কথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোনও সংস্রবেই থাকবে না। মুসলমান পুরুষেরা কেবল কাজ করবে, আর ঘর শাসন করবে; মেয়েরা কেবল রাঁধবে বাড়বে আর ব'সে ব'সে স্বামীর পা টিপে দেবে;—তা' ছাড়া খেলাধুলা, হাসিতামাশা বা কোনও প্রকার আনন্দ তারা করবে না—সব সময় আদব-কায়দা নিয়ে দুরস্ত হয়ে থাকবে। মুসলমান বাপের সামনে হাসবে না, বড় ভাইয়ের সামনে খেলবে না, গুরুজনের অন্যায় কথায়ও প্রতিবাদ করবে না,—এমন কি কচি ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত মার খেলেও চেঁচিয়ে কাঁদবে না! এই রকম হাজার হাজার আইন-কানুনের বেড়াজালে প'ড়ে মুসলমান ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। আনন্দ? কোথায় আনন্দ? কি হবে আনন্দে? মুসলমান তো বেঁচে থাকতে আনন্দ করে না, সে ম'রে গিয়ে বেহেশতে প্রবেশ ক'রে পেট ভরে খাবে, আর হুরপরীদের নিয়ে অনন্তকাল ধ'রে আনন্দ করবে। ব্যস্! এই তার সান্ত্বনা!

পৃথিবীতে যদি আনন্দ-পেষা কল না দেখে থাকো, তবে এসো, বাঙলার এই মুসলমান সমাজে এসে তা দেখে যাও। এই কলের হুকুম তোমাকে মানতেই হবে;—আর তুমি যে-হও সে-হও, তোমাকে এতেই আনন্দ পেতে হবে। অন্যভাবে যদি তুমি আনন্দ পেতে চাও, তবে তা বেদাৎ ও হারাম হবে। তোমাকে এই কলের ভিতরেই ঢুকতে হবে, এবং বাইরে থেকে প্যাচের উপর প্যাচ কষা হবে;—আর তোমাকে বলতে হবে, 'আহা, কি আনন্দ! কি আরাম!'

মুসলমান সমাজে পুরুষ আছে, স্ত্রী নেই; আকাঙ্ক্ষা আছে, উদ্যম নেই; ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিত্ব নেই। এ সমাজের পেট আছে, হাত নেই; পা আছে, গতি নেই; দেহ আছে, মাথা নেই; এক কথায়—আমাদের সমাজ আছে, প্রকৃত সামাজিকতা নেই। কিন্তু এর মোহ আমাদের এত অধিক যে আমরা সব ত্যাগ করব—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সব বিসর্জন দেব, কিন্তু সমাজ আমাদের মাথায় থাক!

গৃহে যখন আমাদের থাকতেই হবে, তখন আমরা এর সংস্কারে লেগে যাইনে কেন? সমাজকেও যখন আমরা বাদ দিতে পারি না, তখন একে সরস শোভন এবং আনন্দময় ক'রেই গড়ে তুলি না কেন? যদি আমাদের ভিতর প্রকৃত অনুভূতি জেগে থাকে, যদি আমরা চলন্ত জীবন্ত বিশ্বের সংস্পর্শে এসে প্রাণের ভিতর স্পন্দন অনুভব ক'রে থাকি, তবে আমাদের আর বসে থাকলে চলবে না;—এই বেলা সকলে মিলে পূর্ণ উদ্যমে ভাঙাগড়ার কাজ আরম্ভ করতে হবে। এই একমাত্র উপায়—যার দ্বারা আমাদের জীবন পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করবে।

# শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য

প্রত্যেক সমাজে শিক্ষিতেরা চালক, অশিক্ষিতেরা চালিত। এজন্য শিক্ষিতদের দায়িত্ব অপরিসীম। বর্তমানকে সম্যকরূপে বুঝিয়া লইয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কর্ম ও চিন্তা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা তাঁহাদেরই কাজ।

কিন্তু বর্তমানে বাঙালী শিক্ষিত মুসলমান বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝায়, বাঙালী সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব কতটুকু, ভাবিয়া দেখা দরকার। শিক্ষিত লোক বলিতে প্রধানতঃ বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পাস বা তদপেক্ষা অধিক শিক্ষিত লোককেই লক্ষ করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ রাজপুরুষ, কেহ কাউন্সিলের মেম্বর, কেহ শিক্ষক, কেহ ছাত্র এবং কেহ ব্যবসায়ী।

রাজপুরুষের প্রভাব প্রায় সর্বশ্রেণীর উপর। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে অনেক হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ইঁহারা অর্থবল ও ক্ষমতাবলে সাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইয়া থাকেন। এই সম্মানের মূলে হয়তো সম্মানকারীর কিছু ভয়ের ভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে; কিন্তু সে যাহাই হোক, অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেও দেশের ও সমাজের অনেক কাজ হয়। স্কুল, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, সমাজ-হিতকর কার্যে সহানুভূতি ও উৎসাহদান—এই সমস্ত কাজ প্রাণের সহিত করিতে পারিলে গভর্নমেন্টের প্রতি লোকের আস্থা ও কৃতজ্ঞতা অধিক হয়। রাজপুরুষগণ যদি নিজেদিগকে জনসাধারণের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র জীব বলিয়া মনে না করিয়া বরং সকলের সুখ-দুঃখের অংশভাগী বলিয়া মনে করেন, তবেই প্রকৃত কার্য হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, জনসাধারণের সুখ-দুঃখে রাজপুরুষের কি আসিয়া যায়? কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার উপর তাহাদের রাজস্বপ্রদানের ক্ষমতা নির্ভর করে, ইহার উপর রাজপুরুষদের বেতনও নির্ভর করে; তাহা ছাড়া দুর্বলের সুখ-দুঃখের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পদদলিত ও শোষণ করিয়া কিছু দিন চালানো যাইতে পারে, কিন্তু চিরকাল চলে না—তাহাতে ক্রমশ এরূপ অশান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহার সমাধান করা পরে মুশকিল হইয়া দাঁড়ায়।

কাউন্সিলের মেম্বরদের উপর আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রনীতি কিয়ৎ-পরিমাণে নির্ভর করে। দেশের সাধারণ লোকে এ সমস্তের অধিক খবর রাখে না। কিন্তু সাধারণের অলক্ষিতে হইলেও অতি নিশ্চিতরূপে দেশের ধনাগম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ইহার ক্রিয়া হয়। ইহাদের প্রতিনিধি হইয়া মেম্বরগণ কাউন্সিলে প্রবেশ করেন, তাহাদের প্রকৃত মতামত জ্ঞাপন করা বা সর্বদা তাহাদের সুবিধার দিকে লক্ষ রাখিয়া কাজ করা উচিত। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এ যাবৎ অধিকাংশ নির্বাচিত মেম্বরই ক্ষুদ্র গণ্ডি-স্বার্থ ও আত্মস্বার্থের দিকে লক্ষ রাখিয়াই কাজ করিতেছেন। আর একটি কথা মনে হয়—সচরাচর দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলেরা কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে আগ্রহ দেখান না; বরং মধ্যম রকম জ্ঞান-বুদ্ধিবিশিষ্ট ধনী, জমিদার

বা উকোলতি আইনজীবীরাই আপন আপন প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিলের পদপ্রার্থী হন। দেশের লোকের জ্ঞান ও চরিত্রবল বৃদ্ধি না হইলে যোগ্যতর লোকের পক্ষে ভোটে জিতিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করা, এবং দেশের আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র-বাণিজ্যনীতি পরিচালনে অংশগ্রহণ করা সুকঠিন হইবে বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর দেশের জ্ঞানচর্চা নির্ভর করে। পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় প্রাণ-জগৎ ও বস্তু-জগতের কতক কতক সমস্যা অবশ্যই মনে উদিত হয়। কিন্তু তাহার বাহিরেও যাহাতে অত্যন্ত নিকটের জিনিস অর্থাৎ আপন পরিবেষ্টনের প্রতি মুক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবার এবং যুগোপযোগী সমস্যা সমাধানের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা জন্মে, ছাত্রদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। এজন্য কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া মতামত প্রকাশ করিবার এবং অন্যের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ থাকা আবশ্যক। সকল সমাজই স্বভাবতঃই পরিবর্তন-বিরোধী। এজন্য মতামত আলোচনা করিবার সময় বাধা-বিপত্তি আসিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া অসহিষ্ণু হইলে, বা অধিকাংশকে এড়াইয়া স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিলে যে খুব বেশী লাভ হইবে এরূপ মনে হয় না। নূতন বা উন্নত আদর্শ প্রচার করা বহু লোকের প্রচুর পরিশ্রমসাপেক্ষ। সমাজকে বুঝিতে দিতে হইবে যে সংস্কারক সমাজের শত্রু নহে, বরং হিতৈষী বন্ধু; আরও বুঝিতে দিতে হইবে যে গণহৃদয়ের অন্তঃস্থলের কোনো গভীর চিরন্তন সত্য আদর্শের বিরোধী কোনো কথাই বলা হইতেছে না। যে-আদর্শের মূল সুদূর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত, সেইরূপ কোনো আদর্শকেই যুগোপযোগী ভাষায় বর্ণনা করিয়া লইতে বলা হইতেছে; তাই উহা নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সাধারণ লোকে আদর্শকে যতটা ভয় করে ততটা ভয় বোধ হয় অত্যাচারকেও করে না। তাহার কারণ, অত্যাচারের কুফল শীঘ্র চোখে পড়ে; কিন্তু বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, যে-সব আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া লোকে নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতেছে, হঠাৎ সেখানে নাড়া খাইলে তাহার ফলাফল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, লোকে সহজে ধারণা করিতে পারে না বলিয়া অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হয়। তাই প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং সহানুভূতিসম্পন্ন-ভাবে দরদী বন্ধুর মত সাধারণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে। অত্যন্ত মহৎ হইয়া অবুঝের অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া দীনভাবে আদর্শের সেবা করিতে হইবে। যত বড় বড় মহাপুরুষ পৃথিবীর নূতন আদর্শের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই নির্বিঘ্নে উহা করিতে পারেন নাই। কেহ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছেন, কেহ লোষ্ট্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, কেহ স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, কেহ কারাবরণ করিয়াছেন, কেহ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইরূপে কতভাবে যে তাঁহারা নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান যুগেও এই নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থানে আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের কথা উল্লেখ করিয়া রাখি। ইঁহারা ধর্ম-ভাষায় শিক্ষিত মোল্লা-মৌলভী ও প্রচারক সম্প্রদায়। ধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে এখনও জনসাধারণের চিত্তে ইংরেজী-শিক্ষিতদের অপেক্ষা ইঁহাদের প্রভাব অধিক। যাঁহাদের প্রভাব অধিক তাঁহাদের অবশ্য দায়িত্বও অধিক। তাঁহারা আল্লাহ্‌র রসুল বা প্রেরিত পুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ লোকের শিক্ষক। জীবনের উদ্দেশ্য কি, জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় কি, অপরের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক, ধর্মবিধির তাৎপর্য কি এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা লোকের প্রশ্ন ও সংশয়ের মীমাংসা করিবেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিতে যে মুক্তবুদ্ধি এবং

পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বর্তমান জগতের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক, তাহা অনেকেরই নাই। যে সব ব্যাপার হযরতের সময় ঘটে নাই তাহা লইয়া কারবার করিতে হইলে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আবশ্যক, উক্ত সত্য ও আদর্শ হইতে নূতন তথ্য বাহির করিয়া বর্তমান সমস্যায় তাহার প্রয়োগ করিতে হইলে যে মৌলিকতার আবশ্যক, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিকতার খুবই অভাব দেখা যাইতেছে। পুরাতন মাদ্রাসা পদ্ধতির শিক্ষা অপেক্ষা বর্তমান ইংরেজী-পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ অধিক হয়। এজন্য কালের ভাবধারার গতি উপলব্ধি করিয়া যাহাতে কোরান-হাদিসের মর্মকথা সমস্ত বর্তমানের প্রত্যেক সমস্যায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে চিন্তা করা শিক্ষিত যুবক ও মৌলবী সাহেবদের উচিত। এজন্য যদি ইংরেজি পদ্ধতিতে শিক্ষিত যোগ্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহাও অকুণ্ঠিতভাবে করিতে হইবে।

বর্তমান মুসলমান সমাজ অধঃপতনের চরম সীমা অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র উন্নতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ করিতেছে। এই যুগ-সন্ধির সময় উন্নতমনা, চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্থিরলক্ষ্য লোকের আবির্ভাব হওয়া চাই। নতুবা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রতিবেশী হিন্দুসমাজে যখন প্রথম শিক্ষার আলো প্রবেশ করিয়াছিল, তখন উক্ত সমাজ আপন মূলধন খতাইয়া জগতের সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করিয়া লইতে ব্যগ্র হইয়াছিল। সেই উৎসাহের স্রোতে ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক প্রথার সম্বন্ধে প্রশ্নমূলক বিবিধ আন্দোলন উপস্থিত হইয়া সমাজের বুদ্ধিকে অনেকটা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। আজ পর্যন্ত সেই আন্দোলনই বোধ হয় বর্তমান হিন্দুসমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুতর আন্দোলন হইয়া রহিয়াছে। বর্তমানে মুসলমান সমাজে প্রায় সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে শুভ সম্ভাবনাই সূচিত হইতেছে। এসময় তরুণ সম্প্রদায়ই সমাজের আশা-ভরসার স্থল। ইহাদিগকে পর্বতের মত ধৈর্যশীল, সহনশীল ও উচ্চভাবাপন্ন হইতে হইবে।

এক প্রকার মত আছে, "সকলেই আপন আপন অবস্থাকে যথাসম্ভব উন্নত করিলে আর পৃথক করিয়া সমাজের ভাবনা ভাবিতে হইবে না—আপনা হইতেই সমাজের উন্নতি হইবে।" এ কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু কার্যতঃ ও আদর্শগতভাবে ইহা অতিশয় ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, সমাজে ১০/১২ হাজার স্বার্থপর ধনীলোকের সৃষ্টি হইলেই যে সমাজের উন্নতি হইবে, ইহা কোনো কথাই নয়। নিজের স্বার্থ দেখিতে হইবে বৈকি, কিন্তু তাহা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন তাহাতে সমগ্র সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়। নানা বৈষম্য ও বিরোধের ভিতরেও সমাজের গতির মধ্যে কিছু একাভিমুখিত্ব থাকা চাই; নতুবা এলোমেলো স্বার্থের সংঘাতে সমাজের অগ্রগমন আর হইয়া উঠিবে না। অতএব বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আত্ম-স্বার্থত্যাগের শিক্ষা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সেবাবৃত্তিই মহানুভবতা ও আদর্শ চরিত্রের নিদান।

আজকাল সমাজের আর্থিক ও মানসিক দৈন্য এত অধিক যে, এক এক করিয়া উহার নামোল্লেখ করাই অসম্ভব। অন্ততঃপক্ষে যে সমস্ত জিনিস না থাকিলে জীবন-ধারণ করা যায় না, সমাজের অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ কৃষক সমাজের তাহারাই অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিকার করিতে হইলে, কৃষকদের ক্ষমতা কোথায়, এবং তাহাদের অধিকারের কতটুকু তাহারা পাইয়াছে এবং তাহাদের প্রকৃত অভাবই বা কি, এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান

করা কর্তব্য; তাহার ফলে আত্ম-চেতনা জাগিলে হয়তো উহারা অধিকতর দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে পারিবে। এজন্য প্রচার দ্বারা যথেষ্ট জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ প্রচারকার্যে শিক্ষক ও ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চাকুরীজীবী, ব্যবসাজীবী সকলেই সাহায্য করিতে পারেন।

জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যতদিন না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত পুস্তকের শিক্ষা ছাড়াও নানা বিষয়ে যে সমস্ত মূলসূত্র সামান্য বুদ্ধিমান লোকে বুঝিতে পারে, সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়াই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীতে পাটের চাহিদা কি পরিমাণ, চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অধিক হইলে মূল্য কিরূপ হইবে, চাহিদামাফিক পাট উৎপাদন করিতে হইলে প্রতি ১০ বিঘা জমির কত বিঘা জমিতে পাটের চাষ করা উচিত এবং তাহা হইলে পাটের দর মণ প্রতি কত হইতে পারে, কী কী কারণে চাষীরা উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে, মহাজনের দাদন প্রণালীর কর্জ টাকার সুদ যোগাইতে যোগাইতে চাষীরা কিরূপে সর্বস্বান্ত হইতেছে এবং এই সংকটময় অবস্থা হইতে কো-অপারেটিভ প্রণালী বা অন্য কোন উপায়ে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে কিনা, অনর্থক বাজে খরচ বা মামলা-মকদ্দমা করিয়া ঘরের পয়সা পরের হাতে দিয়া পরের নিকট করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ কিনা, এই সমস্ত বিষয়, এবং এইরূপ আরও অনেক বিষয় বোধ হয় যে কোনো শিক্ষিত সমাজ সেবক আন্তরিকতা সহকারে পুনঃপুনঃ প্রচার করিলে দেশের বর্ণমালা জ্ঞানশূন্য সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে; অন্ততঃপক্ষে তাহাদের কয়েকজন মাতব্বরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেই তাহারা আপন আপন মহলে আর সকলকে এ সব কথার সারবত্তা বুঝাইয়া দিতে পারে। মোটের উপর, উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কোনো ভুঁইফোড় সমাজই সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। উন্নতি করিতে হইলে সবাইকে যথাসম্ভব টানিয়া তুলিয়া সকলে মিলিয়া উপরে উঠিতে হইবে। ময়ূর সাজিলে কাকের কাকত্ব দূরীভূত হইবে না, এই কথাটা আমরা বারবার ভুলিয়া যাই; অতএব শিক্ষিত লোকদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

শিক্ষিত সমাজে একদল লোক দেখা যায়, যাহারা অশিক্ষিত বিশ্বাসপরায়ণ লোককে আপন-আপন স্বার্থসিদ্ধির কামধেনুরূপে ব্যবহার করেন, অথচ অশিক্ষিত দরিদ্রেরা যখন তাহাদের প্ররোচনায় বিপদের মুখে পড়িয়া হা-হুতাশ করিতে থাকে, তখন শিক্ষিত উপদেশকদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। আগের আমলে জমিদারের পক্ষ হইয়া লাঠিয়ালেরা লাঠি ঘুরাইয়া সম্পত্তি রক্ষা করিত, কিন্তু জমিদারও যথাসম্ভব ঐ সমস্ত লাঠিয়াল প্রজার মা-বাপ ছিলেন। কিন্তু এখন যে-সব বুদ্ধিমান নেতার উপদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, তাঁহারা কার্যকালে অবসর বুঝিয়া সরিয়া পড়েন; মারা যাওয়ার বেলায় রামা-শ্যামা করিম-রহিমের দলই মারা যায়। এই সমস্ত ব্যাপার যাহাতে না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য তরুণসমাজ ও অন্যান্য সেবকসংঘে প্রচার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির আদর্শ লোকের সম্মুখে ধরিতে পারেন। মানুষের হৃদয়ের গোপন কোণে অতি যত্নে লালিত কোন ভাবকে মদ দিয়ে উস্কাইয়া দিয়া একটাকাণ্ড ঘটানো সহজ; কিন্তু ঐ সমস্ত ভাবকেই যুগের শ্রেষ্ঠ ধারণা ও কল্পনা দ্বারা মহিমান্বিত করিয়া মহা-মানবতার দিকে লোকের মনকে প্রধাবিত করা ততটা সহজ নহে। কিন্তু ইহাই তরুণের সাধনা; ইহা না করিলে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে হতভাগ্য সমাজের উদ্ধার নাই। এর জন্য উৎসাহী আদর্শাশ্রয়ী কর্মী-পুরুষ চাই।

দরিদ্রেরাই সমাজের অধিকাংশ। এ জন্য ইহাদের কল্যাণেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ। ইহাদের মধ্যে অর্থাগম, সচ্চিন্তার উদয় ও শিক্ষার প্রসার হইলে প্রকৃত আশার কথা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, নীতিহীন শিক্ষায় লোককে স্বার্থপর ও আত্মাবমাননায় করিতেছে। যাঁহারা অধিক সংখ্যক নিরক্ষর লোক খাটাইয়া কারবার করেন, তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই, অশিক্ষিত গরীব লোকেরাই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ; তাহাদের উপর নির্ভর করা যায়; কিন্তু শিক্ষিত বাবু বা মিয়াসাহেবদের উপর কোনো কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই; তাহারা নানারূপ ফন্দি খাটাইয়া ফাঁকি দিবে ও চুরি করিবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে এই সকল শিক্ষিত লোক একেবারে অনুপযুক্ত। বিশ্বাসের উপরেই কারবার চলে; সততা ও বিশ্বাস হারাইলে বাঙালীর আর্থিক উৎকর্ষ সুদূরপরাহত। এজন্য শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের কর্তব্য হইতেছে দৃঢ়চরিত্র হওয়া; দৃঢ়চরিত্র হইলেই লোকের বিশ্বাস অর্জন করা সহজ হইবে। তখন সমবায় প্রণালীতে কারবার করিয়া বিশ্বের প্রতিযোগিতায় নিজের একটু স্থান করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। সৎ আদর্শ যদি ছাত্রাবস্থায়ই বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের চিত্তে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাঙালীর ব্যাঙ্কে, কাপড়ের কল, চিনির কল, ইনসিওর অফিস, চায়ের বাগান এবং লাভের সম্ভাবনাপূর্ণ নানাপ্রকার কর্ম-কল্পনা (speculative schemes) এখনকার চেয়ে কম ফেল পড়িবে। ফলে বাঙালীও অধিক সংখ্যক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া গৌরবের আসনের অধিকারী হইবে। এই সূলে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে শিক্ষিত লোকে শুধু চাকুরীর প্রত্যাশায় থাকিলে চলিবে না, চাকুরীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ। প্রকৃত উন্নতি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষেই হইবে। হিন্দু-সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানেরা এ বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। একবার শিক্ষা-বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইয়া তাহারা প্রায় ৫০/৬০ বৎসর পিছনে পড়িয়া গিয়াছে, আবার যাহাতে শিল্প-বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে অধিক পিছাইয়া না পড়ে, এখন হইতে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতি হইলে তবেই বাঙলা প্রদেশের উন্নতি হইতে পারিবে। অতএব যাহাতে সামাজিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া মূল সূত্র ধরিয়া বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে মিলন সম্ভবপর হয়, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের কর্তব্য। এই কার্য সুসাধ্য করিতে হইলে উভয় জাতিরই কর্তব্য, শুধু স্বধর্ম নয় প্রতিবেশীর ধর্মেরও মূল কথা কী এবং যে সমস্ত বিষয় লইয়া আমরা বিরোধ করিয়া মরি, তাহা প্রকৃতই ধর্ম ও সমাজবন্ধনের অচ্ছেদ্য অংশ কিনা এ সব বিষয় ভালরূপ জানিবার চেষ্টা করা। এই চেষ্টা করিতে হইলে সংস্কারমুক্তভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা ও চিন্তার ফলাফল প্রকাশ করিবার সাহস থাকা চাই। এক কথায়, যাহারা শিক্ষিত লোক—নেতৃত্বে যাহাদের ন্যায়তঃ অধিকার—তাহাদের দৃঢ়-চরিত্র হওয়া আবশ্যক। সচ্চরিত্র শিক্ষিত লোকের সদ্ভাবনা ও সৎক্রিয়ার ফলেই সমাজ উন্নতি লাভ করিবে। নিরাশ হইলে চলিবে না—আমাদের বিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষার গোড়া পত্তন করিতে হইবে। মুসলমান ও হিন্দুর জন্য পৃথক পৃথক স্কুল করিলে চলিবে না। ধর্মশিক্ষা (অর্থাৎ ধর্মের অনুষ্ঠান অংশ বাদ দিয়া উহার ইতিহাস ও আদর্শগত অংশে) স্কুল হইতে বর্জন করিলে চলিবে না, বরং হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক ছাত্র হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কালচার সম্বন্ধে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, স্কুলের শিক্ষাতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষানীতিজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান সকলেরই এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া পাঠ্য নির্দেশ করা উচিত। পাঠ্য নির্দিষ্ট হইলে পঠনীয় পুস্তকের অভাব শীঘ্রই দূরীভূত

হইবে। পুরাতন রত্নরাজি উদঘাটিত করিয়া নূতনভাবে মাতৃভাষার সাহায্যে তাহা বর্তমানের উপযোগী করিয়া জনসমাজকে উপহার দেওয়া বর্তমান শিক্ষিত মুসলমানের একটি অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কার্যে অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের চেষ্টা না করিয়া যথাযথভাবে স্বধর্ম ও স্বসমাজের শ্রেষ্ঠাংশটুকু লোকের সম্মুখে ধরাই প্রকৃত কাজ।

চারিদিকে অভাব যখন প্রচণ্ড, তখনও নিত্য-অভাবের অতিরিক্ত কিছু প্রাণে চায়। সেটুকু না হইলে মানুষের জীবন অতিশয় দুঃসহ হইয়া পড়ে। যে দীন-ভিখারী, তাহারও একটু অবসর চাই এবং সংসারের দুঃখ-জ্বালার কথা ক্ষণেকের জন্যও চাপা পড়িতে পারে, এমন কোনো চিন্তা চাই। যাঁহারা দার্শনিক তাঁহাদের পক্ষে হয়তো সংসারকে উপেক্ষা করিয়া আপন ধ্যানে আপনি মগ্ন থাকা কিছুই ক্লেশকর নহে। কিন্তু মানসিক বৃত্তি ও ভাব-প্রবণতা সকলের একরূপ নহে; এজন্য কিছু স্থূলতর আনন্দেরও প্রয়োজন। কৃষকের জীবনে এই আনন্দ হাডু-ডু-ডু খেলা, পর্ব বুঝিয়া পাঁতা করিয়া মাছ ধরিতে যাওয়া, ধর্মগ্রন্থ ও পুঁথি পাঠ করা, মৌসুম পরিক এবং সাময়িক যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতিতে যোগদান করা, বৈঠকী, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি গান করা বা উৎসবাদি উপলক্ষে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এইগুলি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে, উহাদের তৃষিত আত্মাকে একেবারে শুকাইয়া মারা হয়। যাত্রা-থিয়েটার, লণ্ঠন-লেকচার, বায়স্কোপ প্রভৃতির সাহায্যে যথেষ্ট শিক্ষাদান করিতে পারা যায়। আমাদের অশিক্ষিত কৃষক-সমাজ, এমন কি শিক্ষিত সমাজেরও অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম-ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবকাহিনী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। মনে হয়, ওলী-পয়গম্বর এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পুরুষদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়া যাত্রা-থিয়েটার ও বায়স্কোপের সাহায্যে জ্ঞান প্রচার করা যাইতে পারে। এ বিষয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বিশেষ করিয়া অবহিত হওয়ার সময় আসিয়াছে।

শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত ধনী ও পদস্থ মুসলমান সমাজেও সুরুচিসম্মত আমোদ-প্রমোদ এবং আলাপ-আলোচনার শোচনীয় অভাব প্রায়ই লক্ষ করা যায়; যাহাকে আমরা কালচার বলি, মধ্যম-রকম হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা ঐ শ্রেণীর মুসলমান-সমাজে তাহার নিম্নতর আদর্শ দেখিতে পাই। ইহার কারণ হয়তো এই যে মুসলমান জনসাধারণ অনেকদিন হইতে প্রাচীন কালচার প্রায় খোওয়াইয়া বসিয়াছে, এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহার সহিত নূতন অবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেছে না; তাহা ছাড়া, মাত্র অল্পদিন হইতে শিক্ষালাভ শুরু করিয়াছে বলিয়া বাল্যকালে গৃহে একটা সভ্যতার আবহাওয়ায় বর্ধিত হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সে যাহাই হউক, চিত্তের এই চাহিদা ভুলিলে চলিবে না। প্রায়ই মুসলমান-সমাজে (অবশ্য, হিন্দু-সমাজেরও কোথাও কোথাও) বড় বড় উকিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, প্রফেসার, জমিদার প্রভৃতির সাহচর্যে আসিলেও সচরাচর অতি অকিঞ্চিৎকর পরনিন্দা এবং সাধারণ গল্পগুজবের অধিক আর কোনো আলোচনাই শোনা যায় না। সাহিত্য, কলা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল; সাধারণভাবে দেশের মঙ্গল-চিন্তামূলক আলোচনাও কমই শুনিতে পাওয়া যায়, আর যাহাও শুনা যায় তাহাও অধিকাংশ স্থলে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক—সমগ্রভাবে বৃহত্তর সমস্যার সমাধান-চিন্তা খুব কম লোকেই করিয়া থাকেন। অবশ্য হিন্দুসমাজও যে এ বিষয়ে মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক সংস্কারমুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাহা নয়। কিন্তু এরূপ অবস্থা দেশের পক্ষে অত্যন্ত

দুঃখজনক। অশিক্ষিতের মানসিক দৈন্য স্বাভাবিক, কিন্তু শিক্ষিত সমাজেও যদি তাহা দেখা যায় তবে বড়ই আক্ষেপের কথা। হয়তো মুসলমান-সমাজ এখন আপন পুত্র-পরিজনের তাল সামলাইতেই এত অধিক বিব্রত যে উচ্চ চাকুরী বা ব্যবসায়ে একটু পসার প্রতিপত্তি হইলেও পারিপার্শ্বিকের টানে পড়িয়া তাহার চিন্তা অথৈ পানিতে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। হয়তো একপুরুষ পরেই শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার আর একটু স্থৈর্য হইবে। তথাপি বর্তমানে আমাদের সাহিত্য, আর্ট, সঙ্গীত, সুরুচিপূর্ণ আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে অভাববোধকে মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিয়া তাহার সমাধানচেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ, যাহারা কয়েক বৎসর পরে দেশের নেতৃস্থানীয় হইবে, এখন হইতেই তাহাদের মধ্যে জ্ঞানচর্চা, বিদ্যাবত্তা ও রুচিসৌষ্ঠবের অনুশীলন করা আবশ্যক। বর্তমান ছাত্রসমাজ সেবাকর্মী, কর্তব্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান, সহিষ্ণু এবং সুষ্ঠুজীবন যাপনে অনুরাগী হইলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশার কোনো কারণ থাকিবে না।

# সাম্প্রদায়িক বিরোধ

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বর্তমানে বড় গুরুতরভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ-ত্রিশ বৎসর আগেও শুনেছি, রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতামঞ্চে উঠে বলেছেন, "আমরা হিন্দু-মুসলমান পরস্পর ভাই-ভাই—একই মায়ের দুটি সন্তান, একই রথের দুটি চক্র, একই দেহের দুটি বাহু ইত্যাদি।" কিন্তু আজকাল তাঁদের বক্তৃতার ধারা যেন অন্য পথে চলেছে। এখন প্রায়ই শুনা যায়, "আমাদের কৃষ্টি ও দৃষ্টি পৃথক, মিলন প্রচেষ্টা বিফল, একে অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকেই বা বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বদেশের উন্নতির সাধন সম্ভব, এমনকি শাসন ব্যাপারে পরস্পরের প্রভাবাধীন অঞ্চল বিভাগ করে নেওয়াই একমাত্র পন্থা।"

এই সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য মনোভাবের এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবার মত। সহজেই চোখে পড়ে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যে স্বদেশী আন্দোলন হয় তাতে হিন্দু যোগ দিয়েছিল, মুসলমান যোগ দেয়নি বললেও চলে। প্রতিবেশী হিন্দুর আহ্বান মুসলমান কর্তৃক কেন উপেক্ষিত হল—এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার ভাবার্থ এই যে অবজ্ঞাত দুর্বলপক্ষ প্রবলপক্ষের গরজের ডাকে প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধি ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় হিন্দু দীন-দরিদ্র মুসলমানদিগকে এবং ঐ অবস্থার হিন্দুকেও কোনোদিন হয়ত প্রীতির চোখে দেখে নাই। তাই অকস্মাৎ উন্নতদের ডাকে অনুন্নতেরা প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারে না। তাদের মনে ছিল কতকটা সন্দেহ, কতকটা অস্পষ্ট উপলব্ধি-জনিত দ্বিধা। হুজুগের জোরে কাজ কিছুটা অগ্রসর হ'তে পারে কিন্তু অধিক দূর নয়। এজন্য প্রথম স্বদেশী আন্দোলন প্রধানতঃ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এবং তাদের দেখাদেখি হুজুগক্রমে হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যেও কিছু প্রসার লাভ করেছিল। মুসলমান যে উক্ত আন্দোলনে যোগ দেয়নি, তার থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ঐ সময়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ পুরোমাত্রায় না হোক, কিছু কিছু জাগ্রত হয়েছিল—অন্ততঃ তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশ খানিকটা স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মেছিল। ঐ সময়ে বর্তমান ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা কম হ'ত; কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে বিক্ষুব্ধ মনোভাবের অস্তিত্ব ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না। তখনও কোরবানী নিয়ে দুই-একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিবরণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে শোনা যেত, কিন্তু বাংলাদেশে তেমন ছিল না। প্রতাপশালী হিন্দু জমিদারের বাড়িতে মুসলমান প্রজা কোরবানী করতে সাহস করত না—এখনও অনেক স্থানে করে না—কিন্তু তাই বলে তারা যে নিজেদেরকে অধিকারচ্যুত মনে করত এরূপ প্রমাণিত হয় না। আজকাল একটা ধূয়া উঠেছে, বিচার-আচার, যুক্তি-তর্ক কিছু নয়, যার যার বর্তমান অধিকার বজায় রাখতে হবে—অর্থাৎ ন্যায়ভাবেই হোক আর অন্যায়ভাবেই হোক যে একটি সুযোগ পেয়ে বসেছে, সে কিছুতেই তা ছাড়বে না। আর যাকে একবার অসুবিধায় ফেলা গেছে, সে যেন চিরকাল ঐভাবেই নিষ্পেষিত হ'তে থাকে। এই প্রকার মনোবৃত্তির ফলে স্বাধীন জাতিদের

মধ্যে বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হ'তে পারে, আর পরাধীন নির্বীর্য জাতির মধ্যে স্বার্থগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধা কিছু আশ্চর্য নয়।

দেখা গেছে, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত পার্থক্য—তা সে আর্থিকই হোক, শিক্ষা-সংক্রান্তই হোক বা বিচারনৈতিকই হোক—বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। রাজা রামমোহনের আমলেও যে মুসলমান শিক্ষা-সম্পদ, রুচি-সভ্যতা এবং কর্মদক্ষতায় হিন্দুর চেয়ে নিকৃষ্ট ত নয়ই বরং উৎকৃষ্টই ছিল, অল্পকালের মধ্যেই সে হিন্দুর চেয়ে সর্বাংশে নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এর কারণ কতকটা ইংরেজ শাসনে জমিদারী বন্দোবস্ত, নিষ্কর বাজেয়াপ্ত এবং ঐ কালের মুসলমানদের ওহাবী-বিদ্রোহ, ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং গতানুগতিক প্রিয়তা। কিন্তু মুসলমানের সাথে শাসক-জাতির অসৌহার্দ্যই বোধহয় এই অবনতির প্রধান কারণ। এজন্য মুখ্যতঃ হিন্দুকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু তবু মুসলমানের নিষ্ফল আক্রোশ সুবিধাভোগী হিন্দুর উপরেই গিয়ে পড়ল। যে-কারণে অফিস-ফেরত বড়বাবু সাহেবের চোখ-রাঙানী কিংবা বিশিষ্ট সম্বোধন হজম করে স্বগৃহে আপন-পরিজনবর্গের উপর ঝাল ঝাড়তে প্রবৃত্ত নয়, এ যেন কতকটা সেই ধরনের। হিন্দুও যেন কোনো দিন মুসলমানের প্রতি স্নিগ্ধ গদগদভাব পোষণ করতে পেরেছে বা আজও করছে, তেমন নয়। প্রতিদিন শহরের কসাইখানায় কত গরু সামরিক ও বেসামরিক লোকের আহার্যে পরিণত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় না, কিন্তু কোরবানীর সময় গোরক্ষিণী বৃত্তির বিশেষ প্রকাশ হয়। পক্ষান্তরে গোরা-পল্টন ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মসজিদের পাশ দিয়ে মার্চ করে গেলে, কিংবা মহরমের সময় মুসলমান ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মসজিদের সামনে দিয়ে গেলে কারও নামাজের ব্যাঘাত হয় না, অথচ সংকীর্তন বা দোল-দশহরা প্রভৃতি হিন্দু-উৎসব উপলক্ষে কাঁসর-সানাই বাজলেই নামাজে মনোযোগ রক্ষা করা অসাধ্য হয়ে পড়ে। এর থেকেই বোঝা যায়, এসবের ভিতরে যতটা প্রপাগাণ্ডা বা জিদ আছে ততটা আন্তরিকতা নিশ্চয়ই নাই।

দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বা অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেখা যায় মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান চাকরিজীবী বা উকিল-মোক্তার বা স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের সংখ্যা-অনুপাতে দেখলে বলা যায়, প্রায় সমভাবেই যোগ দিয়েছিল। এতদিনে মুসলমানের ভিতর কিছু রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এই সময়ই সর্বপ্রথম বন্দেমাতরম ও আল্লাহো-আকবর একসঙ্গে ধ্বনিত হয়। মনে হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান যেন অনেকটা একীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অসহযোগের সঙ্গে খেলাফত আন্দোলনের সংযোগই বোধ হয় এদের সাময়িক ঐক্যের প্রধান কারণ হয়েছিল। এইজন্য খেলাফত আন্দোলনরূপ বেলুনের হাওয়া বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে অনেকটা সরে পড়েছে—কংগ্রেসের সঙ্গে আর ততটা মাখামাখি করছে না—বরং ঠাট বজায় রাখবার জন্য কংগ্রেসবিরোধী দলে ভিড়েছে বা ভিড়ছে। হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এই নবজাত বিরূপতায় প্রধান কারণ বোধ হয় অসহযোগ আন্দোলনের নিষ্ফলতা। বর্তমানে মুসলমান নেতাদের অধিকাংশেরই ধারণা জন্মেছে যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গোটা সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু মুসলমানের সমূহ ক্ষতি হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি প্রায় দশ বৎসর পিছিয়ে গিয়েছে। হয়ত এসবই ঐ গান্ধীর কারসাজী। মুসলমান নেতারা আরও দেখতে পেয়েছে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি দেশীয় প্রতিষ্ঠানে মুসলমানের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করা

## সংস্কার

বদ্ধমূল ধারণাকে সংস্কার বলা যাইতে পারে। সংস্কার কতকটা শিক্ষা এবং কতকটা পরিবেশ হইতে গৃহীত, আবার কতকটা উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

টোল কিংবা মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সহিত ইংরেজী-শিক্ষিতদিগের মনোভাবের তুলনা করিলে সচরাচর ইহাদের সংস্কারে পার্থক্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন টোলে শিক্ষালাভ করিয়া পণ্ডিতেরা বিভিন্নপন্থী হইতে পারেন, আবার বিশেষ বিশেষ মাদ্রাসায় অধ্যয়নের ফলে অনেক মোল্লা ও মৌলবী আহ্‌মদী, মোহাম্মদী, হানাফি প্রভৃতি মতে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া থাকেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষার ফলে অনেক ইংরাজী-নবিশের ধারণা জন্মে যে, ইংরাজের সভ্যতাই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অন্ততঃ এ দেশে যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা দেশীয় অন্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইলেও সভ্য শ্রেণীর বহির্ভূত। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শিক্ষাকেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে যে পরিবেশ গড়িয়া উঠে, উহা অলক্ষ্যে শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। শুধু শিক্ষাকেন্দ্র কেন, সময়গতিকে সমগ্র দেশে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে যে বহু সংখ্যক লোকের মনে কোন একটি বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। বন্দুকের টোটায় শূকরচর্বির মিশ্রণ কল্পনার ন্যায় হুজুগ এই শ্রেণীর সংস্কার; আবার কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেশে সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য ফিরিয়া আসিবে ইহাও একপ্রকার সংস্কার। পরিবেশের প্রভাবে এবং পুনঃ পুনঃ প্রচারের ফলে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে।

দৈবক্রমে কেহ হিন্দুর ঘরে, কেহ মুসলমানের ঘরে, কেহ বা খ্রীষ্টানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকের মনেই বাল্যকাল হইতেই আপন আপন ধর্ম ও আচারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিয়া যায়। এই সংস্কারের কতকটা বহু-শ্রবণজনিত বা অভ্যাসোৎপন্ন হইলেও প্রধানত মানুষের জন্মগত অহমিকাই ইহার মূলে রহিয়াছে।

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মনের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া সংস্কারে পরিণত হইবার পর উহার সহিত যুক্তির সম্বন্ধ সামান্যই থাকে। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, শ্রবণ বা আচরণের ফলে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, সংস্কারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে হয়; তখন তাহার ব্যতিক্রম অসম্ভব এবং অতিক্রম ক্লেশদায়ক বলিয়া মনে হয়। যাহা একবারে নিতান্ত নিঃসংকোচে বিশ্বাস করা গিয়াছে, যাহার সহিত বোঝাপড়া শেষ হইয়াছে মনে করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত আছি, হঠাৎ যদি সেই বিষয়ে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়, তবে আমাদের মানসিক শান্তি বিপর্যস্ত হয়। তাই আমরা আপন আপন সংস্কার ত্যাগ বা পরিশোধন করিতে ভয় পাই।

নূতন ভাব অনেক সময় পুরাতন সংস্কারকে পদ-দলিত করিয়া তাহার উপর বিজয়পতাকা উড়াইতে চাহে—এজন্য সাধারণ লোকের কাছে উহা ভয়াবহ বলিয়া মনে হয়। নূতন সত্য আবির্ভূত হইলে প্রথমে চিরকালই উহা প্রতিহত হইয়াছে, কিন্তু অবশেষে চিরকালই জয়যুক্ত

হইয়াছে। ইহাই সংসারে ভাব-বিবর্তনের ধারা। আজ যাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত এবং সকলের কাছে সমাদৃত, দু'দিন পরেই হয়ত তাহা অমূলক সংস্কার বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতামূলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ভবিষ্যতে আরও বহুবার এরূপ ঘটিবে। সূর্য পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরিতেছে, অতীতের এই সহজ সংস্কার ভেদ করিয়া নবীনতর সত্যের আলোক আনিতে সংস্কারককে বহু ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এক আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় প্রভু কেহ নাই— এই বাণী পর্যায়ক্রমে বহুবার সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ততোধিকবার সংস্কারের জালে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। যতবার সংস্কার ভেদ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ততবারই দুর্জয় বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

সংস্কার বলিতেই আমরা অনেক সময় কুসংস্কার বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কুসংস্কার কথাটি তুলনামূলক। আমাদের জ্ঞান যখন যে পর্যায়ে থাকে তাহার উপর আমাদের সংস্কার নির্ভর করে। যে সমস্ত সংস্কার প্রচলিত জ্ঞানরাশির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থির থাকিতে পারে, তাহা বর্তমান যুগে কুসংস্কাররূপে গণ্য হইতে পারে না। এই কারণে, কোনও সংস্কারকে কুসংস্কার বলিবার অধিকার সকলের জন্মায় না। শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান ও সূক্ষ্মতর অনুভূতি-বলে যদি কেহ কোন প্রচলিত সংস্কারকে অপকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যের সন্ধান দিতে পারেন, তবে তিনিই প্রকৃত সংস্কারক-পদবাচ্য। শুধু নিজে বুঝিলে ও অনুভব করিলে চলিবে না আরও দশজনকে বুঝাইয়া বা অনুভব করাইয়া দিতে হইবে ইহাই সংস্কারকের প্রধান সমস্যা। চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বিপরীত কথা শুনিলে স্বভাবতঃই লোকের অহমিকায় আঘাত লাগে। কাজে কাজেই প্রশ্ন উঠে, "এই ব্যক্তি কি আমাদের সকলের চেয়ে ও আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে, আমরা উহার কথা শুনিব?" আমরা সহজে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহি না বলিয়া আরও প্রবলভাবে সমুদয় সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই।

সংস্কারের মধ্যে কতকগুলি এরূপ যে, উহাদের সহিত আমাদের জীবনযাত্রার বা হিতাহিতের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রে চরকাবুড়ীই থাকুক, আর অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গই থাকুক, তাহাতে আমাদের জীবন-ব্যাপারের কতখানি আসিয়া যায়, সে বিষয় এখনও রহস্যাবৃত। তবে ইহা নিশ্চিত যে, অধিকাংশ সংস্কারের সহিত আমাদের জীবনাদর্শ ও আচরণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এজন্য সর্বযুগেই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সহিত সংস্কারকে সমসূত্রে গ্রথিত করাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় আমাদের পূর্ণবিকাশ হইতে অযথা বিলম্ব হয়।

এই সেদিন উন্নতির পরিপন্থী মনে করিয়া কামাল আতাতুর্ক অনেকগুলি বহুকালসঞ্চিত সংস্কার বর্জন করিতে স্বদেশবাসীকে বাধ্য করিয়াছেন। ইহার ফল শুভ হইয়াছে কি অশুভ হইয়াছে, জগৎ তাহা দেখিতেছে, ভবিষ্যতে ইহার আরও বিচার করিবে। বঙ্গদেশে ও নানা স্থানে সদ্যালোকান্তরিত কামালের স্তুতিগান হইয়াছে। কিন্তু এই স্তুতিবাদের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করা—ইহার কতটুকু আন্তরিক এবং কতটুকু বুদ্ধি-বিরহিত সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত তাহা নির্ণয় করা সমস্যার বিষয় বটে। যাহা হউক, যদি দেশে বাস্তবিকই এই ভাব আসিয়া থাকে যে, জীবনের প্রয়োজন অনুসারে আমাদের দৃঢ়তম সংস্কারকেও জলাঞ্জলি দেওয়া দূষণীয় নহে, এমন কি আবশ্যক হইলে আমরাও তাহা করিতে পারি, তবে ইহা আশার কথা বটে। সংস্কারকে বিচার করিবার মত বীরত্ব যে দেশে প্রকাশ পায়, সে দেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইতে বিলম্ব লাগে না। আমাদের দেশের এরূপ অবস্থা কল্পনা করিতেও মনে আনন্দ হয়।

হইয়াছে। ইহাই সংসারে ভাব-বিবর্তনের ধারা। আজ যাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত এবং সকলের কাছে সমাদৃত, দু'দিন পরেই হয়ত তাহা অমূলক সংস্কার বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতামূলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ভবিষ্যতে আরও বহুবার এরূপ ঘটিবে। সূর্য পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরিতেছে, অতীতের এই সহজ সংস্কার ভেদ করিয়া নবীনতর সত্যের আলোক আনিতে সংস্কারককে বহু ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এক আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় প্রভু কেহ নাই— এই বাণী পর্যায়ক্রমে বহুবার সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ততোধিকবার সংস্কারের জালে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। যতবার সংস্কার ভেদ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ততবারই দুর্জয় বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

সংস্কার বলিতেই আমরা অনেক সময় কুসংস্কার বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কুসংস্কার কথাটি তুলনামূলক। আমাদের জ্ঞান যখন যে পর্যায়ে থাকে তাহার উপর আমাদের সংস্কার নির্ভর করে। যে সমস্ত সংস্কার প্রচলিত জ্ঞানরাশির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থির থাকিতে পারে, তাহা বর্তমান যুগে কুসংস্কাররূপে গণ্য হইতে পারে না। এই কারণে, কোনও সংস্কারকে কুসংস্কার বলিবার অধিকার সকলের জন্মায় না। শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান ও সূক্ষ্মতর অনুভূতি-বলে যদি কেহ কোন প্রচলিত সংস্কারকে অপকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যের সন্ধান দিতে পারেন, তবে তিনিই প্রকৃত সংস্কারক-পদবাচ্য। শুধু নিজে বুঝিলে ও অনুভব করিলে চলিবে না আরও দশজনকে বুঝাইয়া বা অনুভব করাইয়া দিতে হইবে ইহাই সংস্কারকের প্রধান সমস্যা। চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বিপরীত কথা শুনিলে স্বভাবতঃই লোকের অহমিকায় আঘাত লাগে। কাজে কাজেই প্রশ্ন উঠে, "এই ব্যক্তি কি আমাদের সকলের চেয়ে ও আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে, আমরা উহার কথা শুনিব?" আমরা সহজে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহি না বলিয়া আরও প্রবলভাবে সমুদয় সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই।

সংস্কারের মধ্যে কতকগুলি এরূপ যে, উহাদের সহিত আমাদের জীবনযাত্রার বা হিতাহিতের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রে চরকাবুড়ীই থাকুক, আর অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গই থাকুক, তাহাতে আমাদের জীবন-ব্যাপারের কতখানি আসিয়া যায়, সে বিষয় এখনও রহস্যাবৃত। তবে ইহা নিশ্চিত যে, অধিকাংশ সংস্কারের সহিত আমাদের জীবনাদর্শ ও আচরণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এজন্য সর্বযুগেই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সহিত সংস্কারকে সমসূত্রে গ্রথিত করাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় আমাদের পূর্ণবিকাশ হইতে অযথা বিলম্ব হয়।

এই সেদিন উন্নতির পরিপন্থী মনে করিয়া কামাল আতাতুর্ক অনেকগুলি বহুকালসঞ্চিত সংস্কার বর্জন করিতে স্বদেশবাসীকে বাধ্য করিয়াছেন। ইহার ফল শুভ হইয়াছে কি অশুভ হইয়াছে, জগৎ তাহা দেখিতেছে, ভবিষ্যতে ইহার আরও বিচার করিবে। বঙ্গদেশে ও নানা স্থানে সদ্যালোকান্তরিত কামালের স্তুতিগান হইয়াছে। কিন্তু এই স্তুতিবাদের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করা—ইহার কতটুকু আন্তরিক এবং কতটুকু বুদ্ধি-বিরহিত সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত তাহা নির্ণয় করা সমস্যার বিষয় বটে। যাহা হউক, যদি দেশে বাস্তবিকই এই ভাব আসিয়া থাকে যে, জীবনের প্রয়োজন অনুসারে আমাদের দৃঢ়তম সংস্কারকেও জলাঞ্জলি দেওয়া দূষণীয় নহে, এমন কি আবশ্যক হইলে আমরাও তাহা করিতে পারি, তবে ইহা আশার কথা বটে। সংস্কারকে বিচার করিবার মত বীরত্ব যে দেশে প্রকাশ পায়, সে দেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইতে বিলম্ব লাগে না। আমাদের দেশের এরূপ অবস্থা কল্পনা করিতেও মনে আনন্দ হয়।

# মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

## দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণী

আজ আমাদের এই "সাহিত্য-সমাজের" বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইল। গত বৎসরের বার্ষিক সম্মেলনে ইহার জন্মবৃত্তান্ত ও উদ্দেশ্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জীবনের অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করিয়া জন-সাধারণের নিঃসাড় জীবনে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তবেই সমাজ বাঁচিবে; নতুবা তাহাদের প্রাণধারা রসহীন মরুভূমির ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এ বৎসর নানাকারণে আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য প্রথমে এ বৎসরকার পঠিত প্রবন্ধগুলিতে আমরা কি বলিতে চাহিয়াছি তাহাই বিবৃত করিতেছি।

প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলবী আবুল হুসেন এম-এ, বি-এল, সাহেব। বিষয় "আদেশের নিগ্রহ"। তিনি বলেন, ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাস, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই বিশ্বাস শুধু মুখে মুখে থাকিলে চলিবে না—অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত জিনিস। ধর্ম্ম-প্রচারকগণ যে অনুশাসন দেন, তাহার উদ্দেশ্য মানব-সমাজের উন্নতি। বস্তুতঃ মানব-জাতির হিতই ধর্ম্মের লক্ষ্য। ধর্ম্মের সহিত মানবপ্রকৃতির মূলতঃ কোন বিরোধ থাকিলে, সে ধর্ম্মকে লোকে চিরকাল শ্রদ্ধা করিতে পারে না। এজন্য যুগে যুগে পৃথিবীর নব নব প্রয়োজন বা সমস্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমানেরা ইসলামকে যেভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে, তাহাতে যথেষ্ট অন্ধ-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, দলে দলে লোক ভিক্ষা ও ঋণ করিয়া হজ্ব করিতে যায়—স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের দিকে লক্ষ্য করে না। লোকে ওজুর মসলা আওড়াইতে পঞ্চমুখ, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি নাই। লোকে জামায়াত করিয়া নামাজ পড়িতেছে, কিন্তু একতার দিকে লক্ষ্য নাই। এইরূপ, লোকে জুমার নামাজ পড়িতেছে, খোৎবা শুনিতেছে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইতেছে কারণ তাহারা ইহার অর্থও বোঝে না, উদ্দেশ্যও জানে না। এই জন্যই দেখা যায়, বহু মুসলমান, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে পালন করিতেছে, কিন্তু কই, তাহারা ত সুরুচি, কর্ম্ম বা জ্ঞান, কোনক্ষেত্রেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পরিতেছে না। পক্ষান্তরে তাহারা কেবল ভিক্ষুক ও ব্যভিচারীর দলই পুষ্ট করিতেছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে তাহাদের ঈশ্বরে বা পরলোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস নাই। কিন্তু এখন অন্ধের মত বা নির্ব্বোধের মত শাস্ত্র আওড়াইলে বা শুধু অনুষ্ঠান পালন করিলে আর মুসলমানের মুক্তি নাই। মুসলমানকে

বুঝিতে হইবে যে, কোরান-হাদিস তাকে তুলিয়া রাখিবার জন্য নয়—জীবনে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত। আজ সমগ্র জগতে মুসলমানের একই নিরবচ্ছিন্ন কদর্য্য ছবি। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? মুসলমানকে বুঝিতে হইবে যে ইসলামের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য,—কেবল বিধিনিষেধগুলির পূজা করিবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব-সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে, পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর পরিত্রাণ নাই। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন, সুদের ফৎওয়া এই সমস্ত বর্ত্তমান জগতের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেগুলির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার আবশ্যক। মহাপুরুষগণকে শ্রেণীবদ্ধ আলোক-স্তম্ভের সহিত তুলনা করা যায়। একটি আলো ম্লান হইয়া থাকিলে, সেই শিখাতে অন্য আলো জ্বালান উচিত, এবং তাহাকে পূর্ব্বতন আলোকেরই পরিণতি বা বিবর্ত্তন বলা চলে। মূলনীতি ঠিক রাখিয়া শাস্ত্র-বিধির প্রয়োজন মত একটু-আধটু সংস্কার করিয়া লইলে, তাহাও হজরত মহম্মদের ধর্ম্মই থাকিবে। সুতরাং পরিবর্ত্তনের নাম মাত্রেই আঁৎকাইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত যে ধর্ম্ম, যাহা খোদার অভিপ্রেত—তাহা পালন করিলে আমাদের পার্থিব জীবনেই তজ্জনিত সুফল ও শান্তি ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে—পরকালের জন্য আর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, কাজী মোতাহার হোসেন এম-এ, সাহেব—বিষয় "আনন্দ ও মুসলমান গৃহ"। লেখক বলেন, আনন্দ ও হাসি জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ। হৃদয়ের প্রাচুর্য্য হইতেই তাহার জন্ম ও তাহা হইতেই পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টির উদ্ভব হয়। যে সমাজ প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারে, তাহার মধ্যে সঙ্কোচ দ্বিধা ও ভীরুতার বন্ধন নাই। সে সমাজ বলবান, স্বাধীন ও প্রাণময়, এজন্য তাহাই প্রতিভার জন্মদাতা। কিন্তু মুসলমান সমাজ নির্জ্জীব ও আনন্দহীন। উন্নত চিন্তা ও আনন্দের তৃপ্তিতে চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়, তাহাও ইহাদের নাই। ইহার প্রধানতম কারণ—শিক্ষার অভাব, শিক্ষা না হইলে সুরুচি জন্মে না, এবং সুরুচির অভাবে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলি বিকশিত ও চরিতার্থ হইতে পারে না। উন্নত রুচির আনন্দের যেখানে অভাব, সেখানে সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল আনন্দই চরম লক্ষ্য হয়। এজন্য দেখা যায়, কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাশবিক আনন্দ লইয়াই প্রায় পৌনে ষোল আনা মুসলমান মশগুল হইয়া আছে। অধিকাংশ মুসলমান-পরিবারেই বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর শিক্ষার অত্যন্ত অসমতা থাকায়, তাহাদের ভাব ও চিন্তাধারায়ও দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য। প্রধানতঃ এই কারণে এবং কতকটা পর্দ্দা প্রথার শুচি-বায়ুর জন্য গৃহ বলিতে যাহা বুঝায়, মুসলমানের তাহা নাই। এখানে ভাই-বোন, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-কন্যা সকলে মিলিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বা জীবনসমস্যার আলোচনায় এক হইতে পারিতেছে না। এজন্য ইহাদের জীবন মেরুদণ্ডবিহীন, ছায়াবাজীর ন্যায় নড়াচড়া করিতেছে বটে, কিন্তু আসলে তাহা প্রাণহীন। তাহার উপর মুসলমান সমাজ মনোরঞ্জনকর ললিতকলার চর্চ্চাকে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখে না বলিয়া, তাহাদের মধ্যে আনন্দের উপকরণেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকিবে না, পিতার সামনে হাসিবে না, বড় ভাই-এর সামনে খেলিবে না, গুরুজনের অন্যায় কথারও প্রতিবাদ করিবে না, এমনকি কচি মেয়েরা পর্য্যন্ত মার খাইলেও চেচাইয়া কাঁদিবে না, এইরূপ হাজার হাজার আদব-কায়দা ও আইন-কানুনের চাপে মুসলমানের আনন্দধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বুঝিতে হইবে যে, কোরান-হাদিস তাকে তুলিয়া রাখিবার জন্য নয়—জীবনে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত। আজ সমগ্র জগতে মুসলমানের একই নিরবচ্ছিন্ন কদর্য্য ছবি। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? মুসলমানকে বুঝিতে হইবে যে ইসলামের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য,—কেবল বিধিনিষেধগুলির পূজা করিবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব-সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে, পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর পরিত্রাণ নাই। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন, সুদের ফৎওয়া এই সমস্ত বর্ত্তমান জগতের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেগুলির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার আবশ্যক। মহাপুরুষগণকে শ্রেণীবদ্ধ আলোক-স্তম্ভের সহিত তুলনা করা যায়। একটি আলো ম্লান হইয়া থাকিলে, সেই শিখাতে অন্য আলো জ্বালান উচিত, এবং তাহাকে পূর্ব্বতন আলোকেরই পরিণতি বা বিবর্ত্তন বলা চলে। মূলনীতি ঠিক রাখিয়া শাস্ত্র-বিধির প্রয়োজন মত একটু-আধটু সংস্কার করিয়া লইলে, তাহাও হজরত মহম্মদের ধর্ম্মই থাকিবে। সুতরাং পরিবর্ত্তনের নাম মাত্রেই আঁৎকাইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত যে ধর্ম্ম, যাহা খোদার অভিপ্রেত—তাহা পালন করিলে আমাদের পার্থিব জীবনেই তজ্জনিত সুফল ও শান্তি ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে—পরকালের জন্য আর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, কাজী মোতাহার হোসেন এম-এ, সাহেব—বিষয় "আনন্দ ও মুসলমান গৃহ"। লেখক বলেন, আনন্দ ও হাসি জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ। হৃদয়ের প্রাচুর্য্য হইতেই তাহার জন্ম ও তাহা হইতেই পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টির উদ্ভব হয়। যে সমাজ প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারে, তাহার মধ্যে সঙ্কোচ দ্বিধা ও ভীরুতার বন্ধন নাই। সে সমাজ বলবান, স্বাধীন ও প্রাণময়, এজন্য তাহাই প্রতিভার জন্মদাতা। কিন্তু মুসলমান সমাজ নির্জ্জীব ও আনন্দহীন। উন্নত চিন্তা ও আনন্দের তৃপ্তিতে চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়, তাহাও ইহাদের নাই। ইহার প্রধানতম কারণ—শিক্ষার অভাব, শিক্ষা না হইলে সুরুচি জন্মে না, এবং সুরুচির অভাবে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলি বিকশিত ও চরিতার্থ হইতে পারে না। উন্নত রুচির আনন্দের যেখানে অভাব, সেখানে সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল আনন্দই চরম লক্ষ্য হয়। এজন্য দেখা যায়, কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাশবিক আনন্দ লইয়াই প্রায় পৌনে ষোল আনা মুসলমান মশগুল হইয়া আছে। অধিকাংশ মুসলমান-পরিবারেই বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর শিক্ষার অত্যন্ত অসমতা থাকায়, তাহাদের ভাব ও চিন্তাধারারও দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য। প্রধানতঃ এই কারণে এবং কতকটা পর্দ্দা প্রথার শুচি-বায়ুর জন্য গৃহ বলিতে যাহা বুঝায়, মুসলমানের তাহা নাই। এখানে ভাই-বোন, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-কন্যা সকলে মিলিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বা জীবনসমস্যার আলোচনায় এক হইতে পারিতেছে না। এজন্য ইহাদের জীবন মেরুদণ্ডবিহীন, ছায়াবাজীর ন্যায় নড়াচড়া করিতেছে বটে, কিন্তু আসলে তাহা প্রাণহীন। তাহার উপর মুসলমান সমাজ মনোরঞ্জনকর ললিতকলার চর্চ্চাকে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখে না বলিয়া, তাহাদের মধ্যে আনন্দের উপকরণেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকিবে না, পিতার সামনে হাসিবে না, বড় ভাই-এর সামনে খেলিবে না, গুরুজনের অন্যায় কথারও প্রতিবাদ করিবে না, এমনকি কচি মেয়েরা পর্য্যন্ত মার খাইলেও চেচাইয়া কাঁদিবে না, এইরূপ হাজার হাজার আদব-কায়দা ও আইন-কানুনের চাপে মুসলমানের আনন্দধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাহাদের একমাত্র ভরসা, মৃত্যুর পর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়া সুমিষ্ট মেওয়া ভক্ষণ করিবে, প্রাণ ভরিয়া শারাবান-তহুরা পান করিবে, আর চির-যৌবনা হুর-পরীদের লইয়া অনন্তকাল ধরিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে পাইবে। —পরিশেষে তিনি বলেন, আমাদের সুরুচিসম্পন্ন আনন্দের সন্ধান ও সম্ভোগ করিবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহাতে যদি আমাদের সমাজ-গৃহের কিছু সংস্কার করা আবশ্যক হয়, তবে অকুণ্ঠিতভাবে তাহাও করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলবী আবদুর রশীদ বি-এ, বি-টি, সাহেব। বিষয় "মুক্তির আগ্রহ বনাম আদেশের নিগ্রহ"। তিনি বলেন, মুক্তির আগ্রহ মানুষের চিরকাল থেকেই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু মানুষ যখন বস্তু বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না, তখন স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য, এজন্য আইনের প্রয়োজন। কিন্তু শাসনের কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা,—যেমন শরিয়ত—যদিও সাধারণভাবে সকলের উপরেই প্রযোজ্য, তবুও ইহাতে যে সকলের আত্মারই পরিতৃপ্তি হইবে, তাহা আশা করা অন্যায়। জগতে অভিজ্ঞতা, জ্ঞানানুসন্ধিৎসা এবং বিচার-বুদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন এবং মূল্য আছে। চিন্তাশীল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে শরিয়ত বা নিয়মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও তাঁহাদের দ্বারা জগতের বিশেষ অকল্যাণ হইবার আশঙ্কা নাই; কারণ তাঁহারা স্ব স্ব জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জীবনধারাকে যেভাবে পরিচালিত করিবেন, তাহা মোটামুটিভাবে শরিয়তের আদর্শের অনুযায়ীই হইবে, পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। কিন্তু সাধারণ লোক, যাহারা চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসর নহে, তাহাদিগকে নিয়মের শৃঙ্খলে না বাঁধিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং সমাজে নানাপ্রকার অশান্তি ও বিঘ্ন আনয়ন করে। এই হিসাবে আদেশের—বিশেষতঃ শরিয়তের আদেশের—যা' বিশ্বের কল্যাণকামী জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগের অক্ষয়দান, তাহার সার্থকতা আছে। কিন্তু আদেশের একটা দিক, মানুষ সহজেই ভুলিয়া যায়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে আদেশের সার্থকতা ঐখানে—যেখানে তাহা সত্যে পৌঁছিবার পথ নির্দ্দেশ করে। মানুষের প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ শীঘ্রই আদেশের দাস হইয়া পড়ে। সময়ের পরিবর্ত্তনে যে "সত্য" বিবিধরূপ লইয়া প্রকাশিত হইতে পারে, সেকথা সাধারণ মানুষে চিন্তা করে না—যাহারা করে তাহাদিগকেও ইহারা বাধা দেয়, এই ভয়ে যে পাছে তাহাদের শাস্ত্রের ইজ্জত নষ্ট হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, লেখক বলেন, বর্ত্তমান জগতের ব্যবসায়-নীতিতে সুদের আদান-প্রদান অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তবু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, আমাদের সমাজে সুদের প্রচলন হইতেছে না। চিত্রকলা মনে সরসতা ও সজীবতা আনয়ন করে (বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে যে লোকে চিত্রকে খোদার আসনে বসাইবে, ইহাও ধারণা করা যায় না) তথাপি শাস্ত্রবিদেরা এখনও চিত্রাঙ্কনকে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দিতেছেন। সত্য বটে সঙ্গীত সময় সময় কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি জন্মায়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ক্লান্তি-নিবারণী ও চিত্তহারিণী শক্তিটাই বা মানিব না কেন? অথচ সমাজে দেখিতে পাই পবিত্র এমনকি ধর্ম্মভাবাপন্ন সঙ্গীতও দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই প্রকার গোঁড়ামির ফলে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতেছে; এবং শুষ্ক আদর্শের অর্থহীন অনুবর্ত্তিতার ফলে, আত্ম-প্রবঞ্চনা এবং পর-প্রবঞ্চনা অর্থাৎ ভণ্ডামির মাত্রা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিশেষে তিনি বলেন, আমাদিগকে সবল ও জ্ঞানপুষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইব, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিতেছে না—বিরোধ বাধিতেছে দুই-চারিটা সংস্কারের সঙ্গে। কিন্তু তাহা আমাদিগকে অতিক্রম করিতেই হইবে।

চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তরুণ কবি আবদুল কাদের সাহেব। বিষয়—"পল্লীসঙ্গীতে লীলাবাদ"। তিনি নিজের সংগৃহীত অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের পদ আবৃত্তি করিয়া সকলের আনন্দ উৎপাদন করেন। ঘাটু-গান, বন্ধের-গান, মুর্শিদ্যা-গান, মারফতী-গান, কবি-গান, কীর্ত্তন-গান প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বলেন—উহার অনেকগুলি গ্রাম্য চাষীদের জীবন-রস হইতে উৎপন্ন সরল সাহিত্য। প্রথম প্রথম চাষীদের জীবনে এই সমস্ত গানের ভিতর দিয়া ইসলাম এক বিশিষ্টরূপ লইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে কঠোর শরিয়তবাদী মৌলানা এবং পীরসাহেবদের কার্য্যতৎপরতায় চাষীদের জীবন-রস যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে তাহারা ধর্ম্মের যে সহজ সরল আস্বাদ পাইত, এখন আর তাহাদের সে অনুভূতি জাগ্রত নাই।

পঞ্চম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলভী আবুল হুসেন এম-এ, বি-এল, সাহেব। বিষয়—"বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ"। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে মুসলমান সবদিকে পশ্চাৎপদ। সে দরিদ্র, মূর্খ এবং কৃপার পাত্র; অথচ বেশ আত্ম-পরিতুষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। সমাজের নেতৃবর্গ শুধু গবর্ণমেন্টের শতকরা হিসাব লইয়া তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত—কিন্তু তাহাতে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হইতেছে না। মুসলমান-সমাজ ক্রমেই দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে অথচ এই ভিক্ষার দাবী করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করিতেছে না। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং সেকেলে ধরনের শিক্ষা দিয়াই কোনরূপ জোড়াতালি দিয়া কাজ সারার ব্যবস্থা হইতেছে। সমস্ত সমাজ অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং তাহাকে অবনতি ভিন্ন উন্নতি বলা যায় না। আর মোল্লার দল পীর সাজিয়া, নিরক্ষর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া, তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার রাজপথ বাতলাইয়া দিয়া বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া লইতেছে। এই পীরের দল বাস্তবিক পক্ষে কুসীদজীবী মহাজনের চেয়েও অধিক অত্যাচারী ও পাপী। কারণ তাহারা ধর্ম্মের ঘরে সিঁধেল চোর—তাহারা সমাজকে চিরদুর্ব্বল ও চির-অজ্ঞ করিয়া রাখিতেছে, এবং "দুনিয়া ফানা হায়" বলিয়া সমাজের সমস্ত কর্ম্মশক্তি ও উদ্যম উৎসাহের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যনীতিতে তাহাদের আস্থা নাই। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; কিন্তু বেচারা গ্রামবাসীরা মোল্লা-মৌলবী বা পীরের কুহকে পড়িয়া সিন্নি ও তাবিজ দিয়া ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। মুসলমান-সমাজ আজ "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা নিজেদের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিতেছে না। নেতৃগণ সমাজের জন্য থোড়াই কেয়ার করেন, তাঁহাদের স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধি হইলেই যথেষ্ট হইল। এই সমস্ত অবস্থা দূর করিতে না পারিলে মুসলমানের ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময়। অতএব এখন নবীন কর্ম্মীদের নিঃস্বার্থভাবে পূর্ণ-উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে।...

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি লইয়া অবশ্য কিছু কিছু আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তথাপি আশা করা যায় যে প্রবন্ধগুলি হইতেই লেখকগণের—তথা এই সাহিত্য-সমাজের—মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা চক্ষু বুঁজিয়া পরের কথা শুনিতে চাই না, বা শুনিয়াই মানিয়া লইতে চাই না;—আমরা চাই, চোখ মেলিয়া দেখিতে, সত্যকে জীবনে প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে। আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ-আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞান-

শিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকা-মুক্ত করিয়া ভাস্কর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না—আমরা চাই বর্ত্তমান মুসলমান-সমাজের বদ্ধ-কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না—আমরা চাই কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যৎকে মহিমামণ্ডিত করিতে। আমরা জীবনকে "ভোজের বাজি" মনে করিয়া ঐহিক উন্নতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে চাই না—আমরা চাই জগতের সমুদয় জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান, বলবান ও ঐশ্বর্য্যবান হইয়া জীবনের পরিধি বর্দ্ধিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে। আমরা সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার মাতব্বর সাজিয়া ছড়ি ঘুরাইতে চাই না। আমরা চাই সমাজের চিন্তাধারাকে কুটিল ও পঙ্কিল পথ হইতে ফিরাইয়া, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সহজ সত্য পথে চালিত করিয়া আমাদের দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দিতে। এক কথায় আমরা বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিয়া প্রশান্ত জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা বস্তুজগৎ এবং ভাব-জগতের ব্যাপারাদি প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে চাই।

আমরা এ পর্য্যন্ত কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছি তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। কারণ, মাত্র দুই বৎসর কালের সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা যুগ যুগ সঞ্চিত ধারণা ও সংস্কারের কোন বড়রকম পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব না হইলেও, সেটা যে দুঃসাধ্য সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে আশার কথা, যুগ-ধর্ম্ম আমাদের সহায়। যাঁহারা একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারাই প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রীতে এই স্পন্দন জাগাইয়া তোলাই আমাদের প্রথম কাজ। মনে হয়, একাজে আমরা অনেকখানি কৃতকার্য্য হইয়াছি। ক্রমে আমরা অসহিষ্ণুতা ও একদেশদর্শিতা ত্যাগ করিয়া ধীরভাবে চিন্তা করিতে শিখিতেছি। প্রথমতঃ পর্দা-প্রথা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রমাণ, আমাদের এক অধিবেশনে কয়েকজন ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষিতা মুসলমান নারীও ছিলেন। বলাবাহুল্য, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, এক নবজাগরণ আসিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের যুবক দল সমাজের আনন্দহীন অবস্থা তীব্রভাবে অনুভব করিয়া, জীবনকে আর্টের ভিতর দিয়া একটু সরল করিয়া অনুভব করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাহার পর গত বৎসর কবি নজরুলের আগমনে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হইয়া এই ঔৎসুক্য ও উৎসাহ কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এ বৎসর আমাদের সাময়িক অধিবেশনগুলিতে অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল, এবং সুখের বিষয়, গায়কের কোন অভাব বোধ করা যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমনকি গত বৎসরেও সঙ্গীতের কোন আয়োজন করিতে হইলেই, হিন্দু ভ্রাতৃদের অথবা বাহিরের লোকের সাহায্য লইতে হইত, কিন্তু এ বৎসর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে দুই-তিনটি করিয়া গান হইয়াছিল, এবং তাহা আমাদের মুসলিম হলের ছাত্রদিগের দ্বারাই গীত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমরা যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে ও স্পষ্টভাবে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা অসম্ভব ছিল। এখন আমাদের চিন্তাধারার সহিত সংরক্ষণশীল আরবী শিক্ষিত সমাজের ভাবধারার সংমিশ্রণ হওয়ায়, বিচারবুদ্ধি অনেকটা জাগ্রত হইয়াছে। আমার মনে হয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্ত্তমানে ঢাকার মৌলভী ছাত্রগণ (যাহারা স্থিতিশীল বলিয়া

শিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকা-মুক্ত করিয়া ভাস্কর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না—আমরা চাই বর্ত্তমান মুসলমান-সমাজের বদ্ধ-কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না—আমরা চাই কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যৎকে মহিমামণ্ডিত করিতে। আমরা জীবনকে "ভোজের বাজি" মনে করিয়া ঐহিক উন্নতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে চাই না—আমরা চাই জগতের সমুদয় জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান, বলবান ও ঐশ্বর্য্যবান হইয়া জীবনের পরিধি বর্দ্ধিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে। আমরা সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার মাতব্বর সাজিয়া ছড়ি ঘুরাইতে চাই না। আমরা চাই সমাজের চিন্তাধারাকে কুটিল ও পঙ্কিল পথ হইতে ফিরাইয়া, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সহজ সত্য পথে চালিত করিয়া আমাদের দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দিতে। এক কথায় আমরা বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিয়া প্রশান্ত জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা বস্তুজগৎ এবং ভাব-জগতের ব্যাপারাদি প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে চাই।

আমরা এ পর্য্যন্ত কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছি তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। কারণ, মাত্র দুই বৎসর কালের সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা যুগ যুগ সঞ্চিত ধারণা ও সংস্কারের কোন বড়রকম পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব না হইলেও, সেটা যে দুঃসাধ্য সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে আশার কথা, যুগ-ধর্ম্ম আমাদের সহায়। যাঁহারা একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারাই প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রীতে এই স্পন্দন জাগাইয়া তোলাই আমাদের প্রথম কাজ। মনে হয়, একাজে আমরা অনেকখানি কৃতকার্য্য হইয়াছি। ক্রমে আমরা অসহিষ্ণুতা ও একদেশদর্শিতা ত্যাগ করিয়া ধীরভাবে চিন্তা করিতে শিখিতেছি। প্রথমতঃ পর্দা-প্রথা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রমাণ, আমাদের এক অধিবেশনে কয়েকজন ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষিতা মুসলমান নারীও ছিলেন। বলাবাহুল্য, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, এক নবজাগরণ আসিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের যুবক দল সমাজের আনন্দহীন অবস্থা তীব্রভাবে অনুভব করিয়া, জীবনকে আর্টের ভিতর দিয়া একটু সরল করিয়া অনুভব করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাহার পর গত বৎসর কবি নজরুলের আগমনে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হইয়া এই ঔৎসুক্য ও উৎসাহ কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এ বৎসর আমাদের সাময়িক অধিবেশনগুলিতে অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল, এবং সুখের বিষয়, গায়কের কোন অভাব বোধ করা যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমনকি গত বৎসরেও সঙ্গীতের কোন আয়োজন করিতে হইলেই, হিন্দু ভ্রাতৃদের অথবা বাহিরের লোকের সাহায্য লইতে হইত, কিন্তু এ বৎসর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে দুই-তিনটি করিয়া গান হইয়াছিল, এবং তাহা আমাদের মুসলিম হলের ছাত্রদিগের দ্বারাই গীত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমরা যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে ও স্পষ্টভাবে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা অসম্ভব ছিল। এখন আমাদের চিন্তাধারার সহিত সংরক্ষণশীল আরবী শিক্ষিত সমাজের ভাবধারার সংমিশ্রণ হওয়ায়, বিচারবুদ্ধি অনেকটা জাগ্রত হইয়াছে। আমার মনে হয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্ত্তমানে ঢাকার মৌলভী ছাত্রগণ (যাহারা স্থিতিশীল বলিয়া

চিরপরিচিত) তাঁহারাও মুক্ত-বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে হয়ত ঢাকার বাহিরেও অনেক তথাকথিত সাহিত্যিকদের চেয়েও অধিক অগ্রসর। আমাদের চেষ্টার এই প্রাথমিক ফল বাস্তবিকই আশাজনক, এবং ইহার পরিমাণও নিতান্ত সামান্য নহে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমান-জগতে উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া যতদূর সম্ভব, উচ্চতর-সভ্যতাকে আহ্বান করিয়া আনিবার উপযুক্ত শক্তি ও মনোবৃত্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।

গত বৎসর "শিখায়" যে একখানা ছবি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা যে, মসজিদ ও কোরান শরিফকে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিতে হইবে, উক্ত ছবিতে তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া, ছবিখানি যে অর্থে "শিখায়" সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল তাহাই সাধারণ্যে গোচর করিতেছি। ছবির বাম দিকে মরুভূমির উপর কয়েকটি খেজুর গাছ আছে। তাহাই মুসলিম জ্ঞান ও সভ্যতার জন্মভূমি। জ্ঞান ও সভ্যতার আগুন প্রথমে কিছুদিন ক্ষীণভাবে থাকিয়া, মুসলিম-গৌরবের দিনে অতি উজ্জ্বল ও ব্যাপকভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তাহা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া অনেকদিন যাবৎ অন্ধকার ধূমমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল। অতি আধুনিককালে সেই কুণ্ডলীকৃত ধূম-রাশির অগ্রভাগে আবার এক অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে—ইহা দ্বারা ইসলামের নবজাগরণ সূচিত হইতেছে। ছবির ডান দিকে দেখুন, যে মসজিদ পূর্ব্বে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহা বর্ত্তমানে অন্ধকার পূর্ণ, এবং সেই অন্ধকারের ভিতর একখানা বন্ধ করা কোরান শরিফ রহিয়াছে, তাহা খুলিবার লোকটি পর্য্যন্ত নাই। আর ঐ মসজিদের চতুর্দ্দিকে জঞ্জাল আবর্জ্জনা পরগাছা প্রভৃতি স্পর্দ্ধার সহিত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইসলামের নব-প্রজ্জ্বালিত "শিখায়" আবার অন্ধকার স্থান আলোকিত হইবে এবং জঞ্জাল আবর্জ্জনা পুড়িয়া গিয়া কোরান ও মসজিদের সত্যরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে।

গত বৎসরের মত এ বৎসরও আমাদের কোন চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা নাই। ডেলিগেট ও অভ্যর্থনা-সমিতির মেম্বরদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহা বার্ষিক অধিবেশনেই নিঃশেষ হইয়া যায়। এই সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত বৎসর শ্রদ্ধেয় সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমাদের সমিতির সাহায্যার্থ পাঁচ টাকা দান করিয়াছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সে-দান স্বীকার করিতেছি।

গত বৎসরের সভাপতি খানবাহাদুর তসদ্দুক আহমদ এম. ইডি. সাহেব এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এ. এফ. রহমান সাহেব এ বৎসর এখানে নাই। এতদ্ব্যতীত আমাদের আরেকজন বিশেষ উদ্যোগী বন্ধু মৌলবী আনোয়ারুল কাদির সাহেবও অনুপস্থিত। আজকার দিনে তাঁহাদের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে বড় সুখের বিষয় হইত।

শ্রদ্ধাস্পদ কাজী ইমদাদুল হক মরহুমের জীবনেতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা আমাদের একটি সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল কমিটি গঠন করা ছাড়া, এ কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে পত্র লিখিয়াও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। এরূপ নিশ্চেষ্টতা বড়ই দুঃখের বিষয়। আশাকরি, ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থা আর থাকিবে না।

আমাদের সাময়িক অধিবেশনে, খানবাহাদুর তসদ্দুক আহমদ সাহেব, ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, খান সাহেব আবদুর রহমান খাঁ এবং অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত নলিনী ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌঃ মোমতাজ উদ্দীন আহ্‌মদ, মৌঃ মোঃ আবদুর রশীদ, কাজী নূরুল হক, মৌঃ আবদুল ওদুদ, মৌঃ আমিনুর রসুল, মৌঃ নাজীর আহমদ, মৌঃ গোলাম মওলা, মৌঃ খোরশেদউদ্দীন আহম্মদ, মৌঃ আবদুল হক, মৌঃ নাজীর আহমদ, মৌঃ আলী নূর, মৌঃ এ. কে. আহমদ খাঁ, কাজী মহব্বত আলী, মৌঃ মুসলিমউদ্দীন খাঁ, মৌঃ শফিকর রহমান, মৌঃ মোহাম্মদ হুসেন, মৌঃ ফয়েজ আহমদ, মৌঃ আবদুল কাদের, মৌঃ আনোয়ারুল কাদির, এ, জেড্. নূর আহমদ, মৌঃ বেলায়েত আলী খাঁ, মৌঃ রজব আলী মজুমদার, মৌঃ আবদুস সালাম, মৌঃ আবদুস সালাম খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তৎসহ গায়কগণকে, প্রবন্ধ লেখকগণকে এবং প্রতিবারের উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা না হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না। আশাকরি ভবিষ্যতেও ইহাদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা ও উৎসাহের বলে আমাদের সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

এখন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র মদদ অতি নিকটবর্ত্তী—কোরান

শিখা
২য় বর্ষ, ১৯২৮

# মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

## তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বয়ঃক্রম তিন বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময়ের মধ্যে ইহা ধীরে ধীরে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মৌঃ আবুল হুসেন, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, তরুণ কবি আবদুল কাদের, অধ্যাপক মৌঃ আনোয়ারুল কাদির প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যমশীল ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া প্রথমে এই সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে, কয়েকজন নূতন লেখকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তরুণদের মধ্যে উৎসাহ ও বিচারমূলক গবেষণাবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে। এই 'সমাজের' মুখপত্রস্বরূপ আমরা ইতিমধ্যে দুইখানা 'শিখা' বাংলাদেশের সাহিত্যিকবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। খোদার কৃপায় 'শিখা' যেরূপ আদর লাভ করিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহার ভাববৈশিষ্ট্য দ্বারা গুণীসমাজে যেরূপ পরিচিত হইতে পারিয়াছে তাহাতে আমরা প্রকৃতই খুব উৎসাহিত হইয়াছি। এই সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখন সে সমস্তের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। বৃক্ষের পরিচয় তাহার ফলেই পাওয়া যায়। এজন্য আলোচ্য বৎসরে এই সমাজের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রথম অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয় "হিন্দী সাহিত্য ও মুসলমান" শীর্ষক একটি সুললিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি প্রথমতঃ হিন্দী ও উর্দ্দুভাষার প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া এতদুভয়ের সাদৃশ্যটি ভালরূপে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর আমীর খস্রু, মালেক মুহম্মদ জায়েসী, মোল্লা দাউদ, গং কবি, খানখানান আবদুল রহিম, রস খান, ওসমান, নুর মহম্মদ, দীন দরবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের কবি ও সাধকদের পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া, তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর পদ আবৃত্তি করিয়া ও তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন। লেখক বলেন, এই সমস্ত কাব্য শুধু প্রেমের গীতহার মাত্র নহে—এগুলি তীক্ষ্ণানুভূতি-সম্পন্ন দ্রষ্টার কল্পনা-কুশল বস্তু-বর্ণনায় সমৃদ্ধ। বিশেষ করিয়া তিনি 'পদ্মাবৎ', 'প্রেম-বটিকা', 'ইন্দ্রাবতী' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের কথা খুব প্রশংসার সহিত উল্লেখ করেন। উপরোক্ত কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পাঠান ও মোগল বাদশাহ্দিগের নিকট হইতে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমনকি বাদশাহ আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত হিন্দুকে ঘৃণা করিলেও হিন্দীকে ঘৃণা করেন নাই। বাস্তবিকপক্ষে হিন্দী ও বাংলা ভাষা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ বিজাতীয় ভাষা নহে। পরিশেষে জ্ঞান-ভক্তি এবং সাহিত্যের দিক দিয়া সুফী সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান মিলন স্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করেন।

অনেকেই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন মুসলমান বাদশাহগণ ভারতবর্ষকে আপন দেশ মনে করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

জ্ঞানের দিক দিয়া বেশ একটা উন্নত রুচি এবং অনেকখানি ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়; তখনকার সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতির সুরটি স্পষ্ট অনুভূত হয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, অধ্যাপক মৌঃ আবুল হুসেন সাহেব। বিষয়, বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা দ্বিতীয় প্রবন্ধ। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রথম বৎসরের 'শিখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলেন হিন্দু-মুসলমানের ভিতর শিক্ষার অসমতা দূর করা এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য একই আদর্শের শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠান না করিয়া একই স্থানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মাদ্রাসায় যে এক নূতন প্রণালীর শিক্ষা-বিধি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই কল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যত তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। সেই শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা যাহাতে প্রীতি ও ঔদার্য্য বৃদ্ধি পায়, জীবনধারণের ক্ষমতা জন্মে এবং নূতন নূতন সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িলে, তদনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপ কতিপয় সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করিয়া একটি শিক্ষাপদ্ধতির খসড়া উপস্থিত করেন। তাহাতে চারিটি ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা এবং তাহার উপায় প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে পূর্ব্বে সাধারণভাবে শিক্ষায় কতকদূর অগ্রসর হইবার পর অল্প সংখ্যক ছাত্র ইচ্ছা করিলে বিশিষ্ট মুসলিম বা হিন্দু কালচার সম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পাঠ্য-তালিকা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি যে খসড়াটি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হিন্দু-মুসলমান ও ইংরাজ শিক্ষাতত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইলে, দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এ সভায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লেখকের উদারতা ও স্পষ্টবাদিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলেন, মুসলমানকে বৈদেশিক লুণ্ঠনকারীভাবে দেখা হিন্দুর অন্যায়, আবার হিন্দুকে কাফের ও ভারতীয় কাল্‌চার-কে কাফেরী কালচার মনে করাও মুসলমানের পক্ষে অন্যায়। অধ্যাপক আবদুল ওদুদ সাহেব বলেন, আমাদের বৃহৎ চিন্তা নাই; হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, ফিরিঙ্গী প্রভৃতি সকলকে যখন ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মানুষ হিসাবে ভাই ভাই রূপে দেখিতে শিখিব, যখন বেদনা-শীল, প্রেম-প্রবণ, ভাবুক কর্ম্মীর সৃষ্টি হইবে, তখনই সত্যিকার কার্য্য সম্ভবপর হইবে। অধ্যাপক কানুনগো মহাশয় বলেন, মুসলমান সমস্ত নূতন ভাব-ধারাকেই সন্দেহ ও অপ্রীতির চক্ষে দেখে ধর্ম্ম-নাশের ভয়ে,—কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, মুসলমানও অনেক পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, এটা ত ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি আরও বলেন, নূতন চিন্তার সংঘর্ষে পুরাতনপন্থীদেরও দৃষ্টিসীমা কিছু প্রসারিত হয়—সেইটুকুই নূতন আন্দোলনের স্থায়ী প্রভাব। সভাপতি খান সাহেব আবদুর রহমান খাঁ বলেন, কোন বৃহৎ চিন্তাই ব্যর্থ হয় না। কার্য্য ও চিন্তার সংঘর্ষে সমাজের মনস্তত্ত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এই সমাজের তৃতীয় অধিবেশনে পরলোকগত জাষ্টিস্ আমীর আলী মরহুমের জীবন-কথা আলোচিত হয়। অধ্যাপক মৌঃ আবুল হুসেন সাহেব তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্, মিঃ ফখ্‌রুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক মিঃ মোমতাজউদ্দীন আহমদ এবং আরও কয়েকজন কিছু কিছু আলোচনা করেন। তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, মানব-প্রীতি, স্বাধীনচিন্ততা, গভীর জ্ঞান, সাহিত্য-সেবা, আত্ম-প্রত্যয়, আন্তরিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

সমাজের একটি অতিরিক্ত অধিবেশন বঙ্গের কৃতি মহিলা বিদুষী মিস্ ফজিলতুন-নেসা সাহেবাকে তাঁহার বিলাত গমনের প্রাক্কালে অভিনন্দিত করা হয়। আর একটি অতিরিক্ত অধিবেশনে আমাদের পুরাতন বন্ধু ইউরোপ-প্রত্যাগত ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে অভ্যর্থনা করা হয়।

সমাজের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। একটি "পর্দ্দাপ্রথা" অন্যটি "নারী-সমস্যা" বিষয়ে। পর্দ্দাপ্রথার লেখক মৌঃ আবদুল গণি সাহেব বলেন, পুরুষ বহুকাল যাবত স্বার্থের বশে নারীকে স্তুতিবাক্যে ভুলাইয়া, তাহাকে "দেবী" সাজাইয়া "গৃহকারা বন্দিনী" করিয়া রাখিয়াছে। এই অবরোধপ্রথা নীতি ও ধর্ম্ম দুয়েরই বিরোধী। পর্দ্দা, প্রকৃতপক্ষে অবরোধ নহে—পর্দ্দা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বভাবজাত ব্যবধান এবং লজ্জাশীলতা। ইহার অভাব হইলে রুচি-বিকার জন্মে এবং ভব্যতার অভাব প্রকাশ পায়।

অতঃপর নাজিরুল ইসলাম বি. এ. "নারী-সমস্যা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে নারী পুরুষের জন্য প্রচুর ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতেছে বটে, কিন্তু প্রতিদানে পুরস্কার দূরে থাকুক, কেবলি উপেক্ষা পাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ নারীর অর্থনৈতিক অধীনতা। দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে পুরুষের সমকক্ষতা করিয়া নারী যতদিন না স্বাবলম্বিনী হইতে পারিতেছে, তাহার ভাগ্যে পুরুষের একটু কৃপা-মধুর হাসি এবং কতকগুলি স্তুতি-কবিতা ছাড়া আর কিছু পাইবার আশা নাই।

প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইবার পর অধ্যাপক ওদুদ সাহেব বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পর্দ্দার কড়াকড়ি ছিল না। বর্ত্তমানে পর্দ্দাপ্রথা অবরোধে পরিণত হইয়াছে। এ প্রথার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সাধারণ প্রচলিত বোরকা বড় অ-সুন্দর। নারী-শিক্ষার বহুল প্রচলন হইলে তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সৌষ্ঠবের সহিত সমাধান করিয়া লইতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও এ সম্বন্ধে আর একটু উদারতার চর্চ্চা করা উচিত। তিনি "নারী-সমস্যা" সম্পর্কে ইউরোপের কোন মনীষীর মত উল্লেখ করিলেন; ইনি নাকি বলেন, "বাস্তবিক পক্ষে নারী পুরুষের অধীন থাকিয়া পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাটুকুই ভোগ করিতে চায়।"

মৌঃ আবুল হুসেন সাহেব বলেন, পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলেন, নারীকে পুরুষে পরিণত করিয়া নারী-সমস্যার সমাধান করা অনৈসর্গিক (অস্বাভাবিক) ও অসম্ভব। এতদিন নারীগণ পুরুষের দ্বারা শাসিত হইতেন, এখন ক্রমশঃ তাঁহারাই শাসক হইয়া পড়িতেছেন। নৈতিক আদর্শও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে—বিবাহপ্রথাকে বর্ত্তমানে কেহ কেহ প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। এইরূপ অস্বাভাবিকতার ফলে কতকগুলি রোগের সৃষ্টি হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজে নারীর বিশেষ প্রকারের প্রয়োজন আছে সেই দিকে লক্ষ্য করিলেই কৃত্রিম নারী-সমস্যার অবসান হইবে।

মৌঃ নাজীরউদ্দীন আহমদ বি. এ. বলেন, নারীর চরিত্র রক্ষাই যদি পর্দ্দার উদ্দেশ্য হয়, তবে নারীগণই ত আবশ্যকমত নিয়মাদি সৃষ্টি করিতে পারেন, এ বিষয়ে পুরুষেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আইন-কানুন করিতে যান কেন?

মৌঃ আবদুর রশীদ বি-এ. বি-টি. বলেন, নারী যে একেবারেই কোন প্রতিদান পাইতেছে না একথা সত্য নয়। পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে তিনি বলেন, রেল-ষ্টীমারের প্রয়োজন ছাড়াও, নারীদের ভোটাধিকার হইলে একটা নূতনতর এবং অধিকতর প্রয়োজনের চাপে পর্দ্দার কড়াকড়ি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

অধ্যাপক কানুনগো মহাশয় বলেন, স্বাধীনতাকে খানিকটা সীমাবদ্ধ না করিলে চলে না। পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে লেখক আদর্শবাদীর দিক দিয়া আলোচনা না করিয়া লোক-চরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলিয়াছেন, এইজন্য বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রবন্ধের যথেষ্ট মূল্য আছে। বাস্তবিক পক্ষে, পরিচ্ছদে বিলাস-লীলা অপেক্ষা সংযম অবলম্বন করাই অধিকতর প্রশংসনীয়। এই দীর্ঘ আলোচনার পর সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় সভা-ভঙ্গ হয়।

সমাজের পঞ্চম অধিবেশনে নবীন-কবি আবদুল কাদের "পল্লীগানে বৌদ্ধ প্রভাব" সম্বন্ধে একটি অতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক অতি সুন্দরভাবে তাঁহার নিজের সংগৃহীত অনেক গান হইতে প্রমাণ করেন যে, সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। অতঃপর ওহাবী আন্দোলনরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে কেমন করিয়া গ্রাম্যসঙ্গীতাদি মুসলমানদের ভিতর হইতে লোপ পাইতেছে, তাহাও প্রদর্শন করেন।

প্রবন্ধের বস্তু একটু Technical থাকায় অধিকাংশ সমালোচক ইসলাম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, আর্য্য সভ্যতা, সেমেটীক সভ্যতা এবং বাঙালী জাতির স্বাভাবিক কোমলতার বিষয়ই অধিক আলোচনা করেন। এ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের লেখকের ক্ষমতা ও গবেষণার অজস্র প্রশংসা করেন এবং নবীনতর গবেষণা অনুসারে প্রবন্ধে কয়েকটি ত্রুটি দেখাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে তিনি একটি গ্রাম্যসঙ্গীতের কয়েক পদ আবৃত্তি করিয়া বলেন, যে অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য সেরূপ আকুল প্রার্থনা অন্য কোথায়ও তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

এ পর্য্যন্ত সমাজের জন্য নিয়মিত কোন ফাণ্ড বা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হয় নাই। এ কারণ "শিখা" প্রকাশ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে এবং উহাতে অনেক ত্রুটিও রহিয়া গিয়াছে। ক্রমান্বয়ে অধিক লোকের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে, এ বিষয়ে উন্নতি করা সম্ভবপর হইবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানটির নাম "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" হইলেও, কার্য্যতঃ ইহা সাম্প্রদায়িক নহে। আমরা সকল সাহিত্য-সেবীকেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মেম্বররূপ গ্রহণ করিয়া থাকি। হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার সংমিশ্রণে পুষ্টতর এবং পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-গঠনে সহায়তা করাও আমাদের একটি উদ্দেশ্য, এজন্য ভবিষ্যতে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনুবাদ-শাখাও স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে। আরবী-পার্শী ও উর্দ্দু গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ করিলে, মুসলমানের ভাব-বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিবে। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে ভালরূপ চিনিতে পারিবে। পরস্পরের সভ্যতা, চিন্তা-বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় আদর্শের সহিত পরিচয় হইলে স্বভাবতঃই ইহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি জন্মিবে। সাহিত্য-সমাজের দ্বারা জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হইলে এবং সত্যিকার লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে এই সাহিত্য-সমাজের অস্তিত্বের সার্থকতা হইবে। যে সমস্ত কর্ম্মী অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা বিভিন্ন সাময়িক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা উপদেশ ও সুপরামর্শ দ্বারা ইহার গতি নির্ণীত করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতি সমাজের পক্ষ হইতে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশাকরি ভবিষ্যতেও ইহাদের উদ্যম সহানুভূতি ও উপদেশ লাভ করিয়া এই সমাজের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইবে।

শিখা
৩য় বর্ষ, ১৯২৯

# ধর্ম ও সমাজ

পৃথিবীর অগণিত প্রতিষ্ঠানের কোনোটিই প্রয়োজন ব্যতিরেকে স্থাপিত হয় নাই। আমাদের ধর্ম ও সমাজও প্রয়োজনের তাড়নায়ই জন্মলাভ করিয়াছে।

সমাজের প্রয়োজনীয়তা অতি সহজেই চোখে পড়ে। আত্মরক্ষা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—ক্রম-বিকাশবাদের ইহাই মূল সূত্র। যখন কোটি কোটি লোক আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন প্রত্যেকে অন্যের মঙ্গলের দিকে লক্ষ না রাখিয়া আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিলে কি মহামারী কাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে, সে চিত্র স্মরণ করিলেই, সমাজবন্ধন এবং নীতির আবশ্যকতা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। বাস্তবিক, জন্মাবধি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনধারণ করা অসম্ভব। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাকে মানুষের একটা মৌলিক বৃত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। সমাজের প্রথম অবস্থায়, শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ হইলেই লোকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইত, কারণ তখন শারীরিক বলের দ্বারাই অন্যের উপর নিজের ইচ্ছা ও প্রভুত্ব চালানো সম্ভবপর ছিল। তখন বাধ্য হইয়া লোকে সংঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে স্বীকৃত হয়। এই নিয়মগুলিই সামাজিক নিয়ম। পরস্পরের বিশ্বাস, আদান-প্রদান, উপকার-প্রত্যুপকার, বিবাহবন্ধনে পবিত্রতা-রক্ষণ, সত্যবাদিতা, ক্ষমা, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণ সামাজিক প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে might is right-ই আদিম নিয়ম। যখন সকলের শক্তি প্রায় সমান হইয়া উঠে, তখন বিজ্ঞেরা right is might নীতির আদর্শ প্রচার করিতে বাধ্য হন। আজও পৃথিবীতে সমাজে সমাজে বা জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ্ব ঘটিতেছে, তাহাতে সর্বদাই কার্যতঃ চণ্ডনীতিই অনুসৃত হইতেছে। প্রবল স্বভাবতঃ দুর্বলের উপর অত্যাচার করিলেও সর্বদা তাহার মনে ভয় থাকে, দুর্বলেরা সংঘবদ্ধ হইয়া কিম্বা অন্য উপায়ে অধিক প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাকে পাল্টা নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে। সে যাহা হউক, এই ভয় এবং পরিণামদর্শিতাই নীতি বা সাধুবুদ্ধির জনক। সুতরাং সামাজিক প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত এই নীতিজ্ঞানকে ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্ম হইতে যদি নীতিকেই বিচ্ছিন্ন করা হয়, তবে ধর্মের কি অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহার প্রয়োজনই বা কি? অবশ্য একরূপ ব্যাপকভাবে ধরিলে যাহার যে স্বভাব সেই তাহার ধর্ম,—যেমন আগুনের ধর্ম দহন করা, মস্তিষ্কের ধর্ম চিন্তা করা ইত্যাদি। এ হিসাবে বলিতে হয়, স্বভাবত যাহা ঘটিয়াছে তাহাই ধর্ম অনুসারে ঘটিতেছে—ইহাতে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বা তদ্রূপ কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু ধর্মের প্রচলিত অর্থ ইহা নয়। অনেক সময় বলা হইয়া থাকে, একাগ্র সাধনাই ধর্ম। যে কোনো বিষয় যদি মানুষের মনকে অন্য সমুদয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহার চিন্তা ও কর্মের গতি একমুখী করিতে

পারে, তবে সেইটিই তাহার ধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কবির সৌন্দর্যচর্চাই ধর্ম, ছাত্রের অধ্যয়নই ধর্ম, রাজার প্রজাপালনই ধর্ম ইত্যাদি।

মানুষের মনে অসীম জিজ্ঞাসার উদয় হয়, আমি কে? কোথায় ছিলাম? কোথায় চলিতেছি? কেন চলিতেছি? আমার পরিণাম কি? এ জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কে-ই বা সৃষ্টিকর্তা? কেনই বা ইহার সৃষ্টি? স্রষ্টার স্বরূপ কি? কোথায় তাঁর বাসস্থান? সমুদয় ধর্মের মূলে এই সব জিজ্ঞাসা এবং ইহার উত্তর। এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের কাজ। এখানে ধর্ম ও দর্শন একীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ধর্মের ভিতরে দর্শনের অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। ধর্মের সহিত হৃদয়ের গভীর আশা এবং কোনো শক্তিমান নিয়ামক পুরুষের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকাতেই ইহার দর্শন ভাগ শুধু মনের বিলাস মাত্রে পর্যবসিত না হইয়া প্রাণের স্পর্শে স্পন্দিত হইয়া উঠে। ধর্মের বিশিষ্ট রঙ মিশ্রিত না থাকিলে দর্শন কোনও দিন এত অধিক সমাদৃত হইত কিনা সন্দেহ। মানুষের কোন্ প্রয়োজনে দর্শনের ভিতর ধর্মের বীজ নিহিত থাকে, সেই কথাটিই এখন একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। মানুষ যখন বুঝিতে পারে, সে কত ক্ষুদ্র, জগতের নানা ঘটনা ও শক্তিপুঞ্জের সম্মুখে সে সামান্য তৃণের ন্যায় কাতর ও শক্তিহীন, যখন তাহার অন্তরের আকুল বাসনা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তাহার সন্তান-পরিজন ও প্রিয়াস্পদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়—যখন সে প্রবলের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া কাহারও নিকট কোনো প্রতিকার পায় না, চারিদিকে কেবলই ছলনা, কৃতঘ্নতা ও নৈরাশ্যের ছায়া দেখিতে পায়, তখন স্বভাবতঃই এক সর্বশক্তিমান, দয়াময় জগৎকারণে বিশ্বাস এবং পরলোকে তাঁহার ন্যায়বিচার ও দণ্ড পুরস্কারে আস্থা স্থাপনই তাহার একমাত্র সম্বল হয়। এই সান্ত্বনাটুকু না থাকিলে মানুষের জীবন অত্যন্ত দুর্বহ হইয়া পড়িত।

মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে, সে যাহা আশা করে, কিম্বা যাহার অভাব অনুভব করে সে জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক প্রকার নিঃসন্দেহ হয়। সে মনে করে তৃষ্ণা আছে বলিয়া জল আছে, শিশুর ক্ষুৎ-পিপাসা আছে বলিয়া মাতৃস্তন্য আছে; স্নেহবৃত্তি আছে বলিয়া সন্তান আছে, ইত্যাদি। বাস্তবিক মানুষ পৃথিবীতে অনেক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু ইচ্ছার নিবৃত্তির সম্ভাবনাও দেখিতে পায়। সুতরাং সদৃশ যুক্তি দ্বারা অন্তরের প্রেরণা এবং আকাঙ্ক্ষাকেই নিবর্তক জিনিসের অস্তিত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। বাস্তবিক এগুলি তর্কের কথা নয়—হৃদয়ের কথা, যুক্তির কথা নয়—বিশ্বাসের কথা। এ বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। ইহা না থাকিলে মানুষের মনে কোনো শান্তি থাকিত না; অনন্তের পরিমাপে অসমর্থ বুদ্ধি বিকল হইয়া যাইত। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক পরিশেষে কোনো না কোনো বিশ্বাসে আসিয়া ঠেকে এবং সেখানেই আশ্রয় পায়। নতুবা মানুষের চিন্তা ও কর্ম বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমান্বয়েই উন্নত হইতেছে, কিন্তু উহার একটা সীমা সর্বদাই থাকিবে। মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষাও চিরদিনই থাকিবে, সুতরাং প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ জগতে তাহার একটা শেষ নির্ভরস্থলই ধর্মের গোড়ার কথা—সুতরাং কোনো না কোনোরূপে মানুষের এই স্বাভাবিক ধর্মবৃত্তিও চির জাগরূক থাকিবে। বুদ্ধির শেষ সীমা হইতে বিশ্বাসের আরম্ভ। আবার বিশ্বাসের মূলেও বুদ্ধির একটা অস্পষ্ট সম্মতি আছে—নতুবা বিশ্বাসের রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইত। বিশ্বাস একটি বিস্তীর্ণ সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র; জ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ হইলে এই সম্ভাব্যতার ভিত্তি ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় বিশ্বাসও অন্তর্হিত হয়। মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসও ক্রমশঃ

পারে, তবে সেইটিই তাহার ধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কবির সৌন্দর্যচর্চাই ধর্ম, ছাত্রের অধ্যয়নই ধর্ম, রাজার প্রজাপালনই ধর্ম ইত্যাদি।

মানুষের মনে অসীম জিজ্ঞাসার উদয় হয়, আমি কে? কোথায় ছিলাম? কোথায় চলিতেছি? কেন চলিতেছি? আমার পরিণাম কি? এ জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কে-ই বা সৃষ্টিকর্তা? কেনই বা ইহার সৃষ্টি? স্রষ্টার স্বরূপ কি? কোথায় তাঁর বাসস্থান? সমুদয় ধর্মের মূলে এই সব জিজ্ঞাসা এবং ইহার উত্তর। এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের কাজ। এখানে ধর্ম ও দর্শন একীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ধর্মের ভিতরে দর্শনের অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। ধর্মের সহিত হৃদয়ের গভীর আশা এবং কোনো শক্তিমান নিয়ামক পুরুষের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকাতেই ইহার দর্শন ভাগ শুধু মনের বিলাস মাত্রে পর্যবসিত না হইয়া প্রাণের স্পর্শে স্পন্দিত হইয়া উঠে। ধর্মের বিশিষ্ট রঙ মিশ্রিত না থাকিলে দর্শন কোনও দিন এত অধিক সমাদৃত হইত কিনা সন্দেহ। মানুষের কোন্ প্রয়োজনে দর্শনের ভিতর ধর্মের বীজ নিহিত থাকে, সেই কথাটিই এখন একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। মানুষ যখন বুঝিতে পারে, সে কত ক্ষুদ্র, জগতের নানা ঘটনা ও শক্তিপুঞ্জের সম্মুখে সে সামান্য তৃণের ন্যায় কাতর ও শক্তিহীন, যখন তাহার অন্তরের আকুল বাসনা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তাহার সন্তান-পরিজন ও প্রিয়াস্পদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়—যখন সে প্রবলের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া কাহারও নিকট কোনো প্রতিকার পায় না, চারিদিকে কেবলই ছলনা, কৃতঘ্নতা ও নৈরাশ্যের ছায়া দেখিতে পায়, তখন স্বভাবতঃই এক সর্বশক্তিমান, দয়াময় জগৎকারণে বিশ্বাস এবং পরলোকে তাঁহার ন্যায়বিচার ও দণ্ড পুরস্কারে আস্থা স্থাপনই তাহার একমাত্র সম্বল হয়। এই সান্ত্বনাটুকু না থাকিলে মানুষের জীবন অত্যন্ত দুর্বহ হইয়া পড়িত।

মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে, সে যাহা আশা করে, কিম্বা যাহার অভাব অনুভব করে সে জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক প্রকার নিঃসন্দেহ হয়। সে মনে করে তৃষ্ণা আছে বলিয়া জল আছে, শিশুর ক্ষুৎ-পিপাসা আছে বলিয়া মাতৃস্তন্য আছে; স্নেহবৃত্তি আছে বলিয়া সন্তান আছে, ইত্যাদি। বাস্তবিক মানুষ পৃথিবীতে অনেক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু ইচ্ছার নিবৃত্তির সম্ভাবনাও দেখিতে পায়। সুতরাং সদৃশ যুক্তি দ্বারা অন্তরের প্রেরণা এবং আকাঙ্ক্ষাকেই নিবর্তক জিনিসের অস্তিত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। বাস্তবিক এগুলি তর্কের কথা নয়—হৃদয়ের কথা, যুক্তির কথা নয়—বিশ্বাসের কথা। এ বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। ইহা না থাকিলে মানুষের মনে কোনো শান্তি থাকিত না; অনন্তের পরিমাপে অসমর্থ বুদ্ধি বিকল হইয়া যাইত। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক পরিশেষে কোনো না কোনো বিশ্বাসে আসিয়া ঠেকে এবং সেখানেই আশ্রয় পায়। নতুবা মানুষের চিন্তা ও কর্ম বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমান্বয়েই উন্নত হইতেছে, কিন্তু উহার একটা সীমা সর্বদাই থাকিবে। মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষাও চিরদিনই থাকিবে, সুতরাং প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ জগতে তাহার একটা শেষ নির্ভরস্থলই ধর্মের গোড়ার কথা—সুতরাং কোনো না কোনোরূপে মানুষের এই স্বাভাবিক ধর্মবৃত্তিও চির জাগরূক থাকিবে। বুদ্ধির শেষ সীমা হইতে বিশ্বাসের আরম্ভ। আবার বিশ্বাসের মূলেও বুদ্ধির একটা অস্পষ্ট সম্মতি আছে—নতুবা বিশ্বাসের রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইত। বিশ্বাস একটি বিস্তীর্ণ সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র; জ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ হইলে এই সম্ভাব্যতার ভিত্তি ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় বিশ্বাসও অন্তর্হিত হয়। মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসও ক্রমশঃ

পরিবর্তিত হইতেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে লোকের জ্ঞানের স্তর যেমন ভিন্নভিন্ন, বিশ্বাসও সেইরূপ পৃথক। প্রত্যেক দেশের ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস তথাকার সাধারণ অধিবাসীদের চিন্তা ও জ্ঞানের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের সংস্কার আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যক ব্যাপারটি স্বীকার করিতে এবং স্বীকার করাইতে কার্যতঃ বহু নির্যাতন, বিপ্লব ও রক্তপাত উপস্থিত হয়; কারণ এই সমস্ত বিশ্বাসে বুদ্ধির একটু অস্পষ্ট সম্মতি থাকিলেও প্রধানতঃ এগুলি হৃদয়ের ব্যাপার। আবার হৃদয়ের ব্যাপার সবসময়েই অনেকখানি অন্ধ এবং রহস্যময়। কোনো একটা বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেলে, তাহা উৎপাটিত করা সাধারণতঃ অত্যন্ত পীড়াজনক। নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি এক প্রকার অন্ধ স্নেহ উৎপন্ন হয়। এজন্য সেরূপ বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বলা হয়। যুগে যুগে এই অন্ধবিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। এইখানেই ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ; শুধু বিজ্ঞান নয়, এখানে ধর্মের সহিত যুক্তিরও বিরোধ ঘটে। মুশকিল এইখানে যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সর্বদা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভিতর দিয়া যাইতেছে—কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের স্বাভাবিক অবস্থাই স্থিতিশীলতা। এইরূপ স্থিতিশীলতার একটি কারণ, সাধারণ লোকের নির্বিকার অনুকরণ-প্রবৃত্তি, চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা এবং জ্ঞানের স্বল্পতা। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি প্রবলতর কারণ এই যে, ধর্ম-বিশ্বাসকে সচরাচর অপৌরুষেয়ত্বের গৌরবে ভূষিত করিয়া শাস্ত্রকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে করা হয়। মানুষ তাহার অতীতকে লইয়া গৌরব করিতে চায় বলিয়া মোহে পড়িয়া পুরাতনকে সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকবার এই অপরিবর্তনীয় ধর্মবিশ্বাসও পরিবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবী গোলাকার না সমতল, আমাদের পৃথিবীটাই বিশ্বের কেন্দ্র কি না এবং সূর্য ইহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে কি না; কয়দিনে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, কতকাল পূর্বে মানুষ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; প্রভৃতি নানা বিষয়ে ধর্মবিশ্বাস বিজ্ঞানের নিকট হার মানিয়াছে। কিন্তু ইহাতে Copernicus, Bruno, Galileo, Columbus, Magelan প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষকে কিরূপ তিরস্কার ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এমন কি ইহাদের কয়েকজনকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছিল, সে ইতিহাস বড়ই হৃদয়বিদারক। এখন বাধ্য হইয়া ধর্মযাজকেরা বলিয়া থাকেন ধর্মগ্রন্থ বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য নহে। বিজ্ঞান যখন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে পারিয়াছে, ধর্ম তখন বাধ্য হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে। আবার ইউনুস নবীর কেচ্ছা; হনুমান ও সূর্যের বৃত্তান্ত; ঈসা নবীর সশরীরে চতুর্থ আকাশে অবস্থান; মাটির পাখিকে ফুঁ দিয়া প্রাণবন্ত করা; পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা; আদম নবীর পাঁজর হইতে হাওয়া বিবির সৃষ্টি; নূহ নবীর কিশ্‌তী; জলকে শরাবে পরিণত করা; শূকরের ভিতর শয়তানের প্রবেশ; সশরীরে বেহেশত-ভ্রমণ; মুসা নবীর নীল-দরিয়া বিভক্ত করা; মোহাম্মদ নবীর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা; ইয়াজুজ-মাজুজ কাহিনী; আসহাবে কাহাফের গল্প; গঙ্গাস্নানে পাপ-ক্ষয়; চাকা ঘুরাইয়া পুণ্য লাভ; বলিদানে দেবতার তুষ্টি; সীতাদেবীর জন্ম; ঈসা নবীর ক্রুশ-মৃত্যুতে ভক্তের উদ্ধার প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম-কথা ও উপকথা ইউরোপীয় এবং অন্য দেশীয় সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট অবিশ্বাস্য কাহিনী মাত্র; কিম্বা বড় জোর এগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনার রূপক বর্ণনা। বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই শেষোক্ত প্রকার ব্যাখ্যার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার আবশ্যকতা হইতেই এই সমস্ত কাহিনীর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রমাণিত হইতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম-সংস্থাপকের ইতিহাসই প্রচলিত

ধর্মবিশ্বাসের সহিত বুদ্ধি, সাধারণজ্ঞান, মুক্তদৃষ্টি এবং যুক্তির সংঘর্ষের ইতিহাস। লোক যখন প্রচলিত বিশ্বাস বা সংস্কারকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তখন সে বুঝিতে পারে না যে পূর্বতন অনেক ক্ষীণ সংস্কারকে দলিত করিয়া তাহার সংস্কার জন্মলাভ করিয়াছে। সংস্কার যতদিন বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে থাকে, ততদিন সে তাহার জীবন্ত শক্তি-প্রভাবে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সংস্কার যখন বুদ্ধি ও বিচারকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখনই তাহা কুসংস্কারে পরিণত হয়। সাধারণ লোকে ধর্মের প্রকৃত মর্ম ভুলিয়া গিয়া এই সব বাহ্য সংস্কারকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে এইগুলিই তাহাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর কার্যতঃ তাহাদের পক্ষে ঐগুলিই ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত মর্মটি কি, এইখানেই তো সমস্ত গোল। এই পার্থক্য হইতে শত সহস্র ফেরকা বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ হইতে অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত অনর্থের প্রধান কারণ এই যে ধর্ম-বিশ্বাস মূলতঃ স্থিতিশীল এবং জাগতিক ব্যাপারাদি গতিশীল। জনসাধারণ যেন জাতীয় ধর্ম-ভাণ্ডারের খাজাঞ্চী,—লাভ-লোকসানের অতীত এবং নির্বিকার। খাজাঞ্চী একেবারে যক্ষের মত ভাণ্ডার আগলাইয়া বসিয়া আছে; মুদ্রা ক্ষয় তো দূরের কথা, নূতন মুদ্রা দিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিবারও সাহস তাহাদের নাই। ইহারা মুদ্রার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে অসমর্থ বলিয়া মুদ্রা-বিনিময় করাকেও অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করে। কাজেই 'যথা পূর্বং তথা পরং' থাকাই তাহারা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করে।

প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী আপন আপন ধর্ম বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠতম এবং একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বাস্তবিক পক্ষে পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে, ধর্ম মানুষের মনের একটা মূল বৃত্তি, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই মৌলিক ধর্ম-বৃত্তি বা প্রেরণা হইতে যে দর্শন, যে থিওরী এবং যে ধর্ম-কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মনুষ্যরচিত এবং প্রত্যেক দেশের ধর্ম-বিশ্বাস সেই সেই দেশের জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। মনে রাখিতে হইবে, এই সমস্ত দর্শন, থিওরী এবং কাহিনী মুখ্য বস্তু নয়—মূল ধর্ম-প্রেরণাকে রূপ দিবার জন্যই তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। লোকে এই বহিঃপ্রকাশকেই মূল বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়া অনর্থক বিবাদ করিয়া মরিতেছে। সকলেই শরবত খাইতে চাহিতেছে। সেখানে কাহারও দ্বিমত নাই—কাঁচের গেলাসে খাইবে, না রূপার গেলাসে খাইবে, এই লইয়াই যত গোলযোগ; কিম্বা গেলাসের গায়ে কি রকম নক্সা কাটা থাকিবে, এই লইয়া বৃথা আন্দোলন। পূর্বে বলা হইয়াছে ধর্ম মানুষের মনের একটা আকুল আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব সান্ত্বনা। সুতরাং এই সান্ত্বনা যাহাতে অনুসন্ধান ও জ্ঞান-বৃদ্ধির ফলে শীঘ্র নষ্ট হইতে না পারে তাহাই করা কর্তব্য। এরূপ করিতে হইলে ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসহ হইতে হইবে। শাস্ত্র বা ধর্ম-বিশ্বাসকে অপরিবর্তনীয় মনে করিলে যে সান্ত্বনা লাভ ধর্ম-প্রবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত সংঘর্ষে (অর্থাৎ জ্ঞান বিচার ও বুদ্ধির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাসগুলির যদি একটু পরিবর্তন হয়, তবে তাহা দূষণীয় নহে, বরং সেইটিই প্রয়োজন। এরূপ পরিবর্তনে প্রকৃত ধর্মের গায়ে আঁচড় লাগে না। কাঁচের গেলাস ভাঙিয়া গেলে, রূপার গেলাসে কাজ চালাইতে দোষ কি?

শৈশব অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থা প্রাপ্তির দিকেই মানুষের স্বাভাবিক গতি। শৈশব অবস্থায় লোকে অভিভাবকের বিশ্বাস ও অভিপ্রায়ের অধীন থাকে। যৌবন অবস্থায় লোকে চোখ খুলিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে চায়। মানব-সভ্যতার শৈশব অবস্থা অন্য দেশে কাটিয়া

ধর্মবিশ্বাসের সহিত বুদ্ধি, সাধারণজ্ঞান, মুক্তদৃষ্টি এবং যুক্তির সংঘর্ষের ইতিহাস। লোক যখন প্রচলিত বিশ্বাস বা সংস্কারকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তখন সে বুঝিতে পারে না যে পূর্বতন অনেক জীর্ণ সংস্কারকে দলিত করিয়া তাহার সংস্কার জন্মলাভ করিয়াছে। সংস্কার যতদিন বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে থাকে, ততদিন সে তাহার জীবন্ত শক্তি-প্রভাবে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সংস্কার যখন বুদ্ধি ও বিচারকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখনই তাহা কুসংস্কারে পরিণত হয়। সাধারণ লোকে ধর্মের প্রকৃত মর্ম ভুলিয়া গিয়া এই সব বাহ্য সংস্কারকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে এইগুলিই তাহাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর কার্যতঃ তাহাদের পক্ষে ঐগুলিই ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত মর্মটি কি, এইখানেই তো সমস্ত গোল। এই পার্থক্য হইতে শত সহস্র ফেরকা বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ হইতে অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত অনর্থের প্রধান কারণ এই যে ধর্ম-বিশ্বাস মূলতঃ স্থিতিশীল এবং জাগতিক ব্যাপারাদি গতিশীল। জনসাধারণ যেন জাতীয় ধর্ম-ভাণ্ডারের খাজাঞ্চী,—লাভ-লোকসানের অতীত এবং নির্বিকার। খাজাঞ্চী একেবারে যক্ষের মত ভাণ্ডার আগলাইয়া বসিয়া আছে; মুদ্রা ক্ষয় তো দূরের কথা, নূতন মুদ্রা দিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিবারও সাহস তাহাদের নাই। ইহারা মুদ্রার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে অসমর্থ বলিয়া মুদ্রা-বিনিময় করাকেও অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করে। কাজেই 'যথা পূর্বং তথা পরং' থাকাই তাহারা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করে।

প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী আপন আপন ধর্ম বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠতম এবং একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বাস্তবিক পক্ষে পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে, ধর্ম মানুষের মনের একটা মূল বৃত্তি, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই মৌলিক ধর্ম-বৃত্তি বা প্রেরণা হইতে যে দর্শন, যে থিওরী এবং যে ধর্ম-কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মনুষ্যরচিত এবং প্রত্যেক দেশের ধর্ম-বিশ্বাস সেই সেই দেশের জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। মনে রাখিতে হইবে, এই সমস্ত দর্শন, থিওরী এবং কাহিনী মুখ্য বস্তু নয়—মূল ধর্ম-প্রেরণাকে রূপ দিবার জন্যই তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। লোকে এই বহিঃপ্রকাশকেই মূল বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়া অনর্থক বিবাদ করিয়া মরিতেছে। সকলেই শরবত খাইতে চাহিতেছে। সেখানে কাহারও দ্বিমত নাই—কাঁচের গেলাসে খাইবে, না রূপার গেলাসে খাইবে, এই লইয়াই যত গোলযোগ; কিম্বা গেলাসের গায়ে কি রকম নক্সা কাটা থাকিবে, এই লইয়া বৃথা আন্দোলন। পূর্বে বলা হইয়াছে ধর্ম মানুষের মনের একটা আকুল আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব সান্ত্বনা। সুতরাং এই সান্ত্বনা যাহাতে অনুসন্ধান ও জ্ঞান-বৃদ্ধির ফলে শীঘ্র নষ্ট হইতে না পারে তাহাই করা কর্তব্য। এরূপ করিতে হইলে ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসহ হইতে হইবে। শাস্ত্র বা ধর্ম-বিশ্বাসকে অপরিবর্তনীয় মনে করিলে যে সান্ত্বনা লাভ ধর্ম-প্রবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত সংঘর্ষে (অর্থাৎ জ্ঞান বিচার ও বুদ্ধির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাসগুলির যদি একটু পরিবর্তন হয়, তবে তাহা দূষণীয় নহে, বরং সেইটিই প্রয়োজন। এরূপ পরিবর্তনে প্রকৃত ধর্মের গায়ে আঁচড় লাগে না। কাঁচের গেলাস ভাঙিয়া গেলে, রূপার গেলাসে কাজ চালাইতে দোষ কি?

শৈশব অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থা প্রাপ্তির দিকেই মানুষের স্বাভাবিক গতি। শৈশব অবস্থায় লোকে অতিরিক্ত বিশ্বাস ও ভক্তিপ্রবণ থাকে। যৌবন অবস্থায় লোকে চোখ খুলিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে চায়। মানব-সভ্যতার শৈশব অবস্থা অন্য দেশে কাটিয়া

গিয়াছে, আমাদের দেশেও যাইতে বসিয়াছে। যে যুগে লোকে বিনা বিচারে ভক্তি গদগদ ভাবে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করিত সে যুগ আর নাই সে সময় লোকে আজ্ঞার বিচার না করিয়া আজ্ঞাকারীর মুখ চাহিয়াই আদেশ পালন করিত, সে যুগের অবসান হইয়াছে। বর্তমান যুগে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা প্রবল হইয়াছে। বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া, অভিমত গঠন করিয়া তদনুসারে চলাই বর্তমান যুগের আদর্শ। এজন্য ভাববাদী বা পয়গম্বরদিগের অবসান হইয়াছে বলিতে হইবে। বর্তমান যুগের যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের সুসাধ্যতার ফলে, শিক্ষা ও জ্ঞান দ্রুতগতিতে প্রসারিত হইতেছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেই লোকের মনে সতর্কতা ও সন্দেহের উদয় হয়। বর্তমান যুগের সাধারণ লোকেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে পূর্বকালের মুনি-ঋষি, পয়গম্বর, অবতার প্রভৃতির চেয়ে অধিক উন্নত। সুতরাং পূর্বকালে পয়গম্বরদিগের দ্বারা যে কাজ হইত, বর্তমান যুগে আর তাহা হইবার আশা নাই। এখন ঈসা নবী যদি সত্য সত্যই পুনরায় অবতীর্ণ হইতেন, তবে তিনি যে বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন এবং তাঁহাকে যে অধিক সংখ্যক লোক পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিত, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

পৃথিবীতে যত পয়গম্বর আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, এবং কতকগুলি সময়োপযোগী নূতন সত্য প্রচার করিয়াছেন। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব আছে, ততদিন এ কাজেরও সার্থকতা থাকিবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিবিশেষ সাক্ষাৎভাবে আল্লাহর নিকট হইতে সকলের উপকারের জন্য আদেশ বহন করিয়া আসিতেছেন, একথা বোধ হয় এ যুগের লোকে আর বিশ্বাস করিবে না। খোদা সাক্ষাৎভাবে জগদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার স্ব-রচিত নিয়মের বিরুদ্ধতা করিবেন, এ বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে লোপ পাইতেছে। এজন্য পয়গম্বরদিগের ঐশ্বরিকতা কমিয়া গিয়া, তাঁহারা প্রতিভাশালী বিরাট মনুষ্যে পরিণত হইতেছেন। হজরত মোহাম্মদ এ সত্যটি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া, নিজেকে বার বার মনুষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার পর আর কোন নবী আসিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, নবীর কাজ করিবার জন্য যুগে যুগে বহু লোকের আবির্ভাব হইবে। লোকে তাহাদিগকে নবী না বলিয়া মোজাদ্দাদ বা সংস্কারক বলিবে। হজরত মোহাম্মদ মানুষের ক্রমবিকাশের গতিও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমার অনুবর্তীদের মধ্যে এমন অনেক লোক জন্মিবে, যাহারা ইসরাইল বংশীয় নবীদের তুল্য। হযরত মোহাম্মদের এই সমস্ত উক্তি, অসামান্য প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরও সকলের ধর্ম ঠিক এক-প্রকার নয়। প্রত্যেকের শারীরিক আকৃতিতে যেরূপ বিভিন্নতা আছে, মানসিক প্রকৃতিতেও তদ্রূপ। সংসারে যত বড় ধর্ম—এক একটি আদর্শ মাত্র। প্রত্যেকে আপন মনের রঙে তাহার ধর্ম রঞ্জিত করিয়া লয়। প্রকৃত ধর্ম সামাজিক ব্যাপার নহে, উহা ব্যক্তিগত। এজন্য একটা সাধারণ ছাপমারা থাকিলেও বস্তুতঃ পৃথিবীতে যত লোক তত মন, তত ধর্ম। শুধু দীক্ষা দ্বারা ধর্ম-লাভ হয় না,—ধর্ম-লাভ করিতে হইলে চিন্তা ও সাধনা চাই। কোনো ধর্ম, লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধি অপেক্ষা নিম্ন হইলে যেমন তাহা উন্নতির বিরোধী হয়, আবার অধিক উন্নত হইলেও লোকে তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে কোনো ফলোদয় হয় না। এজন্য মিশনারী প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজে হয়তো লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ধর্ম-হিসাবে তাহার কার্যকারিতা তত অধিক নয়। শিক্ষা

ও জ্ঞানের উন্নতিই প্রচারের এক প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে লোক আপনা আপনি অধিক উন্নত ধর্ম গ্রহণ করিবে।

আমরা মানুষের মনের যে মৌলিক বৃত্তিকে 'ধর্ম' নাম দিয়াছি, যাহা শাশ্বত সনাতন, সেটি অনেকখানি ধরা ছোঁওয়ার বাহিরের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাহাকে রূপ দিবার জন্য অনেক সামাজিক নীতি ও রীতির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই নীতি ও রীতিগুলি সাক্ষাৎভাবে ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও, পরোক্ষভাবে আছে। এইখানেই ধর্ম ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে একটি কথা আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। ধর্মগ্রন্থে যাহা লেখা আছে, তাহার সমস্তই যে ধর্মকথা তাহা নহে। উহার মধ্যে কোনগুলি সমাজ-কথা তাহা বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। ধর্মের অর্থ সুবিধা বুঝিয়া একটু ব্যাপকভাবে ধরিলে হয়তো পৃথিবীর সব কিছুকেই ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের মনের সান্ত্বনা মিলিবে না, অথচ কলহও বাড়িয়া যাইবে। বস্তুতঃ যে সমস্ত খুঁটিনাটি ও সামান্য ব্যাপার লইয়া হানাফী, মোহাম্মদী, আহমদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর রেষারেষি হইতে দেখা যায়, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, সেগুলি মোটেই ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, এমন কি অনেক স্থলে সামাজিক রীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের মধ্যে যে প্রভেদ, সেটি কেবল কালচারের প্রভেদ। পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষে মানুষে যে প্রভেদ, তাহা চিরকাল থাকিবেই। এক্ষেত্রে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁহারা অনুন্নতদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যদি বলপ্রয়োগ বা অন্য উপায়ে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া উন্নত করিতে চান, তবে বড়ই নিষ্ঠুরতা হইবে—বেচারাদিগকে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ফেলিয়া নির্যাতন করা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে অনুন্নত সমাজের ভিতরে ধীরে ধীরে জ্ঞানের বীজ ছড়াইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহার ফলে উহার জ্ঞানের যতদূর উন্নতি হইবে, ইহাদের জাগতিক ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও সেই অনুপাতে উন্নতি হইবে।

সমাজের স্থিতি রক্ষার জন্য কতকগুলি শাসন ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলি যে ধর্মের খাতিরে নয়, সমাজের খাতিরেই পালনীয় একথা ভুলিলে চলিবে কেন? লোকের মনে ধর্মের নামে একটি মোহ আছে, সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মের পরিধি বাড়াইয়া সমাজবিধিকে ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই সমাজ বিধির প্রতি মোহ জন্মিয়া গেলে অনর্থক কড়াকড়ি ও জঞ্জাল বৃদ্ধি ভিন্ন কিছুই হয় না। তাহা ছাড়া, ধর্মগ্রন্থের যে অর্থ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই যে চরম এ বিশ্বাসটিও বড় মারাত্মক।

বর্তমান যুগে নূতন জ্ঞানালোকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া আমাদিগকে তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। এস্থলে, সমাজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের অন্তরায় হইলে, সেই সমাজেরই দুর্ভাগ্য। ফলতঃ মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্ম, মানুষের জন্যই সমাজ। ধর্ম এবং সমাজ যদি মানুষেরই অবাধ মুক্তির পথে কণ্টক স্বরূপ হয়, তবে তাহার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এজন্য সমাজের লোককে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু চিন্তা এবং ধর্মে লোকের ব্যক্তিগত অধিকার। এইগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলা সমাজ জীবন বা জাতীয় জীবনে ঘোর কলঙ্কের কথা। মধ্যযুগে অনেক উদারচিন্তা এবং উজ্জ্বল প্রতিভা সমাজের পরিবর্তে শোচনীয় পরিণাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে লোকে ভুল বুঝিয়া তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াছে। বর্তমান যুগে লোকে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও প্রতিভাবান পুরুষরাই স্থিতিশীল সমাজকে

প্রবল আঘাতে জাগ্রত করিয়া উন্নতির দিকে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দেন। এজন্য বর্তমান যুগে এক সঙ্গে যত অধিক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে, এবং জগৎ যেরূপ দ্রুতগতিতে স্থায়ী উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে ইতিপূর্বে ইহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। পূর্বে জ্ঞান ও ক্ষমতা জাতির শ্রেষ্ঠ দুই-চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহারাই সমগ্র সমাজটাকে টানিয়া তুলিতে চাহিতেন। বর্তমানে বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতার ফলে অবহেলিত সাধারণ লোকেরাও মোটের উপর জ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া একটু স্বাধীন আবহাওয়ার আস্বাদ পাইতেছে। একটি জাতি ভিতরের প্রেরণায় সমগ্রভাবে উন্নত হইলে তবেই তাহাকে প্রকৃত উন্নতি বলে। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ধর্ম ও সমাজের সূত্রগুলি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবে, লোকের উদারতা বৃদ্ধি পাইবে এবং ব্যক্তিত্বের সম্মানও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইবে। ব্যক্তিত্বের এই পরিপুষ্টির মধ্যেই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ নিহিত আছে।

# ধর্ম ও শিক্ষা

ধর্ম বিষয়ে আলোচনা কারো মতে নিষ্ফল, কারো মতে নিন্দনীয়। যাঁরা নিষ্ফল বলেন, তাঁদের মধ্যে একদল মনে করেন, ও-কথার যখন মীমাংসাই নাই, তখন ও-নিয়ে আর সময়-ক্ষেপণ করে কী হবে? অন্য একদল মনে করেন, ধর্ম তো মানুষের খেয়াল বা সুখের স্বপ্নমাত্র। লোকে যার যার খেয়াল নিয়ে বেশ মত্ত হয়ে আছে; অনর্থক আলোচনা করে তাদের সাধের সৌধভিত্তি টলানোর সার্থকতা কী? যাঁরা 'নিন্দনীয়' বলেন, তাঁদের ধারণা ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করলে ঈশ্বর তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণীর প্রতি অমর্যাদা করা হয়; কারণ, আলোচনা করতে করতে মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের হয়ে যেতে পারে যা সাক্ষাৎ ঈশ্বরদ্রোহ বা কুফরি কালাম; সুতরাং সকলের পক্ষে ও-বিষয় আলোচনা করা অত্যন্ত পাপের কাজ।

কিন্তু যিনি যাই বলুন, ধর্ম-প্রসঙ্গ নিষ্ফলও নয় নিন্দনীয়ও নয়। ধর্ম প্রশ্ন অত্যন্ত গভীর বা ঈশ্বরতত্ত্ব জটিল বলে এড়িয়ে চলে মানুষ কখনো মনে শান্তি অনুভব করতে পারে না। অতএব যার যেমন খুশি, সে সেই রকম ঐশ্বরিক কল্পনার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাক—এই মনে করে নিশ্চিন্ত উদাসীনতার আশ্রয় নেওয়াও চিন্তার শৈথিল্য আর অন্যের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আদান-প্রদানে অনিচ্ছার পরিচয় দেয়। তা ছাড়া প্রত্যেকেই যখন আপন বিশ্বাস ও কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী, তখন নিজের ধর্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার প্রত্যেকের অধিকার আছে; মনে কোনো সন্দেহ বা ইতস্ততের ভাব আসে, সেগুলো চেপে রাখতে চেষ্টা না করে সে সম্বন্ধে ধীরভাবে আলোচনা ও অনুসন্ধান করাই বরং পুণ্যকর্ম। আলোচনা ও অনুসন্ধান সত্য নির্ণয়ের জন্যই করা দরকার। নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করা বা অন্যের মত খণ্ডন করার জন্যই যে আলোচনা হয়, তা অসার্থক। ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করতে হলেও মোহ বা বিদ্বেষ থেকে বিমুক্ত হয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনা বা সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে, তুলনা করে বিচার করা উচিত। তাহলে যিনি ধর্মপ্রবণ, তাঁর প্রত্যয় দৃঢ় হবে, আর যিনি ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন, তিনিও বুঝবেন ধর্মবুদ্ধি অনেক মহৎ কাজের প্রেরণা যুগিয়েছে—এই সত্যটি স্মরণ করে অন্য লোকের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ কশাঘাত করবেন না।

ধর্মবিষয়ে উদারভাবে আলোচনা করা নানা কারণে বেশ কষ্টসাধ্য। আমাদের দেশে, বিশেষত মুসলমান সমাজে ধর্মের একটা গোঁড়া রূপ অনেক দিন থেকে চলে আসছে, লোকে তা নির্বিচারে মেনে চলছে এবং সেটিকেই সনাতন সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। যদি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা তুলনামূলক বিচারবুদ্ধি এসে তার বহুকালের সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করে তবে সে অভ্যাসের বশে সত্যতা বিচারবুদ্ধিকে অস্বীকার করতে চায় এবং আত্মরক্ষার জন্য পুরাতনের প্রতি অলৌকিকত্ব, অনন্ত সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি আরোপ করে। তখন এরূপ লোকের পক্ষে নতুন তথ্য ও চিন্তাকে ভয়াবহ মনে করে অসহিষ্ণু হওয়া এবং সমাজের ও-গুলো নিষ্পেষিত করতে চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। পুরাতনের সঙ্গে নতুনত্বের

এই ঘাত-প্রতিঘাতে পুরাতন সম্পূর্ণ অতীতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে না, আবার নতুনও ভবিষ্যতের স্বপ্নে সম্পূর্ণ বিভোর হয়ে থাকতে পারে না—মাঝখান থেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশমান বর্তমানের সৃষ্টি হয়।

সামনের দিকে চলতে গেলে অন্ধভাবে চললে এগুলো যাবে না—সেখানে গতিশীল বৈজ্ঞানিক উপায়ই অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য ধর্ম-ব্যাপারে ভক্তিরই প্রাধান্য; কিন্তু বিচারশক্তিকে বাদ দিলে সে ভক্তি বেশিদিন টিকতে পারে না। যে ভক্তির মূলে বিচারের নির্দেশ নেই, তা অত্যন্ত দুর্বল ও টলটলায়মান।

ধর্মের ব্যক্তিগত দিক ছাড়া একটা সমাজগত দিকও আছে, সেটা আবার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই শেষোক্ত দিকটার প্রতিই সমাজের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ধর্ম-শিক্ষার সমুদয় কেন্দ্রেই অন্তত আমাদের দেশে, এই বিধি-বিধানগুলো খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শেখানো হয়। আর সে শিক্ষা হয় বিদেশী ভাষার সাহায্যে। হিন্দুদের কাছে সংস্কৃত দেবভাষা, মুসলমানদের কাছে আরবী বেহেশতের ভাষা। এই সব ভাষায় যা কিছু লেখা থাকুক তাই পরম পবিত্র বলে মনে করা হয়, আর তাই শিখবার জন্য অল্প বয়সেই বালকদের ওপর প্রবল চাপ দেওয়া হয়। প্রথমেই কয়েক বছর পরে ব্যাকরণ মুখস্থ করান, শ্লোক বা আয়াত মুখস্থ করান—এই হচ্ছে সনাতন বিধি। ভাষাশিক্ষার যেসব উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে তা শুধু নতুনত্বের জন্যই অশ্রদ্ধেয়। সংস্কৃতে স্তোত্র-পাঠ করা আর আরবীতে নামাজ পড়াই নিয়ম। যার অর্থ বোধ হয় না যে কথার কাজে প্রাণের যোগ নেই, সেই সব কথায় ভগবানের প্রার্থনা করায় কতটা হৃদয়মনের তৃপ্তি হয় তা বুঝে ওঠা কঠিন, কিন্তু তাই চলে আসছে এবং তার সপক্ষে অনেক যুক্তির আবির্ভাব হয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের কাছে উর্দু আর পার্শীও পবিত্র ভাষা, তার কারণ, এই দুই ভাষায় আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় এবং মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে অনেক পুস্তক এই ভাষায় লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় মুসলমানি ধর্ম-কথা ও কাহিনী সম্বন্ধে বই খুব সামান্যই আছে। এটা বাঙালী মুসলমানের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার কথা। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ না হয়ে উর্দু, পার্শী বোলচালের প্রতি মোহান্ধভাবে আকৃষ্ট হওয়া এবং মনে মনে এই দুই ভাষা শ্রেষ্ঠ বলে কল্পনা করে উর্দুভাষী পশ্চিমা লোককে আশরাফ বা কুলীন বলে মেনে নেওয়া বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা। বোধ হয় এইভাবে নির্বিচারে নিজেদের ক্ষুদ্র বলে ধরে নেওয়ার চেয়ে ভীষণ দৈন্য আর কিছুই হতে পারে না। ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ের প্রতি অন্ধ অনুরাগই এই দুর্বলতা ও দৈন্যের মূলীভূত কারণ; আবার অশিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা উর্দুর মোহকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, সম্ভবত প্যান-ইসলামের স্বপ্নও এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। বাংলায় মুসলমান প্রাধান্যের আমলে দেখা যায়, মুসলমানেরা বাংলা ভাষায় চর্চা করতেন এবং অন্যকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। কিন্তু যেই তাদের ক্ষমতা অন্যের হাতে চলে গেল অমনি দুর্বলের আশ্রয় গোঁড়ামি আর প্রাচীনতা-প্রীতি তাদের অত্যধিকভাবে পেয়ে বসল। তখন আরবী, পার্শী আর উর্দু ছাড়া অন্য ভাষা 'কুফরি' ভাষা হয়ে পড়ল এবং সুযোগ্য মওলানারা ইংরেজী শিক্ষাকে হারাম বলে ফতোয়া দিলেন। বাংলাকেও পৌত্তলিক ভাষা বলে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগলেন। তার ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা তো আমরা প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। ব্রাহ্ম গিরীশবাবু প্রথমে যখন বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদ করেন, তখন 'ধর্ম গেল' 'ধর্ম গেল' বলে রব উঠেছিল। এখন পর্যন্ত কোরআনের উর্দু ও পার্শী অনুবাদ বাঙালী মুসলমানের

এই ঘাত-প্রতিঘাতে পুরাতন সম্পূর্ণ অতীতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে না, আবার নতুনও ভবিষ্যতের স্বপ্নে সম্পূর্ণ বিভোর হয়ে থাকতে পারে না—মাঝখান থেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশমান বর্তমানের সৃষ্টি হয়।

সামনের দিকে চলতে গেলে অন্ধভাবে চললে এগুলো যাবে না—সেখানে গতিশীল বৈজ্ঞানিক উপায়ই অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য ধর্ম-ব্যাপারে ভক্তিরই প্রাধান্য; কিন্তু বিচারশক্তিকে বাদ দিলে সে ভক্তি বেশিদিন টিকতে পারে না। যে ভক্তির মূলে বিচারের নির্দেশ নেই, তা অত্যন্ত দুর্বল ও টলটলায়মান।

ধর্মের ব্যক্তিগত দিক ছাড়া একটা সমাজগত দিকও আছে, সেটা আবার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই শেষোক্ত দিকটার প্রতিই সমাজের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ধর্ম-শিক্ষার সমুদয় কেন্দ্রেই অন্তত আমাদের দেশে, এই বিধি-বিধানগুলো খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শেখানো হয়। আর সে শিক্ষা হয় বিদেশী ভাষার সাহায্যে। হিন্দুদের কাছে সংস্কৃত দেবভাষা, মুসলমানদের কাছে আরবী বেহেশতের ভাষা। এই সব ভাষায় যা কিছু লেখা থাকুক তাই পরম পবিত্র বলে মনে করা হয়, আর তাই শিখবার জন্য অল্প বয়সেই বালকদের ওপর প্রবল চাপ দেওয়া হয়। প্রথমেই কয়েক বছর পরে ব্যাকরণ মুখস্থ করান, শ্লোক বা আয়াত মুখস্থ করান—এই হচ্ছে সনাতন বিধি। ভাষাশিক্ষার যেসব উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে তা শুধু নতুনত্বের জন্যই অশ্রদ্ধেয়। সংস্কৃতে স্তোত্র-পাঠ করা আর আরবীতে নামাজ পড়াই নিয়ম। যার অর্থ বোধ হয় না যে কথায় কাজে প্রাণের যোগ নেই, সেই সব কথায় ভগবানের প্রার্থনা করায় কতটা হৃদয়মনের তৃপ্তি হয় তা বুঝে ওঠা কঠিন, কিন্তু তাই চলে আসছে এবং তার সপক্ষে অনেক যুক্তির আবির্ভাব হয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের কাছে উর্দু আর পার্শীও পবিত্র ভাষা, তার কারণ, এই দুই ভাষায় আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় এবং মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে অনেক পুস্তক এই ভাষায় লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় মুসলমানি ধর্ম-কথা ও কাহিনী সম্বন্ধে বই খুব সামান্যই আছে। এটা বাঙালী মুসলমানের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার কথা। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ না হয়ে উর্দু, পার্শী বোলচালের প্রতি মোহান্ধভাবে আকৃষ্ট হওয়া এবং মনে মনে এই দুই ভাষা শ্রেষ্ঠ বলে কল্পনা করে উর্দুভাষী পশ্চিমা লোককে আশরাফ বা কুলীন বলে মেনে নেওয়া বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা। বোধ হয় এইভাবে নির্বিচারে নিজেদের ক্ষুদ্র বলে ধরে নেওয়ার চেয়ে ভীষণ দৈন্য আর কিছুই হতে পারে না। ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ের প্রতি অন্ধ অনুরাগই এই দুর্বলতা ও দৈন্যের মূলীভূত কারণ; আবার অশিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা উর্দুর মোহকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, সম্ভবত প্যান-ইসলামের স্বপ্নও এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। বাংলায় মুসলমান প্রাধান্যের আমলে দেখা যায়, মুসলমানেরা বাংলা ভাষায় চর্চা করতেন এবং অন্যকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। কিন্তু যেই তাদের ক্ষমতা অন্যের হাতে চলে গেল অমনি দুর্বলের আশ্রয় গোঁড়ামি আর প্রাচীনতা-প্রীতি তাদের অত্যধিকভাবে পেয়ে বসল। তখন আরবী, পার্শী আর উর্দু ছাড়া অন্য ভাষা 'কুফরি' ভাষা হয়ে পড়ল এবং সুযোগ্য মওলানারা ইংরেজী শিক্ষাকে হারাম বলে ফতোয়া দিলেন। বাংলাকেও পৌত্তলিক ভাষা বলে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগলেন। তার ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা তো আমরা প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। ব্রাহ্ম গিরীশবাবু প্রথমে যখন বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদ করেন, তখন 'ধর্ম গেল' 'ধর্ম গেল' বলে রব উঠেছিল। এখন পর্যন্ত কোরআনের উর্দু ও পার্শী অনুবাদ বাঙালী মুসলমানের কাছে বাংলা অনুবাদের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়; বোধ হয় যা বোঝা যায় তার

উৎসবের দিনে মানুষের মন নিজের সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে ছাড়া পেয়ে, সবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মতো অবস্থায় থাকে—মানুষ ভাবে মানুষের সঙ্গে মিলবার সুযোগ প্রত্যহ আসে না, কাজেই একে অবহেলা করে নষ্ট করা বড়ই দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। সৌন্দর্য ও রুচি বিকাশের অবলম্ব হিসেবেও উৎসবের দিন মূল্যবান। এজন্য সপ্তাহের সাধারণ দিন থেকে কয়েকটি দিন এই উদ্দেশ্যে বেছে রেখে দেওয়া মানুষের স্বাস্থ্য ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বাস্তবিকভাবে উপকারী

ধর্মশিক্ষা যাতে মানুষকে একদেশদর্শী করে না রাখে, এজন্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, সাহিত্য সবই শেখা দরকার। ধর্মই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় নয় বরং ধর্ম শিক্ষা অন্য সমুদয় শিক্ষার ভূমিকাস্বরূপ। আবার অন্যান্য শিক্ষা ধর্মের মর্যাদাহানিকর নয়, বরং তারা ধর্মের প্রকৃতি নির্দেশের সহায়স্বরূপ। ইতিহাসের সঙ্গে পুরানো কথার ভূগোল ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পৃথিবীর ধর্মোক্ত আকৃতি ও গতির ভূতত্ত্বের সঙ্গে পৃথিবীর বয়সের এবং সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মনীতির কিছু কিছু বিরোধ থাকতে পারে। এই বিরোধকে এড়িয়ে না চলে ধীরভাবে এগুলো বিচার করে দেখাই প্রকৃষ্ট উপায়। সৎ শিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাতে স্বাধীনভাবে সব বিষয় চিন্তা করে দেখার ক্ষমতা জন্মে; তাতে মানুষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় এবং মোটের ওপর সে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করে।

সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলে সমাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধান থেকে ধর্মনৈতিক বিধানগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। ফলে আমাদের শিক্ষায় অনেক প্রধান স্থানে জোর না দিয়ে বহু অপ্রধান স্থানে জোর দেওয়ায় অনেক সময় অনর্থক তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। নৈতিক শিক্ষা মূলত সামাজিক নিয়ম হলেও ধর্মের সঙ্গে সংযোগে তার গৌরব ও কার্যকারিতা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু নৈতিক শিক্ষার চেয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দিকেই বর্তমান ধর্মশিক্ষা অধিক মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে, এমন কি একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিরোধ ও অনর্থের সূত্রপাত করেছে। ধর্মের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য কোনো অনন্ত মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস করা, তার ওপর সম্পদে বিপদে নির্ভর করা, সৃষ্টির কৌশল ও সৌন্দর্যে বিস্ময় ও পুলক অনুভব করা—এসব বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। এই সমুদয়ের মূলীভূত ঐক্যের প্রতি অবহিত হয়ে বিশেষ বিশেষ ধর্মের আনুষঙ্গিক অনৈক্যকে বড় করে না দেখাই উদার শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য ছেলেবেলা থেকেই যাতে ধর্মান্ধতা বা ধর্মবিরোধ মনে জাগতে না পারে তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তা করতে হলে পরস্পরের বিষয় ভালো রকম জানার, অনুভব করার এবং সহানুভূতিসম্পন্নভাবে বিচার করার অবসর দেওয়া আবশ্যক—পরস্পরকে সন্দিগ্ধভাবে আলাদা করে রাখা নিতান্তই ভুল। এ কারণে টোল, মাদ্রাসা, হিন্দু-কলেজ, ইসলামিক-কলেজ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। সেখানে সঙ্কীর্ণতা ও অপ্রেম বিরাজ করে, পরস্পরকে বুঝবার কোনো আগ্রহ বা অবসর নেই। সেখানে কোনো বৃহৎ চিন্তা বা কর্মের সূচনা হওয়া সুদূরপরাহত। ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষে মানুষে যোগস্থাপন করা, বিরোধের সৃষ্টি করা নয়। যে শিক্ষা অন্য মানুষকে হিংসা ও ঘৃণা করতে শেখায়, তা কখনো কাম্য হতে পারে না। তাই বলে আমি ধর্মের প্রতি উদাসীন হতে বলছি না। উদারতা ও উদাসীনতার মধ্যে অনেক প্রভেদ। উদাসীনের নির্লিপ্ততার মধ্যে একটা ভয়ানক ফাঁকি নির্বিকার অচৈতন্যের ভাব আছে; উদারপন্থীর সহনশীলতার মধ্যে আছে প্রেম ও সজাগ সহানুভূতি। সুতরাং কোনো বিশেষ ধর্মে সংশ্লিষ্ট থেকেই অন্যের সঙ্গে প্রেম-সম্বন্ধ রাখা সম্ভব এবং তা যে শুধু উচিত তা নয়, সেটিই শ্রেষ্ঠ; এবং প্রকৃত ধর্মের উদ্দেশ্যই তাই।

## আর্টের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ

ধর্ম ও আর্ট এই দুইটি আমাদের পরিচিত শব্দ ; কিন্তু ইহাদের প্রকৃত লক্ষণ বা অর্থ কি, এ সম্বন্ধে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়, ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আশানুরূপ স্পষ্ট নয়।

ধর্ম বলিতে আমরা সাধারণভাবে আবাল্য অভ্যস্ত নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান, নৈতিক বিধি-বিধান, পৌরাণিক গল্প বা কিংবদন্তিতে বিশ্বাস, আল্লাহ ও পরকাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা এবং কোনও বিশিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকের প্রতি প্রচুর আস্থা ও ভক্তির সংমিশ্রণ বুঝিয়া থাকি।

কিন্তু ধর্মের দ্বারা জীবনের কতটুকু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, জীবনেরই বা উদ্দেশ্য কি, ধর্মের সীমা কতদূর, ধর্মের কোন অঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত, এ সমস্ত বিষয় সাধারণ লোকে বিচারই করে না ; আবার বিশিষ্ট লোকদের ভিতরেও অনেক মতভেদ দেখা যায়। সে যাহা হউক, আমরা সচরাচর বিশ্বাস করি, কোনো বিশিষ্ট যুগে কতকগুলি বিশিষ্ট ভাবধারা অবলম্বন করিয়া সমাজ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়। এই বিশিষ্ট ভাবধারা অনেকের মনেই অস্পষ্টভাবে উদিত হয়, কিন্তু একজনের ভিতরে ইহার সম্যক উপলব্ধি জন্মে। এইরূপ একজনই সে যুগের মহাপুরুষরূপে বরিত হইয়া থাকেন। সমগ্র সমাজ জানতঃই হউক বা অজ্ঞাতেই হউক এই ভাবধারা অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ স্পষ্টতর অনুভূতিতে উপনীত হইয়া থাকে।

এই ভাবধারার মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য, সৃষ্টিকর্তার সহিত আমাদের সম্বন্ধ, প্রভৃতি চিরন্তন জিজ্ঞাসার যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ উত্তরের বীজ নিহিত থাকে। তবু এইখানেই ধর্মের সহিত আর্টের বিরোধ বাধে। আর্ট ধর্মের ভাবধারাকে সামাজিক অনুষ্ঠান, কিংবদন্তি, স্থাপত্য, চিত্রকলা, কবিতা, মহাকাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা বাঁধিয়া পরম যত্নে লালন করিতে থাকে, সুতরাং স্বভাবতঃই এই সমস্তের প্রতি লোকের মমতা জন্মিয়া যায়। এমন কি এগুলিকেই সাধারণ লোকে ধর্মের অপরিহার্য সারাংশ বলিয়া ভ্রম করে। ঠিক এই কারণেই প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তককে ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া পূর্বতন ভাবধারা হইতে উৎপন্ন আর্টরূপে সমাদৃত বহু অনুষ্ঠান বা প্রতীকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এই যুদ্ধে একবার ধর্মের জয় হইয়াছে, আবার স্থিতিশীল আর্টের জয়জয়কার উঠিয়াছে। এই বিরোধের ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে বিভিন্ন যুগের কয়েকটি ভাবধারার কথা উল্লেখ করিতে হয়, এবং উৎকৃষ্ট আর্ট বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়।

কেহ বলেন বর্ণনীয় বিষয় ভাল হইলেই উৎকৃষ্ট আর্ট হইবে, কাহারও মতে আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি, আবার অনেকে বলেন বস্তুতঃ যাহা ঘটে তাহার যথাযথ বা নিখুঁত বর্ণনাই আর্টের শ্রেষ্ঠ উপাদান—বর্ণনীয় বিষয় উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হউক, সুন্দর বা অসুন্দর হউক, সমাজের উপর তাহার প্রভাব কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হউক, কিছুতেই কিছু আসে যায় না। এ স্থলে মনীষী টলস্টয়ের অভিমত খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন,

বিষয়বস্তু সুন্দর হইলেই যে আর্ট উৎকৃষ্ট হইবে তাহা নহে; কারণ উৎকৃষ্ট বিষয়ও এরূপ নীরস ও কৃত্রিম উপায়ে প্রকাশ করা যায় যে তাহা লোকের নিকট হেয় বলিয়া অবজ্ঞাত হইতে পারে। আর্টকে শুধু 'সৌন্দর্যসৃষ্টি' বলিলে, ইহা বিচার করিবার কোনো সর্বসম্মত আদর্শ পাওয়া যায় না; কারণ, সৌন্দর্য কি, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। সৌন্দর্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত ইহা একান্ত অনির্দিষ্ট সুখ বা ব্যক্তিগত আনন্দের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়নির্বিশেষে নির্ভুলভাবে স্বভাব বর্ণনা করাও আর্টের আদর্শ হইতে পারে না। আর্ট নূতন সৃষ্টি—পরিচিত বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা নহে; এরূপ বর্ণনা দ্বারা অপ্রধান বস্তুকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া আর্ট যখন মানুষেরই সৃষ্টি তখন মানুষের প্রয়োজন বা কল্যাণ-নিরপেক্ষভাবে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (art for art's sake) নিতান্তই অসঙ্গত কথা। টলস্টয়ের মতে আর্ট স্রষ্টার মনের বিপুল ভাবাবেগ অন্যের মনে সঞ্চারিত করিবার উপায়। চিত্র, বাক্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য প্রভৃতি নানা উপায়ে এই ভাবের সঞ্চার হয়। আর্ট সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার মনে কোনো নূতন সত্যের প্রবল অনুভূতির সঙ্গে তাহার প্রকাশ-ব্যাকুলতা ও প্রকাশ-ক্ষমতা দুই-ই থাকা আবশ্যক। আর্ট অকৃত্রিম হইলেই অন্যের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে। আর্ট চিন্তাসূত্র নয়, যে যুক্তির উপর যুক্তি গাঁথিয়া ইহার ইমারত খাড়া হইবে; হৃদয়ের, প্রবল অনুভূতি বলিয়া, ইহা ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে। এই জন্য সার্বজনীনতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আর্টের একটি বড় পরীক্ষা। উৎকৃষ্ট আর্ট সার্বজনীন,—এজন্য ইহা কল্যাণময় ও নীতিসম্মত; ইহার প্রকাশ সহজ ও সরল—এজন্য ইহা সুন্দর; আর ইহা হৃদয়ের অনুভূতি হইতে উদ্ভূত,—এজন্য ইহা সত্য। উৎকৃষ্ট আর্ট সম্বন্ধে একটি বড় কথা এই যে, স্রষ্টার মনের ভাব যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবধারার নির্দেশানুযায়ী হইবে, অন্যথায় ইহা আর্ট হইলেও অপকৃষ্ট ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ ভাবধারা হইতেছে—মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধের ক্রমিক বিকাশ। এরূপ স্থলে যুদ্ধবিগ্রহের বা অন্য দেশীয়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার গ্রাস করিবার, ধর্মান্ধতার, বা স্বধর্মের বিরুদ্ধবাদীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাৎ প্রার্থনা করার আদর্শে অনুপ্রাণিত আর্ট নিন্দার্হ।

ভাবধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক যুগের স্বীকৃত আর্ট অন্য যুগে অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। যে শ্রেষ্ঠ ভাবধারাকে আমরা যুগের ধর্ম বলিয়াছি তাহার অনুবর্তী বা পরিপন্থী ভাবকে আমরা ভাল বা মন্দ বলিয়া থাকি। ইহুদি জাতির মধ্যে এক জেহোভার বিশ্বাস এবং যে সমস্ত কার্য তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া স্থিরীকৃত ছিল সেগুলি যথাযথ পালন করাই শ্রেষ্ঠ ভাবধারা ছিল। অনেকেশ্বরবাদীদের সহিত বিরোধ, প্রতিমাদি ধ্বংস করা প্রভৃতি প্রশংসনীয় কার্য ছিল। আবার লোকে একটু ক্ষমতাশালী হইলে স্বভাবতঃই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে আস্থাহীন হইয়া পড়ে। অনেকস্থানে ইহার কারণ এই যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস যুগের প্রকৃত বা শ্রেষ্ঠ ভাবধারার শুধু আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ বা বিকৃত ধারণা মাত্রে পর্যবসিত হয়। অনেক সময় এই সব ক্ষমতাশালী লোক প্রকৃত ভাবধারা বুঝিতে অক্ষম; অথচ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের অসারতা তাহাদের চক্ষে সুস্পষ্ট। কাজে কাজেই কোনো ভাবধারার প্রতিই ইহাদের বিশ্বাস থাকে না। সুতরাং সৌন্দর্য—অন্য কিছুতেই বিশ্বাস না থাকিলে ভালমন্দের কোনো মাপকাঠি থাকে না। সুতরাং সৌন্দর্য—অন্য কথায় আরামপ্রিয়তা—তাহাদের আর্টের মাপকাঠি হয়। এইভাবে আর্ট আবার গ্রীকদের সৌন্দর্যপরায়ণতার আদর্শের দিকে ধাবিত হয়। এই সময় আর্ট দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়;

নিম্নশ্রেণীর জন্য কৃত্রিম বা decadent art, আর সমৃদ্ধ শ্রেণীর জন্য সৌন্দর্যপ্রীতির আর্ট বা aesthetic art,--এইভাবে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আর্টের রূপ বদলাইতে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে, এমন কি পৃথিবীর সর্বত্র, এই সব মিথ্যা ও শ্রেণীমূলক আর্ট প্রাধান্য লাভ করিয়া সম্মানিত হইতেছে। তাহার ফলে আর্টে সরলতা ও সার্বজনীন ভাবসঞ্চারণ-ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। হৃদয়ের গভীর উৎস হইতে নির্গত না হওয়ায় ও জীবনের সংশ্রবশূন্য হওয়ায়, বিষয়বস্তুর অভাব ঘটিয়াছে; আর কৃত্রিম বাক্য-বিন্যাসের বাহাদুরী দ্বারা সে অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা হওয়াতে আর্ট দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এইরূপ দুর্বোধ্যতাকে দোষ বলিয়া না ধরিয়া বরং অতীন্দ্রিয়তা নামক একটি শব্দ দ্বারা তাহার গৌরব ঘোষণা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

# ধর্মের বাহ্যরূপ ও আদর্শ রূপ

ধর্মমাত্রই কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক ধর্মের সহিত অন্য ধর্মের কিছু না কিছু আদর্শগত পার্থক্য আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই পার্থক্যের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য, আবার কোথায়ও বা প্রচুর। মানুষের জীবন-যাপনের প্রণালী বা জাতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য হইতেই এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। স্থান-কাল ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বাহ্য আকৃতির ন্যায় মানসিক প্রকৃতিও স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্তিত হয়। অতএব এই প্রভেদ বা বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া লওয়াই সঙ্গত।

কিন্তু পার্থক্য যতই থাকুক, ধর্মে ধর্মে সামঞ্জস্য তার চেয়ে অনেক অধিক। প্রায় সকল ধর্মেই মানুষের সহিত সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার এবং মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহারবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কোনও ধর্মবিধিই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না—যত প্রভেদ, সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি লইয়া। সমাজগত ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও চিন্তাধারার উপর এই প্রভেদ নির্ভর করে। ইহুদীয়, খ্রীস্টীয় ও মোহাম্মদীয় ধর্মের মধ্যে হয়ত মূলতঃ কোনও প্রভেদ ছিল না—কিন্তু কালক্রমে, মানুষের সংস্কার-আচ্ছন্ন স্থিতিশীলতার জন্য একই ইসলাম ধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকারভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তথাপি দেখা যায়, নিরাকার সগুণ একেশ্বরবাদের দিকেই ইহাদের সমগ্র গতি। আবার ভারতীয় ধর্মসমূহের সাধারণ লক্ষণের মধ্যে বৈদান্তিক একমেবাদ্বিতীয়ম নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত, বৈদিক ও পৌরাণিক নানাবিধ রূপকল্পনার সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। একই অক্ষয় ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি কল্পনার দিকে এত অধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে যে, মনে হয় ব্রহ্মই যেন শতধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতের নিভৃত মানসপটে কি ভাবের উদয় হয় বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে যে খণ্ড-দেবতা প্রবল হইয়া অপর খণ্ডের উপর প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, ইহা শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয় প্রকৃতি ব্রহ্মকে বিভিন্ন করিয়া দেখিবার পথে কোনও প্রকার বাধা অনুভব করে নাই, পক্ষান্তরে ইসলামীয় প্রকৃতি বিশ্বসংসারে ব্রহ্মের নিদর্শন দেখিয়াছে, কিন্তু সর্বদা মনে রাখিয়াছে, এই নিদর্শন ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্মের প্রকাশও নহে, ব্রহ্মের বিবিধ সৃষ্টি ও লীলা-কৌশল মাত্র। ইসলাম ব্রহ্মকে সমগ্রচ্যুত করিয়া আংশিকভাবে পরখ করা বিপজ্জনক মনে করিয়াছে। আমার মনে হয়, সেমেটীয় ও ভারতীয় প্রকৃতির মধ্যেই এই পার্থক্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে—এবং ইসলামীয় কৃষ্টি যে ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে বেমালুম মিশিয়া যায় নাই বা ভারতীয় কৃষ্টি যে আপন বৈচিত্র্যের মধ্যে ইসলামকে আত্মস্থ করিয়া লইতে পারে নাই তাহারও কারণ এইখানে।

ভারতীয় প্রকৃতি "যত মত তত পথ" স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহাতে নির্বাচনের কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কারণ যে কোনও পথে চলিলে একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যায়। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে গন্তব্য-পথ বাছাই করিয়া লওয়ার মূল্য কম নহে। জ্ঞান পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ

ধর্মের আদর্শ-রূপ সার্বজনীন, সমাজ-বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে, কিন্তু উহার সামাজিক রূপ বা বাহ্যরূপ নানা আকস্মিক বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া হয়ত গুরুতর রকমের সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন ধর্ম যদি সার্বভৌমিকতার দাবী করে, তবে তাহা উহার অন্তর্নিহিত আদর্শের বলেই করিতে পারে। সেই আদর্শ সর্বদেশের সকলের গ্রহণযোগ্য হইলেই উহাকে সার্বভৌমিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন ধর্মেরই সামাজিক রূপ সমগ্রভাবে সকলের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে কিনা, ইহা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়। আমরা ধর্ম হিসাবে লোকের শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকি, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে হিন্দু সমাজের সকলে হিন্দু নহে, আবার মুসলমান সমাজের সকলেই মুসলমান নহে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, আদর্শগত ভাবে ধরিতে গেলে, কোন ধর্মের আদর্শ যে কতখানি অবলম্বন করিতে পারিয়াছে, সে সেই পরিমাণে ঐ ধর্মের অন্তর্বর্তী। এই আদর্শ অনেক সময় বাহ্য প্রকাশসাপেক্ষ নয় বলিয়া আমরা মানুষের অন্তর্বৃত্তির লক্ষণ দেখিয়া তাহার ধর্ম নির্ণয় করিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য সমাজস্থ বহুলোকে যে ইসলামের আদর্শ কতক পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অতএব সেই পরিমাণে তাহারা আদর্শগতভাবে ইসলাম-পন্থী। কোন মহান আদর্শ সমাজবিশেষে বদ্ধ হইয়া থাকিবার বস্তু নয়—ইহার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা সর্বস্তরের লোকের মনে কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। মূলকথা মহান আদর্শের লক্ষণ হইতেছে এই যে ইহা সমাজ, জাতি ও ব্যক্তি-নির্বিশেষে ইহার প্রভাব বিস্তার করে। এই সমগ্র প্রভাব দ্বারাই আদর্শের যথার্থ পরিমাপ পাওয়া যায়। কোন সমাজে কতকগুলি লোক বাহ্যতঃ একটি ধর্ম আশ্রয় করিয়াছে উহা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত পরিমাপক নহে।

ধর্মের প্রতি যাহাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, সম্যকভাবে সেই ধর্মের আদর্শ অবলম্বন করা তাহাদের কর্তব্য। নতুবা শুধু সংখ্যার দ্বারা ধর্মের গৌরব রক্ষা করা যায় না। মুসলমানের দ্বারা যাহাতে ইসলামের গৌরব ক্ষুণ্ন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সেইরূপ হিন্দুসমাজস্থ কাহারও দ্বারা যাহাতে হিন্দুত্বের অপমান না হয় সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মকর্মের ভিতরে যে আদর্শ রহিয়াছে তাহা অনুভব করিতে হইবে ধর্মগ্রন্থে যে "সালাতের" কথা উল্লিখিত আছে, তাহা যথার্থভাবে সম্পাদিত হইতেছে না। "সালাত" যদি শুদ্ধ হইত তবে নামাজীর চরিত্র হইতে অসারতার ভাব বিদূরিত হইত, ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিত এবং তাঁহার নির্দেশের অবাধ্য হইবার প্রবৃত্তি থাকিত না। ইসলাম ধর্ম হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল, কিন্তু এ কথা সকল ধর্ম সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। আসল কথা, মানুষে মানুষে মনুষ্যত্বের যে পার্থক্য তাহাই প্রকৃত পার্থক্য। মনুষ্যত্বের সাধনাই প্রকৃত ধর্ম। আমরা অন্যবিধ সুবিধার জন্য মানুষকে সমাজ হিসাবে ভাগ করিয়া দেখি, উহা কার্য-সৌকর্যের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলেও এরূপ শ্রেণীবিভাগের সহিত আদর্শের যোগাযোগ নাই। আল্লাহর কাছে আমরা সামাজিক হিসাবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ কিছুই নহি—সকলেই মনুষ্যনামা, সৎ অথবা অসৎ, পুণ্যবান অথবা পাপী।

# নাস্তিকের ধর্ম

ধর্ম মানুষের বিপদে আশ্রয়, শোকে সান্ত্বনা, এবং সম্পদে আত্মবিকাশের প্রধান উপায়। মানুষ দুর্বল ব'লে স্বভাবতঃই বিপদকালে অসীম ক্ষমতাশালী কারো কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করে। দারুণ শোকে নিজেকে এই ব'লে প্রবোধ দেয় যে হয়ত এর ভিতরে এমন কোনো গূঢ় মঙ্গল-উদ্দেশ্য আছে যা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিশক্তির অতীত। সম্পদের সময় তার মন অন্যের দুঃখে বিগলিত হয়, এবং সেই সহানুভূতির সূত্রে হৃদয়ের সহিত হৃদয় যুক্ত হ'য়ে মানুষের আত্মিক বিকাশ হয়। সুতরাং ধর্মভাব ব্যক্তির পক্ষে যেমন স্বাভাবিক সমাজের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজনীয়।

নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ধর্ম-ভাবে মনোহারিত্ব ফুটে ওঠে। মনে যে সব ধর্ম-ভাব স্বভাবতঃই উদিত হয়, অনুষ্ঠানই তার কায়াস্বরূপ। প্রত্যেকের মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ভাব অন্যের থেকে কিছু না কিছু স্বতন্ত্র। এ জন্য ঠিক যে অনুষ্ঠানটি একজনের ধর্মভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ হ'তে পারে অন্যের পক্ষে সেটা আংশিক বা সম্পূর্ণ-প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র। তবু এক এক জন বিরাট মানুষের আদর্শকে সামনে রেখে লোকে সর্বদা চেষ্টা করে, যাতে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি ক্রমান্বয়ে উক্ত আদর্শের খাতে প্রবাহিত হয়। এর সুবিধা এই যে একটা ভাল আদর্শ চোখের সামনে পাওয়া যায়। কিন্তু অসুবিধা এই যে, যা নিজের পক্ষে স্বাভাবিক নয় তাকে স্বাভাবিক ব'লে বিশ্বাস করবার বা প্রচার করবার প্রবৃত্তি জন্মে। এর ফলে নিজের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাকে অবহেলা করতে করতে আত্ম-শক্তি ও আত্ম-চরিত্রে অবিশ্বাস জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-নিগ্রহের আদর্শ প্রবল হয়ে জীবনে সরসতার স্থলে কৃত্রিমতার সঞ্চার হয়। যাদের আত্ম-প্রত্যয় বিরাট পুরুষের আদর্শের চাপে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যায় নি, সংসারে তারাই জীবন্ত ও শক্তিমান লোক। কিন্তু লোকে তাঁদের ক্ষমা করে না। যত বড় বড় মহাপুরুষ, ধর্মপ্রচারক, নূতন বাণী প্রচার করে গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই তৎকালীন জনসাধারণের কাছে অশেষ প্রকারের লাঞ্ছিত হয়েছেন। জনসাধারণ সমস্ত নূতন 'আইডিয়া' বা ভাবকেই অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে। এটা একদিক দিয়ে মন্দ নয়। লোকের এই দ্বিধা ও সন্দেহ-জনিত অত্যাচারে নূতন ভাব বা সত্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়। তাতে নূতন সত্যের দ্যুতি যেমন শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নূতন মিথ্যারও তেমনি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। নূতন-পুরাতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজে হঠাৎ কোনো আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত না হয়ে, অধিকাংশ সময় সহনযোগ্য দ্রুততা বা মৃদুতার সহিত পরিবর্তন ঘটে।

মহাপুরুষেরা সকলেই নূতন নূতন সত্য প্রচার করে গেছেন, বা পুরাতন সত্যকেই নূতন দৃষ্টিতে দেখে গেছেন। যে সত্যকে কোটি কোটি লোকে কতকাল ধরে একভাবে বুঝে এসেছেন, মহাপুরুষের প্রতিভা তারই আরেকটি রূপ (হয়ত সুন্দরতর বা পরিপূর্ণতর রূপ), লোকের সামনে তুলে ধরে। লোকে প্রথম প্রথম তার প্রখরতা সহ্য করতে পারে না, কিন্তু

ক্রমান্বয়ে, হয়ত কয়েক শতাব্দী পরে— তার সততা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এইরূপে মহাপুরুষদের প্রচণ্ড ধাক্কায় জনসাধারণ অল্পে অল্পে অগ্রসর হয়। যুগ-যুগ ধরে সর্ববিধ ধারণার ক্রমিক পরিবর্তন হচ্ছে, ধর্ম-বিষয়ে ধারণাও যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, তা' অধুনা-প্রচলিত ধর্মমতের লিষ্ট দেখলেই বোঝা যায়।

বোধ হয় আদিম মানুষ সহজ সরল বিশ্বাসে তাঁর দেবতার সান্নিধ্য বেশী করে অনুভব করতেন। পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে তাঁর জাগ্রত দেবতা ছিল। দেবতা রাখাল ভক্তের গামছা পেতে বসে কত মধুর আলাপ করতেন, গুরুতর জাতীয় সমস্যার সময় পাহাড় বা আকাশ থেকে দৈববাণী করতেন, কখনও বা স্বয়ং মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে অসুর-দলন করতেন, ভক্তকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলে সে অগ্নিকে কুসুম-শয্যায় পরিণত করতেন, এবং ভক্তের অনুরোধে অনায়াসে মৃতকে জীবন, অন্ধকে চক্ষু, তোতলাকে স্পষ্ট বাক্‌শক্তি দান করতেন। বিশ্বাসের বলে পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করতো, আর শত নির্যাতন-নিষ্পেষণের পরীক্ষা অতিক্রম করেও পরিণামে ধর্মের অবধারিত জয় হ'ত।

কিন্তু লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করলো। জীবনের দুঃখ-দৈন্য, অসম্পূর্ণতা, রোগ-শোক, দেখে তারা দেবতাকে ভগবান বা করুণা-নিধান পূর্ণব্রহ্ম বলে স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কেউ শোকে দেবতাকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করলো, কেউ বা ঐশ্বর্য-গর্বে স্ফীত হ'য়ে দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য আকাশে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। কেউ দেবতার অস্তিত্বেই অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, কেউ বা নিজেকেই খোদা বলে প্রচার করতে লাগলো। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে পরম নির্ভরশীলতার সহিত সৃষ্টিকর্তাকে মঙ্গলময়-রূপেই ভাবতে চায়, এমনকি তার জাজ্জ্বল্যমান নিষ্ঠুর রূপের সম্মুখীন হয়েও সংসারকে মায়াময় মনে করে নিজের অসহ্য দুঃখেও তাঁর মঙ্গল-হস্ত দেখতে ভালবাসে, তাতে আর সন্দেহ নাই। দুঃখ-চিন্তাকে ভুলে থাকাই নিরুপায় দুঃখীর উৎকৃষ্ট পন্থা। তাই সান্ত্বনার জন্য নানারূপ কাল্পনিক মোহে নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী বলে বসলো, ঈশ্বর মানুষের মনের সৃষ্টি, কল্পনার কারসাজি। অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর জড় প্রকৃতিই অন্তর্নিহিত গুণবলে নির্দিষ্ট নিয়মে আপনাকে আপনি বিকশিত করতে করতে এই বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। এর জওয়াব কেউ দিতে পারলো না। তর্ক করতে করতে এই পাওয়া গেল, আস্তিক যাকে সৃষ্টিকর্তা বলছেন নাস্তিক তাকেই নামান্তরে প্রকৃতি বলছেন। এমন কি যাঁরা বলছেন বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ভগবান প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন, প্রত্যেক বস্তুই সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ, তাঁরাও তর্কশাস্ত্রের দুই এক পদ এদিক ওদিক করে ঐ একই কথা বলছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে এঁরা ভগবানকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁকে চিন্ময় পরিচালক রূপে কল্পনা করছেন, আর প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক বলছেন জড়প্রকৃতির ভিতরই চিন্ময়ত্ব আছে, জড় ও চিৎ একই বস্তুর দুই অচ্ছেদ্য রূপ, জড়কে চালিত করবার জন্য জড়াতীত স্বতন্ত্র চিৎ-পদার্থের বা চিন্ময় পুরুষের কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য যাঁরা শোকের বশে বা মদ-গর্বে ঈশ্বরকে নিন্দা-অভিশাপ বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সুতরাং এঁদের কথা আমাদের আলোচনার বাইরে রাখলেও কোনো দোষ নাই।

সংসার হিতে-অহিতে ভালয়-মন্দয় মিশানো। তাই কেউ কেউ শিষ্ট ঈশ্বর ও দুষ্ট ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কল্পনা করেছেন। প্রকৃতিবাদী বলেন, ঈশ্বর বা প্রকৃতি, নিরপেক্ষ নিয়ম অনুসারে কাজ

করছে। প্রকৃতিবাদীর কাছে এই সব সোপানই সপ্ত স্বর্গ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আস্তিকের স্বর্গ-নরকের ন্যায়, বিবর্তন-সোপানের উঁচু নীচু ধাপগুলিই প্রকৃতিবাদীর সদসৎ কর্মের নিয়ন্ত্রক। আস্তিক যেমন আত্মাকে অবিনাশী মনে করে, প্রকৃতিবাদীও তেমনি এক অখণ্ড মানবতায় বিশ্বাসী। এঁর মতে, মানুষ যার যার সঙ্গে কর্ম-সূত্রে একত্র হয়, যার যার মধ্যে নিজের ভাব ও স্বভাব সঞ্চারিত করে দেয়, তাদের ভিতর দিয়ে সে চিরকাল বেঁচে থাকে। সন্তান, শিষ্য, পারিষদ এরা সবাই মিলে লোকের ব্যক্তিত্বকে বহন করে তাকে চিরজীবী করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আস্তিক ও প্রকৃতিবাদী উভয়ের মধ্যে কর্মপ্রেরণায় বা ধর্মভাবে কোনো সত্যিকার পার্থক্য নাই। যদি বলা যায় এদের ভিতর একই মূলগত জিনিসের শুধু নামগত পার্থক্য, তা হলে হয়ত বেশী ভুল বলা হয় না। তবে উভয়ে সৃষ্টিস্তরের বিভিন্ন সোপানের লোক। সাধারণ আস্তিকের আশা ও ভয়ের চেয়ে প্রকৃতিবাদীর কর্মপ্রেরণা সূক্ষ্মতর। একজন প্রাথমিক ভক্তিযোগের লোক আর একজন বিচার ও চিন্তাজগতের লোক। কিন্তু তাই বলে যে কাব্যময়তা এবং লোকোত্তর রহস্যময়তার ভাব ধর্মের প্রাণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিকের বিচার ও চিন্তার বুননে তা বিলুপ্ত তো হয়ই নি, বরং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হ'য়ে আরো ছড়িয়ে পড়েছে। পক্ষপুট-বিশিষ্ট বা শিঙ্গাধারী স্বর্গীয় দূতের কল্পনা, বা সগুণ ব্রহ্মের কোটি কোটি দেবরূপের কল্পনার পাশে, বিশ্বব্যাপী ইথারের অনন্ত ঘূর্ণনবৈচিত্র্যের দ্বারা শক্তির জড়রূপ ও অধ্যাত্মরূপ প্রকাশের কল্পনাকে কাব্যের দিক দিয়েই হোক আর রহস্যময়তার দিক দিয়েই হোক, সগৌরবে দাঁড় করান যেতে পারে। সুতরাং কল্পনার দিক দিয়ে, অনেকে বিজ্ঞানের আবির্ভাবে ধর্মের শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা করেন, তা' অমূলক।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আলোচনা শেষ করব। স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সংসারে এত পাপাচরণ কেন, এটি বাস্তবিকই বড় আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ লোকই মুখে বিশ্বাস করে, হৃদয়ে করে না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধনের যেমন প্রকৃত কদর হয় না, বিশ্বাসেরও তাই। আপন চেষ্টার দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা আয়ত্ত না করলে কোনো জিনিসই আমাদের নিজস্ব হয় না। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ লোকই অন্যের চোখে দেখে, অন্যের বুদ্ধিতে ভাবে, অন্যের অনুভূতির স্পন্দনকে নিজের অনুভূতি ব'লে ভুল করে। জাগ্রতভাবে, নিজের জীবনের উপর প্রভু হয়ে, বেঁচে থাকার চেয়ে গড্ডলিকা-স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া ঢের বেশী সহজ ও নিরাপদ। সুতরাং চোখ বুঁজে, না ভেবে চলাই সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। দুই একটা বুলি আউড়িয়েই তারা মনে করে, বিশ্বাস করেছি। এই আত্মবঞ্চনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে আত্মদৃষ্টি ও আত্ম-বিচার হারিয়ে ফেলে। কোনো বৃহৎ ভাব বা কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে চলবার সবচেয়ে বড় উপায়, তাকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নিয়ে সব পেয়েছি ভেবে তাকে মনের কোণ থেকে সরিয়ে রাখা। ঠিক এই পদ্ধতিতেই জগতের অনেক উচ্চ আদর্শ, নীতি-বাক্য, ধর্ম-কথা, কাব্য, কাহিনী, আর্ট, সব অভ্যস্ত হ'য়ে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় সকলের ভিতর অবিরাম চেতনা সঞ্চারিত করে রাখবার জন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিমান পুরুষের চেষ্টা। সজ্ঞানে পথ বুঝে বা পথ খুঁজে চলবার সময় এঁরা বারবার ভুল করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, শোধরানোর সম্ভাবনা থাকলে এই ভুলের ভিতর দিয়েই আছে।

# কোরানের মোমেন, আল্লাহ্ ও কাফের

## (ক) সমসাময়িক অবস্থা

হজরত মোহম্মদ যে সময় ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করিলেন, সে সময় আরবে ও তন্নিকটবর্তী স্থানে পৌত্তলিক অধিবাসীগণ ছাড়া ইহুদী ও খ্রিস্টানগণেরও বসতি ছিল। এছাড়া সাবেয়ী সম্প্রদায় নামে আর একটি সম্প্রদায়ের নামও কোরানে উল্লিখিত আছে। হেজাজ প্রদেশের আরবেরা বোধ হয় সভ্যতা, ভব্যতার ও ভাষার পারিপাট্যে অন্যদের চেয়ে অধিক উন্নত ছিল ; এজন্য তারা বহিঃস্থ ও যাযাবর আরবগণকে তুচ্ছার্থে আজমী বলে অভিহিত করতো। বাঙালীর মধ্যে যেমন বাঙ্গাল, আরবীর মধ্যে তেমনি আজমী ছিল। কৃষিকার্য্যে পশুপালন ও স্থল বাণিজ্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায় ছিল ; তবে কোরানে নৌকা বা জলপোতেরও উল্লেখ আছে, এজন্য জল-বাণিজ্যও কিছু কিছু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। যাহোক আরবদের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর থাকলেও তাদের ব্যবসায় বুদ্ধি পাকা রকমেরই ছিল। কারণ কোরানে ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক কথাই আছে। মক্কা নগরী ব্যবসায়ের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। সমাজে লোকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতো। গোষ্ঠীভুক্ত লোকের সম্বন্ধে যাই হোক, অন্য গোষ্ঠীর লোকের ধনসামগ্রী সুবিধামত লুট করা মোটেই অন্যায় বলে মনে করা হতো না। সমাজে মদ্যপান, কন্যা হত্যা, বহুবিবাহ, ক্রীতদাস প্রথা, এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বংশানুক্রমিক যুদ্ধবিগ্রহ অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। মক্কার কাবা-মন্দিরেই ৩৬০টি বিগ্রহ ছিল, প্রতিদিন এক একটির পূজা করতে করতে সম্বৎসরে সবগুলির পূজা সমাপ্ত হতো। খ্রিস্টানেরা হজরত ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর বলে মনে করতো, আর ত্রিত্ববাদেও বিশ্বাস করতো। ইহুদীরা বিদ্বান হলেও সাধারণতঃ কপট স্বভাব ছিল। ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা সত্যপ্রীতির চেয়ে পার্থিব সুখ-সম্পদকেই অধিক ভালবাসতো। মোটের উপর, গতানুগতিকভাবে লোকের দিনগুলি বেশ একরকম নির্ভাবনায় কেটে যাচ্ছিল।

এমন সময় মক্কার মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদ প্রচার করলেন, "আমি আল্লাহর কাছ থেকে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছি : প্রতিমা মিথ্যা, হজরত ঈসা রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ ছিলেন, আর পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থ বাইবেল ও তওরাতে লোকে ইচ্ছামত অনেক বাজে জিনিষ ঢুকিয়ে তার পবিত্রতা নষ্ট করে ফেলেছে।" তিনি বললেন, "একমেবাদ্বিতীয়ম আল্লাহই সমস্ত সৃষ্টি করেছেন, অতএব সমস্ত অর্চনা তাঁরই প্রাপ্য; তিনি একদিকে যেমন করুণাময়, ক্ষমাশীল বন্ধু, অন্যদিকে তেমনি নিখুঁত হিসাবী ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক। তিনি পুণ্যবানের সুকৃতির যেমন মহান পুরস্কার দিবেন, সত্য অগ্রাহ্যকারী পাপীকে তেমনি কঠোর দুঃখজনক শাস্তি দিবেন। আমি লোককে সাবধান করে দেবার জন্য এবং প্রকৃত ধর্মপথ শিক্ষা দেবার জন্য আল্লাহর দ্বারা প্রেরিত হয়েছি। অতএব আমার অনুবর্তী হও।"

একথায় অল্প কয়েকজন অনুচর ছাড়া সকলেই বিরক্ত হলো। আরবেরা বলতে লাগলো, আমাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ কেমন করে আল্লাহর বিশেষ কৃপার পাত্র হল ? আর বাপ-দাদার আমল থেকে যেসব পূজা-অনুষ্ঠান করে আসছি, তাই বা মিথ্যা হবে কেন ? কিন্তু হজরত মোহম্মদের সঙ্গে বিচার করতে বা কথা বলতে এসে অনেকেই তাঁর কথার যুক্তিবত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তারা বলতে লাগলো, মোহম্মদ কবি বা ঐন্দ্রজালিক ; আবার কেহ কেহ বলতে লাগল এসব কথা মোহাম্মদ অন্য লোকের কাছ থেকে শিক্ষা ক'রে আবৃত্তি করে থাকে; অতএব এসব কথা ততটা গ্রহণীয় নয়। হজরত মোহম্মদ আরও শিক্ষা দিতেন একই আল্লাহর নিকট সকলকে কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে, সেখানে বংশমর্যাদা বা পার্থিব ধনসম্পদ কোনই কাজে আসবে না— মানুষ সকলে ভাই ভাই, আল্লাহর নিকটে সকলেই সমান। একথায় বিশেষ করে বংশাভিমানী ও সুবিধাভোগী কোরেশগণই অধিক কুপিত হয়ে মোহম্মদের বিপক্ষতা করতে সুরু করলো ; শেষে তাদের অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক হওয়াতে মোহম্মদকে কয়েকজন পারিষদসহ প্রাণভয়ে মদিনায় পলায়ন করতে হল। সেখানকার অনেকে তাঁর ধর্ম অবলম্বন করে তাঁর আপদ-বিপদে সাহায্যকারী হলেন, ইহুদীদের সঙ্গেও পরস্পর সম্প্রীতিসূচক সন্ধি হল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় এবং কোরানের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হতেও দেখা যায়, কপট স্বভাব ইহুদীরা বারংবার সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করে মোহম্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, এবং যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের কাছে তাঁর গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে অনেক কপট মুসলমানেরও সহযোগ ছিল। এইসব কারণে পরিশেষে মোহম্মদকেও অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। তিনি প্রচার করলেন, আল্লাহর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জেহাদ করলে, অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। আল্লাহর পথে মৃত্যু হলে তা মৃত্যু নয়, বরং তা-ই অনন্ত জীবন।

নিম্নে আমরা কোরান থেকে যেসব বাক্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে, তৎকালীন অবস্থার যে অতি সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া গেল, তা স্মরণ রাখা আবশ্যক। আর একটি কথা এই যে, কোরানে আল্লাহ বক্তা, মোহম্মদ শ্রোতা। আল্লাহ নিজের বিষয় কোন সময় প্রথম পুরুষে, কোন সময় তৃতীয় পুরুষে উল্লেখ করছেন ; এবং কোন সময় সাধারণ ভাষা, কোন সময় অলঙ্কারবহুল রূপক ভাষা ব্যবহার করছেন, আবার কখনও বা গল্পচ্ছলে উপদেশ দিচ্ছেন। সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময় আল্লাহ বিশেষ বিশেষ বাণী প্রেরণ করেছেন— সমগ্র কোরান একযোগে মোহম্মদের অন্তরে প্রকাশিত করেন নাই। কতকগুলি বাণী নিত্য সত্য, আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য ; কিন্তু যেগুলি বিশেষ অবস্থার বাণী, তার মধ্যকার মূলনীতি অনুসরণ করে নূতন নূতন অবস্থায় তার প্রয়োগ করা চলে। এইভাবে যেকোন কালের যেকোন অবস্থায় যদি কোরানের মূল সূত্রগুলি প্রয়োগ করে সুন্দরভাবে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা যায়, তবেই তাকে সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক বলা যেতে পারে। অন্যথায় ও-সব কথা নিরর্থক।

## (খ) মোমেন

এইবার মোহম্মদের প্রচারিত বাণীর প্রতি তৎকালীন লোকের মনোভাবের পার্থক্য অনুসারে তাদের শ্রেণীবিভাগ করতে চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে বলতে গেলে মোহম্মদের বাণী যারা

বিশ্বাস করলো, তারা মোমেন আর যারা অবিশ্বাস করলো তারা কাফের। (মোমেন শব্দের অর্থ বিশ্বাসী, আর কাফের শব্দের অর্থ অগ্রাহ্যকারী।) অনেকে মুখে বিশ্বাস করলেও অন্তরে অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করতে লাগলো, এরা কপট। এই শ্রেণীর কপটেরা বাহ্যতঃ মুসলমান বলে পরিচিত হলেও, এরা অন্তরে কাফের, এবং কোরানে এদের বিষয়েও গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে কাফেরদের ভিতরে থাকতে বাধ্য হয়েও, মনে মনে আল্লাহর প্রেরিত ও মোহম্মদের প্রচারিত সত্যের প্রতি বিশ্বাসী ছিল, এরা বাহ্যতঃ কাফের হলেও অন্তরে মোমেন ; এদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ অভয় দান করেছেন।

ধর্ম কি এবং বিশ্বাসী বা মোমেনদের থেকে কি আশা করা যায়, দেখা যাক। আল্লাহ বলছেন, "যারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ কায়েম রাখে ; এবং তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্বে যা' অবতীর্ণ করেছি তাতে যারা বিশ্বাস করে, আর যারা পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস করে, তারা প্রভুনির্দিষ্ট সুপথে আছে এবং তারা পরিত্রাণ লাভ করে।" —(বকর-১) অন্যত্র বিশ্বাসীগণকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, "তোমরা লোকের জন্য নির্বাচিত শুভ-মণ্ডলী ; তোমরা বৈধকর্ম্মে বিধিদান ও অবৈধ কার্য্যে নিষেধ করে থাক ; এবং আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করছ।" —(আল্-এমরান-১২)

অন্যত্র,— "নিশ্চয় বিশ্বাসীগণ মুক্ত হয়েছে। বিশ্বাসী তারা, যারা আপন নামাজে সাভিনিবেশ, যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিমুখ, যারা বিধিমত দান বা জাকাত প্রদান করে, আর যারা আপন ভার্য্যাগণ বা হস্তাধিকৃত ভোগ্যা বাসীদের ছাড়া (অন্যের প্রতি) আপন গচ্ছিত বিষয় ও আপন অঙ্গীকার রক্ষা করে।" —(মোমেনুন-১)

"আল্লাহকে স্মরণ করা ও নামাজ রক্ষা, যাদের বাণিজ্য ক্রয়-বিক্রয়ের (চিন্তা) দ্বারা শিথিল হয় না, এবং যারা অন্তর ও দৃষ্টি বিক্ষেপকারী কেয়ামতের দিনকে ভয় করে, (তারাই মোমেন) তারা প্রাতঃসন্ধ্যা আল্লাহর ঘরে তাঁকে সপর্দ করে থাক।" —(নূর-৫)

"আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষের নিকট আহুত হলে, যখন তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন বিশ্বাসীরা কেবল এই বলে যে, "শুনলাম ও অনুগত হলাম" বিশ্বাসীদের বাক্য এতদ্ভিন্ন হয় না।" —(নূর-৬)

"যে ব্যক্তি পাপ থেকে ফিরে আসে ও শুভকর্ম করে, নিশ্চয় সে আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, ও নিরর্থক বিষয়ের দিকে উপস্থিত হলে মহদ্ভাবে চলে যায়, এবং যখন মহাপ্রভুর নিদর্শনাদি সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয়, তখন সে সম্বন্ধে বধির ও অন্ধরূপে পড়ে থাক না।" —(ফোরকান-৬)

"এবং সত্যই আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পুরুষ পাঠিয়েছি, এবং বলেছি যে, তোমরা আল্লাহর অর্চনা কোরো ও প্রতিমাদি থেকে নিবৃত্ত থেকো।" —(নহল-৫)

উপরের কয়েকটি আয়াত বা শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস, কৃতকর্মের ফলভোগে বিশ্বাস এবং আরও কয়েকটি অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস রাখার সঙ্গে সঙ্গে, সৎকার্য্য, সদ্ব্যয়, ধর্মকথার আলোচনা, ইন্দ্রিয় সংযম, অনর্থ বিষয় ও লজ্জাজনক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া প্রভৃতি মোমেনের লক্ষণ। অবশ্য এইসব উক্তির অনেক অধিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে কিন্তু এস্থলে তার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ মোমেনদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবেন, কোরান থেকে তার কয়েকটা শ্লোক বর্ণনা করা যাক।— যথা— "যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের স্বর্গোদ্যানে নিয়ে যাবেন, যার নিচে ঝরণা প্রবাহিত হয় ;

সেখানে স্বর্ণময় ও মৌক্তিক কঙ্কণ তাদের-কে পরাণ হবে, আর সেখানে তাদের পরিচ্ছদ হবে কৌষের বস্ত্র।"

অন্যত্র : "নিশ্চয়, যারা মুসলমান বা মুসায়ী বা সাবেয়ী, বা ইসায়ী, তাদের যারা আল্লা ও পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের কোন ভয় নাই, সন্তাপ নাই।" —(মায়দা-১০)

অন্যত্র : "হাঁ, যে জন অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও লোভ মুক্ত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ.সেই বিরাগীগণকে প্রেম করেন।" —(আল এমরান-৮)

"যারা বিশ্বাসী হয়েছে ও সৎকর্ম করেছে, অবশ্য আমি তাকে স্বর্গোদ্যানে নিয়ে যাই, যার নীচে ঝরণা বহমান। তারমধ্যে তারা চিরকাল বাস করবে, আর সেখানে তাদের জন্য সাধ্বী নারীসকল থাকবে, আর আমি তাদের শান্তিযুক্ত ছায়াতে প্রবিষ্ট করব।" —(নেসা-৮)

"নিশ্চয় তাদের মধ্যে (ইহুদীদের মধ্যে) জ্ঞানে নিপুণ ও বিশ্বাসী লোকেরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ সত্যের বিশ্বাস করে এবং নামাজ পালন করে ও জাকাত দেয় ; তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। তাদের আমি মহা পুরস্কার দিব।" —(নেসা-২২)

"নিত্য স্বর্গোদ্যানে পবিত্র বাসস্থান ও আল্লাহর মহাপ্রসন্নতা আছে ; ইহাই সেই মহা চরিতার্থতা।" —(তওবা-৯)

"হে বিশ্বাসীগণ তোমরা সহিষ্ণুতা ও উপাসনা বিষয়ে সাহায্য অন্বেষণ কর ; নিশ্চয় আল্লাহ সহিষ্ণুদের সহায়। যারা আল্লাহর পথে নিহত হ'য়েছে, বলোনা যে তারা মরেছে, বরং তারা জীবিত হ'য়েছে ; কিন্তু তোমরা তা জান না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ভয়, অন্নাভাব, ধনহানি, প্রাণহানি ও ফলহানি ইহার কোন একটি দিয়া পরীক্ষা করি ; এবং সহিষ্ণুদের সুসংবাদ দেহ ; যখন তাদের নিকট সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন তারা বলে, "নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই, এবং তার দিকেই আমাদের প্রত্যাগমন।" এই সকল লোক, এদের উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও কৃপা, এরাই সৎপথগামী।" —(বকর-১৯)

বলা হবে "তোমরা ও তোমাদের ভার্য্যাগণ সানন্দে স্বর্গে প্রবেশ কর", তাদের কাছে বৃহৎ সুবর্ণ পাত্র ও সোরাহী সকল পরিবেশন করা হবে ; তন্মধ্যে প্রাণ যা' অভিলাষ করে তা' থাকবে, আর চক্ষুও স্বাদ গ্রহণ করবে, তোমরা তথায় নিত্যকাল অবস্থান করবে।" —(জোখরাফ-৭)

মোটের উপর, আশ্বাস দেওয়া হ'চ্ছে যে, মোমেনদের খুব সুখের স্থানে থাকতে দেওয়া হবে ; সেখানে কোনরূপ কষ্ট হবে না, এবং আল্লাহ যে প্রসন্ন থাকবেন, এইটেই খুব বড় সার্থকতা। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গেই সৎকর্মের আবশ্যকতার কথা কোরানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সৎকর্ম অনুসারেই পুরস্কার দিবেন, কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা সমাজভুক্ত লোককে যে বিশেষ অনুগ্রহ করবেন, এমন নয়।

## (গ) আল্লাহ

এখন, কিরূপ আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে, তার একটু আভাস দেওয়া যাক। আল্লাহ বলছেন,—

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই। তিনি অধিপতি, প্রতি পবিত্র, অভাবহীন, আশ্রয়দাতা, রক্ষাকারী, জয়যুক্ত, পরাক্রান্ত গৌরবান্বিত। যা কিছু তাঁর অংশীরূপে নিরূপিত

হয়, তার থেকে তিনি বিমুক্ত। সেই আল্লাহই স্রষ্টা, আবিষ্কর্তা, আকৃতির বিধাতা ; উত্তম নাম সকল তাঁরই। স্বর্গে মর্ত্যে যা কিছু আছে, তাকে স্তব করে থাকে এবং তিনিই বিজয়ী, কৌশলময়।" —(হাশর-৩)

"যাঁর হস্তে রাজত্ব, তিনি সমুন্নত ও ক্ষমতাশালী। যিনি কার্য্যতঃ কে তোমাদের মধ্যে অত্যুত্তম, তাই পরীক্ষা করবার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন ; তিনি পরাক্রান্ত (অথচ) ক্ষমাশীল। যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। আচ্ছা, চক্ষু সঞ্চালন কর, কোন ত্রুটি কি দেখছ ? আবার চক্ষু সঞ্চালন কর ; তোমার চক্ষু নিস্তেজ হয়ে ফিরে আসবে, আর তা' ক্লান্ত থাকবে। সত্য সত্যই আমি পৃথিবীর আকাশকে দীপাবলী দ্বারা শোভমান করেছি এবং তাকে শয়তানকুলের বিতাড়কযন্ত্র করেছি এবং আমি তাদের জন্য অগ্নিদণ্ড প্রস্তুত করে রেখেছি।" —(মালক-১)

"সেই ঈশ্বর, যিনি বায়ুপুঞ্জকে প্রেরণ করেন ; অনন্তর উহা মেঘকে উন্নয়ন করে। পরে তিনি তাহাকে ইচ্ছামত আকাশে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন ও তাহাকে খণ্ড খণ্ড করেন; পরে তুমি দেখতে পাও যে, তার ভিতর থেকে বারি-বিন্দু সকল নির্গত হয়। যখন তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন উক্ত বারি-বিন্দু পৌঁছিয়া দেন, তখন তারা হঠাৎ উল্লসিত হয় ... অনন্তর তুমি আল্লাহর কৃপার নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, তিনি কেমন করে ভূমিকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন ; অবশ্যই তিনি মৃতসঞ্জীবনকারী, আর সর্ব্বশক্তিমান।" —(রুম-৫)

"দ্যুলোক ও ভূলোকে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই ; নিশ্চয় তিনি নিষ্কাম, প্রশংসিত ; এবং পৃথিবীতে যে সকল গাছ আছে তা' যদি কলম হয় ও সাগর তার কালি হয় — এমনকি সপ্ত-সাগরও যদি কালি হয়— তবু আল্লাহর প্রসঙ্গ শেষ হবে না ; অবশ্য, আল্লাহ জয়যুক্ত, বিজ্ঞানময়। তোমাদের সৃজন ও সমুত্থাপন তাঁর কাছে অতি সহজ ব্যাপার। তিনি স্রষ্টা ও শ্রোতা।" —(লোকমান-৩)

"তুমি কি দেখ নাই, আল্লাহর কৃপায় পোত সকল তাঁর নির্দশনাবলীর কিছু তোমাদের দেখাবার জন্য সাগরে গমন করে ? নিশ্চয় এর মধ্যে সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য উপদেশ আছে। যখন চন্দ্রাতপের ন্যায় তরঙ্গ তাদেরকে বেষ্টন করে, তখন তারা আল্লাহর জন্য ধর্মকে বিশুদ্ধ করে তাকে ডাকতে থাকে ; অনন্তর যখন আমি তাদের উদ্ধার ক'রে কূলের দিকে নিয়ে যাই, তখন তাদের কেহ মধ্য-পথ অবলম্বন করে ; অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ধর্মদ্রোহীগণ ছাড়া কেউ আমার নিদর্শনকে অগ্রাহ্য করে না। ...নিশ্চয়, আল্লাহর নিকটেই কেয়ামতের জ্ঞান আছে, এবং তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন ও গর্ভে যা' থাকে, তা' জানেন ; এবং কাল কি উপার্জন করবে তা কেউ জানে না, আর কোথায় মরবে তাও কেউ জানে না। অবশ্য আল্লাহই জ্ঞানময়, তত্ত্বজ্ঞ।" —(লোকমান-৪)

"অবশ্য, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ; আর তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় আমি তা জানতে পারি। আমি তার প্রাণের শিরার চেয়েও বেশি কাছে আছি।" —(ক্বাফ-২)

"স্বর্গ, আমি তাকে স্বহস্তে নির্মাণ করেছি, নিশ্চয় আমি ক্ষমতাশীল ; এবং পৃথিবী, তাকে আমি প্রসারিত করেছি, নিশ্চয় আমি উত্তম প্রসারণকারী। আমি প্রত্যেক পদার্থ দ্বিবিধ সৃষ্টি করেছি, ভরসা যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।... এবং আমার অর্চনা করবে, এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মানব ও দানবকে সৃজন করি নাই। তাদের নিকট আমি কোন উপজীবিকার প্রত্যাশা করি না ; এবং ইচ্ছা করি না যে, তারা আমাকে অন্নদান করে। নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই জীবিকাদাতা, দৃঢ়-শক্তিশালী।" —(জারেয়াত-৩)

"যদি আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তবে তিনি যা' সৃষ্টি করেন তার থেকে যাকে ইচ্ছা হ'ত অবশ্য গ্রহণ করতেন ; পবিত্র তিনি, তিনি একমাত্র পরাক্রান্ত আল্লাহ। তিনি সত্যই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি রজনীকে দিবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও দিবাকে রজনীর ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করেন। এবং সূর্য-চন্দ্রকে বাধ্য করেছেন যে, তারা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়ে সঞ্চরণ করে। জানিও তিনি ক্ষমতাশীল, পরাক্রান্ত।" (জোমর-১)

"দ্যুলোক ও ভূলোকে যা আছে তা আল্লাহর। তোমাদের অন্তরের বিষয় প্রকাশই কর আর গোপনই কর, আল্লাহ তার হিসাব গ্রহণ করেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা হয়, শাস্তি দেন ; তিনি সর্ব্বশক্তিমান।" (বকর-৪০)

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি জীবন্ত নিত্যস্থায়ী ; তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁহাকে পায় না ; দ্যুলোক ও ভূলোকে যা আছে, সেসব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর আজ্ঞা ব্যতীত তাঁর নিকট পাপীর পাপ মুক্তির জন্য অনুরোধ করতে পারে ? মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা' কিছু আছে তিনি সব জানেন ; আর তিনি যতদূর ইচ্ছা করেন তার অতিরিক্ত কোন জ্ঞানের ভিতর মানুষ প্রবেশ করতে পারে না ; তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে ; এ দুইয়ের সংরক্ষণ তাঁর কাছে মোটেই ভারবহ নয়। তিনি উন্নত ও মহান।" (বকর-৩৪)

"স্বর্গ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা, এবং চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রবৃন্দ, এবং পর্বত, বৃক্ষ ও চতুষ্পদ সকল এবং অধিকাংশ মনুষ্য নিশ্চয় আল্লাহকে প্রণাম করে।" (হজ্জ-২)

"আল্লাহ ভূলোক ও দ্যুলোকের জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁর জ্যোতির উপমা, যথা— গৃহে দীপ রক্ষার জন্য তাক আছে, তন্মধ্যে দীপ আছে, সেই দীপ কাঁচাধারে, সেই কাঁচাধার উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, কল্যাণযুক্ত জয়তুন তরুর তৈলে প্রজ্জ্বলিত হয়। তা' পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় নয়, তার তৈল, অগ্নিস্পর্শ ছাড়াই জ্বলে উঠতে চায় ; জ্যোতির উপর জ্যোতিঃ হয়। যাকে ইচ্ছা করেন, আল্লাহ আপন জ্যোতিদ্বারা পথ দেখিয়ে থাকেন ; এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণন করেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী।" (নূর-৫)

"আল্লাহর সৃষ্ট জিনিষের দিকে কি তারা তাকায় না ? আল্লাহর উদ্দেশ্যে নমস্কার করতে করতে এদের ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঘুরে থাকে, এবং সে সকল বিনম্র। জীব ও দেবতা যা কিছু স্বর্গে ও মর্ত্তে আছে তারা আল্লাহকে প্রণিপাত করে ও তারা অহঙ্কার করে না। তাঁরা পরাক্রান্ত মহাপ্রভুকে ভয় করে এবং যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।" —(নহল-৬)

উহারা বলে "কে অস্থিকে জীবিত করবে ? বস্তুতঃ তা'ত গলে গেছে।" তুমি বল (হে মোহম্মদ), যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই করবেন। তিনি সমুদয় সৃষ্টি সম্বন্ধে পারদর্শী। যিনি তোমাদের জন্য হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেছেন, পরে তোমরা তার থেকে আগুন জ্বাল। যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, সমর্থ। এবং জ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন কেবলমাত্র বলেন যে 'হউক', আর অমনি 'হয়'। অতঃপর যাঁর হাতে সব জিনিষের কর্তৃত্ব, তিনি পবিত্র, আর তাঁর দিকেই তোমরা পুনর্মিলিত হবে।"— (ইয়াসিন-৫)

"স্বর্গ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে; সব আল্লাহর স্তব করে ; তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। পৃথিবী ও স্বর্গের রাজত্ব তাঁরই ; তিনিই বাঁচান ও মারেন, এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি আদিম ও অন্তিম ; তিনি বাহ্য ও গুপ্ত এবং তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই যিনি ষষ্ঠ দিবসে স্বর্গ ও

মর্ত সৃজন করেছেন, এবং উচ্চ স্বর্গের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। পৃথিবীতে যা' কিছু ঘটে, তার থেকে যা' কিছু নির্গত হয় ও আকাশ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়, তিনি সমুদয় জ্ঞাত হন ; স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই, তার দিকেই সমুদয় ক্রিয়া প্রত্যাবর্তিত হয়। তিনি রাত্রিকে দিবার ভিতরে ও দিবাকে রাত্রির ভিতরে প্রবেশিত করেন এবং তিনি অন্তর-বাহিরের রহস্যবিৎ।" ... (হাদিদ-১) তিনি আপন বান্দার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শন প্রেরণ করেন, যাতে তোমরা অন্ধকার থেকে জ্যোতি দিকে আসতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাশীল, দয়ালু।" - (হদিদ-১ ঐ)

"নিশ্চয় আমি মানুষকে বস্তুতঃ একবিন্দু মিশ্রিত শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছি ; উদ্দেশ্য যে, তাকে পরীক্ষা করি। এজন্য তাকে শ্রবণক্ষম ও দর্শন করেছি। আর তাকে অবশ্য প্রকৃত পথও দেখিয়েছি। এখন সে কৃতজ্ঞও হতে পারে, অকৃতজ্ঞও হতে পারে।" -(দহর-১)

মোটের উপর আল্লাহ নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, সিদ্ধিদাতা, পরম করুণাময়, ক্ষমাশীল বন্ধু। কিন্তু তিনি আবার সূক্ষ্মদর্শী, সদাজাগ্রত, দণ্ড-পুরস্কারের বিধাতা। তিনি সর্ব্বব্যাপী, বিশ্ব-প্রকৃতির যা' কিছু, সবই তাঁর নিদর্শন। তাঁর নিজের কিছুই অভাব নাই ; তিনি লোককে তাঁর নিদর্শনগুলি জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখতে, জ্ঞানকর্ণ দিয়ে শুনতে, আর ভক্তিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে আদেশ করেছেন। আর সৎকাজ করতে ও লোকের হিতসাধন করতে উপদেশ দিচ্ছেন। এজন্য নামাজ পালন করতেও বলছেন, নামাজের উদ্দেশ্য অসৎ ও লজ্জাজনক কাজ থেকে মনকে নিবৃত্ত ও পবিত্র করা। আল্লাহ যে সৎপথ দেখিয়েছেন, তাই অনুসরণ করাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুবর্তন। তাঁর নির্দেশিত পথ ত্যাগ করে অন্য কিছুর বশবর্তী হয়ে অন্য পথে চলাই তাঁর সঙ্গে শরীক স্থাপন করা। কোরানে এজন্য বারংবার সদ্বিবেচনা করে সদ্জ্ঞান লাভ করবার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র আল্লাহতেই সমর্পিত-চিত্ত হয়ে পরস্পর সদ্ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে। এই আবার নির্দেশিত সকল ও শান্তিপূর্ণ ধর্মপথ — বা ইসলাম।

## (ঘ) কাফের

এই ধর্ম যারা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে, এর প্রতিষ্ঠা ও প্রসার যাদের কাছে এতটা অপ্রীতিকর যে তারা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এর বিরুদ্ধতা করে, তারাই কোরানে কাফের, অগ্রাহ্যকারী, অনেকেশ্বরবাদী, কপটবিশ্বাসী, মোনাফেক প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছে। এদের সম্বন্ধে কোরানের কতকগুলি আয়াত বা শ্লোক উদ্ধৃত করলেই এদের স্বরূপ জানা যাবে। কোরানে আছে :

"তারা বলে, অবশ্যই আমরা পিতৃপুরুষগণকে এক রীতি (অনুবর্তী) প্রাপ্ত হয়েছি, বস্তুতঃ আমরা তাদের পদচিহ্নতেই পথ প্রাপ্ত। এইরূপ তোমার পূর্বেও আমি যেকোন গ্রামে যেকোন ভয়প্রদর্শক পাঠিয়েছি, সর্ব্বত্রই সেখানকার সম্পন্ন লোকেরা বলেছে, "অবশ্যই আমরা পিতৃপুরুষগণকে এক রীতির অনুবর্তী প্রাপ্ত হয়েছি, এবং আমরা অবশ্য তাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করি।" প্রেরিত পুরুষ বলেছিল, "তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে তোমরা যে ধর্মের অনুবর্তী পেয়েছ, তারচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তোমাদের কাছে এনেছি।" তারা বলেছিল, "তোমরা যে সত্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তার বিরোধী।" অনন্তর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি ; এখন দেখ, মিথ্যাবাদীদের কেমন পরিণাম হয়েছে ?" —(জোখরুফ-২)

"বাস্তবিক পক্ষে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করতে পারে না— তারা এজন্য সকলে সম্মিলিত হলেও পারে না। এবং যদি মক্ষিকা তাদের থেকে কিছু নিয়ে যায় তারা তা উদ্ধারও করতে পারে না। প্রার্থক প্রার্থিত উভয়ই অক্ষম ; তারা আল্লাহকে যথার্থ মর্যাদার মর্যাদা করে না। অবশ্য তিনি শক্তিময় পরাক্রান্ত।" —(হজ্জ-১০)

"যখন তোমাদের নিকট আল্লাহর নিদর্শন পাঠ করা হচ্ছে, আর তোমাদের মধ্যে তার প্রেরিত পুরুষ বিদ্যমান, তখন তোমরা কেমন করে কাফের হবে?" —(আল এমরান-১০)

"এবং নিশ্চয় তাদের ভিতর একদল আছে, যারা জিহ্বা কুঞ্চিত করে গ্রন্থ (উচ্চারণ) করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা গ্রন্থধারী ; অথচ তারা গ্রন্থাধিকারী নয়। তারা বলে বটে যে তারা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, কিন্তু তারা আল্লাহর কাছ থেকে আসে নাই ; আল্লাহ জেনেশুনে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলছে। কোন মানুষের পক্ষে এটা উচিত হয় না যে তাকে আল্লাহ গ্রন্থ, পূর্বজ্ঞান প্রেরিতত্বদান করলেন, আর সে লোকদের কে বললো যে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার সেবক হও ; বরং তোমরা গ্রন্থ সম্বন্ধে যেমন উপদেশ দিচ্ছিলে ও পড়ছিলে, সেই অনুসারে নিজেরা আল্লাহর অনুগত হও। আর তাদের এটাও উচিত নয় যে তোমাদেরকে বলে দেবদূতগণকে ও প্রেরিত পুরুষগণকে তোমরা আল্লাহ্ বলে স্বীকার কর। তোমরা মুসলিম হবার পর কি তারা তোমাদের কাফের হতে বলে?" — (আল এমরান-৮)

"ধর্মদ্রোহীগণ তাদের নিকট অকস্মাৎ কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে বা ধ্বংস দিবসের শাস্তি উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত সর্বদা প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাকবে।" — (হজ্জ-৭)

"ধর্ম-বিদ্বেষীগণ বলেছেন, "(কোরান) অপলাপ মাত্র (মোহম্মদ) তা রচনা করেছে; এবং অন্য এক দল (লোক) এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করে। তারা আরও বলেছে, এই কোরান পুরানো উপন্যাসের সমষ্টি ; সে ইহা (অন্যের দ্বারা) লিখিয়ে নিয়েছে, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা তার কাছে এখানা পাঠ করা হয়। তারা বলেছে, এই প্রেরিত পুরুষ কেমন, যে সে অন্ন ভোজন করে এবং দোকানে দোকানে ঘোরে ? তার কাছে স্বর্গীয় দূত কেন অবতীর্ণ হয় নাই ? তাহলে সে দেবদূতগণকে দিয়ে ভয় প্রদর্শন করতে পারত ? অত্যাচারী লোকেরা আরও বলেছে যে, তোমরা যার অনুসরণ করছ, সে একটা ইন্দ্রজালগ্রস্ত লোক বৈ আর কিছু নয়।" —(ফোরকান-১)

"ধর্মদ্রোহীগণ বলেছে, কেন তার প্রতি কোরান একযোগে উত্তীর্ণ হয় নাই ?" —(ফোরকান-৩)

"এবং তারা বলে, 'ওহে, যার উপরে উপদেশ অবত্তীর্ণ হয়েছে, তুমি সেই ব্যক্তি, নিশ্চয় তুমি ক্ষিপ্ত'।" —(হেজ্বর-১)

"এমন কোন প্রেরিত পুরুষ তোমার নিকট উপস্থিত হয় নাই, যাকে তারা উপহাস করে নাই। এইরূপে আমি অপরাধীদের অন্তরে বিদ্রূপ চালনা করি। তারা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না ; পূর্ববর্তীদের মধ্যে এইরূপ রীতিই বরাবর চলে আসছে। এবং যদি আমি তাদের প্রতি আকাশের দ্বার উন্মোচন করি, আর তারা তথায় আরোহণ করে, তবু তারা বলবে, "আমাদের চক্ষু বিহ্বল হয়ে গেছে, আমরা সকলে ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। —(হেজ্বর-১)

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আপন বাসনাকেই আল্লাহ বলে গ্রহণ করেছে ? তুমি কি ভাবছ যে তাদের অধিকাংশ লোকে শোনে বা বুঝতে পারে ? তারা নিশ্চয়ই পশুর সমান, বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রান্ত।" —(ফোরকান-৪)

"ধর্মদ্রোহীগণ ছাড়া কেউ আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিবাদ করে না।" (মোমেন-১)

"যে ব্যক্তি ধর্মকে অস্বীকার করে তাকে কি তুমি দেখেছ ? সে ঐ ব্যক্তি, যে নিরাশ্রয়কে দুঃখ দেয় এবং দরিদ্রকে আহার দিতে লোককে উদ্বুদ্ধ করে না। অতএব সেইসব নামাজী লোকদের প্রতি আক্ষেপ, যারা নিজেদের নামাজ সম্বন্ধে হতজ্ঞান, যারা লোক দেখানোর জন্য (নামাজ পড়ে) অথচ কিঞ্চিৎ দান করতে পরাঙ্মুখ হয়।" — (মাউন-১)

"তারা আল্লাহ সম্বন্ধে দৃঢ় শপথ করেছে যে, যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে উত্থাপন করবেন না। হ্যাঁ, উত্থাপন করবেন ; তাঁর অস্বীকার সত্য। ... " —(নহল-৫)

মোটের উপর দেখা যাচ্ছে, যারা হজরত মোহম্মদের প্রচারিত সত্য অস্বীকার করেছে, যারা তাঁকে ক্ষিপ্ত যাদুকর, কবি প্রভৃতি বলেছে ; কোরানকে যারা মিথ্যা ও লোক-রচিত গল্পাবলী বলেছে, যারা গতানুগতিক ধর্মের অনুবর্তন করে মোহাম্মদের ধর্মের বিরুদ্ধতা করেছে; যারা কপটতার আশ্রয় নিয়ে বলেছে যে স্বর্গের থেকে দেবদূত অবতারণ বা ঐরূপ কোন আশ্চর্য কাণ্ড দেখাতে পারলে বিশ্বাস করবো ; যারা ধর্মের সঙ্গে অসত্য মিশিয়ে ধর্মের নামে চালিয়েছে ; এবং যারা পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণকে আল্লাহ বলে স্বীকার করেছে ও লোককে সেইরূপ শিক্ষা দিয়েছে ; যারা কেয়ামত ও আল্লাহর বিচার সম্বন্ধে বিশ্বাসহীন ; আল্লাহকে ছেড়ে অন্য দেবদেবীর অর্চনা করে ও তাদের নিকট ফল প্রার্থনা করে ; যারা আল্লাহর নিদর্শন দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না এবং কিছুই বোঝে না ; এবং যারা লোক দেখানোর জন্য ধর্মক্রিয়া করে, কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকহিত সম্বন্ধে উদাসীন থাকে ; কোরান অনুসারে তারাই ধর্মদ্রোহী কাফের। এই তালিকার মধ্যে কতকগুলো বিশেষভাবে সেই সময়ের লোককেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে অন্যগুলি সাধারণভাবে সর্বকালে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু মুসলমান সমাজে সাধারণতঃ নিত্য প্রযোজ্য আয়েতগুলির উপর অধিক জোর না দিয়ে যেগুলি বিশেষভাবে হজরতের সমসাময়িক কালের লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ; সেগুলির উপরই অত্যধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আরবের ঐ সময়কার লোকে প্রতিমাকে যেভাবে সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা বলে মনে করতো অন্ততঃ কোরান থেকে যেরূপ বোঝা যায়, ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বর্তমানকালে প্রতিমাকে সেভাবে দেখে না। আরবের লোকে যে প্রতিমাকে আল্লাহর গুণের রূপ-কল্পনা বলে মনে করতো, কোরানে তার সামান্য ইঙ্গিত মাত্রও পাওয়া যায় না ; কারণ তাহলে কোরানে এ-সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু যুক্তির অবতারণা হত কিন্তু ভারতীয় হিন্দু— অন্ততঃ শিক্ষিত ও পণ্ডিত সম্প্রদায় দেবী প্রতিমাকে আল্লাহরই গুণাবলীর মুর্তি-পরিকল্পনারূপেই গ্রহণ করে থাকেন। এরূপ স্থলে, আরব ও ভারতের মুর্তি-পূজককে একই পর্যায়ে ফেলিয়া একই আখ্যায় আখ্যাত করবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমার বোধ হয়, এরূপ বিবেচনা এ পর্যন্ত করা হয় নাই। কোরানে অনেক কথারই বাহ্য অর্থ ও গূঢ় অর্থ দুই প্রকার আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যারা ধর্মপথে তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করে তারাও জেহাদ করে, আর যারা নিজেদের শয়তানী প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে, তারাও জেহাদ করে। বর্তমান যুগে এই শেষোক্ত প্রকার জেহাদ করবারই সুযোগ বেশি এবং এও তরবারীর জেহাদের চেয়ে হীন নয়।

ইসলাম ধর্মকে কেবল মুসলমান সমাজের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধলে ইসলামের প্রতি অবিচার করা হয়। ইসলাম একটি আদর্শ, যা আল্লাহ সমস্ত সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে যারা সেই আদর্শের অনুবর্তন করে, তারা ইসলাম ধর্মে আছে ; আর যারা অনুবর্তন করে না তারা বহু ইসলামিক অনুষ্ঠান পালন করা সত্ত্বেও এবং জগতে মুসলমান বলে পরিচিত হলেও প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নাই। বর্তমান যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক ইসলামের আদর্শ অনেকাংশে গ্রহণ করেছে। সেই পরিমাণে তারা ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেছে। মুখের কথার চেয়ে অন্তরের অনুভূতি এবং কর্মে তার বাহ্য প্রকাশই অধিক মূল্যবান। আমার মনে হয়, বে-ইউরোপীয়কে আমরা ধর্মহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ বলে মনে করি, তাদের মধ্যেই আরবীয় মিশরীয় বা ভারতীয়দের চেয়ে ইসলামের অনুবর্তী লোক বেশি আছে,— কারণ তারাই জগতের কল্যাণকর কাজ বেশি করছে, আর, আল্লাহর নিদর্শনের দিক দেখে একাগ্রমনে জ্ঞানসাধনা বেশি করে করছে। কাজে কাজেই আল্লাহও আপন অঙ্গীকার অনুসারে তাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহ-বর্ষণ করছেন।

আল্লাহ নিজে কাফেরদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবেন, তার বিশ্বাসীগণকে কিরূপ ব্যবহার করতে উপদেশ দিচ্ছেন, কোরান থেকে তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক : কোরানে আছে—

"যারা ধর্মদ্রোহী হয়েছে, তাদের কার্যাবলী প্রান্তরের সেই মরীচিকার মত, যাকে জল মনে করে পিপাসু তার কাছে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাকে কোন পদার্থরূপে প্রাপ্ত হয় না— বরং আল্লাহকে (শাস্তিদাতৃরূপে) প্রাপ্ত হয় তারপর আল্লাহ তার হিসাব পূর্ণ করেন, আল্লাহ হিসাবে তৎপর। অথবা তার অবস্থা যেন গভীর সমুদ্রে তিমির-রাশী ; তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাকে গ্রাস করছে, তার উপর মেঘ-অন্ধকারপুঞ্জ পরস্পর এক অন্যের উপর; যখন সে আপন হাত বের করে, তখন বে তার দেখতে পাবে এমন সুযোগ নাই; আল্লাহ যাকে আলো দেন নাই, এই সেই ব্যক্তি— বস্তুতঃ তার জন্য কোন আলোক নাই।" —(নূর-৫)

"নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর সঙ্গে অংশী স্থাপন করাকে ক্ষমা করবেন না, তাছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" —(নেসা-৭)

"যারা আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কঠিন শাস্তিদাতা",—(আনফাল-২)। "এবং স্মরণ কর, যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে অংশী মনে করছ, তাদের ডাক।' পরে তারা তাদিগকে ডাক্‌বে কিন্তু উত্তর দিবে না, এবং আমি তাদের মধ্যে মৃত্যুভূমি স্থাপন করব।" —(কাহাফ-৭)

"নিশ্চয় কপট লোকেরা আল্লাহকে বঞ্চনা করে আল্লাহও তাদেরকে বঞ্চনা করে থাকেন। যখন তারা নামাজের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়। তারা লোককে প্রদর্শন করে, এবং আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে। ... হে বিশ্বাসীগণ তোমরা বিশ্বাসীগণকে ছেড়ে ধর্মদ্রোহীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" —(নেসা-২১)

"আমার শত্রুকে ও তোমার শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" —(মোমতা হেনা-১)

"ধর্মদ্রোহীদের জন্য আগ্নেয় বসন প্রস্তুত রয়েছে ; তাদের মস্তকের উপর উষ্ণ জল নিক্ষেপ করা হবে, তাদের উদরাভ্যন্তরের জিনিষ ও চর্ম তদ্দ্বারা দ্রবীভূত করা হবে ; এবং

তাদের জন্য লৌহময় হাতুড়ী সকল আছে। যখন তারা ক্লেশ থেকে বের হতে চাইবে, তখন তারা আবার তথায় স্থাপিত হবে, আর তাদের বলা হবে, অগ্নিদণ্ড আস্বাদন কর।" (হজ্জ-২)

"যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করো কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না ; আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীকে প্রেম করেন না। তাদের যেখানে পাবে, সংহার কর ; এবং তারা তোমাদেরকে যেখান থেকে নির্বাসিত করেছে তোমরাও তাদেরকে নির্বাসিত করো। হত্যার চেয়ে ধর্মদ্রোহিতা গুরুতর। এবং পবিত্র মসজিদের নিকট তারা তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করো না। কিন্তু যদি তারা সংগ্রাম করে, তোমরাও করো। কাফেরদের প্রতি এইরূপ শাসন ; কিন্তু তারা নিবৃত্ত থাকলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" ... —(বকর-২৪)

"হে বিশ্বাসীগণ যখন তোমরা দলবদ্ধভাবে ধর্মদ্রোহীদের সঙ্গে (যুদ্ধে) সাক্ষাৎ কর, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। ... পরন্তু তোমরা তাদেরকে বধ কর নাই, আল্লাহই বধ করেছেন। এবং যখন তুমি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করেছ, তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহই করেছেন। ... নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের চক্রান্তের নিস্তেজকারী।" —(আন্‌ফাল-২)

"হে সংবাদবাহক, তুমি বিশ্বাসীগণকে সমরে প্রবৃত্তি দান কর। যদি তোমাদের মধ্যে ২০ জন সহিষ্ণু লোক থাকে, তবে তারা ২০০ জনের উপর জয়ী হবে। আর যদি তোমাদের পক্ষে ১০০ জন লোক থাকে, তবে কাফেরদের ১০০০ এর উপর জয়ী হবে; যেহেতু এরা এমন এক দল, যে জ্ঞান রাখে না। ... কোন তত্ত্ববাহকের উচিত নয় যে, ভূমিতে বহু রক্তপাত হবার পূর্বে সে বন্দীত্ব গ্রহণ করে। তোমরা পার্থিব সম্পত্তি ইচ্ছা করছ, কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন পরকাল ; তিনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞাতা।" —(আন্‌ফাল-৯)

"অনন্তর তোমরা যখন ধর্মবিরোধীদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে মিলিত হও, তখন তাদের কণ্ঠচ্ছেদন করো। তাদের অধিকাংশকে ধ্বংস করবার পর, (অন্যগুলিকে) দৃঢ় বন্ধন করো। অবশেষে তারা যুদ্ধাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করলে হয় তাদের হিত সাধন করো, নয় বিনিময় গ্রহণ করো। এই আজ্ঞা এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে স্বয়ং তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন ; কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে একজনকে অন্যজন দ্বারা পরীক্ষা করেন ; এবং যাহারা আল্লাহর উদ্দেশে পথে নিহত হয়েছে, তিনি তাদের ক্রিয়া সকলকে নিশ্চয়ই বিফল করবেন না।" —(মোহম্মদ-১)

"যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে পৃথিবীতে যারা আছে, এক যোগে সকলে বিশ্বাসী হত। কিন্তু তুমি কি, লোক যে পর্যন্ত বিশ্বাসী না হয়, সে পর্যন্ত তার প্রতি বল প্রয়োগ করবে ? আল্লাহর আদেশ ভিন্ন কারো পক্ষে বিশ্বাসী হওয়া সাধ্য নয়। যারা জ্ঞান রাখে না আল্লাহ তাদের প্রতি দুর্গতি প্রেরণ করেন। তুমি বল, হে মোহম্মদ, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে' কি আছে তোমরা দৃষ্টি কর। নিদর্শন সকল ও ভয়প্রদর্শকগণ অবিশ্বাসীদলের কোন উপকার করে না। তারা তাদের পূর্ববর্তীগণের সময়কার মত শাস্তিই প্রতীক্ষা করে। তুমি বল, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।" —(ইউনুস-১০)

"তোমাদের জন্য সংগ্রাম লিখিত হয়েছে ; এবং উহা তোমাদের পক্ষে দুষ্কর। হয়ত এমন বিষয়ে তোমরা বিরক্ত হবে, তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য কল্যাণ ; হয়ত তোমাদের জন্য যা অমঙ্গল, তাইতে তোমাদের প্রীতি আছে। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।" —(বকর-২৬)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ করে, সে পৃথিবীতে বহু ও বিস্তৃত স্থান প্রাপ্ত হয় ; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ও তার প্রেরিত পুরুষের জন্য দেশ ত্যাগী হয়ে ঘর থেকে বের হয়, তৎপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে নির্ধারিত আছে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" —(নেসা-১৪)

"ভ্রম-ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা মুসলমানের উচিত নয়। কেউ ভ্রমবশতঃ কোন মুসলমানকে হত্যা করলে একজন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে হয়।... হে বিশ্বাসীগণ, যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যাও, তখন অনুসন্ধান নিও ; যে তোমাদের প্রতি সালাম অর্পণ করে, তাকে বলো না যে তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব সামগ্রী চাহ, কিন্তু লুণ্ঠন-সামগ্রী আল্লাহর কাছে প্রচুর আছে।" —(নেসা-১৩)

"মহা হজের দিন আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষের তরফ থেকে মানবমণ্ডলীর প্রতি বিজ্ঞাপন এই যে, আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষ অংশীবাদীদের প্রতি অপ্রসন্ন। পরন্তু যদি তোমরা (বিদ্রোহিতা থেকে) প্রতিনিবৃত্ত হও, তবে তা' তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক; এবং যদি অগ্রাহ্য কর, তবে জানিও যে তোমরা আল্লাহকে পরাস্ত করিতে পারিবে না ; যারা ধর্মদ্রোহী হয়েছে, হে মোহম্মদ তাদের তুমি দুঃখকর শাস্তি সম্বন্ধে সংবাদ দাও। অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করেছ, আর যারা কোন বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে কোন ত্রুটি করে নাই, আর তোমাদের বিপক্ষে কাউকে সাহায্য করে নাই, তারা (পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপনের) বাহিরে ; অতঃপর তোমরা এদের প্রতি তোমাদের অঙ্গীকার নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পূর্ণ কর ; আল্লাহ অবশ্যই ধর্মভীরুদিগকে ভালবাসেন। অনন্তর যখন হজক্রিয়ার মাস সকল অতীত হয়, তখন যে স্থলে অংশীবাদীগণকে পাবে, সেখানেই তাদের সংহার কর, ধর, আবেষ্টন কর, এবং তাদের জন্য প্রত্যেক গম্য স্থানে ঘাঁটি করিয়া থাক ; কিন্তু যদি প্রতিনিবৃত্ত হয়, নামাজ কায়েম রাখে ও জাকাত দেয় ; তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও ; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু এবং অংশীবাদীদের কোন ব্যক্তি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহর বাক্য শ্রবণ করা পর্যন্ত তাকে আশ্রয় দাও, পরে তাকে তার নিজের আশ্রয়-ভূমিতে পাঠিয়ে দাও। এরা অজ্ঞান সম্প্রদায় এজন্য এই ব্যবস্থা।" —(তওবা-১)

"যারা আল্লাহর প্রতি ও অন্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাহার প্রেরিত পুরুষ যা' অবৈধ করেছেন, তা' অবৈধ করে না, এবং যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তারা যে পর্যন্ত হীনভাবে স্বহস্তে জিজিয়া না দেয়, সে পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর।" —(তওবা-৪)

"যাদের সঙ্গে কাফেরগণ সংগ্রাম করতে প্রবৃত্ত, তা'দিগকে (ধর্মযুদ্ধে) অনুমতি দেওয়া হয়েছে যেহেতু, তারা উৎপীড়িত ; নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য দানে সমর্থ। তারা বলে থাকে যে "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ" — কেবল এই কারণে তারা অন্যায়ভাবে আপন আপন ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এবং যদি মানুষ পরস্পর একজন দ্বারা অন্যজন দূরীকৃত না হত ; তবে মুসলমান সাধুদের তপস্যাকুটীর, ঈসায়ীদের ভজনালয়, ইহুদীদের অর্চনা-ভবন প্রভৃতি যে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে আল্লাহর নাম-কীর্তন হয়, সে সমুদয় ধ্বংস হয়ে যেত। এবং যে ব্যক্তি তাঁর (ধর্মের) সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান পরাক্রান্ত।" —(হজ-৬)

"আল্লাহ উপবেশনকারীদের চেয়ে সংগ্রামকারীদের উচ্চ পুরস্কার অধিক দিয়েছেন।" —(নেসা-১৩)

"পশ্চাতে পরিত্যক্ত লোকেরা পয়গম্বরের (স্বার্থের) বিরুদ্ধে উপবিষ্ট থাকতে সন্তুষ্ট হল আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপন সম্পত্তি ও জীবন যোগে যুদ্ধ করতে অসন্তুষ্ট হল এবং পরস্পর বললো, তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না।" তুমি বল, নরকের আগুন আরও বেশি গরম, যদি তারা বুঝতো (তবে এমন করতো না), অতএব তাদের অল্প হাস্য করা ও অধিক ক্রন্দন করা উচিত ; তারা যা করছে, তার প্রতিফল আছে। ...—(তওবা-১১)

এসব আয়েত থেকে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ অংশীবাদী কাফেরগণকে ও কপট বিশ্বাসীগণকে নরকাগ্নি আস্বাদন করাবেন। বিশ্বাসীদের প্রতি যে যুদ্ধাদেশ দেওয়া হয়েছে ও যুদ্ধে যে নীতি অবলম্বন করবার কথা বলা হচ্ছে, তা' অধুনা প্রচলিত কোন দেশের যুদ্ধ নীতির চেয়ে অধিক নিষ্ঠুর নয়, বরং অনেকাংশে অধিক উদার। উপবেশনকারীদের প্রতি তীক্ষ্ণতা ও সংগ্রামকারীদের প্রতি আবেগময় উৎসাহ-বাণী থেকে তখনকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাচ্ছে। পাছে কেউ হত্যাকাণ্ডকে নৃশংস বলে মনে করে, এজন্য বলা হচ্ছে 'হত্যার চেয়ে ধর্মদ্রোহিতা গুরুতর', আর হত্যা যা করবার তা' আল্লাহই করছেন, মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়েও বলা হচ্ছে ওরা যুদ্ধ করলে, তবে তোমরা যুদ্ধ করবে, কখনও সীমা লঙ্ঘন করবে না। আর ধর্মগ্রহণ করবার জন্য বল প্রয়োগ করতে বিশেষভাবে নিষেধ করে বলা হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে না ; তুমি কেবল সংবাদ পৌঁছাবার মালিক, তাদের উপর দারোগা নও। কোন স্থানে কোরান মুসলমানগণকে বলছে, তোমরা অংশীবাদীদের দেবদেবীর প্রতি কটূক্তি করো না; তা'হলে ওরাও তোমাদের আল্লাহর প্রতি কটূক্তি করবে। ইহুদীরা মুসলমানদের প্রতি কিরূপ বিশ্বাসঘতকতা করেছিল এবং বারবার সন্ধিভঙ্গ করেছিল, তা' ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রেখে, কোরানের যুদ্ধবিষয়ক শ্লোকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আদেশ মনে করায় হজরতের ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে। নিরপেক্ষ লোকের সেগুলি ভাল করে অনুসন্ধান করা উচিত।

## (ঙ) উপসংহার

কোরানের নানাস্থানে যুক্তির অবতারণা করে দেখান হয়েছে যে এই বিশ্ব আল্লাহর রচিত, পৃথিবীর যা' কিছু তাঁরই নির্দশন। এই নিদর্শনের দিকে মুক্ত-দৃষ্টিতে দেখবার ও বুঝবার জন্য বারংবার বলা হচ্ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, উন্মুখ হয়ে নূতন সত্য আহরণের চেষ্টা এবং নূতন সত্য, ভাব বা বাণী সমাগত হলে গতানুগতিকভাবে পুরাতনের মোহে আকৃষ্ট না থেকে নূতন সত্যকে গ্রহণ করা ধার্মিক লোকের কর্তব্য। অন্য কথায়, সময়ের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে, তাহলেই আল্লাহ পুরস্কার দিবেন। অন্যথায় তাদের ভীষণ দুর্গতিজনক শাস্তি হবে। আল্লাহর এই কথার প্রমাণ আমরা হাতে হাতেই পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে জাতি যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনের রহস্যোদ্ভেদে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই তখন জয়যুক্ত হয়েছে। অতএব, কোন জাতির জয়যুক্ত হওয়া সমগ্রভাবে সেই জাতির ধর্ম-প্রবণতা বা ঈশ্বরানুবর্তিতারই নিদর্শন মাত্র। পৃথিবীর চিন্তাধারা ও ভাবধারার সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকিলে, আল্লাহর সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয় না এবং জীবনে যে সমস্ত সমস্যা উপস্থিত হয়, তার মীমাংসাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যে জাতি আল্লাহর জ্ঞানে অনগ্রসর তার দুর্গতির শেষ

"পশ্চাতে পরিত্যক্ত লোকেরা পয়গম্বরের (স্বার্থের) বিরুদ্ধে উপবিষ্ট থাকতে সন্তুষ্ট হল আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপন সম্পত্তি ও জীবন যোগে যুদ্ধ করতে অসন্তুষ্ট হল এবং পরস্পর বললো, তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না।" তুমি বল, নরকের আগুন আরও বেশি গরম, যদি তারা বুঝতো (তবে এমন করতো না), অতএব তাদের অল্প হাস্য করা ও অধিক ক্রন্দন করা উচিত ; তারা যা করছে, তার প্রতিফল আছে। ...—(তওবা-১১)

এসব আয়েত থেকে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ অংশীবাদী কাফেরগণকে ও কপট বিশ্বাসীগণকে নরকাগ্নি আস্বাদন করাবেন। বিশ্বাসীদের প্রতি যে যুদ্ধাদেশ দেওয়া হয়েছে ও যুদ্ধে যে নীতি অবলম্বন করবার কথা বলা হচ্ছে, তা' অধুনা প্রচলিত কোন দেশের যুদ্ধ নীতির চেয়ে অধিক নিষ্ঠুর নয়, বরং অনেকাংশে অধিক উদার। উপবেশনকারীদের প্রতি তীক্ষ্ণতা ও সংগ্রামকারীদের প্রতি আবেগময় উৎসাহ-বাণী থেকে তখনকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাচ্ছে। পাছে কেউ হত্যাকাণ্ডকে নৃশংস বলে মনে করে, এজন্য বলা হচ্ছে 'হত্যার চেয়ে ধর্মদ্রোহিতা গুরুতর', আর হত্যা যা করবার তা' আল্লাহই করছেন, মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়েও বলা হচ্ছে ওরা যুদ্ধ করলে, তবে তোমরা যুদ্ধ করবে, কখনও সীমা লঙ্ঘন করবে না। আর ধর্মগ্রহণ করবার জন্য বল প্রয়োগ করতে বিশেষভাবে নিষেধ করে বলা হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে না ; তুমি কেবল সংবাদ পৌঁছাবার মালিক, তাদের উপর দারোগা নও। কোন স্থানে কোরান মুসলমানগণকে বলছে, তোমরা অংশীবাদীদের দেবদেবীর প্রতি কটূক্তি করো না; তা'হলে ওরাও তোমাদের আল্লাহর প্রতি কটূক্তি করবে। ইহুদীরা মুসলমানদের প্রতি কিরূপ বিশ্বাসঘতকতা করেছিল এবং বারবার সন্ধিভঙ্গ করেছিল, তা' ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রেখে, কোরানের যুদ্ধবিষয়ক শ্লোকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আদেশ মনে করায় হজরতের ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে। নিরপেক্ষ লোকের সেগুলি ভাল করে অনুসন্ধান করা উচিত।

## (ঙ) উপসংহার

কোরানের নানাস্থানে যুক্তির অবতারণা করে দেখান হয়েছে যে এই বিশ্ব আল্লাহর রচিত, পৃথিবীর যা' কিছু তাঁরই নির্দশন। এই নিদর্শনের দিকে মুক্ত-দৃষ্টিতে দেখবার ও বুঝবার জন্য বারংবার বলা হচ্ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, উন্মুখ হয়ে নূতন সত্য আহরণের চেষ্টা এবং নূতন সত্য, ভাব বা বাণী সমাগত হলে গতানুগতিকভাবে পুরাতনের মোহে আকৃষ্ট না থেকে নূতন সত্যকে গ্রহণ করা ধার্মিক লোকের কর্তব্য। অন্য কথায়, সময়ের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে, তাহলেই আল্লাহ পুরস্কার দিবেন। অন্যথায় তাদের ভীষণ দুর্গতিজনক শাস্তি হবে। আল্লাহর এই কথার প্রমাণ আমরা হাতে হাতেই পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে জাতি যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনের রহস্যোদ্ভেদে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই তখন জয়যুক্ত হয়েছে। অতএব, কোন জাতির জয়যুক্ত হওয়া সমগ্রভাবে সেই জাতির ধর্ম-প্রবণতা বা ঈশ্বরানুবর্তিতারই নিদর্শন মাত্র। পৃথিবীর চিন্তাধারা ও ভাবধারার সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকিলে, আল্লাহর সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয় না এবং জীবনে যে সমস্ত সমস্যা উপস্থিত হয়, তার মীমাংসাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যে জাতি আল্লাহর জ্ঞানে অনগ্রসর তার দুর্গতির শেষ

মানুষকে আল্লাহ খুব অকিঞ্চিৎকর পদার্থ থেকে সৃষ্টি করে তাকে কোন কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছেন। এখন সেই মানুষ যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে, বা অন্যকে আল্লাহ বলে মনে করে, তবে, তাতে আল্লাহর কি ক্ষতিবৃদ্ধি হতে পারে ? বস্তুতঃ আল্লাহর তাতে কিছুই আসে যায় না। আল্লাহ যে প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে শাস্তি দেন তা' নয়। যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে পূজা করে অর্থাৎ যিনি ফলদানে সক্ষম, তার কাছে না চেয়ে অন্যের কাছে ফল প্রার্থনা করে, বা অন্য কথায়, যারা নিষ্ফল কাজ করে সুফলের প্রত্যাশা করে আল্লাহর বিধান অনুসারে, বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মেই তার ক্রিয়াকলাপ পণ্ড হয়-- এই হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি বা ন্যায়বিচার। বাস্তবিক পক্ষে, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন না হয়ে কারো উপায় নাই, কারণ আমরা সবাই আল্লাহর এবং তাঁর অভিমুখেই আমাদের সকলের গতি। আল্লাহ বিবেক-সম্মত পথে লোককে চালিত করছেন, সেই পথই স্বাভাবিক, সরল প্রকৃতি-নির্দিষ্ট পথ। সেই পথ বিশ্বের কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়-- সেইটিই শান্তিছায়াময়, পরম আরাম ও সৌভাগ্যের পথ। কিন্তু লোকে যে পরিমাণে সেই পথ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে, সেই পরিমাণে সে আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য গ্রহণ করছে, আর তার শাস্তিও হচ্ছে অশেষ দুর্গতি। কেউ কেউ বলছেন ; মানবসভ্যতা এক বিরাট ব্যর্থতার ইতিহাস ; এখন জগদ্বাসী এমন এক সঙ্কটময় স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে যে, বিবিধ প্রকার বিরুদ্ধ সমস্যার সমাধান করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে ; তাই, সমাজে এক মহাবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে ; এমনকি বর্তমান লোভাসক্ত ও পরস্পর প্রেমশূন্য মনুষ্যসমাজ লোপ পেয়ে, প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সরল পথচারী নূতনতর এক অতিমানব সমাজ উদ্ভূত হতে পারে। যাই হোক, তিনি যা' করবেন, ন্যায় অনুসারেই করবেন। তিনি অতি দয়ালু— "এক বিন্দু সৎকাজ" করলে তার জন্য সুফল দেবেন ; আবার তিনি অন্তর্যামী, হৃদয়ে যে চিন্তা উদিত হয়, তিনি তারও খবর রাখেন। বাস্তবিক, এ সমস্তও আমরা হাতে হাতেই দেখতে পাচ্ছি। আমরা যা কিছু করি বা ভাবি তার ক্রিয়া আমাদের শরীর ও আত্মায় প্রতিফলিত হয়— স্বাস্থ্য-বিধি লঙ্ঘন করলে শরীরে তার চিহ্ন থাকে, আবার অসচ্চিন্তায় রত থাকিলে "অন্তঃকরণে সিল-মোহর অঙ্কিত হয়ে যায়"— বিবেক-বুদ্ধি বা সদসৎ বিচার বুদ্ধিই লোপ পায়। কোরানের আল্লাহ সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময় ; তাঁর ইচ্ছামাত্রই জগতের সমস্ত উদ্ভূত হয় ও লয় হয়। বাস্তবিক তাঁর রহস্য তিনি আপন নিদর্শনের ভিতর দিয়ে মানুষকে যতটুকু জানিয়েছেন, তার বেশি আর আমরা জানতে পারিনে। যে বিস্ময়ী শক্তি দ্বারা বিশ্বসংসার-নদী-পর্বত, পশু-পক্ষী, মানব-দানব, সূর্য-তারকা নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, তার সম্যক জ্ঞান তাঁরই কাছে আছে, সমস্ত শক্তি তাঁরই শক্তি। ভক্তি বিষয়ে আমরা সেই অনাদি অনন্ত, সদা জাগ্রত, ভীষণ দণ্ডধারী, করুণা-বিধান, অনুতাপ গ্রাহ্যকারী (পতিতপাবন), অসীম ক্ষমাশীল, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় অদ্বিতীয় মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হয়ে তাঁকেই বন্দনা করি, আমাদের সরল পথের সন্ধান বলে দেবার জন্য তাঁর কাছেই সকাতর মিনতি জানাই।

মোয়াজ্জিন
পৌষ-মাঘ ১৩৪০

# মহাগ্রন্থ কোরআনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমাবেশ

আজকাল ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ধর্ম কি বিজ্ঞান-সম্মত, অথবা বিজ্ঞানই কি ধর্ম-সম্মত? এ দুটো উক্তির কোনওটাই সত্য নয়। ধর্মের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে অপর সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবার সহায়তা করা। এর একটা প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কতকগুলো বিষয় না দেখেও বিশ্বাস করে নিয়ে, এইসব বিশ্বাসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে অপরের আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা বুঝে যথাসম্ভব নির্বিরোধে বা শান্তির সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। ধর্মের বিষয় হচ্ছে মানুষের নিজের জীবনটা কি, কেন, কোথা থেকে এলো, কি এর পরিণতি, এবং তার সঙ্গে অন্যসব মানুষ, জীবজন্তু, জড়-পদার্থ প্রভৃতির সম্পর্ক কি, সে-সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হ'য়ে নিজেকে আর-সবের সঙ্গে মানিয়ে চলা। অপর পক্ষে বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হ'ল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে মানুষ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করে, তারই উপর ভিত্তি করে এইসব প্রাকৃতিক ব্যাপারকে কার্য-কারণ-রূপে ব্যাখ্যা করে বিশ্ব-সংসারটাকে বুঝে নেওয়া। এসব বুঝে নেওয়া ব্যাপারেও তাকে কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ধরে নিতে হয়,— নইলে যুক্তি এগোয় না,—এর কোনও ভিত্তিই থাকে না। এসব স্বতঃসিদ্ধকে নিত্য-সত্য বলে গণ্য করা হয়; তার কারণ কি? কারণ এই যে, চিরকালই এসব ব্যাপার এইভাবেই চলে আসতে দেখা গেছে। তাই ভবিষ্যতেও এইভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু কাল যদি সূর্য না ওঠে, বাতাস যদি লুপ্ত হয়, কুয়া, কল, বা নদী-সমুদ্রের পানি যদি অন্তর্হিত হয়, তখন? বৈজ্ঞানিক বলেন, সে যখন হবে, তখন দেখা যাবে, বর্তমানে যে-নিয়ম চলছে, যা প্রত্যক্ষ জ্ঞান-গোচর হচ্ছে সেই হিসাবেই আমরা আমাদের কল্পনা, অনুমান-বুদ্ধি ইত্যাদি খাটিয়ে জগতকে ব্যাখ্যা করব। এসব নিয়ম যা চলছে, তা কেন চলছে, এসব কি কেউ সৃষ্টি করেছেন? এসব প্রশ্ন বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষগোচর যেটুকু রয়েছে সেই সম্বন্ধেই আমরা ভাবনাটা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে অবশ্যই প্রকৃতিগত বিভিন্নতা রয়েছে। তবু ধর্মের মধ্যেও অযৌক্তিক ব্যাপার ঢুকালে, তা লোকের কাছে বিশ্বাস্য হবে না, তাই ধর্মেরও একটা যুক্তি আছে। তেমনি বাহ্যজগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়বস্তু, এবং কিয়দংশ মানবীয় ব্যবহারও, যথাসম্ভব যুক্তি দিয়েই বুঝানো হ'য়ে থাকে। ধর্ম, জড়-পদার্থের কি সব গুণ আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে না-রাজ; আর বিজ্ঞান, 'অতীন্দ্রিয়' যে-সব ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে, অথবা না-ও থাকতে পারে, সে-সব বিষয়ে মাথা গলাতে যায় না। তবে বলা যেতে পারে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হ'লেও উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তি ব্যবহার এবং সেই যুক্তির আনুষ্ঠানিক স্বতঃসিদ্ধ—তা অতীন্দ্রিয় পরম বিশ্বাসই হোক বা আপাতত প্রচলিত 'নিত্যসত্যই হোক'—যুক্তি ব্যবহার উভয়ত্রই রয়েছে।

কোরআনে বহু স্থানে 'যুক্তি' ব্যবহারের কথা বলা হ'য়েছে—আর সে কথাগুলো কেবলি যে অতীন্দ্রিয় তা নয়, অনেক বিষয়ই প্রত্যক্ষভাবে এই বাস্তব জগতেই ঘটতে পারে। অবশ্যই ইন্দ্রিয়াতীত যে-সব কথা আছে, সেগুলো যদি বুঝা না-ই যায়, বাস্তব জগতে সাময়িক, ঐতিহাসিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত যে-সব কথা রয়েছে, সেগুলোকে কোনও ক্রমেই দুর্বোধ্য বলা যায় না। এ প্রবন্ধে শুধু উদ্বোধনী সূরা 'ফাতেহা' এবং দ্বিতীয় সূরা 'বকর' থেকেই কতকগুলো আয়াত বা শ্লোকের তর্জমা দিয়ে বক্তব্যটা যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সূরা 'ফাতেহা'র তর্জমা এই :

(১) অপার করুণাময়[১] পরম দয়াল[২] আল্লার নাম[৩] (স্মরণে এই প্রারম্ভিক)।
(২) সকল স্তুতি প্রশংসা আল্লারই প্রাপ্য, যিনি সমুদয় বিশ্বজগতের প্রতিপালক;
(৩) যিনি নির্বিশেষ করুণার উৎস, সুকৃতির পুরস্কারক ও দুষ্কৃতির দণ্ডবিধায়ক;
(৪) আর যিনি শেষবিচারের মহামহিম অধিপতি।
(৫) আমরা শুধু তোমাকেই বন্দনা করি, আর শুধু তোমারই সহায়তা কামনা করি।
(৬) অতএব, তুমি সরল ও সুদৃঢ় পথে আমাদের চালিত করো।
(৭) যে-পথে চলে পূর্ববর্তীরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে সেই পথে আমাদের চালিয়ে নেও, আর যে ভ্রান্তপথে চলার ফলে ভ্রষ্ট-পন্থীরা তোমার রোষের পাত্র হ'য়েছে, সে পথে আমাদের চলতে দিয়ো না।

এর প্রথম আয়াতটা 'আরম্ভিক', অর্থাৎ যে কোনও মঙ্গলজনক কাজ করবার পূর্বেই এই বাক্যটা উচ্চারণ করা বিধেয়—যেমন আহার করা, কোরআন পাঠ করা, কোথায়ও যাত্রা করা, কোনও অঙ্গীকারপত্র লেখা, কোনও উস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, কোনও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। এই সূরায় আয়াতগুলো যে-ভাবে সাজানো হয়েছে, তা সাধারণ লোকে তাদের মানব-প্রভুর করুণা উদ্রেক করবার জন্য যেমন করে বলে থাকে ঠিক সেই ক্রমেই সাজানো হ'য়েছে। প্রথমে কিছু প্রশংসা দয়াগুণের উল্লেখ, তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বীকৃতি এবং মহামহিম বিচারকর্তার সম্মুখে বিনয়-নম্র ও সন্ত্রস্ত ভাব, তারপর তাঁর কৃপা ও সাহায্য প্রার্থনা এবং সর্বশেষে পরকালেও ভবিষ্যৎ সুখের অভিলাষে সৎপথ প্রদর্শনের আর ভ্রান্তপথ থেকে নিবৃত্ত থাকবার জন্য তাঁর কাছে সকাতর প্রার্থনা করা হয়েছে। আমাদের মানবীয় বুদ্ধিতে এই হচ্ছে যুক্তির পরম্পরা। এই ধরনটা অবশ্যই বিজ্ঞান-সম্মত।

তবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ কেমন, তাঁর প্রকৃতি কিরূপ, এসব বিষয় মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। তবু তাঁর সম্বন্ধে মানুষে নিজেদের যুক্তিতর্ক, অনুমান ও কল্পনা দ্বারা বিশ্বজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, কতকগুলো গুণের সমাবেশ ক'রে তাঁর স্বরূপ বুঝবার

---

১. অপার করুণাময় রহমান, যিনি নির্বিশেষে সমুদয় সৃষ্ট জীবের জন্য কতই না দ্রব্যসম্ভার সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাদের ব্যবহারের জন্য। তিনি একাধারে স্রষ্টা ও রক্ষক। এ নাম—'রহমান'—শুধু আল্লার প্রতি প্রযোজ্য।

২. পরম দয়াল—রহীম, যিনি সুকৃতির যথাযোগ্য পুরস্কার ও দুষ্কৃতির দণ্ড প্রদান করেন। এ নাম রহীম—মানুষের প্রতিও প্রযোজ্য।

৩. আল্লার নাম— আল্লার নাম দিয়ে আরম্ভ (করলাম); কিংবা আল্লার নাম স্মরণে (এই আরম্ভিক বাক্য)।

বা অনুভব করবার চেষ্টা করেছে। মানুষের ভাষা আর মানবীয় অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোন্ ভিত্তিতেই বা তাঁর ধ্যান-ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব? মানুষ নিজেকে 'আশ্‌রাফুল্ মখ্‌লুকাত' বা সমুদয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবরূপে কল্পনা করে থাকে। এসব কথাই ধর্মগ্রন্থে বলা হ'য়ে থাকে আল্লারই দোহাই দিয়ে। অর্থাৎ, মানুষের নিজের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর মহত্তম আদর্শই আল্লার প্রতি আরোপিত হ'য়েছে।

কিন্তু এরূপ বর্ণনা যে শুধুই আল্লাহ্ সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করবার জন্যই, তাঁর প্রকৃত সত্তা কেমন তা কোনও মানুষেরই জ্ঞানায়ত্ত নয়, একথাও পবিত্র কোরআনে একাধিকবার উল্লেখ করা হ'য়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে-সব বর্ণনা করা হয়েছে—যেমন আল্লার আরশ, ফেরেশতা, বেহেশত-দোজখ, জীন, শয়তান—ইত্যাদি সেগুলো মানুষের বোধগম্য রূপক হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমরা মানবীয় যুক্তি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তের যে-সব সৌধ রচনা করি, তার বাইরেও অনেক কথা আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যও নয়, চিন্তা-গ্রাহ্যও নয়। তবু ইন্দ্রিয়গোচর তথ্যাদি ব্যবহার করবার তাগিদও ধর্মশাস্ত্রেই রয়েছে। ধর্মগ্রন্থের অতীন্দ্রিয় কল্পনা বা রূপকাদি নিয়ে বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত না হওয়ারও নির্দেশ রয়েছে। এর থেকে দেখতে পাই ধর্মীয় যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করতে হ'লে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই কোনও কোনও সূত্র এর অন্তর্গত করে নেওয়া আবশ্যক হয়। এখানে স্মরণীয়, বর্তমান গণিতশাস্ত্রও অভিজ্ঞতানির্ভর নয় এমন কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে চতুর্বিস্তারী বা বহুবিস্তারী জ্যামিতি ও ব্যাপ্তি (four dimensional or multidimensional Geometry or Space) স্বীকার করা হ'য়ে থাকে। এর মধ্যে শুধু বাচনিক (verbal) বা বীজগাণিতিক সঙ্গতি রক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়,—যেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এ-গুলোর যাচাই করার জন্য প্রতিকৃতি বা চিত্রণ করতে পারিনে। এ ছাড়া আমরা বেশ কয়েক শতাব্দী আগেই জানতে পেরেছি শব্দ, আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির তরঙ্গাঘাতের বহুলাংশই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহিতার বহির্ভূত হ'য়ে রয়েছে। অতএব অতিপ্রাকৃত কোনও স্বতঃসিদ্ধ গ্রহণ করে একটা খেয়ালীজগৎ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাটাকেও আমরা খামখেয়ালী বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে। তাই অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি সম্বন্ধে কেউ যদি বলেন, 'আমার হৃদয়ে আমি অমুক রকম অভিজ্ঞতা পেয়েছি'—তা হ'লে যাঁর খুশী তিনি তা স্বীকার করতে পারেন, আবার স্বীকার নাও করতে পারেন। এমনও হ'তে পারে যে একজনের পক্ষে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য সেটা অপরের অভিজ্ঞতা দূরে থাকুক, চিন্তারও বহির্ভূত; তাই ব্যাপারটা তার কাছে অন্ততঃ সন্দেহজনক বলে মনে হবে। আর ঐ লোকটা যে বুজুর্গী দেখাবার জন্য তাহা মিথ্যা কথা বলছে না, তারই বা ঠিক কি? হয়ত মানবীয় অনুভূতি প্রাচুর্যের মাত্রাভেদে কোনও এক ব্যাপার কারো কাছে প্রত্যক্ষ সত্য হ'লেও সেটা অন্যের অগ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে সেটা যে 'অসম্ভব' এ-কথাও জোর করে বলা যায় না। আল্লাহ্ মানুষের মনের ভিতর ভাব ঢুকিয়ে দিতে পারেন, বা ফুঁ দিয়ে কারো হৃদয়ে তাঁর নিজের রুহ, বাণী কিংবা ক্রিয়া সঞ্চারিত করতে পারেন, এমন কথা যদি অভিজ্ঞতাসূত্রে সদা-সত্যবাদী সচ্চরিত্র লোকেরা বলেন, তা' হলে অন্য সাধারণ লোকে নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, সংস্কার, অহমিকা অথবা শুধু অনুকরণ-প্রিয়তা থেকেই কেউ বিশ্বাস করবেন, কেউ অবিশ্বাস করবেন, কেউ হয়ত সংশয়িত হবেন, আবার কেউ বা দাবীদারকে একেবারেই মিথ্যুক বলেও অভিহিত করতে পারেন। কিন্তু অভিপ্রায় অনুসারে ধরতে গেলে লোকটাকে একেবারে 'পাগল' বলে ঠাওরানো যুক্তিযুক্ত নয়।

বা অনুভব করবার চেষ্টা করেছে। মানুষের ভাষা আর মানবীয় অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোন্ ভিত্তিতেই বা তাঁর ধ্যান-ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব? মানুষ নিজেকে 'আশ্‌রাফুল্ মখলুকাত' বা সমুদয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবরূপে কল্পনা করে থাকে। এসব কথাই ধর্মগ্রন্থে বলা হ'য়ে থাকে আল্লারই দোহাই দিয়ে। অর্থাৎ, মানুষের নিজের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর মহত্তম আদর্শই আল্লার প্রতি আরোপিত হ'য়েছে।

কিন্তু এরূপ বর্ণনা যে শুধুই আল্লাহ্ সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করবার জন্যই, তাঁর প্রকৃত সত্তা কেমন তা কোনও মানুষেরই জ্ঞানায়ত্ত নয়, একথাও পবিত্র কোরআনে একাধিকবার উল্লেখ করা হ'য়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে-সব বর্ণনা করা হয়েছে—যেমন আল্লার আরশ, ফেরেশতা, বেহেশত-দোজখ, জীন, শয়তান—ইত্যাদি সেগুলো মানুষের বোধগম্য রূপক হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমরা মানবীয় যুক্তি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তের যে-সব সৌধ রচনা করি, তার বাইরেও অনেক কথা আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যও নয়, চিন্তা-গ্রাহ্যও নয়। তবু ইন্দ্রিয়গোচর তথ্যাদি ব্যবহার করবার তাগিদও ধর্মশাস্ত্রেই রয়েছে। ধর্মগ্রন্থের অতীন্দ্রিয় কল্পনা বা রূপকাদি নিয়ে বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত না হওয়ারও নির্দেশ রয়েছে। এর থেকে দেখতে পাই ধর্মীয় যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করতে হ'লে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই কোনও কোনও সূত্র এর অন্তর্গত করে নেওয়া আবশ্যক হয়। এখানে স্মরণীয়, বর্তমান গণিতশাস্ত্রও অভিজ্ঞতানির্ভর নয় এমন কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে চতুর্বিস্তারী বা বহুবিস্তারী জ্যামিতি ও ব্যাপ্তি (four dimensional or multidimensional Geometry or Space) স্বীকার করা হ'য়ে থাকে। এর মধ্যে শুধু বাচনিক (verbal) বা বীজগাণিতিক সঙ্গতি রক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়,—যেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এ-গুলোর যাচাই করার জন্য প্রতিকৃতি বা চিত্রণ করতে পারিনে। এ ছাড়া আমরা বেশ কয়েক শতাব্দী আগেই জানতে পেরেছি শব্দ, আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির তরঙ্গাঘাতের বহুলাংশই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহিতার বহির্ভূত হ'য়ে রয়েছে। অতএব অতিপ্রাকৃত কোনও স্বতঃসিদ্ধ গ্রহণ করে একটা খেয়ালীজগৎ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাটাকেও আমরা খামখেয়ালী বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে। তাই অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি সম্বন্ধে কেউ যদি বলেন, 'আমার হৃদয়ে আমি অমুক রকম অভিজ্ঞতা পেয়েছি'—তা হ'লে যাঁর খুশী তিনি তা স্বীকার করতে পারেন, আবার স্বীকার নাও করতে পারেন। এমনও হ'তে পারে যে একজনের পক্ষে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য সেটা অপরের অভিজ্ঞতা দূরে থাকুক, চিন্তারও বহির্ভূত; তাই ব্যাপারটা তার কাছে অন্ততঃ সন্দেহজনক বলে মনে হবে। আর ঐ লোকটা যে বুজুর্গী দেখাবার জন্য তাহা মিথ্যা কথা বলছে না, তারই বা ঠিক কি? হয়ত মানবীয় অনুভূতি প্রাচুর্যের মাত্রাভেদে কোনও এক ব্যাপার কারো কাছে প্রত্যক্ষ সত্য হ'লেও সেটা অন্যের অগ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে সেটা যে 'অসম্ভব' এ-কথাও জোর করে বলা যায় না। আল্লাহ্ মানুষের মনের ভিতর ভাব ঢুকিয়ে দিতে পারেন, বা ফুঁ দিয়ে কারো হৃদয়ে তাঁর নিজের রুহ, বাণী কিংবা ক্রিয়া সঞ্চারিত করতে পারেন, এমন কথা যদি অভিজ্ঞতাসূত্রে সদা-সত্যবাদী সচ্চরিত্র লোকেরা বলেন, তা' হলে অন্য সাধারণ লোকে নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, সংস্কার, অহমিকা অথবা শুধু অনুকরণ-প্রিয়তা থেকেই কেউ বিশ্বাস করবেন, কেউ অবিশ্বাস করবেন, কেউ হয়ত সংশয়িত হবেন, আবার কেউ বা দাবীদারকে একেবারেই মিথ্যুক বলেও অভিহিত করতে পারেন। কিন্তু যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে ধরতে গেলে লোকটাকে একেবারে 'পাগল' বলে ঠাওরানো যুক্তিযুক্ত নয়।

তবে সাধারণতঃ দাবীদারের যোগ্যতা ও পূর্ব-ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুকূল হলে তিনি যে ইচ্ছা করে সত্যের অপলাপ করছেন, এরূপ মনে করা অবিচার হবে। অনেক সময় দেখা যায়, আল্লাহ যাঁদের প্রতি সত্য সত্যই অনুগ্রহ করে তাঁদের মনে কোনও ভাব জাগ্রত করে দেন, তাঁদের কথা প্রথমে অল্প কয়েকজনে মেনে নেন, পরে ঐতিহাসিক বা সামাজিক ব্যাপারে এর তত্ত্বফল প্রকাশিত হ'লে সবিশেষ দ্রুততার সঙ্গেই তাঁর মতটা অধিকাংশ লোকেই মেনে নেন। প্রথম বিশ্বাসীদের অনেকেই হয়ত অদৃশ্যকে না দেখেই দাবীদারের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। এই কথাই কোরআন শরীফে 'ঈমান বিল গায়েব' বলে উল্লিখিত হ'য়েছে।

কোরআন শরীফের দ্বিতীয় সূরা 'বকর'-এর কয়েকটা রুকুর কতকগুলো আয়াতের অনুবাদ এই :

২-১-২ (ক) : "এই দিলেন্দেহে সেই পুস্তক : এতে আছে ধর্মগ্রাহীদের জন্য পথের দিশা।"

২-১-৩ : "ধর্মগ্রাহী তারাই যারা দর্শন-বিনাই অলক্ষণীয়কে বিশ্বাস করে, তাঁর স্তুতিতে অবিচল থাকে, আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে সদ্ব্যয় করে।"

২-১-৪ : "আর তোমার উপর আর তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যে-সব গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সে-সবে বিশ্বাস করে, আর শেষ পরিণতি বা পরকালকে সুদৃঢ় সত্য বলে জানে।"

২-১-৫ : "এরাই তাদের প্রভুর নির্দেশিত সুপথে আছে, আর এরাই মোক্ষ লাভ করবে।"

২-১-৬ : "আর যারা ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের তুমি উপদেশ দিলেও যা,' না দিলেও তা-ই; তারা কিছুতেই সুধর্ম মেনে নেবে না।"

২-১-৭ : "আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কর্ণের উপর ছাপ মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে লাগিয়ে দিয়েছেন পর্দা; তাদের ভাগ্যে আছে অশেষ দুর্ভোগ।"

এসবের মর্মার্থ এই যে যারা আল্লার নির্দেশের অনুগত তারাই ধর্মগ্রাহী, আর যারা আল্লার আদেশ অগ্রাহ্য করবে তারাই ধর্মদ্রোহী। অন্য কথায় ধর্ম সৎ, অধর্ম অসৎ। ইহলোক ও পরলোকে ধর্মানুরাগীরা সুখে থাকবে, ধর্মদ্রোহীরা নানা দুর্ভোগ পোহাবে।

২-২-১৩ : "তাদের যখন বলা হয়, আর সকলের মত তোমারও বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে কি, আমরা কি ঐ সব আহম্মক ছোটলোকের মত বিশ্বাস করব? তা নয়; আসলে, এরাই হচ্ছে নির্বোধ, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না।"

২-২-১৬ : "এরা এমন লোক যারা বিপথ বেছে নিয়েছে সুপথের বদলে; ফলে তাদের এটা লাভের বাণিজ্য হয়নি; আর তারা সুপথের দিশে হারিয়ে ফেলেছে।"

এখানে দেখা যাচ্ছে এরা অহমিকার বলে জনসাধারণকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নির্বোধ মনে করছে। আর নিজেরা আপন বুদ্ধিতে ভ্রান্ত পথটাই বেছে নিয়ে মূর্খের মতই আনন্দ বোধ করছে। অহঙ্কারই পতনের মূল। অহঙ্কারেই শয়তানের পতন হয়েছিল।

২-৮-৬২ : "যারা ধর্মগ্রহণ করেছে, যারা ইহুদী ধর্ম মেনে চলে, আর যারা খ্রীষ্টান অথবা সাবেয়ী ধর্ম অবলম্বন করেছে, তাদের মধ্যেও যারা আল্লাকে স্বীকার করে, পরলোককে সত্য বলে মানে আর সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লার কাছে

তবে সাধারণতঃ দাবীদারের যোগ্যতা ও পূর্ব-ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুকূল হ'লে তিনি যে ইচ্ছা করে সত্যের অপলাপ করছেন, এরূপ মনে করা অবিচার হবে। অনেক সময় দেখা যায়, আল্লাহ যাঁদের প্রতি সত্য সত্যই অনুগ্রহ করে তাঁদের মনে কোনও ভাব জাগ্রত করে দেন, তাঁদের কথা প্রথমে অল্প কয়েকজনে মেনে নেন, পরে ঐতিহাসিক বা সামাজিক ব্যাপারে এর তত্ত্বফল প্রকাশিত হ'লে সবিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর মতটা অধিকাংশ লোকেই মেনে নেন। প্রথম বিশ্বাসীদের অনেকেই হয়ত অদৃশ্যকে না দেখেই দাবীদারের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। এই কথাই কোরআন শরীফে 'ঈমান বিল গায়ব' বলে উল্লিখিত হ'য়েছে।

কোরআন শরীফের দ্বিতীয় সূরা 'বকর'-এর কয়েকটা রুকুর কতকগুলো আয়াতের অনুবাদ এই :

২-১-২ (ক) : "এই নিরন্দেহে সেই পুস্তক : এতে আছে ধর্মগ্রাহীদের জন্য পথের দিশা।"

২-১-৩ : "ধর্মগ্রাহী তারাই যারা দর্শন-বিনাই অলক্ষণীয়কে বিশ্বাস করে, তাঁর স্তুতিতে অবিচল থাকে, আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে সদ্ব্যয় করে।"

২-১-৪ : "আর তোমার উপর আর তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যে-সব গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সে-সবে বিশ্বাস করে, আর শেষ পরিণতি বা পরকালকে সুদৃঢ় সত্য বলে জানে।"

২-১-৫ : "এরাই তাদের প্রভুর নির্দেশিত সুপথে আছে, আর এরাই মোক্ষ লাভ করবে।"

২-১-৬ : "আর যারা ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের তুমি উপদেশ দিলেও যা,' না দিলেও তা-ই; তারা কিছুতেই সুধর্ম মেনে নেবে না।"

২-১-৭ : "আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কর্ণের উপর ছাপ মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে লাগিয়ে দিয়েছেন পর্দা; তাদের ভাগ্যে আছে অশেষ দুর্ভোগ।"

এসবের মর্মার্থ এই যে যারা আল্লার নির্দেশের অনুগত তারাই ধর্মগ্রাহী, আর যারা আল্লার আদেশ অগ্রাহ্য করবে তারাই ধর্মদ্রোহী। অন্য কথায় ধর্ম সৎ, অধর্ম অসৎ। ইহলোক ও পরলোকে ধর্মানুরাগীরা সুখে থাকবে, ধর্মদ্রোহীরা নানা দুর্ভোগ পোহাবে।

২-২-১৩ : "তাদের যখন বলা হয়, আর সকলের মত তোমারও বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে কি, আমরা কি ঐ সব আহম্মক ছোটলোকের মত বিশ্বাস করব? তা নয়; আসলে, এরাই হচ্ছে নির্বোধ, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না।"

২-২-১৬ : "এরা এমন লোক যারা বিপথ বেছে নিয়েছে সুপথের বদলে; ফলে তাদের এটা লাভের বাণিজ্য হয়নি; আর তারা সুপথের দিশে হারিয়ে ফেলেছে।"

এখানে দেখা যাচ্ছে এরা অহমিকার বলে জনসাধারণকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নির্বোধ মনে করছে। আর নিজেরা আপন বুদ্ধিতে ভ্রান্ত পথটাই বেছে নিয়ে মূর্খের মতই অনেক বোধ করছে। অহঙ্কারই পতনের মূল। অহঙ্কারেই শয়তানের পতন হয়েছিল।

২-৮-৬২ : "যারা ধর্মগ্রহণ করেছে, যারা ইহুদী ধর্ম মেনে চলে, আর যারা খ্রীষ্টান অথবা সাবেয়ী ধর্ম অবলম্বন করেছে, তাদের মধ্যেও যারা আল্লাকে স্বীকার করে, পরলোককে সত্য বলে মানে আর সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লার কাছে

যথাযোগ্য পুরস্কার রাখা রয়েছে, তাদের কোনও ভয় বা বিপদ নেই, আর তাদের পরিণামে পস্তাতে হবে না।"

এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু মুখে একটা ধর্ম স্বীকার করলেই হবে না। আল্লাহ আছেন, পরকাল আছে এসব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্মও করতে হবে, তবেই হবে প্রকৃত পুণ্য-সঞ্চয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি।

২-৯-৭৯ : "যারা নিজের হাতে বই লিখে বলে 'আল্লার কাছ থেকে এসেছে এ বই,' তারা ধ্বংসে হোক। এরা কিঞ্চিৎ ব্যবসাদারীর খাতিরে এসব করে—এদের লভ্য অতি সামান্য। আবার বলি, তারা স্বহস্তে ঐ রকম ধোকাবাজী কেতাব লিখেছে, তাদের প্রতি ধিক্কার, আর ওর থেকে তারা যা উপার্জন করছে তাতেও ধিক।"

এখানে মিথ্যাবাদী, কপট ও লোভী লোকদের প্রতি ধিক্কার বর্ষিত হ'য়েছে। সেকালে, বিশেষ করে ইহুদী ধর্মযাজকদের এরূপ অভ্যাস ছিল।

২-১২-১০১ : "আবার যখন তাদের আসল গ্রন্থে যা লেখা আছে আল্লার কাছ থেকে তারই পরিপোষক আর এক গ্রন্থ নিয়ে একজন প্রেরিত পুরুষ আসলেন তখন গ্রন্থধারীদের একদল ঐ গ্রন্থ (অমান্য করে) পিঠের পিছনে ফেলে রাখল,—ভারখানা এই যে তারা যেন এমনসব আজগুবি কথা কোনও দিনই জানে নাই, শোনেও নাই।"

এখানেও ইহুদীদের অধিকাংশ লোকই যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রত্যাখ্যান করলো সেই কথা বলা হয়েছে। আবার পরবর্তী কালে যে খ্রীষ্টানরাও ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখান করেছিল, তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

২-১৩-১১১ : "তারা বলে, ইহুদী বা খ্রীষ্টান ব্যতীত আর কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না। এ হচ্ছে তাদের অলীক কল্পনা। তাদের বল, তাদের কথাই যে ঠিক তার প্রমাণ দেখাক।"

২-১৩-১১২ : "না না (ওদের কথা সত্য নয়) যারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে আল্লার হাতে সঁপে দিয়েছে আর (সেই সঙ্গে) সৎকর্মও করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লার কাছ থেকে পুরস্কার। তাদের নেই কোনও ভয় কোনও দুশ্চিন্তা।"

এখানেও নতুন সত্যধর্ম ইসলামের আবির্ভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অধিকাংশ লোক যে একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করেছিল, সেই কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে শুধু মনে মনে সাধু হ'লেই মোক্ষলাভ হবে না,—আল্লার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে আর লোকহিতও সাধন করতে হবে।

২-১৪-১১৫ : "পূর্ব পশ্চিম সব দিকই আল্লার; যে দিকেই মুখ ফিরাও দেখতে পাবে সেদিকেই রয়েছে আল্লার মুখ (বা উপস্থিতি)। তিনি অবশ্যই সর্বব্যাপী।"

২-১৪-১১৬ : ওরা (খ্রীষ্টানেরা) বলে আল্লাহ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন। আল্লার পবিত্রতা ধ্বনিত হোক। আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ত তাঁর। সবই আনত হ'য়ে তাঁরই বন্দনা করছে।"

২-১৪-১১৭ : "আকাশগুলো আর পৃথিবী সৃষ্টির তিনিই ত আদি কারণ। তিনি যখন কোনও কিছু করবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন 'হোক' আর অমনি তা হ'য়ে যায়।"

২-১৪-১১৮ : "অজ্ঞেরা বলে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? কিংবা তাদের কাছে কেন আয়াত বা নির্দশনবাণী আসে না? আগেকার যুগের লোকেও ঠিক এরূপ কথাই বলেছিল। তাদের মনও ছিল এদেরই মত। আমি ত স্পষ্ট নির্দশন-বাণী পাঠিয়েছি, কিন্তু তা বুঝতে পেরেছে শুধু সেই দল যাদের মনে রয়েছে আল্লার দৃঢ় প্রত্যয়।"

এসব আয়াতে বলা হ'য়েছে, স্বর্গে-মর্ত্যে যা কিছু আছে সবই ত আল্লার। তিনি আবার একটা একটা সন্তান গ্রহণ করতে যাবেন কেন? ইহুদী হোক, খ্রীষ্টান হোক আর যে কোনও ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, তিনি ত নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন সর্বত্র; যারা মনে-প্রাণে বুঝতে চায়, তারাই কেবল সত্য গ্রহণ করতে পারে, অন্যে পারে না।

২-১৪-১২০ : "ইহুদী বা খ্রীষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি দেশের ও দশের অনুবর্তী হও। তাদের তুমি বলে দাও আল্লার দেওয়া যে নির্দেশ, সেই হচ্ছে প্রকৃত পন্থা। যদি তুমি তোমার কাছে সদ্‌জ্ঞান আসবার পরেও তাদের মনগড়া কল্পনার তাবেদারী কর, তাহ'লে, (জেনে রাখ) আল্লার কাছ থেকে তুমি কোন আশ্রয় বা সাহায্য পাবে না।"

২-১৪-১২১ : "যাদের কাছে ঐশীগ্রন্থ পাঠানো হ'য়েছে তারা তা প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত পাঠ করুক। যারা এরূপ করবে, তারাই সত্যি সত্যি ঐ গ্রন্থে বিশ্বাসী। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে, (তদ্বারা) তারা নিজেদেরই অনিষ্ট করবে।"

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা ইহুদী বা খ্রীষ্টান, তারা সচরাচর (যুগোপযোগী) নতুন ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করবে না। হজরত মুহম্মদকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, খবরদার, তুমি ওদের ধোকায় ভুল পথে পা বাড়িয়ো না; যদি তেমন কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমার উপর থেকে তাঁর সৌহার্দ্য ও সহায়তা প্রত্যাহার করবেন।

২-১৯-১৫৩ : "হে ধর্মগ্রাহী (মুমিন)-গণ, তোমরা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আরাধনার সহিত সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীলদের সঙ্গেই আল্লাহ রয়েছেন।"

২-১৯-১৫৪ : "আর যারা আল্লার পথে কাজ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে, 'তারা মরে গেছে,'—এমন কথা বলো না বরং তারা জীবিতই আছে, তোমরা তা অনুভব করতে পারছ না।"

২-১৯-১৫৫ : "নিশ্চয় জেনো, আমি তোমাদের পরীক্ষা করি কতকটা ভয়, ক্ষুধা, ধনক্ষয়, জনক্ষয়, ফল-ক্ষয় দিয়ে; আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা ধৈর্য ধরে কষ্ট সহ্য করে।"

২-১৯-১৫৬ : "যারা সমূহ বিপদে পড়লে বলে, 'আমরা ত আল্লারই, আর তাঁর সকাশেই আমরা চলেছি'।"

২-১৯-১৫৭ : "এরাই তারা যাদের উপর আল্লার আশিস্‌ ও কৃপা (বর্ষিত হয়); এরাই চলেছে সত্য পথে।"

এই আয়াতগুলোতে আল্লার পথে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নির্ভয়তার সহিত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালাবার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

২-২০-১৬৪ : "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের অনুক্রমে মানুষের সুবিধার জন্য সমুদ্র-সঞ্চরমান জাহাজে, আর আল্লার আকাশ থেকে বারি-বর্ষণ করে যে-ভাবে শুষ্ক মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করে নানা জীবজন্তুর বাসস্থানে পরিণত করেছেন তাতে আর যে-ভাবে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বায়ু ও মেঘের পরিবর্তন করে ওদেরকে দাসের মত পরিচালিত করেছেন,—এসবের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান জাতির জন্য অর্থময় সঙ্কেত।"

২-২০-১৬৫ : "তবু দেখ, বহু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে তাঁর সমকক্ষরূপে গণ্য ক'রে আল্লার প্রতি যে অনুরাগ শোভা পায়, সেইরূপ অনুরাগে তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে ; আর যারা ধর্মগ্রাহী তারা প্রগাঢ় ভক্তিভরে আল্লাকেই প্রিয় জ্ঞান করে। কিন্তু ধর্ম-প্রত্যাখ্যানকারীরা যদি এর সংশ্লিষ্ট শাস্তিটাও দেখতে পেত, তাহ'লে বুঝতে পারতো, একমাত্র আল্লাই হচ্ছেন যাবতীয় ক্ষমতার অধীশ্বর, আর তিনি শাস্তি দানেও অতি ভয়ঙ্কর।"

এ-স্থলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ব্যাপারাদি থেকে যথার্থ জ্ঞান আহরণের কথা বেশ জোরে-শোরেই বলা হয়েছে ; আর আল্লার বিধিবিধান লংঘন করবার পরিণাম যে অতি ভীষণ সে সম্বন্ধেও সতর্ক ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।

২-২১-১৭০ : "ওদের যখন বলা হয়, 'তোমরা আল্লার প্রেরিত বাণী অনু-সরণ কর'; ওরা তখন জওয়াব দেয়, 'তার চেয়ে বরং আমাদের বাপ-দাদাদের যেমন করতে দেখেছি, আমরা সেই রীতিই অনুসরণ করব।' এ কেমন কথা? তাদের পূর্বপুরুষেরা যদি অজ্ঞ বা ভ্রান্ত-পথে চালিত হ'য়ে থাকেন, তবুও তারা তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করবে?"

এখানে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কুসংস্কার ত্যাগ করে প্রকৃত সরল ও সত্য পথে চলবার উপর জোর দেওয়া হ'য়েছে। এই মনোভাব অবশ্যই আধুনিক, আবার বিজ্ঞানসম্মতও বটে।

২-২৫-২১৩ : "আদিতে সব মানুষ ছিল সম্মিলিত একটামাত্র জাতি। তারপর যখন এদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, তখন আল্লাহ ঐসব বিরোধ মীমাংসার জন্য সুসংবাদ ও সাবধান-বাণী সহ নবীদের পাঠান। কিন্তু সুস্পষ্ট সত্যবাণী প্রাপ্ত হওয়ার পরেও তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ঐশীগ্রন্থের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বিভক্ত হ'য়েই রইল। তবে যারা ধর্মগ্রাহী তারা আল্লার অনুমতিতে বিবদমান বিষয়ের প্রকৃত সমাধান পেয়ে গেল; কারণ আল্লাহ যাকে খুশী (অর্থাৎ যাকে ভাল মনে করেন) তাকেই সুদৃঢ় সরল পথ প্রদর্শন করেন।"

২-২৫-২১৪ : "তোমরা কি ভেবেছ, পূর্ববর্তীরা যে-সব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে বেহেশ্‌তের উদ্যানে প্রবেশ করেছে, তোমরা সে-সব ব্যক্তিরেকেই বেহেশ্‌তে

প্রবেশ করবে?" তারা ভোগ করেছে দুর্দিন, অমঙ্গল আর ভূমিকম্পের মত প্রলয়ঙ্করী হৃৎকম্প—এমনকি রসুল এবং তাঁর বিশ্বাসী সঙ্গীরা পর্যন্ত বলে উঠেছে 'কোথায় আল্লার সহায়তা?' হাঁ, জেনে রাখো, আল্লার সাহায্য নিকটেই আছে।"

এখানে বলা হ'য়েছে কত ঐকান্তিক সাধনায়, কত পরীক্ষার ভিতর দিয়ে মোক্ষলাভ করতে হয়, সেই কথা।

২-৩৪-২৫৪ ; "আল্লাহ—তিনি ব্যতীত আর কোনও আরাধ্য (প্রভু) নেই; তিনি চিরঞ্জীব, অতন্দ্র, অনিদ্র; নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সকলই তাঁর; তাঁর অনুমতি ছাড়া কার সাধ্য যে তাঁর সামনে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে? তাঁর সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি সে-সবই জানেন। তিনি আপন ইচ্ছায় তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান মানুষকে দেন, কেউ তার অতিরিক্ত আর কিছুই জানতে পারে না। তাঁর আসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এই স্বর্গ-মর্ত্যের, সংরক্ষণ করতে তাঁকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না—তিনি সবার ঊর্ধ্বে মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত।"

২-৩৪-২৫৬ : "ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে কোনও বলপ্রয়োগ বা বাধ্যবাধকতা নেই। সত্য স্পষ্টতই ভ্রান্তি থেকে পৃথক। অতএব যারা মিথ্যাকে ত্যাগ করে আল্লাকে গ্রহণ করেছে, তারা একটা দৃঢ় হাতল ধরে রয়েছে—এ হাতল কখনও শিথিল হয় না। কারণ আল্লা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"

এখানে সদাজাগ্রত আল্লার মহিমা বর্ণিতা হ'য়েছে। তাঁকে কেউ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। সত্যের খুঁটিটা দৃঢ় আর মিথ্যার খুঁটি ভঙ্গুর। সত্য না চাইলে বা দেখতে না পারলে জোর করে সত্য দেখাতে যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন,—তিনি সদাজাগ্রত, তাই তাঁর হাতে যে নিজেকে সঁপে দিয়েছে তাকে আল্লাহ দৃঢ়ভাবেই ধরে রাখবেন আর সত্য পথ দেখাবেন। ন্যায় পথ ও অন্যায় পথের বা ভ্রান্ত পথ বা সরল দৃঢ় পথের পথিকদের বিচার আল্লাহই করবেন।

পবিত্র কোরআন শরীফের সর্বত্র জ্ঞান অর্জন ও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস, ভক্তি ও ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু আয়াত আছে। তার থেকে যেগুলো উল্লেখ করা হ'লো এর থেকেই আশা করি কোরআন শরীফের মূলভাব কি সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। মোট কথা, জ্যামিতি বা গণিত-বিদ্যার মতই কোরআন শরীফেও কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ রয়েছে, সেগুলো স্বীকার করে নিলে বাকিটা আপনি এসে পড়ে। এই কারণেই বলা যায়, কোরআন শরীফের উপদেশ বিজ্ঞানসম্মত বিচার-যুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই ধর্ম ও বিজ্ঞান মিলেছে। তবে মূল বিশ্বাসগুলোর মধ্যে অতীন্দ্রিয়তার যে সুর রয়েছে সেটা সনাতন বিজ্ঞানের বহির্ভূত হ'লেও, বর্তমান বিজ্ঞানের থেকে সম্যক-রূপে পৃথক নয়।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৬

# শবে-বরাত

'শবে-বরাতের' অর্থ শুভরাত্রি বা ভাগ্য-বন্টনের রাত্রি। কথিত আছে শা'বান মাসের মধ্যভাগে এই রজনীতে অশেষ কল্যাণবাহী মহাগ্রন্থ কোরানকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। কোরান শরীফের সুরা 'দোখান' বা ধূম্র অধ্যায়ে আছে—'আল্লাহ উন্মুক্ত গ্রন্থের কথা বলছেন। আমি শুভ-রজনীতে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছি। এই রজনীতে সমুদয় প্রধান কার্য নির্দিষ্ট করা হয়। এইসব আদেশ আমার কাছ থেকেই যায়, আমিই উহার প্রেরক। উহা তোমার প্রতিপালকের দয়াস্বরূপ। তিনি নিশ্চয়ই সব জানেন ও শুনেন। তিনি সমুদয় আকাশ, পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে সকলেরই প্রভু—একথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর। তিনি ছাড়া অন্য প্রভু নাই। তিনিই বাঁচান, তিনিই মারেন, তিনিই তোমার প্রভু এবং তোমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষদেরও প্রভু।'

কারো কারো মতে এই 'শুভরাত্রি' শবে-বরাতের রাত্রি, কিন্তু অনেকের মতে ইহা রমজান মাসের শবে-কদরের রাত্রি বুঝায়। এই দুই মতের সামঞ্জস্য করবার জন্য কোন কোন হাদিসও বলেন, শবে-বরাতের রাত্রিতে কোরআন শরীফ 'লওহে মাহফুজে' সংরক্ষিত হয়, আর শবে-কদরের রাত্রিতে সর্বপ্রথম সেখান থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করা হয়; পরে আরো বহুবার প্রয়োজন অনুসারে অল্পে অল্পে সমুদয় কোরআন হযরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ হয়। 'লওহে মাহফুজ' শব্দের অর্থ সংরক্ষিত লিখন-পট। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই আল্লাহর লিখনপট। যা কিছু ঘটবে, সবই তিনি আগে থেকেই জানেন আর সমস্তই 'লওহে মাহফুজ' বা প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন—তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হবার যো নাই। কোরআনের যে মহান বাণী স্থির ও অটল, প্রকৃতির সঙ্গে যার পূর্ণ সামঞ্জস্য—সেইসব আয়াত, নিদর্শন বা বিধিলিপি সৃষ্টি-কুশলী আল্লাহ আগে থেকে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই রজনীকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পূর্ণ ঐশী সংকল্প প্রকাশের ক্ষণ বলা যায়। জড়জগৎ ও অধ্যাত্ম জগতের যতকিছু আইন-কানুন সমস্তই আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন—তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ঘটনার পর ঘটনা বিবর্তিত হয়ে ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে। যা কিছু ঘটছে তা সবই সর্বজ্ঞলীলাময় খোদা দেখছেন, শুনছেন ও জানছেন; বাস্তবিক তিনি কর্মের সঙ্গে কর্মফলের বা কারণের সঙ্গে ঘটনার যে-সম্বন্ধ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, অকাট্যভাবে সেই অনুসারে সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য নির্বাহ হচ্ছে।

মুসলমানদের ভিতর সাধারণ বিশ্বাস এই যে প্রতি বৎসর শবে-বরাতের রাত্রিতে আল্লাহ সংবৎসরের জন্য প্রত্যেকের ভাগ্য বণ্টন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে একবারেই আল্লাহ সব ঠিক করে রেখেছেন; তাঁর আর বছর বছর নতুন বাজেট করবার দরকার হয় না। তবে ঐ রাত্রির স্মারক হিসাবে প্রতি বৎসর শাবান মাসের ১৫ই তারিখে শবে-বরাতের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভাগ্য-বণ্টন সম্বন্ধে হিন্দুদের ভিতর এই সংস্কার আছে যে বিধাতা-পুরুষ জন্মের ষষ্ঠ দিনে

নিজের ললাটে তার ভাগ্য লিখে দিয়ে যান, এই বিধিলিপি খণ্ডন করা মানুষের পক্ষে তো নয়ই, দেবতাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। খ্রীষ্টান, ইহুদি প্রভৃতি ধর্ম অনুসারেও সৃষ্টির প্রারম্ভেই সর্বনিয়ন্তা ভগবৎশক্তি চন্দ্র-সূর্য-তারকা দিবা-রাত্রি প্রভৃতির নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন এবং মানুষও বিধিদণ্ড নিয়মের বাধ্য। সব ধর্মেই মানুষের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করা এবং ভাগ্য-বিধায়ক বিশ্বপ্রভুর শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ আছে।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শবে-বরাতের সময় রাত্রি জেগে উপাসনা করা এবং দিনে রোজা রাখা সম্বন্ধে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। ঐ রাত্রিকে বিশেষ পুণ্যসঞ্চয়ের রাত্রি মনে করে তিনি মদিনার কবরস্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের পাপ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেছেন এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব ওই তারিখে কোরআন পাঠ করেই হউক বা দরিদ্র-ভোজন করিয়েই হউক বা পাপ ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেই হউক মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু পুণ্য প্রেরণ করা হযরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুষ্ঠিত রীতিসম্মত কার্য বা 'সুন্নত'। তা ছাড়া হালুয়া-রুটি ভক্ষণ ও বণ্টন প্রভৃতি যে-সব প্রথা আছে এগুলি শাস্ত্রবিধি নয়, লৌকিক প্রথা বা দেশাচার। অবশ্য দেশাচারও যদি শাস্ত্রবিরোধী না হয় তবে তাকে নিন্দা করা যায় না; আল্লাহর কৃপায় তার মধ্যেও পুণ্য নিহিত থাকতে পারে। বস্তুতঃ শবে-বরাতের শুভরাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে গ্রামের ক্ষুদ্র-মহৎ সকলের বাড়ি থেকেই হালুয়া-রুটি এনে একখানে জড়ো করে যে গ্রামশুদ্ধ লোক বণ্টন করে নেয় এ দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য। এদ্বারা ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব এবং প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতির চর্চা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, এই রাত্রিতে যার ভাগ্যে উৎকৃষ্ট হালুয়া-রুটি জোটে, সারা বছর ধরেই তার ভাগ্যে আল্লাহ্ ঐরূপ আহার নির্দিষ্ট করে থাকেন। যা হউক, পরস্পর কিছু সাহায্য করে সবাইকে সৌভাগ্য লাভের সুযোগ দেওয়ার মধ্যে যে সহযোগিতার ভাব আছে, তা বড়ই মধুর এবং ঐ ভাবটি হালুয়া-রুটি বণ্টন প্রথার একটি প্রধান সার্থকতা বা বিশেষত্ব।

এখন বিগত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা বা পুণ্যদান সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলব। প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই হিন্দু-মুসলমান ইহুদি-খ্রীষ্টান প্রভৃতি সব ধর্মেই মৃতের সদগতির জন্য প্রার্থনা করার রীতি আছে। জানাজার নামাজ পড়া, গয়ায় পিণ্ড দেওয়া, গির্জা বা অন্যান্য ধর্মগৃহে মৃতের কল্যাণের জন্য উপাসনা করা এগুলি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধি। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রার্থনার যে ফল হয় এবং জীবিতদের প্রার্থনা যে মৃতের আত্মার পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে এমন বিশ্বাস পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যেই রয়েছে। আজ বিশেষ করে মুসলমান শাস্ত্রের কথাই আলোচনা করব।

শাস্ত্রে আছে হযরত আদম (আঃ) স্বর্গচ্যুত হয়ে লঙ্কাদ্বীপে পড়ে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছিল; হযরত নূহ অবাধ্য সমাজের প্রতি...শাস্তি বর্ষিত হউক, এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহ্ তা শুনেছিলেন; হযরত ইব্রাহিম তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রেরিতত্ব ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন, তা মঞ্জুর হয়েছিল; হযরত ইউনুস সমুদ্রের মধ্যে মৎস্যগর্ভ থেকে আল্লাহকে ডেকেছিলেন, আল্লাহ্ তা শুনেছিলেন; হযরত জাকারিয়া নিজের বংশে একজন উত্তরাধিকারী নবী চেয়েছিলেন, তাঁর সে আর্জি কবুল হয়েছিল। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বহুবার আল্লাহর কৃপা প্রার্থনা করেছেন, সত্য প্রচারে তাঁরই সাহায্য চেয়েছেন...আল্লাহও সর্বদা তাঁর প্রার্থনার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ইতিহাসে দেখা যায়, হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে একবার দুর্ভিক্ষে মক্কাবাসীদের অতিশয় কষ্ট হয়। তখন

দিনের ললাটে তার ভাগ্য লিখে দিয়ে যান, এই বিধিলিপি খণ্ডন করা মানুষের পক্ষে তো নয়ই, দেবতাদের পক্ষেও সহজ নয়। খ্রীষ্টান, ইহুদি প্রভৃতি ধর্ম অনুসারেও সৃষ্টির প্রারম্ভেই সর্বনিয়ন্তা জগৎপতি চন্দ্র-সূর্য-তারকা দিবা-রাত্রি প্রভৃতির নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন এবং মানুষও বিধিদণ্ড নিয়মের বাধ্য। সব ধর্মেই মানুষের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করা এবং ভাগ্য-বিধায়ক বিশ্বপ্রভুর শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ আছে।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শবে-বরাতের সময় রাত্রি জেগে উপাসনা করা এবং দিনে রোজা রাখা সম্বন্ধে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। ঐ রাত্রিকে বিশেষ পুণ্যসঞ্চয়ের রাত্রি মনে করে তিনি মদিনার কবরস্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের পাপ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেছেন এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব ওই তারিখে কোরআন পাঠ করেই হউক বা দরিদ্র-ভোজন করিয়েই হউক বা পাপ ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেই হউক মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু পুণ্য প্রেরণ করা হযরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুষ্ঠিত রীতিসম্মত কার্য বা 'সুন্নত'। তা ছাড়া হালুয়া-রুটি ভক্ষণ ও বন্টন প্রভৃতি যে-সব প্রথা আছে এগুলি শাস্ত্রবিধি নয়, লৌকিক প্রথা বা দেশাচার। অবশ্য দেশাচারও যদি শাস্ত্রবিরোধী না হয় তবে তাকে নিন্দা করা যায় না; আল্লাহর কৃপায় তার মধ্যেও পুণ্য নিহিত থাকতে পারে। বস্তুতঃ শবে-বরাতের শুভরাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে গ্রামের ক্ষুদ্র-মহৎ সকলের বাড়ি থেকেই হালুয়া-রুটি এনে একখানে জড়ো করে যে গ্রামশুদ্ধ লোক বন্টন করে নেয় এ দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য। এতদ্বারা ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব এবং প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতির চর্চা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, এই রাত্রিতে যার ভাগ্যে উৎকৃষ্ট হালুয়া-রুটি জোটে, সারা বছর ধরেই তার ভাগ্যে আল্লাহ ঐরূপ আহার নির্দিষ্ট করে থাকেন। যা হউক, পরস্পর কিছু সাহায্য করে সবাইকে সৌভাগ্য লাভের সুযোগ দেওয়ার মধ্যে যে সহযোগিতার ভাব আছে, তা বড়ই মধুর এবং ঐ ভাবটি হালুয়া-রুটি বন্টন প্রথার একটি প্রধান সার্থকতা বা বিশেষত্ব।

এখন বিগত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা বা পুণ্যদান সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলব। প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই হিন্দু-মুসলমান ইহুদি-খ্রীষ্টান প্রভৃতি সব ধর্মেই মৃতের সদগতির জন্য প্রার্থনা করার রীতি আছে। জানাজার নামাজ পড়া, গয়ায় পিণ্ড দেওয়া, গির্জা বা অন্যান্য ধর্মগৃহে মৃতের কল্যাণের জন্য উপাসনা করা এগুলি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধি। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রার্থনায় যে ফল হয় এবং জীবিতদের প্রার্থনা যে মৃতের আত্মার পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে এমন বিশ্বাস পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যেই রয়েছে। আজ বিশেষ করে মুসলমান শাস্ত্রের কথাই আলোচনা করব।

শাস্ত্রে আছে হযরত আদম (আঃ) স্বর্গচ্যুত হয়ে লঙ্কাদ্বীপে পড়ে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছিল; হযরত নূহ অবাধ্য সমাজের প্রতি...শাস্তি বর্ষিত হউক, এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহ তা শুনেছিলেন; হযরত ইব্রাহিম তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রেরিতত্ব ও সৌভাগ্য আবির্ভাব জন্য দরখাস্ত করেছিলেন, তা মঞ্জুর হয়েছিল; হযরত ইউনুস সমুদ্রের মধ্যে মৎস্যগর্ভ থেকে আল্লাহকে ডেকেছিলেন, আল্লাহ তা শুনেছিলেন; হযরত জাকারিয়া নিজের বংশে একজন উত্তরাধিকারী নবী চেয়েছিলেন, তাঁর সে আর্জি কবুল হয়েছিল। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বহুবার আল্লাহর কৃপা প্রার্থনা করেছেন, সত্য প্রচারে তাঁরই সাহায্য চেয়েছেন—আল্লাহও সর্বদা তাঁর প্রার্থনার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ইতিহাসে দেখা যায়, হিজরতের অনেক বছর পূর্বে একবার দুর্ভিক্ষে মক্কাবাসীদের অতিশয় কষ্ট হয়। তখন

হযরতের বিরুদ্ধবাদী কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান অগত্যা হযরতের নিকট এসে তাঁকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন আপদ শান্তির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। তখন হযরত প্রার্থনা করেন এবং তার ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পায়। আর-এক বর্ণনায় পাওয়া যায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন কোরেশের তাড়নায় আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন সেই সময়ে 'সরাকা' নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কয়েকজন কোরেশ ঘোড়সওয়ার তাঁদের পিছনে ধাওয়া করেছিল। 'সরাকা' অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে পড়লে হযরত প্রার্থনা করেছিলেন, "হে আল্লাহ এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার কর।" তাঁর প্রার্থনায় সরাকার ঘোড়ার পা মাটির ভিতরে বসে যায় আর সে অগ্রসর হতে পারে না। অবশেষে 'সরাকা' নিরুপায় হয়ে হযরতের সাহায্য প্রার্থনা করে অঙ্গীকার করে যে ঘোড়ার পা উন্মুক্ত হলে সে দলস্থ অনুসারিগণকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। হযরতের প্রার্থনা অনুসারে ঘোড়ার পা মুক্ত হয়েছিল, 'সরাকা'ও আপন দলবলসহ মক্কায় ফিরে গিয়েছিল। এইরূপ আরও শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাস্তবিক বিপদকালে সর্বশক্তিমান খোদা ছাড়া আর কার কাছেই বা সাহায্যের জন্য হাত পাতা যায়—তিনিই ত সমস্ত করুণার আধার।

শুধু নবী-পয়গম্বর, ওলী-দরবেশের প্রার্থনাই যে পূর্ণ হয় এমন নয়। সকাতরে প্রার্থনা করলে সাধারণ লোকের প্রার্থনাও আল্লাহর দরবারে গ্রাহ্য হয়। এখন কথা উঠতে পারে, জীবিত লোকে প্রার্থনা দ্বারা উপকার পেতে পারে, কিন্তু প্রার্থনায় মরা মানুষের কি লাভ? মরা মানুষের কি আর ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখবোধ আছে? এই প্রশ্নের শাস্ত্রসম্মত উত্তর এই যে, দেহ ও আত্মার সংযোগে মানুষ। মৃত্যুতে দেহ ও আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দেহের উপর তখন আর আত্মার কর্তৃত্ব থাকে না। দেহ মাটির সঙ্গে মিশে যায়, কিংবা চিতায় পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, কিংবা হিংস্র পশুপক্ষীর উদরসাৎ হয়। কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হয় না। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে হয় শান্তিতে, নয় আরামে অবস্থান করে। আত্মা বুঝতে পারে তার থেকে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব হরণ করা হয়েছে, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ি-ঘর, দাস-দাসী প্রভৃতিও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ কারণে যার মনে আপত্তি প্রবল, তার আত্মা স্বভাবতই ক্লেশ পায়। কিন্তু যার মন আল্লাহর চরণে উৎসর্গকৃত, এসব পার্থিব বৈভব স্খলনে তার তেমন ক্লেশ বোধ হয় না। তা ছাড়া মৃত্যুর পর আত্মা সূক্ষ্মলোকে প্রবেশ করে তাঁর রহস্য দেখতে বা জানতে পায়, জীবিত অবস্থায় তা সম্ভব ছিল না। সূক্ষ্মলোকের দিক দিয়ে দেখলে বলা যায় পৃথিবীর মানুষ সব মৃত; মৃত্যু দ্বারাই তারা অন্তর্লোকে জীবন লাভ করে।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, কেউ মরে গেলে সকাল-সন্ধ্যায় তাকে তার ভাবী অবস্থান প্রদর্শন করা হয়। কারো অবস্থান স্বর্গে কারো বা নরকে। প্রত্যেককে তার অবস্থা দেখিয়ে দিয়ে বলা হয়, কেয়ামতের দিন তোমার আবাস ঐখানে নির্দিষ্ট হবে। এই অবস্থা দর্শন করে আত্মার সুখ বা দুঃখ হতে পারে কিনা তা সহজেই অনুমান করা যায়। আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন তিনি রসুলুল্লাহর মুখে শুনেছেন যে মানুষ মরে গেলে তার কাছে নীল-চোখওয়ালা দুইজন কৃষ্ণবর্ণ ফেরেস্তা এসে উপস্থিত হয়; একজনের নাম 'মুনকের' আর একজনের নাম 'নকীর', এরা মৃতের কৃতকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করে।

বদরের যুদ্ধে যেসব সত্যদ্রোহী কোরেশ মারা গিয়েছিল হযরত (দঃ) তাদের এক-একজনের নাম ধরে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমার আল্লাহ আমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার

করেছিলেন আমি দেখলাম তা পূর্ণ হয়েছে, তোমাদের প্রভু তোমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ দেখছ?" হযরতের এই কার্য দেখে অনেক লোক বলেছিল, "হে রসুলুল্লাহ' এরা তো মরে গেছে, এদের কাছে কথা বলে লাভ কি? এরা ত আর শুনতে পাবে না।" তখন হযরত জওয়াব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়ই শুনতে পাবে, এখন তারা পৃথিবীর জীবিত মানুষের চেয়ে আরও ভাল করে শুনতে পাবে। মৃত্যুতে আত্মার ধ্বংস হয় না, তার জ্ঞান ও বুদ্ধি অব্যাহত থাকে।" আবি আসিয়াদ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট এসে নিবেদন করল, "হে খোদার রসুল! আমার মা-বাপ পরলোকে গমন করেছেন; এমনকি কোনও উপায় হতে পারে যার দ্বারা আমি তাদের কিছু উপকার করতে পারি?" হযরত বললেন, "চার রকমে তুমি তাদের উপকার বা সন্তোষ সাধন করতে পার। প্রথমতঃ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা; দ্বিতীয়তঃ তোমার প্রতি তাঁরা যে উপদেশ বা আদেশ দিয়ে গেছেন তা পালন করা; তৃতীয়তঃ তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনকে সম্মান করা; চতুর্থতঃ তাঁদের বিশেষ নিকট-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করা।" হাদিসে আছে, মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আত্মা স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী 'বরজখ' নামক স্থানের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করে। পুণ্য-আত্মাদের স্থানের নাম 'ইল্লীন' আর পাপ-আত্মাদের স্থানের নাম 'সিজ্জীন'। কেয়ামতের দিন সকলের 'আমলনামা' বা কৃতকর্ম অনুসারে বিচার হবে, তারপর কোনও আত্মা দোজখে অবরুদ্ধ থাকবে, আবার কোন আত্মা বেহেশতে অবাধ বিচরণ করতে পারবে। যা হউক, 'বরজখে' অবস্থানকালে আত্মা পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করে থাকে। এমনকি নিদ্রাবস্থায় যখন জীবিত ব্যক্তির আত্মা দেহ-বন্ধন থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত হয়, তখন তাদের সঙ্গেও মৃত ব্যক্তিদের আত্মারা আলাপ-আপ্যায়ন বা সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকে।

বিবি আয়েশা (রাঃ) এবং হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন পরিচিত বা অপরিচিত যে-কোন লোক কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে মৃতের প্রতি শান্তিবাক্য বা সালাম উচ্চারণ করলে মৃতের আত্মা শুনতে পায় এবং খুশী হয়ে সালামের জওয়াব দিয়ে থাকে। এসব বিষয়ে শত শত উপাখ্যান আছে; বাহুল্য-ভয়ে তা আর উল্লেখ করলাম না।

এইসব শাস্ত্রীয় বচন ও উপাখ্যান থেকে দেখা যায় যে মৃতের জানাজা পড়লে বা তার উদ্দেশ্যে কোন সৎকর্মের পুণ্যফল প্রেরণ করলে মৃতের আত্মা সন্তুষ্ট হয় এবং শান্তি পায়। কিন্তু এতে যে শুধু মৃতেরই কল্যাণ হয় এমন নয়, জীবিতেরাও এই প্রকার দরুদ, সালাম পাঠ বা পুণ্য প্রেরণের ফলে বিশেষ উপকৃত হয়। শবে-বরাতের সময় বা যে কোন সময় মৃত্যুকে স্মরণ করলে পাপ ধৌত হয়, মনের মলিনতা দূর হয়, সৎকর্মে মতি হয়। ফাতেহা দেওয়ার প্রথা বা পীর, পয়গম্বর, ওলি, দরবেশ প্রভৃতি পুণ্যবানদের জন্য আল্লাহর সমীপে সৎকার্য প্রেরণ করা একদিকে যেমন পরলোকগত আত্মার সন্তুষ্টি ও শান্তির কারণ অন্যদিকে তেমনি ফাতেহা প্রদাতার পক্ষেও শুভজনক। তাই এ সময়ে এইসব পুণ্য কার্যের সবিশেষ তাৎপর্য আছে—আল্লাহর ইচ্ছা হলে এই সময়ে তিনি অপর্যাপ্ত অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারেন।

ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী

# চীনে ইসলাম

হযরত মোহাম্মদের আবির্ভাব-কালে চীনের বিদ্যা ও হুনর্ আরবদের ভিতর একটি প্রবাদ-বাক্যরূপে পরিগণিত ছিল। "বিদ্যা-শিক্ষার জন্য চীনদেশ পর্যন্ত গমন করিবে" —এই হাদিসটি শুধু চীনের দূরত্ব নয়, ইহার জাতীয় সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধিও জ্ঞাপন করে। ঐ সময় চীনে ট্যাং (T'ang) বংশীয় সুবিখ্যাত তাই-সাং (T'ait Sang) নামক নরপতি রাজত্ব করিতেন। "জ্ঞান ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে, সুশাসন, দিগ্বিজয়ে, সংযম, উন্নত রুচি ও বিদ্যোৎসাহে" তাঁহাকে চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলা যাইতে পারে। এই সময় ইউরোপ মধ্যযুগের গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, এবং চীনই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুসভ্য দেশ ছিল। এই সময় চীনের সর্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং রাজ-কার্যে যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য রীতিমত পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল। চীনরাজ্যের সীমানা তখন পারস্য-দেশ ও কাস্পিয়ান হ্রদের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং মধ্য-এশিয়ার বহু ভূভাগ ইহার অন্তর্ভূত ছিল। সম্রাট তাই-সাং স্বীয় রাজ্য সুদৃঢ় করিবার জন্য সীমান্ত-প্রদেশের তুর্কী সম্প্রদায়সমূহকে নানাবিধ সুবিধা ও ধর্ম-সংক্রান্ত স্বাধীনতা দান করিয়া তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন। তিনি আবার বিরাট সাহিত্য-সংগ্রহেও ব্রতী ছিলেন; এজন্য বিবিধ-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিতেন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিজ্ঞ যাজকগণও তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

চীনের এইরূপ শান্তি, শ্রীবৃদ্ধি ও উদারতার যুগে (খ্রীঃ ৬২৮ অব্দে) হযরত মোহাম্মদের এক পিতৃব্য ওহাব-আবি-কবসা তথাকার রাজ-দরবারে দূত-রূপে প্রেরিত হন। তিনি ও তাঁহার সহচরগণ বর্তমানে শেন-সি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত রাজধানী সিন্-গান (Singan) নগরে সম্রাট কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন, এবং ক্যান্টন নগরে মসজিদ নির্মাণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। অতঃপর আরব হইতে স্থলপথে জলপথে আরো কয়েক দল লোক আসিয়া ইহাদের সংখ্যা বর্ধন করেন। ওহাব-আবি-কবসা কয়েক বৎসর চীনে অবস্থান করিবার পর একবার আরবে গমন করেন; কিন্তু শেষজীবন সেখানে যাপন না করিয়া পুনরায় চীনে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনুমানিক ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রওজা আজ পর্যন্ত ক্যান্টন নগরের উত্তর তোরণের নিকট সুরক্ষিত আছে। তাঁহার নির্মিত দুইটি মসজিদও বহু সংস্কারের ফলে অদ্যাবধি বর্তমান আছে। তন্মধ্যে একটির নাম square pagoda: ইহা দর্শকবৃন্দের নিকট একটি বিশেষ পবিত্র স্থান বলিয়া পরিচিত।

এই সমস্ত আরবগণ যে কেবল ধর্ম-প্রচার করিতেই চীন দেশে গিয়াছিলেন তাহা নহে; ব্যবসায়-বাণিজ্যই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি হযরত মোহাম্মদের একজন নিকট-আত্মীয়, ইসলাম ধর্মের প্রথম অভ্যুদয়-কালে যে কেবল মাত্র স্বধর্ম পালন করিবার অনুমতি পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা মনে হয় না। কালক্রমে চীনে মুসলমানের সংখ্যা যে পরিমাণ বর্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, তিনি কিছু কিছু প্রচার-কার্যও করিয়াছিলেন। তবে

বাণিজ্যই যে তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, একথা বলিবার কারণ এই যে, ঐ যুগের সাহিত্যে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে একটু-আধটু উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে ধর্ম-প্রচারের কোন নামগন্ধই দেখিতে পাওয়া যায় না বরং তাঁহাদের বিলাস ও সমৃদ্ধির উল্লেখই দেখা যায়। তাহা ছাড়া ঐ সমস্ত নবাগত মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশই আপনাদের কার্যসিদ্ধি (অর্থাৎ যথেষ্ট অর্থ-সংগ্রহ) হইলেই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। ঐ দেশেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবার প্রবল আগ্রহ তাহাদের ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে চীনে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন একদল সৈনিক। ইহারা ৭৫৫ খ্রীঃ খলিফা আবু জাফর কর্তৃক চীন-সম্রাট 'হুয়েন-সাং'-এর সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। 'হুয়েন-সাং'-এর প্রধান সেনাপতি ছিলেন 'গ্যান-লুশান' (Ngan Luhshan) নামক একজন তুর্কী-বীর। ইনি সম্রাট কর্তৃক তুর্কী এবং তাতারদিগের বিরুদ্ধে এক অভিযানে প্রেরিত হইয়া সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। সম্রাট নিরুপায় হইয়া খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। যাহা হউক, এই সৈন্যদল অতিশয় কৃতিত্বের সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিবার পর, সম্রাট কর্তৃক ঐ দেশে অবস্থান করিয়া স্থানীয় লোকদের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। চীনের বর্তমান মুসলমান অধিবাসীর অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষ এই বিজয়ী সৈন্যদল। পূর্বে যে বণিক-সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও ইতিমধ্যে দলে দলে আসিয়া সমুদ্রতীরবর্তী নগরসমূহে বাণিজ্য করিতেছিলেন। এমনকি, তাঁহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য একজন কর্মচারীও (Consul) ছিলেন।

পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্টন নগরে এক বিদ্রোহমূলক আন্দোলনের ফলে মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সর্বসমেত এক লক্ষ বিশ হাজার বিদেশীর প্রাণ-সংহার করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। এই ঘটনায় বণিক-সম্প্রদায়ের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, এবং বহুকাল যাবৎ নূতন কোন আরব বণিকদল চীনে পদার্পণ করেন নাই। তাহার ফলে চীনে ইসলামের প্রভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল।

অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনে যখন মোঙ্গলদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন আবার মুসলমানদিগের সুদিন আসিল। সম্রাট কুবলা খাঁ রাজ্যকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য-ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত ধর্মের প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার নূতন সাম্রাজ্য কারাজাংয়ে মুসলমানদিগের সামরিক গুণ লক্ষ্য করিয়া ইহাদের বশ্যতা ও সাহায্য পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুসলমানদের প্রতি এই নূতন আনুকূল্যের ফলে দলে দলে আরবগণ আসিয়া ফু-কিন, চেকিয়াং, কিয়াংশু প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় ক্যান্টনের পরিবর্তে 'ফুচু' নগর বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল।

কারাজাং প্রদেশের বর্তমান নাম ইয়ান্নান (Yunnan)। এইটি মুসলমান-প্রধান স্থানে পরিণত হইল। অন্যান্য প্রদেশেও কোন কোন মুসলমান উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সমর-বিভাগ ও রাজস্ব-বিভাগেও কোন কোন মুসলমান সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলমানগণই জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেন-সি এবং কান-সু নগরেও অধিক সংখ্যায় মুসলমান বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাও

অনৈসলামিক প্রতিবেশীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহারা চীনে যদি সামান্য একটু উৎসাহের সহিত প্রচারকার্যে লিপ্ত হইতেন, তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সমগ্র চীন দেশ ইসলাম গ্রহণ না করিলেও অত্যন্ত গভীরভাবে ইসলামের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ট্যাং এবং মোঙ্গল-সাম্রাজ্য ব্যতীত অন্য কোন সাম্রাজ্যে মুসলমানগণ সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই। এই দুই সাম্রাজ্যেও টাইসাং এবং কুবলা খান ব্যতীত অন্য কোন সম্রাট বিদেশীদিগকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। প্রকাশ্যভাবে ধর্মপ্রচার চীনাম্যানদিগের নিকট চিরকালই অসহ্য ব্যাপার। কনফুসীয় ধর্মের প্রতিনিধি শিকাগো নগরে ধর্ম-মহাসভায় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন "কেহ কতকগুলি মতবাদ লইয়া একদেশ হইতে অন্য দেশে গিয়া সেগুলি প্রবর্তিত করিতে চাহিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ ব্যক্তি নিজেকে উক্ত দেশবাসীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কৃপার চক্ষেও দেখিয়া থাকে।" যাহা হউক, চীনদেশে গিয়া বিদেশীরা যাহাতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে না পারে, এজন্য গভর্ণমেন্ট সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। পৈতৃক দেশের সহিত সম্বন্ধ রাখা, হজ্ করা, আরব হইতে মোল্লা আমদানী করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মের বিধি অনেক সময় সংক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইত এবং মসজিদ নির্মাণ পরবর্তীকালে রহিত হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তী ট্যাং রাজগণের সময়ে মুসলমান ধর্মের প্রতি এত অধিক হস্তক্ষেপ করা আরম্ভ হইল যে, কেহ কেহ হায়নান নামক দ্বীপে প্রস্থান করিলেন, বহু মুসলমান আরব দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা কোনরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিলেন মাত্র।

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পতনের পর স্বদেশীয় মিং-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই সম্রাটগণ মুসলমানদিগকে মোঙ্গল জাতির সমশ্রেণীস্থ মনে করিয়া তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করেন। বিশেষতঃ মিং-সম্রাটদিগকে মোঙ্গলদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া মুসলমানদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিল। ইহাদের রাজত্বকালে বহু ঘোষণাপত্রে বারংবার মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, চীনদেশে তাহাদের বাস করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই। এমনকি, এক সময়ে মুসলমানদিগকে ক্যান্টন নগর ত্যাগ করিয়া জাহাজে আশ্রয় লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অত্যাচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে শুধু এইটুকু অনুমান করাই যথেষ্ট যে, পূর্বে যে ক্যান্টন নগর মুসলমান-প্রধান স্থান ছিল, আজ সেই সমগ্র ক্যান্টন প্রদেশে মাত্র একুশ হাজার মুসলমান বাস করে এবং চেকিয়াং, কুফিন এবং ক্যান্টন এই তিনটি প্রদেশে মিলিয়া মাত্র পঞ্চাশ হাজার মুসলমানের বাস। অথচ এইগুলিই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের প্রধান বাণিজ্য-স্থল ছিল। এই পঞ্চাশ হাজার মুসলমানের পূর্বপুরুষগণ জীবনরক্ষার্থে ধর্মের অনুশাসনের অধিকাংশ ত্যাগ না করিলে ইহাদেরও অস্তিত্ব থাকিত না।

আধুনিক মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অধীনেও মুসলমানদিগের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দীর্ঘকালব্যাপী অন্যায়-অত্যাচারের ফলে চীনদেশের পশ্চিমাঞ্চলের বীরপ্রকৃতির মুসলমানগণ বারংবার বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা রাজকীয় সৈন্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া সীমান্ত প্রদেশের অসভ্য জাতি-অধ্যুষিত পর্বত ও জঙ্গলে বিতাড়িত হয়েন। তথায় অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মং-সীন নামক স্থানে চীনা রাজপুরুষগণ ষোল হাজার পুরুষ-স্ত্রী-বালক-বালিকাকে নিতান্ত

নির্মমভাবে হত্যা করায় আর একটি বিদ্রোহ হয়। এমনকি, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ান্নান শহরে সামান্য একটি কলহের ফলে আঠারো দিন যাবৎ রাজপুরুষগণ মুসলমানদিগকে হত্যা করেন। ইহার ফলেও একটি বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "বিদ্রোহীরা" বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সাহায্য-দানে অস্বীকার করেন। জয়ের আশায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া বীর সেনাপতি টু ওয়েন হিন (Tuwen hsin) চীনাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি কিঞ্চিৎ বিষ গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সত্তর জন অনুচরকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া চীনাম্যানরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করে। অবশিষ্ট মুসলমানদের প্রতি পৈশাচিক নির্দয় ব্যবহার করা হইল। তিনদিনের মধ্যে তা-লি-ফু (Ta-li-fu) নগর ও জেলার পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে অন্যূন ত্রিশ হাজারকে তরবারীসাৎ করা হইল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শেনসি-নগরে এইরূপ এক "বিদ্রোহের" ফলে চীন-সেনাপতি সমুদয় মুসলমান অধিবাসীকে হত্যা করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এই বিদ্রোহ দমন করিতে বার বৎসর লাগিয়াছিল। বহু প্রদেশকে বাস্তবিকই নির্মুসলমান করা হইয়াছিল। শেনসি প্রদেশে এখনও কৃষকদের অভাবে বহু জমি পতিত পড়িয়া রহিয়া সেই নিদারুণ নৃশংসতার সাক্ষ্য দিতেছে।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা-দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চীনাম্যানদের ধর্ম-সংক্রান্ত উদারতার লম্বা সার্টিফিকেট থাকিলেও তাহারা চিন্তার স্বাধীনতা এবং বিদেশীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও পরাক্রমকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া চিরকাল কঠোর হস্তে এগুলি দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

বর্তমানে চীনের মুসলমান সংখ্যায় তিন কোটি হইবে। উত্তর-পশ্চিমস্থ কান-সু প্রদেশে প্রায় ৮৫ লক্ষ; উত্তরাঞ্চলের শেন-সি প্রদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ ইয়াননান প্রদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ, অবশিষ্ট আনুমানিক ২০ লক্ষ সমুদয় সাম্রাজ্যের ভিতর বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। চীনাম্যানরা যে এত অধিক সংখ্যায় 'বিধর্মী'কে সহ্য করিতেছে, তাহার কারণ এই যে, তথাকার মুসলমানেরা প্রায়ই দেশবাসীদের সহিত অভিন্ন হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও পরিচ্ছদ দুই-ই চীনাম্যানদের অনুরূপ। তবে ইহাদের চিবুকাস্থি কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত, নাসিকা অপেক্ষাকৃত সুগঠিত, এবং মোচ কর্তিত বলিয়া উহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়। ইহারা বর্তমানে দেশবাসীদের সহিত বিবাহ স্থাপন করে না, তবে সময় সময় ইহাদের মধ্য হইতে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা ধর্মপ্রচারের কোন চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ইহাদের নিজেদের ধর্মমত কি, তাহাই বাহিরের জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত।

অনেক শহরেই মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র ক্যান্টনেই চারটি আছে। কিন্তু মসজিদের অনুপাতে নামাজীর সংখ্যা অল্প। একমাত্র রমজান মাসে নামাজীর সংখ্যা অধিক হয়। বাহ্য আচার-ব্যবহারের মধ্যে প্রতিমা-পূজায় বিরতি এবং শূকর-মাংস ভক্ষণে বিতৃষ্ণাই উল্লেখযোগ্য। চীনাদের ভাষায় ইসলামকে হুই-হুই (Hui-Hui) বলে। লক্ষাধিক মুসলমান অধ্যুষিত পিকিং নগরে খাদ্যদ্রব্যের ফেরিওয়ালারা বাসনের উপর হুই-হুই শব্দ বিচিত্রভাবে খোদিত করিয়া থাকে। তাহার উদ্দেশ্য, মুসলমানেরা বুঝিতে পারিবে যে, ঐ খাদ্য শূকর-চর্বির সংস্পর্শে আসিয়া কলুষিত হয় নাই। চীনেও অন্যান্য মুসলমান দেশের ন্যায় ত্বক্‌চ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। রমজানের উপবাসও বিশেষভাবে প্রতিপালিত হয়; কিন্তু কোন কোন

নির্মমভাবে হত্যা করায় আর একটি বিদ্রোহ হয়। এমনকি, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ান্নান শহরে সামান্য একটি কলহের ফলে আঠারো দিন যাবৎ রাজপুরুষগণ মুসলমানদিগকে হত্যা করেন। ইহার ফলেও একটি বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "বিদ্রোহীরা" বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সাহায্য-দানে অস্বীকার করেন। জয়ের আশায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া বীর সেনাপতি টু ওয়েন হিন (Tuwen hsin) চীনাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি কিঞ্চিৎ বিষ গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সত্তর জন অনুচরকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া চীনাম্যানরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করে। অবশিষ্ট মুসলমানদের প্রতি পৈশাচিক নির্দয় ব্যবহার করা হইল। তিনদিনের মধ্যে তা-লি-ফু (Ta-li-fu) নগর ও জেলার পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে অন্যূন ত্রিশ হাজারকে তরবারীসাৎ করা হইল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শেনসি-নগরে এইরূপ এক "বিদ্রোহের" ফলে চীন-সেনাপতি সমুদয় মুসলমান অধিবাসীকে হত্যা করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এই বিদ্রোহ দমন করিতে বার বৎসর লাগিয়াছিল। বহু প্রদেশকে বাস্তবিকই নির্মুসলমান করা হইয়াছিল। শেনসি প্রদেশে এখনও কৃষকদের অভাবে বহু জমি পতিত পড়িয়া রহিয়া সেই নিদারুণ নৃশংসতার সাক্ষ্য দিতেছে।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা-দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চীনাম্যানদের ধর্ম-সংক্রান্ত উদারতার লম্বা সার্টিফিকেট থাকিলেও তাহারা চিন্তার স্বাধীনতা এবং বিদেশীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও পরাক্রমকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া চিরকাল কঠোর হস্তে এগুলি দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

বর্তমানে চীনের মুসলমান সংখ্যায় তিন কোটি হইবে। উত্তর-পশ্চিমস্থ কান-সু প্রদেশে প্রায় ৮৫ লক্ষ; উত্তরাঞ্চলের শেন-সি প্রদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ ইয়াননান প্রদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ, অবশিষ্ট আনুমানিক ২০ লক্ষ সমুদয় সাম্রাজ্যের ভিতর বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। চীনাম্যানরা যে এত অধিক সংখ্যায় 'বিধর্মী'কে সহ্য করিতেছে, তাহার কারণ এই যে, তথাকার মুসলমানেরা প্রায়ই দেশবাসীদের সহিত অভিন্ন হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও পরিচ্ছদ দুই-ই চীনাম্যানদের অনুরূপ। তবে ইহাদের চিবুকাস্থি কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত, নাসিকা অপেক্ষাকৃত সুগঠিত, এবং মোচ কর্তিত বলিয়া উহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়। ইহারা বর্তমানে দেশবাসীদের সহিত বিবাহ স্থাপন করে না, তবে সময় সময় ইহাদের মধ্য হইতে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা ধর্মপ্রচারের কোন চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ইহাদের নিজেদের ধর্মমত কি, তাহাই বাহিরের জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত।

অনেক শহরেই মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র ক্যান্টনেই চারটি আছে। কিন্তু মসজিদের অনুপাতে নামাজীর সংখ্যা অল্প। একমাত্র রমজান মাসে নামাজীর সংখ্যা অধিক হয়। বাহ্য আচার-ব্যবহারের মধ্যে প্রতিমা-পূজায় বিরতি এবং শূকর-মাংস ভক্ষণে বিতৃষ্ণাই উল্লেখযোগ্য। চীনাদের ভাষায় ইসলামকে হুই-হুই (Hui-Hui) বলে। লক্ষাধিক মুসলমান অধ্যুষিত পিকিং নগরে খাদ্যদ্রব্যের ফেরিওয়ালারা বাসনের উপর হুই-হুই শব্দ বিচিত্রভাবে খোদিত করিয়া থাকে। তাহার উদ্দেশ্য, মুসলমানেরা বুঝিতে পারিবে যে, ঐ খাদ্য শূকর-চর্বির সংস্পর্শে আসিয়া কলুষিত হয় নাই। চীনেও অন্যান্য মুসলমান দেশের ন্যায় ত্বকচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। রমজানের উপবাসও বিশেষভাবে প্রতিপালিত হয়; কিন্তু কোন কোন

দেশের মুসলমানের ন্যায় ইহারা ধর্ম বিষয়ে একান্ত অসহিষ্ণু, একদেশদর্শী এবং প্রচারব্যগ্র নহে।

চীনদেশে মুসলমানী গ্রন্থ অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি আবার সম্রাটের অনুমোদন ও অনুমতিক্রমে লিখিত। কিন্তু কঠোর রাজকীয় আইন দ্বারা চীনাভাষায় কোরআনের অনুবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইসলামের প্রভাব ঐ দেশে কত সামান্য মাত্রায় কার্যকরী হইয়াছে। চীনের মুসলমানেরা আপনাদিগকে স্বর্গ হইতে প্রেরিত ধর্মের গর্বিত উপাসক মনে না করিয়া ক্রমান্বয়ে দেশবাসীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এটা কিন্তু ঐ দেশেরই প্রভাব। শুধু ইসলাম কেন, বৌদ্ধ-ধর্ম, ইহুদী-ধর্ম, নেষ্টরীয় ধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম, সমস্তই চীনদেশে গিয়া আপন-আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ঐ দেশের প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নেষ্টরীয় খ্রীষ্টানদের একখানা দলিল বা রেকর্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে—প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট তাহা মূল্যবান হইতে পারে, কিন্তু বর্তমানের সহিত তাহার কোনই সংশ্রব নাই। ইহুদীদের কেবলমাত্র হোনান প্রদেশস্থ কায়-ফ্যাং (kai-fung) নগরে[১] একটি ভগ্নাবশেষ মাত্র নির্দশন—সেখানে হিব্রুভাষায় কতকগুলি পাণ্ডুলিপি আছে বটে, কিন্তু উহা তাহাদের নিকটে দুর্বোধ্য, তাহাদের কোন ভজনালয় বা মিলন-মন্দির নাই, এবং সমগ্র চীনদেশে মাত্র তিনশত ইহুদী বর্তমান আছে। বৌদ্ধধর্মের নাম আছে বটে, কিন্তু তাহা জীবনহীন—শাক্যমুনির ধর্মের প্রধান বিশিষ্টতাগুলিই লুপ্ত হইয়াছে। সকলের যে-অবস্থা, মুসলমানদেরও তাহাই হইয়াছে। এমনকি প্রয়োজন-স্থলে মুসলমানেরা চাকুরির জন্য রাজকীয় বেদীকে সেজদা করিতেও বাধ্য হয়। অধিকন্তু তাহাদের মসজিদের ভিতর স্বর্ণাক্ষরে এই কথাগুলি খোদিত করিয়া রাখিতে হইয়াছে— "সম্রাট দশ হাজার বৎসর রাজত্ব করুন।"

এইরূপে সমস্ত ধর্মের উপরেই চীনের ছাপ লাগিয়া মোটের উপরে একটা-কিছুতে দাঁড়াইয়াছে। চীনের মুসলমানগণ নিজেদিগকে আরব-বোখারা-পারস্য-রুম প্রভৃতি দেশ হইতে সমাগত অতিথি মনে না করিয়া খাঁটি চীনবাসী মনে করিয়াই গৌরব অনুভব করেন। অন্যান্য চীনাম্যানেরাই ইহাদিগকে এখন আর বিদেশী মনে করে না। চীনে অনেক গুপ্ত ধর্ম-সম্প্রদায় আছে—যাহাদের মতামত বাহিরের লোকের সম্পূর্ণ অগোচর। মুসলমানদিগকে সাধারণ চীনবাসী ঐরূপ এক-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই মনে করে। চীনে শিয়া ও সুন্নী উভয় দলই বিদ্যমান; কিন্তু অন্যান্য দেশের শিয়া-সুন্নীর ন্যায় ইহারা পরস্পরকে হিংসা বা ঘৃণা করে না। রাজনৈতিক অবস্থার চাপে অমুসলমানদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস করিতে বাধ্য হওয়ায়, ইহারা মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কেও সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছে। যে কারণেই হউক, ইহাদের এইরূপ উদারতা প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।[২]

সওগাত
অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

---

১. এই স্থানে কনফুসিয়সের সমাধি বিদ্যমান আছে।

২. Riv. W. Gilbert walshe ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো নগরীর এক ধর্মসভায় "Islam in China" শীর্ষক যে-একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা হইতে বর্তমান প্রবন্ধের প্রায় সমুদয় উপকরণ গৃহীত হইয়াছে। চীনের বর্তমান অবস্থায় মুসলমান লোকসংখ্যা এবং তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।—লেখক

# মানুষ মোহম্মদ

যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষদের দৃষ্টি ঠিক সমসাময়িক কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাঁরা সাধারণের অগোচর অনেক বিষয়, অনেক গুরুতত্ত্ব বা রহস্য দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান। এজন্য সমসাময়িক লোকে তাঁদের সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারে না। শুধু তাই নয়, অনেক সময় ভুলও বুঝে থাকেন। আবার, মহাপুরুষেরাই যে সব সময় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ ক'রে থাকেন তা-ও নয়। বুদ্ধির অগোচর অস্পষ্ট অনুভূতির নির্দেশেই তাঁরা বেশীর ভাগ কাজ করেন। পরে আস্তে আস্তে সে-সবের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে থাকেন। এইরূপ অস্পষ্ট অনুভূতির নির্দেশ বা প্রেরণা দৈবানুগ্রহে ঘটে থাকে। এরই অপর নাম প্রত্যাদেশ বা 'ওহি'। অবশ্য এর গভীরতার বিভিন্ন স্তর বা পরিমাণ আছে। এবং সাধক ও পণ্ডিতগণ তার ভিন্ন ভিন্ন নাম রেখেছেন।

হজরত মোহম্মদ একজন উঁচুদরের যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষ। আজ তের শ' বছর ধ'রে তাঁকে বুঝবার জন্যে কত লোকে কত চেষ্টা করছেন। সম্পূর্ণরূপে বোধ হয় কেউ বুঝতে পারেন নাই— (কাউকেই অন্য আর একজনে ষোল আনা বুঝতে পারে না)। প্রত্যেক লোকের বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিগত বিশেষ সাধনার উপর নির্ভর করে। এমন কি দৈবানুগ্রহ স্বরূপ প্রেরণা পর্যন্ত ঐকান্তিক সাধনা-দ্বারাই লাভ করতে হয়। যা হোক, তাই ব'লে অন্যকে বুঝার চেষ্টা করা নিরর্থক নয়। তা'তে প্রেম ও সহানুভূতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। মহাপুরুষদের চরিতকথা আলোচনা করলে আর একটি লাভ হয়; সেটা এই যে, একটা মহৎ আদর্শ চোখের সামনে ভেসে উঠে চরিত্রকে কতকটা প্রভাবান্বিত ক'রে থাকে।

জ্ঞানী, কর্মী, সাধক, সম্রাট, সেনাপতি, ধর্ম-স্থাপক প্রভৃতি নানারূপে হজরত মোহম্মদ আমাদের নিকট প্রকটিত। সব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অতি সুদীর্ঘ নিবন্ধের অবতারণা করতে হয়। তার উপযুক্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, সাধনা ও অবসর আমার নাই; আর দীর্ঘ বিবরণ শুনবার মতো ধৈর্যও আপনাদের সকলের আছে কিনা, বলা যায় না। তাই সাধারণ ভদ্রলোক হিসাবে হজরত মোহম্মদ কেমন ছিলেন, যথাসম্ভব সংক্ষেপে কেবল সেই কথাটি একটু আলোচনা করব।

হজরত মোহম্মদ দিব্যকান্তি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, তাঁর চেহারা থেকে প্রতিভা ও দৃঢ় সংকল্পের দ্যুতি স্ফুরিত হয়ে সকলকে মুগ্ধ করত। তাঁর বাক্য এমন কোমল মধুর ও মনোহর ছিল যে, শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর আকর্ষণী-শক্তি অনুভব ক'রে বলত, "মোহম্মদের কথায় ইন্দ্রজাল আছে।" তিনি যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে, তেমন বাহ্য কেশ ও বেশ-বিন্যাসেও আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। বাস্তবিক, স্কন্ধ পর্যন্ত বিলম্বিত কেশ-দাম, মধ্যস্থলে সযত্ন রচিত সিঁথি, সুবিন্যস্ত দীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে শুভ্র পাগড়ী, নয়নে সোর্মা, পরিধানে পরিষ্কার বস্ত্র, এবং অঙ্গে সুগন্ধি লেপন, দন্তকাষ্ঠের সাহায্যে দন্তধাবন, নখাগ্রে রঞ্জন-দ্রব্যের ব্যবহার, এ সমস্ত যথেষ্ট শালীনতা ও

সৌখিনতার পরিচায়ক। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার সময় তিনি প্রায়ই সুসজ্জিত হয়েই দেখা করতেন। এক সময় তিনি জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি স্থাপন ক'রে কেশবিন্যাস করছিলেন। তা দেখে বিবি আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, "হজরত, আপনি হচ্ছেন আল্লার প্রেরিত পুরুষ, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তবু অতক্ষণ ধ'রে সাজগোজ করছেন, এ কেমন?" মোহম্মদ বল্লেন, "লোকে উত্তম বসনে ভূষিত হয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করেন, আল্লাহ্ এমত ইচ্ছা করেন।" বাস্তবিক মোহম্মদ নামাজ-যোগে তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হবার পূর্বেও প্রক্ষালন সুমনন প্রভৃতি বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভূষণে নিজেকে ভূষিত করতেন।

হজরত মোহম্মদ এতদূর শিষ্টাচারী ছিলেন যে, কারো সঙ্গে দেখা হ'লে তিনিই অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে সালাম বা স্বস্তিবচন পাঠ করতেন। এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো প্রকার মিথ্যা আত্মাভিমান ছিল না। তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে যখন মাজ'কে এয়মন-রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত ক'রে পাঠান, তখন বহু উপদেশের মধ্যে সালামে-অগ্রসরতা ও বাক্যে-কোমলতা বিষয়েও তাঁকে উপদেশ দান করেন। অন্যের যাতে মনঃকষ্ট না হয় সেদিকে রীতিমত লক্ষ রেখে কাজ করা বা কথা বলা ভদ্রতার লক্ষণ। তাই হজরত মাজ'কে উপদেশ দিচ্ছেন, "আমি নিজের জন্য যা ভালবাসি, তোমার জন্যও তাই ভালবাসি; নিজের জন্য যা অপ্রিয় জানি তোমার সম্বন্ধেও তা' অপ্রিয় মনে করি। তুমিও আপন জীবন দ্বারা অন্যের বিচার করবে।" হজরত কারো প্রতি কটু কথা খুব কমই বলেছেন। প্রেরিতত্ব লাভের পূর্বেও তিনি যখন ক্রীতদাস যায়েদকে মুক্ত ক'রে দিয়ে আপন পিতার সঙ্গে চ'লে যাবার জন্যে তাকে স্বাধীনতা দান করেছিলেন, তখন সে দাস পিতৃসঙ্গের চেয়ে প্রভু মোহম্মদের সঙ্গকেই প্রিয়তর জ্ঞান করেছিল। একবার কোরায়জা বংশের সহিত যুদ্ধের সময় হজরত উক্ত ইহুদী সম্প্রদায়কে "মর্কট ও বরাহের ভ্রাতা" ব'লে গাল দিয়েছিলেন। তাতে ইহুদীরা বলেছিল "হে মোহাম্মদ তুমি তো প্রেরিতত্ব লাভের পূর্বে কোনদিন কাউকে কটু কথা পর্যন্ত বলতে না; এখন তোমার এ প্রবৃত্তি হ'ল কেন?" হজরত মোহম্মদ একথা শুনে অত্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন।

হজরত মোহম্মদ অবশ্য পরলোককে ইহলোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাই ব'লে যে এ সংসারে একটু হাস্য-রসিকতা করা যাবে না, বা সর্বদা মুখ ভার ক'রে থাকতে হবে, তাঁর এরূপ সংস্কার ছিল না। তিনি সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন এবং নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ভালবাসতেন। একবার তিনি এক বৃদ্ধাকে বলেছিলেন, "বুড়ীরা কখনও বেহেস্তে যাবে না।" বুড়ী তো কেঁদেই আকুল! তখন তিনি হেসে বল্লেন, "তুমি বেহেশ্‌তে যেয়েও কি বুড়ী থাকবে? বুড়ীরাও নব-যুবতী হয়ে বেহেশ্‌তের সুখ সম্ভোগ করবে।"

দ্বিতীয় হিজরীতে "জাল-আশীর" এর অভিযান থেকে ফিরবার কালে হজরত আলী ক্লান্ত হয়ে মাটির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সমস্ত গা পিঠ মাথা বালুতে ভ'রে গিয়েছিল। হজরত নিকটে এসে আলীর এই দশা দেখে স্নেহ কৌতুক ভ'রে বলে উঠলেন "হে 'আবু তোরাব' বা 'মাটির সন্তান', ওঠ!" সেই থেকে আলীর এক উপাধি হয়ে গেল 'আবু তোরাব'।

মোহম্মদ সময় সময় তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ও ছুট খেলা করতেন। তাতে কখনও নিজে জিততেন, কখনও স্ত্রীদের জিতিয়ে দিতেন।

তিনি যুদ্ধে যাওয়ার সময় প্রায়ই সঙ্গে কোনো কোনো স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন। আপন ইচ্ছামত একজনকে নিলে যদি অন্য পত্নীদের মনে কষ্ট লাগে সেই ভয়ে তিনি অনেক সময় কাকে নিয়ে যাবেন ঠিক করবার জন্য লটারী খেলতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠত তাঁকেই সঙ্গে নিতেন।

ভীষণ যুদ্ধকালেও তাঁর সরল কৌতুক রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ওহোদের যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি খাজমার পুত্র রাফেয়াকে নিতান্ত বালক বলে প্রথমতঃ সঙ্গে নিতে চান নাই। পরে তীরন্দাযীর সুখ্যাতি ও সুপারিসে তাকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন। তখন বামনের পুত্র সফ্‌রাও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বায়না ধ'রে বসলো। সে বলতে লাগলো, "রাফেয়ার থেকে আমি কুস্তীতে শ্রেষ্ঠ, ও যুদ্ধে যাবে, আর আমি যেতে পারব না! সে কিছুতেই হবে না।" মোহম্মদ এই ঘোর সংকটকালেও বললেন, "বেশ, তোমরা দুইজনে কুস্তি কর, দেখি কে জেতে, কে হারে।" অমনি দুই বালক-বীরে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে সফ্‌রারই জিত হ'ল। তখন হজরত দুই জনকেই যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। মহাপুরুষের জীবনের গুরুগম্ভীর ভাব ও কর্মের পার্শ্বে এই সব হাস্য-কৌতুক বেশ উপভোগের সামগ্রী, সন্দেহ নাই।

মোহম্মদ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত আদর করতেন, তাদের সঙ্গে মিষ্টিমুখে কথা বলতেন, এবং সময় সময় তাদের সঙ্গে খেলাও করতেন। একবার নামাজে সেজদা দিবার সময় তাঁর দৌহিত্র শিশু হুসেন তাঁর ঘাড়ে চড়েছিলেন। হুসেনের নেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে তবে হজরত সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করলেন। তিনি অনেক সময় নিজে উট সেজে হাসেন হুসেনকে সেই উটে চড়াতে ভালবাসতেন।

পূর্বে কয়েকবার বলা হয়েছে, মোহম্মদ অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুতে তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করেছিলেন। তাঁর নিজের আসন্ন মৃত্যুকালে যখন কন্যা ফাতেমা কেঁদে আকুল হচ্ছিলেন, তখন হজরত আলী তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাতে হজরত বলেছিলেন, "আলী, তুমি ফাতেমাকে আপন পিতার জন্য শোক প্রকাশ করতে বাধা দিও না।" মানবীয় প্রকৃতির দুর্বলতা তিনি স্বীকার করতেন। কর্তব্যের শাসনে হৃদয়-বৃত্তিকে নিষ্পেষিত করে ফেলবার শিক্ষা হজরত কখনও দেন নাই।

আরবের উচ্ছৃঙ্খল সমাজে বিবাহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ক'রে প্রয়োজন মতো মাত্র চারিটি নারীতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যবস্থা দিয়ে হজরত মোহম্মদ খুব বড় একটা সংস্কার সাধন করেছিলেন।

কিন্তু তিনি নিজে দ্বাদশটি বিবাহ করেছিলেন, তন্মধ্যে দুই জন দাসী-পত্নী ছিলেন। হজরতের প্রথম বিবাহ হয় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিবি খাদিজার সঙ্গে। পুণ্যবতী খাদিজা ৬৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। হজরতের বয়স তখন ৫০ বৎসর। বিবি খাদিজার জীবিতকালে তিনি অন্য কোনো বিবাহ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তিনি যৌবনকাল একমাত্র বিবি খাদিজাকে নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু খাদিজার মৃত্যুর পর এক বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি বালিকা আয়েশা এবং বৃদ্ধা সওদার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তী ছয়-সাত বৎসরের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে হাফসা, জয়নাব, ওম্মে সালমা, জবিরিয়া, রায়হানা, ওম্মে হাবিবা, মারিয়া, সাফিয়া ও মায়মুনাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হজরতের মৃত্যুর সময় এই এগার জন জীবিতা ছিলেন। যা' হোক পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সংযম রক্ষা ক'রে সহসা এরূপভাবে হজরত মোহম্মদের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, একথা বাস্তবিকই বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য তিনি পত্নীগৃহে গিয়ে অনেক সময় সারা রাত উপাসনায় রত থাকতেন, এরূপ হাদিস বা কথা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাজনৈতিক কারণে, বা সাম্যভাব প্রদর্শনের জন্য, বা নিরাশ্রয়া নারীকে আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে, বা কোনো কোনো নারী তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষিণী ছিলেন ব'লে অনেকগুলি বিবাহ করেছিলেন। সে

সময়ের অবস্থা কেমন ছিল, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু বর্তমান যুগে এগুলি অতিরিক্ত বিবাহ করবার সঙ্গত কারণরূপে গণ্য হয় না। মহাপুরুষদের জীবনে অনেকগুলি ঘটনা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ থাকে। মোহম্মদের শেষ বয়সের বিবাহ ব্যাপারকেও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ব'লে মনে করা যেতে পারে।

মোহম্মদের অন্তঃকরণ সমবেদনায় পূর্ণ ছিল। অন্যের দুঃখ দেখলেই অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়তেন। কারো অসুখ-বিসুখের সংবাদ পেলে জাতিধর্মনির্বিশেষে তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কারো মৃত্যু হ'লে তিনি শবের অনুগমন করতেন। প্রতি বৎসর তিনি ওহোদ ক্ষেত্রে গিয়ে উক্ত যুদ্ধে নিহত ৭০ জন শহীদের কবর যিয়ারত ক'রে, তাঁদের জন্য প্রার্থনা ক'রে আসতেন।

আবদুল্লা ওবায় নামক এক ব্যক্তি মুখে হজরতের আনুগত্য স্বীকার করলেও অত্যন্ত কপট প্রকৃতির লোক ছিল। সে তলে তলে ইহুদী ও কোরেশগণকে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল, অনেক গোপনীয় আভ্যন্তরীণ কথা শত্রুদের নিকট প্রকাশ করেছিল, আর হজরতের নামে নানা কুৎসা রটনা ক'রে প্রচার করেছিল। তার এই সমস্ত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে এক সময় তার পুত্র তাকে হত্যা করতে অগ্রসর হয়। হজরত নিষেধ করেন এবং বলেন যে, "যতদিন সে আমার সহচর হয়ে আছে, ততদিন আমি ওর মঙ্গল চিন্তাই করব। ওকে যদি বধ করার হুকুম দেই, তবে লোকে বলবে যে, মোহম্মদ আপন সহচরদের হত্যা করে।"—যা' হোক এ হেন আবদুল্লা ওবায়ের কঠিন পীড়ার সময় মোহম্মদ তাকে দেখতে যেতেন। মৃত্যুকালে আপন পাপাচার ও কপটাচারের জন্য সে অনুতপ্ত হয়। সে হজরতের নিকট প্রার্থনা করে, "আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে আমার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবেন, আর আপনার অঙ্গাচ্ছাদন দিয়ে আমার কাফন করবেন"; মোহম্মদ সম্মত হন। তিনি তার শব প্রক্ষালন ও কাফন পরিধানের সময় উপস্থিত ছিলেন। যখন তার কবরের পার্শ্বে জানাজা পড়তে প্রবৃত্ত হন, তখন ওমর তাঁকে নিবারণ ক'রে বলেন, "প্রেরিত পুরুষ, এ লোক কপট ছিল, এ অমুক সময় এরূপ করেছে, অমুক সময় এরূপ বলেছে, আপনি কেন এর আত্মার জন্য প্রার্থনা করছেন?" হজরত ওমরকে বললেন, "তুমি চুপ কর।" তথাপি ওমর বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করতে নিষেধ করতে লাগলেন। তখন হজরত বললেন, "ওমর আমি আবদুল্লাহ্ ওবায়ের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য।"

হজরত মোহম্মদের দয়া ও ক্ষমার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি হিজরতের পূর্বে যখন জায়েদকে সঙ্গে ক'রে তায়েফ নগরে ধর্মপ্রচার করতে যান, তখন সেখানকার লোক তাঁকে যারপরনাই অপমান করে এবং লোষ্ট্রাঘাতে তাঁর সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দেয়। তখন মোহম্মদ বলেছিলেন, "হে খোদা, এরা কি করছে তা বুঝতে পারছে না। তুমি এদের অন্তঃকরণে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত কর।"

বদরের যুদ্ধে বহু লোক মুসলমানদের হস্তে বন্দী হয়। তারা এক ব্যক্তিকে আবুবকরের কাছে এবং আর একজনকে ওমরের কাছে পাঠিয়ে দেয়, যাতে তা'রা মোহম্মদের নিকট বন্দীদের হয়ে সুপারিশ করে। আবুবকর বন্দীদের প্রার্থনা মতো সুপারিশ করলেন, "মুক্তিমূল্য গ্রহণ ক'রে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হোক"। ওমর বললেন, "এদের সবাইকে হত্যা ক'রে শত্রু নির্মূল করাই সুযুক্তি।" মোহম্মদ আবুবকরের পরামর্শ মতো কাজ করাই স্থির করলেন। এতদনুসারে এক হাজার থেকে চার হাজার দেরেম পর্যন্ত মুক্তিমূল্য নির্ধারিত হ'ল। সিদ্ধান্ত

নিঃস্ব বন্দীগণকে অমনি অমনি ছেড়ে দেওয়া হ'ল। যারা বিদ্বান তাদের প্রতি আদেশ হ'ল যে, দশজন আনসারীকে বর্ণমালা ও প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে, তা' হ'লেই তাঁদের মুক্তি। একজন নিরক্ষর 'উম্মি' পয়গম্বরের শিক্ষাদান করবার এই ব্যবস্থা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য।

মোহম্মদের এক কন্যার নাম ছিল জয়নাব। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই আবুল আস্-এর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ইনিও বদর-যুদ্ধের একজন বন্দী ছিলেন। জয়নাব যখন এর মুক্তিমূল্য প্রেরণ করলেন, তখন মোহম্মদ আপন কন্যার প্রেরিত মুদ্রা গ্রহণ করতে বড়ই লজ্জা ও ক্লেশ বোধ করতে লাগলেন। তিনি সহচরগণকে বললেন, "তোমরা সঙ্গত বোধ করলে জয়নাবের স্বামীকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ না ক'রে মক্কায় পাঠিয়ে দাও।" তখন সকলের মত অনুসারে বিনা পণে আবুল আস্‌কে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মোহম্মদ করুণাবিবর্জিত কঠোর বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

আবুল আস্ হজরতের কন্যা জয়নাবকে ইসলামে বিশ্বাস হেতু ইতিপূর্বেই বর্জন করেছিলেন; এখন মুক্ত হয়ে তিনি জয়নাবকে হজরতের নিকট পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে হব্বার নামে এক ব্যক্তি জয়নাবকে বাধা প্রদান করে এবং তাঁকে লক্ষ্য করে' একটি ভল্ল নিক্ষেপ করে। ভল্ল লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেও অন্তঃসত্ত্বা জয়নাব তাতে অত্যন্ত ভয় পান। তার ফলে মদিনায় পৌঁছে তার গর্ভপাত ও অকালমৃত্যু হয়। মোহম্মদ মক্কাবিজয়ের পর এই হব্বারকে ক্ষমা করেছিলেন।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী রাক্ষসী হেন্দা ওহোদ সমরে নিহত বীর আমীর হামজার কলিজা বা যকৃৎ চর্বন করেছিল। একেও মোহম্মদ ক্ষমা করেছিলেন। উক্ত হামজার হত্যাকারী ওহশীকে দেখে মোহম্মদ শোকে হৃদয়াবেগ দমন করতে পারেন নাই। তিনি ওহশীকে বললেন, "তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু তুমি আর আমার সামনে এসো না।"

খয়বরের যুদ্ধের পর ইহুদী দলপতি হারেসের কন্যা জয়নাব ছাগমাংসে বিষ মাখিয়ে হজরত ও তাঁর সহচরগণকে ভোজন করতে দিয়েছিলেন। হজরত একগ্রাস মুখে দিয়েই বিস্বাদ লাগাতে সকলকে সাবধান ক'রে দিলেন, "তোমরা কেউ এই মাংস খেয়ো না, এতে বিষ মাখানো আছে।" কিন্তু ইতিপূর্বেই তাঁর কোনো সহচর একগ্রাস গলাধঃকরণ ক'রে ফেলেছিলেন। কিছুকাল পরে এঁর মৃত্যু হয়। যা'হোক, কে বিষ দিয়েছে অনুসন্ধান করাতে জয়নাব আত্ম-দোষ স্বীকার করলো। বললো, "আপনি সত্য নবী কিনা, পরীক্ষা করবার জন্য এরূপ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি নবী হ'লে হয় আগে থেকে জানতে পেরে ভোজন করবেন না, নয়ত ভোজন করলেও আপনার উপর বিষের ক্রিয়া হবে না।" হজরত মোহম্মদ এহেন প্রাণের শত্রুকেও অবলীলাক্রমে ক্ষমা করেছিলেন। তাঁর জীবনে ক্ষমার এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে, যা শুনলে চমৎকৃত হতে হয়।

মোহম্মদ অতিথি-সেবা করতে খুব ভালবাসতেন। অনেক সময় নিজে অভুক্ত থেকেও সমস্ত অন্ন অতিথিকে দিতেন। নিজের ঘরে কিছু না থাকলে সহচরদের প্রতি সেই অতিথি-সেবার আদেশ প্রদান করতেন।

মোহম্মদ কোনো প্রকার শারীরিক পরিশ্রমকেই ঘৃণা করতেন না। বাল্যকালে উদরান্ন সংস্থানের জন্য তাঁকে পারিশ্রমিক গ্রহণ ক'রে অন্যের পশু চরাতে হয়েছিল। মদিনায় মসজিদ নির্মাণ করবার সময় তিনি স্বয়ং মজুরদের সঙ্গে মিলে মিশে ইটপাটকেল টানা এবং অন্যান্য কাজ করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি অন্য সকলের মত মাটি কেটে ও পাথর ভেঙ্গে

পরিখা খনন করেছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি নিজে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করেছেন, সৈন্যচালনা করেছেন— প্রাণভয়ে লুকিয়ে থাকেন নাই।

কোনো কোনো চরিত-গ্রন্থে পাওয়া যায়, কোরেশগণ যেমন হজরতকে বধ করবার জন্য অনেক চর নিযুক্ত করেছিল, হজরতও নাকি মদিনায় অবস্থানকালে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করবার জন্য দুইজন ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তবে রাজনৈতিক প্রয়োজন হিসাবে তৎকালীন অবস্থার প্রতি লক্ষ ক'রে হয়ত বা হজরতকে সমর্থনও করা যেতে পারে; কিন্তু আমরা যখন মানুষ হিসাবে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা করছি, তখন এরূপ প্রচেষ্টাকে কোনোক্রমেই নির্দোষ ব'লে অভিহিত করতে পারি না।

তাঁর আত্মসম্মানবোধ অতি প্রবল ছিল বলে ভিক্ষাবৃত্তিকে অতিশয় ঘৃণা করতেন। এক সময় এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাকে একখানা কুঠার দান ক'রে বলে দিয়েছিলেন, "এর দ্বারা কাঠ কেটে তাই বেচে জীবনধারণ কর গে।"

হজরত কারও দান গ্রহণ করতেন না, কিন্তু উপহার দিলে ফিরিয়ে দিতেন না। পারশ্য দেশের এক কৃষক-সন্তান 'সালমান ফারসী' তাঁর এই লক্ষণ দেখে তাঁকে চিনতে পেরে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

"মানুষ মানুষের ভাই, পরস্পর সমান"—এই নীতিবাক্য তিনি কেবল মুখেই প্রচার করেন নাই, কার্যেও তার ভুরি ভুরি প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তিনি দাসদাসীর কাছ থেকে যেমন সেবা গ্রহণ করতেন, তাদেরও তেমন সেবা করতেন। অনেক সময় দাসকে উটে চড়িয়ে নিজে পদব্রজে চলতেন। বাড়ীতে দাসদাসীদের জন্য স্বতন্ত্র পাক হ'ত না, সকলে এক সঙ্গে বসে একই ভোজ্য আহার করতেন। দাসদাসীরা পরিবারের অন্য লোকের ন্যায় সমুদয় সুবিধাই ভোগ করত। ভক্ত বেল্লাল একজন দাস ছিলেন, তাকে তিনি আজান দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করেন। একজন দাসের সঙ্গে আপন ফুফাত বোনের বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্বে দাসপুত্র আসামার নেতৃত্বাধীনে আবুবকর, ওমর, ওসমান এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান মোহাজের ও আন্‌সারগণকে এক অভিযানে গমন করতে আদেশ করেন। তাতে অনেকে কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এজন্য হজরত মোহম্মদ রোগক্লিষ্ট শরীরে মাথায় পটি বেঁধে মস্‌জিদের বক্তৃতামঞ্চ বা মিম্বারে আরোহণ ক'রে বলেন, "হে মুসলমান বন্ধুগণ, আসামার সেনাপতিত্ব সম্বন্ধে এসব কি বিগর্হিত কথা শুনতে পাচ্ছি? যদি তোমরা আজ আসামার সেনাপতি হওয়া অনুচিত বলো, তবে মুতার যুদ্ধে তার পিতার সেনাপতিত্বেও অনুরূপ বোধ ক'রে থাকবে। যথার্থই সে সেনাপতির উপযুক্ত ছিল, তদভাবে তার পুত্রও যোগ্যপাত্র। আসামার পিতা জায়দ সকল লোকের প্রিয় ছিল। আসামাও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার শ্রেষ্ঠ সহচর। উভয়েই সৎক্রিয়াশীল; এক্ষণে আসামার সম্বন্ধে আমার উপদেশ তোমরা গ্রাহ্য কর।"

মানুষে মানুষে সমতা সম্বন্ধে নবুয়ত-প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই হজরত মোহম্মদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। হজের সময় সকল লোকে আরাফাতের ময়দানে সমবেত হতেন, কিন্তু কোরেশরা আপনাদের আত্মমর্যাদা লাঘব হওয়ার ভয়ে মক্কার সীমানার বাহিরে যেতেন না। এই প্রথা হজরতের মনঃপুত না হওয়াতে তিনি প্রেরিতত্ব লাভের পূর্বেও একাকী সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে আরাফাতের ময়দান পর্যন্ত যেতেন। নবী হওয়ার পর তিনি দৈবানুগ্রহ-স্বরূপ প্রেরণা-যোগে প্রচার করেন যে, "অন্য লোকেরা যতদূর পর্যন্ত গমন করে, সকলেরই

পরিখা খনন করেছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি নিজে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করেছেন, সৈন্যচালনা করেছেন— প্রাণভয়ে লুকিয়ে থাকেন নাই।

কোনো কোনো চরিত-গ্রন্থে পাওয়া যায়, কোরেশগণ যেমন হজরতকে বধ করবার জন্য অনেক চর নিযুক্ত করেছিল, হজরতও নাকি মদিনায় অবস্থানকালে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করবার জন্য দুইজন ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তবে রাজনৈতিক প্রয়োজন হিসাবে তৎকালীন অবস্থার প্রতি লক্ষ ক'রে হয়ত বা হজরতকে সমর্থনও করা যেতে পারে; কিন্তু আমরা যখন মানুষ হিসাবে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা করছি, তখন এরূপ প্রচেষ্টাকে কোনোক্রমেই নির্দোষ ব'লে অভিহিত করতে পারি না।

তাঁর আত্মসম্মানবোধ অতি প্রবল ছিল বলে ভিক্ষাবৃত্তিকে অতিশয় ঘৃণা করতেন। এক সময় এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাকে একখানা কুঠার দান ক'রে বলে দিয়েছিলেন, "এর দ্বারা কাঠ কেটে তাই বেচে জীবনধারণ কর গে।"

হজরত কারও দান গ্রহণ করতেন না, কিন্তু উপহার দিলে ফিরিয়ে দিতেন না। পারশ্য দেশের এক কৃষক-সন্তান 'সালমান ফারসী' তাঁর এই লক্ষণ দেখে তাঁকে চিনতে পেরে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

"মানুষ মানুষের ভাই, পরস্পর সমান"—এই নীতিবাক্য তিনি কেবল মুখেই প্রচার করেন নাই, কার্যেও তার ভুরি ভুরি প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তিনি দাসদাসীর কাছ থেকে যেমন সেবা গ্রহণ করতেন, তাদেরও তেমন সেবা করতেন। অনেক সময় দাসকে উটে চড়িয়ে নিজে পদব্রজে চলতেন। বাড়ীতে দাসদাসীদের জন্য স্বতন্ত্র পাক হ'ত না, সকলে এক সঙ্গে বসে একই ভোজ্য আহার করতেন। দাসদাসীরা পরিবারের অন্য লোকের ন্যায় সমুদয় সুবিধাই ভোগ করত। ভক্ত বেল্লাল একজন দাস ছিলেন, তাকে তিনি আজান দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করেন। একজন দাসের সঙ্গে আপন ফুফাত বোনের বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্বে দাসপুত্র আসামার নেতৃত্বাধীনে আবুবকর, ওমর, ওসমান এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান মোহাজের ও আন্‌সারগণকে এক অভিযানে গমন করতে আদেশ করেন। তাতে অনেকে কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এজন্য হজরত মোহম্মদ রোগক্লিষ্ট শরীরে মাথায় পটি বেঁধে মস্‌জিদের বক্তৃতামঞ্চ বা মিম্বারে আরোহণ ক'রে বলেন, "হে মুসলমান বন্ধুগণ, আসামার সেনাপতিত্ব সম্বন্ধে এসব কি বিগর্হিত কথা শুনতে পাচ্ছি? যদি তোমরা আজ আসামার সেনাপতি হওয়া অনুচিত বলো, তবে মুতার যুদ্ধে তার পিতার সেনাপতিত্বেও অনুরূপ বোধ ক'রে থাকবে। যথার্থই সে সেনাপতির উপযুক্ত ছিল, তদভাবে তার পুত্রও যোগ্যপাত্র। আসামার পিতা জায়দ সকল লোকের প্রিয় ছিল। আসামাও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার শ্রেষ্ঠ সহচর। উভয়েই সৎক্রিয়াশীল; এক্ষণে আসামার সম্বন্ধে আমার উপদেশ তোমরা গ্রাহ্য কর।"

মানুষে মানুষে সমতা সম্বন্ধে নবুয়ত-প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই হজরত মোহম্মদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। হজের সময় সকল লোকে আরাফাতের ময়দানে সমবেত হতেন, কিন্তু কোরেশরা আপনাদের আত্মমর্যাদা লাঘব হওয়ার ভয়ে মক্কার সীমানার বাহিরে যেতেন না। এই প্রথা হজরতের মনঃপুত না হওয়াতে তিনি প্রেরিতত্ব লাভের পূর্বেও একাকী সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে আরাফাতের ময়দান পর্যন্ত যেতেন। নবী হওয়ার পর তিনি দৈবানুগ্রহ-স্বরূপ প্রেরণা-যোগে প্রচার করেন যে, "অন্য লোকেরা যতদূর পর্যন্ত গমন করে, সকলেরই

ততদূর পর্যন্ত গমন করা কর্তব্য।" তা ছাড়া মক্কার লোকেরা সমস্ত হজযাত্রীর বস্ত্র যোগাতেন। তাঁদের নিকট থেকে বস্ত্র ক্রয় না করলে অগত্যা উলঙ্গ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করতে হ'ত। হজরত আজমীদের এই অপমান ক্ষালন করেন। তিনি মক্কা-বিজয়ের পর হজরত আলীকে দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, কেউ উলঙ্গ অবস্থায় কাবা প্রদক্ষিণ করতে পারবে না।

হজরত অনেক সময় কোনো কঠিন সমস্যা উপস্থিত হ'লে প্রত্যাদেশের জন্য অপেক্ষা করতেন। অধিকাংশ সময়ই দৈবানুগ্রহে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হ'ত। প্রত্যাদেশ পালন করা নিজের জন্য ও আপন মণ্ডলীর জন্য অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করতেন। কিন্তু যে সব বিষয়ে কোনো দৈববাণী হয় নাই, সেই সব বিষয়ে তিনি পাত্রমিত্র দশজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অধিকাংশের মত অনুসারেই চলতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় শত্রুর আগমন প্রতিরোধ করার উপায় কি, জিজ্ঞাসা করাতে সালমান ফারেসী বললেন, এরূপ অবস্থায় পারশ্যে নগরের চতুর্দিকে গভীর গড়খাই নির্মাণ করবার রীতি আছে। তাঁর পরামর্শমতই হজরত পরিখা খনন করতে আদেশ দেন। আরবদেশে পরিখা খনন ক'রে যুদ্ধ করা এই প্রথম। নামাজে আহ্বান করবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করতে হবে, তা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়। অগ্নি প্রজ্জ্বলন, ঘণ্টাধ্বনি, প্রভৃতি অনেক প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে শেষে উচ্চস্থান থেকে আজান দেওয়াই সাব্যস্ত হয়। যুদ্ধের সময় নগরের ভিতর থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে, কি বাইরে প্রান্তরে গিয়ে শত্রুর আগমনে বাধা দিতে হ'বে, এ সব ব্যাপারও সাধারণ মন্ত্রণায় স্থির হ'ত। — পরিখার যুদ্ধে হজরত অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শত্রুপক্ষীয় গৎফান ও ফেজানা বংশের দুইজন প্রতিনিধি ডাকিয়ে এনে তাদেরকে মদিনায় উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে যুদ্ধের থেকে নিবৃত্ত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি মাজের পুত্র সাদ ও এবাদার পুত্র সাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। তাতে উভয় সাদই বলেন, "প্রেরিত পুরুষ, এরূপ সন্ধি স্থাপনে যদি আপনি প্রত্যাদেশ পেয়ে থাকেন, তবে তা আমাদের শিরোধার্য। বুদ্ধি ও যুক্তি অনুসারে, না প্রত্যাদেশ অনুসারে এ কার্য হচ্ছে, আমাদের জ্ঞাপন করুন।" হজরত বললেন, "প্রত্যাদেশ হ'লে তোমাদের পরামর্শ গ্রহণ করতাম না। আমি এ বিষয়ে কোনো প্রত্যাদেশ পাই নাই; কিন্তু যখন দেখলাম যে আরবের বহু গোষ্ঠী একত্র হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করছে তখন ইচ্ছা ক'রেছি যে, শত্রুদের দুই এক দলকে বশীভূত ক'রে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রস্তর নিক্ষেপ করি। তা' হলে তাদের প্রতাপ খর্ব হয়ে পড়বে।" মাজের পুত্র সাদ বললেন, "হে রসুল, পূর্বে এদের সঙ্গে আমরাও মহান ঈশ্বরকে ভুলে পুতুল-পূজায় যোগ দিতাম, তখনও এই সব লোক আতিথ্য-সৎকারের উদ্দেশ্যে সবিনয় প্রার্থনা না ক'রে আমাদের উদ্যানের একটি খোর্মাফলের প্রতি লোভ করতে পারে নাই; আর এখন তো আমরা ইসলাম-রূপ মহাসম্পদ লাভ করেছি, আপনার সাহচর্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছি, এমত অবস্থায় আমরা কেন এত নীচতা স্বীকার করতে যাব, আর এই অসত্য-পথাবলম্বী দুষ্ট দলকে আমাদের উপর প্রবল হতে দেব? তাদের একবার প্রশ্রয় দিলেই তারা বারংবার নানা ছুতায় অনুরূপ দাবী করতে আরম্ভ করবে। আমরা এরূপ নীচতা স্বীকারে অসম্মত। আল্লার নামে শপথ ক'রে বলছি, যে পর্যন্ত না তাঁর আদেশ পাচ্ছি সে পর্যন্ত এদের ও আমাদের মধ্যে অসি ভিন্ন অন্য কথা হবে না।" তখন এই কথা শুনে হজরত সন্ধিপত্রের মুসাবিদা ছিঁড়ে ফেললেন। এই ঘটনায় প্রসঙ্গতঃ হজরতের অনুগামীগণের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌তালা অবশ্য তাঁদের একান্ত নির্ভরশীল বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করবেন।

হজরত চিরকাল মক্কাবাসীদের প্রতি এবং তাঁর ধাত্রী-মা হালিমা ও তদ্বংশীয় লোকের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। এতে তাঁর কোমল প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মক্কা-নগরে লোকসংখ্যা অধিক এবং ভূমির পরিমাণ ও উর্বরাশক্তি অল্প ব'লে খাদ্যদ্রব্যের জন্য মক্কাবাসীগণকে অন্য স্থানের আমদানীর উপর নির্ভর করতে হ'ত। নজ্দ্ প্রদেশের সামামা নামক এক ধনবান বণিক যব গম প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে মক্কায় চালান দিতেন, তাতে মক্কাবাসীদের খাদ্যের স্বচ্ছলতা হ'ত। হজরত নজ্দে একদল লোক পাঠিয়ে সামামাকে বন্দী ক'রে আনলেন। তাঁকে মসজিদের একটি স্তম্ভে বেঁধে রেখে প্রশ্ন করা হ'ল "তোমাদ্বারা কি কোরেশগণ উপকৃত হচ্ছে?" তখন সামামা উত্তর করলেন, "মোহম্মদ, আমি একজন কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তুমি আমাকে হত্যা করলে একজন হিতৈষীকে হত্যা করবে, আর আমাকে মুক্তি দিলে একজন কৃতজ্ঞকে মুক্ত করবে। যদি ধন তোমার লক্ষ্য হয়, তা'হলে বল, আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব।" পর পর তিন দিন তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়, তিন দিনই তিনি এই উত্তর দেন। তখন হজরত সামামাকে ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন। সামামা মুক্ত হয়ে গিয়ে প্রথমে স্নানাদি করে, আবার মসজিদে এসে হজরতের নিকট ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করলেন। পরে সামামা ওমরা ব্রত পালন করবার জন্য মক্কায় চলে যান, সেখান থেকে স্বদেশে প্রস্থান করেন ও আপন অনুচরবর্গকে মক্কায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে নিষেধ ক'রে দেন। ফলে মক্কাবাসীদের ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হ'ল। তখন তারা তাদের পরম শত্রু মোহম্মদের নিকট দূত প্রেরণ ক'রে এই সংবাদ জ্ঞাপন করল। হজরত মোহম্মদ তাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে সামামাকে আদেশ করলেন, মক্কায় যেন পূর্বের ন্যায় রীতিমত শস্য প্রেরণ করা হয়।

কোনো এক যুদ্ধের সময় হজরত শত্রুদের শস্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছিলেন; পরে অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের অনুরোধে উক্ত কার্য থেকে বিরত থাকেন।

মক্কা-বিজয়ের পর হোনায়েন-অরণ্যে সম্মিলিত আরব গোষ্ঠীর এক বিরাট বাহিনীর সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়। এই যুদ্ধে অতি কষ্টে জয়লাভ হয়, ও পরে বহু বন্দী ও লুণ্ঠন-সামগ্রী হস্তগত হয়। বন্দীদের মধ্যে হজরতের দুধ-ভগিনী শায়মা ছিলেন। হজরত তাঁকে দেখেই সসম্মানে গাত্রোত্থান ক'রে আপন উত্তরীয় বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিয়ে তাঁর মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে তাঁকে অনেক উপহারসহ সন্তুষ্ট ক'রে বিদায় করেন। তাঁর সুপারিসে হালিমার এক আত্মীয় নজ্জাদ-কেও মুক্তিদান করা হয়।

কোনো প্রকার আড়ম্বর প্রদর্শনের ভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি কোনো দিন নিজের বোজর্গী জাহির করবার জন্য অলৌকিক ক্রিয়াদি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি নিজেকে আবদুল্লাহ্ বা ঈশ্বরের দাস ব'লে পরিচিত করতেন। কখনও নিজেকে ঈশ্বরের অংশ বা অবতার ব'লে ঘোষণা করেন নাই। তিনি বারংবার দৃঢ়রূপে ঘোষণা করেছেন; "আমি সামান্য মানুষ মাত্র, আল্লাহ্ আমাকে সুসমাচার প্রচার করতে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমার অন্তঃকরণে আল্লাহ্ প্রেরণার সঞ্চার করে থাকেন।" তাঁর দ্বারা অনেক আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তিনি কোরেশদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও অলৌকিকতা দেখাবার জন্য উৎসাহী হন নাই! কোরেশরা তাঁকে স্বর্গীয় দূত নামিয়ে এনে তাঁর প্রেরিতত্বের সাক্ষ্য দিবার জন্য বা অকস্মাৎ অপরিমিত ধন-সম্পদদের অধিকারী হ'বার জন্য অথবা স্বর্গ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সোপান স্থাপন করবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। তিনি কেবলই বলতেন, 'মহান আল্লাহ্ আমাকে এজন্য প্রেরণ করেন নাই। তাঁর আজ্ঞা আপনাদের নিকট প্রচার করতে পাঠিয়েছেন।

তা যদি গ্রাহ্য করেন তবে আপনাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হবে, গ্রাহ্য না করলে আমি ধৈর্য সহকারে আল্লা'র আজ্ঞার প্রতীক্ষা করব।"

মোহম্মদের পুত্র সন্তান ইব্রাহিম যেদিন পরলোক গমন করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকে বলাবলি করতে লাগ্‌ল, মহাপুরুষের শোকে সমবেদনা জানাবার জন্য প্রকৃতি মলিন বেশ ধারণ করেছে। মোহম্মদ এই কথা শুনে বললেন, "আমার ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে এই সূর্যগ্রহণের কোনো সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতির যে বাঁধা নিয়ম আছে, সেই অনুসারে কাজ হয়ে থাকে।"

হজরত অত্যন্ত বিনয়ী, শান্তিকামী ও অঙ্গীকারপূর্ণকারী ছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যখন তিনি লিখতে চাইলেন "বিসমিল্লাহের রাহ্‌মানের রাহিম"— তখন কোরেশরা বললেন, "আমরা রাহমান কে জানি না, "বে এস্‌মেকা আল্লাহুম্মা" লেখ।" হজরত তাই লেখালেন। অতঃপর যখন আলী তাঁর নির্দেশ মত লিখলেন "মোহম্মদ রসুলুল্লাহ্ হইতে কোরেশদের প্রতি" তখন তারা বললেন "তোমাকে যদি রসুলুল্লাহ্ (আল্লার প্রেরিত) ব'লেই মান্‌ব, তবে আর এত গোলমাল কিসের? লেখ, মহম্মদ ইব্‌নে আব্‌দুল্লাহ্ (আব্‌দুল্লার পুত্র মোহম্মদ)।" হজরত তখন আলীকে রসুলুল্লাহ্ কেটে ইব্‌নে আবদুল্লাহ লিখতে বললেন। আলী "রসুলুল্লাহ্" শব্দ কিছুতেই কাটতে রাজী না হওয়ায় তিনি স্বহস্তে উহা কেটে দিয়ে, তার উপর দিয়ে আলীকে ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ লিখতে আদেশ করলেন। এই সব ঘটনায় তাঁর মহানুভবতা, যুক্তি অনুবর্তিতা, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণ প্রকাশ পায়।

এই হোদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত ছিল, 'কোনো মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় চ'লে গেলে কোরেশরা তাঁকে হজরতের নিকট ফেরত পাঠানের জন্য দায়ী থাকবেন না, কিন্তু মক্কা থেকে কেউ মদিনায় গেলে, মোহম্মদ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।" কোরেশদের পক্ষে থেকে সুহাইল হজরতের সঙ্গে এই মর্মে কথোপকথন করছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁর পুত্র 'আবুজন্দল' হাতে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবস্থায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে বলতে হজরতের সভায় উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রর্থনা করলেন। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বেই পুত্রের ইসলাম অবলম্বনের অপরাধে সুহাইল তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। পুত্রকে উপস্থিত দেখেই সুহাইল হজরতকে বললেন, সন্ধিতে যা নির্দ্ধারিত হয়েছে, তার প্রথম ব্যাপার উপস্থিত; হজরত এইক্ষণ আপনি এ-কে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। হজরত বললেন "এখনও সন্ধিপত্র লেখা হয় নাই। আমার অনুরোধ যে, এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি নিবৃত্ত থাকুন, তাকে আমার আশ্রয়ে থাকতে দিন।" সুহাইল অসম্মত হলেন। হজরত বারবার দৃঢ় অনুরোধ করাতেও যখন সুহাইলকে সম্মত করাতে পারলেন না, তখন অগত্যা তাঁকে অতঃপর পুত্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে অনুরোধ ক'রে আবুজন্দলকে পিতার হস্তে সমর্পণ করলেন। তখন আবুজন্দল আর্তনাদ ক'রে বলতে লাগলেন, "মুসলমান বন্ধুগণ! তোমরা কি আমাকে অংশীবাদীদের হস্তে সমর্পণ করলে? আমার আবেদন শ্রবণ করলে না, আমাকে আশ্রয় দিলে না! ইসলামধর্ম গ্রহণ করাতে আমার উপর যে সব নির্যাতন হয়েছে তা একবার বিবেচনা করলে না?" তখন হজরত বললেন, "আবুজন্দল, ধৈর্য ধারণ কর, মনকে প্রফুল্ল রাখ, শুভফলের প্রার্থী থাক, আল্লার অনুগ্রহের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি সত্বরই তোমাকে ও অপর যে সব মুসলমান মক্কায় অবস্থান করছে সে সকলকেই দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন। সম্প্রতি কোরেশদলের সঙ্গে আমরা এক নিয়মে আবদ্ধ হচ্ছি, তার অন্যথা করা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। প্রথমতঃ এই ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ আবশ্যক।"

হজরত মোহাম্মদ হোদায়বিয়া থেকে মদিনায় ফিরে আসার পর আবু নজির নামক এক ব্যক্তি ইসলামধর্ম গ্রহণপূর্বক মক্কা থেকে পলায়ন ক'রে মদিনায় উপস্থিত হয়। তখন মক্কা থেকে কওসর ও আমের নামক দুইজন দূত আবু নজিরকে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধপত্রসহ হজরতের নিকট গমন করে। হজরত সন্ধিপত্র অনুসারে আবু নজীরকে দূতদ্বয়ের সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পথে আবু নজির বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমেরকে বধ করে, ও পুনরায় হজরতের নিকট এসে বলে, "প্রেরিত পুরুষ, আপনি আমাকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন, তাতে আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে। তারপর আল্লাহ আমাকে শত্রুহস্ত থেকে মুক্তিদান করেছে।" হজরত বললেন, "আবু নজির বিবাদাগ্নির আশ্চর্য উদ্দীপক; দুই একজন সহায় পেলে সে কি না করতে পারে?" এই কথা শুনে আবু নজির তৎক্ষণাৎ মদিনা থেকে পলায়ন করে।

হজরত মোহম্মদের সঙ্কল্প যে অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, কোনো প্রকার লোভ, অত্যাচার, ক্ষমতার মোহ, কিছুতেই যে তাঁকে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত ক'রতে পারে নাই, বরং সমুদয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে নিজের জীবনেই যে তিনি জয়শ্রী মণ্ডিত হ'তে পেরেছিলেন, এ এক মহা-আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আশ্চর্য বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বিশ্বপতির মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করেছিলেন। আল্লা'র প্রতি এই আপন-ভোলা পূর্ণ নির্ভরশীলতাই ইসলামের মূল মন্ত্র। এরই জন্য তাঁর অন্তঃকরণে দুর্জয় সাহস, বিপৎপাতে অসীম ধৈর্য, বিপন্মুক্তিতে চিত্ত-প্রসাদ। আর এই দৃঢ় সবল ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তিনি অনুচরদের অশেষ আশার স্থল ছিলেন, আর তাঁদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অবদান— ভক্তির আসন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কে জানত, যে আরব একদিন বিলাস-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, মোহম্মদের মুখের থেকে একটিমাত্র আয়াত শুনে তারা একদিকে আজন্মের নেশা মদ খাওয়া ত্যাগ করতে পারবে! আজও তো মদ্যপান নিবারণী সোসাইটির অন্ত নাই। কিন্তু কই, তার ফলে কয়জন মদের নেশা ত্যাগ করতে পেরেছে? অন্যের জীবনকে অনুপ্রাণিত ক'রে অনুরাগের উত্তাপে কয়লাকে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত করা মোহম্মদের জীবনের একটা বিশিষ্টতা ছিল। সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে আমরা সশ্রদ্ধ বিনতি জানাই।

# গৌতম বুদ্ধ

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয় আনুমানিক খ্রীঃপূঃ ৫৬০ অব্দে, নেপালের পাদদেশে শাক্য বংশে। ২৯ বছর বয়সে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে সংসারবিরাগী হয়ে আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে যোগ-ধ্যান, আত্মনিগ্রহ, উপবাস প্রভৃতি চিরাচরিত পন্থায় সাধনা করে ব্যর্থ হয়ে নানাদেশে ভ্রমণ করে ৩৬ বছর বয়সে উরুবেলা নামক স্থানে বোধি-বৃক্ষতলে কিছুদিন সাধনা করবার পর দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তাঁর মনে গোড়া থেকেই সংসারের রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু প্রভৃতির কারণ কি এবং কিসে এসবের দুঃখ-ক্লেশ জয় করা যায়, এই প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি এই সমস্যারও সমাধান পেলেন নির্বাণের মধ্যে। নির্বাণের সাধারণ অর্থ 'নিভে যাওয়া' বা বিলুপ্তি। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের অর্থ পরম চরিতার্থতা—যার ফলে মানুষ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, অহংবোধ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে অতীন্দ্রিয় অপার নিস্পৃহ আনন্দ লাভ করে ও পুনর্জন্মের বৃত্ত থেকে অব্যাহতি পায়।

বোধি বা পরমজ্ঞান লাভ করার পর বাকি জীবন তিনি পরিব্রাজন, শিক্ষাদান ও সংগঠন কাজে লিপ্ত থেকে ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাঁর শবদেহ দাহন করা হয়। দেশ-দেশান্তরের ভক্তেরা তাঁর ভস্মাবশেষ স্মারক হিসাবে রক্ষা করেন। বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের দুইটি প্রধান বিভাগ আছে—দক্ষিণ বিভাগ বা হীনযান এবং উত্তরা বিভাগ বা মহাযান। সিংহল, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে হীনযান ও নেপাল, চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে মহাযান পন্থা প্রচলিত।

বুদ্ধ আক্রমণধর্মী ধর্ম প্রচার করেননি এবং তোলপাড় করে একটা-কিছু বৈপ্লবিক কাণ্ডও ঘটাতে চাননি। তবু তাঁর সঙ্গে বহু সংখ্যক শিষ্যের সমাগম হয়েছিল। সংঘবদ্ধ শিষ্যদের কাজ ছিল শাস্ত্র অধ্যয়ন, শিক্ষাদান ও ভিক্ষা গ্রহণ। গৌতম বুদ্ধ কল্পনাবিলাসী তার্কিক ছিলেন না। তিনি প্রচলিত ঈশ্বর-পূজা সমর্থনও করেননি আবার তার নিন্দাও করেননি।

ঈশ্বর সম্বন্ধে মৌনীভাব ছিল বলে অনেকে ভাবেন তিনি নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু একথা ঠিক নয়। তিনি ছিলেন অতিশয় বাস্তববাদী। তিনি বলতেন পৃথিবীর চারটি মহৎ সত্য হচ্ছে ১. মানুষের দুঃখকষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, ২. এসবের কারণ হচ্ছে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা প্রয়াস আত্মতুষ্টি, ৩. এর অবসান করতে হলে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ অহংজ্ঞান প্রভৃতি বর্জন করতে হবে, আর ৪. অষ্টাবিধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। পন্থাগুলি হচ্ছে—সত্য মত, সত্য সংকল্প, সত্য ভাষণ, সত্য কর্মাবলী, সত্য জীবিকা, সত্য প্রচেষ্টা, সত্য মন ও সত্য আনন্দ,—এর দ্বারা লাভ হবে সম্যকজ্ঞান প্রীতি-সমস্ত চাল-চলন, মানসিক উন্নতি ও পরমানন্দ।

বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নাই। বর্তমান যুগে গবেষণা দ্বারা বহু দুর্বোধ্য আচার-অনুষ্ঠানের উপর আলোকপাত হওয়াতে অনেক কুসংস্কার, মূর্তি-পূজা ও বৈদিক দেবদেবী পূজাকে আর বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকার করা যায় না—বরং শিক্ষা দিয়েছে আত্মজয় ও সর্বজীবে দয়াই যে এ

ধর্মের মূল দার্শনিক ভিত্তি তা জানা গেছে। অতীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রকোপে পড়ে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু এখনও পৃথিবীর নানা দেশে ৪৫ কোটিরও অধিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাস করে। এতে এই ধর্মের অন্তর্নিহিত জীবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পালি ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক হচ্ছে প্রাচীনতম বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ। এখানা বেশ বৃহৎ গ্রন্থ, আয়তনে বাইবেলের প্রায় দ্বিগুণ। এতে আছে খ্রীঃপূঃ প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় পণ্ডিতদের আলোচনা, বিচার ও মীমাংসা, গৌতমের খণ্ড খণ্ড জীবন-কাহিনী, বেদী থেকে প্রদত্ত ভাষণ আর সঙ্ঘের নিয়মাবলীর বিশ্লেষণ। পরবর্তী সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে ধর্মনীতির চেয়ে অলৌকিক কথা-কাহিনীই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

সংসারের মায়া-ত্যাগের সাধনাকে এক কথায় বৌদ্ধধর্মের সার বলা যেতে পারে। ধর্ম-কার্যের প্রারম্ভেই যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় তা হচ্ছে—

'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' অর্থাৎ আমি বুদ্ধের শরণ লই সঙ্ঘের শরণ লই। এই তিনটিই ধর্মের আরকান বা স্তম্ভস্বরূপ। ধর্ম বলতে বুঝায় যা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হতে পারে রীতি-নিয়ম-কর্তব্য—এগুলি অবশ্য প্রতিপাদ্য। সংসারে মায়া-ত্যাগ ও অহংত্যাগের মধ্যে কার্যতঃ বিশেষ প্রভেদ নাই। সংসারে সবই নশ্বর—দেহই বলো, অনুভূতিই বলো, আর আত্মজ্ঞানই বলো, কিছুই থাকবে না। মানুষের নিজস্ব স্বাধীন সত্তাও অমূলক। তবু নিজের স্বাধীন অস্তিত্ববোধ বিলুপ্ত করে; অহং লাভ করেও মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে লোকহিত করবার জন্য, অপরকে জ্ঞানালোক বিতরণ করবার জন্য। অতএব দেখা যাচ্ছে অহং দৃশ্যতঃ নেতিবাচক হলেও এতে ধর্মকর্ম অনষ্ঠান ও কর্তব্য-বোধের মাধ্যমে অস্তি-বাচকভাবও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বর্তমানে কয়েকটি দেশে বৌদ্ধধর্মের বাস্তবরূপ কেমন সে সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা যাচ্ছে। মোটের উপর হীনযান-পন্থীরা আপন চেষ্টায় নিজের মুক্তি-নীতিতে বিশ্বাসী এবং রোগ-শোক-মৃত্যু সম্বন্ধে অতিশয় সজাগ বলে খানিকটা নৈরাশ্যবাদী, বিশেষতঃ থাইল্যাণ্ডের লোক। মহাযান-পন্থীরা অপরকে উদ্ধারের চেষ্টা অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক দীক্ষিত শিষ্যকে বোধিসত্ত্বের স্তরে উন্নীত করবার সম্ভাবনা, এই দুই প্রায় অনুরূপ রীতিতে বিশ্বাসী বলে সম্ভবতঃ অধিক আশাবাদী। উভয় পন্থার অনুসারীরাই দেব-দেবীর আনুকূল্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের বিশ্বাস এক অশরীরী মহাসত্তায় বিলীন বা উন্নীত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। এই মতের সঙ্গে পরবর্তী সূফী মতবাদের 'ফানাফিল্লাহ' ও 'বাকাবিল্লাহ'-র সুস্পষ্ট মিল দেখা যায়।

চীন দেশে তাও-বি (Taoism) ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। এর ফলে অনেক ফেরকা বা শাখার সৃষ্টি হয়েছে। একটি শাখা হচ্ছে পুণ্যভূমি সম্প্রদায়। এই পুণ্যভূমি অমিতাভ বুদ্ধের শাসিত, অমিতাভ যেন দিব্যধামে অবস্থিত পিতা, তিনি সর্বদা মানুষের স্তুতি ও প্রার্থনা পেতে চান। এছাড়া একটি দেবী আছেন ক্যানিয়ান বা কুমারীদেবী—বহু আবেগ ও উচ্ছ্বাসভরে এই দেবীর পূজা হয়।

তিব্বতে কিছুদিন আগেও ধর্মের ভার ছিল সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে। লামা বা সন্ন্যাসীগণ সুবিস্তৃত ধর্মীয় অনুশাসন প্রণয়ন করেছেন। এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল দালাইলামার হাতে।

জাপানের বৌদ্ধেরা জেন (zen) সম্প্রদায়ভুক্ত। জেন হচ্ছে বিশেষ এক যোগ-সাধন-পদ্ধতি। এই মতে বহু বর্ষব্যাপী যুক্তিমূলক সাধনায়ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় না, বরং হঠাৎ সহজাত পন্থায় হঠাৎ সেই জ্ঞান হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। (এই ধারণা কতকটা বিশ্বাসে

মিলিয়ে ধর্ম তর্কে বহুদূর এর সমভাবী)। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মর্ত্যভূমির যে এক আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব আছে সে সম্বন্ধে সজাগ থাকা, কাজ হলে এতেই হবে। হাতের কাজ শারীরিক পরিশ্রমের পরিপোষক হিসাবে চিন্তনও আবশ্যক—এই হলে আত্মজিৎ হয়ে নির্বাণ লাভ করা যায়। মধ্যযুগে জেন মতবাদ জাপানী সামরিক মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তখন থেকে জাপানে জুজুৎসুর চর্চা জোরদার হয়ে উঠে, সেই সঙ্গে জাপানে যুদ্ধক্ষেত্রেও মহানুভবতা বা বুশিডো'-র সঞ্চার হয়।

শাক্যমুনির জন্ম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরাট ঘটনা। খ্রীঃপূঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এঁর সমসাময়িককালে বা কিছু আগে-পরে তাও ধর্মের প্রবর্তক লাওৎসি, এথেন্স-এর জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ সোলন, চীনের ধর্মনেতা কনফুসিয়াস ও লিডিয়ার অধিপতি ক্রীসাস জীবিত ছিলেন; আইওনিয়ানদের হাতে পারস্য-রাজ দরায়ুস-এর পরাজয়, পারসিক কর্তৃক ব্যাবিলন অধিকার, ব্যাবিলনীয়ান কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার, রোমীয় রাষ্ট্রের পত্তন, ম্যারাথনের যুদ্ধ, থার্মোপাইলীর যুদ্ধ, সালামিন-এর যুদ্ধ প্রভৃতি বিখ্যাত ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ যুগটা ছিল গ্রীক, রোমক ও পারসিক জাতির সামরিক উত্থান-পতনের যুগ, আর উত্তর ভারত, নেপাল ও চীন প্রভৃতি দেশে ধর্ম ও চিন্তা-বিপ্লবের যুগ। বুদ্ধের নির্বাণের কিছুকাল পরে তাঁর শিষ্যরা ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক রচনার সূচনা করেন। এর প্রথম ভাগ সূত্ত সাধারণ লোকের জন্য। দ্বিতীয় ভাগ বিনয় সাধু-সন্ন্যাসী বা ধর্ম-শিক্ষকদের জন্য আর তৃতীয় ভাগ অভিধর্ম দার্শনিকদের জন্য। বুদ্ধ নিজে কিছুই লিখে যাননি। সূত্ত বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুকাল পরে আরব্ধ ও সমাপ্ত হয়। আর বিনয় রচিত হয় মহারাজ অশোকের আদেশে খ্রীঃপূঃ ২৪৪ সালে। বুদ্ধের মৃত্যুকাল খ্রীঃপূঃ ৪৮০ সাল ধরলে দেখা যায় সূত্ত রচনাকাল থেকে বিনয় রচনা পর্যন্ত কালের ব্যবধান ২৩৬ বছর। এরই মধ্যে কোনও সময়ে নিশ্চয়ই অভিধর্মও রচিত হয়েছিল।

মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে আপনা-আপনি অনেক অলৌকিক কাহিনী গড়ে ওঠে এবং মহাপুরুষেরা ক্রমে ক্রমে দেবতারূপে বা চৈতন্যময় সর্বব্যাপী অবয়বহীন বিশ্বস্রষ্টার প্রতিনিধি এবং অবতাররূপে পূজিত হতে থাকেন। বুদ্ধ কখনও অলৌকিকত্ব বা দেবত্বের দাবী করেন নাই; এমনকি বিশ্বজগতে একজন মহান স্রষ্টা ও নিয়ামক আছেন কিনা সে সম্বন্ধেও তিনি উচ্চবাচ্য করেননি। তার মনের ভাব ছিল পৃথিবীতে মানুষ কাজ করে যাবে। পরহিত করে যাবে, নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। সকলকে ভালোবাসবে আর নিজেকে একটা স্বাধীন অহংসত্তার উর্ধ্বে উন্নীত করে সর্বমানবের সত্তার সাথে একত্ব অনুভব করবে। এই করলেই বিশ্ব-আত্মার সাথে যোগ সাধন হবে, হিংসা বিদ্বেষ দুঃখ ক্লেশ দূর হয়ে যাবে। সকল ধর্মেরই মহাপুরুষগণ প্রকারান্তরে (এবং চলতি সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে) এইরূপ উপদেশই দিয়ে গেছেন। যদিও সে সবের ভাষা ও ভাবে আপাত পার্থক্য আছে বলে মনে হয়, তবুও সকলেরই চরম লক্ষ্য ব্যক্তির শান্তি ও আনন্দ এবং সেইসঙ্গে অন্য সকলেরই শান্তি ও আনন্দ। যুগে যুগে যে-সকল নতুন ক্লেদ ও আবর্জনা জড়ো হয়, মহাপুরুষেরা সেগুলো দূর করে বিশ্বসঙ্গীতকে একটু উন্নততর ও ব্যাপকতর গ্রামে বেঁধে দেন। বুদ্ধও তাই করে গেছেন। সেজন্য অন্যান্য নবী রসুলও জগবন্ধুর সঙ্গে তিনিও বিশ্ববাসীর সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। বর্তমানকালেও সুধিগণ ও প্রেমিকগণ বুদ্ধের মূলনীতিগুলোকে অতিশয় শ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকেন। এই বিরাট মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি; আর হয়ত অজ্ঞাতসারে যেসব ভুল-ত্রুটি করে ফেলেছি সুধিগণ সেসব অক্ষমতার বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য করে ক্ষমার চোখে দেখবেন এই আশা করি।

# ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভক্তিযোগ

শৈশব হইতেই কেশবচন্দ্রের অন্তঃকরণে ধর্মের প্রতি উন্মুখতা লক্ষিত হয়। পনের-ষোল বৎসর বয়সের সময়ই তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের সহিত আনাগোনা করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইহাতেও বাঁধা পড়িলেন না; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তখন তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ৩০ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাংকের চাকুরীতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কেশবের মন অনন্তের দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। তিনি শীঘ্রই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া ধর্মপ্রচারে বহির্গত হন। তখন তিনি ২৩ বৎসরের যুবক মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার এরূপ অনুরাগ এবং একেশ্বরবাদের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল যে, তিনি সহজেই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব অর্জন করিয়া ২৪ বৎসর বয়সেই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে বৃত হন ও 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ উপাধি পাইলেও কেশবচন্দ্র নিজেকে তখনও সত্য-সত্যই 'ব্রহ্মানন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য।...তখন আকাশে সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না পাই নাই। বিবেক হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, খুব আলোকিত করিতেছে, ইহাই অনুভব করিতাম।...কিন্তু যে-আনন্দ ভক্তিতে উৎপন্ন হয়, সে-আনন্দ হৃদয়ে ছিল না। পুণ্যবান হইলে, জিতেন্দ্রিয় হইলে যাহা হয়, তাহা ছিল। সে তৃপ্তি—সে আনন্দ নয়। আনন্দময়ীর পূজা ব্যতীত আনন্দ হয় না।...বন্ধুদিগের নিকট ব্রহ্মানন্দ নাম পাইয়াছিলাম, কিন্তু অন্তর তাহাতে সায় দিত না। হৃদয়ে তখন কবিত্বের ভাব ছিল না।...অবশেষে মাতৃমন্দির স্থাপন করিলাম কিরূপে, আশ্চর্য। তখন বিবেক-প্রধানই ছিলাম; সেকালে ব্রাহ্মদের সকলেই প্রায় বিবেক-প্রধান ছিল।...অন্তরে বাহিরে কেবল বিবেক সাধন, বিশ্বাস বৈরাগ্যসাধন; অল্প পরিমাণই প্রেম ছিল। মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল; কতদিন এরূপ চলিবে? তখন বুঝিলাম এত ঠিক নয়, অনেক দিন এইরূপ কাটান গেল, আর চলে না। মনে হইল, খোল কিনিতে হইবে।...ভক্তিভাব দেখা যাইতে না যাইতে কিরূপে ও কেমন গুপ্তভাবে একজন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন।...আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না; শান্তি, আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্শ্বে রাখিলাম।...এক সময়ে ভক্তিভাব ছিল না, গান করা আমার পক্ষে এক সময়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। দশজনের সমক্ষে আমি যে গান করিতে পারিব, ইহা আমার মনেই হইত না, কখনও যে ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিব, জানিতাম না।...সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল, পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল।...মা, একজনের দিকে সকলের দৃষ্টি হউক। পাঁচটি হরি চাই না। সতের হাজার ঈশ্বর, চল্লিশ হাজার ব্রহ্ম পূজা করিলে জগতের সুখ হবে না। একটি জননী তুমি মাঝখানে দাঁড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক।"

উপরি-উদ্ধৃতি বাক্যাবলী হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে এবং আপনার মধ্যে জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্যের শুষ্কতা অনুভব করিয়া সরসতার প্রার্থী হইয়াছিলেন এবং ভক্তিরসের মধ্যেই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিরস বাহ্যতঃ খোলকরতাল সংকীর্ত্তনের মধ্যে এবং অন্তরে ঈশ্বরের মাতৃরূপে কল্পনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ইহা ছাড়া ভক্তিরসের অন্য কোন প্রকার অভিব্যক্তি হইতে পারে কি না, তাহা বলিয়া যান নাই। তিনি আপন অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিয়া গিয়াছেন যে একেশ্বরবাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়াও ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা করা যায় এবং তাহাকে হরি, গোপাল প্রভৃতি পৌত্তলিক নামে অভিহিত করিলেও একেশ্বরবাদীত্ব নষ্ট হয় না। বাস্তবিক, প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর যুক্তিতর্কের প্রশ্ন উত্থান করা চলে না। মানুষের প্রকৃতি-ভেদে উপায়-ভেদ হইতে পারে এবং তাহাই স্বাভাবিক। কোন কোনও মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বরোপাসনায় খোল-করতালের দখল দিলে অবশেষে তাহা কেবল গণ্ডগোলই পর্যবসিত হয়। একথা হয়ত জনসাধারণের পক্ষে খাটে, কিন্তু ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল হইতেই সঙ্গীত উপাসনার এক বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অপৌত্তলিকদিগের মধ্যেও মহাসাধক আমীর খসরু এবং আজমীরনিবাসী খাজা মাঈনউদ্দীন চিশতীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌলানা রুমী, দেওয়ান হাফেজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র একেশ্বরবাদী সাধক ঈশ্বরকে প্রিয়তমরূপে কল্পনা করিয়া তাহার সহিত নিবিড় যোগ অনুভব করিয়া গিয়াছেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহর্ষি মনসুর ঈশ্বরের সহিত আপন আত্মার অভেদত্বের আস্বাদ পাইয়া নিজেকেই "আনাল্-হক" সোহম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত মতবাদ সাধারণ লোকসমাজে প্রচার করিলে, ইহার কদর্থ হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া শরিয়তবাদী মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণ্যে বা অনধিকারীর নিকট এই সমস্ত মতবাদ প্রচারের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভিতরে অধিকারীভেদে সাধন-পদ্ধতির ভেদ রহিয়াছে। এ সমস্ত স্থলে বিশেষের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণের বিষয়ই ভাবা আবশ্যক।

একেশ্বরবাদীত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, কেশবচন্দ্রের সঙ্কীর্তন প্রবর্তন শেষ পর্যন্ত সহায় হইবে কি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে, এ সম্বন্ধে আমার মনে এখনও ঘোরতর সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের নিজের দিক দিয়া কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি ছিলেন সমন্বয়াচার্য, তিনি অনায়াসে বহুর ভিতর একের সন্ধান এবং একের মধ্যে বহুর লীলা-বিলাস দেখিতে পান। ভয় অধস্তনদিগের জন্য। তিনি নিজেও কোন একস্থানে এই ভয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বারংবার একেশ্বরবাদের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের চিন্ময়ী মূর্তি যেন ঈশ্বরকে আড়াল করিয়া না দাঁড়ায়। পাছে লোকে প্রতিমা-পূজা বা চিত্র-পূজার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এজন্য তিনি মন্দিরের নিয়মপত্রে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা ব্যক্তি-বিশেষের ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না।"

যাহা হউক, ভক্তির দেশ ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া ভাবুকতাপূর্ণ বাংলাদেশে ভক্তিবাদ কীর্তন ও সংকীর্তনের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে। এই কারণে খোল-করতালের বাদ্য এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেম-গাথা শ্রবণ করিয়া একদিকে যেমন কতিপয় ব্রাহ্ম ইহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ পাইয়া তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে তেমনি বাংলার হিন্দু-জনসাধারণ ইহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধর্মের সামান্য বিভেদ ভুলিয়া

স্বদেশীয় সংস্কৃতির পানে ইহার সহিত সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। ভদ্র-সন্তানেরা নগ্নপদে ইতরদলের সহিত মিলিয়া নগর সংকীর্তনে বাহির হইবেন, এরূপ কল্পনা করা তখনকার যুগে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং ভক্তি-ভাবের অনুপ্রেরণায় শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের অভিমান ভাঙ্গিল, সকলে রাজপথে বাহির হইয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে সঙ্গীত ও নৃত্যাদিতে মত্ত হইয়া ব্রহ্মরসাস্বাদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করিয়া আন্তরিকতার সহিত দশের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিয়া অনেকেই যে বিশেষ আধ্যাত্মিক কল্যাণের অধিকারী হইয়াছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করেন, কেশবচন্দ্র যে উন্নত জ্ঞানরাজ্যে ও ধর্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যে বীর্যবত্তার বলে কৌলিক গুরুমন্ত্র গ্রহণে অস্বীকার করিয়া পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, যে উন্নত আদর্শের অনুসরণ করিয়া প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তী ভক্তি-প্রধান যুগে তিনি সেস্থান হইতে স্খলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নহে। বরং পূর্ববর্তী যুগে তাঁহার আংশিক এবং ভক্তিপ্রধান যুগে তাঁহার পূর্ণশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তিভাব তাঁহার ভিতরে পূর্ব হইতেই প্রচ্ছন্ন ছিল। সূক্ষ্মদর্শী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেন, "আমি বহুকাল পূর্বে একদিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, চক্ষু বুঁজিয়া স্থির হইয়া সকলে বসিয়া আছে; কিন্তু বোধ হইল ভিতরে যেন কেহ লাঠি ধরিয়া রহিয়াছে। কেশবকে দেখিয়া মনে হইল, এই ব্যক্তির শতা ডুবিয়াছে।" কেশব নিজেই বলিয়াছেন, আদিসমাজে থাকাকালীন তাঁহার জ্ঞান ও নীতির প্রাধান্য ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালে কর্মকাণ্ড এবং অনুতাপ, প্রার্থনা, ইন্দ্রিয়-শাসন ইত্যাদির প্রাধান্য ছিল; কিন্তু তখনও সমগ্রের দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। "যাবতীয় স্বরূপ একত্র ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না; যখন যেটি প্রয়োজন তখন সেইটি করিবার জন্যই চেষ্টা ছিল।...এইরূপে দিন গেল বটে, কিন্তু সামঞ্জস্যের দিকেই যাইতেছি, নববিধানের দিকে যাইতেছি। আংশিক ধর্ম ছাড়িয়া হৃদয় এখন পূর্ণতার দিকে গিয়াছে।...এই পূর্ণতা মনের ভিতরে ছিল।...ফুলের তোড়ার মত সাধুরা মিলিত হইয়াছেন, সত্যে তোড়া বাঁধা হইয়াছে।...কখনও অনুতাপ, কখনও সদনুষ্ঠান, কখনও বৈরাগ্য, কখনও আনন্দ, কখনও বৃদ্ধভাব, কখনও বাল্যভাব কখনও বা যুবার উৎসাহ এক-এক করিয়া সমস্তই আসিতে লাগিল। সমুদয় যন্ত্র মিলিয়া এক-যন্ত্র হইল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের স্বর মিলিয়া এক সুমিষ্ট স্বর উৎপন্ন হইল। এখন পূর্ণতা চাই, পূর্ণতার দিকেই এখন যাইতেছি। ক্রমাগত চলিতেছি।"

কেশবকে দিয়া বিধাতা যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, ঘটনার ভিতর দিয়া পরীক্ষা করিয়া ও শুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে সেই উদ্দেশ্য-মূলে আনিয়াই দাঁড় করাইলেন। ভক্তিরসের ভিতর দিয়া তিনি ঈশ্বরের সমগ্ররূপ বা সমগ্র মহিমা দর্শন করিয়া নানা বিচ্ছিন্ন অংশকে সংযুক্ত করিবার জন্য সমন্বয়ধর্ম, 'নববিধান' প্রচার করিলেন। ইহা দ্বারা তিনি মৌলিক আদর্শ হইতে স্খলিত না হইয়া আপাত দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ নানাভাব ও নানা অনুষ্ঠানের সহিত সহজেই আধ্যাত্মিক ঐক্য স্থাপন করিলেন। এইরূপে বিরোধের স্থলে মিলনের মন্ত্র প্রচারিত হইল।

শুধু কেশবের নিজের দিক দিয়া নয়, সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই সময় তাঁহার দূরদৃষ্টি ও মহাতেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি

ধারে কারবার করেন নাই, নগদ কারবার করিয়াছেন—অর্থাৎ নিজে কোন বিষয় উপলব্ধি না করিয়া কার্যে হাত দেন নাই এবং নিজে করিয়া তবে অন্যকে উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে, পৌত্তলিক আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর শাসন উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্ম হওয়াতে যে সাহস, ব্রহ্মজ্ঞানীর যে ভয় ও ব্যঙ্গোক্তি, ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হরিভক্ত হইবার সাহস তদপেক্ষা কম নহে। তিনি স্বয়ং পায়ে নূপুর ও হাতে সোনার বালা পরিয়া নাচিয়া নাচিয়া হরিগান করিয়াছেন, অর্ধঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজিয়া শিষ্য ও পরিবারবর্গসহ ধ্যানস্থ রহিয়াছেন, রন্ধন-ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিরতর রহিয়াছেন, আপন শিষ্যবৃন্দের পাদোদক পান করিয়াছেন, তেতলার ছাদের উপর বৈরাগ্য-কুটির নির্মাণ করিয়া বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়া সহধর্মিণীকে পার্শ্বে বসাইয়া মহাদেবের ন্যায় যোগ-সাধন করিয়াছেন—এই সমস্ত কার্য উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষিত বহু লোকের নিকট অদ্ভুত পৌরাণিক যুগের খেয়াল বা পাগলামী বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা কেশবচন্দ্রের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা এবং ভক্তির আন্তরিকতাই প্রমাণিত হইতেছে।

এইরূপ অকৃত্রিমতা এবং দৃঢ়বিশ্বাস উপহাসের বস্তু নহে; কিন্তু শ্রদ্ধার বিষয় হইতে হইলে ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত রুচি অতিক্রম করিয়া সমাজকল্যাণের বীজ নিহিত থাকা চাই। সুখের বিষয়, ভক্তিযুগে কেশবচন্দ্র যে-সমস্ত সদনুষ্ঠানের ভিত্তিপত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্থায়ীভাবে সমাজের কল্যাণকর হওয়াতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

ভক্তি ধর্মের প্রাণস্বরূপ। ভক্তির অভাবে শত-সহস্রনীতি এবং যাবতীয় উৎকৃষ্ট সংস্কার একত্র হইয়াও কোন সমাজকে একসূত্রে বাঁধিতে পারে না। মানুষের প্রাণের চিরন্তন ক্ষুধা—ঈশ্বরের সহিত সংযোগ-স্থাপন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সম্ভব। ভক্তিযোগেই বিধাতার লীলা সন্দর্শন হয়, ন্যায় ও যুক্তির দ্বারা নহে। তাই কেশবচন্দ্র ভক্তি সঞ্চার করিয়া আপন সমাজকে শুষ্ক ন্যায়-নীতির মরুভূমি হইতে লীলারসের শীতল ছায়ায় লইয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশ, বিশেষ কৃপা, সাধুভক্তি, যোগ-ধ্যান প্রভৃতি ধর্মের উচ্চতর আধ্যাত্মিক লক্ষণ। পূর্ব-প্রচলিত ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে এ সকলের অভাব ছিল। তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিলে, যাহারা বিধবা-বিবাহ ও স্বয়ম্বর-বিবাহ দেয়, উপবীত ছিন্ন করে, জাতিভেদ-পৌত্তলিকতা মানে না, তাহাদিগকে বুঝাইত। কিন্তু এ সমস্তই লৌকিক না সামাজিক ব্যাপার—ইহার মধ্যে পরমাত্মার সহিত সংযোগের আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা কোথায়? কেশবচন্দ্রের ভক্তিযোগে পূর্ণমাত্রায় যোগ-ভক্তি, বৈরাগ্য, প্রেমোন্মত্ততার সাধন ও সম্ভোগ উন্নতিশীলতার লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি স্থূল মানবীয় প্রকৃতি হইতে সমাজের মুখ অতিমানবীয় প্রকৃতির দিকে ফিরাইয়া দিলেন। আপন সমাজের প্রতি ইহা তাঁহার একটি বিশিষ্ট দান বটে।

আদর্শকে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে বাহ্য অনুষ্ঠান চাই। এজন্য তিনি স্বদেশীয় আচারের সহিত যোগ রাখিয়া আরতি, স্তোত্র, শঙ্খ-ঘণ্টা, কাঁসর-বাদ্য, ধূপধূনা, পুষ্পমাল্য দ্বারা দেবমন্দির সাজান ইত্যাদি বাহ্য-অনুষ্ঠান দ্বারা নববিধানের নূতনত্ব সম্পাদন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রা, নিশানস্পর্শ, হোম-জল-সংস্কার, খৃষ্টের রক্তমাংস ভোজন, মস্তক-মুণ্ডন, ভিক্ষাব্রত অবলম্বন প্রভৃতি নানা প্রথা প্রবর্তিত করেন। নিশানস্পর্শ, জল-সংস্কার এবং রক্তমাংসভোজন লইয়া অনেক আন্দোলন ও হাসি-তামাশার সৃষ্টি হইয়াছিল। নিশানস্পর্শ অর্থ পতাকাপূজা নহে। তিনি বেদ-বাইবেল-ললিতবিস্তার-কোরান একস্থানে রাখিয়া তদুপরি এক বিজয়-নিশান উড়াইয়া দিলেন, পরে উক্ত নিশানকে সম্বোধন করিয়া ঈশ্বরের মহিমা ব্যাখ্যা

করিয়া বিশ্বাসীদিগকে তাহা স্পর্শ করিতে দিয়াছিলেন। 'রক্ত-মাংস ভোজন' আক্ষরিকভাবে হয় নাই—খৃস্টের ভাগবতী তনু নিজ জীবনে পরিণত করাই ইহার তাৎপর্য, জল ও অন্নই রক্ত ও মাংসের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল।' "জল-সংস্কার" জর্দানের জলে হয় নাই, কমল সরোবরের জলেই হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের এই সমস্ত সমন্বয়-চেষ্টা দেখিয়া অনেকে উপহাস করিয়া বলিত, "কেশববাবুর ধর্ম দরবেশের কাঁথা এবং ঘাসিরামের চানাচুর।" ইহা শুনিয়া তিনি কেবল হাসিতেন।

কেশবচন্দ্রই প্রথমে আপনার সমাজে সাংবাৎসরিক মাঘোৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া শারদোৎসব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি নির্দোষ উৎসব তিনি বলবৎ রাখেন। হিন্দু-সমাজে যাহাকিছু উৎকৃষ্ট পাইয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত উপাসনা-প্রণালী তাঁহার ধর্ম-বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে নূতন বেদের ন্যায় কাজ করিত। তৎকালীন সমাজের পক্ষে ইহা নূতন ছিল। প্রাত্যহিক উপাসনার ব্রহ্মতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব এবং উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং...' শ্লোকের শেষে তিনিই সর্বপ্রথমে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' পদটি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সপ্তস্বরূপের আরাধনার পর ধ্যান, পরিশেষে প্রার্থনা ও কীর্তন হইত। প্রতিদিন ইহা সাধন করিতে করিতে কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে এক প্রকাণ্ড চিন্ময় রাজ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। দীর্ঘ উপাসনা, ধর্ম-প্রসঙ্গ ইত্যাদি উপায়ে সাধকবৃন্দের হৃদয়ও ক্রমে নরম হইতে লাগিল।

ভক্তিরসের সমাগমে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি বিকশিত হইয়াছিল। ১৮০০ শকে প্রথম শারদোৎসবে তিনি শিষ্য-পরিজনসহ নৌকাযোগে বহির্গত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে শ্রীমৎ পরমহংসজীর সহিত সম্মিলিত হন। ঐ সময় বক্তৃতা ও প্রার্থনায় গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেন। তাহাতে দুর্নাম রটিয়াছিল যে, কেশবচন্দ্র রাধাকৃষ্ণের জয়গান ত আগেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন আবার গঙ্গাপূজা শুরু করিয়া দিলেন। যাহা হউক, এসব কথায় কেশবচন্দ্রের কিছু আসিয়া যাইবে না।

কেশবচন্দ্রের ভক্তির বিষয় কিছু বলিতে হইলে, তাঁহার যোগের কথাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন, "ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগের আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকিবে না। ভক্তি যোগকে সুমিষ্ট করে, যোগ ভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি করে। একটি ভাই আর একটি ভগিনী। একজন পরিচর্যা করিয়া ভক্তিকে বিশ্বাসভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল; আর একজন পরিচারিকা হইয়া যোগকে সরস করিল। যোগ হয়ত অদ্বৈতপদে লইয়া ফেলিত; ভক্তি হয়ত কুসংস্কার উৎপন্ন করিত। কিন্তু যোগের পাহাড়ে ভক্তির বাগান হইল। সে বাগান স্বপ্নের বাগান নয়, কল্পনার বাগান নয়, কেননা সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগে যোগে মহাযোগ হইল; মহাযোগের ফল হইল।...আমি অধিক সাধন করি নাই। (কিন্তু ঈশ্বর প্রসঙ্গে) যোগে নয়ন পরিষ্কৃত হইল, ভক্তিতে হৃদয় উদ্বেলিত হইল। ...বলিলাম, "হে চক্ষু, ব্রহ্মকে না দেখিয়া নাস্তিক হইও না; কর্ণ, "আমি আছি, আমি আছি" এ শব্দ শুনিও, ব্রহ্মের নানা বিচিত্র কথা শুনিও। ...হে সত্য, হে জ্বলন্ত ঈশ্বর, আমি তোমায় দেখিয়াছি; তুমি কথা কও, কথা কও। আমি মস্তিষ্কের ঈশ্বর মানি না।...যোগেতে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি।" কেশবচরিতের প্রণেতা লিখিয়াছেন, "সাধক যে পরিমাণ সাধনকার্যে কৃতকার্য হইবেন সেই পরিমাণে ইহার সারতত্ত্ব ও মাধুর্য উপলব্ধি করিতে

পারিবেন। যোগ-বিমুখ আর্য-গৌরবচ্যুত হিন্দু-সন্তানেরা যেদিন পৈত্রিক ধনে পুনরায় অধিকারী হইবে, সেইদিন যোগি-শ্রেষ্ঠ কেশবকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণিপাত না করিয়া থাকিতে পারিবে না।"

মোটকথা, সমাজের বিশেষ প্রয়োজনের সময় কেশবচন্দ্র ভক্তি ও যোগের আদর্শ প্রচার করিয়া, স্বদেশ-বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত সুরীতি ও সুনীতি গ্রহণ করিয়া গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সহিত সমুদয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শতদল

# বিজ্ঞান

# বিজ্ঞান

কান্তকবি বৈজ্ঞানিককে চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিখেছিলেন :

"ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিককে,
দেখব সে উপাধি নিলে কয়টা 'কেন'র
জবাব শিখে।

এ সম্ভবতঃ স্পর্ধিত জ্ঞানাভিমানী বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল, কিংবা জ্ঞানের প্রতি সাধারণ লোকের যে একরকম শ্রদ্ধা ও বিস্ময় মিশান মনোভাব আছে, তাই লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক কিন্তু 'কেন'র জওয়াব দেবার দাবী করে না— একটা 'কেন'র জওয়াব হ'তে না হতেই 'কেন'র 'কেন' তথ্য 'কেন' এইসব এসে পড়ে। ভক্তকবি 'কেন'র সমস্যা সমাধানের জন্য নিখিল 'কেন'র মূল কারণে যাবার সুপারিশ করেছেন। সাদা কথায় এর অর্থ এই— আল্লাহর মর্জিতেই সব হয় : তাঁকেই জানবার চেষ্টা কর তাহলে আর কেনর কোনও প্রশ্নই উঠবে না। বৈজ্ঞানিকের এতে কোনও আপত্তি নেই, বরং সে কার্যতঃ সেই চেষ্টাই করে, অর্থাৎ আল্লাকে জানবার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ যে বড় রসিক পুরুষ, লুকোচুরি খেলতে ওস্তাদ! তিনি নিজে আড়ালে থেকে মানুষকে চোখ টিপে ধরে বলছেন,— "বল ত আমি কে? কখনও বা একটু ছোঁয়া দিয়ে একটু আভাষ দিয়ে দূরে বসে তামাসা দেখছেন। এই তাঁর লীলা, বিশ্বসংসার তাঁর খেলাঘর। তিনি নিরাকার বলেই বহুরূপী, গায়ের বলেই রহস্যে আবৃত। তাই কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। কবি কল্পনার সাহায্যে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বা মানুষের স্নেহ-প্রীতির মধ্যে তাঁর এক রূপ প্রত্যক্ষ করে। দার্শনিকও আপনার অন্তর্গূঢ় চেতনার মধ্যে তাঁর আর-এক রূপের প্রতিফলন দেখতে পেয়ে বিশ্বের ভাবরাজ্যের সঙ্গে মনে মনে সেই অরূপরতনের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসী হয়। আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে স্থূল ইন্দ্রিয়ের মারফতে বস্তুরহস্যের ব্যবহার নিরীক্ষণ করতে থাকে; সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে আল্লাহর খোলা কেতাব এই বিশ্ব-প্রকৃতি চোখের সামনে পড়ে রয়েছে, একে নেড়ে-চেড়ে পরখ করে দেখার মধ্যেই চির রহস্যময়ের কতকটা সন্ধান পাওয়া যাবে।

আদম-হাওয়ার বৈজ্ঞানিক মন ছুটেছিল রহস্যের সন্ধানে। তাই ভক্তের তৃপ্তিময় নিশ্চিন্ততার মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে না দিয়ে, তারা অজানা গাছের স্বাদ চেখে দেখবার জন্য ব্যগ্র হল। তারা বেহেস্তের শান্তির চেয়ে মর্তের কঠোর পরিশ্রম আর সাধনাই বরণ করে নিল। সেইদিন থেকে বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কৌতূহল থেকে এর জন্ম, পরখ করে করে সত্য উদঘাটন করার চেষ্টায় এর বিকাশ, আর পরীক্ষিত বহুবিধ সত্যের মধ্যে একত্বের সন্ধান লাভেই এর আকাঙ্ক্ষিত সার্থকতা।

সেই আদিমকাল থেকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষ আবিষ্কার আর উদ্ভাবন করে চলেছে। ফল-মূলের গুণাগুণ, ঔষধ-পথ্যের আবিষ্কার, কৃষিকার্য, অগ্নি-প্রজ্বলন, রন্ধন-প্রণালী, চাকাওয়ালা গাড়ী নির্মাণ, পশুপালন, অস্ত্রের ব্যবহার, বস্ত্রপরিধান, নৌকা-গঠন, বিনিময় ও বাণিজ্য, ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ আর ক্ষুদ্র গহ্বরের তথ্য সংগ্রহ, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে তার জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হয়েছে। এই জ্ঞান-সাধনের শেষ নাই, বরং এর প্রসার ক্রমেই দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে। মানুষের অশ্রান্ত চেষ্টার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, প্রজননবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, যুদ্ধবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, খনিজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, খগোল ও জ্যোতিবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, গণিত, সংখ্যাবিজ্ঞান প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্টির আদি থেকে গত একশ' বছর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষ হয়েছে, বিগত একশ' বছরের মধ্যেই তার চেয়েও বেশী উৎকর্ষ হয়েছে। রেলগাড়ী, মোটরকার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন, উড়োজাহাজ, ক্রেফনট, এটমবোমা প্রভৃতি উপকারী বা মারাত্মক যন্ত্রের নাম উল্লেখ করলেই এ কথার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা জন্মে।

এখানে জিজ্ঞাসা হতে পারে, মারাত্মক জিনিসের আবিষ্কারে বিজ্ঞানের অসাধুতা প্রমাণিত হয় কিনা। এর জওয়াবে বলা যেতে পারে, যে-কোনও জ্ঞান থেকেই ক্ষমতার উদ্ভব হয়। এই ক্ষমতা যে ব্যবহার করবে তার এখতিয়ার হচ্ছে একে ভাল বা মন্দের জন্য প্রয়োগ করা। আসলে বিজ্ঞান হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা—প্রয়োজন বা প্রয়োগের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নাই। মানুষের মনোবৃত্তি অনুসারেই এর ব্যবহার হয়, সুতরাং এর ভালমন্দের জন্য দায়ী মানুষের মনোবৃত্তি, বা যে-সব সামাজিক রাষ্ট্রিক বা অন্যবিধ পরিবেশের ফলে মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়, সেই সব পরিবেশ। প্রথমে যখন বিদ্যুৎ আর চুম্বকশক্তির মধ্যে সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে, কোনও বিশেষ দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে নিকটবর্তী চুম্বক-শলাকা কোনও এক নির্দিষ্ট দিকে হেলে পড়ে, তখন সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান যে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মোটর, ডাইনামো প্রভৃতির জন্মদাতা হবে এ ধারণাই কারো ছিল না—মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে। কিংবা যেদিন আলকেমী বা কিমিয়াবিদের স্বপ্ন কতকটা সার্থক করে প্রমাণিত হল যে, বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুগুলো একই রকমের অস্তিবোধক বিদ্যুৎকেন্দ্র আর অভাবাত্মক বিদ্যুৎ-কণার সমাবেশে গঠিত এবং এই সমাবেশ কৃত্রিম উপায়ে ভেঙ্গে নতুন সমাবেশ গঠন করে এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব, সেদিন কে জানতো যে তামা-পিতল-লোহা প্রভৃতি সোনায় পরিণত হবার আগে এ জ্ঞানের থেকে ধ্বংসকারী এটম-বোমার উদ্ভব হবে? আসলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে মনুষ্যজাতির ভালমন্দের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই— অবস্থা-বিশেষে মানুষের রুচি-প্রবৃত্তি বাধ্যকারী পরিবেশের তাড়নায় এর ভাল-মন্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। প্রকৃতিতেও কি আমরা দেখিনে—যে-বাতাস এমন স্নিগ্ধকর এবং মানুষের জীবন-রক্ষণ তারই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবেগে গাছপালা ঘরবাড়ী উড়ে যায়, নৌকাডুবি আর জাহাজডুবি হয়? এমন অবস্থায় বাতাসকে আমরা মঙ্গল বলব না অমঙ্গল বলব? মঙ্গল আর অমঙ্গল কি একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ বা আসলে তুল্য-রূপ ঘটনা—কেবল মানুষের স্বার্থবুদ্ধিতেই বিভিন্ন দেখায়? যাক—এসব তর্ক হয়ত দর্শনশাস্ত্রের বা নীতিশাস্ত্রের বিষয়, নির্বিকার বৈজ্ঞানিক এ-নিয়ে বেশী মাথা না ঘামালেও চলতে পারে।

বৈজ্ঞানিক একনিষ্ঠ জ্ঞানের সাধক। সেই জ্ঞান কাজে লাগাবার ভার যান্ত্রিকের উপর— এঁরা টেকনিক্যাল লোক, বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক নন—তবে বিজ্ঞান-শিল্পী বটে। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান নিয়েই বিজ্ঞান-শিল্পী যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, আবার বিজ্ঞান-শিল্পীর যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে থাকেন। এজন্য সচরাচর বৈজ্ঞানিক আর বিজ্ঞান-শিল্পী উভয়কেই বৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এদের একজনের কাজ শুধু জ্ঞানের পরিধি বাড়ান, আর-একজনের কাজ সেই জ্ঞানের ব্যবহারে লাগানোর উপায় উদ্ভাবন করা। অনেক বৈজ্ঞানিক আবার একাধারে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী। কাজে-কাজেই এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মধ্যে সব সময় একটা সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। তবু এঁদের ক্ষেত্রগত পার্থক্য স্বীকার করতেই হবে।

বৈজ্ঞানিককে উপরে সাধক বলা হয়েছে। কারণ, জ্ঞানের অনুসন্ধানে যে ধৈর্য, একাগ্রতা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের আবশ্যক হয় তা সত্যিই 'সাধনা'র পর্যায়ে পড়ে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস হয় সত্য না হয় মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বৈজ্ঞানিকের সাধনা নিরাসক্ত, অর্থাৎ তাঁর বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত হলেও তাঁর কোনও ক্ষোভ নাই, বরং সেই যে একটা জ্ঞান লাভ হ'ল তাতেই তাঁর আনন্দ। ধর্মজগতে দেখা যায়, কেউ সাধনা করেন বেহেশতের আশায়, আবার কেউ বা মনের তাগিদে বা আল্লার নির্দেশে। বেহেশতের আশায় যাঁরা সাধনা করেন, বিজ্ঞান জগতে তাঁরাই বিজ্ঞান-শিল্পী; আর অন্যদল নির্বিকার বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকের সাধনা সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের সাধনা। তথ্যের উপর এর প্রতিষ্ঠা—আপ্তবাক্যের উপর নয়। পৃথিবী নিশ্চল, না ঘূর্ণ্যমান; ছোটবড় দুটো ওজন এক সঙ্গে উঁচু স্থান থেকে ছেড়ে দিলে একই সময় মাটিতে পড়বে, না আগে-পরে পড়বে; চোখের থেকে আলোক-কণা বস্তুর উপরে পড়ে দর্শন-অনুভূতি হয়, না বস্তুর থেকেই আলোকরশ্মি চোখে এসে ঠেকলে বস্তু দৃষ্ট হয়—এই রকম আরও অনেক বিষয়ের ধারণা প্রচলিত ধারণার বিপরীত বলে প্রমাণিত হয়েছে। নতুন কিছু করতে গেলেই বা ভাবতে গেলেই তার জন্য বিশেষ প্রয়াসের দরকার হয়। মানুষের সংস্কার বা অতীত-প্রীতি, চিরদিনই নতুন সত্যের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তাতেই দেখা যায় চিরকাল পয়গম্বরগণ নির্যাতিত হয়েছেন, আর বৈজ্ঞানিকরাও কম নির্যাতন সহ্য করেননি। সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯) এবং গ্যালিলিওর (১৫৬৪-১৬৪২) নাম এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও কত লোককে যে বৈজ্ঞানিক বা আধা-বৈজ্ঞানিক মতের জন্য পুড়িয়ে মারা হয়েছে, বা শূলে চড়ান হয়েছে বা তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে তার সংখ্যা করা যায় না। এর থেকে একটা কথা এই প্রমাণিত হয় যে, মত বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে পৃথিবীতে জ্ঞানের উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হত। বর্বরতা স্থায়ী করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নতুনের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে স্থায়ী হয়ে পুরাতনকেই আঁকড়ে বসে থাকা। আরস্তু বা নিউটনের মত বড় বড় জ্ঞানীরও কোনও কোনও ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদের পক্ষে স্বমত অখণ্ডনীয় মনে করা নিতান্ত অহমিকা ও মোহান্ধতার পরিচয় তাতে আর সন্দেহ কি? বিজ্ঞানের রাজ্যে—এবং জীবনের সবক্ষেত্রেই মতের সহনশীলতা ও সংস্কারমুক্ত নিরাসক্ত বিচারই উন্নতির উপায়। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান উন্নয়নের পন্থা পরীক্ষামূলক। গ্রীকদের আমলে এবং মধ্যযুগেও জ্ঞানের ভিত্তি ছিল পরীক্ষা-বিরহিত যুক্তির উপর। তাই আমরা দেখতে পাই অনেক রকম ন্যায়ের অন্যায় কচকচি, সাতের মাহাত্ম্য বেশী না তিনের মাহাত্ম্য বেশী এইসব নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনা ও তর্ক প্রয়োগ ছিল সে-যুগের একটা বিশেষত্ব। আরবেরা গ্রীকদের থেকে অনেককিছু গ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিশারদ আল-হাযেনই প্রথমে বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রাভাতিক ও সান্ধ্য সূর্যের বর্ধিত আয়তন যে দৃষ্টিভ্রম মাত্র, একথা তিনি চোখের সামনে নির্দিষ্ট দূরে পয়সা রেখে সূর্যকে আড়াল করে প্রমাণিত করেছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর রজার বেকনকেই (1212-1294) এই পরীক্ষারীতি প্রবর্তনের সম্মান দিয়ে থাকেন। তার কারণ, আরব যখন বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, ইউরোপ তখন ছিল ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন। কাজে কাজেই আল-হাযেন এর পরবর্তী রজার বেকন দ্বারাই স্পষ্টভাবে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক জাগরণে বেশী সহায়তা হয়েছিল।

তর্কশাস্ত্রের বিশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায় অঙ্কশাস্ত্রে। অঙ্কের সংখ্যা বা পরিমাণ মানুষের স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত না থাকায় বোধ হয় সংস্কারবর্জিত মনোভাব নিয়ে গণিতের সূত্র ও চিন্তাধারার অনুসরণ করা সহজ হয়। ইউক্লিড পরিমাণ-ঘটিত প্রমাণের যে বিশুদ্ধ ধারা দেখিয়ে গেছেন, তা সত্যিই যুক্তিশাস্ত্রের কীর্তিস্তম্ভের মত। আমাদের মনের অপ্রমেয় চিন্তাধারা অঙ্কের পরিমাণের ভিতর আবদ্ধ হয়ে অনেকটা দৃঢ় বাস্তবরূপ ধারণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লর্ড কেলভিন (1824-1908) বলে গেছেন, "তুমি যে-বিষয়ে কথা বলছ তা যদি মাপতে পার কিংবা সংখ্যা দিয়ে তার পরিমাণ নির্দেশ করতে পার, তবে বলব সে-সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান আছে; কিন্তু তুমি যদি তা মাপতে না পার বা তার পরিমাণও না জান, তবে বলব সে-সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান অতিশয় নগণ্য এবং মোটেই সন্তোষজনক নয়।" বাস্তবিক দৈর্ঘ্য, ওজন, সময় প্রভৃতির সূক্ষ্ম মাপের ফলে কয়েকটি গ্রহ-উপগ্রহ, যুগল নক্ষত্র, মৌলিক পদার্থ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। চিন্তাজগতেও পরীক্ষা আর মাপের ফলে বিপর্যয় এসেছে। নিউটনের (1642-1727) গতিনিয়মের স্থলে আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতা' সূক্ষ্ম মাপ আর যুক্তির বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামবাদ বা বিচ্ছিন্ন শক্তি-কণাবাদের উৎপত্তিও এইভাবেই হয়েছে। মোটের উপর, তথ্য আর যুক্তি এই দুই পায়ের উপর বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। যুক্তি খাটাতে গেলে ইউক্লিডের নিয়ম ছাড়া উপায় নাই; অর্থাৎ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ কতকগুলো বিষয় মেনে নিতে হবে, এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত সেই সব কল্পনা বা স্বীকৃতি খুঁটির উপর দাঁড় করাতে হবে। বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃতি বিষয়েও আবার পরীক্ষার নিক্তিতে মেপে পরখ করতে হয়। অনেক সময় যুক্তি প্রয়োগ করে দেখা যায়, একাধিক থিওরি বা কল্পনামালা দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট তথ্য বা ঘটনার সামঞ্জস্যময় বর্ণনা করা সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমস্যাটির আরও তথ্য যোগাড় করে দেখেন কোন থিওরিতে সবগুলো ঘটনার বর্ণনা মিলে। প্রথমে একাধিক থিওরি থাকলেও পরে তথ্য সঞ্চয়ের ফলে কতকগুলি থিওরী বাদ পড়ে, কতকগুলি বা কিছু কিছু সংশোধিত হয়। এইভাবে মার্জিত করতে করতে একটিমাত্র থিওরিতে উপনীত হওয়াই বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন। ভুল করে এবং ঠেকে ঠেকে সেই ভুল সংশোধন করে করে বিজ্ঞান অগ্রসর হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বিজ্ঞানেও ভুলের মূল্য আছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুল করা অনিবার্য; বৈজ্ঞানিক সেই ভুল সংশোধন করতে পিছ-পাও হয় না। কারণ থিওরির প্রতি বৈজ্ঞানিকের আসক্তি নেই, তার আগ্রহ সত্য-উদ্ঘাটনে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি জাগ্রত হলে পরস্পর সংঘাত কম হবার সম্ভাবনা। কারণ, দেখা যায় আমরা অনেক সময় কোন

মহাজন-বাক্য বা শ্লোগান-এর মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকি—ঘটনা বা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে অন্ধভাবে তার অনুসরণ করি। জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব জাগ্রত হলে, এ অবস্থার উন্নতি হতে পারে। বিজ্ঞান এদিক দিয়ে প্রকৃত একেশ্বরবাদী। সে কেবল 'হক' বা সত্যকেই চায়, 'হক' ছাড়া আর কোনও থিওরী শ্লোগান বা প্রতীকই তার উপাস্য নয়।

উপসংহারে বলব, বৈজ্ঞানিকও সামাজিক জীব, তার মনোবৃত্তির সঙ্গেও জ্ঞানের অন্যসব শাখার সাধারণ মিল আছে; এমনকি যে-ধর্মকে সচরাচর বিজ্ঞানের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বলে মনে করা হয়, তার মূলনীতির সঙ্গেও বিজ্ঞানের আগাগোড়া আশ্চর্য মিল রয়েছে। আমার মনে হয় জ্ঞানের এক-এক শাখার এক এক প্রকৃতি আছে। বৈজ্ঞানিক যেন বিশ্বসংসারের 'হক' বা 'সত্য' রূপের ধেয়ানী, কবি তার সুন্দর রূপের পূজারী। ফিলসফার তাঁর মরমের সন্ধানী, আর ধর্মসাধক হয়ত সৃষ্টি আর স্রষ্টার মিলন বা একাত্মসাধনের প্রয়াসী।

# সভ্যতা ও বিজ্ঞান

বর্তমানে প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে সভ্যতার ভিত্তিভূমি টলমল করিতেছে, বিজ্ঞানের সমুদয় কৌশল মানুষের দুঃখজনক ও ধ্বংসমূলক কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ই আমাদিগকে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সভ্যতা বলিতে আমরা কি বুঝি এবং কীই বা আমাদের লক্ষ্য। বর্তমান যুদ্ধের অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা, এবং সমাজ-জীবনের দুর্ভেদ্য সমস্যাসৃষ্টির অন্তরালে মানুষের চিরকল্যাণকর কোন কিছু আমরা বর্তমান বিজ্ঞানসভ্যতা হইতে লাভ করিয়াছি কিনা তাহা তলাইয়া দেখিতে হইবে। অধুনা নানা দেশের বহু মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত জড় সভ্যতা সম্বন্ধে হতাশাব্যঞ্জক কথা বলিতে শুরু করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রশ্নের আশু মীমাংসা করিবার জন্য আমাদিগকে যত্নশীল হইতে হইবে। আমার মনে হয়, ইহারা মন্দের দিকটা অতিশয় বড় করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াই মনে করেন, আদিম সরলতার দিকে ফিরিয়া না গেলে আর মনুষ্যসমাজের উদ্ধারের অন্য পথ নাই। অবশ্য আমাদের নিকট ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে; পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা-প্রবাহ দেখিয়া বিষণ্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি জীবনের, কিংবা মাত্র এক পুরুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া এ বিষয়ে সঠিক মত প্রকাশ করা অনুচিত হইবে। মানবসমাজের বিবর্তন ঋজুপথে হয় না। এজন্য বর্তমান পরিস্থিতির অল্পপরিসর পটভূমিতে দাঁড়াইয়া আমরা সমাজভাগ্য নির্দ্ধারিত করিতে পারি না। ইহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা ভুলিয়া গিয়াই বিচার করিতে হইবে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, অতীতেও—ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই—আমরা যুদ্ধ করিয়াছি, হত্যা করিয়াছি, বিশাল সভ্যতা চুরমার করিয়া দিয়াছি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্বাপেক্ষা বিরাট সভ্যতার পত্তনও করিয়াছি। ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার দিকেই জীবনের গতি; অতএব কখনও কখনও ইহার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আমরা যেন পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরত্নকে অবহেলা না করি। সদাজাগ্রত উন্নতি-চেষ্টার ফলেই জীবনে উৎকর্ষ সাধিত হয়; চিন্তাহীন অলসতার মধ্যে সুখ কোথায়? এরূপ সুখের আমরা কেবল কল্পনাই করিতে পারি, সমাজগতভাবে ইহা কখনও সম্ভব নহে।

আমরা কর্ম করি অবসরের আশায় নহে, বরং নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জের উপর আধিপত্য লাভের জন্য; আমরা যে পরস্পর মিলিত হইয়া সহযোগিতা করি, সেও আমাদের সৃজনী বৃত্তির কর্মশীলতা এবং সম্প্রসারণের নিমিত্তই। ব্যক্তিই হউক, সম্প্রদায়ই হউক, বা জাতিই হউক—ইহারা যদি সুখ-সুখ করিয়া লালায়িত হয়, অথবা দুঃখ-ক্লেশ দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে তবে বুঝিতে হইবে ইহারা আর বাঁচিয়া নাই, পরন্তু ইহারা কণ্টকাকীর্ণ পথের ধূলিশয্যায় চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে।

এজন্য, আমি ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতায় বিশ্বাস করিতে বলি। অতীত সুখের কাহিনী যেন আমাদিগকে মোহিত না করে; আমরা যেন জীবনধর্মের বিরুদ্ধে চলিয়া বর্তমান সভ্যতার

দিকে পিছন ফিরিয়া না থাকি। অবশ্য আমি বর্তমান জীবন-ব্যবস্থার স্থূল ত্রুটিগুলি চক্ষু বুঁজিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বলিতেছি না, কেবল কালধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া বিভিন্ন চলার পথ হইতে আমাদের প্রয়োজন মত উত্তম পথটি বাছিয়া লইতে পারি। আজিকার দিনের ত্রুটিগুলি সকলেরই চক্ষে ঠেকিতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমরা এই অবস্থার উন্নতির চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানলাভ করাই ছাড়িয়া দেই, তবে তাহা সমীচীন হইবে না। যদি রাসায়নিক আবিষ্কারকে ধ্বংসলীলার সহায়ক যন্ত্রাদি নির্মাণে নিয়োজিত করা হয়, তবে সেই কারণে যেসব জ্ঞান-সাধক নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া প্রকৃতির রহস্যভেদের জন্য জীবনপাত করিয়াছেন, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায় হইবে। একদিকে যেমন বিষাক্ত বাষ্প উৎপাদন করা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ভীষণ ব্যাধির প্রকোপ হইতে রক্ষার নিমিত্ত উত্তম প্রতিষেধকও আবিষ্কার করা হইয়াছে। মোটরকার ও উড়োজাহাজ আজ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে সত্য, কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে ইহারাই আবার মানুষ, সম্প্রদায় ও জাতিকে পরস্পর নিকটতর করিয়া অসংস্রবজনিত নানা কু-ধারণা দূর করিয়া মিলনের পথ সহজ করিয়া দিয়াছে।

যাহারা বর্তমান অবস্থার সহিত জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে হয়ত যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার যুগে জীবনযাত্রা পূর্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত ইহার ফলে তাহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সাহসিক প্রতিবেশীরা সুযোগ পাইয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া লইতেছে। কিন্তু প্রাচীন পন্থা আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে ইহার প্রতিকার হইবে না, বরং বর্তমান অবস্থার সহিত মিল রাখিয়া জীবনধারাকে নূতন পথে প্রবর্তিত করিতে হইবে। হয়ত পৃথিবীর কোনও নিভৃত প্রান্তে মান্ধাতার আমলের জীবনপ্রণালী এখনও চলিতেছে—সময় সময় আমরা দানব বা ঐরূপ কোন প্রাচীন ধরনের জীবের কথা শুনিয়া থাকি বটে। কিন্তু বিবর্তনের পথে মানুষ ও তাহার সমাজ ইহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে; এখন আর অতীত জীবনধারার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত জীবনের বিজয়-রথ থামিয়া যাইবে না। দৈব-প্রেরণা বলে ইতিপূর্বেই নানা জটিল জীবের সৃষ্টি হইয়াছে—এই বিবর্তন পথের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ যতই কেন অপ্রত্যাশিত হউক না, আমরা যে আবার পুরাতনের দিকে ফিরিয়া যাইব, এরূপ আশা করা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

যন্ত্রের উদ্দেশ্যের সহিত ব্যবহারের যখন কোনও বিরোধ না থাকে তখনই আমরা বলি উহা বিনা অপচয়ে সুচারুরূপে কর্ম করিতেছে। প্রতিযোগিতায় যেটি টিকিয়া যায় তাহা কৃত্রিম প্রতিরোধ দূর করিয়া নিশ্চয় কোনও উন্নততর বা স্বল্প-অপচয় উপায় অবলম্বনের ফলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। জীবন-নিয়ন্ত্রণের বেলায়ও আমাদিগকে অনুরূপ নিয়মের বশবর্তী হইতে হয়। পুরাতন জীর্ণ প্রথা ত্যাগ করিয়া আধুনিক জীবন-যাত্রার উপযোগী জীবন-বিধি অবলম্বন করিবার সাহস থাকা চাই। পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে, এই বিষয়ে যদি আমাদের মনে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে আর জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকে মানব-অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। সফলতার বিবরণ হইতে যেমন আমরা জীবন-জিজ্ঞাসার আলোক পাই, অগণ্য বিফলতার ইতিহাস হইতেও তেমনি আমরা বুঝিতে পারি, জীবনে কি কি বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। বলিতে গেলে বিজ্ঞান বর্তমান সভ্যতা হইতে

উদ্ভূত নহে, বরং ইহাই সভ্যতার জনক, এবং মানবসমাজের উৎকর্ষের নিদর্শন। ইহার আদি কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। প্রাচীন কাল্‌ডিয়ায়, মিশরে এবং আমাদের দেশেও স্বর্ণযুগে ইহার অতিশয় আদর ছিল, সন্দেহ নাই। তখনকার দিনেও যন্ত্রপাতি এবং পরিশ্রম লাঘব করিবার নানাবিধ সরঞ্জাম ছিল, তখনও লোকে ঠিক এখনকারই মত প্রকৃতির নিয়ম ও রহস্য জানিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। হইতে পারে, তখন প্রকৃতির রহস্য আরও নিভৃতে লুকান ছিল। তবে, এখন যেমন উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করিয়া থাকে, তখনও সর্বদেশে কতিপয় লোক নিজেদের জ্ঞানের সুযোগ লইয়া অন্যান্য সরল ভ্রাতৃবর্গের উপর আধিপত্য না করিয়াছে, এমন নহে। তখনও ঠিক এখনকার মতই রক্তগঙ্গা-প্রবাহী যুদ্ধ-বিগ্রহের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিবার জন্য সময় সময় বিজ্ঞানবিদগণের ডাক পড়িত, কিন্তু প্রধানতঃ শান্তির সময় জ্ঞান-সম্প্রসারণ এবং সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধনই তাহাদের কার্য্য ছিল।

একভাবে দেখিতে গেলে, বর্তমানে সর্ববিষয়ে অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া আরও প্রভূত চেষ্টার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির রহস্য-জ্ঞান এখন আর দুই-চারজন চিহ্নিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই—ইহা এখন জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এখন আর অসুখ-বিসুখ হইলে নিরুপায় হইয়া যাদুমন্ত্র বা দৈবশক্তির দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন বলিয়া উহাই যে আমাদিগকে বিনাবিচারে মানিয়া চলিতে হইবে, এমন নহে। এখন আর প্রকৃতির অন্ধ শক্তির ভয়ে অভিভূত হইয়া গড় করিবার দিন নাই। সত্য বটে এখনও আমরা নৈসর্গিক উৎপাতের হাত এড়াইতে পারি নাই। এখনও ভূমিকম্পে আমাদের নগরগুলি কম্পিত হয়, বন্যায় সমগ্র দেশ ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহামারীতে সাময়িকভাবে সমগ্র দেশের কর্মস্রোত বন্ধ হয়। কিন্তু তথাপি আমরা পূর্বাপেক্ষা অনেক সত্বর এই সবের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে শিখিয়াছি। আমাদের অগ্রগামীর দল নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জ জয় করিবার নিমিত্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন; এবং বহুক্ষেত্রে অনেক স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করিয়াও মানুষ বিজয়ী প্রভুর স্থান লাভ করিয়াছে। কোনও জাতির বিশেষ সমস্যা বা বিপদ দেখিয়া আমরা যেন চিরতরে হতাশ্বাস না হই। কেবল সাহস ও ইচ্ছাশক্তির বলেই আমরা জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত উপায় বাহির করিতে পারিব। জাতীয় প্রচেষ্টায় সফল হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসেই আছে, এবং ধৈর্য্য সহকারে চেষ্টায় রত হইলে পরিণামে জয় হওয়াও সুনিশ্চিত। কুসংস্কার সর্বদাই জাতীয় জীবনে শৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়াছে। সর্বাগ্রে এই কুসংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে। কালধর্মের প্রয়োজনে এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যে, আমাদের চিরপোষিত উত্তরাধিকার ত্যাগ না করিলে আর সফল হইবার উপায় নাই।

যে-কোন সুসভ্য দেশের চরম সফলতা শুধু তাহার জ্ঞানভাণ্ডার, কলকজা বা রেকর্ডশালায়ের দ্বারা পরিমিত হয় না, ঐ দেশের জনগণ কি প্রকৃতির, তাহার দ্বারাই নির্ণীত হয়। অটুট নিয়মানুবর্তিতা কিংবা বিপুল সংগঠন বলেই পরিণামে জয়ী হওয়া যায় না। শীর্ষস্থান রক্ষা করিতে হইলে, স্বাধীনচিত্ত পুরুষ চাই, সাহসিক এবং অদম্য উৎসাহশীল কর্মী ও ভাবুক চাই। ফলতঃ এরূপ লোক চাই, যাহারা ন্যায় ও সুসঙ্গতির অনুরোধে দারুণতম তিক্ত সত্য উচ্চারণ করিতেও পশ্চাদপদ হয় না। যেসব স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ভালবাসে এবং সম্মান করে, কেবল তাহারাই প্রকৃতপক্ষে মহৎ হইবার আশা করিতে পারে। দেশের প্রকৃত আশা পূর্ণজাগ্রত মানবত্বের উপরই নির্ভর করে, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের উপর নহে।

যদি কোনও দেশ অদূরদর্শী নীতি অবলম্বন করিয়া চিন্তাশীলদিগের মুখবন্ধ করিয়া দেয়, এবং জনসাধারণকে কাপুরুষের ন্যায় ঐ নীতির পোষকতা করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে দেখা যাইবে, কার্য্যকালে বহুকাল সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারেও কোনও ফলোদয় হইবে না। অপ্রকৃত অস্থায়ী জয়ের লক্ষণ দেখিয়া অনেক সময় আমরা এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করিয়া থাকি। ক্ষণিক সফলতার দৃষ্টান্তে প্রলুব্ধ হইয়া আমরা অনেক সময় শাশ্বত সত্য অবহেলা করিয়া থাকি, এবং এত উচ্চৈঃস্বরে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘবদ্ধতার জয়গান করি যে তাহার মধ্যে সত্য ও স্বাধীনতার সরল সুর একেবারে তলাইয়া যায়।

নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কিরূপ শৃঙ্খলা? কোন উচ্চ আদর্শলাভের জন্য স্বাধীন ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মের বশবর্তী হইয়া পরস্পর সহযোগিতা করিতে চায় সেইরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা। অতএব যদি কেহ কোন সত্যে বিশ্বাস করিয়া দশজনের বিরুদ্ধে কথা বলিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে যেন নির্য্যাতন করা না হয়, এমনকি পরিণামে যদি তাহার মত ভ্রান্ত বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তথাপি নহে। হয়ত প্রত্যেক দেশের লোকেই মনে করে, সমগ্র মানবসমাজের ভাগ্য নির্ণয়ের মহান কর্তব্য-ভার ঐ দেশবাসীর উপরই ন্যস্ত আছে। যাহা হউক, আমরা যেন ভাবিতে পারি পৃথিবী এখনও এরূপ বিশাল রহিয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা রক্ষা করিয়া বাস করিবার এখানে স্থানের অভাব নাই; তাহারা যেন স্ব স্ব উৎকর্ষ ও মুক্তির জন্য আপন আপন ক্ষমতা ও স্বদেশীয় দ্রব্য-সম্ভারের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে; তাহারা যেন অধস্তন জাতিগণকে শোষণ করাকেই গরিমা ও গৌরবের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে না করে।

বর্তমান সভ্যতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক মূর্তি দেখিয়াও আমি হতাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া আলোক অন্বেষণ করি, উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা করি। যদি চলিতে চলিতে পথে হঠাৎ অভাবিত প্রতিবন্ধক দেখিতে পাই, তবে যেন আমরা ভয়ে থামিয়া না যাই, কিংবা আদিমযুগের বৈচিত্র্যহীন জীবনধারার দিকে প্রত্যাবর্তন না করি। আসুন আমরা নিজেদের দুর্বলতা কোথায় খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহা দূর করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করি। মানবজাতির ভাগ্য এবং ক্রমোৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় যেন আরও দৃঢ় হয়। বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং সভ্যতার বার্তা যেন সুদূর পল্লীবাসী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কর্মীর নিকটেও পৌছাইয়া দিতে পারি এবং তাহার কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া তাহাকে আপন ক্ষমতায় আস্থাবান করাইয়া দিই। আমরা যেন বর্তমান সভ্যতার যাবতীয় কল্যাণকর বিষয়ে সদ্ব্যবহার করিয়াও প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে বিগত যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সহিত সুসমঞ্জস করিতে পারি। আমাদের বালক-বালিকারা যেন পূর্ণ জাগ্রত নরনারীতে পরিণত হইবার শিক্ষা পায়—তাহারা যেন সংস্কারমুক্ত হয়, কল্যাণ করিবার ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয় এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সততা ও সাহসিকতার সহিত কর্ম্ম করিতে উৎসুক হয়। আমরা যেন সম্ভাবনার ক্ষেত্র ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে করিতে চলি, জ্ঞানকে নব নব দৃষ্টিতে দেখিয়া উহার প্রসার বৃদ্ধি করি, এবং প্রকৃতির রহস্য আয়ত্ত করিবার জন্য নিখিল মানবের প্রয়াসের সহিত আমাদের প্রচেষ্টাও যুক্ত করিয়া ধন্য হই।

মূল : সত্যেন্দ্রনাথ বসু

অনুবাদক : কাজী মোতাহার হোসেন

মুসলিম হল বার্ষিকী

১৩শ সংখ্যা ১৩৪৬

# বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানসাধন

দীর্ঘদিনের বহু সাধনায় জ্ঞান ক্রমশ প্রকাশিত হয়; অনায়াসে, স্বপ্নবাণীর মত দৈবাৎ একদিনে ইহা লাভ করা যায় না। জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই পরম আশ্চর্য ব্যাপার। এসব কেন হইতেছে, কেমন করিয়া হইতেছে, ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইলে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা আবশ্যক। 'কেন'-র উত্তরের শেষ নাই; কারণ, একটি 'কেন'-র উত্তর দিলে তৎক্ষণাৎ আর একটি বা একাধিক 'কেন'র উৎপত্তি হয়। যেমন, আমরা দেখি কেন? তাহার উত্তর—বাহ্য বস্তু হইতে আলোক আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িয়া একটি বিশেষ স্থানে তাহার প্রতিচ্ছবি পড়ে, পরে সেখান হইতে স্নায়ুমণ্ডলী বাহিয়া মস্তিষ্কে ইহার অনুভূতি পৌঁছিলেই উক্ত বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ইহার পদে পদে আবার নূতন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়; যথা—বাহ্য বস্তু হইতে আলো আসে কেন? চক্ষের ভিতরে সে আলোক প্রবেশ করে কেন? তথায় প্রতিকৃতি পড়ে কেন? স্নায়ু বাহিয়া তাহার অনুভূতি সঞ্চালিত হয় কেন? আর ঐ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছিলেই বা দৃষ্টিজ্ঞান হয় কেন? এইরূপে এক 'কেন'-কে তাড়াইয়া নূতন 'কেন' সৃষ্টি করিতে করিতে জ্ঞান অগ্রসর হয়। অন্য কথায় বলা যায়, বৈজ্ঞানিকেরা 'কেন-র উত্তর দেয় না, কেমন করিয়া ঘটনা ঘটিতেছে তাহার যথাযথ বিবরণ দিয়া দিয়া জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করে।

প্রকৃতির দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত; যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যখন তখন তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম অথবা সত্য দৃষ্টি সকলের নাই। আমরা সচরাচর যাহা দেখি, তাহা ভাল করিয়া দেখি না। আংশিক দেখিয়াই মনে করি, আমাদের দেখা শেষ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক, অশেষ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে সাধারণ পরিচিত ঘটনার মধ্যেও অনেক নূতন জিনিস দেখিতে পায়। তখন অন্য দশজনেও সে কথার সত্যতা অনুভব করিয়া চমৎকৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে হইতে আরিস্টটোল শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন যে, দুইটি জিনিস এক সঙ্গে মাটিতে ফেলিয়া দিলে আগে ভারী জিনিসটি মাটিতে পড়িবে, তারপর হালকাটি পড়িবে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত সকলেই একথা মানিয়া লইয়াছিল; ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। অবশেষে গ্যালিলিও খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, লঘু-গুরু ভেদে ভূ-পতনে সময়ের কোনো তারতম্য হয় না। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের 'বার্থোলোমিউ' নামক জনৈক পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন যে, রামধনুতে ক্রমান্বয়ে লাল, নীল ও সবুজ রং সাজানো রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, পাঁচশত বৎসর ধরিয়া ইংলন্ডের লোকে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিল। একটি রামধনুর দিকে তাকাইলেই যে ভুলের সংশোধন হইয়া

যাইত, সেই ভুল পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত কাহারও চোখে ধরা পড়ে নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, আমরা আপ্তবাক্য কিরূপ দৃঢ়তা ও অন্ধতার সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মহাজন-বাক্যকেও পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া লইবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে; আর আবশ্যক মত যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হওয়ায় পরীক্ষা করিবারও সুবিধা হইয়াছে; তা ছাড়া নিপুণ ও গভীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা পূর্বের অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম-হিসাব ও কঠোর পরিশ্রমের কয়েকটি উদাহরণ দিলেই এ কথার সত্যতা জানা যাইবে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পারা এবং সামান্য সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করিতে পারা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অপরিহার্য। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে হার্শেল সাহেব দূরবীনের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, একটি তারকা অন্যগুলির চেয়ে একটু আশাতীতরূপে বড় দেখাইতেছে। তখন তিনি মনে করিলেন, এটি হয়তো ধূমকেতু হইবে; কিন্তু পরে ইহার গতিবিধির বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, এটি সূর্যের একটি নূতন উপগ্রহ—ইউরেনাস। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এ কয়েকটি গ্রহের বিষয় লোকের জানা ছিল; কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ বৃহৎ এই ইউরেনাস গ্রহটিই প্রথম আবিষ্কার। লর্ড রেলে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রচার করিলেন যে, বায়ু হইতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ওজন করিলে যেখানে ২.৩১০২ গ্রাম হয়, অন্য উপায়ে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ওজন করিলে ঠিক অনুরূপ অবস্থায় ২.২৯৯০ গ্রাম পাওয়া যায়। এই পার্থক্য অতি সামান্য হইলেও লর্ড রেলে দেখিলেন, তাঁহার পরীক্ষায় এই পরিমাণ ভুল হইতে পারে না। অথচ তিনি ইহার কোনো কারণও নির্ণয় করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, পরে স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে পরীক্ষা করিতে করিতে বাতাসের মধ্যে আরগন নামক একটি গ্যাস আবিষ্কার করেন। এই গ্যাস নাইট্রোজেন অপেক্ষা হালকা। বাতাস হইতে আহৃত নাইট্রোজেনের ভিতর এই গ্যাসের সংমিশ্রণ থাকাতেই লর্ড রেলের পরীক্ষায় ইহা লঘুতর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

জ্ঞানান্বেষণের জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত কিরূপ সাবধানতা ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, হার্শেলের জীবনে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বহস্তে কাঁচ পালিশ করিয়া তাঁহার দূরবীনের আয়না প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার টেলিস্কোপটি ২০ ফুট লম্বা এবং তাহার মুখের প্রতিফলক আয়নাটি সাতফুট ব্যাস-ওয়ালা ছিল। এই আয়না পালিশ করিতে করিতে এমন এক অবস্থা হইল, যখন তিনি দেখিলেন যে, মুহূর্তকাল কাজ স্থগিত রাখিলে সমুদয় পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব তিনি ১৬ ঘণ্টা যাবৎ ক্রমাগত পালিশ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভগ্নী তাঁহার মুখে খাদ্য তুলিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন, নতুবা হয়তো শ্রান্তি ও অবসাদেই তাঁহার জীবনসংশয় হইত। তাঁহার এই বিশাল টেলিস্কোপ দিয়া তিনি দৃশ্যমান আকাশের সমুদয় অংশ পর্যালোচনা করিয়া নক্ষত্রাদির তালিকা প্রস্তুত করেন। টেলিস্কোপ দ্বারা একবারে আকাশের অতি সামান্য অংশই দেখা যায়। এজন্য তাঁহাকে অন্ততঃ পক্ষে তিন লক্ষ বার পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ তিনি প্রত্যহ উন্মুক্ত আকাশ-তলে সারারাত্রি ধরিয়া আকাশ পর্যবেক্ষণ-কার্যে লিপ্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিকের অধ্যবসায় ও একাগ্রতা এইরূপই হওয়া আবশ্যক।

পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ফরাসী জ্যোতির্বিদ ডক্টর জ্যানসেন সত্য সত্যই পঙ্গু ছিলেন এবং কোনো বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁহাকে অনেকবার

গিরিলঙ্ঘন করিতে হইয়াছিল। আল্পস্ পর্বতের শিখরে একটি বেক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, দৃঢ় সংকল্প দ্বারা অতিক্রম করা যায় না এরূপ বিঘ্ন অতি অল্পই আছে।

কীট-পতঙ্গাদির স্বভাব নির্ণয় করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আবশ্যক হয়, সেরূপ বোধহয় বিজ্ঞানের অন্য কোনো বিভাগেই হয় না। পোকা-মাকড় বধ করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন পর্যালোচনা করা ততটা কঠিন নয়; কিন্তু দিনের পর দিন জীবন্ত কীটের চাল-চলন লক্ষ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ 'ফেবার' যখন প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া পোকা-মাকড়ের অভিজ্ঞতা ও সহজ বুদ্ধি বিষয়ে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেন, তখন প্রত্যহ তিনজন কৃষাণ ক্ষেতে যাইবার সময় তাঁহাকে প্রাতরভিবাদন জানাইয়া যাইত আবার সায়ংকালে ফিরিবার সময়ও দেখিতে পাইত, ফেবার ঐভাবেই সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া আছেন। তাহারা অবশ্য ফেবারকে অতিশয় নির্বোধ ও কৃপার পাত্র বলিয়াই মনে করিত। ডারুইন যদিও তাঁহাকে 'অননুকরণীয় পর্যবেক্ষক' বলিয়া এবং মেটারলিঙ্ক তাহাকে 'কীট-পতঙ্গের হোমার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি সাধারণে তাঁহাকে একদেশদর্শী, অবজ্ঞেয় গো-বেচারা বলিয়াই জানিত। বাস্তবিকপক্ষে বৈজ্ঞানিক অচিরেই কোনো লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া জ্ঞানানুশীলন করেন না। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য নিঃস্বার্থভাবে, লোকের প্রশংসা বা নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া, একান্ত বিনম্রভাবে সাধনা করিয়াই আনন্দ পান।

ফেবার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। নিজে স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া বৎসরে মাত্র ৬৪ পাউন্ড উপার্জন করিতেন। কিন্তু তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ পর্যবেক্ষণ করিয়া ১০ খণ্ড পুস্তকে প্রাণিবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভাষা এত চমৎকার যে, সে পুস্তকগুলি একাধারে সাহিত্য ও বিজ্ঞানরূপে সমাদর লাভ করিয়াছে। দরিদ্র 'ফেবার' আদর্শ জ্ঞান-সেবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যে যুগে সকলেই অর্থ লাভের জন্য ব্যস্ত, সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি একবার পুস্তক কিনিবার জন্য সমগ্র মাসের বেতন ব্যয় করিয়া ফেলিলেন—মনের খোরাক জোগাড় করিতে গিয়া পেটের খোরাকে টান পড়িল। তিনি জ্ঞানের আনন্দে পেটের জ্বালার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। যাহা হউক, পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী প্রাণিতত্ত্ববিদদিগের প্রেরণা যোগাইবে; এবং সাংসারিক অনটন সত্ত্বেও সত্যানুসন্ধানিগণ কিরূপে জ্ঞানসেবা করিয়া থাকেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার নাম কীর্তিত হইবে।

বৈজ্ঞানিক বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে সাধারণ নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করিয়া আপাত বিশৃঙ্খল জাগতিক ব্যাপারকে সুসম্বদ্ধ করেন। এজন্য তাঁহাকে সুনিয়ন্ত্রিত কল্পনার প্রয়োগ করিতে হয়। এজন্য বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি উদার, প্রশান্ত,—বিশেষকে ছাড়াইয়া সমষ্টির দিকেই তাঁর দৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিউটনের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। গাছের ফল পাকিলে তাহা মাটির দিকে পড়ে, এ তথ্য কাহার না জানা ছিল? ইতঃপূর্বে মনীষী গ্যালিলিও পতনশীল পদার্থের গতিবেগ সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এমন কি খৃষ্ট-জন্মের শতাধিক বৎসর পূর্বেও বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যার আদি প্রবর্তক হিপারকাস গ্রহাদির পরিভ্রমণকাল প্রায় শুদ্ধরূপেই নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু পার্থিব ও সৌর জগতের সমুদয় পদার্থের পরস্পর আকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য

নিউটনের বিরাট কল্পনা ও প্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই নিয়ম অনুসারে অঙ্ক কষিয়া হ্যালির ধূমকেতু, নেপচুন গ্রহ এবং অসংখ্য অদৃশ্য তারকার বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। নেপচুনের কথাই ধরা যাক। ইউরেনাস গ্রহ (১৭৮১) আবিষ্কৃত হইবার পর জ্যোতির্বিদেরা ইহার কক্ষপথ নির্ণয় করিয়া ইহা কখন কোন স্থানে অবস্থিতি করিবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। কিন্তু নিউটনের নিয়ম অনুসারে হিসাব করিয়া যেরূপ হয় কার্যতঃ দেখা গেল, ঠিক সেরূপ না হইয়া অতি সামান্য পরিমাণ অগ্রপশ্চাৎ হইতেছে। তাহাতে বৈজ্ঞানিকেরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই নিকটবর্তী কোনো জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের ফলেই এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। কত বড় জ্যোতিষ্ক কোন সময় কোথায় থাকিয়া আকর্ষণ করিলে ইউরেনাসের গতির এইটুকু ব্যতিক্রম হইতে পারে, গণিতজ্ঞেরা তাহাই হিসাব করিতে লাগিয়া গেলেন। দুরূহ পরিশ্রমের ফলে ইংল্যান্ডে Adams ও ফ্রান্সে Le Verrier এই দুইজন পণ্ডিত সমস্যাটির সমাধান করিলেন। এমন কি, তাঁহারা প্রচার করিলেন, অমুক দিনে, অমুক সময়, অমুক স্থানে সেই নূতন জ্যোতিষ্কটি দেখা যাইবার কথা। জার্মানির Dr. Gake একজন জ্যোতির্বিদ সত্য সত্যই ইঁহাদের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানে জ্যোতিষ্কটি দেখিতে পাইলেন; এইটিই সূর্যের নবাবিষ্কৃত গ্রহ নেপচুন (১৮৪৬)। এই নেপচুন আবিষ্কারই বোধ হয় নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্তম্ভ।

কোলাম্বাস, জন, সেবাস্টিয়ান ক্যাবট, ভাস্কো-ডি-গামা (Good hope) এবং ম্যাগেল্যানের (circumnavigation) নাম জনসমাজে বিশেষরূপে পরিচিত; কারণ তাঁহারা বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত অসম সাহসিকতার সহিত সমুদ্রপথে একপ্রকার নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন কুক, ডাক্তার ন্যানসেন প্রভৃতি (১৮৯৩) কেবল জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত মেরুপথযাত্রী হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। বাহাদুরী লইবার আশায় নয়, পার্থিব লাভের আশায়ও নয়, কেবল মাত্র মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি হউক, এই ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইঁহারা আপন প্রাণকে পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছিলেন; এজন্য বৈজ্ঞানিকের চক্ষে ইঁহাদের সম্মান অধিক।

জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য জানিয়া শুনিয়া রোগের কবলে আত্মবিসর্জন দিবার বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চিকিৎসকদের ভিতর দেখা যায়। এজন্য ডাক্তার ল্যাজিয়ার (১৯০০) ও ডাক্তার মায়ার্স (১৯০১) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বমানবের একান্ত নমস্য।

বিজ্ঞানকে যাঁহারা পেশারূপে অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা ছাড়াও অনেকে অবসর সময়ে বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে স্যার জোসেফ প্রেস্টউইচ-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চল্লিশ বৎসর যাবৎ ইনি লন্ডনের একজন বিশিষ্ট সওদাগর ছিলেন। সারাদিন তাঁহাকে বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং অফিস হইতে ফিরিবার পর রাত্রিজাগরণ করিয়া গণিত রসায়ন প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন, আর শিলাখণ্ডের শ্রেণীবিভাগ ও খনিজ পদার্থের বিশ্লেষণ কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অনবসর সত্ত্বেও ভূ-তত্ত্ববিদ্যায় তাঁহার দান অধিক ও এত উচ্চাঙ্গের যে, তাঁহার অবসরের প্রতি মুহূর্তে এই সব গবেষণায় লিপ্ত না থাকিলে কিছুতেই ইহা সম্ভবপর হইত না। তাঁহার জ্ঞান কতদূর গভীর ছিল, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এক সময় তিনি কেন্ট জেলায় গৃহনির্মাণ করিয়া সেখানে ১৬৮ ফুট গভীর কূপ খনন করিবার জন্য লোক লাগাইয়াছিলেন। লোকেরা ১৬৬ ফুট পর্যন্ত

খনন করিয়াও যখন পানি পাইল না তখন হতাশ হইয়া তাঁহাকে আসিয়া বলিল, আর বৃথা পরিশ্রম করিয়া ফল কি? তিনি সমুদয় শুনিয়া বলিলেন, 'কাজ করিয়া যাও, আর দুই ফুট খনন করিলেই কাল পানি উঠিবে।' পরদিন সত্য সত্যই দুই ফুট খনন করিয়া পানি পাওয়া গেল। অজ্ঞ লোকে যে কথা বলিলে বুজরুগী বলিয়া মনে হইত বৈজ্ঞানিক সুস্পষ্ট জ্ঞানে সেই কথা জোর করিয়া বলিতে পারিলেন। বাস্তবিক জ্ঞানের অভাবেই রহস্যের সৃষ্টি, আর জ্ঞানের প্রভাবেই রহস্যের তিরোভাব হয়। বৈজ্ঞানিককে সাধারণত বস্তুতান্ত্রিক নির্মম বিশ্লেষক ও নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বস্তুতান্ত্রিকতা ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের জন্য উন্মত্ত কোলাহল নহে, তাঁহার বস্তুতান্ত্রিকতার অর্থ সত্যনিষ্ঠা, সত্যকে বা বাস্তবকে ইন্দ্রিয়াদি ও যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া লওয়া এবং অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে সুদৃঢ় জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা। বৈজ্ঞানিকের নির্মম বিশ্লেষণ সাধারণ সাংসারিকের মত পরছিদ্রান্বেষণ নহে; তাঁহার উদ্দেশ্য, আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের ভিতর কোন নিয়ম ক্রিয়া করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা। বৈজ্ঞানিকের খোদাভক্তি অজ্ঞানতাপ্রসূত ও পরোপদিষ্ট নামকীর্তন মাত্র নহে; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়া স্রষ্টার প্রতি কার্যে তাঁহার চমৎকার কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং যে মহাশক্তি জাগতিক নিয়মের প্রবর্তন করিয়াছেন, একাধারে তাঁহার সূক্ষ্মতা ও বিশালতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিহ্বল বিনম্রভাবে তাঁহার মহিমা ধ্যান করিয়া থাকেন।

বর্তমানে ইউরেনিয়ম প্রভৃতি ভারী ধাতুর পরমাণুকেন্দ্র থেকে নানা উপায়ে জোর করে জড়-কণা নির্গত করে সীসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুর পরমাণু পাওয়া গেছে। আবার উল্টো প্রক্রিয়ায় নিকৃষ্ট ধাতু থেকে উৎকৃষ্ট ধাতুও প্রস্তুত করা গেছে। কিন্তু এইভাবে দু'এক গ্রেন সোনা প্রস্তুত করতে যে ব্যয় হয়, তা দিয়ে এমনিতেই অনেক বেশী সোনা কিনতে পাওয়া যায়। যা' হউক' অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন যে একেবারে অলীক খেয়ালমাত্রই ছিল না, অন্তত এটুকু প্রমাণিত হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধে আণবিক শক্তির ভয়াবহ পরিচয় পাওয়া গেছে হিরোশিমা আর নাগাসাকি নামক দুটো জাপানী শহরের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলায়। বর্তমানে এই বিরাট শক্তিকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করবার চেষ্টা চলছে আর তাতে অনেকটা সাফল্যও দেখা যাচ্ছে।

এই বিশ্ব-সংসার কে সৃষ্টি করেছেন, বা তিনি কেমন, বৈজ্ঞানিক তা' নির্ণয় করতে উৎসুক নন; তিনি চান শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ জগতটির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। এর উপাদানগুলো কি? এদের সংমিশ্রণে কি হয়, বিশ্লেষণেই বা কি হয়,—অর্থাৎ এইসব উপাদান কি কি নিয়ম অনুসারে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাই আবিষ্কার করতে। এই বিশেষ ধরনের জ্ঞান পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার আওতায় পড়ে। আর, এইসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝবার জন্য, এবং আপাতঃদৃষ্টিতে অসংলগ্ন ব্যাপারাদির ভিতরকার শৃঙ্খলা নির্ণয় করবার জন্য বিশুদ্ধ যুক্তি-বিচারের যে শাস্ত্র উদ্ভূত হয়েছে তার নাম অঙ্কশাস্ত্র বা গণিতবিদ্যা। এই গণিতবিদ্যাই অন্য সব বিজ্ঞানের লালয়িতা। গণিতের অকাট্য যুক্তি সংখ্যা ও পরিমাণের উপর প্রয়োগ করা হয়। কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে পরিমাণের ছাঁচে ঢেলে বৈজ্ঞানিক একের পর এক সিদ্ধান্তের ইমারত খাড়া করেন।

সাধারণের বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিকের কল্পনার বালাই নেই। কিন্তু তা সত্য নয়। বৈজ্ঞানিকের কল্পনা বায়বীয়, ধূমায়িত বা তরলিত নয়। তাঁর কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত, অঙ্কশাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন—নিউটন আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব। এ এক বিরাট কল্পনা। ভিত্তিমূলে রয়েছে অনুভব, অভিজ্ঞতা আর যুক্তি। তত্ত্বটা হল এই যে, বিশ্বের সমুদয় বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে, এই আকর্ষণের পরিমাণ আকর্ষণ ও আকর্ষিতের বস্তুপরিমাণের সঙ্গে সরল অনুপাতে বাড়ে, আর পারস্পরিক দূরত্বের সঙ্গে বিপরীত বর্গ অনুপাতে কমে। এই তত্ত্বকে প্রথমে আপাতত মেনে নিয়ে গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে দেখা গেল, এর দ্বারা পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি সৌর গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ, গতিবেগ, বৎসর, সৌরদূরত্ব প্রভৃতি ঠিক ঠিক নির্ণয় করা যায়; তা' ছাড়া কয়েকটি ধূম্র-তারকা ও গ্রহের অস্তিত্বও অনুমান করা গেছে; সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ ও ধূমকেতুর আবির্ভাবকালও নির্ণীত হয়েছে। তারপর এই আপাত-মেনে-নেওয়া কল্পনা একটি তত্ত্ব বলে প্রতিষ্ঠিত হল যার দ্বারা বিশ্বজগতের অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সূত্রে গাঁথা গেল। এইভাবে আমরা জগৎ সম্বন্ধে স্পষ্টতর জ্ঞানালোক লাভ করলাম। আমাদের হাতের কাছেও তরল ও কঠিন পদার্থের পৃষ্ঠটান পরখ করে দেখা গেল ঐ একই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের আকর্ষণ দ্বারা এসবের ব্যবহার বুঝতে পারা যায়। অর্থাৎ ঘাসের উপর শিশির-বিন্দু বা 'পদ্মপত্রে নীর' ছড়িয়ে পড়ে না কেন, ছাতা বা তাঁবুর ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়ে না কেন, লোহার সরু সূঁই পানির উপর সন্তর্পণে সমান্তরালভাবে ভাসিয়ে রাখা যায় না কেন, সমতল কাঁচের উপর আর একখানা ভিজে কাঁচের পাত রেখে খাড়াভাবে তুলতে গেলে অত্যধিক জোর লাগে কেন, পানিভরা গেলাসের উপর কর্পূরখণ্ড ফেললে কর্পূর ইতস্তত

অস্থিরভাবে নড়তে থাকে কেন-এসব প্রশ্নেরও মীমাংসা পাওয়া গেল সাক্ষাৎভাবে পৃষ্টানের সাহায্যে আর পরোক্ষভাবে আণবিক মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের ভিত্তিতে।

চৌম্বক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, আলো ও তাপের বিকিরণ প্রভৃতি অনেক কিছুতেই মাধ্যাকর্ষণের মত বিপরীত বর্গনিয়ম খাটে। এই ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আলো, তাপ, চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি আসলে একই সত্তা—শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যেই যা প্রভেদ প্রথমে মনে করা গিয়েছিল এইসব তরঙ্গ ঈথার নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম সর্বব্যাপী, হালকা স্থিতিস্থাপক, অরোধক পদার্থের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়। অঙ্ক কষে দেখা গেল, এতে ঈথারের প্রতি যেসব গুণ আরোপ করতে হয় তার কতকগুলো পরস্পরবিরোধী। তাইতো অনুমান করা হল ঈথার কোনও পার্থিব পদার্থ নয়—একরকম অ-পদার্থ। বর্তমানে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মনে করেন, সূর্য কোন মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই দূর থেকে পৃথিবীতে শক্তি বিতরণ বা বিকিরণ করতে পারে; এই শক্তি অঙ্কশাস্ত্রের কয়েকটি সূত্র অনুসারেই সঞ্চারিত হয়, আর এই সঞ্চরণের প্রকৃতি কতকটা সরলরৈখিক, আবার কতকটা তরঙ্গধর্মী। প্রকৃতির এই দ্বৈতরূপ পদার্থ বিজ্ঞানীকে বেশ খানিকটা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। আলোক সম্বন্ধে নিউটনের সরলরৈখিক তত্ত্ব, আর হাইগেন্সের তরঙ্গ-তত্ত্ব দুইয়ের ভিতরেই কিছু সত্য আছে। এমনকি একই সত্তা দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে পৃথক বলে প্রতীত হয়, এই ধরনের সন্দেহ বা আশা আজকার বৈজ্ঞানিকের মনকে আলোড়িত করছে। ব্যাপারটা যেন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের "একেই দুই বা দুইয়েই এক" ধরনের হেঁয়ালীর মত ঘোরালো মনে হচ্ছে। তবু বৈজ্ঞানিকের চেষ্টার ক্লান্তি নেই। অক্লান্তভাবে তথ্যের পর তথ্য পুঞ্জীভূত করে, থিওরীর পর থিওরী খাড়া করে নিরাসক্তভাবে গ্রহণ, বর্জন ও ভুল সংশোধনের ভিতর দিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের কঠিন পথে বৈজ্ঞানিক অগ্রসর হচ্ছেন। সত্যের স্থান সর্বোচ্চ, এর কাছে আপ্তবাক্য, আত্মাভিমান, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাব বা ভাবাবেগের কোনও স্থান নেই।

এর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরী এসে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করেছে। এর সঙ্গে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ দ্বারা বনিয়াদি গতিবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধগুলোর ভিত্তিমূল ধ্বসে পড়েছে। আর বল-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চিন্তার আমূল পরিশোধন করতে হয়েছে।

অবশ্য, বৃহৎ পদার্থখণ্ডের ধীরগতির ক্ষেত্রে সংশ্লেষণের সমান্তরিক নিয়ম মোটামুটি খাটলেও আলোর বেগের সহিত তুলনীয় দ্রুতগতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, "দুইয়ে দুইয়ে চার" নিয়ম আর খাটে না। এখন আর স্থান ও কালকে পৃথক সত্তা বলে ভাববার দিন নেই। এখন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সঙ্গে 'কাল'কেও একটি চতুর্থ আয়তন বলে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। আবার, তাপমাত্রা চাপ প্রভৃতিকে এখন আর ক্ষুদ্র কণিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ভাবা যায় না— এগুলো বরং একত্র পুঞ্জীভূত বহু কণিকার স্থানিক ও কালগত এক-একটা গড়পড়তা অভিব্যক্তি মাত্র। আগে ধারণা ছিল যে-কোনও কণাসমষ্টির প্রত্যেকটি কণিকার কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থান গতিও গতিবৃদ্ধি হার জানা থাকলেই নিউটনের নিয়ম অনুসারে বা তদাশ্রিত হ্যামিল্টনের নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী যে কোনও সময়ে ঐসব কণিকার অবস্থান, গতি ও গতি-বৃদ্ধি হার নির্ণয় করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এ-ধারণা উল্টে গেছে। এখন প্রমাণিত হয়েছে অবস্থান যতই নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়, গতিবেগের নির্ধারণ ততই ভুল-সঙ্কুল হয়ে পড়ে, আবার গতিবেগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নির্ণয়ের ভুলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রপাতি যতই নির্ভুল হউক না কেন, একটি মাপের নির্ভুলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য মাপটির ভুল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ যেন কোনও অলক্ষ্য শক্তির কারসাজি। প্রকৃতি কিছুতেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মাপজোখ করতে দেবে না।

বৈজ্ঞানিক এখন কয়েকটি বিষয়ে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হলেও অন্যান্য অনেক দিকে তার পর্যবেক্ষণ কেবল শুরু হয়েছে বলা চলে। অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, জৈববিজ্ঞান, প্রজনন-বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বহু দিকে আজকাল সংখ্যাগণিতের সাহায্যে নতুন গবেষণার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে মানবীয় বা জৈবিক খামখেয়ালীর অনিশ্চয়তার মধ্যেও এবং প্রকৃতির খামখেয়ালীর ভিতর থেকেও সমষ্টিগতভাবে, সত্য নির্ধারণ সম্ভব হবে, তার এইভাবে লব্ধ বা উপলব্ধ সত্যের উপর কতখানি প্রত্যয় রাখা যায় তাও নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানের দান অসংখ্য। গাড়ীর চাকা, কৃষিকার্য, রন্ধন, ঔষধপথ্য, নৌকো, বয়নশিল্প, স্থাপত্য, ছাপাখানা, বিজলীবাতি, ষ্টীম-ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, উড়োজাহাজ, এটম বোমা প্রভৃতি উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-জগতে ও জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সংস্পর্শে মানুষের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যে-সব কুসংস্কার বিদূরিত হয়েছে তার উপকারও অসামান্য বলতে হবে। তাই মনে হয়, সুস্পষ্ট "আলোর দিশারী" ও সত্যের সন্ধানী হিসাবে বিজ্ঞানের স্থান সকলের পুরোভাগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

# কবি ও বৈজ্ঞানিক

কবি ও বৈজ্ঞানিক দুইজনই সাধক, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। এ দু'য়ের সাধনা যেমন বিভিন্ন, দৃষ্টি ও সৃষ্টিও তেমনি পৃথক।

কবির দৃষ্টিতে তিনি কেবল বস্তু বা ঘটনা দেখেন না; এ সবের ভিতর দিয়ে কি যেন এক অস্পষ্ট আভাস বা ইঙ্গিত দেখতে পান। সে ইঙ্গিত অনেক সময় সাধারণ মানুষের মনের কল্পনাকেও আলোড়িত ক'রে তোলে, এবং কল্পনা উদ্বুদ্ধও করে। সে কল্পনার ছায়ায় পৃথিবীর চিত্র বেশ স্নিগ্ধ মনোহর উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে। তখন পৃথিবীটা আর আমাদের নিত্য-গোচর পৃথিবী থাকে না—কল্পনার স্বর্গে পরিণত হয়। সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনাকে আশ্রয় ক'রেই গড়ে ওঠে, কিন্তু কবির কাছে তা কিছু কম বাস্তব নয়, আর সাধারণ লোকের মনে যে আনন্দের সৃষ্টি করে, সেটাও কিছু তুচ্ছ ব্যাপার নয়। জড়পিণ্ড সংসারটা প্রাণের স্পন্দনে সচকিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাতে করে কবির সহানুভূতি ও আত্মীয়তার পরিধি শতগুণ বেড়ে যায়।

কবির সত্য শুধু বর্তমানের নয়,—তা অতীতের সুখস্মৃতি উদ্দীপনা করে, আর ভবিষ্যতের অপ্রাপ্ত মোহনীয় যুগের আগমনী জানায়। এই আগমনী সুরের রেশ ধ'রে ধ'রে জগৎ ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এই ভাবে কবি যুগে যুগে জগৎকে পঙ্কিলতা হতে বাঁচিয়ে, সুমার্জিত করে নৈতিক ও মানসিক চেতনার সঞ্চার ক'রে মহাকল্যাণ সাধন করেছেন।

দার্শনিকও নতুন নতুন ভাবের বন্যা এনে জগৎকে ভাবের দিক দিয়ে আরও নিবিড় ক'রে দেখতে শিখিয়েছেন। কিন্তু তিনি অনেকটা কবি-প্রকৃতির হ'লেও কবির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এ যে তিনি কবির মত অত বিপুল ও চিত্তাকর্ষকভাবে লোককে বুঝাতে পারেন না। দার্শনিক সাধারণ লোকের মনের মানুষ বা চিন্তার মানুষ; আর কবি যেন তার ঠিক হৃদয়ের মানুষটি। তাই দার্শনিকের চেয়ে কবির বাণী আরও প্রত্যক্ষভাবে লোকের চিত্ত অধিকার করে।

ওদিকে বৈজ্ঞানিক সচরাচর দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনাকেই বিশেষভাবে পরখ ক'রে দেখতে চান। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়াদির প্রাধান্য নাই। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোনো জিনিস নাই, বৈজ্ঞানিক কোনো দিন এমন কথা বলেন না—কিন্তু তার সম্ভাব্যতা স্বীকার করলেও, তা' নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে ও বিষয়ে চুপ থাকা বা উপেক্ষা করাকেই বেশী বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। তিনি কাজের লোক, যা সামনে আসছে তারই রহস্য নিয়ে ব্যস্ত, মাথা খাটিয়ে রহস্য সৃষ্টি করে আর আপদ বাড়ানো শ্রেয় জ্ঞান করেন না। কিন্তু তাই বলে, নতুন রহস্য যখন সত্যি সত্যিই আসে, বৈজ্ঞানিক সে সময় কস্মিনকালেও উদাসীন থাকেন না। নতুন নতুন রহস্য নির্ণয় ক'রেই তো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক হাজার হাজার সমস্যার সমাধান করতে অপারগ, এ কথা তিনি ভাল রকমেই জানেন। এজন্য তাঁর মনে গর্বের ভাব কখনও আসে না। বৈজ্ঞানিক জানেন, তিনি

অনেক কিছু করেছেন, সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারে অনেক সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি যে অনন্ত কোটি রহস্যের উদ্দেশ পান নাই এবং যে সমস্ত উপস্থিত রহস্যের স্বরূপ নির্ণয় ক'রতে পারেন নাই, তার জন্য অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে সাধনা ক'রে যাচ্ছেন। তিনি নিজের মনে নিজেই সঙ্কুচিত; এর পরও যদি কেউ বলেন, "অমুক সাধারণ ব্যাপারটাই যখন সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক মীমাংসা করতে পারলেন না তখন আর বিজ্ঞানের মূল্য কি?" তা' হ'লে বোধ হয় অনেকখানি অন্যায় ও অবিচার করা হবে।

বৈজ্ঞানিক বস্তু বা ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন, তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে অশ্রদ্ধার সঙ্গে ফেলে দেবার জন্য নয়—তার ভিতরকার সত্যটি আবিষ্কার করে জগতের অন্যান্য সত্যের সঙ্গে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করে যথাযথভাবে গাঁথবার জন্যই। এর জন্য বৈজ্ঞানিকের 'নির্দয়' 'পাষাণ' প্রভৃতি অনেক আখ্যা মিলেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যদি কখনও নিষ্ঠুরও হন, তবু সে সত্য-সুন্দরের জন্য—সে রকম নিষ্ঠুরতার তুলনা বিশ্বস্রষ্টার জাগতিক নিয়মে অনবরতই দেখতে পাচ্ছি।

কবি দেখতে চান জগৎ-ব্যাপারের অতীত সৌন্দর্য, আর বৈজ্ঞানিক দেখতে চান তার অন্তর্নিহিত সত্য। কবির সৌন্দর্য যেমন সত্য, বৈজ্ঞানিকের সত্যও তেমনি সুন্দর। কবির কল্পনা-তুলিকার স্পর্শে মানুষ অতীন্দ্রিয় লোকে উঠে গিয়ে আত্মভোলা হয়ে যায়, আর বৈজ্ঞানিকের পরিমাপরজ্জু তার কল্পনার-ফানুস টেনে ধরে ব'লে আবার তার স্থায়ী আত্মানুভূতি ফিরে আসে। কবি, স্থূল সংসারটাকে অনেকখানি উপেক্ষা ক'রে কল্পলোকের অমৃতের লোভে আকাশে বিচরণ করেন। তাঁর সে বিচরণ নিরর্থক হয় না—তিনি সত্যি সত্যিই কিছু না কিছু অমৃত বা সুধা পান ক'রে জগৎবাসীর জন্যও কিছু নিয়ে আসেন। আবার বৈজ্ঞানিক, পৃথিবীর স্থায়ী প্রাপ্তিকে সর্বদা মুঠোর ভিতর রেখে, নিশ্চিতকে না ছেড়ে, ঐরূপ নিশ্চিত আরও সত্যসুধার সন্ধানে ফেরেন। এখানে তিনিও কল্পনা-প্রিয় দার্শনিকের মত। কিন্তু এঁর কল্পনা প্রধানতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে না—বৈজ্ঞানিকের কল্পনা যেন শরীরী; তাঁর অন্তর বাহিরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জড়জগতের সমস্ত উপাদান দিয়ে তিনি তাঁর কল্পসুন্দরীর মন যোগাচ্ছেন। তার ফলে তিনি সুন্দরী প্রকৃতির কাছ থেকে অতি সঙ্গোপনে যে গোপন রহস্যবাণী শুনতে পাচ্ছেন, তা' সোনার থালায় সাজিয়ে জগজ্জনের সামনে ধরছেন।

জগৎ এজন্য কবি ও বৈজ্ঞানিক দুইজনের নিকটই কৃতজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক না থাকলে কবির কল্পনা, খেয়াল হয়ে ধোঁয়ার মত শূন্যে মিলিয়ে যেত, আর কবিচিত্ত না থাকলে, বৈজ্ঞানিকের সাধনা পৃথিবীর ধূলামাটির মধ্যে মাথা কুটে মরতো।

# অসীমের সন্ধানে

অসীম নীলিমায় যখন তারকাপুঞ্জ স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করিতে থাকে তখন মানব-মন তাহার বিরাট স্তব্ধতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া পড়ে। এইরূপ নির্জন অবসরে যখন মানুষ অনন্তের সঙ্গে মুখোমুখি ভাবে দাঁড়ায়, তখন তাহার আত্মা যেন উর্ধ্বে—বহু উর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং সে আপন অসহায় ক্ষুদ্রতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। তখনই সে হযরত দাউদের মত সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞ চিত্তে জিজ্ঞাসা করে, 'হে বিশ্বনিয়ন্তা প্রভু, মনুষ্য কে যে তুমি তাহার বিষয় চিন্তা করো? এবং মনুষ্যসন্তানই বা কি যে তুমি তাহার প্রতি মনোযোগী হও?'

হযরত দাউদ যদি নৈশ আকাশের বিশালতায় মুগ্ধ হইয়াই উল্লিখিতরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে বর্তমান জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্বজগতের ধারণা যে আরও শত সহস্র গুণ বিশাল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের মনোভাব আমরা কি কথায় ব্যক্ত করিব? চর্মচক্ষে আমরা অতি পরিষ্কার রজনীতেও তিন সহস্রের অধিক নক্ষত্র দেখতে পাই না; কিন্তু সামান্য একটা টেলিস্কোপের সাহায্যেই ইহার বহুগুণ দেখিতে পাই; আর অধুনা যে সমস্ত যন্ত্র দ্বারা বিশাল নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়, তদ্দারা পূর্বেকার কয়েক সহস্রের স্থলে আমরা অন্তত পক্ষে ১০ কোটি তারকার অস্তিত্ব জানিতে পারি।

দূরবীক্ষণ উদ্ভাবনের পূর্বেকার লোকের নিকট দৃশ্যমান জগতের পরিমাণ ও বিস্তৃতি কতটুকুই বা ছিল? চক্ষুর দৃষ্টিসীমার বহির্দেশেও যে কোটি কোটি বিমান-বিহারী নক্ষত্রাদি থাকিতে পারে, এ কথা সাধারণ লোকে কেন, তখনকার দিনে অতি বড় কল্পনাবিলাসী দার্শনিকও ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহারা যতদূর দেখিতে পাইতেন, বিশ্বের আদি ও অন্ত তাহারই মধ্যে নির্দেশিত করিতেন।

মানববুদ্ধির অসম্পূর্ণতার বিষয় বোধ হয় জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা হইতেই সব চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশ্বের সীমা নির্দেশ করিতে সতত অনিচ্ছুক। রাত্রিকালে উজ্জ্বল তারকাখচিত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, যেন অসীম অনন্তের গায়ে উহারা নিস্তব্ধ শান্তিতে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, 'নিশ্চল' তারকা বলিতে একটিও নাই। উহাদের মধ্যে অনেকে পৃথিবীস্থ যে কোন মেলট্রেন হইতে অনেক অধিক দ্রুত গতিতে শূন্যমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে। যাঁহারা জ্যোতিষবিদ্যার সহিত অপরিচিত, তাঁহাদের পক্ষে একথা বিশ্বাস করাই কঠিন যে, পৃথিবী এবং আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করা ছাড়াও, স্বয়ং সূর্য সমেত প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ মাইল বেগে অজ্ঞাত শূন্য প্রদেশে ধাবিত হইতেছে। এই ভ্রমণকার্য কবে আরম্ভ হইয়াছে, বা কবে শেষ হইবে, ইহার কিছুই আমরা জানি না। কয়েক মিনিট পূর্বেই আমরা 'ভেগা' নক্ষত্র হইতে যতদূরে ছিলাম, এখন তদপেক্ষা হাজার হাজার মাইল

নিকটে পৌঁছিয়াছি; হয়তো প্রকৃতির নিয়ম অক্ষুণ্ন থাকিলে দশ বিশ লক্ষ বৎসর পরে বর্তমানে যেখানে 'ভেগা' নক্ষত্র আছে, সেখানে পৌঁছিলেও পৌঁছিতে পারি।

আমাদের চিরপরিচিত সূর্যটি পর্যন্ত এমনি দেখিতে যতটা শান্তশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, বস্তুতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমরা অতি ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের উপরে উঠিয়া যদি দেখিতে পারিতাম, তবে তাহাকে ধূসর বর্ণ না দেখিয়া বরং নীলাভ দেখিতাম; আর ওই নীলবর্ণ গোলকের চতুষ্পার্শে রক্তসমুদ্রের ন্যায় ঘোর লালবর্ণ অগ্নিসমুদ্র দেখিতাম, যাহার গভীরতা পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার মাইলের মধ্যে; আর এই অগ্নিসমুদ্র হইতে সময় সময় জ্বলন্ত বাষ্পরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখিতাম, যাহার উচ্চতা অনুমান লক্ষ মাইল হইবে। সূর্যের এই বিশাল শক্তির প্রকাশ দেখিলে আমাদের মনে হয়তো নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার পরিবর্তে ভীতিবিহ্বলতারই সঞ্চার হইত।

আমরা সূর্য হইতে বার্ষিক যে-পরিমাণ উত্তাপ প্রাপ্ত হই, বিগত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে তাহার বিশেষ কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। এ-জন্য আমরা মনে করি যে চিরকাল এইভাবেই আমরা সূর্য হইতে আলো ও তাপ পাইতে থাকিব। কিন্তু সূর্যোত্তাপের প্রকৃত কারণ বা উৎস কোথায়, এ বিষয়ে যখন এ-পর্যন্ত কিছুই সঠিক জানা যায় নাই, তখন আমাদের এ-ধারণাকে শুধু নির্ভরশীল 'বিশ্বাস' ছাড়া কিছুই বলা যায় না। যে-কোন মুহূর্তে অণুপরমাণুর বিপর্যয় বা অন্যবিধ কারণে যদি সূর্যের উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় তবে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার সম্যক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। সূর্যের উত্তাপ শতকরা দশভাগ কমিয়া গেলেই বর্তমান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল গ্রীনল্যান্ড বা সাইবিরিয়ার ন্যায় তুষারমণ্ডিত হইয়া যাইবে। আধুনিক কালে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে মধ্যে মধ্যে দশ-পাঁচ দিন হঠাৎ সূর্যোত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয়—এবং ইহার পরিমাণও শতকরা দশের কাছাকাছি। কালক্রমে এই আকস্মিক পরিবর্তন স্বাভাবিক ও একমুখী (অর্থাৎ শুধু কমের দিকে বা শুধু বেশির দিকে) হইয়া পড়া বিচিত্র নহে। বৈজ্ঞানিক যদিও উপপত্তিক যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আরও কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া সূর্যের তাপ প্রায় অবিকল এইভাবেই থাকিবে তথাপি আগামী একশত বৎসরের মধ্যেই সূর্যের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাও কেহ স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না।

অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বর্তমান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র তাহাকে নিখিলবিশ্বের সম্বন্ধে সত্য বলিয়া কখনোই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। যে সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা জানি, তাহাদের বিষয়ে আমরা যুক্তির প্রয়োগ করিতে পারি। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এ-যাবৎ যাহা যাহা আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে, তাহা ছাড়াও এমন বহু বিষয় থাকিতে পারে, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং যাহা জানিতে হইলে নূতন নূতন যন্ত্রের বা নূতন নূতন অনুসন্ধান প্রণালীর আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জ্যোতির্বিদগণ নানা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আকাশে যত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, সম্ভবত তদপেক্ষা অধিক অন্ধকার নক্ষত্র বিদ্যমান আছে, এবং আকাশের যে সমস্ত স্থান সম্পূর্ণ অন্ধকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুত তাহা রশ্মিবিহীন পদার্থ কণিকার কুজ্ঝটিকায় পরিপূর্ণ বলিয়া তাহা ভেদ করিয়া দূরবর্তী নক্ষত্রের আলোক আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে না।

ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের সহায়তায় আকাশে এ সব জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহা বৃহত্তম দূরবীক্ষণেরও দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত। বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের এরূপ

বিপুলাকার সহচরের বিষয় জানা গিয়াছে, যেগুলি নিজেরা আলোক বিকিরণে অক্ষম হইলেও সহচর তারকার গতি পরিবর্তিত করিতে সমর্থ। তাহা ছাড়া প্রতিদিন যে সহস্র উল্কাপিণ্ড বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিয়া 'ছুটন্ত তারকা' রূপে আমাদের নয়নগোচর হয় তাহা হইলেও বেশ বুঝা যায় যে নভোমণ্ডলকে 'শূন্যমণ্ডল' না বলিয়া মৃত বা নিষ্প্রভ পদার্থের আধারও বলা যাইতে পারে।

যন্ত্রের উন্নতি ও নব নব অনুসন্ধান প্রণালী উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া নূতন নূতন ব্যাপার আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে। বাস্তবিক, নিখিল জগতের বিশালতা যে আমাদের দৃষ্টিশক্তির দ্বারাই সীমাবদ্ধ নহে, এ-কথা সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণের কাঁচই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা আমরা যে সমস্ত নক্ষত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারি, তাহারা যে শুধু চর্মচক্ষে দৃষ্ট তারকার চেয়ে সংখ্যায় অধিক, তাহা নহে,—সমুদয় নক্ষত্র হইতে আমরা পৃথিবীতে যে-পরিমাণ আলোক পাই, তাহারও অধিকাংশ চক্ষুর অগোচর তারকাদের নিকট হইতেই আসে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিরূপিত হইয়াছে যে সমুদয় নক্ষত্রালোকের তিন-চতুর্থাংশই এই সমস্ত অদৃশ্য নক্ষত্রের দান। অতএব আমাদের দৃষ্টিগোচর বিশ্ব যে সমগ্র বিশ্বের সামান্য একটা অংশ মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আকাশে যে অন্ধকার জ্যোতিষ্ক আছে, তাহা কেমন করিয়া জানা গেল? তাহার কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? ইহার উত্তরে বলিব, প্রমাণ কখনও এক প্রকার নয়। প্রত্যেক জ্যামিতি পাঠকই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা হয়; আবার এগুলির সাহায্য লইয়া মুখ্য ভাবে বা গৌণ-ভাবে অন্যান্য প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা যায়। গৌণ প্রমাণ ও মুখ্য প্রমাণের চেয়ে কম সত্য নহে। জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেইরূপ মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি কয়েকটি জাগতিক নিয়মকে স্বীকার করিয়া লইয়া তৎসাহায্যে পরীক্ষালব্ধ ঘটনা বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। তাহা বুঝাইতে হইলে কতকগুলি অনুমানের প্রয়োজন হয়। এই অনুমান দ্বারা যে-সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা যদি প্রকৃত ঘটনার সহিত হুবহু মিলিয়া যায় এবং বিভিন্ন ঘটনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া যদি একই প্রকার অনুমানের প্রয়োজন হয়, তবে ঐ অনুমানটিকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। গ্যালিলিও সর্বপ্রথম পতনশীল বস্তুর নিয়ম আবিষ্কার করেন; তারপর নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম স্বীকার করিলেই কেবল যে পৃথিবীর নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ভূপতন রহস্য নির্ণীত হয়, তাহা নহে,—বরং ঐ একই নিয়ম দ্বারা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রাদির গতিও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া অন্য প্রমাণে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের ব্যাপকতার দুই একটা নিদর্শন দেওয়াই যথেষ্ট। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপচুন গ্রহ প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু ইহার প্রায় ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদগণ ইউরেনাস গ্রহের গতি-বৈলক্ষণ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে নিকটবর্তী অন্য কোন জ্যোতিষ্কের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবেই ইউরেনাসের সরল গতির কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। শুধু ইহাই নহে। ঐ অদৃশ্য জ্যোতিষ্ক কোন সময় আকাশের ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করে অঙ্ক করিয়া কষিয়া তাহাও নির্ণয় করিয়াছিলেন। যখন গণিতের হিসাবের সঙ্গে নেপচুনের অবস্থান, গতিবিধি সমস্ত মিলিয়া গেল, তখন আর বিস্ময়ের সীমা থাকিল না। সৌভাগ্যক্রমে নেপচুনগ্রহ চর্মচক্ষে অদৃশ্য হইলেও টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা গিয়াছিল।

তাহা না হইলে হয়তো বা গণিতের সিদ্ধান্ত এতদিন পর্যন্ত সন্দেহজনক অদ্ভুত বাক্য মাত্রই থাকিয়া যাইত।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। Dog-star বা স্বাতী-নক্ষত্র আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ইহার গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া দেখা গেল যে ইহা ঠিক সমবেগে সরল পথে চলিতেছে না। বক্রতা অতি সামান্য হইলেও তাহার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত বেসেল ধারণা করিলেন, ইহার নিকটবর্তী কোন অন্ধকার জ্যোতিষ্কের প্রভাবে উহার গতির ঐরূপ ব্যতিক্রম হইতেছে। ইতিপূর্বে অন্য কেহ অন্ধকার তারকার কথা কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু তিনি তৎকালীন প্রধান জ্যোতির্বিদ স্যার জন্ হার্শেলের নিকট লিখিলেন—'আলোকবস্তুর কোন অপরিহার্য ধর্ম নহে। অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্রের অস্তিত্ব দ্বারা ঐরূপ অগণিত অন্ধকার নক্ষত্রের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না।' তিনি বলিলেন যে স্বাতী-নক্ষত্র বাস্তবিক পক্ষে একটি যুগল নক্ষত্র—যাহার এক অংশ উজ্জ্বল, অন্য অংশ অন্ধকার—এবং উভয় অংশ পরস্পর মাধ্যাকর্ষণ-সূত্রে আবদ্ধ। তিনি যখন এই অভিমত ব্যক্ত করেন, তখন ইহা এক প্রকার অবিশ্বাসই ছিল; কিন্তু ইহার বিশ বৎসর পর টেলিস্কোপের সাহায্যেই উক্ত তারকার নিকট একটি ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়। বলা বাহুল্য, ইহাই বেসেল-কথিত সেই অদৃশ্য বা অন্ধকার সহচর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই স্যার জন হার্শেল উজ্জ্বল নক্ষত্রের উজ্জ্বল সহচর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ স্থলেই উভয়ের উজ্জ্বলতার বিলক্ষণ পার্থক্য দেখা যায়। স্বাতী-নক্ষত্র সম্বন্ধে এই পার্থক্য অত্যন্ত অধিক; কারণ এটি নক্ষত্রজগতের উজ্জ্বলতম রত্ন হইলেও ইহার সহচরকে দেখিতে হইলে অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীণের সাহায্য লইতে হয়; কিন্তু গুরুত্ব হিসাবে উক্ত সহচর ইহার প্রায় অর্ধগুণ হইবে।

পূর্বোক্ত বেসেল সাহেব Procyon (প্রসাইয়ন) নক্ষত্র সম্বন্ধেও অনুরূপ যুক্তি দ্বারা বলিয়াছিলেন যে ইহার একটি নিষ্প্রভ সহচর আছে। অর্ধশতাব্দী পরে উক্ত সহচর সর্বপ্রথম প্রফেসর শেবার্লে (Schaeberle) সাহেবের দৃষ্টিগোচর হয় (অবশ্য টেলিস্কোপের সাহায্যে)। ইহার গুরুত্ব আমাদের সূর্যের অর্ধেকের চেয়েও অধিক হইবে।

এ-পর্যন্ত তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, যেখানে জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথমে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার পর টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা গিয়াছে। পূর্ববাণী এইভাবে সফল হইতে দেখিলে অনুরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যখনই কোন নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে উহা ঠিক ঋজুভাবে বা সমবেগে চলিতেছে না, তখনই আমরা অনুমান করিতে পারি, যে উহার নিকটে এক বা একাধিক জ্যোতিষ্ক আছে।

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক নক্ষত্রই অনন্ত আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী হইতে দৃষ্ট এই গতি অতি সামান্য হইলেও অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। এই কারণ আর কিছুই নহে, নিকটবর্তী কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ।

কিন্তু যে-সমস্ত নক্ষত্র ঠিক পৃথিবীর দিকে বা তদ্বিপরীত দিকে অগ্রপশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের গতি-বৈলক্ষণ্য তো এ-উপায়ে ধরা যাইবে না। কারণ, ঊর্ধ্বাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনন্তের বুকে যে-নীলবর্ণ গোলোকের অর্ধাংশ দ্বারা আমাদের দৃষ্টি

প্রতিহত হয়, নক্ষত্ররাশিকে দৃশ্যত তাহারই উপর প্রক্ষিপ্ত বা উহার গাত্র সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। এজন্য পৃথিবী হইতে একই সরলরেখায় দুটি নক্ষত্র থাকিলে তাহাদিগকে যেমন একটি বলিয়াই বোধ হইবে, তেমনি কোন নক্ষত্র যদি বিভিন্ন সময় ঐ সরলরেখার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে তবে উক্ত গোলোকের উপর তাহার অবস্থানের কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইবে না।

যাহা হউক, এইরূপ অগ্রপশ্চাৎ গতি নির্ণয় করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। জ্যোতির্বিদের হস্তে spectrometer বা আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্র সঙ্গীত-বিদ্যার সুর-সপ্তকের ন্যায় কাজ করে। যেরূপ কোন শব্দায়মান বস্তু শ্রোতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে তাহার সুর কিঞ্চিৎ তীব্র হয় এবং পশ্চাদপসরণ করিতে থাকিলে একটু কোমল হয়, ঠিক সেইরূপ তারকার অগ্রপশ্চাৎ গতির সঙ্গে সঙ্গে আলোক-সপ্তকের সুরও একটু ওঠা-নামা করে,—অর্থাৎ পৃথিবী ও তারকার ব্যবধান কমিতে থাকিলে বিশ্লেষণ-যন্ত্রের আলোক-রেখাগুলি একটু ভাইওলেটের দিকে এবং ব্যবধান বাড়িতে থাকিলে লোহিতের দিকে সরিয়া আসে। এই যন্ত্র দ্বারা সুদূর নক্ষত্র—যাহার দুরত্ব হয়তো নির্ণয় করা যায় না—তাহাও সেকেন্ডে কত মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতেছে, এ-কথা প্রায় ঠিক বলিয়া দেওয়া যায়।

সর্বপ্রথম জন গুডরিক নামক এক যুবক এইরূপ একটি জ্যোতিষ্কের বিষয় কল্পনা করেন। এই ব্যক্তি জন্মাবধি মূক ও বধির হইয়াও দৃষ্টিশক্তির এরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ইয়র্ক শহরের একটি ক্ষুদ্র মানমন্দিরে বসিয়া যে-সমস্ত মূল্যবান গবেষণা করেন, তাহার ফলে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটির উচ্চতম সম্মানস্বরূপ তাঁহাকে 'কপ্‌লি' মেডেল প্রদান করা হয়।

'আল্‌গল' নামক একটি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে ইনিই সর্বপ্রথম ধারাবাহিকরূপে ও শৃঙ্খলার সহিত পরীক্ষা করেন। এই নক্ষত্র উজ্জ্বলতায় প্রায় ধ্রুবতারার সমান। কিন্তু প্রায় আড়াই দিন পর হঠাৎ ইহার আলো কমিয়া গিয়া সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে ইহার উজ্জ্বলতার তিনভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; এবং ইহার প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে পূর্ব উজ্জ্বলতা ফিরিয়া আসিয়া আবার ৫৯ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। এই সমস্ত পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় এরূপ নিয়মিতভাবে ঘটিয়া থাকে যে কোন বৎসর কোন সময় আল্‌গলের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইবে, তাহা পূর্ব হইতেই গণনা করিয়া খসড়া বদ্ধ করিয়া রাখা যায়। এইরূপ একখানা খসড়া সঙ্গে রাখিলে নাবিকগণ 'সামুদ্রিক' পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতিরেকেও আল্‌গলের ম্লানিমা লক্ষ্য করিয়া ঘড়ি ঠিক করিয়া লইতে পারেন।

আল্‌গলের জ্যোতির্হ্রাসের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া গুডরিক অনুমান করেন যে, কোন অন্ধকার জ্যোতিষ্ক ইহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সময় সময় আল্‌গল ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী হওয়াতেই ঐ নক্ষত্রের আংশিক 'গ্রহণ' হয়। তবে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের ন্যায় কোন কালো ছায়া ইহার উপর দিয়া যাইতে দেখা যায় না। তাহার কারণ নক্ষত্রগণ এতদূরে অবস্থিত যে কোন টেলিস্কোপ দ্বারাই উহাদিগকে গ্রহাদির ন্যায় আকারে বৃহত্তর করিয়া দেখা যায় না—সর্বদাই সূক্ষ্ম বিন্দুরূপেই দেখা যায়। যাহা হউক, গুডরিকের প্রস্তাবিত থিওরি পণ্ডিত সমাজে সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত হইলেও ইহার শতাব্দীকালের মধ্যে ইহার অন্য কোন সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই;—তারপর Spectrometer দ্বারা ইহার গৌণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে আলগলের নিকট বাস্তবিকই কোন অদৃশ্য জ্যোতিষ্ক আছে, তবে গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে ঐ নক্ষত্রদ্বয় উহাদের সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে দোদুল্যমান থাকিবে—অর্থাৎ অন্ধকার নক্ষত্রটি যখন পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইবে, তখন আলগল অপসৃত হইবে, এবং উহা অপসৃত হইলে আলগল অগ্রসর হইবে। সুতরাং গুডরিকের অনুমান সত্য হইলে আলগলের জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধিকালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই নক্ষত্র অগ্রপশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে বাধ্য।

বাস্তবিক আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্রের পরীক্ষায় আলগলের ঠিক এই প্রকার গতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রফেসর 'ভগেল' পট্‌সডাম মানমন্দির হইতে পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে আলগলের জ্যোতি হ্রাস হইবার পূর্বে ইহা প্রতি সেকেন্ডে ২৪ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয়, এবং গ্রহণ শেষ হইবার পর ২৮ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয়। ইহার গতি গড়ে ২৬/২৭ মাইল ধরিয়া লইয়া কোন গ্রহণ হইতে পরবর্তী গ্রহণের মধ্যে ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে মোট কতদূর পথ চলে, তাহা জানা যায়। তাহা হইতে উক্ত কক্ষের ব্যাস নির্ণয় করা যায়। এই সমস্তের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে আলগলের সহচর প্রায় সূর্যের সমান, এবং আলগল স্বয়ং সূর্যাপেক্ষা কিছু বৃহত্তর।

এই অন্ধকার, নক্ষত্রটিকে কখনও দেখা যায় নাই, হয়তো যাইবেও না। তথাপি জ্যোতির্বিদগণ ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন না। বাস্তবিক Spectroscope এর প্রমাণ বা সাক্ষ্য সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। প্রায় বিশটি নক্ষত্র দেখা গিয়াছে, যাহাদের আলো আলগলের ন্যায় কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত, কখনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি করিয়া সহচর আছে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু আলগল বা তদনুরূপ নক্ষত্রের সহচরগণ সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী এবং উল্লিখিত নক্ষত্রগণের ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়াতেই নিরূপিত সময় অন্তে আমরা আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাই। যদি উহারা একটু পাশ কাটাইয়া অর্থাৎ একটু ঊর্ধ্ব-নিম্ন বা দক্ষিণ-বাম দিয়া চলিয়া যাইত, তবে আমরা আলোকের কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিতে পাইতাম না। বস্তুত অন্ধকার নক্ষত্র উজ্জ্বল নক্ষত্রের চতুর্দিকে যে কোন সমতলে ভ্রমণ করিতে পারে; এবং তাহা পৃথিবীর কক্ষপথের সহিত যে কোন কোণে হেলিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ সমস্ত নক্ষত্রের গ্রহণ কেবল তখনই দেখিতে পাইব, যখন এই দুই সমতল পরস্পর মিলিয়া যাইবে, কিংবা তাদের ভিতর কৌণিক ব্যবধান সামান্য মাত্র থাকিবে।

সুতরাং শুধু ঔজ্জ্বল্যের অসমতা দৃষ্টে আমরা সমুদয় অন্ধকার সহচরের সন্ধান পাইতে পারি না। তবে সুখের বিষয়, উপরোক্ত দুইটি সমতলের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান একটু বেশি হইলেও আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা আমরা উজ্জ্বল নক্ষত্রটির অগ্রপশ্চাৎ গতি অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারি। অতএব দেখা যাইতেছে, আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্রের আবিষ্কার এবং উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষিক গবেষণার এক নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যে-সমস্ত নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে Spica (স্পাইকা) নক্ষত্র অন্যতম। ইহার আলগলের ন্যায় একটি অন্ধকার-সঙ্গী আছে বটে, কিন্তু ইহার আলোকের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। Spectroscope এর পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে প্রায় ৪ দিনে একবার করিয়া ইহা পৃথিবীর নিকটবর্তী হয় ও দূরে সরিয়া যায়। সুতরাং ইহার নিশ্চয়ই একটি সহচর আছে। এই

সহচর হয়তো সম্পূর্ণ অন্ধকার, কিংবা উজ্জ্বল হইলেও স্পাইকার এত নিকটবর্তী যে সর্বোৎকৃষ্ট টেলিস্কোপ দ্বারাও উহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা যায় না। কিন্তু নিষ্প্রভই হউক, আর ক্ষীণপ্রভই হউক, এ-কথা নিশ্চিত যে এতদিন ধরিয়া যে-নক্ষত্রটিকে একক বলিয়া মনে করা হইত, বাস্তবিক পক্ষে তাহা যুগল এবং তাহার সহচরটি যেন আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে।

উত্তর-নক্ষত্র বা ধ্রুবতারার গতি দৃষ্টেও জানা যায় যে তাহা নিকটবর্তী এক বা একাধিক নক্ষত্র দ্বারা আকর্ষিত হইতেছে। প্রায় ৪ দিনে একবার করিয়া ইহার অগ্র-পশ্চাৎ গতিসম্পন্ন হয়। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে যুগ্ম নক্ষত্র। অধিকন্তু এই নক্ষত্রযুগল আবার উভয়ে অন্য এক নক্ষত্রের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, এরূপ লক্ষণ দেখা গিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে যুগল নক্ষত্র না বলিয়া ত্রয়ীনক্ষত্র বলিতে হইবে। এ-যাবৎ পরীক্ষিত সমুদয় তারকার আনুমানিক তৃতীয়াংশ তারকার নিকটেই একটি করিয়া অন্ধকার নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইলে হয়তো টেলিস্কোপের ক্ষমতার বহির্ভূত বহুসংখ্যক জ্যোতিষ্কের বিষয় জানা যাইবে। বর্তমানে যে পর্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতেই আমরা এক বিশাল অন্ধকার জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছি। ভবিষ্যতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অন্ধকার নক্ষত্রও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হইবে।

Spectroscope দ্বারা আলোকহীন নক্ষত্রের বিষয় জানা যায়। ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও শূন্যমণ্ডলে অন্ধকার পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। টেলিস্কোপ এবং ক্যামেরা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে আকাশের যে-সমস্ত অংশ সম্পূর্ণ শূন্য এবং অন্ধকার বলিয়া মনে হয়, তাহাও অনেকস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুখচিত, কিন্তু যন্ত্র ছাড়া শুধু চক্ষে উহাদিগকে দেখা অসম্ভব। অনেকস্থলে ফটোগ্রাফিক রাসায়নিক চক্ষুতেও হয়তো প্রথমত কিছুই দেখা যায় না। পরে ঘণ্টাখানেক বা তদূর্ধ্বকাল পর্যন্ত আলোকসম্পাত হইতে দিলে অনবরত ক্ষীণ রশ্মির সমবেত প্রভাবে বুঝা যায়, শূন্যের অন্ধকার কোণেও কিছু আলো আছে বটে। এই উপায়ে মানবচক্ষুর অগোচর বহুসংখ্যক তারকা এবং আলোক-পদার্থের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে।

আকাশ পর্যবেক্ষণের নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয়তো আরও নূতন নূতন জগতের সন্ধান পাইব। আমাদের দৃশ্যমান জগতেই টেলিস্কোপ এবং ক্যামেরার সাহায্যে প্রায় এক বৃন্দ বা শতকোটি তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; হয়তো আমাদের এই জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র ইহা ছাড়া আর অধিক নাই। এরূপ মনে করিবার হেতু এই যে নভোমণ্ডলের নানাস্থানের যে-সমস্ত আলোক চিত্র লওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, খুব উৎকৃষ্ট (sensitive) প্লেটে দীর্ঘকাল রশ্মিপাত করিলেও (exposure দিলেও) এক নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত তারকা বা আলোকপদার্থের ছাপ পড়ে না। তাহাতেই মনে হয়, সম্ভবত আমাদের দৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের পরিসর এবং সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা একপ্রকার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি।

মানববুদ্ধি যুগ-যুগান্তর সাধনার ফলে আমাদের এই দৃশ্যমান জগতের সমগ্র অংশই ধারণায় আনিতে পারে। কিন্তু 'অসীম' তাহার ধারণার বহির্ভূত। আমাদের সসীম অন্তঃকরণ দ্বারা নক্ষত্রদিগের দূরত্ব সম্বন্ধেই যখন আমরা কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি না, তখন এই লক্ষ লক্ষ যোজনের উপরেও যে অনন্ত শূন্যমণ্ডল পড়িয়া আছে, তাহার বিস্তার সম্বন্ধে কিরূপে ধারণা করিব? অনেক ক্ষীণ নক্ষত্র হইতে আমরা এখন যে আলো পাইতেছি, তাহা

হয়তো পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিতে শত শত বৎসর লাগিয়াছে; অথচ এতকাল ধরিয়া প্রত্যেক সেকেন্ডে ঐ আলো এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার (১,৮৬,০০০) মাইল ভ্রমণ করিয়া তবে এখানে পৌঁছিয়াছে। অনেক নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে উহাদের যে-আলো আজ পৃথিবীতে আসিল, তাহা হয়তো হযরত আদমের জন্মের সময় ঐ নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা যে নক্ষত্রালোকের বিষয় অবগত আছি, তাহার সম্পূর্ণ পরপারে কি ইহার চেয়ে উজ্জ্বলতর এবং মহিমময় নক্ষত্র থাকিতে পারে না, যাহার আলো হয়তো এ-যাবৎকাল আমাদের পৃথিবীতে আসিয়াই পৌঁছে নাই?

আমাদের দৃশ্যমান জগতের বহির্দেশে অন্য জগৎ থাকিলেও সে বিষয় বর্তমানে আমরা কেবল কল্পনাই করিতে পারি। কিন্তু আমাদের পরিচিত এই জগতেই যথেষ্ট অন্ধকার বস্তু রহিয়াছে, যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা মাত্র সেদিন জ্ঞানলাভ করিয়াছি। অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইতেছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে নভোমণ্ডলে বিশাল মেঘের ন্যায় স্তূপীকৃত Cosmic dust (বিশ্ব-ধূলিকা), এবং বহু সংখ্যক অন্ধকার গোলোক আছে, যাহা কস্মিন্‌কালে দেখাও যাইবে না, ফটোতেও উঠিবে না। নীহারিকার যে সমস্ত অংশ চক্ষু কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে দেখা যায়, তাহা খুব সম্ভব বিশ্ব-ধূলিকার ঘনীভূত অংশ হইতে উত্থিত জ্বলন্ত বাষ্প মাত্র।

সুতরাং আমরা যাহা দেখিতে পাই বা যাহার আলোকচিত্র গ্রহণ করি, তাহা সমগ্র নীহারিকার একটি অংশ মাত্র। যুগযুগের পরিবর্তন বা বিবর্তনের ফলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘূর্ণমান পদার্থ-কণিকা আকৃতিবিশিষ্ট হয়। পরে উহা সংকুচিত হইবার কালে উহা হইতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া নক্ষত্রের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত নক্ষত্র আমাদের সৌরজগতের ন্যায় এক একটি গ্রহ-উপগ্রহ বেষ্টিত জগতের জনয়িতা। সর্বপ্রথম অন্ধকার পদার্থ-কণিকার পিণ্ড; তৎপর উত্তাপ ও তড়িতালোকিত বাষ্পরাশির ঈষদোজ্জ্বল ভাতি; অতঃপর অত্যুষ্ণ তারকা, যাহার উত্তাপে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই শুধু দ্রবীভূত নহে, বাষ্পাকারে পরিণত হইতে পারে; অতঃপর আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বর্তুল, যাহার উপরিভাগে কঠিন পদার্থের স্তর, কিন্তু অভ্যন্তরে মেরুদণ্ড-স্বরূপ দ্রবীভূত পর্বত বা ধাতব পদার্থ বিরাজমান; পরিশেষে যন্ত্রের ন্যায় একটি মৃতপ্রায় তুষারাবৃত ভ্রাম্যমাণ গোলোক,—এই বোধ হয় অনন্ত আকাশরাজ্যে ক্রমবিকাশের ধারা।

জ্ঞানপিপাসু মানবমন ক্রমাগত চেষ্টার ফলে জ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। সে জানে যে তাহার জানিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তথাপি সে আকাশমণ্ডলের আশ্চর্য ঘটনা ও নিদর্শনাদি দেখিয়া তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সচেষ্ট। সে দৃশ্যমান জগৎকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া আকৃতিবিহীন কুজ্ঝটিকা হইতে পরিণত নক্ষত্রের এবং পরিণত নক্ষত্র হইতে মৃতকল্প অন্ধকার জ্যোতিষ্কের সৃষ্টিরহস্য আলোচনা করিতেছে।

অনন্ত জগতের চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধি কেন, কল্পনাও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। স্বপ্নরাজ্যও এই বিশাল, অসীম, মহান অনন্তকে ধারণা করিতে অক্ষম। এ বিষয়ে জাঁ পল্ রিখটার (Jean Paul Richter)-এর লিখিত একটি চমৎকার স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে। কোন ব্যক্তিকে আকাশের জ্যোতিষ্কের ভিতর লইয়া গিয়া অনন্ত ছায়াসমুদ্রের ভিতর দিয়া জগতের পর জগৎ দেখানো হইল। অবশেষে সম্মুখবর্তী অসীমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল।

তখন সে হৃদয়াবেগে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিল, 'স্বর্গীয় দূত, ক্ষান্ত হও। আমি আর অগ্রসর হইতে পারি না—এই "অনন্তের" সম্মুখে আমার চিত্ত ব্যথিত, পীড়িত। বিশ্বপিতার অপার মহিমা অসহনীয়। আমাকে এখন অন্তত, উন্মুক্ত, ব্যাপ্তির নির্যাতন হইতে রক্ষা করো—আমি যে ইহার কোন শেষ দেখিতেছি না।' তখন স্বর্গীয় দূত তাহার উজ্জ্বল হস্তের সংকেতে ঐ আকাশের মহাকাশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'বিশ্বস্রষ্টার জগতের অন্ত কোথাও নাই; আর ঐ দিকে দেখো, ইহার আদিও নাই।'

এবং নক্সা তৈয়ার করেছিলেন। পরে যখন গণিতের হিসাবের সঙ্গে নেপচুনের অবস্থান ও গতিবিধি সব মিলে গেল, তখন আর সিদ্ধান্তের ঠিক হওয়া না জ্যোতিষশাস্ত্রে নেপচুন গ্রহ চর্ম-চক্ষে অদৃশ্য হ'লেও টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা গিয়েছিল। তা' না হ'লে হয়ত ঐ গণিতের সিদ্ধান্ত এতদিন পর্যন্ত সন্দেহজনক অদ্ভুত রচনা-রূপেই থেকে যেত।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। Dog star বা স্বাতী-নক্ষত্র আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা। এর গতি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা গেল, এটা ঠিক সহজভাবে সরল পথে চলছে না। পথ-চ্যুতি অতি সামান্য হ'লেও তার একটা কারণ নিশ্চয়ই থাকবে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত বেসেল (ঊনবিংশ শতাব্দী) ধারণা করলেন, নিকটবর্তী কোনও অন্ধকার জ্যোতিষ্কের প্রভাবেই গতির এরূপ ব্যতিক্রম হচ্ছে। এর পূর্বে অন্য কেউ অন্ধকার তারকার কথা কল্পনাও করেননি। কিন্তু তিনি তৎকালীন প্রধান জ্যোতির্বিদ্ স্যার জন হার্শেলের কাছে লিখলেন—'আলোকবত্ত্ব কোনও অপরিহার্য ধর্ম নয়। অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্রের অস্তিত্ব দ্বারা ঐরূপ অগণিত অন্ধকার নক্ষত্রের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না।' তিনি বললেন, স্বাতী-নক্ষত্র বাস্তবিক পক্ষে একটি যুগল নক্ষত্র— যার এক অংশ উজ্জ্বল, অপর অংশ অন্ধকার—এবং উভয় অংশ পরস্পর মাধ্যাকর্ষণ-সূত্রে আবদ্ধ। তিনি যখন এই অভিমত ব্যক্ত করেন, তখন এ-প্রকার ধারণা একরকম অবিশ্বাস্যই ছিল; কিন্তু এর ২০ বৎসর পরে বৃহৎ টেলিস্কোপের সাহায্যে উক্ত তারকার নিকট একটা ক্ষীণ-প্রভ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়। বলাবাহুল্য, এ-টাই 'বেসেল' কথিত সেই অদৃশ্য বা অন্ধকার সহচর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই স্যার জন হার্শেল উজ্জ্বল, নক্ষত্রের উজ্জ্বল সহচর আবিষ্কার করেছিলেন। অধিকাংশ স্থলেই উভয়ের উজ্জ্বলতার বিলক্ষণ পার্থক্য দেখা যায়। স্বাতী-নক্ষত্র সম্বন্ধে এই পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। কারণ, এটি নক্ষত্র-জগতের উজ্জ্বলতম বস্তু হ'লেও এর সহচরকে দেখতে হ'লে অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীণের দরকার হয়। কিন্তু ওজন হিসাবে উক্ত সহচর স্বাতী-নক্ষত্রের প্রায় অর্ধেক হবে। পূর্বোক্ত বেসেল সাহেব প্রসাইয়ন (Procyon) নক্ষত্র সম্বন্ধেও অনুরূপ যুক্তি দ্বারা বলেছিলেন, এর একটা নিষ্প্রভ সহচর আছে। অর্ধ শতাব্দী পরে উক্ত সহচর সর্বপ্রথম প্রফেসর শেবার্লে (Scheeberle) সাহেবের দৃষ্টিগোচর হয় (অবশ্য টেলিস্কোপের সাহায্যে), এর ওজন আমাদের সূর্যের ওজনের অর্ধেকের চেয়েও কিছু বেশী হবে।

এ-পর্যন্ত তিনটে দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'য়েছে, যেখানে জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথমে আনুমানিক সিদ্ধান্ত ক'রে পরে পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছে। পূর্ববর্তী এইভাবে সফল হ'তে দেখলে অনুরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিও আমাদের প্রত্যয় দৃঢ় হয়। যখনই দেখা যায়, কোনও নক্ষত্রের গতি স্বাভাবিক প্রত্যাশিত গতি থেকে কিছুটা ভিন্ন, তখনই আমরা অনুমান করতে পারি যে, ওর নিকটে এক বা একাধিক জ্যোতিষ্ক রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে নক্ষত্রের অবস্থানের তুলনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক নক্ষত্রই আকাশ-পথে ভ্রমণশীল। পৃথিবী থেকে দৃষ্ট এই গতির কৌণিক পরিমাণ খুব সামান্য হ'লেও মনে করা যেতে পারে, এর কোনরূপের কিছু কারণ থাকবেই, আর সে কারণ সাধারণতঃ নিকটেই অপর জ্যোতিষ্কের অবস্থান, এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ।

কিন্তু যেসব নক্ষত্র ঠিক পৃথিবীর গতির সঙ্গে সমান্তরভাবে বা তার ঠিক বিপরীত দিকে আপাততঃ ভ্রমণ করছে, তাদের গতি কৌণিক ব্যবধান দিয়ে ধরা যাবে না, কারণ সেগুলো

সর্বদাই একই সরলরেখায় রয়েছে। যাহোক, একই সরল রেখায় অগ্রপশ্চাৎ গমনকারী নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করবারও উপায় রয়েছে। জ্যোতির্বিদের হাতে আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্র (Spectrometer বা Spectroscope) সঙ্গীতবিদ্যার সুর-সপ্তকের মত কাজ করে। কোনও শব্দকারী বস্তু শ্রোতার দিকে সমান বেগে অগ্রসর হ'তে থাকলে যেমন তার স্বরটা কিঞ্চিৎ উঁচু বা চড়া হয়, আর অপসরণ করতে থাকলে তার স্বরটা একটু নম্র হয় বা খাদে নেমে যায়, ঠিক সেইভাবে তারকার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আলোকতরঙ্গের সুর বা কম্পন-সংখ্যাও (Frequency) একটু ওঠা-নামা করে; অর্থাৎ পৃথিবী ও তারকার মধ্যেকার দূরত্ব কমতে থাকলে স্পেকট্রোস্কোপে দৃষ্ট আলোক বর্ণালীর রেখাগুলো একটু ভায়োলেটের দিকে, আর অন্তর্বর্তী দূরত্ব কমতে থাকলে একটু লোহিতের দিকে সরে আসে। এই সামান্য সূত্র ধরেই, কোনও সুদূর নক্ষত্র—যার দূরত্বও হয়ত নির্ণয় করা যায় না—তা-ও সেকেন্ডে কত মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে বা পৃথিবী থেকে অপসৃত হচ্ছে, তা' প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। এতে যে তত্ত্বটা ব্যবহৃত হয় তাকে পদার্থবিদ্যায় (Doppler's Principle) বা ডপলারের নিয়ম বলা হয়।

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকের একটা বিশিষ্ট গুণ। এইরূপ একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন জন্ গুডরিক। ইনি মূক ও বধির হয়েও দৃষ্টি-শক্তির সার্থক ব্যবহার করেছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়; কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ইয়র্কশায়ারের মানমন্দিরে বসে যেসব মূল্যবান গবেষণা করেন তজ্জন্য ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল সোসাইটির উচ্চতম সম্মানস্বরূপ তাঁকে 'কপ্লি' মেডেল প্রদান করা হয়। 'আলগল' (Algol) নামক একটা নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে ইনিই সর্বপ্রথম ধারাবাহিক শৃঙ্খলার সাথে পরীক্ষা করেন। এই নক্ষত্র উজ্জ্বলতায় প্রায় ধ্রুবতারার সমান। কিন্তু প্রায় আড়াই দিন পর হঠাৎ এর আলো কমে গিয়ে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই এর উজ্জ্বলতা পূর্ব উজ্জ্বলতার এক-তৃতীয়াংশ ($^1/_3$) হ'য়ে পড়ে; এবং এর সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে আবার এর পূর্ব উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। তারপর আবার আড়াই দিন (৫৯ ঘণ্টা) কাল স্থায়ী হয়। এইসব পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে ঘড়ির কাঁটার মত এমন নিয়মিতভাবে ঘটে যে, কোন্ সময় আলগলের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাবে, তা' পূর্ব থেকেই গণনা করে রাখা যায়। এমন একখানা ঘড়ি রাখলে নাবিকগণ সামুদ্রিক পঞ্জিকার (Nautical almanac-এর) সাহায্য ব্যতিরেকেও আলগলের ম্লানিমা লক্ষ করে ঘড়ি ঠিক করে নিতে পারেন।

আলগলের জ্যোতিহ্রাসের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে গুডরিক অনুমান করেন যে, কোনও অন্ধকার জ্যোতিষ্ক এর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সময় সময় আলগল ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে এসে পড়লেই ঐ নক্ষত্রের আংশিক 'গ্রহণ' (eclipse) হয়। তবে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণের মত কোনও ছায়া এর উপর দিয়ে যেতে দেখা যায় না। এর কারণ নক্ষত্রগুলো এতই অধিক দূরে অবস্থিত যে আমাদের পৃথিবীতে স্থাপিত কোনও টেলিস্কোপ দিয়েই সৌরমণ্ডলের মত আকারে সুস্পষ্ট করে দেখা যায় না—সর্বদাই সূক্ষ্ম বিন্দুরূপেই দেখা যায়। যা-হোক গুডরিকের প্রস্তাবিত থিওরী পণ্ডিতসমাজে সাদরে গৃহীত হ'লেও, শতাব্দীকালের মধ্যেও এর জন্য কোনও সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তারপর স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে এর চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে আলগলের নিকট সর্বদাই কোনও অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আছে, তা' হলে জ্যোতিষ-বিদ্যার নিয়ম অনুসারে

ঐ নক্ষত্র ও তার সহচর এদের সাধারণ ভর-কেন্দ্রের চারদিকে দোদুল্যমান থাকবে, অর্থাৎ অন্ধকার সহচরটা যখন পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হবে তখন আলগল অপসৃত হবে, এবং যখন সহচর অপসৃত হবে তখন আলগল অগ্রসর হবে। সুতরাং ওঠানামার অনুপাত সমতা রেখে আলগলের জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সহচর অগ্র-পশ্চাৎ ভ্রমণ করতে বাধ্য। বস্তুবিক, আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রের পরীক্ষায় আলগল ও সহচরের ঠিক এই প্রকার গতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক 'ভগেল' পটসডাম মানমন্দির থেকে পরীক্ষা নির্ণয় করেছেন যে আলগলের জ্যোতি হ্রাস হবার পূর্বক্ষণে এটা সেকেণ্ডে ২৪ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয়, এবং গ্রহণ শেষ হবার পর সেকেণ্ডে ২৮ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয়। তাই এর আপেক্ষিক বেগ গড়ে ২৭/২৮ মাইল ধরে যে-কোনও গ্রহণ থেকে পরবর্তী গ্রহণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভর-কেন্দ্রের চতুর্দিকে কতদূর পথ চলে, তা হিসাব করা যায়। এর থেকে উক্ত কক্ষের ব্যাস নির্ণয় করে জানা গেছে যে, আলগলের সহচর প্রায় সূর্যের সমান এবং আলগল স্বয়ং সূর্যের চেয়ে কিছু বৃহত্তর।

এই অন্ধকার নক্ষত্রটাকে কখনও দেখা যায়নি, হয়ত যাবেও না। তবু জ্যোতির্বিদেরা এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন না। বস্তুতঃ স্পেকট্রোস্কোপের প্রমাণ বা সাক্ষ্য সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেছেন, তাঁদের মনে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রায় ২০টা নক্ষত্র দেখা গেছে (১৯১০ সাল পর্যন্ত) যাদের আলো আলগলের আলোর ন্যায় কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত, কখনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এদের প্রত্যেকটির একটি করে সহচর আছে বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু আলগল বা তদনুরূপ নক্ষত্রেরা সহচরগণ-সহ সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর কেন্দ্রের গতির সঙ্গে সমসূত্রে এসে পড়াতেই নিরূপিত সময় অন্তর আমরা আলোকের বাড়তি-কমতি দেখতে পাই। কিন্তু ওরা যদি একটু পাশ কাটিয়ে একটু ঊর্ধ্ব-নিম্ন বা বাম-দক্ষিণ দিয়ে সরে যেত তা'হলে আমরা আলোক বর্ধনীর কোনও বৈলক্ষণ্যই দেখতে পেতাম না। বস্তুতঃ অন্ধকার নক্ষত্রগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের চতুর্দিকে যে-কোনও সমতলে ভ্রমণ করতে পারে, এবং তারা পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে যে-কোনও কোণে হেলে চলতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত নক্ষত্রের গ্রহণ কেবল তখনই দেখা যাবে যখন এই দুই সমতল পরস্পর মিলে যাবে, কিংবা তাদের ভিতরকার কৌণিক ব্যবধান সামান্য মাত্র থাকবে।

সুতরাং শুধু ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যের অসমতা দৃষ্টে সমুদয় অন্ধকার সহচরের সন্ধান পেতে পারিনে; তবে সুখের বিষয়, উপরোক্ত দুটো সমতলের কৌণিক ব্যবধান একটু অধিক হলেও আমরা উজ্জ্বল নক্ষত্রটার অগ্র-পশ্চাৎ গতি অন্য উপায়েই নির্ণয় করতে পারি। অতএব, আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্রের আবিষ্কার ও উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ সংক্রান্ত গবেষণার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। এর সাহায্যে যেসব নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা গেছে, তাদের মধ্যে Spica (স্পাইকা) অন্যতম। এটাও আলগলের মত একটা সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও এর আলোকের বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায় না। তবে স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে শুধু একটু জানা গেছে যে, ৪ দিনে একবার করে এটা পৃথিবীর নিকটবর্তী হয় ও দূরে সরে যায়; সুতরাং এর নিশ্চয়ই একটা সহচর আছে, এই সহচর হয়ত সম্পূর্ণ অন্ধকার অথবা উজ্জ্বল হলেও স্পাইকার এত নিকটবর্তী যে সর্বোৎকৃষ্ট টেলিস্কোপ দিয়েও ওদের স্বতন্ত্র করে দেখা যায় না। কিন্তু [illegible] থেকে, একথা নিশ্চিত যে, একদিন হয়ত যে নক্ষত্রটিকে

নিযুত অবগত আছি, তার সম্পূর্ণ পরপারে কি এরচেয়েও উজ্জ্বলতর ও বৃহত্তর নক্ষত্র থাকতে পারে না, যার আলোক হয়ত এযাবৎ আমাদের পৃথিবীতে এসেই পৌঁছে নাই?

আমাদের দৃশ্যমান জগতের বাইরে অন্য জগৎ থাকলেও সে বিষয়ে বর্তমানে আমরা কেবল কল্পনাই করতে পারি। কিন্তু আমাদের পরিচিত এই জগতেই ঢের অন্ধকার বস্তু রয়েছে, যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা মাত্র সেদিন জানতে পেরেছি। অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হচ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি যে, আকাশমণ্ডলে বিশাল মেঘের মত স্তূপীকৃত বিশ্বধূলিকা (Cosmic dust) রয়েছে, এবং বহু সংখ্যক অন্ধকার গোলক আছে যাদের কোনও দিন দেখাও যাবে না, ফটোতেও তোলা যাবে না। নীহারিকার যেসব অংশ চক্ষু বা ক্যামেরার সাহায্যে দেখা যায়, তা' হয়ত বিশ্বধূলিকার ঘনীভূত অংশ থেকে উত্থিত জ্বলন্ত বাষ্পমাত্র।

সুতরাং আমরা যা দেখতে পাই বা যার আলোক-চিত্র গ্রহণ করি, তা' সমগ্র নীহারিকার একটা অংশমাত্র। যুগ-যুগের পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থ-কণিকা আকৃতিবিশিষ্ট হয়। পরে এই আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুপিণ্ড সঙ্কুচিত হবার সময় তার থেকে কিয়দংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে নক্ষত্রের সৃষ্টি করে। এইসব নক্ষত্র আমাদের সৌরজগতের মত এক একটা গ্রহ-উপগ্রহসমন্বিত জগতের জনয়িতা। সর্বপ্রথম অন্ধকার পদার্থ-কণিকার পিণ্ড, তারপর উত্তাপ ও তড়িতালোকিত বাষ্পরাশির দীপ্তোজ্জ্বল জ্যোতি; তারপর অত্যুষ্ণ তারকা—যার ফলে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই শুধু দ্রবীভূত নয়, বাষ্পাকারে পরিণত হতে পারে; তারপর আমাদের পৃথিবীর মত বর্তুল—যার উপরের ভাগ কঠিন পদার্থের স্তর, কিন্তু অভ্যন্তরে যেকোনওরূপ দ্রবীভূত পর্বত বা ধাতব পদার্থ বিরাজমান; তারপর মঙ্গলের ন্যায় একটা মৃতপ্রায় তুষার ঢাকা ভ্রাম্যমাণ গোলক;—এই বোধহয় অনন্ত আকাশরাজ্যে ক্রমবিকাশের ধারা।

জ্ঞান-পিপাসু মানব-মন ক্রমাগত চেষ্টার ফলে জ্ঞানের উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করছে। সে জানে যে, তার জানবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তবু সে অকাতরে আকাশমণ্ডলের আশ্চর্য ঘটনা ও নিদর্শনাদি দেখে সেসবের তত্ত্বনিরূপণে সচেষ্ট। সে দৃশ্যমান জগৎ-কে মনশ্চক্ষুর সামনে ধরে আকৃতিহীন কুজ্ঝটিকা থেকে পরিণত নক্ষত্রের এবং পরিণত নক্ষত্র থেকে মৃতকল্প অন্ধকার জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি রহস্য আলোচনা ক'রে, সে সমুদায়কে গোটা কয়েক সাধারণ নিয়মের গণ্ডিতে ফেলে সহজে বুঝবার চেষ্টা করছে।

অনন্ত জগতের চিন্তা করতে গেলে বুদ্ধি যেন, কল্পনাও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। মনুষ্যমাত্রেই এই বিশাল অনন্তকে সম্যক ধারণা করতে অক্ষম। এ বিষয়ে জাঁ পল রিক্টার (Jean Paul Richter)-এর লিখিত একটি চমৎকার স্বপ্ন-বৃত্তান্তের কথা স্মরণ করা যেতে পারে; কোন ব্যক্তিকে আকাশের গ্রহ-তারাদের ভিতর দিয়ে নিয়ে অনন্ত স্থান-কালের ভিতর দিয়ে জগতের পর জগৎ দেখা হ'ল। অবশেষে সমুদ্রবর্তী অসীমের দিকে দৃষ্টিপাত করে তার চিত্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ল, তখন সে রুদ্ধাবেগে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে বলল, 'স্বর্গীয় দূত! ক্ষান্ত হও। আমি আর অগ্রসর হ'তে পারি নে। এই অনন্তের সামনে দাঁড়িয়ে আমার চিত্ত ব্যথিত, পীড়িত। অনন্ত অন্তরীক্ষে জগতের মহিমা অসহনীয়। আমাকে এখন অনন্ত, উন্মুক্ত, ব্যাপ্তির নির্যাতন থেকে রক্ষা কর, আমি যে এর কোন শেষ দেখছি নে।' তখন স্বর্গীয় দূত তাঁর উজ্জ্বল হস্তের সঙ্কেতে ঐ আকাশের মহাকাশের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মানুষ! অনাদিকালের জগৎ বা অনন্তের আর কোনখানে নেই; আর, ঐ দিকে, দেখ, এর আদিও নেই।'

**পরিচিতি** : বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে বিগত পনর বছরের মধ্যে, মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা গিয়েছে, এবং মহাশূন্যে অভিযান সংক্রান্ত অনেক বৈজ্ঞানিক কারিগরী ব্যবস্থারও অনেক অগ্রগতি হ'য়েছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলো তাত্ত্বিক ধারণা এবং তারকার জন্ম-মৃত্যু, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়েও কতকটা জ্ঞাতব্য বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। তার আগে আমাদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য দেওয়া যাচ্ছে :

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কড়-ভেদে বিভিন্ন হয়, তবে গড় দূরত্ব ধরা যায় ৯৩ মিলিয়ন মাইল, অর্থাৎ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সূর্যের ব্যাস ৮৬৫ হাজার মাইল; আর পৃথিবীর ব্যাস ৭.৯ হাজার মাইল। পানির তুলনায় সূর্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৪১, এবং পৃথিবীর ৫.৫২. সূর্যের ৯টি গ্রহ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, বরুণ (Uranus), নেপচুন ও প্লুটো, আর পৃথিবীর কেবল একটা উপগ্রহ

এখানে তালিকায় সূর্য ও গ্রহাদির দূরত্ব (সূর্য থেকে), ব্যাস, ঘন, আয়তন, ভর ও উপগ্রহের সংখ্যা দেওয়া যাচ্ছে। আমরা পৃথিবীর লোক, স্বভাবতঃই পৃথিবীর সঙ্গে অন্যদের তুলনা করতে চাই। সেজন্য পৃথিবীর প্রতি প্রযোজ্য তথ্যকে একক ধরে তথ্যগুলো দেখান হ'য়েছে :

| | সূর্য | বুধ | শুক্র | পৃথিবী | মঙ্গল | বৃহস্পতি | শনি | বরুণ | নেপচুন | প্লুটো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্যাস | ১০৯.২ | ০.৩৮ | ০.৯৭ | ১.০০ | ০.৫২ | ১১.২ | ৯.৫ | ৪.০০ | ৩.৫২ | ০.৬২ |
| ঘন আয়তন | ১৩,০০,০০০ | ০.০৫ | ০.৯০ | ১.০০ | ০.১৫ | ১৩১৮ | ৭৫৫ | ৬৫ | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | ৩৩৩,৪০০ | ০.০৫৫ | ০.৮১৫ | ১.০০ | ০.১০৭ | ৩১৮.৪ | ৯৫.২ | ১৪.৬ | ১৭.৩ | ? |
| সূর্য-দূরত্ব | ০.০০ | ০.৩৮৭ | ০.৭২৩ | ১.০০০ | ১.৫২৪ | ৫.২০৩ | ৯.৫৩৯ | ১৯.১৮ | ৩০.০৬ | ৩৯.৪৪ |
| ঘনত্ব | ১.৪১ | ১.০০ | ০.৯২ | ১.০০ | ০.৭১ | ০.২৪ | ০.১৩ | ০.২৩ | ০.২৯ | ? |

গ্রহগুলো সূর্যের থেকে দূরত্ব অনুসারে সাজানো হ'য়েছে। আয়তনের দিক দিয়ে বুধ ক্ষুদ্রতম, বৃহস্পতি বৃহত্তম। উপগ্রহের সংখ্যা হিসাবে বৃহস্পতির ১২টা, শনির ৯টা, বরুণের ৫টা, মঙ্গল ও নেপচুনের ২টা করে, আর পৃথিবীর ১টা মাত্র (চন্দ্র)। শুক্র, বুধ ও প্লুটোর উপগ্রহ নেই। বস্তুমান (mass)-এর দিকদিয়ে বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন ও বরুণ যথাক্রমে প্রথম থেকে চতুর্থ স্থানীয়। ঘনত্ব (density) বলতে এক ঘন সেন্টিমিটারের বস্তুপরিমাণ বা ভর বুঝায়।

আর এক কথা, কোনও ক্ষেপণাস্ত্র বা বস্তুকণা (গ্যাস, আয়োন প্রভৃতি) প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃপক্ষে ৬.৯৫ মাইল (প্রায় ৭ মাইল) না হ'লে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রতিরোধ ছাড়িয়া পৃথিবী ত্যাগ করে যেতে পারে না। এই বেগকে মহানিক্রমণ বেগ বলা হয়। সূর্য, তারকা ও গ্রহাদির থেকেও এদের আকর্ষণের বাইরে চলে যাওয়ার বিভিন্ন নিক্রমণ-বেগ আছে; যথা সূর্য থেকে ৩৮৪, চন্দ্র থেকে ১.৫, বুধ থেকে ২.২, শুক্র থেকে ৬.৩, মঙ্গল থেকে ৩.১, বৃহস্পতি থেকে ৩৭.০, শনি থেকে ২২.০ বরুণ থেকে ১৩.০, নেপচুন থেকে ১৪.০ ও প্লুটো থেকে ৬.৫? (মাইল/সেকেণ্ড)। প্লুটো সংক্রান্ত সংখ্যাটা কিছু সন্দেহজনক।

**একটি তারকার জন্ম** : ১০০০ বছর আগে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদগণের চেয়ে চীন ও জাপানের জ্যোতির্বিদেরাই অধিক উন্নত ছিলেন। চীনা পর্যবেক্ষকগণের লিখিত বিবরণ (record) থেকে জানা যায়, ১০৫৪ সালে জুলাই মাসে এখন যেটাকে কর্কট নীহারিকা বলা

হয়, আকাশের সেই স্থানে হঠাৎ একটা নতুন তারার আবির্ভাব হয়। এর ঔজ্জ্বল্য বাড়তে বাড়তে কয়েকদিনের মধ্যেই আকাশের আর সব তারার চেয়ে এইটিই সর্বোজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর ক্রমে ক্রমে এর ঔজ্জ্বল্য আবার হ্রাস হ'তে শুরু করল। আসল কথা, কর্কট রাশিতে এখন যে তারা ও নীহারিকা দেখা যাচ্ছে, এক হাজার বছর আগে এর অস্তিত্বই ছিল না। এইরকম নতুন তারা (nova বা supernova) এখনও মাঝে মাঝে খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূর-দূরান্তের তারকাপুঞ্জের মধ্যে হঠাৎ উদয় হ'তে দেখা যায়।

কর্কট রাশির ঐ তারাটির থেকে ধূলি-পদার্থ বা ধূলি-মেঘ নির্গত হ'য়ে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে, প্রায় ৯১৪ বছরের মধ্যে প্রথম আবির্ভাব-স্থল (বৃষ রাশি) থেকে চারদিকে প্রায় ৩-আলোক বর্ষ দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। এর আলোকরশ্মির ঔজ্জ্বল্য সর্বত্র সমান নয়, মনে হয় যেন সত্যিই একটা বৃহৎ কাঁকড়া-বিছের মত হাত-পা নাড়ছে আঁকা-বাঁকা ভাবে। এই বিছের হাত-পায়ের চারদিকে বিদ্যুৎকণা (electrons) চক্রাকারে ঘুরছে। পৃথিবীতে আমরা একসিলারেটর যন্ত্র দিয়ে বিদ্যুতের যে শক্তি সঞ্চার করতে পারি, তার চেয়ে এই কর্কটের সৃষ্ট বিদ্যুৎ-কণা হাজার হাজার গুণ অধিক ক্ষমতাশালী। এর থেকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি বিচ্ছুরিত হয়—এক্স-রে, দৃষ্ট আলোক, আর রেডিও তরঙ্গ। কর্কটের প্রত্যক্ষাদি ক্রিয়া বা কার্য ভাল করে বুঝবার জন্য এর ঔজ্জ্বল্যের ধাঁচ (pattern), প্রবলতা (intensity), বর্ণালী সমন্বয় (spectral composition) পার্শ্বায়নের দিকে (directione of polarisation) চৌম্বক বল-রেখার সাধারণ ধারা ও বৈশিষ্ট্য, বিদ্যুতের কক্ষপথ প্রভৃতি নানা দিক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তা-ছাড়া, মহাকর্ষের আকর্ষণ আর তার প্রতিরোধক পারমাণবিক বিকর্ষণের দ্বন্দ্বই হিসাব করা হয়েছে। এসবের ভিতর দিয়ে দুটো প্রধান তত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায়। প্রথম, পদার্থের চাপরোধকতা বা স্থিতি-স্থাপকতার একটা উচ্চ সীমা রয়েছে; আর দ্বিতীয়তঃ মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত আইনস্টাইনের জ্যামিতিক বল-বিজ্ঞান-এর সঙ্গে প্লাঙ্কের শক্তি কণাকণ বা শক্তি-কণকবাদ (quantum theory) মিশ্রিত করে বর্তমান কণকিত জ্যামিতিক বল-বিজ্ঞানের (quantied relativity অথবা quantum theory of Geometrodynamics-এর) তত্ত্ব। বর্তমানে এই শেষোক্ত তত্ত্ব (theory) দিয়েই মহাবিশ্বের প্রসারণ-পুনঃ সংকোচন-প্রসারণ-পুনঃ সংকোচন-চক্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রসারণ-সংকোচন দ্বারা মাপন-রেখার দৈর্ঘ্য বা পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যাস প্রভৃতির প্রসারণ-সংকোচন বুঝায় না, বরং এর দ্বারা একাধিক জ্যোতিষ্কের মধ্যেকার ব্যবধানের ক্রমপ্রসারণ ও পুনঃসংকোচনের চক্রই বুঝায়। বর্তমানে প্রসারণের পর্ব চলছে। পণ্ডিতদের মতে কোটি কোটি বছর পর পর এক একটা কল্পের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক কল্পেই বস্তুকণা থেকে শক্তি (energy) এবং শক্তি থেকে বস্তুকণা (matter)-র জন্ম হয়, কিন্তু এদের সম্মিলিত শক্তি, বস্তু-পরিমাণ, রৈখিক বস্তুবেগ বা কৌণিক বা ঘূর্ণন বস্তুবেগ (linear momentum ও angular moment of momentum) অপরিবর্তিত থাকে।

নীহারিকাগুলোকে এক একটা জগৎ বলা যায়, আর মহাকাশে যে অগণিত নীহারিকা আছে, তার সবগুলো মিলিয়ে, সমগ্রটাকে বিশ্ব (বা ইউনিভার্স) বলা চলে। এই বিশ্বের ব্যাসার্ধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, একথা ১৯২৭ সালে (Habble) হাব্‌ল প্রমাণ করেছিলেন। এর আগে Schroedinger তরঙ্গ সূত্র (Wave Formula) দিয়ে জাগতিক ব্যাপারের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তাতে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সূক্ষ্ম হিসাব মিলে গেলেও, জগতের বস্তুকণার কেন

সম্ভাবনার তরঙ্গে পরিণত হয়—তখন আর ধরা-ছোঁয়ার বা কল্পনায় আঁকবার মত কোন বস্তুই থাকে না। আর এতে সমগ্রভাবে মাপ-জোখের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ পাওয়া গেলেও যখন ১৩৮ সেন্টিমিটারের কাছাকাছির দূরত্বের ব্যাপার উপস্থিত হয় তখন এর নির্দিষ্টতা থাকে না, এমনকি সময়েরও নির্দিষ্টতা লোপ পায়। আর প্রাথমিক অবস্থা বা (initial conditions)-এর উপর নির্ভরশীল আইনস্টাইন শ্রোডিংগার সমীকরণের (সাধারণ সমাধান ছাড়া) বিশেষ সমাধান অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। পদার্থবিদ্যায় একেই নিশ্চয়তা তত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়।

প্রসারণশীল জগতের আরম্ভিক অবস্থা ও অন্তিম অবস্থার অনির্দিষ্টতার জন্যই সৌরজগৎ, কক্ষজগৎ বা এইরূপ অসংখ্য জগতের প্রত্যেকটির বস্তুমান সমান থাকলেও এবং মোট শক্তি ও গতিবেগ ও কৌণিক বা ঘূর্ণ গতিবেগ অক্ষয় অব্যয় থাকলেও এদের এক এক কল্পে এক এক রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতে পারে। এই হ'ল বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের সাধারণ ভাবধারা; কিন্তু এটা এখন বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত অভিমতে পরিণত হয়নি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে নীহারিকা, তারকাপুঞ্জ, তারাচিত্র, কোয়াসার প্রভৃতি কথা শুনা যায়। এদের অর্থ সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই—নীহারিকা (Nebula) অনেকটা মেঘের মত অস্পষ্ট উজ্জ্বল স্থান, বস্তুধূলিতে কিংবা দূরস্থ তারাসমষ্টি দ্বারা উজ্জ্বলিত।

তারকাপুঞ্জ (galaxy বা milkyway) একত্র অবস্থিত কাছাকাছি উজ্জ্বল তারকার সমাবেশ বা দল (গ্রীক gala-র অর্থ দুগ্ধ)।

তারাচিত্র (constellation) নিকটবর্তী কতকগুলো স্থির নক্ষত্রের সমাহার, যা কল্পিতরেখা দ্বারা সংযুক্ত করলে হংস, ভল্লুক, মকর, মৎস্য, অস্ত্রধারী বীরপুরুষ প্রভৃতির মত দেখায়।

কোয়াসার (quasars=quasi+star) আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৩ সালে। প্রকৃতিগতভাবে এ অনেকটা সুপারনোভা বা বৃহৎ নয়া তারকার মতই নীহারিকা থেকে জন্মলাভ করে, তবে এতে অনেকগুলো সুপারনোভা এক সঙ্গে থাকে, আর অল্প সময়ের মধ্যেই একটার পর একটা ফুটে ওঠে বলে, মোটের উপর এদের উজ্জ্বল আলোক নীহারিকাটা সর্বদাই আলোকিত দেখা যায়।

আর একটি কথা। তারকা-মেঘ (বা বস্তুপুঞ্জের এক একটা দল) অতিশয় বিরাটকায়, এর কেন্দ্রীয় অংশের উপর চারদিকে অবস্থিত বস্তুপুঞ্জের বিরাট চাপ পড়াতে ক্রমে ক্রমে এর আয়তন কমে আসতে চায়। অবশ্য মাধ্যাকর্ষণের ফলে এরূপ হয়; কিন্তু অন্যদিকে, পদার্থের আণবিক বিকর্ষণও রয়েছে, অর্থাৎ কোনও বস্তুকণা নিউক্লিয়াসের অতিশয় নিকটবর্তী হ'য়ে পড়লে তখন নিউক্লিয়াস সেটাকে প্রতিরোধ করতে চায়। মাধ্যাকর্ষণের শক্তির চেয়ে নিউক্লিয়াসের প্রতিরোধ অধিক হ'লে, নিউক্লিয়াস অগ্রসরমান বস্তুকণাগুলোকে প্রবলভাবে ঠেলে দিয়ে বিক্ষিপ্ত দেয়। তার ফলে অবরুদ্ধ সংকোচনের স্থলে বস্তুপুঞ্জের প্রসারণ আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু যদি নিউক্লিয়াসের দিকে ধাবমান কণাগুলোর মাধ্যাকর্ষণের শক্তি নিউক্লিয়াসের শক্তির চেয়ে অধিক হয়, তা হলে কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াস নিজের ক্রমবর্ধিত বেগে আপতনশীল কণিকার চাপে এক একটা ক'রে নিউক্লিয়াসের অনুরূপ ভেঙে যায়, পরে এই ভাঙনের শক্তিতে পার্শ্ববর্তী নিউক্লিয়াসগুলোও অতি দ্রুত ভেঙে যেতে থাকে। এইভাবে সমুদয় কেন্দ্রস্থ সমবেত ও স্থির নিউক্লিয়াসের পিণ্ড ভেঙে গিয়ে পদার্থের মধ্যে যে বিপুল তেজ বা শক্তি রয়েছে তা x রশ্মি, β রশ্মি, α রশ্মি, γ রশ্মি, কসমিক রশ্মি, আলোক রশ্মি আর কোটি কোটি ডিগ্রীর তাপ রশ্মি রূপে নির্গত হ'য়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে অনেকানেক সূর্য্য অনুসন্ধান

## নির্দেশিকা

Gregory—Spring and Discovery of Science (England)
শাহ ফজলুর রহমান—মহাশূন্যে অভিযান (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৬৬)
মোহাম্মদ আবদুল জব্বার— তারা পরিচিতি (কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৭)
মোহাম্মদ আবদুল জব্বার— ভূগোল পরিচয় (ঐ, ১৯৬৫)
অমল দাশগুপ্ত—মহাকাশের ঠিকানা (নতুন সাহিত্যভবন, কলিকাতা, ১৯৬০)
Pear's Cyclopaedia (71st edition)
American Scientist (Spring 1968)—Article on "Our Universe" by J. A. Wheeler.

বাংলা একাডেমী পত্রিকা
গ্রীষ্ম ১৩৭৫

# মহাবিশ্ব পরিচয়

## (১)
## চর্ম চোখে আকাশ

আমরা পৃথিবীর বুকে বৃক্ষ-লতা, রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মরু, জীব-জন্তু, দেশি-বিদেশী মানুষ; নদীতে মাছ-কুমির, নৌকা-ষ্টিমার; ওপরে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে পাখি, ঊর্ধ্বে উড়ন্ত কাক, চিল, এরোপ্লেন, আরও ঊর্ধ্বে দেখি দিনে সূর্য, রাতে চন্দ্র-তারকা। আমরা ভাবি, পৃথিবীর অন্ত কোথায়ও আছে কি? সমুদ্র কত গভীর? আকাশ কত উচ্চে? আরও অবাক হয়ে ভাবি শূন্যের তারাগুলো মাটিতে পড়ে যায় না কেন? কোথায়ও গাঁথা রয়েছে নাকি? ইত্যাদি নানা কথা। মানুষ চিন্তা করে করে একটির সঙ্গে আর একটি মিলিয়ে মিলিয়ে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু সামঞ্জস্যময় তথ্য নির্ণয় করেছে। সেইসব সূত্র ধরে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য গ্রথিত করেছে। ওসব বিষয়ে আমরা সহজ ভাষায় কিছুটা আলোচনা করছি।

## (২)
## সূর্য ও চন্দ্রের উদয় অস্ত

আমরা চোখে দেখি, প্রতিদিন সূর্য পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়, আবার পরদিন প্রভাতে পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়। চন্দ্রকেও দেখি সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশের কিছু দূর উঁচুতে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকেই সরতে সরতে অস্ত যায়, পরেরদিন আর একটু উঁচু থেকে আর একটু বৃহদাকারে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকেই সরতে সরতে অস্ত যায়। এইভাবে মনে হয়, চাঁদ প্রতিদিন একটু একটু দেরি করে উদিত হয় এবং একটু একটু করে স্থূলকায় হতে হতে অবশেষে পূর্ণ হয়ে সারারাত আলো দিতে দিতে প্রভাতে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। অতি প্রাচীনকালেই—অন্ততঃ বিশ হাজার বছর আগেও লোকে চাঁদের এসব কলা লক্ষ্য করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু এই নয়, চন্দ্রের সাহায্যে তারা সময় ও ঋতু নির্ণয় করতে পারতেন।

## (৩)
## প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা (Uniformity of Nature)

চাঁদ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশি বলে এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিতভাবে বলা চলে। এর থেকে প্রকৃতির নিয়মে একটি শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য রোজ প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর পর উদিত

হয় আর চাঁদ পৃথিবীর ওপরকার আকাশ বেয়ে ২৯ $\frac{১}{২}$ দিনে একবার করে পুরো চক্কর ঘুরে আসে। বহুকাল যাবৎই এরা প্রায় একইভাবে চলে আসছে।

## (৪)
## পৃথিবী-কেন্দ্রি বিশ্ব ভুল কথা (Geocentric Universe)

এছাড়া নক্ষত্রদের দেখা যায়, কোনওটা লাল, কোনওটা নীল, কোনওটা হলদে, কোনওটা অধিক উজ্জ্বল, কোনওটা অনুজ্জ্বল, আর সবগুলোই পৃথিবীর উপরকার অতি ঊর্ধ্ব আকাশ বেয়ে পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব প্রায় ঠিক রেখেই এমনভাবে ঘুরছে। মনে হয় যেন, অতি ঊর্ধ্ব আকাশের গায়ে তারাগুলো গাঁথা রয়েছে, আর সব-সমেত এরা পৃথিবীকে প্রতি রাত্রে প্রদক্ষিণ করছে। তারাগুলোরও যেন ঋতুজ্ঞান আছে। এক এক ঋতুতে সাঁঝের বেলায় তারা-মণ্ডলির এক এক রকম চিত্র মাথার ওপর দেখা যায়।

প্রতিদিন লক্ষ্য করে করে প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা তারার তালিকা প্রস্তুত করে কোন তারার অবস্থান কোথায় সেসব লিখে রেখে গেছেন। এই তথা-কথিত নিশ্চল-আকাশে-গাঁথা তারাগুলোর মধ্যে আবার কয়েকটা জ্যোতির্ময় তারা একটু আগুপিছু চলে বলে মনে হয়। এগুলোকেই কালে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি বলে অভিহিত করা হত। আর মনে করা হত যে পৃথিবীটাই সমুদয় বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, আর সূর্য (রবি), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল (Mars), বুধ (Mercury), বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus যোহরা), শনি (Saturn)-এরা সবই পৃথিবীর অনুচর, তাই একে প্রদক্ষিণ করে চলতে বাধ্য হয়। পুরোনো শাস্ত্র-কেতাবও ঐ ভুল ধারণাই পরিবেশন করেছে।

## (৫)
## সৌর জগৎ

আধুনিক বিজ্ঞান উল্টো কথা বলছে। চন্দ্র অবশ্যই পৃথিবীর একটা উপগ্রহ, পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, কিন্তু সূর্যের চারদিকেই পৃথিবী ও অপর সব গ্রহ আপন অনুচর বা উপগ্রহ নিয়ে ঘুরছে। এছাড়া আরও জানা গেছে, এই গ্রহগুলো যথা—নির্দিষ্ট কক্ষে আপন আপন বিভিন্ন ভ্রমণকালে এক এক বার সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এদের আয়তন কোনওটা পৃথিবীর চেয়ে বড়, কোনওটা আবার ছোট। বৈজ্ঞানিকেরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীকে যদি ১ ইঞ্চি ব্যাসওয়ালা গোলক বলে কল্পনা করা যায়, তবে সূর্যের ব্যাস হবে ৯ ফিট, চাঁদ একটা ছোট মটরের মত, মঙ্গলের ব্যাস $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, বুধের $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি, বৃহস্পতির ১১ $\frac{২}{৫}$ ইঞ্চি, শুক্রের $\frac{৩৯}{৪০}$ ইঞ্চি, শনির ৯ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এছাড়া বিগত ২০০ বছরের মধ্যে সূর্যের আরও তিনটে গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা, ১৭৮১ সালে ইউরেনাস (Uranus), ১৮৬৪ সালে নেপচুন (Neptune) এবং ১৯৩০ সালে প্লুটো (Pluto)। উপরোক্ত স্কেলে ইউরেনাসের ব্যাস হবে ৪ ইঞ্চি, নেপচুনের ৩ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, আর প্লুটোর $\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি।

আমাদের সৌর জগতে সূর্যের উপরোক্ত ৯টা গ্রহ ত ঘোরেই তাছাড়া এদের মোট ৩১টা উপগ্রহও ঘুরছে। শুধু কি তাই? প্রায় ৩০,০০০ গ্রহানুপুঞ্জ, আর প্রায় ১০ কোটি ধূমকেতুও একে প্রদক্ষিণ করে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে একক ধরে গ্রহগুলোর নাম ও দূরত্ব :— নাম— বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো— দূরত্ব : .৩৯, .৭২, ১.০০, ১.৫২, ৫.২০, ৯.৫৪, ১৯.১৮, ৩৩.০৭, ৩৯.৫।

সূর্য থেকে প্লুটো পর্যন্ত যে বিরাট স্থান রয়েছে, তার অতি ক্ষুদ্র এক অংশমাত্র এই গ্রহগুলো জুড়ে রয়েছে, আর এর লক্ষ লক্ষ গুণ স্থান খালিই পড়ে রয়েছে। এসব তথ্য থেকে দেখা যায় সূর্য কত মহামান্য— আয়তনে ও বস্তুমানে, শক্তি ও তেজে। সূর্যের তুলনায় পৃথিবী একটা নগণ্য গ্রহ মাত্র। এরচেয়ে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুনও বৃহত্তর।

আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর ব্যাসকে ১″ ধরলে সূর্যের ব্যাস হয় ৯ ফুটের কিছু অধিক (১০৯ ইঞ্চি)। এর থেকে হিসেব করে দেখা যায়, আয়তনে (অর্থাৎ valume-এ) সূর্য পৃথিবীর থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়।

এই বিরাট গোলকের ব্যাস হচ্ছে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল, আর আয়তন তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার (৩,৩৫,০০০) বিলিয়ন ঘনমাইল। এক এক বিলিয়ন হচ্ছে অযুতের অযুত গুণ, অর্থাৎ ১০ লক্ষেরও ১০ লক্ষ গুণ। এ সংখ্যাটা লিখতে ১-এর পৃষ্ঠে ১২টা শূন্য লাগে, সংক্ষেপে ১০$^{১২}$। সুতরাং সূর্যের আয়তন ৩৩৫×১০$^{১৫}$ = ৩.৩৫×১০$^{১৭}$ ঘন মাইল। (এখানে বলে রাখা ভাল, ১ মিলিয়ন (million) হচ্ছে আমাদের অযুত=১০$^{৬}$; ১ বিলিয়ন (billion) অযুতের অযুত গুণ=১০$^{১২}$; ১ ট্রিলিয়ন (trillion) হচ্ছে ১ বিলিয়নের অযুতগুণ = ১০$^{১৮}$; ১ কোয়াড্রিললিয়ন (quadrillion) হচ্ছে ট্রিলিয়নের অযুতগুণ = ১০$^{২৪}$ = ১ বিলিয়নের বিলিয়নগুণ। আমাদের হিসেবে বিলিয়ন হচ্ছে ১ লক্ষ কোটি=১০$^{৭}$ × ১০$^{৫}$ = ১০$^{১২}$। এত বড় বড় সংখ্যা ধারণা করাই কঠিন; কিন্তু জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলেই বড় বড় একক না ধরে উপায় নেই।

এই বিরাট সূর্যের উপরি-তলের মহাভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ধূলিও বাষ্পপিণ্ডের উষ্ণতা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর সূর্যের বস্তুমান (mass) ২,০০০ কোয়াড্রিলিয়ন টন=২×১০$^{২৭}$ টন। সূর্য-পৃষ্ঠে দুটো বায়ুস্তর (atmosphere) আছে। ওপরেরটা অপেক্ষাকৃত কম চাপের পাতলা বহিঃস্তর, যার নাম (Corona); ভেতরেরটা ঘন চাপ বিশিষ্ট কিছু অপ্রসর জ্বলন্ত বায়ুস্তর, সূর্যের গাত্র (photosphere) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের বিস্তার প্রায় ১০ হাজার মাইল, এর নাম ক্রোমোস্ফিয়র (chromosphere)। আমরা টেলিস্কোপ বা ফটোগ্রাফির সাহায্যে বাইরের দুটো স্তর ডিঙ্গিয়ে আর অধিক দূরে কিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারিনে। এর কারণ, শুধু এই দুই স্তর থেকে উদ্ভূত দৃশ্যমান আলো আর অদৃশ্য অতি বেগুনি (ultraviolet) ও অবলোহিত (infra-red) বিকিরণই ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল শূন্যপথ অতিক্রম করে পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করে আমাদের কাছে এসে পৌছতে পারে। বাদ বাকি বিকিরণ ফোটোস্ফিয়ারের আয়নিত গ্যাস-কণায় রচিত অবগুণ্ঠনের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও সূর্যের অভ্যন্তরের ঘনত্ব (density), উষ্ণতা (temperature) ও মৌলিক পদার্থাদির পরিচয় হিসেব করে বের করা হয়েছে; আর বিজ্ঞানীরা জানেন, আণবিক প্রক্রিয়ায় কেমন করে এইসব পদার্থ প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। সূর্যের কেন্দ্র-দেশে অবস্থিত প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার মাইল ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট

অপেক্ষাকৃত ঘণীভূত অংশ (Nulcear zone) থেকেই এর তেজ নির্গত হয়। এখানে ১ কোটি ৪০ লক্ষ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় হাইড্রোজেনের পরমাণু একত্রিভূত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এর ফলে গামা রশ্মিরূপে যে প্রবল শক্তি উদ্ভূত হয়, তা ৩০ হাজার মাইল উর্ধ্বস্থ ফোটোস্ফিয়রের শেষ প্রান্তের দিকে ধাবিত হয়। পথে প্রায় ৪২ হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বলয়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট গ্যাস পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি বিশিষ্ট Z-ray (রঞ্জন রশ্মি) ও অতি বেগুনি (Ultraviolet) রশ্মি উৎপন্ন হয়।

আমরা সূর্য-কেন্দ্রের উষ্ণতা (temperature) সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেছি। এবার চাপ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা আবশ্যক। আমরা জানি, ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাড়ে সাত সের (=১৫ পাউণ্ড)। কিন্তু সূর্যের তাপে বাষ্পিভূত প্লাটিনাম, শিশা, সোনা, রূপা, লোহা, পারা, থেকে আরম্ভ করে অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন হিলিয়াম হাইড্রোজেন প্রভৃতির বাষ্পায়িত, ফুটন্ত, বস্তুপিণ্ডের চাপ হবে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু-মণ্ডলের যে চাপ তার ৪ হাজার কোটি গুণ। আমরা জানি উত্তাপের ফলে বায়বীয় পদার্থের আয়তন বাড়ে, আর চাপ দিলে কমে। ফলে, সূর্যের উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডের মোটামুটি একটা আয়তন দাঁড়িয়ে যায়, যার থেকে অধিক বাড়তেও পারে না, অধিক কমতেও পারে না।

## (৬)
## তারকার উজ্জ্বলতা ও বিপুল সংখ্যা

এই যে মহাপ্রবল সূর্য ও সমুদয় আকাশের নক্ষত্রের মজলিসে একটা অতি সাধারণ তারকা ছাড়া কিছু নয়। খালি চোখেই ৪০০০ থেকে ৭০০০ পর্যন্ত তারা দেখা গেছে। আর টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে এবং অন্য উপায়ে যেসব তারার অস্তিত্ব জানা গেছে, তাদের কোনও কোনওটা সূর্যের চেয়ে ছোট হলেও অধিকাংশই ওর থেকে বহু গুণ বৃহত্তর।

নক্ষত্রেরা প্রায়ই দল বেঁধে ভ্রমণ করে। একক তারকার সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগের অধিক নয়। অধিকাংশ তারাই জোড়ায় জোড়ায় অথবা তিন-চার-পাঁচ বা তদধিক সংখ্যায় জোট বেঁধে চলে বলে মনে হয়। এই জোটের কেন্দ্র-বিন্দুটা কোন্ দিকে কত বেগে ধাবিত হচ্ছে, তাকেই ঐ তারকা দলের গতি বলে মনে করা হয়। ঐ কেন্দ্রের চারদিকে এরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে, হয়ত বা কখনও একে অপরকে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে আড়াল করে ভ্রমণ করে। এই দলগুলোকে যুগ্ম, ত্রয়ী, চতুর্দলি, পঞ্চদলি প্রভৃতি আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এগুলো কিন্তু তারকা গুচ্ছ (cluster) নয়। অবশ্য এসব নাম দেয়া হয় আমরা তারকাদের কিভাবে দেখতে পাই তারই অনুসরণে। তারকাগুচ্ছ (বা ক্লাস্টার)-এর উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় হার্কিউলেস তারা চিত্রের তারকাগুলোর কথা। এর প্রত্যেকটা তারা খালি চোখে একটা বলেই মনে হয়, কিন্তু বিস্তারণক্ষম টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখলে দেখা যায় অনেকগুলো অতিকায় তারকা ঘিজিঘিজি (কাছে কাছে) রয়েছে, খালি চোখে ওদের সমষ্টির সমবেত অনুভূতি একত্র হয়ে একটি উজ্জ্বল তারা রূপেই দৃষ্ট হয়। এরকম আরও অনেক গুচ্ছ রয়েছে।

তারাগুলোর উজ্জ্বলতায় বেশি কমি আছে, এইটেই সকলের আগে চোখে পড়ে। আপাত দৃষ্টিতে কোন্টা কত উজ্জ্বল, এর একটা বৈজ্ঞানিক পরিমাপ নির্ণয় করে এদের উজ্জ্বলতা-মান

(magnitude) নির্ধারণ করা হয়েছে। ১-উজ্জ্বলতা-মানের কোনও আদর্শ তারা থেকে যে পরিমাণ আলো আমাদের চোখে পড়ে তার তুলনায় ২-উজ্জ্বলতা মানের তারকার থেকে আমাদের চোখে তার প্রায় আড়াই ভাগ (২.৫১২ ভাগ) কম আলো চোখে পড়বে। ২-থেকে ৩-উজ্জ্বলতায়, ৩-থেকে ৪-উজ্জ্বলতায় এই হারে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতা কম হতে থাকবে। ৬-উজ্জ্বলতা ১-উজ্জ্বলতার থেকে ৫ ধাপ নিচে। এই রীতি অনুসারে তারা যত অধিক অনুজ্জ্বল হবে তার ম্যাগনিচুড (m) ততই অধিক হবে। কোন্ ম্যাগনিচুডের কতটা তারা আছে, তা টেলিস্কোপ ও ফোটোগ্রাফিক প্লেট দিয়ে পরীক্ষা করে ২০ ম্যাগনিচুড পর্যন্ত তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। ম্যাগনিচুড, m, যতই বাড়তে থাকে তারার সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তারায় সংখ্যাগুলো যথাক্রমে ৬৩০, ১৬২০, ৪৮৫০, ও ১৪৩০০। দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক ধাপে সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে যাচ্ছে। পরে এই অনুপাত হ্রাস হতে হতে প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে আসে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ ম্যাগনিচুডের তারকা সংখ্যা যথাক্রমে ১৫০ মিলিয়ন, ২৯৬ মিলিয়ন, ৫৬০ মিলিয়ন ও ১০০০ মিলিয়ন। এর ওপরের ম্যাগনিচুডের তারাগুলো বর্তমান টেলিস্কোপে ধরা যাচ্ছে না, আবার বহু ঘণ্টা যাবৎ কিরণ-পাত (exposure) দিয়েও ফোটো প্লেটে উঠানো যাচ্ছে না। স্যামসনের লেখা Astronomy প্রবন্ধের তালিকা থেকে m-৮ থেকে m-১২ পর্যন্ত মোট সংখ্যা=৩,৬৪৩,৩০০ এবং m-১৩ থেকে m-২০=১,১২৪,৫০০,০০০

মোট—১,১২৭,১৪৩,৩০০

এখানে প্রায় ১১৩ কোটি তারার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। যে হারে তারার সংখ্যা m-এর সঙ্গে বেড়ে চলেছে, তাতে এইখানেই যে সমাপ্তি তা কিছুতেই মনে করা যায় না। এই সংখ্যা শ্রেণীর সত্যিই শেষ আছে কিনা, তা-ই সন্দেহ। সংখ্যার বৃদ্ধি-হার সামান্য কমে এসেছে বটে; এমনও হতে পারে যে, দীর্ঘ পথে আলো ক্ষীণ হয়েই, অনুপাতে এই হ্রাসটুকু হয়েছে। এ সম্বন্ধে আর একটা বিশেষ কথা এই যে, গণনায় শুধু একক বা বিচ্ছিন্ন তারকাই ধরা হয়েছে। গুচ্ছ তারকা (Cluster-এর) হিসেব এর মধ্যে ধরা হয়নি।

বলাবাহুল্য উপরোক্ত আপাত উজ্জ্বলতা তারকার দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন তারার প্রকৃত উজ্জ্বলতা কত তা নির্ণয় করতে হলে সব তারাকেই কোনও নির্দিষ্ট আদর্শ দূরত্বে স্থাপন করে দেখলে কতটা উজ্জ্বল দেখাত সেই হিসেবও করা আবশ্যক। এটাও করাও হয়েছে। সচরাচর এই আদর্শ দূরত্ব ধরা হয় পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় ২ মিলিয়ন গুণ=৩৩ আলোক বর্ষ=১০ পার্সেক=২০০ মিলিয়ন মাইল।

খালি চোখে সূর্যকে অন্যান্য তারকার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু আদর্শ দূরত্বে রেখে হিসেব করে দেখা গেছে সূর্যের প্রকৃত উজ্জ্বলতাকে ১ ধরলে, আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারকা সিরিয়াস-এর (সুরাইয়া) উজ্জ্বলতা ২৩ (দূরত্ব ৮.৭ আ, ব); ক্যানোপাসের ১৫০০ (দূরত্ব ১০০ আ, ব); দেনেব ৬০,০০০ (দূরত্ব ১৪০০ আ, ব)—অর্থাৎ অনেক নক্ষত্রই সূর্যের থেকে বহু গুণ অধিক উজ্জ্বল অথবা আপাত দৃষ্টিতে সেগুলোকে অনেক নিষ্প্রভ দেখায়।

অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে বলা যায়, সূর্য একটা সাধারণ নক্ষত্র, তবে উজ্জ্বলতায় কিছু খাটো।

এর থেকে মনে হয়, তারাগুলো হয়ত ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। সম্ভবত প্রথমে উচ্চ-তাপ বিশিষ্ট বৃহৎ ও ভারি তারকার জন্ম হয়; এবং এজন্যই ওরা অধিক উজ্জ্বল এবং ভায়োলেট বা নীল বর্ণের হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে এই শ্রেণীর নিচের দিকে যেতে থাকে।

এইভাবে উষ্ণতা ও ভার কমতে কমতে যুগ্ম তারকারা পৃথক হয়ে পড়ে আর এরা অধিকতর বিকেন্দ্রিক উপবৃত্তাকারে কক্ষ পরিভ্রমণ করতে থাকে।

## (৭)
## তারকা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ শব্দ

এখানে নক্ষত্র সংক্রান্ত কয়েকটা পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। এতে তারকা সংক্রান্ত বর্ণনা-মূলক শ্রেণী বিভাগ বুঝবার সুবিধা হবে।

(১) Galaxy (তারকা-গুচ্ছ)— কতকগুলো তারা, পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত হলেও, তাদের যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে এক গোষ্ঠীভূক্ত করে রাখা হয়েছে। অনেক সময় এর ভেতরে গ্যাস ও বস্তুকণাও থাকতে পারে।

(২) Nebula (নীহারিকা)— সৌর জগতের বাইরে অবস্থিত বস্তুধূলি বা মেঘের ঘন সমাবেশ; আগে একেও গ্যালাক্সি বা তারকাগুচ্ছ বলা হত।

(৩) Milky way (ছায়াপথ)— স্থানীয় তারকাগুচ্ছ যার মধ্যে সূর্যও অবস্থিত। এ যেন আকাশ পথে তারার রাস্তা, অবশ্য মাঝে মাঝে ভাঙা ভাঙা বা অংশচ্যুত রয়েছে।

(৪) Cluster (তারাপুঞ্জ)— কোনও তারকাগুচ্ছ বা galaxy নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত বহু সংখ্যক তারকা। এই পুঞ্জ যদি ঠাসাঠাসিভাবে না থেকে একটু ফাঁক ফাঁক মত থাকে, আর গ্যালাক্সির তলের বরাবর থাকে, তাহলে এর নাম হয় galactic cluster, কিন্তু যদি গ্যালাক্সির তলের প্রায় সীমা ঘেঁষে থাকে, তারাগুলোর যদি আকৃতি উপবর্তুলকার হয়, আর বেশ ঠাসাঠাসিভাবে থাকে, তাহলে এরূপ পুঞ্জের নাম দেয়া হয় উপবর্তুল তারাপুঞ্জ।

(৫) Constellation (তারাচিত্র)— উজ্জ্বল তারকার একটা গোষ্ঠী, যা কোনও কল্পিত পরিচিত পদার্থ বা জন্তুর মত দেখায়। যথা— ধনু, ছোট ভল্লুক, সর্প, মিথুন ইত্যাদি।

## (৮)
## বিশেষ ধরনের তারকার শ্রেণীবিভাগ

Giant (দানব)— যে তারার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ১৫ থেকে ৪০ গুণ, আর উজ্জ্বলতাও সূর্যের প্রায় ১০০ গুণ তার নাম দানব।

Super-giant (অতিদানব)— যে তারার উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতার প্রায় ৫০,০০০ গুণ, আর যার ব্যাস কয়েক হাজার মিলিয়ন মাইল।

Nova (নব্য তারা)— যে তারা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পরে শীঘ্রই উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে।

Super-nova (নব্য দানব)— অতিশয় অস্থির তারা যা হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে বিস্ফোরিত হয়ে যায়।

Pulsating Star (স্পন্দ তারকা)— যে তারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিস্ফোরিত ও সঙ্কুচিত হয়।

Variable Star (অসম-জ্যোতি তারা)— যে তারার জ্যোতি পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের ক্রিয়া ছাড়াই নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস হয়, তেমন তারা

White dwarf (সাদা বামন)— সূর্যের সমান বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র আয়তনের অত্যধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট তারা।

## কয়েকটি তারকার নাম

(ক) খালি চোখে প্রায় ৭,০০০ তারকা দেখা যায়। তারমধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল কয়েকটা তারার দূরত্ব ও প্রকৃত উজ্জ্বলতার তালিকা দেয়া হচ্ছে :

| তারকা | দূরত্ব | প্রকৃত উজ্জ্বলতা |
|---|---|---|
| | সূর্য=১ আলোক বর্ষ | |
| Sirius | ৮.৭ | ২৩ |
| Canopus | ১০০ | ১৫০০ |
| Alpha Centauri | ৪.৩ | ১.৫ |
| Vega | ২৭ | ৪৫ |
| Capella | ৪৭ | ১৭০ |
| Arcturus | ৩৬ | ১০০ |
| Rigel | ৮০০ | ৪০,০০০ |
| Procyon | ১১.৩ | ৭.৩ |
| Betelgeuse | ৫০০ | ১৭,০০০ |
| Achernar | ৬৫ | ২০০ |
| Beta Centauri | ৩০০ | ৫,০০০ |
| Altair | ১৬.৫ | ১১ |
| Aldebaran | ৫৩ | ১০০ |
| Spica | ২৬০ | ২,৮০০ |

## (খ) সূর্যের ব্যাসকে একক ধরে কয়েকটি তারার ব্যাস

| তারকা | ক্যাপেলা | আর্কটুরাস | আলডেবরান | বিটেলজুস | অ্যান্টারিস |
|---|---|---|---|---|---|
| ব্যাস | ১২ | ৩০ | ৬০ | ২৯০ | ৪৮০ |
| তারকা | ভেগা | সিরিয়াস | প্রসাইয়ন | সেন্টরাই | বার্নার্ড |
| ব্যাস | ২.৪ | ১.৮ | ১.৯ | ১.০ | ০.১৬ |

# শব্দ ও তাহার ব্যবহার

জন্মাবধি মানুষ শব্দ শুনিতেছে এবং শব্দ ব্যবহার করিতেছে। তাহার জীবন-ব্যাপারে শব্দ বা ধ্বনি এরূপ অপরিহার্য যে সাধারণ মানুষের মনে, ইহার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জন্মা বড়ই অস্বাভাবিক। কারণ, যে-সমস্ত বিষয় বা ঘটনা আমাদের অতি পরিচিত, সেগুলি আমাদের জীবনের মূল অনুভূতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায়; আবার মূল অনুভূতিগুলি বুঝাইতে গেলে তাহার চেয়ে কঠিন জিনিসের আশ্রয় লইতে হয়। এজন্য শব্দের কোনো সংজ্ঞা না দিলেও কোনো ক্ষতি হইবে না।

মানব-শিশু বিচিত্র ধ্বনিময় পৃথিবীতে আসিয়া প্রথমেই ক্রন্দন করিয়া থাকে। তাহার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবার একমাত্র উপায় না হইলেও, প্রধান উপায়ই ক্রন্দন-ধ্বনি। একমাত্র শব্দ-দ্বারাই সে তাহার ক্ষুধা, অস্থিরতা, বেদনা প্রভৃতি জ্ঞাপন করে। আবার সুমধুর আধো আধো বুলি দ্বারাই সে ক্রমশ পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর অধিকতর স্নেহ আদায় করিতে থাকে। মনের ভাব প্রকাশ করিবার যে আনন্দ, তাহা কেবলমাত্র ইঙ্গিতের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় ধ্বনি। ধ্বনি-দ্বারা আমরা কি চমৎকার ভাষা, কবিতা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, অভিনয়, সঙ্গীত প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছি! ইহা দ্বারা যে একজনের মনের ভাব আর দশজনে বুঝিতে পারে, সে এক পরম আশ্চর্য ব্যাপার। ইহার পিছনে মানুষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত সাধনা রহিয়াছে। কথাটা বোধ হয় ঠিক পরিষ্কার হইল না। তবে বর্তমান যুগেও, আমরা কথার ভিতর কিরূপ সম্ভাব্যতার বীজ দেখিতে পাই, সে বিষয় একটু উল্লেখ করিলেই, বর্তমান অবস্থায় আসিতে মানুষের কত কঠোর সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা সহজেই কল্পনা করিয়া লইতে পারিব। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়, নজরুল ইসলামের সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি এত মনোহর লাগে কেন? আর ঠিক সেই কথাগুলি অন্য লোকে উচ্চারণ করিলে তত সুন্দর হয় না কেন? হয়ত অমৃতলাল বসু একটা সামান্য গল্প বলিলেও বেশ জমিয়া উঠে, আবার আর একজনে খুব ঘটা করিয়া বলিলেও তত সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, শব্দ প্রয়োগে অনেক কৌশলের মা'র প্যাঁচ আছে। একই শব্দ, বলিবার ভঙ্গী অনুসারে বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক করে। এমনকি, শব্দ আদর, অভিমান, আত্মীয়তা প্রভৃতি জ্ঞাপন করে, ঠিক সেই শব্দই ক্রোধ, অপমান, শ্লেষ, বিদ্রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া ভীষণ অশান্তি এমনকি মানহানির মোকদ্দমা পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা যে শব্দের এই অতি সামান্য উচ্চারণ-বৈষম্য অনুভব করিতে পারি' তাহা নিশ্চয়ই শত সহস্র বৎসরের সাধনার ফল। ক্রমাগত ব্যবহার করিতে করিতেই আমাদের শ্রবণ-শক্তি বর্তমান পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; আবার শব্দ প্রয়োগ ব্যাপারেও এই অভ্যাসের ফলে কণ্ঠ ও জিহ্বার জড়তা অপসারিত হইয়া ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই শব্দের এতাদৃশ ব্যবহার করিয়াছিল। অনেক সময়

শব্দের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, নিকটে কোনো বিশেষ প্রকারের শব্দ হইতেছে, তাহা হয় বাঘের শব্দ, নয় যাঁতায় ডাল ভাঙ্গার শব্দ। এস্থলে শব্দের স্বরূপ নিরূপণ আত্মরক্ষার পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

কেমন করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভঙ্গী সহকারে শব্দ নির্গত করা যায়, তাহা জানিতে হইলে শব্দের কি কি গুণ আছে, একটু জানা আবশ্যক। সকলেই জানেন, শব্দ বায়ু মণ্ডলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত কম্পন বা তরঙ্গ বিশেষ। একটি শব্দায়মান ঘণ্টায় হাত দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে কম্পনই শব্দের কারণ; ঐ কম্পন যত কম হইতে থাকে, তত উহার উচ্চতা কমিতে থাকে, কম্পন থামিলে শব্দও থামিয়া যায়। ঘণ্টার কম্পন, তৎসংলগ্ন বায়ুমণ্ডলকে কাঁপাইয়া তোলে। বায়ুর এই কম্পনই ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দানুভূতি জন্মায়। এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বায়ুমণ্ডল অধিক আন্দোলিত হইলে উচ্চশব্দ এবং অল্পমাত্রায় আন্দোলিত হইলেই নিম্নশব্দ উৎপন্ন হয়। শব্দ যে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার প্রমাণ— একটি ঘড়ি কিংবা বৈদ্যুতিক ঘণ্টাকে কাচের ঢাকনার ভিতর উত্তমরূপে আবদ্ধ রাখিলেও বাহির হইতে উহার শব্দ শ্রুত হয়। কিন্তু উক্ত ঢাকনার মধ্য হইতে ক্রমাগত বায়ু নিষ্কাষণ করিতে থাকিলে শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে; এবং যদি শব্দ-দায়ক বস্তুকে খানিকটা তুলার আস্তরণের উপর রাখা হইয়া থাকে, তবে অবশেষে কোনো শব্দই শ্রুতিগোচর হইবে না।

শব্দ যখন শব্দ-দায়ক বস্তুর কম্পনের উপর নির্ভর করে, তখন এই বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে যে কয়বার কম্পিত হয়, তৎসংলগ্ন বায়ুমণ্ডলও ততবার কম্পিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, বায়ুমণ্ডল প্রতি সেকেণ্ডে যত অধিকবার কম্পিত হয়, শব্দ ততই তীক্ষ্ণ হইতে থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক, আমাদের কর্ণ পৃথিবীর সমুদয় শব্দ অনুভব করিতে অক্ষম। প্রথমত অতিমাত্রায় ক্ষীণ হইলে আমরা উহা অনুভব করিতে পারি না। আবার অতি উচ্চশব্দ হইলেও কানে তালা লাগিয়া যায়, এমনকি কানের পর্দা ছিঁড়িয়া শ্রবণ-শক্তি লোপ পাইতে পারে।

আমরা জানি বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া যখন শব্দ প্রবাহিত হয়, তখন বায়ুর কণিকাগুলি একস্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া যায় না, উহারা আপন আপন জায়গায় থাকিয়াই সামান্য মাত্র অগ্র-পশ্চাৎ আন্দোলিত হয়। যখন ধানের উপর বাতাসে ঢেউ খেলিয়া যায়, তখন প্রত্যেকটি ধান গাছ আপন আপন জায়গায় থাকিয়াই একটু এদিক-ওদিক আন্দোলিত হয়। উহার স্বাভাবিক অবস্থান হইতে যতদূরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে উহার ধাবন— amlpi-tude বলা যাইতে পারে। এই ধাবনের পরিমাণ সচরাচর অতি সামান্য। শ্রুতিগোচর শব্দের জন্য ইহার নিম্নসীমা নির্ণয় করিবার যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছে, তাহার ফলে জানা গিয়াছে যে বায়বীয় অণুর ধাবন একটি অণুব্যাসার্ধের সমান (এক ইঞ্চির ২০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) হইলেই শব্দ শ্রুত হইবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, সকলের শ্রবণশক্তি সমান নহে। সুতরাং উপরি উক্ত সংখ্যা দ্বারা একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় মাত্র, ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে কোনো সীমা নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে।

আবার ধাবন শ্রুতি সীমার অন্তর্ভুক্ত থাকিলেই যে শব্দ শুনিতে পারিব, তাহা নহে; কারণ, শব্দের শ্রবণ যোগ্যতা কম্পন সংখ্যার উপরেও নির্ভর করে। বায়ু কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে

যত অধিক হইবে স্বরও তত তীব্র বা তীক্ষ্ণ হইতে থাকিবে। এইরূপ তীক্ষ্ণ হইতে হইতে কম্পন সংখ্যা যখন ৩০, ০০০ সহস্র বা ততোধিক হয়, তখন আমরা আর উহা শুনিতে পারি না; তাহাকে শব্দ নামও দেওয়া চলে না। অন্য উপায়ে আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি। একটা ডাঁসকে টিপিয়া ধরিলে খুব দ্রুত ডানা নাড়িতে থাকে। সে শব্দ অতিশয় তীক্ষ্ণ, এমনকি অনেক সময় শ্রবণসীমার বহির্ভূত। খুব দ্রুতকম্পী আন্দোলন জলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে অনেক মৎস্যের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বায়ুর কম্পন সংখ্যা কমিতে কমিতে ৩০ বা তাহার অনধিক হইলে, আমাদের কোনো নির্দিষ্ট সুরের শব্দানুভূতি জন্মে না। শব্দের আরেকটা গুণ হইতেছে তাহার ব্যঞ্জনা। একই উচ্চতার সুর, কণ্ঠ, হার্মোনিয়ম, বেহালা, এস্রাজ বা তবলা হইতে নির্গত হইলে, তাহাদের কম্পন সংখ্যা সমান থাকা সত্ত্বেও শুনিতে ঠিক এক প্রকার হয় না— যন্ত্রভেদে শব্দের প্রকৃতিই বিভিন্ন হইয়া যায়। শব্দের এই বিশিষ্ট প্রকৃতির নাম দেওয়া যাইতেছে ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনা বা প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমরা অ-আ-ই-উ-এ-ঐ-ও প্রভৃতি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারি। আপনারা সকলেই লক্ষ করিয়াছেন, বিভিন্ন স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় আমাদের বদনমণ্ডল এবং তৎসহ মুখ-গহ্বর বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। আবার মানুষের মুখাবয়বের গঠন এবং পেশী সঙ্কোচন-প্রসারণের প্রকারভেদের উপর তাহার স্বরের মিষ্টতা বা কর্কশতা নির্ভর করে। এখন, এই উচ্চারণ-ভেদে বা শব্দের উৎপত্তি ভেদে, বায়ু তরঙ্গে কি বিশিষ্টতা জন্মে, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমরা সচরাচর যে সমস্ত শব্দ শুনিতে পাই, তাহা কতকগুলি অমিশ্র বা অবিশ্লেষ্য শব্দের সমষ্টি মাত্র। খুব বৃহৎ মুখ-বিশিষ্ট লম্বা অর্গান পাইপের শব্দ অনেকটা বিশুদ্ধ বা অযৌগিক। Helmholtz সাহেব এক প্রকার শব্দ-গ্রাহী যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহা আপন আপন আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন তীক্ষ্ণতার শব্দ গ্রহণ করিয়া শব্দায়মান হইয়া উঠে। এইরূপ অনেকগুলি যন্ত্রের সম্মুখে কোনো শব্দ উৎপাদন করিলে কতকগুলি বিশেষ গ্রহণ-যন্ত্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, উহা যে-যে শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন তাহার কোন্‌টি কত তীক্ষ্ণ এবং কত দরাজ। এই সমস্ত স্বরের মধ্যে যেটির কম্পন-সংখ্যা অল্প, সচরাচর সেইটিই সর্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হয়। এবং তাহার দ্বারাই উহার তীক্ষ্ণতার অনুভূতি জন্মে। এই স্বল্পকম্পী স্বরটিকে আমরা মূলস্বর বলিয়া ধরিলে, অন্যান্য স্বরগুলিকে সহচর স্বর নাম দেওয়া যাইতে পারে। এস্থলে বলিয়া রাখি, ঘণ্টাধ্বনিতে মূলস্বরই সহচর স্বরের চেয়ে অধিক তীব্র।

বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া এই মিশ্রিত শব্দ-তরঙ্গ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। তথায় উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া শব্দানুভূতি জন্মায়। আমরা একটু অভ্যাস করিলেই কণ্ঠস্বর এবং সেতারে বা হার্মোনিয়মের সুরের মিশ্র-ভাব শব্দগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও অনায়াসে ধরিতে পারি। কানের যে এই বিশ্লেষণ ক্ষমতা আছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মেছোহাটার কল-কোলাহলের ভিতরেও অন্যান্য শব্দ উপেক্ষা করিয়া দাম-দস্তুর করা, কিংবা Concert এর ঐক্যতান বাদনে যে কোনো যন্ত্রের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়া কেবল সেইটিই শোনা, কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ইহা হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কানের এইরূপ বিশ্লেষণ ক্ষমতা আছে।

সঙ্গীতজ্ঞেরা শব্দের তীব্রতা অনুসারে, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন সপ্তকে বিভক্ত করিয়াছেন। এক সপ্তকের যে কোনো সুরের কম্পন সংখ্যা যত, পরবর্তী সপ্তকের সেই সুরের কম্পন সংখ্যা

তাহার দ্বিগুণ। মানুষের কণ্ঠে উদারা, মুদারা ও তারা এই তিনটি সপ্তক মাত্র উচ্চারিত হয় এবং কর্ণে (৩০ হইতে ৩০,০০০ বার কম্পন পর্যন্ত অর্থাৎ) নয় দশটি মাত্র সপ্তক বিদ্যমান আছে।

এ-পর্যন্ত শব্দের যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যথা (১) উচ্চতা, (২) তীব্রতা ও (৩) ব্যঞ্জনা - তাহা কিছুকাল স্থায়ী সঙ্গীতাত্মক শব্দ সম্বন্ধেই খাটে। ইহা ছাড়াও পৃথিবীতে শত শত প্রকার বিশৃঙ্খল শব্দ হইতেছে, যাহাকে (কটু) কর্কশধ্বনি বা কোলাহল বলা যাইতে পারে। বন্দুকের আওয়াজ, বাজারের কোলাহল, নদীর কলধ্বনি, হুক্কার গুড়গুড়ি, খইভাজার পটপটানি, ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, সাপের ফোঁস-ফোসানি এই-সমস্ত শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এইভাবে শব্দের শ্রেণী বিভাগ করা গেলেও অনেকগুলি শব্দকে— যেমন পাতার মর্মর, সমুদ্রের কলতান, বৃষ্টির টাপুর টুপুর-- এইগুলিকে অনেকে বিশেষত কবি বা সৌন্দর্যচর্চী' লোকেরা, কিছুতেই কটু শব্দ বলিতে স্বীকৃত হইবেন না। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে যে-শব্দের স্থায়িত্বকাল এত অল্প যে, তাহার কোনো তীক্ষ্নতা নির্ণয় করা অসম্ভব, অথবা যেগুলি বায়ুমণ্ডলে খুব অল্প সময়ে বহুবার একই প্রকারের আন্দোলন সৃষ্টি না করে, অর্থাৎ অন্য কথায় এলোমেলো শব্দকে গণ্ডগোল শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এই স্থলে বলিয়া রাখি, একদিকে যেমন অনেক টুংটাং গণ্ডগোল একত্র মিশিয়া কবির চিত্ত বিনোদন করিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি অনেকগুলি সুমিষ্ট সঙ্গীতাত্মক স্বরের একত্র মিশ্রণে কবি-অকবি সকলেরই বিরক্তিজনক শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে— এক সঙ্গে হারমোনিয়মের ৩/৪টি পাশাপাশি পর্দা চাপিয়া ধরিয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলে শেষোক্ত উক্তিটির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যাঁহারা নূতন হারমোনিয়ম শিক্ষার্থীর পাল্লায় পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ কথায় সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এ পর্যন্ত শব্দের বেগ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। রাখাল গরুর পিঠে লাঠি বসাইয়া দিলে প্রায় তৎক্ষণাৎ আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু শব্দ শুনিতে কিছুক্ষণ বিলম্ব হয়, ধোপা কাপড় কাঁচিবার সময় কাপড় পাট সংলগ্ন হইবার কিছুক্ষণ পরে আমাদের কানে শব্দটা পৌছে; স্টীমার হুইস্‌ল দিবামাত্রই চোঙ্গের কাছে সাদা ধোঁয়া দেখা যায়, কিন্তু শব্দটা শুনিতে কিছুক্ষণ বিলম্ব লাগে। এই সমস্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়, শব্দের একস্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে সময়ের আবশ্যক। শব্দ প্রতি সেকেন্ডে বাতাসের ভিতর দিয়া কতদূর চলিতে পারে, পণ্ডিতেরা তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে এক মাইল পথ অতিক্রম করিতে শব্দের প্রায় পৌনে পাঁচ সেকেন্ড সময়ের আবশ্যক। জল, মৃত্তিকা, লৌহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিতর দিয়া শব্দ-তরঙ্গ কত বেগে প্রবাহিত হয়, তাহাও নির্ণীত হইয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে সচরাচর ক্ষীণ ও উচ্চশব্দ একই বেগে প্রবাহিত হয়। তবে খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, অতি উচ্চ শব্দ ক্ষীণতর শব্দ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দ্রুতগামী। আবার শব্দের তীক্ষ্নতা ভেদেও, গতি-বেগের কোনো তারতম্য হয় না। যদি বিভিন্ন স্বর-গ্রামের সুর অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন তীক্ষ্নতার সুর সমান বেগে সঞ্চারিত না হইত, তবে দূরস্থ কোনো ব্যক্তি কনসার্ট বা সঙ্গীত অবিকৃত শুনিতে পাইত না। কোনো সুর অধিক বেগে এবং কোনোটি স্বল্প বেগে সঞ্চারিত হইবার ফলে সমুদয় জড়াইয়া গণ্ডগোল হইয়া যাইত।

শব্দ সম্বন্ধে এত অধিক কথা বলিবার আছে যে, মোটামুটিভাবেও সমুদয় কথা একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করা কঠিন। এইবার আমরা কয়েকটি শব্দ যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিব তাহা হইতেই শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

(ক) **শব্দবাহী নল** : বায়ুমণ্ডলে শব্দ উৎপন্ন হইলে, তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যত অধিক পরিমাণ স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে, শব্দের উচ্চতা ততই কমিতে থাকিবে। এজন্য দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে আর শ্রুতিগোচর হয় না। সুতরাং শব্দ দূরশ্রাব্য করিতে হইলে যাহাতে উহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া না পড়িয়া শব্দ প্রেরকের ইচ্ছামত দিকে প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটি নলের ভিতর কথা বলিলে, এই উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয়। নলের ভিতর থাকাকালীন শব্দের গতি একমুখিতা প্রাপ্ত হয়— নল হইতে বহির্গত হইলেও উহার বেশীর ভাগ সেই দিকেই চলিতে থাকে। এর কারণ উক্ত দিকে উহার উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, গ্রাহক সমুদয় শব্দ-তরঙ্গের অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিয়া থাকে; কারণ যে ছিদ্র দিয়া শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবে, সেই ছিদ্র তো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহাই কথঞ্চিৎ পরিপোষকতা হয়, কানের বহিরাবরণের দ্বারা। আপাত দৃষ্টিতে অনাবশ্যক বোধ হইলেও, কানের এই বহিঃস্থ অংশ অনেকখানি স্থানের শব্দ-তরঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কর্ণরন্ধ্রের দিকে প্রেরণ করিয়া উহার উচ্চতা বৃদ্ধি করে। বলাবাহুল্য বহিঃস্থ কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলে, আমাদের শব্দানুভূতি অনেক পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া যাইত।

(খ) **ষ্টেথোস্কোপ** : ইহার কোনো পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না। ডাক্তারেরা ইহা দ্বারা শব্দের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া রোগীর ফুসফুস এবং ত্বকের নিম্নেকার ফোঁড়া প্রভৃতির অবস্থা নির্ণয় করিয়া থাকেন।

(গ) **মাইক্রোফোন** : এই যন্ত্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে Hughes সাহেব কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। একটি তড়িৎ-প্রবাহ-পথের এক অংশে দুইটি কার্বন-খণ্ড তৃতীয় আর একটি সূচী-মুখ কার্বন-খণ্ড দ্বারা আল্‌গাভাবে সংযোজিত থাকে। এই শেষোক্ত কার্বন-খণ্ড উর্ধ্বমুখ অবস্থায় থাকে, অপর দুইটি কোনো ফ্রেমের সহিত আটকান থাকে, এই ফ্রেমের সহিত একটি সূক্ষ্ম ধাতুর পাত বা পর্দা সংলগ্ন থাকে। ইহা শব্দ বা অন্য কোনো কারণে কম্পিত হইলে সূচীমুখ কার্বন খণ্ডের অধঃস্থ ও নিম্নস্থ সংযোগ-স্থলের তড়িতাবরোধকতার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া তড়িৎ প্রবাহ বর্ধিত বা হ্রাস করে। তড়িৎ প্রবাহের এই পরিবর্তন প্রবাহ-পথ সন্নিবিষ্ট একটি টেলিফোন দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। বাহ্যত এই যন্ত্র অতি সাধারণ স্থূল বলিয়া বোধ হইলেও কার্যত ইহা অতিশয় সূক্ষ্মানুভব। এমনি পাতের উপর দিয়া সামান্য একটি মশক বা মক্ষিকা চলিয়া গেলে টেলিফোনে তজ্জনিত শব্দ বেশ উচ্চৈঃস্বরেই শুনা যায়। ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে যেমন শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় কিছু কিছু জানা যায়, মাইক্রোফোনের সাহায্যেও তেমনি মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ জলবাহী নলের ফাটল বা ভগ্নাবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তাহার স্থান নির্দেশ করা যায়। স্থান নির্দিষ্ট হইলে মেরামত করিবার সময় অনর্থক যেখানে সেখানে খুঁড়িয়া পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) **টেলিফোন** : ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল্ টেলিফোন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া যুক্ত প্রদেশ হইতে পেটেন্ট গ্রহণ করেন। টেলিফোনকে প্রেরক ও গ্রাহক উভয়রূপেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

এক খণ্ড চুম্বকের একপ্রান্তে কয়েক পাক তামার তার জড়ান থাকে। ঐ তারের একপ্রান্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত এবং অপর প্রান্ত টেলিফোনের লাইনের সহিত সংলগ্ন থাকে।

চুম্বকের ঐ প্রান্ত হইতে সামান্য দূরে সরু একটি লৌহ পাত রক্ষিত থাকে। ইহার সম্মুখে কথা বলিবার জন্য একটি (concave mouth piece) নিম্ন-মধ্য মুখ-রক্ষী থাকে। এই মুখ-

রক্ষী দ্বারা শব্দ কেন্দ্রীভূত হইয়া পূর্বোক্ত পর্দার উপর পতিত হইয়া উহাকে অনুরূপভাবে কম্পিত করে। চুম্বকের সম্মুখে ধাতুর পাতের এইরূপ কম্পনের ফলে, তারের ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবর্তিত হইয়া টেলিফোনের লাইন ধরিয়া গ্রাহক যন্ত্রের চুম্বক সন্নিকটস্থ তারের মধ্যেও প্রবাহিত হয়। পাত যেমন চুম্বকের নিকটবর্তী বা দূরবর্তী হইতে থাকে, প্রবর্তিত বিদ্যুৎও তেমনি বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বিভিন্নমুখী বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে গ্রাহক-যন্ত্রের চুম্বকের চুম্বকত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে থাকে। চুম্বকত্বের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত ইহার আকর্ষণ শক্তিরও এইরূপ পরিবর্তন হয়। এর কারণ, গ্রাহক যন্ত্রের লৌহপাতও কম্পিত হইয়া অনুরূপ শব্দ উৎপাদন করে। টেলিফোন কানের কাছে ধরিলে এই শব্দই শুনিতে পাওয়া যায়। শব্দতরঙ্গের শক্তি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হইয়া পুনরায় শব্দ উৎপাদন করে। এজন্য অভ্যাস না থাকিলে, টেলিফোনের কথা বুঝিতে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়। কারণ যেমন শব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়, এগুলি যন্ত্রের ভিতর দিয়াও ঠিক নিখুঁত বা অবিকৃতভাবে সেইরূপ শব্দতরঙ্গই আবার উৎপন্ন হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

আজ পঞ্চাশাধিক বৎসর পরেও গ্রহণ-যন্ত্রের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। তবে প্রেরণ-যন্ত্ররূপে অনেক সময় হিউগ্ সাহেবের উদ্ভাবিত মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন গ্রামোফোন, রেডিও, ফোন প্রভৃতি নানা প্রকার যন্ত্র আছে। তা ছাড়া, হারমোনিয়ম, অর্গান, বেহালা প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্য-যন্ত্রের নাম করা যায়। প্রবন্ধ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে, এই ভয়ে শব্দের সঙ্গীতের দিকটা বারান্তরে আলোচনা করিব।[১] উপরে যে যন্ত্রগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তৎসাহায্যে বর্তমান শব্দকে কি প্রয়োজনে লাগান হইতেছে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব।

(১) ঊর্ধ্ব-আকাশের অবস্থা নির্ণয়। প্রায় ১০০ বৎসর যাবৎ যন্ত্রবাহী বেলুনের সাহায্যে ঊর্ধ্ব বায়ু স্তরের চাপ, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি নির্ণয় করা যাইতেছে। তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ঊর্ধ্বে থাকিলে প্রায় সাড়ে সাত মাইল পর্যন্ত ক্রমশ তাপের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে, অতঃপর আর কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। কিন্তু এই সমস্ত বেলুন, অনুমান বিশ মাইলের উপরে উঠিতে পারে না। এতদিন মনে করা হইত, ইহার ঊর্ধ্বেও তাপ পরিমাণের আর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু বর্তমানে শব্দ-পরীক্ষা দ্বারা এ ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় বিস্ফোরক তোপ-ধ্বনি বা তৎসদৃশ প্রচণ্ড শব্দের গতি, বেগ, শ্রুতি গোচরতা ইত্যাদি বিষয়ের ধারাবাহিক পরীক্ষা করা হইয়াছে। অল্ডে ব্রোহক, লা কূর্টন এবং জুটার বর্গে যথাক্রমে ১৯২৩, ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে পূর্ব-ঘোষিত সময়মত তোপধ্বনি করা হইয়াছিল এবং নিকটে, দূরে নানা স্থান হইতে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে জানা গিয়াছে, শব্দের উৎপত্তি স্থানের নিকট উহার বেগ কিঞ্চিৎ অধিক, আরও দূরে শব্দ ক্ষীণতর এবং বেগ স্বাভাবিক। অতঃপর কিয়দ্দূর পর্যন্ত কোনো শব্দই শ্রুত হয় না, কিন্তু আরও দূরে আবার অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শব্দ শ্রুতি-গোচর হয়, কিন্তু এই শব্দ পৌঁছিতে অস্বাভাবিকরূপ দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হয়। সে শব্দ প্রথমত ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে প্রবাহিত হইয়া পরে তথা হইতে প্রত্যাবর্তিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে, তাহাই অধিক বিলম্বে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতার সহিত শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অধিকতর ক্ষীণ না হইবার কারণ, অনুমান ১০০ মাইল বা তদপেক্ষা অধিক দূরে অনেকগুলি শব্দতরঙ্গ একসঙ্গে

---

১. দ্রষ্টব্য 'বাদ্য-যন্ত্রের স্বর-ভঙ্গী', দ্বিতীয় খণ্ড। (সম্পাদকের পাদটীকা)

অবতরণ করে। শব্দের বেগ ঊর্ধ্বস্তরে নিম্নাপেক্ষা অধিক না হইলে এইরূপে ক্রমশঃ দিক পরিবর্তন করিয়া অবশেষে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করা সম্ভবপর হইত না। নিউটন নির্ণয় করিয়াছেন, শব্দের বেগ বায়ুমণ্ডলের চাপ এবং উহার ঘনতার ভাগফলের উপর নির্ভর করে। তাপ পরিমাণ সমান থাকিলে এই ভাগফলও সমান থাকে, কিন্তু তাপ পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহাও অধিক হয়। এজন্য মনে করা যায় যে, উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের তাপ পরিমাণ অধিক। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, প্রায় ১০ মাইল উর্ধ্ব বায়ুমন্ডলের তাপ পরিমাণ অধিক। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, প্রায় ১০ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত তাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, অতঃপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে ২০ মাইল উর্ধ্বে ভূ-পৃষ্ঠের তাপের সমান হয়, পরে আরও বাড়িতে বাড়িতে ৩৫ মাইল উর্ধ্বে তাপ পরিমাণ প্রায় ৭০ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) হয়। ইহা পুরাতন ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, প্রজ্জ্বলিত উল্কাপাত পর্যবেক্ষণ করিয়া ঠিক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গিয়াছে।

(২) কামানের অবস্থান নির্ণয়। যুদ্ধে শত্রু পক্ষের কামানের অবস্থান নির্ণয় করিবার প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। অন্ততঃপক্ষে তিনটি বিভিন্ন স্থানে ঠিক কোন্ সময় কামানের শব্দ অনুভূত হয়, মাইক্রোফোনের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করিতে হয়। তিনটি স্থানেই মাইক্রোফোন স্থাপন করিয়া তাহা হইতে তার লইয়া একটি মাত্র ফলকের উপর বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে শব্দের আগমন সংকেত গ্রহণ করা হয়। মনে করুন ক, খ, ও গ তিনটি স্থান। ক-তে শব্দ পৌছিবার কতক্ষণ পরে খ ও গ-তে শব্দ পৌছিয়াছে; পূর্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায়। এই সময়ের ব্যবধানে শব্দ যতদূর যাইতে পারে, ততটা ব্যাসার্ধ লইয়া যথাক্রমে খ ও গ-কে কেন্দ্র করিয়া দুইটি বৃত্ত অঙ্কিত করা গেল। এখন এমন একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে যাহা এই বৃত্তদ্বয়কে স্পর্শ করে, এবং ক-এর ভিতর দিয়া গমন করে। স্পষ্টই অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইতেছে, এই বৃত্তের কেন্দ্রই শব্দের উৎপত্তিস্থল। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ বলিয়া বোধ হইলেও কার্যক্ষেত্রে কয়েকটি উৎপাত আছে। প্রথমতঃ কামান হইতে দুই প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়; একটি কামান দাগার শব্দ, অপরটি দ্রুত নিক্ষিপ্ত গোলার শব্দ। প্রথমটিতে বায়ুমণ্ডলে বিপুল আলোড়ন হয়, অথচ ইহার কম্পন সংখ্যা সামান্য এবং স্থায়িত্ব কালও অল্প। দ্বিতীয়টি দীর্ঘস্থায়ী, দ্রুত-কম্পী এবং মাইক্রোফোনের সাহায্যে সহজে উপলব্ধ হয়। এই শেষোক্ত শব্দটিই মাইক্রোফোনের নিকট অগ্রে পৌছিয়া থাকে। ইহাকে যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া প্রথমোক্ত শব্দ মাইক্রোফোনে গ্রহণ করিবার জন্য, ইহার সম্মুখে খুব বৃহদাকার শব্দ-গ্রাহী যন্ত্র স্থাপন করা হয়। বলা বাহুল্য, শব্দ-গ্রাহী যন্ত্র যত বৃহৎ হয়, ততই স্বল্পকম্পী শব্দ গ্রহণ করিবার জন্য অধিক উপযোগী হয়। আবার কামান দাগার শব্দ কত বেগে ধাবিত হয় জানিতে হইলে কোন জাতীয় কামান বর্ষিত হইতেছে তাহা জানা চাই। ইহার এই গতি-বেগ আবার সর্বদা সমান থাকে না, প্রথমে সাধারণ শব্দ অপেক্ষা দ্রুত বেগে প্রবাহিত হইয়া, উহার আন্দোলন বা ধাবন পরিমাণ হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে গতি-বেগ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত নানা কারণে শব্দের উৎপত্তিস্থল সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। তথাপি এই উপায়ে ২০০ গজ দূরত্ব পরিমাপ করিতে মাত্র ১ গজ এদিক ওদিক হয়।

(৩) এরোপ্লেন কিংবা কামানাদির অবস্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিগত মহাযুদ্ধের সময় অন্য এক উপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছিল। শব্দ কোন দিক হইতে আসিতেছে— অগ্র-পশ্চাৎ

হইতে না দক্ষিণ-বাম হইতে তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি। দক্ষিণ-বাম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিন্তু সম্মুখ ও পশ্চাৎ লইয়া অনেক সময় খট্‌কা লাগে। কিন্তু মস্তক একটু দক্ষিণে কি বামে হেলাইয়া, কিংবা একটা কানে একটু হাতের আড়াল করিয়া আমরা সহজেই এই দুই দিকের মধ্যে প্রকৃত দিক নির্ণয় করিতে পারি। মনে করুন একটি শব্দ সম্মুখ হইতে আসিতেছে। ঠিক সোজা সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে উভয় কর্ণে শব্দ ঠিক একই সময়ে প্রবেশ করিবে। আবার ঐ শব্দ ঠিক পশ্চাৎ হইতে আসিলেও তাই। এজন্য সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক লইয়া একটু গোলমাল বাধে। কিন্তু মস্তক দক্ষিণ দিকে ঘুরাইলে সম্মুখ হইতে আগত শব্দ অগ্রে বাম কর্ণে প্রবেশ করায় মনে হইবে যেন শব্দ বাম দিক হইতে আসিতেছে এবং ঐ কারণে পশ্চাৎ হইতে আগত শব্দটি মনে হইবে যেন ডান দিক হইতে আসিতেছে।

যাহা হউক, শত্রু-সৈন্য সম্মুখে আছে না পশ্চাতে আছে তাহা আর এরূপ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিবার প্রয়োজন হয় না। দুই কাণে দুইটি চর্মহীন প্রকাণ্ড কর্ণঢাক সংযুক্ত করিয়া দিলে অতি সূক্ষ্ম শব্দও অতিরঞ্জিত হইয়া অনুভব যোগাইতে পারে। কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত কর্ণঢাক দুইটির এক মুখ খুব সরু থাকে। উহাদিগকে সামান্য ব্যবধানে সমসূত্রে রাখিয়া উহাদের সরু মুখ হইতে সমান দীর্ঘ দুইটি নমনীয় নল লইয়া পর্যবেক্ষকের দুই কর্ণে সংযোজিত হয়। এই দুইটি ঢাকই এক সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল রাখিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরান যায়। এইরূপ ঘুরাইতে ঘুরাইতে যে অবস্থায় শব্দ ঠিক সম্মুখ বা পশ্চাৎ হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয় সে অবস্থায় ঐ ঢাকদ্বয়কে একটি দৈত্যের কর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বুঝা যায় যে শব্দ ঐ দৈত্যের ঠিক সম্মুখ বা পশ্চাদ্ভাগ হইতে আসিতেছে। এই রূপে শত্রুর কামানের দিক নির্ণয় করা যায়। কিছুদূর হইতে আরেকজনে এই রূপ দিক নির্ণয় করিলে, কামানের অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি শব্দায়মান বস্তুর দিক্ নির্ণয় করা যায়। এরোপ্লেনের শব্দ হইতে উহার অবস্থান নির্ণয় করিতে হইলে, উহা কোন্ দিকে আছে, তার সঙ্গে কত উর্ধ্বে আছে, তাহাও জানিতে হইলে ঢাকের বৃহৎ মুখ ভূমির সহিত সমতল করিয়া না রাখিয়া একই লম্বরেখা একটির উপরে আরেকটি রাখিতে হয়। এই ঢাকদ্বয়কে পূর্বের ন্যায় বৃহৎ কাণ বরিয়া ধরিয়া লইলে, বোধ হইবে যেন দৈত্যটি পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। দৈত্যটি এপাশ ওপাশ করিয়া বিভিন্ন অবস্থায় শয়ন করিলে, কর্ণদ্বয়ে যে প্রকার গতি বিধি হয়, উক্ত ঢাকদ্বয়কে সেইভাবে ঘুরান যায়। এইরূপ ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক অবস্থার শব্দকে পূর্ববৎ সম্মুখ বা পশ্চাৎ হইতে আগত বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতে, পূর্বোক্ত নিয়ম দ্বারা এরোপ্লেন ঠিক কত ডিগ্রী উর্ধ্বে অবস্থিতি করিতেছে তাহা সহজেই জানা যায়।

(৪) দ্বি-কর্ণিক শব্দ দিকানুভূতি হইতে কেমন করিয়া কামান ও এরোপ্লেনের অবস্থান নির্ণয় করা যায় তাহা দেখান গেল। এইরূপে জলের ভিতর সাব-মেরীনের শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাহার দিক, অবস্থান ও গতিবিধির বিষয়ও জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া আর একটি উপায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা যাইতেছে। জলের ভিতর যে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যায় তাহাকে হাইড্রোফোন বলা হয়। অবশ্য, মাইক্রোফোন যাহাতে জল লাগিয়া নষ্ট হইতে না পারে, এজন্য উহাকে কাষ্ঠ কিম্বা ধাতব আবরণের ভিতর রাখা হয়, এবং দৃঢ় ইস্পাত কিম্বা অন্য কোনো কঠিন পদার্থের নলদ্বারা জলের ভিতর ডুবাইয়া দিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। জাহাজের উপর হইতে এই নলটি ঘুরাইলে, নিম্নস্থ মাইক্রোফোনও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে

থাকে। যে অবস্থায় উহার শব্দ ক্ষীণতম বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা শোনাই যায় না সে অবস্থায় বুঝিতে হইবে, শব্দ মাইক্রোফোনের পাতের সহিত সমান্তরালভাবে আসিতেছে। লম্বভাবে আসিলে পাতকে কম্পিত করিয়া শব্দ উৎপাদন করিত। কিন্তু ইহাতে দুইটি বিপরীত দিকের মধ্যে ঠিক কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। নৌ-বিভাগের পরীক্ষাগারের একটি আবিষ্কার দ্বারা ইহার সুমীমাংসা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে মাইক্রোফোনের একদিকে কোনো ভারী পদার্থের পুরু ফলক যবনিকা (block) সংযোজিত করিয়া দিয়া উহাকে সেই দিকে "বধির" করিয়া দেওয়া যায়। এই পদার্থটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে আঘাত করিলে থপ থপ শব্দ হয়, টনক শব্দ উৎপন্ন হইলে চলিবে না। তাহা ছাড়া উহার অভ্যন্তরে বিশেষ আয়তনের একটি গহ্বর থাকা প্রয়োজন, এবং মাইক্রোফোন হইতে ইহা কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে রক্ষিত হওয়া চাই। ইংরেজীতে ইহার নাম দিয়াছে Baffle আমরা ইহাকে "রোধক" বলিতে পারি। শব্দ আসিয়া প্রথমে রোধকের উপর পড়িলে মাইক্রোফোনে উহার কোনো প্রভাব লক্ষিত হইবে না, কিন্তু শব্দ প্রথমে মাইক্রোফোনের উপর পড়িলে উহা যথারীতি প্রভাবিত হইবে। ইহা হইতে সহজেই শব্দাগমের প্রকৃত দিক নির্ণয় করা যায়।

(৫) মাইক্রোফোনের ন্যায় যন্ত্রই ভূ-গর্ভে ব্যবহৃত হইলে তাহার নাম হয় জিওফোন। ইহার সাহায্যে শত্রুরা কোন্ দিকে এবং কতদূরে পরিখা প্রভৃতি খনন করিতেছে, তাহা জানিতে পারা যায়। যুদ্ধের সময় একবার বৃটিশ সৈন্যেরা জার্মানীদের বৈদ্যুতিক তার কাটিয়া দিবার জন্য সুড়ঙ্গ কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় জিওফোন সাহায্যে জানা গেল যে, জার্মান সৈন্যও সুড়ঙ্গ কাটিতেছে এবং তাহারা মাত্র ৪/৫ হাত দূরে রহিয়াছে। তাহাদের কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা সমস্তই শোনা যাইতে লাগিল। তখন অনেকগুলি জিওফোনের সাহায্যে নির্ণয় করা গেল যে, তাহারা বৃটিশ লাইনের সহিত সমান্তরালভাবে কাটিয়া চলিতেছে। কাজে কাজেই বৃটিশ সৈন্য নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া মতলব মত জার্মান তার কাটিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। যদি জার্মানরা বৃটিশ পরিখা ভেদ করিয়া ফেলিত তবে মিত্রশক্তির পূর্বোক্ত আয়োজন বৃথা হইত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা ইহার উদ্ভাবন করেন। জিওফোন যন্ত্রে একটি কাঠের বাক্সের ভিতর দুই খণ্ড অভ্রের পাত একটির উপরে আরেকটি রক্ষিত হয়। ইহাদের অন্তর্বর্তী স্থান পারদ দিয়া পূর্ণ থাকে, এবং বাক্স ও পাত-দ্বয়ের মধ্যবর্তী শূন্য স্থান হইতে যথাক্রমে দুইটি নল গিয়া পর্যবেক্ষকের দুই কর্ণে সংযুক্ত হয়। শব্দের আগমনে কাঠের বাক্স কম্পিত হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভারী পারদ স্থির থাকে। এ কারণে পূর্ব-কথিত শূন্য-স্থানে বায়ুর চাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ইহাই নলের সাহায্যে কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দানুভূতি জন্মায়।

জিওফোনের সাহায্যে খনির ভিতরকার বিপদগ্রস্ত লোকদিগের উদ্ধার কার্যও সাধিত হইয়া থাকে। দুইটি জিওফোনের সাহায্যে অনায়াসে কোনো দিক হইতে এবং কত দূর নিম্ন হইতে বিপদগ্রস্তের সঙ্কেত আসিতেছে, প্রথমে তাহা নির্ণয় করিয়া, সেই দিকে দ্রুত খনন কার্য অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব হইতেই তাহাদিগকে বিপদকালে কোন ধাতু-নির্মিত দণ্ড বা নলের উপর আঘাত করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া থাকে, কারণ ইহার ভিতর দিয়া শব্দ অপেক্ষাকৃত দ্রুততা ও উচ্চতার সহিত আগমন করিতে পারে। কিন্তু নরম মৃত্তিকা পড়িয়া নলের অধিকাংশ স্থান আবৃত হইয়া গেলে ইহার শব্দবাহী ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পায়; তখন নলের ভিতরকার বায়ুই শব্দ-বাহকের কাজ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন কারণে

নলটি ভাঙিয়া গেলে ইহার ভূ-পৃষ্ঠস্থ মুখ হইতে শব্দের প্রতিধ্বনির সময় নিরূপণ করিয়া ঠিক ভগ্ন স্থানটি নির্দেশ করা যায়। জিওফোনের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ জলের পাইপের কোথায় ফাটল থাকিলে তাহাও নির্ণয় করা যায়।

ভূগর্ভে শব্দকে আর একভাবেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জার্মানীর গটিংগেনে মূল্যবান খনি প্রভৃতি আবিষ্কারের এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহার খুঁটিনাটি কার্যপ্রণালী এখনও ব্যবসায়ের গুপ্তবিদ্যা বলিয়া ভালরূপে জানিতে পারা যায় নাই।

শব্দের আর ২/১টি মাত্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াই আজকার মত শেষ করিব। রাত্রিকালে কিম্বা কুয়াশার মধ্যে সমুদ্রের ভিতরেই হউক, কিম্বা সঙ্কীর্ণ নদীতেই হউক, নির্দিষ্ট পথ দিয়া হাজাজ-ষ্টীমার চালাইবার জন্য হাইড্রোফোন ব্যবহার করা যাইতে পারে। জলের মধ্যে স্থানে স্থানে নিমজ্জিত ঘণ্টা রাখা হয়। কি প্রকারে ঠিক সম্মুখবর্তী ঘণ্টার শব্দ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে জাহাজ চালান যায়, ইতিপূর্বেই তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপে একটির পর একটি ঘণ্টা অতিক্রম করিয়া হাজাজ নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে।

জাহাজ চালাইবার সময় প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। জলের ভিতর দিয়া কোনো শব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া উহা কতক্ষণ পরে সমুদ্রের তলদেশ হইতে প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রপৃষ্ঠে উপস্থিত হয় নির্ভুলরূপে জানিতে পারিলে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা কিছুই শক্ত নয়। টিউনিংফর্ক বা শব্দোৎপাদক শলাকা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা সময়ের খুব সূক্ষ্ম পরিমাপ পাইয়া থাকেন। পূর্বে এইরূপ শলাকাই ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে, প্রেরিত বিস্ফোরক বা পিস্তলের শব্দ দ্বারা তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক উপায়ে একটি চাক্‌তিকে কোন নির্দিষ্ট বেগে চালিত করা হয়।

অতঃপর শব্দ প্রত্যাবর্তন করিয়া মাইক্রোফোনে লাগিবা মাত্র উহা বন্ধ হইয়া যায়। একটি নির্দেশক শলাকার অবস্থান হইতে উক্ত চাক্‌তি কতবার ঘুরিয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। ইহা হইতেই সময় নিরূপণ করিয়া তৎসাহায্যে জলের ভিতর শব্দের বেগ সেকেন্ডে প্রায় ১৪৪০ মিটার ধরিয়া লইয়া সমুদ্রের গভীরতা সহজেই নির্ণয় করা যায়। অধিকাংশ যন্ত্রেই নির্দেশক শলাকা সময়ের পরিবর্তে একবারেই সমুদ্রের গভীরতা জ্ঞাপন করে। বলা বাহুল্য এইগুলিই ব্যবহার করিতে অধিক সুবিধা। প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করিবার উপায় সর্বপ্রথম বেহ্‌ম সাহেব উদ্ভাবিত করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রকে তিনি "বেহ্‌ম লট" নাম দিয়াছেন। বেহ্‌ম লটের সাহায্যে এরোপ্লেন হইতে পৃথিবীর দূরত্ব নির্ণয় করা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে কিম্বা কুয়াসার সময় বেহ্‌ম লট বড় কাজে আসে। এরোপ্লেন অতি ঊর্ধ্বে থাকিলে ব্যারোমিটার বা বায়ুমান যন্ত্রের সাহায্যে উহার উচ্চতা নিরূপণই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। যাহা হউক, "বেহ্‌ম লট" দ্বারা শুধুই যে উচ্চতা নিরূপণ করা যায় এরূপ নহে। নিম্নে জল না মৃত্তিকা; মৃত্তিকা হইলে তাহা সমতল কি অসমতল, কঠিন কি আর্দ্র, নিকটে পাহাড় কিম্বা বৃক্ষলতাদি আছে কিনা, ইত্যাদি নানা বিষয় অনেকটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়। অনেকেই হয়ত লক্ষ করিয়াছেন, জল হইতে শব্দের যেরূপ উচ্চ প্রতিধ্বনি হয়, মৃত্তিকা হইতে তদপেক্ষা অল্প এবং বরফ মিশ্রিত আর্দ্র মৃত্তিকা হইতে আরও অল্প হইয়া থাকে! ভগ্ন স্থান, উচ্চ-নীচ মৃত্তিকা অথবা পাহাড় পর্বতের নিকটবর্তী স্থান হইতে একটি ধ্বনির পরপর অনেকগুলি প্রতিধ্বনি হয়। এই প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে বহু অভিজ্ঞতার ফলে, এরাপ্লেন হইতে প্রতিধ্বনির উচ্চতা ও স্বরূপ লক্ষ করিয়া বিমানবিহারী কিরূপ স্থানের উপর দিয়া চলিতেছেন তাহা প্রায় ঠিক ঠিক অনুমান করিয়া লইতে পারেন।

# গাণিতিক চিন্তাধারা

আজকাল অঙ্কশাস্ত্র এতই বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে যে কারো পক্ষেই এর সমুদয় শাখার দ্রুত প্রগতি সম্বন্ধে ওয়াকেফ থাকা সম্ভব নয়। অঙ্কের মৌলিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে গবেষণা করে স-ইয়ার সাহেব মন্তব্য করেছেন :

১৯৫১ সালে গণিত সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্তসার লিখিতেই বড় কাগজের ৯০০ পৃষ্ঠা লেগেছিল। উক্ত প্রবন্ধগুলো আবার সমস্তই নতুন বিষয়ের উপর লেখা, পুরানো জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি নয়। গণিতে যে-হারে জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে, তার খবর রাখতে হলে দৈনিক ১৫খানা প্রবন্ধ পড়ে শেষ করতে হয়; তাতে আবার অধিকাংশই বিশিষ্ট পারিভাষিক বিবরণে পরিপূর্ণ। অবশ্য এই দুরূহ কাজে হাত দেওয়ার কল্পনা কারো মনে আসবার কথা নয়।

গণিতের বিষয়বস্তু এতই বিভিন্ন প্রকার যে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হলে গণিতজ্ঞদের রচিত শত শত বিষয়ের উল্লেখ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, গণিতজ্ঞেরা যা করেন তাই অঙ্কশাস্ত্র। যাহোক এইসব জটিলতার ভিতর চোখ বুলিয়ে গেলে একটা ধারা চোখে পড়ে; আর এইসব সাধারণ ধরন-ধারণের আলোচনাকেই অঙ্কশাস্ত্রের মূল কথা বলা যেতে পারে।

যেকোনও প্রশ্নের মূল অন্বেষণ করতে হলে তার থেকে অনাবশ্যক কথাগুলো ছেঁটে ফেলতে হয়। স-ইয়ার একটি উদাহরণ দিচ্ছেন :

"এক গ্লাসে ১০ চামচ পানি আছে, অপর একটি গ্লাসে আছে ১০ চামচ শরবৎ। প্রথম গ্লাস থেকে এক চামচ পানি দ্বিতীয় গ্লাসে ঢেলে খুব করে নেড়ে দেওয়া হলো। তারপর দ্বিতীয় গ্লাস থেকে ঐ মিশ্র পদার্থের এক চামচ আবার প্রথম গ্লাসে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এই প্রক্রিয়ার পরে প্রথম গ্লাসে শরবতের পরিমাণই অধিক, না দ্বিতীয় গ্লাসের পানির পরিমাণই অধিক হবে?"

অঙ্কটা কষে দেওয়ার আবশ্যক নেই, পাঠকেরা কেবল এই প্রশ্নের অনাবশ্যক কথাগুলো ছেঁটে ফেলতে চেষ্টা করুন। সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি সঙ্কেত দেওয়া যাচ্ছে যে, গ্লাস দুটোতে যদি তরল পদার্থের পরিমাণ ১০ চামচ করে না হয়ে x চামচ করে থাকতো, আর আদান-প্রদানও একবার করে না হয়ে y বার হতো, তাহলেও প্রশ্নটির উত্তর এখন যা আছে তখনও তা-ই থাকতো।

কখনও কখনও অপেক্ষাকৃত সহজ একটি প্রশ্নকেই সামান্য ছদ্মবেশে পরিবেশন করা হয়। ছেলেবেলাকার এই সমস্যাটির কথাই ধরুন :

এক গোয়ালার একটি তিন সেরী আর একটি পাঁচ সেরী পাত্র আছে; তাই দিয়েই সে ভাণ্ডার থেকে সকলকে দুধ মেপে দেয়। এক খরিদ্দার চার সের দুধ কিনতে চায়। গোয়ালা কেমন করে দেবে?

এখানে অঙ্কটাকে অন্য কথায় এইভাবে বলা যেতো :

"শুধু যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন এবং ৩ ও ৫ এই অঙ্ক দুটো ইচ্ছামত ব্যবহার করে ১-কে প্রকাশ কর। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ৩+৩-৫=১; সুতরাং গোয়ালা করবে কি, প্রথমে ক্রেতাকে ৩ সের দেবে, তারপর উপরের সরল অঙ্কটি থেকে আর ১ সের দেওয়ার উপায় অনায়াসে তার মাথায় আসবে। অন্যভাবে দু'সের দু'সের করেও চার সের দিতে পারে। ৫-৩=২; ২+২=৪"। পাটীগণিতের এইটুকু জানলেই গোয়ালা ১ সের, ২ সের, ৩ সের, ৪ সের, ৫ সের ইত্যাদি যত সের ইচ্ছা তত সের দুধ মেপে দিতে পারে।

কিন্তু এই ছদ্মবেশ, পর-সজ্জা বা আত্মগোপন সবসময়ে এতটা স্পষ্ট থাকে না। অনেক সময় আল্-জাব্রার 'অভেদ'গুলো জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ক্রমযোজিত পর্যায়, ক্রমগুণিত পর্যায়, সংখ্যা-বিজ্ঞান, গতি-বিজ্ঞান, সম্ভাব্যতা প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে গ্রহণ করা হয়। তখন শুধু আল্-জাব্রার সাহায্যে সেগুলো প্রমাণ করা বেশ কঠিন হতে পারে। সচরাচর ব্যবহৃত অনেক বীজগাণিতিক ফাংশন বা নির্ভরণ অতি-জ্যামিতিক নির্ভরণেরই বিশেষ রূপ মাত্র। নির্ভরণটি এই :

$$F(a,b;c;x=1+\frac{a.b}{c}\cdot\frac{x}{1!}+\frac{a(a+1)b(b+1)}{c(c+1)}\cdot\frac{x^2}{2!}$$

$$+\frac{a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)}{c(c+1)(c+2)}\cdot\frac{x^2}{3!}$$

সুবিধা মত a,b,c ও x নির্বাচন করে এর থেকে শুধু যে ক্রমগুণিত পর্যায় $(1\text{-}x)^{-1}$-ই উৎপন্ন করা যায়, তা নয়; $(1\text{-}x)^{-n}$, $\log(a\text{-}x)$, $\tan^{-1x}$, $e^x$, $1/_2(\sin^{-1}x)^2$, বেসেল ফাংশন, লেজেণ্ডার বহুপদী (পলিনোমিয়াল) প্রভৃতি অনেক নির্ভরণ শ্রেণী উৎপাদন করা যায়। ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত চিহ্ন i ও w কে যথাক্রমে অক্ষরেখার ৯০ ও ১২০ ঘূর্ণনের সমার্থ মনে করা যায়। Matrix বা ছক-কে দুই, তিন বা বহু বিস্তার বিশিষ্ট পদার্থের, অথবা তড়িৎ, বায়ুমণ্ডল, স্থির জল, আলোক-কণা প্রভৃতির চাপ বা পেষণ-পরিমাণের প্রতীক হিসাবে ভাবা যেতে পারে। এইসব আলোচনা করতে করতে দেখা গেছে, পাটীগণিতের পরিবর্ত গুণন-সূত্র, (a×b=b×a), সবসময় খাটে না। সুতরাং গুণনের পরিবর্ত নিয়ম ত্যাগ করেই ভিন্ন আল্জাব্রা তৈরী হয়েছে। এইভাবে, নির্ণায়ক-কে মনে করা যায় সংশ্লিষ্ট বর্গ-ছকের সঙ্কোচন, প্রসারণ বা আকৃতি বৈলক্ষণ্যের পরিমাপক হিসাবে।

পাশের চিত্রে PA, PB, PC, PD চারটি সরল রেখা একই বিন্দু থেকে বের হয়েছে, আর ABCD ও A′B′C′D′ সরল রেখা দুটো এগুলোকে ছেদ করেছে যথাক্রমে A, B, C, D ও A′, B′, C′, D′ বিন্দুতে।

$\frac{AB.CD}{BC.DA}$ বা $\frac{A'B'.C'D'}{B'C'.D'A'}$ কে Cross-ratio বা কাটাকাটি অনুপাত বলা হয়। AD সরল রেখার যেকোন বিন্দু, O, কে আরম্ভ-বিন্দু বা মূল
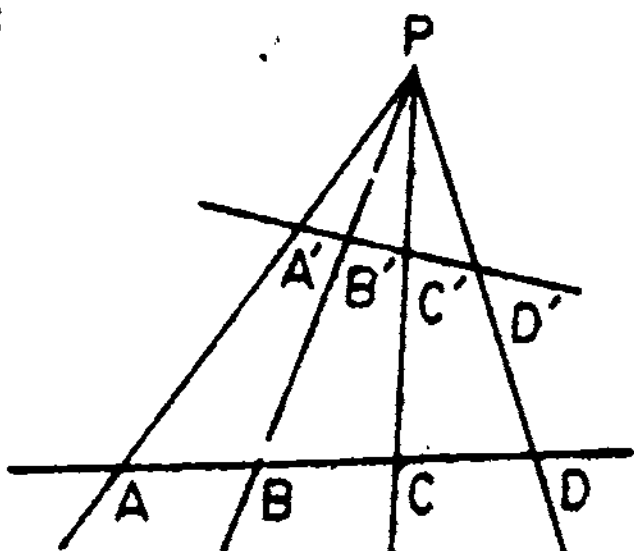
বিন্দু ধরে সেখান থেকে A, B, C ও D দূরত্বকে a, b, c ও d মনে করলে, কাটাকাটি অনুপাতকে আলজাব্রায় প্রকাশ করা যায় এইভাবে :

$$F(a,b,c,d)=\frac{(a-b)(c-d)}{(b-c)(d-a)}$$

অনুরূপভাবে $$F(a', b', c', d')=\frac{(b'-b')(c'-d')}{(b'-c')(d'-a')}$$

প্রমাণ করা যায় যে, যেকোনও ছেদকের উপরেই F নির্ভরণটি নেওয়া হোক না কেন, এর মান শুধু p থেকে প্রক্ষিপ্ত রেখাগুলোর উপরেই নির্ভর করবে, ছেদকের অবস্থানের উপর নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে F=-1 হলে তখন ছেদকের উপরকার বিন্দুগুলোকে বলা হয় harmonic range বা সুমিত পরিক্রম। এই পরিক্রমের গুণাবলী জ্যামিতিক আলোক-বিজ্ঞান এবং প্রক্ষেপ-জ্যামিতিতে কাজে লাগে। এখানে বলা আবশ্যক, বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে জ্যামিতিক প্রক্ষেপ করলে কোণ এবং দৈর্ঘ্যাদির পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু এই কাটাকাটি অনুপাত ঠিকই থাকে। এজন্য সুমিত পরিক্রমের যেকোনও তিনটি বিন্দু দেওয়া থাকলে প্রক্ষেপ জ্যামিতির সাহায্যে এর চতুর্থ বিন্দুটি শুধু স্কেলের সাহায্যেই নির্ণয় করা যায়।

উপরে যে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল তাতে পাটীগণিত, আলজাব্রা ও জ্যামিতির কয়েকটা মিলন-ক্ষেত্র এবং পদার্থবিদ্যার সঙ্গে এদের সংশ্রব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে বিশুদ্ধ গণিত আর পদার্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য শুধু বাস্তব জগতের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ মাত্র। পদার্থবিদ কতকগুলো বিষয় স্বীকার করে নিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা আবার বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তবেই স্বীকৃতির উপযোগিতা নির্ণয় করেন। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ গণিতবিদ কতকগুলো সুসমঞ্জস স্বীকৃতি নিয়েই সিদ্ধান্ত করে যান; বাস্তবের সঙ্গে কোনও মিল হোক বা না হোক, তার পরোয়া করেন না। বিশুদ্ধ গণিত প্রণালীসম্মত তর্ক বা যুক্তির সাহায্যে চলতে চলতে হয়ত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কতকগুলো এমন সম্প্রসারক নিয়ম ঘোষণা করেন, যা করতে বেশ খানিকটা সাহসের দরকার। যুক্তি থেকে উদ্ভূত হলেও প্রথম প্রথম লোকে এইসব বিষয় বিশ্বাস করে নেয়, পরে হয়ত এর তাৎপর্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে লোকের প্রত্যয় জন্মান হয়। শূন্য, বিয়োগ সংখ্যা, ভগ্নাংশ, অবাস্তব বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও উর্ধ্বতর প্রসারের উৎপত্তি এইভাবেই হয়েছে। পরে দেখা গেছে, এদের সাহায্যে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং গাণিতিক বিশ্লেষণের পথ সুগম হয়েছে।

এখন সংক্ষেপে অন্-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি এবং সীমিত জ্যামিতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রধান লক্ষণ এই : (১) সমকোণী ত্রিভুজের বেলায় বাহুগুলোর বর্গ সম্পর্কিত পিথাগোরাসের নিয়মের প্রযোজ্যতা; (২) যেকোনও বিন্দুর ভিতর দিয়ে ঐ বিন্দুর বহিঃস্থ যেকোনও সরলরেখার সঙ্গে একটি মাত্র সমান্তর সরলরেখা অঙ্কন করা যায়, এই স্বতঃসিদ্ধের স্বীকৃতি। হয়ত বা শুধু অভ্যাসের বশেই ইউক্লিডীয় জ্যামিতি আমাদের কাছে বেশ স্বাভাবিক ঠেকে। যাহোক, অন্য প্রকার সম্ভাবনার বিষয়ও সময় সময় প্রস্তাবিত হয়েছে, এমনকি, তা যুক্তিসহ বলে মেনে নেওয়াও হয়েছে। একটি সম্ভাবনা এই যে
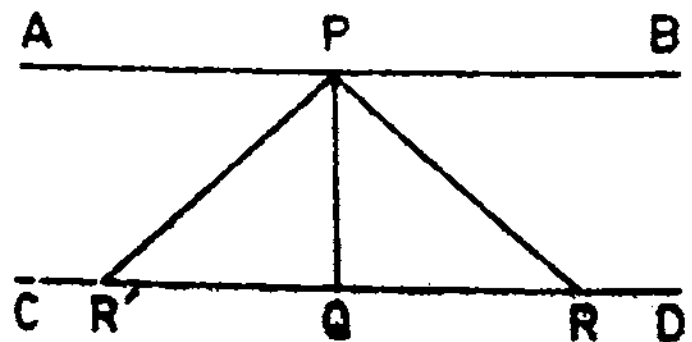
সমান্তর সরল রেখাগুলো সত্যি সত্যি কোথায়ও মিলিত হয়, (অন্য কথায়, সমান্তর সরল রেখা বলে কোন কিছু নেই, যেকোন দুটো সরল রেখারই একটি সাধারণ বিন্দু থাকবেই)। অন্য সম্ভাবনাটি এই :

একটি সমতলে যদি AB এবং CD এমন দুটি সরল রেখা হয় যাদের উপর PQ একটি সাধারণ লম্ব (পার্শ্বস্থ চিত্র) তাহলে CD-র উপর Q এর উভয় পার্শ্বে সমান দূরে R ও Ŕ দুইটি বিন্দু নিলে QR ও QŔ যতই বড় হোক না কেন, <QPŔ এবং <QPR কখনই ৯০-র সমান হতে পারে না, সর্বদাই তার থেকে একটি ন্যূনতম সূক্ষ্ম কোণের ব্যবধান থাকবে। এই সূক্ষ্ম কোণটিকে <D ধরলে, <D যদি অতিশয় ক্ষুদ্র হয় (যেমন ১ ডিগ্রীর কোটি ভাগের এক ভাগ), তাহলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই জ্যামিতির সঙ্গে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পার্থক্য সামান্যই থাকবে এবং BPR এবং APŔ-এর মধ্যবর্তী অসংখ্য সরলরেখা P-র ভিতর দিয়ে যাবে এবং এদের প্রত্যেকটিই CD-র সঙ্গে সমান্তর হবে।

কল্পনা দ্বারা বিশেষ বিশেষ জগতের নির্দেশ করা গেছে, যেখানে উপর্যুক্ত অন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিগুলো সত্যি সত্যি খাটে। সরলরেখা এবং ক্ষুদ্রতম দূরত্বের ধারণা হয়ত আমরা যে জগতে বাস করি তার উপর এবং ঐ জগতের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্বন্ধে আমাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। এই ত, আমরা যে জগতে বা পৃথিবীতে বাস করি তাকে সমতল না বলে বর্তুলাকার বলাই অধিক সঙ্গত। বর্তুলের উপর ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টির কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, আর এই পরিমাণ সর্বদাই দুই সমকোণের চেয়ে অধিক। তবু, আমরা প্রায় সকলেই ভাবি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কখনই দুই সমকোণ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না; কিন্তু গাণিতিক সত্য অবশ্যই এমন যুক্তি এবং শাশ্বত মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই যা কোন আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়।

উপরে আমরা দেখলাম গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বহু সংযোগ স্থল রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে জ্যামিতির যে-কোনও প্রতিজ্ঞা অঙ্কাঙ্ক জ্যামিতির সাহায্যে আল্‌জাব্রায় নিয়ে ফেলা যায়। আবার পাটীগণিতের যেকোনও প্রশ্ন আল্‌জাব্রার সঙ্কেতের মধ্যে ধরা যায়। ছকের শ্রেণী ও স্তম্ভগুলোকে vector বা সদিক সংখ্যা বলে মনে করা যায়, প্রক্ষেপ জ্যামিতির অনন্তে অবস্থিত রেখা ও বিন্দুগুলো বাদ দিলেই, ইউক্লিডীয় জ্যামিতি পাওয়া যায়। এইসব সংযোগের বিষয় মনে রাখলে গণিত সম্বন্ধে একটি সমগ্র ধারণা করতে সুবিধে হয়। কোনও প্রশ্ন একভাবে কষতে গেলে হয়ত কূল-কিনারা পাওয়াই মুশকিল, অথচ অপর একটি সংশ্লিষ্ট দিক থেকে দেখলে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ডেসার্গ-এর উপপাদ্যের কথা বলা যায়। ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিতে দেখলে উপপাদ্যটা দাঁড়ায় এইরকম :

OA, OB, OC একটা তেপায়ার তিনটে পায়া A, B, C ভূমির উপর অবস্থিত। Á, B́, Ć যথাক্রমে এই তিন পায়ার তিনটে বিন্দু এবং Á, B́, Ć তলটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল নয়। তাহলে ÁB́Ć তলটি ভূমিতলকে একটি সরল রেখায় কাটবে। আর এই সরলরেখাটির উপরেই AB ও ÁB́-এর ছেদ বিন্দু D, BC ও B́Ć-এর ছেদ বিন্দু E এবং CA ও ĆÁ-এর ছেদ বিন্দু F থাকবে।
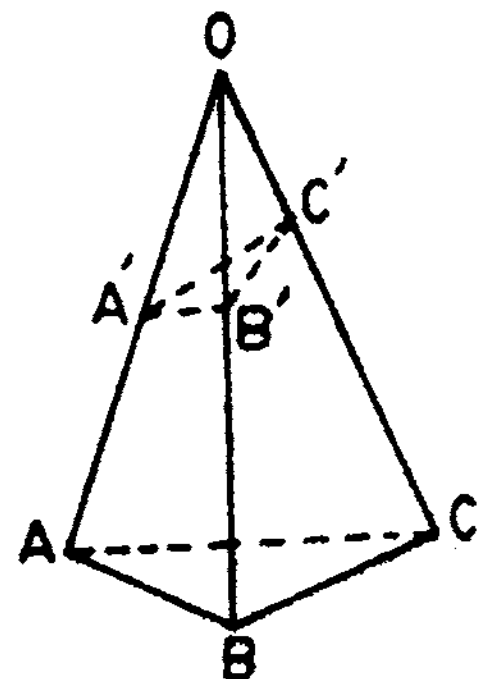
অন্য কথায়, AB ও A′B′, BC ও B′C′ এবং CA ও C′A′-এর ছেদবিন্দু তিনটি সম-রেখ হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিতে যা এত সহজে বুঝা গেল, শুধু জ্যামিতি দিয়ে তাই বুঝতে গেলে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হতো।

উপসংহারে বলতে চাই, ভাল শিক্ষক ইচ্ছা করলে যেকোনও প্রশ্ন বা সমস্যার উপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করে উক্ত প্রশ্ন ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। হয়ত একটি প্রশ্ন কঠিন বোধ হচ্ছে, তাকে একটু অন্যভাবে রূপান্তরিত করে নিলেই সহজ হয়ে যেতে পারে। অভেদত্ব প্রমাণ করতে, নির্ভরণের টুকরোগুলো যোজিত করতে বা সমীকরণের সমাধান করতে আমরা প্রায়ই পরিবর্তের আশ্রয় নিয়ে থাকি। প্রায়ই দেখা যায়, এসব রূপান্তর সাধিত হয়—আরম্ভ-বিন্দু পরিবর্তন করে, একক বদলে বা কোনও অক্ষের চারদিকে খানিকটা ঘুরিয়ে দিয়ে। ছাত্রদের মনে যদি গাণিতিক প্রশ্নের শুধু বাহ্য পরিচয়ের স্থলে একটা সত্যকার অনুভব জাগিয়ে তুলতে হয়, তাহলে একই প্রশ্নের নানাবিধ রূপ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলে ছাত্রদের গাণিতিক নির্ভরণ বা সূত্রাদি সম্বন্ধে এমন একটা পরিপূর্ণ বোধ জন্মাবে, যার ফলে দরকার পড়লে তারা বুদ্ধি খাটিয়ে সেগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলো নীচে দেওয়া হলো :

Transformation—রূপান্তর
Co-ordinate Geometry—অক্ষাঙ্ক জ্যামিতি
Dimension—বিস্তার, প্রসার
Commutative law—পরিবর্তনিয়ম
Vector—সদিক সংখ্যা
Identity—অভেদ
Algebra—বীজগণিত
Arithmetic Progression—ক্রমযোজিত পর্যায়
Geometric Progression—ক্রমগুণিত পর্যায়
Function—নির্ভরণ
Probability—সম্ভাব্যতা
Hyper Geometric—অতি জ্যামিতিক
Polynomial—বহুপদী
Matrix—ছক
Determinant—নির্ণায়ক
Transversal—ছেদক
Origin—আরম্ভ-বিন্দু; মূল বিন্দু
Cross ratio—কাটাকাটি অনুপাত
Projected line—প্রক্ষিপ্ত রেখা
Geometrical Optics—জ্যামিতিক আলোক-বিজ্ঞান
Harmonic range—সুরিত পরিক্রম
Generalisation—সম্প্রসারণ
Formal—প্রণালী সম্মত
Finite Geometry—সীমিত জ্যামিতি

বাংলা একাডেমী পত্রিকা
বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫

# অঙ্কশাস্ত্রে কল্পনার স্থান

পরিমাণ নিয়েই অঙ্কশাস্ত্রের কারবার। জ্যামিতিতে রেখা, ক্ষেত্র প্রভৃতির পরিমাণ নিয়ে আলোচনা হয়; পাটীগণিতে সময়, মুদ্রা, ওজন প্রভৃতির পরিমাণ এবং তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়; বীজগণিতে সাধারণভাবে সংখ্যাতত্ত্ব এবং তৎসংক্রান্ত সূত্রাবলী আলোচিত হয়। ত্রিকোণমিতি, গতিবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান, এবং অন্যান্য উচ্চগণিতেও বিভিন্ন প্রকার পরিমাণ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। পদার্থবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ফলিতগণিতেও মাপ-জোকের বিশেষ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আবার কোনও কিছু মাপতে গেলেই একটি বাস্তব প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়। এর থেকে মনে হ'তে পারে অঙ্কশাস্ত্র বোধ হয় খুব বাস্তবঘেঁষা নিছক গদ্য, এর মধ্যে কল্পনার কোনও প্রভাব নাই। বাস্তবিক কিন্তু তা' নয়।

প্রথমে জ্যামিতির কথাই ধরা যাক। বিন্দু ও রেখাই জ্যামিতির মূল উপকরণ। বিন্দু ও রেখা বলতে কি বুঝায়, মোটামুটি সে-ধারণা সকলেরই আছে। কিন্তু ঐ ধারণা বিশ্লেষণ করতে গেলেই এর অবাস্তবতা চোখে পড়ে। সাধারণতঃ ছোট একটি ফোঁটাকে আমরা বিন্দু বলে থাকি, যেমন চন্দ্রবিন্দু, সিন্দুর বিন্দু, চয়ে বিন্দুড়, ইত্যাদি। কিন্তু ঐ ফোঁটাটি কত ছোট হ'লে তাকে বিন্দু বলব, এর কোন বাঁধাধরা সাধারণ প্রচলিত নিয়ম দেখা যায় না। আমরা সচরাচর ব'লে থাকি, ফোঁটাটিকে ছোট করতে করতে যখন ওর আকৃতি চতুষ্কোণ, কি ত্রিকোণ, কি গোলাকার, কিছুই বোঝা যায় না, তখন ওর নাম বিন্দু। কিন্তু আকৃতি বুঝবার ক্ষমতা চোখের তেজের উপর নির্ভর করে, চোখে যখন বোঝা না যায়, তখনও অণুবীক্ষণ দিয়ে হয়ত বোঝা যেতে পারে; এক অণুবীক্ষণে যখন বোঝা যায় না, তখনও হয়ত আরও তেজাল অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে আকৃতি ধরা পড়ে। সুতরাং ফোঁটাটিকে কত ছোট করা হবে, তার কোন হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে না। তা' ছাড়া, ফোঁটাটিকে ছোট করবারও ত একটা সীমা আছে। অণু-পরমাণুর চেয়ে ত আর ছোট করা যাবে না। যা হোক, আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে পারে, ফোঁটাটিকে ক্রমাগত ছোট করতে আমরা অপারগ হ'তে পারি, কিন্তু তাতে 'বিন্দু'র কল্পনা করতে বাধে না। আমরা পরিমাণকে বাদ দিয়ে বা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে অতিক্ষুদ্র একটি ফোঁটাকে বিন্দু বলে থাকি। কোন স্থানে অবস্থিত থাকলেও তার পরিমাণ নেই। তর্কশাস্ত্র অনুসারে অবস্থান থাকা এবং পরিমাণ না থাকা পরস্পর-বিরোধী ভাব, সুতরাং বিন্দুর ঐ প্রকার সংজ্ঞা গ্রহণীয় নয়। কিন্তু আমরা ঐ প্রকার সংজ্ঞা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এই বুঝাতে চাই যে আমাদের চিন্তায় বিন্দুর 'অবস্থান'ই মুখ্য ব্যাপার, ওর আয়তন বা পরিমাণ অপ্রাসঙ্গিক। তাই পরিমাণকে ক্ষুদ্র করতে করতে একটা চলনসই রকমের ক্ষুদ্র আয়তনে পৌঁছতে পারলেই তাকে আমরা চলিত কথায় বিন্দু বলে থাকি। এইরূপ হাজার হাজার বাস্তব 'বিন্দু' একসঙ্গে করলেও তার পরিমাণ অবশ্যই বড় হয়, পাশাপাশি গায়ে সেঁটিয়ে সাজালে

একটা লম্বা 'রেখা'র মতও হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের কল্পিত 'বিন্দু' এমনই যে, হাজার হাজার বিন্দু একখানে জড়ো করলেও তার আয়তন কিছুই থাকে না, আবার, একটি বিন্দুকে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে বিন্দু বাস্তব কোন ফোঁটা নয়, বাস্তবের অতীত কল্পনায় তার জন্ম।

লেখা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। রেখার কল্পনা এই যে তার দৈর্ঘ্য থাকবে কিন্তু প্রস্থ থাকবে না। বাস্তবিক কোন রেখা অঙ্কিত করলে তার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থ না থেকেই পারে না। কিন্তু আমরা দৈর্ঘ্যকেই রেখা কল্পনার মুখ্য অংশ ব'লে গ্রাহ্য করি, আর প্রস্থকে অপ্রাসঙ্গিক ভেবে ধর্তব্যের মধ্যে আনিনে।

বিন্দু ও রেখার ধারণা তলের সাহায্যে আর একভাবেও প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে। যা'র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, অথচ বেধ নাই এরূপ স্থানকে পৃষ্ঠ বা তল বলে। বেধটি বাদ দিয়ে কোন জিনিসের উপরিভাগ বা শুধু বহির্ভাগকে তল বলে। দুইটি তল পরস্পর কোণাকুণিভাবে কাটাকাটি করলে, ওদের সংযোগস্থল একটি রেখা উৎপন্ন করে। তলের উপর এইরূপ দুইটি রেখার সংযোগস্থল দিয়ে ঐ তলস্থ যেকোনও বিন্দুর অবস্থান নিরূপিত হয়। কারণ, ঐ তলের উপর একটি মূলবিন্দু ধরে নিয়ে, তার থেকে দুইটি নির্দেশ-রেখা বা মূল-রেখা টেনে, উভয় রেখা থেকেই দূরত্ব বা অবস্থান-বোধক নির্দেশাঙ্ক' জানা থাকলে একটিমাত্র নির্দিষ্ট বিন্দু বুঝায়। যেমন, কলকাতার মনুমেন্ট থেকে উত্তরে ১০ মাইল আর পশ্চিমে ৪ মাইল বললে, একটি নির্দিষ্ট স্থানই বুঝায়। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা দ্বারা যে ভূমণ্ডলের স্থাননির্দেশ করা হয়, তারও মূল ব্যাপার এই যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর দিয়ে একটিমাত্র অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা টানা যায়; বাস্তবিক, এই দুইটিই উক্ত স্থানের নির্দেশাঙ্ক। কোন তলের বহিঃস্থ স্থান বা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করতে হলে, অবশ্য ঐ তলের উপকার দুইটি রেখাই যথেষ্ট হবে না, আরও একটি নির্দেশ রেখার প্রয়োজন হবে। ঘন পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে—সুতরাং এর যে-কোন বিন্দুর অবস্থান জানতে বা প্রকাশ করতে হ'লে, তিনটি নির্দেশ রেখা ও তিনটি নির্দেশাঙ্কের প্রয়োজন। যেমন, গাছের একটি ডালে একটি আম আছে, তার অবস্থান নির্দেশ করতে হ'লে আমরা বলতে পারি, অমুক জায়গা বা মূলবিন্দু থেকে অত হাত উত্তরে, অত হাত পূর্বে এবং অত হাত উর্ধ্বে। এই তিনটিই হবে তার নির্দেশাঙ্ক। আমরা ত্রিমাত্রিক বা ত্রিপাদ জগতে বাস করি। দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার দিকে এই তিনটি পদ প্রসারিত। এ ছাড়াও চতুর্থ পদ কোন্ দিকে স্থাপন করব, তার জায়গা খুঁজে পাইনে। এই দেখে পণ্ডিতেরা ভাবলেন, "তাই ত, আমাদের পৃথিবীটা ত বড় সঙ্কীর্ণ স্থান, চতুর্থপদ প্রসারেরই স্থান নাই!" এই ভেবে তাঁরা কল্পনা-বলে চতুঃপাদ এমনকি বহুপাদ জগতের সৃষ্টি ক'রে বাস্তবের সংস্পর্শ ত্যাগ ক'রে বিশুদ্ধ চিন্তা ও যুক্তির জাল বিস্তার করেছেন। এই দুঃসাহসিক কল্পনার রাজ্যে কতকগুলি স্বীকৃতি ও বাঁধা আইন-কানুন মাত্র সম্বল নিয়ে এঁরা অনেক অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছেন।

এইবার পাটীগণিতের ও বীজগণিতেরও দুই-একটা প্রক্রিয়ার কথা বলব। সংখ্যাকে কেন্দ্র করেই এদের কারবার। এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে বস্তু গণনা হয়। পূর্ণ-সংখ্যার সাহায্যে এইরূপ গণনাই সংখ্যা সম্বন্ধে আদিম ধারণা। এই ধারণাকে প্রসারিত করে স্বভাবতই অপূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ এসে পড়ে। আবার একটিও বস্তু না থাকলে, অভাব বুঝাবার জন্য, 'শূন্যের' কল্পনা করা হ'য়েছে। তা'ছাড়া সাংসারিক নানাকাজে জমা ও খরচের

প্রয়োজন হয়, অনেক সময় জমার থেকে খরচ বেশী হ'য়ে পড়ে। ঐসব অভাব বা ঋণ বুঝাবার জন্য 'বিয়োগ' সংখ্যা স্বীকৃত হয়েছে। সংখ্যার উপর যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চারিটি প্রধান প্রক্রিয়া খাটান হয়। গুণের বিষয়ই ধরা যাক। কোন সংখ্যাকে ২ বার, ৩ বার, ৪ বার (বা কোন পূর্ণসংখ্যক বার) নিয়ে যোগ করাকেই ঐ সংখ্যাকে ২, ৩, ৪ প্রভৃতি দিয়ে গুণ করা বলে। কিন্তু কোন সংখ্যাকে দেড়বার, পৌনে তিনবার (বা কোনও অপূর্ণসংখ্যক বার) নিয়ে যোগ করার বস্তুতঃ কোন মানে নাই; কিন্তু আমরা অনায়াসেই ওর একটা মানে ধ'রে নিয়ে, অপূর্ণসংখ্যা দ্বারা গুণন স্বীকার করে নেই। মোটকথা, আমরা $\frac{১}{২}, \frac{১}{৩}, \frac{১}{৪}$ প্রভৃতি দিয়ে গুণ করা, আর ২, ৩, ৪ প্রভৃতি দিয়ে ভাগ করাকে সমার্থক বলে মনে করি। আবার কোনও সংখ্যাকে (-৫) বার নিয়ে যোগ করার বাস্তবিক কোন মানে হয় না। কিন্তু আমরা এরও মানে কল্পনা বা স্বীকার ক'রে নেই। যোগেবিয়োগে গুণ করলে বিয়োগ হয়, আর বিয়োগে বিয়োগ গুণ করলে যোগ হয়, এইসব সূত্র আমরা মেনে নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভগ্নাংশ বা বিয়োগ সংখ্যার সাধারণ চার প্রক্রিয়া—যোগ বিয়োগ গুণ-ভাগ পুরোপুরি বাস্তবাশ্রিত নয়, এর মধ্যে কতকটা সংজ্ঞার মার-প্যাঁচ বা কল্পনারও স্বীকৃতির অধিকার আছে।

গুণনের নিয়ম অনুসারে দেখা যায় যে, কোন যোগ বা বিয়োগ-সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল যোগ সংখ্যা হয়। সুতরাং কেবল যোগ সংখ্যারই বর্গমূল বের করা যায়। পণ্ডিতেরা ভাবলেন, এটি ত বর্গমূল আকর্ষণের প্রক্রিয়াকে বড্ড বেশী সীমাবদ্ধ করছে—এই সীমাবন্ধন উঠিয়ে দিলে কেমন হয়? তাই ভেবে, তাঁরা (-১) এরও কাল্পনিক বর্গমূল স্বীকার করে নিলেন। তারপর এই কাল্পনিক সংখ্যার, অর্থাৎ ৮-১ এর এক জ্যামিতিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

'প্রকৃত' (real) যোগবিয়োগ সংখ্যা, কাল্পনিক (imaginary) সংখ্যা এবং এ দুয়ের সমবায়ে মিশ্রকাল্পনিক (complex) সংখ্যা এইসবই এই জ্যামিতিক পরিকল্পনা অনুসারে সম্ভব হয়েছে।

মিশ্রকাল্পনিক বা 'অপ্রকৃত' সংখ্যাও 'প্রকৃত' সংখ্যার মত যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগের এবং বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতির নিয়ম মেনে চলে—এই স্বীকৃতি গ্রহণ করে পণ্ডিতেরা অঙ্কশাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বাস্তবের আশ্রয় ত্যাগ করে, দুঃসাহসিক কল্পনাবলে মানুষ যে জ্ঞানের বিচিত্র সৌধ প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কল্পনার রথে জ্ঞানের পথে মানুষের এই জয়যাত্রা আজও শেষ হয়নি।

উহার আর একটি কারণ, তথ্যের এক একটি পরিমাণের মধ্যে মোটের উপর যতটা পার্থক্য, কোনও নির্দিষ্ট আয়তনের নমুনা লইয়া ঐ নমুনাগুলির গড় নির্ণয় করিলে দেখা যায়, এই গড়গুলি পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী। (৬) তথ্যগণিতের সিদ্ধান্তগুলি অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির মত সুনির্দিষ্ট হয় না, কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে কি পরিমাণ ভুলের সম্ভাবনা আছে, তাহা নির্ণয় করা যায়।

তাহাছাড়া (৭) তথ্যগণিতের সাহায্যে আজকাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, অল্প খরচে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, পরিকল্পনা বা গবেষণা যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে সম্পাদন, অগ্রিম শস্যাদির উৎপন্ন পরিমাণাদি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা সম্পাদন, এবং সময় থাকিতে গভর্ণমেন্ট যাহাতে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সমূহ বিপদ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে, এ বিষয়ে সহায়তা হইবে।

১.৪ ইংরেজী 'Statistics' শব্দটাকে আমরা তথ্যগণিত বলিয়াছি। Statistics শব্দের সহিত State বা দেশের গভর্ণমেন্টের ব্যাপারাদির সম্পর্ক আছে। পাক-ভারতেও আলাউদ্দীন খিলজী, সম্রাট আকবর, শেরশাহ্ ও আওরঙ্গজেবের আমলে এবং ইহার পূর্বেও, অবশ্য বড় বড় সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য লোক সংখ্যা, সৈন্য সংখ্যা, ফসল উৎপাদন, ভূমি ব্যবস্থা, নানাবিধ কর স্থাপন ও আদায়করণ ইত্যাদি ব্যাপারে সংখ্যাগণিত ব্যবহৃত হইত; বাইবেল ও কোরান শরীফেও কিছু কিছু সংখ্যাতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে গভর্ণমেন্টের কাজের সুবিধার জন্য যে যে বিষয়ের তথ্যের প্রয়োজন হইত তাহাই কেবল আহরণ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য, এবং বিশেষ করিয়া এই একটি মানসিক উন্নয়নমূলক শিক্ষার বিষয় হিসাবে 'Statistics, Statistician, Statistical' (সংখ্যা গণিত, সংখ্যা গণিতবিদ, সংখ্যা গাণিতিক) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার কেবল বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে।

Statistics শব্দটি কয়েকটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথায় বা অঙ্কে লিখিত বা প্রকাশিত তথ্য অর্থে— যেমন, Statistics of crime, Statistics of Import and Export, Population Statistics, Accident Statistics (অপরাধতথ্য, আমদানী-রপ্তানী তথ্য, আদমশুমারি বিবরণ, দুর্ঘটনা তথ্য) প্রভৃতি। (২) আঙ্কিক তথ্য হইতে পাটিগণিতের সাহায্যে নির্ণীত গড়, শতকরা অংশ, অনুপাত ইত্যাদি অর্থে।

এবং (৩) একটি বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান অর্থে। এই অর্থে তথ্য গণিতের অন্তর্নিহিত যুক্তি, ইহার হিসাবপদ্ধতি ও ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত—সকলই বুঝায়। আমরা 'তথ্যগণিত' শব্দটা এই অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। (৪) আবার Statistic শব্দটা ব্যবহৃত হয় তথ্য হইতে হিসাব করিয়া গড়, মধ্যক, পটক্ষেপ, বিস্তার, এবং নির্দিষ্ট সূত্রের সাহায্যে যাহা কিছু নির্ণয় করা যায় সেই সমুদয় বুঝাইতে। ৩,৪,৫,৮ এই সংখ্যাকে a,b,c,d ধরিলে, $S_1=a+b+c+d$; $\infty=ad-bc$; $S_2=a^2+b^2+c^2+d^2$; $x=\frac{1}{4}(a+b+c+d)$, $g=(abcd)^{\frac{1}{4}}$, $\frac{1}{h}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right)$ প্রভৃতি এক একটি Statistic, ইহাকে আমরা পরিমাপ বলিব।

আরও কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। যাহা কিছু বিভিন্ন পরিমাণ ধারণা করিতে পারে, তাহাকে ইংরেজীতে Variable বলে, ইহার বাংলা নাম

'বিভিন্নক'। যাহা বিভিন্ন মান ধারণ না করিয়া, কোনও নির্দিষ্ট মান ধারণ করে, তাহার ইংরেজী নাম Constant, বাংলা নাম 'অভিন্নক'।

যেমন কাহারও মাসিক আয় ২০ টাকা, ৫৪ টাকা, ৩০৯.২৫ টাকা, ৮৭৫ টাকা,...ইত্যাদি অনেক কিছুই হইতে পারে। এখানে আয়ের পরিমাণ একটি বিভিন্নক, ২০, ৫৪, ৩০৯.২৫, ৮৭৫ প্রভৃতি ইহার ভিন্ন ভিন্ন মান। এই মাসিক আয়গুলির সমষ্টি $S_১$ = ১২৫৮.২৫ টাকা, গড়=$_x$=৩১৪.৫৬২৫ টাকা, মধ্যক (M=মধ্যেকার পরিমাণ) ৫৪ টাকা ও ৩০৯.২৫ টাকার মাঝামাঝি ১৮১.৬২৫, টাকা, এখানে $S_১$,x,M এগুলি বিভিন্নকের মানগুলি হইতে নির্ণীত এক একটি পরিমাণ (=Statistic)

যখন কোনও নির্দিষ্ট বিষয় বা লক্ষণ সম্বন্ধে তথ্য গাণিতিক আলোচনা করা হয়, তখন সেই বিষয়ে বা (সেই লক্ষণযুক্ত যাবতীয় তথ্যকে তথ্যবিশ্ব (Population) বলে। যেমন, "ঢাকা শহরে জনপ্রতি পারিবারিক আয় কত?"—এই প্রশ্ন বিবেচনাকালে ঢাকা শহরে যতটি পরিবার আছে, তাহার প্রত্যেকটি পরিবারের জনপ্রতি আয় হইবে তথ্যবিশ্ব; উহা হইতে ১০টি পরিবার বাছিয়া লইলে, এই দশটি পরিবারের জন্য প্রতি আয় হইবে পূর্বোক্ত তথ্যবিশ্ব হইতে চয়িত একটি (Sample) যাহার আয়তন (Sample size) হইতেছে ১০। এই নির্বাচিত দশটি পরিবারের 'জনপ্রতি আয়' নির্ণয় করিয়া তাহা হইতে যদি ঢাকা শহরের যাবতীয় পরিবারের জনপ্রতি আয় কোনও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে নির্ণয় করা যায়, তবে তাহা হইবে নমুনা হইতে তথ্যবিশ্বের জনপ্রতি আয় সম্বন্ধে একটি 'নিরূপণ' বা estimate অপর একটি নমুনা হইতে 'নিরূপণ' করিলে খুব সম্ভব, ভিন্ন ফল পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বিভিন্ন 'নিরূপণের' মধ্যে পরস্পর 'পার্থক্য' বা 'বৈলক্ষণ্য' থাকিবে। নমুনার আয়তন বৃহত্তর করিয়া এবং পরিবারগুলি চয়ন করিবার পদ্ধতি যথাসম্ভব নিটাল (unbiased) করিতে পারিলে 'নিরূপণ'-গুলির পারস্পরিক পার্থক্য কমিয়া যাইবে, এবং তথ্যবিশ্বের প্রকৃত 'জনপ্রতি পারিবারিক আয়ের' অধিক নিকটবর্তী হইবে। 'নিরূপণগুলির' মধ্যেকার বিচ্যুতি বা তারতম্য যথাসম্ভব হ্রাস করাই তথ্যগণিতের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। এজন্য সুপরিকল্পিত অনুসন্ধান পদ্ধতি ও নিখুঁত তথ্যসংগ্রহ প্রণালী উদ্ভাবন করাও তথ্যগণিতের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

পুরোগামী বিজ্ঞান
৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭২

# অষ্ট-মহিমা

আমরা অষ্ট ধাতুর নাম জানি— সুবর্ণ, রজত, তাম্র, সীসক, রংগ, লৌহ, ইস্পাত অথবা মতান্তরে,—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, যশদ (দস্তা), সীসক, লৌহ, পারদ। 'সাষ্টাঙ্গ' প্রণিপাতের সময় বুঝতে—জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, মস্তক, দৃষ্টি, বুদ্ধি, বাক্য : আমাদের অষ্টাঙ্গ। যাহোক, আমাদের অষ্ট-প্রহর সতর্ক হয়ে চলতে হয়,—কি জানি, কখন বা কোন অবাধ্যতার ফলে 'অষ্টভুজা'র খড়্গের আঘাতে নিপাতপ্রাপ্ত হই তার ঠিক কি? তাই 'অষ্টসিদ্ধি' যোগ-বলে অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঐশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা রূপ বিভূতি অর্জন করে, অষ্টভুজাই হোক বা 'অক্টোপাশ'ই হোক এদেরকে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে অষ্টাবক্র গতিতে আমাদের চরণ যুগলের ভেল্কীর পরাকাষ্ঠা দেখানো সমুচিত।

হায়! এ কী করে ফেললাম। সতর্ক হ'তে গিয়ে দেখি ভুলেই গিয়েছি, আমার কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অষ্টাঙ্গের কিছুটা মহিমা দেখানোর ইচ্ছা ছিল। যা'হোক কি আর করা যায়, যা হবার হয়ে গেছে।। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক,—"দেখি চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই" কথাটা ঠিক কিনা।

পাশের ছবিতে ক খ গ ঘ একটা বর্গক্ষেত্রের ক খ ও ক ঘ বাহুদ্বয়কে সমান আটভাগে ভাগ ক'রে এই খণ্ডগুলোর মধ্য-স্থলে বর্গক্ষেত্রের বহিরাংশে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ লিখে খণ্ড-গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে; আর এই খণ্ড-গুলোর প্রান্ত বিন্দু থেকে কখ-এর সমান্তর ক'রে এবং ক ঘ-এর সমান্তর ক'রে সরলরেখা টানা হ'য়েছে। ক খ গ ঘ বর্গ ক্ষেত্রটা ত আগে থেকেই কখ, খগ, গঘ ও ঘক রেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা ছিল।
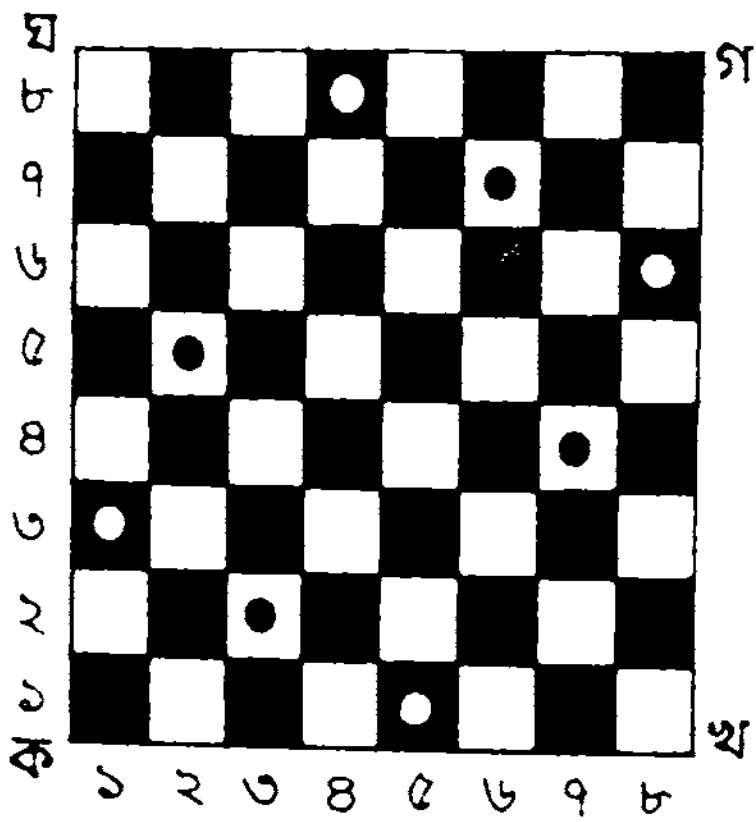
এখন উপরোক্ত অঙ্কনের ফলে দেখা যাচ্ছে, বেশ একটা জাল তৈরী হ'য়েছে। গায়ে চারদিক থেকেই দেখা যায় এক এক ধারে নয়টা ক'রে বিন্দু দ্বারা ঐ দিকের রেখাটাকে আট ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। এইভাবে জালটার মধ্যে মোট ৮×৮=৬৪টা ছোট কোঠা বা প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি হয়েছে, আর কখ ও কঘ এর পাশে যে অঙ্কগুলো বসানো হ'য়েছে, তার সাহায্যে প্রত্যেকটা বর্গের একটা নাম দেওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাচ্ছে জালীর (বা জালের ফাঁকের) মধ্যস্থলে আটটি স্থানে এক একটা ক'রে বিন্দু বসানো রয়েছে। কখ রেখার পিছনে বসে কেউ ছকটার দিকে তাকালে দেখতে পাবে, প্রথম ফালিতে একটি বিন্দু আছে, আর সেটা তৃতীয় দীঘেলেও আছে। এখানে কখ-এর লম্বালম্বি খোপগুলোকে ফালি (file) আর কখ এর সমান্তর খোপগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে দীঘেল (বা দীর্ঘল বা length) তাই বলা যায়, এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে। (১, ৩)-- প্রথম অঙ্কটা দ্বারা দীঘেল, এবং দ্বিতীয় দ্বারা ফালি বুঝান হচ্ছে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ডান দিকে নজর করলে যেসব বিন্দু ক্রমান্বয়ে দেখা যাবে সেগুলোর স্থানাঙ্ক হচ্ছে যথাক্রমে (২,৫); (৩,২); (৪,৮); (৫,১); (৬,৭); (৭,৪); (৮,৬)। আশাকরি এতক্ষণে 'স্থানাঙ্ক' সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা হ'য়ে গেছে— জালীর ৬৪ ঘরের প্রত্যেকটাই আলাদা নাম দেওয়া যাচ্ছে : প্রথম অঙ্কটা চিত্রে বাম থেকে ডান দিকের নম্বর আর দ্বিতীয় অঙ্কটা চিত্রের নিচের দিক থেকে উপর দিকের নম্বর। বলাবাহুল্য দীঘেলের অঙ্ক বাঁ দিক থেকে শুরু হ'য়ে ডান দিকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে, আর 'ফালি'র (বা আড়ের) অঙ্ক নীচের দিক থেকে শুরু হ'য়ে উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলন্ত রেখাটিকে ইংরেজীতে x অক্ষ, আর নীচু থেকে উঁচু দিকে চলন্ত রেখাটিকে y অক্ষ বলে। বাঙলায় x-কে অ-অক্ষ এবং y-কে আ-অক্ষ বলা যেতে পারে; অথবা x-কে শয়নাক্ষ, এবং y-কে লম্বাক্ষও বলা যায়। শেষোক্ত নাম দুটোতে বুঝায়,—x অক্ষ যেন কাগজের গায়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, আর y অক্ষ যেন এর সঙ্গে লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে (পাহারাদার-এর মত)।

এইবার আমরা আটটা ভয়ঙ্কর জন্তুর প্রসঙ্গ শুরু করতে চাই। জন্তুটা যে কি, ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ বড়ই প্রচণ্ড—চোখোচোখি হ'লেই খুনোখুনী। তবে সুখের বিষয়, এরা বড় একচোখো। অর্থাৎ এদের মাত্র একটা করে ছোট্ট চোখ, তবে আমরা যে জালীর বর্ণনা দিয়েছি, তার উপর দিয়ে কেবল ডাইনে-বাঁয়ে বা উপর-নীচে বা কোণাকুনি (ডান-কা'তে বা বাঁ-কা'তে) চলতে পারে। এই অদ্ভুত জন্তুগুলোর মালিক একজন মস্ত খেলোয়াড় আর একটু শৌখিনও বটে। ইনি মস্ত একটা চৌকোণা তক্তা পেতেছেন তাঁর বিশ্রাম-কামরা জুড়ে; আর তার উপর জালীর মত চৌষট্টিটা কুঠরী এঁকে সেগুলোতে রঙ লাগিয়েছেন—দুই রঙ, সাদা আর কালো। রঙ লাগানোরও আবার পদ্ধতি রয়েছে। কখ-এর পিছনে ব'সে দেখলে দেখা যায় (১,১) নম্বরের কুঠরীটা কালো, আর ডান-কা'তে (২,২) (৩,৩) ... (৮,৮) সবগুলো কুঠরীতেই ঐ একই রঙ। আবার দীঘেল দিকে তাকালে দেখা যায় রঙগুলো কালো-সাদা-কালো-সাদা, কালো-সাদা, কালো-সাদা। আর উপরে-নীচেও সেইরকম, সাদার পাশে কালো, আর কালোর পাশে সাদা। এইভাবে ৩২টি সাদা কোঠা আর ৩২টি কালো কোঠা। ডান কোণা, (৮,১) থেকে বিপরীত কোণা (১,৮) পর্যন্ত আটটি কোঠার সবগুলোই সাদা।

এই কালো-সাদা রঙের তক্তার উপরেই ভদ্রলোকটি তার আটটি জন্তুকেই চলা-ফেরা করতে দেন। এরা যার যার রাস্তায় ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নীচে, কোণাকুনি যার যার সরল রেখার উপর দিয়ে অনবরত চলাফেরা করে, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পায় না : সাবাস, ভদ্রলোকের সংস্থাপনের বাহাদুরী। জন্তুরা খেলতে খেলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ইনি জীবগুলোকে আলাদা আলাদা বাক্সে আটকে রাখেন—কেউ কাউকে দেখতে পারে না।

ভদ্রলোকের আবার বিচার-আচারও আছে। তাই ৯২ দিনে ৯২-ভাবে জন্তুদের সংস্থাপন করেন যাতে জীবগুলোর কাছে দৌড়াবার পথ একঘেয়ে হয়ে না পড়ে। অবশ, ৯২ দিন পরে, তিনি আবার ঐ, "৯২ প্রকার পথের" পুনর্ব্যবহার করতে বাধ্য হন। তবুও আমার মনে হয়, ঐ জীবগুলো মনুষ্যজাতির চেয়ে অধিক রস সম্ভোগ করে; কারণ আমাদের বড় বড় কবিরাও কাব্যে নবরসের অধিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে পারেননি, কিন্তু এই জীবগুলো বিরানব্বই রসের আস্বাদন উপভোগ করেছে। ৯২ রসের তালিকা পরে দিচ্ছি,—তার আগে পাঠকদের জিজ্ঞাসা করি, জন্তুগুলো কি? আর বলে রাখি, ঐ ভদ্রলোকটির নাম Euler (Leonwip) নামের বাংলা উচ্চারণ—"অয়লার", কিন্তু ইনি জাতে তেলী নন। (1707-1783),

দ্রষ্টব্য : চিত্রে যে আটটি নিরেট বৃত্ত দেখা যাচ্ছে, এবং যে বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্কও বর্ণিত হ'য়েছে সে-টাও ৯২টি সংস্থাপনের মধ্যে একটি। এখন একটু সংক্ষিপ্ত আকারে, অর্থাৎ শয়ানাঙ্কগুলো বাদ দিয়ে লঘু লম্ব্যাঙ্ক দেখান হ'য়েছে। (৯২টা সংস্থাপনকে কেবল ১২টা মূল সংস্থাপন রূপে প্রকাশ করা যায়)।

| (১) | ১৫ | ৮৬ | ৩৭ | ২৪ |
|---|---|---|---|---|
| | ১৭ | ৫৮ | ২৪ | ৬৩ |
| | ৩৬ | ৪২ | ৮৫ | ৭১ |
| | ৪২ | ৭৩ | ৬৪ | ৫১ |
| | ৫৭ | ২৬ | ৩১ | ৪৮ |
| | ৬৩ | ৫৭ | ১৪ | ২৮ |
| | ৮২ | ৪১ | ৭৫ | ৩৬ |
| | ৮৪ | ১৩ | ৬২ | ৭৫ |

| (২) | ১৬ | ৮৩ | ৭৪ | ২৫ |
|---|---|---|---|---|
| | ১৭ | ৪৬ | ৮২ | ৫৩ |
| | ৩৫ | ২৮ | ৬৪ | ৭১ |
| | ৪৭ | ৫২ | ৬১ | ৩৮ |
| | ৫২ | ৪৭ | ৩৮ | ৬১ |
| | ৬৪ | ৭১ | ৩৫ | ২৮ |
| | ৮২ | ৫৩ | ১৭ | ৪৬ |
| | ৮৩ | ১৬ | ২৫ | ৭৪ |

| (৩) | ২৪ | ৬৮ | ৩১ | ৭৫ |
|---|---|---|---|---|
| | ৩৮ | ৪৭ | ১৬ | ২৫ |
| | ৪২ | ৮৬ | ১৩ | ৫৭ |
| | ৪৭ | ৩৮ | ২৫ | ১৬ |
| | ৫২ | ৬১ | ৭৪ | ৮৩ |
| | ৫৭ | ১৩ | ৮৬ | ৪২ |
| | ৬১ | ৫২ | ৮৩ | ৭৪ |
| | ৭৫ | ৩১ | ৬৮ | ২৪ |

| (৪) | ২৫ | ৭১ | ৩৮ | ৬৪ |
|---|---|---|---|---|
| | ৩৬ | ২৭ | ১৪ | ৮৫ |
| | ৪১ | ৫৮ | ২৭ | ৩৬ |
| | ৪৬ | ৮৩ | ১৭ | ৫২ |
| | ৫৩ | ১৬ | ৮২ | ৪৭ |
| | ৫৮ | ৪১ | ৭২ | ৬৩ |
| | ৬৩ | ৭২ | ৮৫ | ১৪ |
| | ৭৪ | ২৮ | ৬১ | ৩৫ |

| (৫) | ২৫ | ৭৪ | ১৮ | ৬৩ |
|---|---|---|---|---|
| | ৩৬ | ২৭ | ৫১ | ৮৪ |
| | ৩৬ | ৮১ | ৪৭ | ৫২ |
| | ৪৮ | ১৫ | ৭২ | ৬৩ |
| | ৫১ | ৮৪ | ২৭ | ৩৬ |
| | ৬০ | ১৮ | ৫২ | ৪৭ |
| | ৬০ | ৭২ | ৪৮ | ১৫ |
| | ৭৪ | ২৫ | ৮১ | ৩৬ |

| (৬) | ২৬ | ১৭ | ৪৮ | ৩৫ |
|---|---|---|---|---|
| | ৩১ | ৭৫ | ৮২ | ৪৬ |
| | ৩৫ | ৭১ | ৪২ | ৮৬ |
| | ৪৬ | ১৫ | ২৮ | ৩৭ |
| | ৫৩ | ৮৪ | ৭১ | ৬২ |
| | ৬৪ | ২৮ | ৫৭ | ১৩ |
| | ৬৮ | ২৪ | ১৭ | ৫৩ |
| | ৭৩ | ৮২ | ৫১ | ৬৪ |

| (৭) | | | |
|---|---|---|---|
| ২৬ | ৮৩ | ১৪ | ৭৫ |
| ৩৭ | ২৮ | ৬৪ | ১৫ |
| ৪২ | ৫৮ | ৬১ | ৩৭ |
| ৪৮ | ৫৩ | ১৭ | ২৬ |
| ৫১ | ৪৬ | ৮২ | ৭৩ |
| ৫৭ | ৪১ | ৩৮ | ৬২ |
| ৬২ | ৭১ | ৩৫ | ৮৪ |
| ৭৩ | ১৬ | ৮৫ | ২৪ |

| (৮) | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭ | ৩৬ | ৮৫ | ১৪ |
| ২৮ | ৬১ | ৩৫ | ৭৪ |
| ৪১ | ৫৮ | ৬৩ | ৭২ |
| ৪৭ | ৫৩ | ১৬ | ৮২ |
| ৫২ | ৪৬ | ৮৩ | ১৭ |
| ৫৮ | ৪১ | ৩৬ | ২৭ |
| ৭১ | ৩৮ | ৬৪ | ২৫ |
| ৭২ | ৬৩ | ১৪ | ৮৫ |

| (৯) | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭ | ৫৮ | ১৪ | ৬৩ |
| ৩৬ | ৪১ | ৮৫ | ৭২ |
| ৪২ | ৭৩ | ৬৮ | ১৫ |
| ৪৮ | ১৩ | ৬২ | ৭৫ |
| ৫১ | ৮৬ | ৩৭ | ২৪ |
| ৫৭ | ২৬ | ৩১ | ৮৪ |
| ৬৩ | ৫৮ | ১৪ | ২৭ |
| ৭২ | ৪১ | ৮৫ | ৩৬ |

| (১০) | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৫ | ২৮ | ১৭ | ৪৬ |
| ৪৬ | ৮২ | ৭১ | ৩৫ |
| ৫৩ | ১৭ | ২৮ | ৬৪ |
| ৬৪ | ৭১ | ৮২ | ৫৩ |

| (১১) | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৫ | ৮৪ | ১৭ | ২৬ |
| ৩৬ | ৮২ | ৪১ | ৬৫ |
| ৩৭ | ২৮ | ৫১ | ৪৬ |
| ৪২ | ৮৫ | ৭১ | ৩৬ |
| ৫৭ | ১৪ | ২৮ | ৬৩ |
| ৬২ | ৭১ | ৪৮ | ৫৩ |
| ৬৩ | ১৭ | ৫৮ | ২৪ |
| ৬৩ | ১৫ | ৮২ | ৭৩ |

| (১২) | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৬ | ২৫ | ৮১ | ৭৪ |
| ৩৬ | ৮১ | ৫৭ | ২৪ |
| ৪২ | ৭৫ | ১৮ | ৬৩ |
| ৪৭ | ১৮ | ৫২ | ৬৩ |
| ৫২ | ৮১ | ৪৭ | ৩৬ |
| ৫৭ | ২৪ | ৮১ | ৩৬ |
| ৬৩ | ১৮ | ৪২ | ৭৫ |
| ৬৩ | ৭৪ | ১৮ | ২৫ |

পরিশেষে বক্তব্য এই যে পাঠক ছকের কখ, খগ, গঘ ও ঘক—এই চারদিক থেকে দেখলে দেখবেন দশম পর্যায়ের নকশা মাত্র ৪টি সংযোজনে এবং অপর ১১টি পর্যায়ের সংযোজনের প্রত্যেকটিতে ৮টি করে নকশা দেখতে পাবেন ব্যাপারটা চারদিক একই হাতি দেখার মত।

Students Dictionary অনুসারে (Calcutta Edu) 1913.p-69
অষ্টধাতু—সোনা, রূপা, তামা, সীসা, লোহা, টিন, ইস্পাত, দস্তা।
অষ্টাঙ্গ—দুইহাত, বক্ষ, কপাল, দুইচক্ষু, পলা, পিঠের মধ্যাংশ ১+১=২ ১+১=২
সাষ্টাঙ্গের প্রমাণ—হাত, পা, উরু, বক্ষ, চক্ষু, মস্তিষ্ক মন ও বাক্য দ্বারা প্রমাণ।
অষ্টসিদ্ধি—অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা।

বড় বড় বিশেষজ্ঞরা ফ্রয়েডের মতকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফ্রয়েড পড়ে গেলেন একা। মস্তিষ্ক-ব্যবচ্ছেদ ল্যাবরেটরী থেকে তিনি বহিষ্কৃত হলেন এবং পরের এক বছর পর্যন্ত কোথাও তাঁর বক্তৃতা দেবার মত স্থান থাকল না।

ফ্রয়েড হিপনটিজমে বিশ্বাস করতেন, কারণ বিখ্যাত ম্যাগনেটিস্ট "হ্যানসেন" কি করে হিপনটিজমের দ্বারা সুস্থ লোককে মূর্ছাগ্রস্তের মত অসাড় ও কঠিন করে ফেলতেন, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। যাই হোক জার্মানী বা অস্ট্রেলিয়ার লোকে কিন্তু ও বিদ্যাকে জুয়াচুরী বলেই মনে করত। ফ্রান্সে হিপনটিক চিকিৎসার চলন ছিল, আর ঐ সময়টাতেই খবর পাওয়া গেল যে ঐ দেশের ন্যানসী শহরে একদল ডাক্তার হিপনটিজমের সঙ্গে কিংবা হিপনটিজম ছাড়াই শুধু ভাবপ্রবর্তন (suggestion) দ্বারাই রোগীদের আরোগ্য করছেন। ফ্রয়েড ১৮৮৯ সালে একবার নিজেই ন্যানসী গিয়ে সেখানকার চিকিৎসা-পদ্ধতি দেখে আসলেন। এইসব দেখে তাঁর মনে সুস্পষ্ট ধারণা হল যে মানুষের চৈতন্যগোচর না হয়েও প্রবল মানসিক ক্রিয়া ঘটতে পারে।

ফ্রয়েড প্রথম প্রথম হিপনটিক চিকিৎসা করতেন। এ বিষয়ে ভিয়েনার আর একজন প্রধান ডাক্তার ব্রুয়ারের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল। এঁরা দুইজনে মিলে হিস্টিরিয়ার উৎপত্তি এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। এর মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, মনের ইচ্ছা নানা কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে ও তার থেকে এক রকম চিত্ত-বিকলন এবং শারীরিক ক্লেশ-চিহ্ন প্রকাশ পায়। হিপনটিজমের প্রভাবে ঐসব দমিত মনোভাব স্মরণ হয় এবং রোগী তা মন খুলে বলে ফেলতে পারলেই তার বোঝা হালকা হয়ে যায়; তদ্দরুন লক্ষণগুলোও দূর হয়। এইভাবে বারংবার হিপনটাইজ করে প্রতিবারে এক একটা লক্ষণ দূর করে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়।

সে যাই হোক বইখানা সম্বন্ধে জার্মানীর ডাক্তাররা অত্যন্ত বিরুদ্ধমত প্রকাশ করলেন। ব্রুয়ার এতে বেশ খানিকটা দমে গেলেন, কিন্তু ফ্রয়েড এসব বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না। থিওরী সম্বন্ধেও ব্রুয়ারের সঙ্গে ফ্রয়েডের মতানৈক্য ছিল। এই কারণে তাঁদের একত্র গবেষণা করা আর সম্ভব হল না, ফ্রয়েড একসময় একা পড়ে গেলেন। ফ্রয়েডের নতুন মত ছিল এই : প্রত্যেকের একটা অহং আছে। বিরুদ্ধ বাসনা বা প্রবৃত্তির সঙ্গে সংঘর্ষ হলে, অহং এইসব প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে। কিন্তু এগুলো অত্যন্ত প্রবল হলে অহং যেন মনের গভীরে পলায়ন করে এই সংঘর্ষ এড়ায়। এতে নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলোর শক্তি নষ্ট হয় না। তা ছাড়া অহং-এর সঙ্গে সংস্পর্শ না হওয়ায় চেতন মনে এগুলো স্মরণ হয় না। হিপনটিজম কিংবা স্বপ্নের আবেশে চেতন-মন বা অহং-এর শক্তি কিছুটা কম হয়ে পড়লেই এইসব নিরুদ্ধ প্রবৃত্তি এবং এদের উত্তেজক ঘটনাগুলো মনে পড়ে। এগুলো বলে ফেললেই যেন নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির চাপ হালকা হয়ে রোগের উপসর্গ দূর হয়।

ফ্রয়েড বহুসংখ্যক মনোরোগী পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মনোব্যাধির সঙ্গে যৌন-কারণ বর্তমান, তাই তিনি সাব্যস্ত করেন, যৌন-প্রবৃত্তি মানুষের চরিত্র ও প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে আছে। এমনকি শিশুদের মধ্যেও যৌন-প্রবৃত্তি রয়েছে, অবশ্য তার প্রকাশ হয় অন্যভাবে। এদের নিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তি খেলাধূলা, মারামারি, অভিমান, কান্না, মুখ-ভ্যাংচানি প্রভৃতি নানা পথে প্রকাশ পায়। বয়স্কদের নিরুদ্ধ যৌন প্রবৃত্তিও সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, লোকসেবা প্রভৃতি নানা পথে বেঁকে নিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের মতে শিশুর জন্মকাল থেকে

চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত যৌনবোধ খুব প্রবল থাকে, তারপর দশ-বার বছর মগ্নচৈতন্যের মধ্যে থেকে যৌবনের প্রারম্ভে আবার তার দ্বিতীয় বার প্রকাশ হয়। যা হউক এইসব মতের জন্য, বিশেষ করে "নিষ্পাপ শিশু"র প্রতি যৌনবৃত্তি আরোপ করবার জন্য ফ্রয়েডের লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে যুদ্ধ-ফেরত সৈন্যদের মনোবিকার চিকিৎসার সময় হিপনটিজমের কার্যকারিতা অনেকাংশে স্বীকৃত হয়। ফ্রয়েড এইসব চিকিৎসার আর-এক প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তিনি হিপনটাইজ না করেই অবাধ ভাবানুসরণ বা Free Association-এর সাহায্য চিকিৎসা করে আরও সহজে ফললাভ করেন। প্রথমে রোগীকে সঙ্কোচমুক্ত করে যেভাবে মনে আসে তাই বলে যাবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। পরে এইসমস্ত ভাব বিশ্লেষণ করে নিরুদ্ধ প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে চিকিৎসা করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম Psycho-analysis বা মনোবিশ্লেষণ। এর সাহায্যে তিনি স্বপ্ন, ব্যঙ্গ-কৌতুক, সাহিত্যিক প্রচেষ্টা, চারুশিল্প, পুরাকাহিনী, ধর্ম প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। জ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবা প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। ১৯০৬ সালের থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে নানাদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁর সঙ্গে এসে জোটেন। ১৯১০ সালে মনোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে একটা আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। ইংল্যাণ্ড, কলকাতা, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বুদাপেস্ট, বার্লিন ও ভিয়েনায় এর শাখা স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সালে ফ্রয়েডের ৭০ বছর বয়সের সময় পৃথিবীর সর্বস্থানের বিদ্বান-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁকে অভিনন্দন পাঠানো হয়। পরে ১৯৩৯ সালে তিনি হিটলার কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে লণ্ডনে বসবাস করেন এবং ১৯৪৪ সালে ঐ শহরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

'ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী'

# দর্শন

# মানব-মনের ক্রমবিকাশ

কবি যখন ভাবের প্রাচুর্যে নির্ঝরের বন্দনা করে, বসুন্ধরাকে সম্বোধন করে, এবং দুরন্ত সাগরকে তাহার গান শুনায়; যখন সে পর্বতের সঙ্গে কথা বলে, কোকিলের সঙ্গে আত্মীয়তা করে এবং সমীরণের নিকট মনোবেদনা জানায়; তখন আমরা বিদ্রূপের হাসি হাসি না—সম্ভাব্যতার তর্কও করি না, আমরা প্রাণ দিয়া অনুভব করি। আমাদের হৃদয়ের কোন্ নিভৃত গোপন কন্দরে, কি যেন এক অনির্দেশ্য অথচ পরিচিত সুর ঝংকৃত হইয়া উঠে। কোন্ অতীত যুগের হারানো কাহিনী যেন অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। সে যুগ মানব ইতিহাসের শৈশবকাল; আর সে কাহিনী বোধহয় শিশুচিত্তের কল্পনারঞ্জিত স্মৃতি। সে যুগে এই সব চিন্তা মানুষের মনকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া থাকিত। বর্তমানে যাহা কবিতার অলংকার মাত্র, সে যুগে তাহা জীবনের সত্য ঘটনা ছিল। তখন, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল; বৃক্ষলতা প্রভৃতিও তাহাদের নিকট প্রাণযুক্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল।

সেই আদিম যুগে মানুষের নিকট সূর্য এক মহা শক্তিশালী দেবতা ছিল, উহার হাস্যে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং ক্রোধে উত্তপ্ত প্রান্তর ধু-ধু করিত। পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড ঘুমন্ত দৈত্য ছিল, উহা সময় সময় একটু নড়িয়া চড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইত। মানুষ জীবিতকালে ঐ দৈত্যের পিঠের উপর দিয়া চলাচল করিত, মৃত্যুর পর তাহার পেটের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিত। আগুন এক বন্য দুরন্ত প্রাণী ছিল উহাকে স্পর্শ করিলেই দংশন করিয়া দিত। পশুপক্ষীরা বিদেশী ছিল, উহাদের স্বতন্ত্র ভাষা এবং আচারপদ্ধতি ছিল। বৃক্ষলতা বাক্‌হীন প্রাণী ছিল, উহাদের কতকগুলি মানুষের হিতকারী বন্ধু এবং কতকগুলি অনিষ্টকামী শত্রু ছিল।

এইসব বস্তু ও প্রাণীকে তাহারা ঠিক মানুষ ভাবিয়াই তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিত। তাহারা কখনও একটা সুন্দর কাঁঠাল গাছ বা নারিকেল গাছকে ফুলসাজে সাজাইত। কখনও বা ফল-দায়ক বৃক্ষকে পূজা উপচারে সম্মানিত করিয়া ফল প্রার্থনা করিত। তাহারা কতকগুলি প্রাণীকে বুদ্ধির জন্য সম্মান করিত, কতকগুলিকে হিংস্র বলিয়া ভয় করিত এবং কতকগুলিকে উপকারী বলিয়া কদর করিত। এইজন্য এইসব জন্তুকে বধ করা, এমন কি তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করাও ভয়ানক অন্যায় মনে করিত। পাছে হিংস্র জন্তুর সমাজ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এই ভয়ে তাহারা সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না; বরং নানা উপচারে উহাদিগকে পূজা করিত। এইরূপ নিসর্গের অন্যান্য শক্তির কৃপা-দৃষ্টি লাভের জন্য তাহাদের উদ্দেশে পূজা ও বলিদান করিত। কিন্তু সময় সময় দুই চারি জন অসাধারণ সাহসী পুরুষ ব্যাঘ্র ভল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইত। এমন কি সময় সময় মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুকে তরবারি দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত, স্ফীতবক্ষ নদীর স্রোতকে বল্লমের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিত, দুর্দান্ত সমুদ্রকে বেত্রাঘাতে শাসন করিত, নির্দয়

পৃথিবীকে শাণিত ছুরিকা দ্বারা বধ করিত। আকাশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উন্নত সৌধ নির্মাণ করিত এবং স্বর্গ জয় করিবার জন্য মেঘের গায়ে তীর ছুঁড়িত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করিল। তখন তাহারা আবিষ্কার করিল যে, দেহ হইতে পৃথক একটি জিনিস মানুষের ভিতর আছে। সেই জিনিসটি জড় দেহকে চালনা করে। সেই মন বা আত্মা কিম্বা তদ্রূপ কোনো ভৌতিক অদৃশ্য পদার্থই চিন্তা করে, সেই আকাঙ্ক্ষা করে, সেই সিদ্ধান্ত করে। শরীর যখন নিদ্রায় অচেতন তখনও ইহা জাগ্রত থাকিয়া ঘুমন্ত মানুষের অন্তঃকরণে চিন্তা ও কল্পনার জাল বিস্তার করে। যখন তাহারা দন্তহীন পক্বকেশ বৃদ্ধের নিকট হইতে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করে, তাহারা বুঝিতে পারে যে শরীরের সঙ্গে আত্মা জরাগ্রস্ত হয় না—সুতরাং ইহার মৃত্যু নাই। দেহটি আত্মার বাহন মাত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে, দেহ ধ্বংস হইয়া গেলে তদাশ্রয়ী আত্মার কী অবস্থা হয়?

প্রিয়জনের বিচ্ছেদে তাহার চিন্তা ও স্মৃতি সর্বদা মনে হইতে থাকে। তন্দ্রা-অবস্থায় তাহার প্রতিমূর্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, তাহার সুমিষ্ট কোমল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, তাহার মধুর স্পর্শ অনুভূত হয়। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তর্হিত হইলেও, অনেকের মনে বিশ্বাস থাকিয়া যায় যে, সত্যই প্রিয়াস্পদের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রধানতঃ এইরূপ ভাব হইতেই ভ্রান্তি জন্মে। হয়তো তাহাদের সর্দারের মৃত্যু হইয়াছে। অর্ধজাগ্রত অবস্থায় তাহার প্রতিকৃতি আসিয়া যেন তাহাদিগকে শাস্তির ভয় দেখাইতেছে, সুতরাং তাহাদিগের সহজেই বিশ্বাস হয় যে সর্দার জীবিত আছে। এইরূপে মৃত্যুর পরপারে জীবন আছে, এই ধারণার উৎপত্তি হয়। আত্মার মোকাম বা বাসস্থান-স্বরূপ এই দেহের যখন ধ্বংস হয়, তখন আত্মা অবাধে বাতাসের মধ্যে চলাচল করে। ইহা বাতাসের মতই অদৃশ্য; বাতাসের মতই ভয়াবহ নিষ্ঠুরও হইতে পারে। ইহা হইতে অসভ্য মানুষের মনে এই ধারণা হয় যে, আধি ব্যাধির যন্ত্রণা তাহার সর্দারের প্রদত্ত শাস্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহার ইহাও বিশ্বাস হয় যে, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাহাদের সর্দারের আত্মা অদৃশ্য অস্ত্র লইয়া তাহাদের সপক্ষে যুদ্ধ করে। এই হিতকামী আত্মা বা Father spirit-এর সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়, তাহার সমাধির পার্শ্বে খাদ্যসম্ভার যোগান হয়। প্রকৃতপক্ষে তখনও তাহাকে সর্দার বলিয়াই মনে করা হয়। এবং এই সব কল্পিত সর্দারকে দেবতা আখ্যায় ভূষিত করা হয়। প্রত্যেক সর্দারই দেহত্যাগের পর দেবতার আসন ও সম্মান পাইতে থাকে। জীবিত সর্দার যেন এই সব দেবতার পুরোহিত, ইনি দেবতাদের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন বলিয়া সময় সময় শাস্ত্র বা আদর্শের প্রবর্তন করেন। সর্দারদের গৌরবজনক বীরত্বকাহিনী অবলম্বন করিয়া গীত রচিত হয়, তাহাদের জীবনবৃত্তান্ত বংশপরম্পরায় ঘোষিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হয়।

মানুষ স্বভাবতঃই নিজের মনের রঙে জগৎকে রঙিন করিয়া দেখে। সে মনে করে, নিজের ভিতরে যেমন জড় ও চিন্ময় পদার্থ আছে, সেইরূপ সামান্য তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রাদি পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থেরই একটি জড় ভাগ আর একটি সূক্ষ্ম ভাগ আছে। দেবতার মন্দিরে বা সমাধি স্থানে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহার সূক্ষ্ম অংশে দেবতারা ভোগ করেন, জড় অংশ যেমনকার তেমনি থাকিয়া যায়। নদী কেবল পানি মাত্র নহে যে শুকাইয়া গেলেই নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার মধ্যে এক আত্মা বাস করে, —তাহার মৃত্যু নাই। কিন্তু মানুষ যতই

সমষ্টিকে ধারণা করিতে সক্ষম হয়, ততই তাহাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা প্রত্যেক বৃক্ষের এক একটি দেবতা কল্পনা না করিয়া সমগ্র বনের একটি দেবতা স্বীকার করে; প্রত্যেক নদীর স্বতন্ত্র দেবতার স্থলে একটি মাত্র জলদেবতায় বিশ্বাস করে; প্রত্যেক নক্ষত্রের পৃথক পৃথক দেবতার স্থলে সমগ্র আকাশের একটি মাত্র দেবতার ধারণা করে। এইরূপে প্রকৃতি একদল দেবতার শাসিত বলিয়া অনুমিত হয়। স্থল বিশেষে কৌলিক দেবতাদিগকে ইহাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, আবার কোথায়ও বা স্বতন্ত্রভাবেই ইহাদের পূজা হয়।

এই সমস্ত দেবতা আদিম মানুষের নিকট প্রভু বা সম্রাটের ন্যায়। তাহাদের চরিত্রও মানবীয় চরিত্র; কারণ প্রত্যেক জাতিই নিজেদের চরিত্রের উচ্চতম আদর্শের দ্বারা দেবতার চরিত্র কল্পনা করে। কোনো কোনো দেশে শুভ এবং অশুভ দুই প্রকার দেবতা আছে। উপদেবতাগুলিকে স্তুতিবাক্য এবং উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট করা যায়, শুভ দেবতাগুলিকেও অবহেলা করিয়া ভীষণ ও ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা যায়। যাহা হউক, যেমন অত্যাচারী রাজাদের ভাগ্যেই স্তুতিউপহার অধিক জোটে, সেইরূপ অপদেবতাগণই অধিক পরিমাণে পূজা উৎসর্গ প্রভৃতি পাইয়া থাকেন।

মৃত্যুর পরে আত্মার স্থিতি সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমে তাহাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। সমাধির আশেপাশেই তাহাদের গতিবিধি ছিল। পরে ভূগর্ভে কিংবা অন্তরীক্ষে তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ করা হয়। পৃথিবীতে তাহারা যেভাবে জীবন-যাপন করিত ভৌতিক জগতেও তাহারা ঠিক সেইভাবেই বাস করে। বস্তুতঃ মৃত্যুর পর আত্মার জীবন পৃথিবীস্থ জীবনেরই পরবর্তী অধ্যায় মাত্র। পরবর্তী জীবন, পৃথিবীস্থ জীবনের উপনিবেশ বিশেষ, কাজেই সেখানেও ঠিক এই সমস্ত আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়াই আত্মা বাস করিবে। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, এই কারণে তাহার সমাধিপার্শ্বে বা তাহার অভ্যন্তরে, তাহার ব্যবহৃত প্রিয় খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি রক্ষিত হয়; এমন কি, তাহার পত্নী ও দাসদাসীদিগকেও সময় সময় তাহার অনুগমন করিতে হয়, তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিবর্গ, পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্রের আত্মা প্রেতলোকে তাহার অনুগমন করে।

নরলোক এবং প্রেতলোকে একই দেবদেবী রাজত্ব করে। নরলোকে স্থায়িত্বকাল অল্প, প্রেতলোকে স্থায়িত্ব কাল দীর্ঘ। কিন্তু উভয় লোকই অনাদিকাল হইতে অবস্থান করিতেছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে। মানুষ কোনও কালে পৃথিবীকে আরম্ভ হইতে দেখে নাই বলিয়া তাহা অনাদি; এবং সে ইহাকে বৃদ্ধ হইতে দেখে না বলিয়াই ইহা অনন্ত।

নরলোক ও পরলোক পাশাপাশি অবস্থিত। এমন কি সীমারেখাও খুব সুনির্দিষ্ট নহে। দেবতারা বা প্রেতাত্মারা অনেক সময় রক্তমাংসের শরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে। স্ত্রীলোককে ভুলানো, শত্রুকে উৎপীড়ন করা এবং প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বাক্যালাপ করা, এই সমস্ত তাহাদের কাজ। অপর পক্ষে মানুষের মধ্যেও এমন সব অতিমানব আছেন, যাঁহারা জড় শরীরকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া আত্মিক জগতে ভ্রমণ করিতে পারেন, এবং সেখান হইতে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করিয়া মর্তবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারেন। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মারা অনেক সময়, পৌত্র বা প্রপৌত্রের রূপ ধরিয়া বংশে পুনঃপ্রবেশ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত বীরপুরুষ এবং ধর্ম প্রবর্তকগণকে অনেক সময় অবতার বলা হয়, অর্থাৎ

তাঁহারা দেবতার ঔরসে স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছেন। কখনও কখনও বিশ্বাস করা হয় যে, কোনো দেবতা দয়াপরবশ হইয়া পৃথিবীর দুর্দশা বা বিপ্লব দূর করিবার জন্য দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়া থাকেন।

কখনও কখনও অসভ্য জাতিরা বিশ্বাস করে যে তাহাদের রাজা প্রকৃতপক্ষে নরদেহধারী দেবতা। কোনো কোনো দেশে রাজদেহকে অবিনাশী বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস, রাজা আহার করেন না, নিদ্রা যান না এবং তাঁহার মৃত্যু নাই। ঐ সমস্ত রাজ্যে পুরোহিতেরাই সর্বেসর্বা। সাধারণ লোকে কোনো দরবার লইয়া উপস্থিত হইলে রাজা পর্দার আড়াল হইতে একখানি পা বাহির করিয়া দিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন! তাঁহার মৃত্যু হইলে, পুরোহিতেরা গোপনে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়া তৎস্থলে অন্য রাজা প্রতিষ্ঠিত করে।

অপুষ্ট মানুষের জগৎ রহস্যাবৃত। তাহার প্রত্যেক যন্ত্রণা, প্রত্যেক স্বপ্ন, প্রত্যেক সম্পদ, প্রত্যেক বিপদ—এক কথায় যাহার কারণ নির্ধারণ করা একটু কঠিন, সে সমস্তই দেবতার রোষ বা অনুগ্রহের ফলে সংঘটিত হয়। প্রতিদিন, প্রতি-নিয়তই দেবতা তাহার কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। এমন কি, মৃত্যুও স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহার বিশ্বাস, কোনো না কোনো সময়ে মানুষ দুর্ব্যবহার দ্বারা দেবতাদিগের রোষ উৎপাদন করে, এবং তাহারই ফলে দেবতাগণ কর্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হয়।

তাহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা অসাধারণ। পিতা-পিতামহদের বর্ণিত দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস, একেবারে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক। বিশ্বাস করিবার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না; সে প্রাণের সহিত অনুভব করে, তাহাকে যাহা শিখানো গিয়াছে তাহাই সত্য। তাহার বিশ্বাস, তাহার জ্ঞানবুদ্ধির সহচর ও সমপ্রকৃতির। যতক্ষণ না তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিবর্তন হয়, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। যদি কোনো দেবতা স্বপ্নে, বা তাহার পুরোহিতের মারফতে কোনো প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া থাকেন, তবে সে কিছুমাত্র আশ্চর্য জ্ঞান করে না—তাহার দেবতার প্রতি বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও কমে না। সে সহজভাবে মনে করে, দেবতা ছলনা করিয়াছেন। দেবতা তাহার নিকট এক বিরাট ক্ষমতাপন্ন পুরুষ, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ছলনা করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা দোষের বিষয় নহে। তাহার দেবতা স্বেচ্ছাচারী নৃপতি বিশেষ—ক্ষেতের প্রথম ফসল, গাছের প্রথম ফল, পালের প্রথম বাছুর তাঁহার প্রাপ্য। আবার কখনও কখনও তাঁহার ভোগের জন্য কুমারী নারী, এবং ভোজের জন্য নরদেহ দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। আর মানুষ প্রকৃতপক্ষে দেবরাজার ক্রীতদাস। সে প্রার্থনা করে—অর্থাৎ ভিক্ষা চায়; স্তোত্র পাঠ করে—অর্থাৎ স্তুতি গায়; বলি উৎসর্গ করে—অর্থাৎ কর প্রদান করে। সাধারণতঃ ভয় হইতেই এই সব করে—তবে অনেক সময় প্রতিদানে কিছু বেশী পাইবার আশাতেও করিয়া থাকে। তাহার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী প্রধানতঃ দীর্ঘজীবন, ঐশ্বর্য, এবং পুত্রবতী স্ত্রী। সচরাচর দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে যে সব বিদ্রোহের কথা উদিত হয়, তাহা প্রকাশ করিতে ভয় পায়, কিন্তু সময় সময় অসহ্য হইলে তাহার অন্তর্নিহিত যাতনা কথায় প্রকাশ পায়। রোগ শয্যায় ছটফট করিতে করিতে সে দেবতাকে অভিশাপ করে আর বলে, "আমার ভিতরটা খোলা করিয়া খাইয়া ফেলিতেছে।" আবার মানুষ যখন নিজের বুদ্ধির চেয়ে উচ্চতর কোনো ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখনও সে দেবতাকে ঠিক চিনিতে পারে না। কারণ দীক্ষা দ্বারা ধর্ম পাওয়া যায় না। একবার সোমালীল্যাণ্ডের এক বৃদ্ধা বলিয়াছিল, "ও আল্লা, তোমার দাঁতে যেন আমার দাঁতের মত

কন্‌কনানী হয়; ও আল্লা, তোমার মাড়ীতে যেন আমার মাড়ীর মত ঘা হয়।' খৃষ্টান সম্রাট 'পেপেল' এক সময় নিজের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "গড়কে দেখিতে পাইলে এই মুহূর্তে তাহার প্রাণবধ করিতাম, মানুষকে কেন সে মরণাধীন করিয়াছে?'

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতার সংখ্যা কেমন করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়, পূর্বেই তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই সংখ্যা যত কম হয়, দেবতার ক্ষমতাও তত প্রসারিত ও পরিবর্ধিত হয়। অবশেষে মানুষ যখন বিচিত্র বিশ্বে এক পরিপূর্ণ একত্বের সন্ধান পায়, তখন ক্রমে ক্রমে তাহার মনে একটি মাত্র দেবতার কল্পনা আসে। তখন লোকে বিশ্বাস করে যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম' পুরুষটিই সমগ্র বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছেন। প্রথমতঃ এই দেবতা যেন জগতের বহির্দেশে বা উর্ধ্বদেশে নির্বিকারভাবে বসিয়া রাজত্ব করেন; এবং আগেকার দেবতাগুলি এই দেবাদিদেবের প্রতিনিধি বা ডিপুটি রূপে পৃথিবীতে কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তাঁহারা ফেরেস্তা কিম্বা পয়গম্বর শ্রেণীতে অবনীত হন; তখন লোকের বিশ্বাস হয় যে, সৃষ্টিকর্তা বিশ্বের সর্বত্র অর্থাৎ 'অনলে, অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধরে সলিলে গহনে, বিরাজিত আছেন; এবং ভালমন্দ সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে প্রবাহিত হয়। তবে কোনো কোনো পদ্ধতিতে তাঁহাকে কেবল শুভদায়ক বলিয়া কল্পনা করা হয়; অশুভের কর্তা কোনো বিদ্রোহী ফেরেস্তা বা অসুর,—যাহাকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মহাশত্রু বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এ পর্যন্ত আমরা নীতির দিক দিয়া একটি কথাও বলি নাই। পৃথিবীর সৃজনকাহিনী, দেবতা দ্বারা মানুষের শাসন, মৃত্যুর পরে তাহার অবস্থা, এসমস্তই বৈজ্ঞানিক হিসাবে ধরিলে অনুমান বা কল্পনা মাত্র। এগুলি প্রাথমিক মানুষের জিজ্ঞাসু চিত্তের কৌতূহল নিবারক যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত। এইগুলি নানাভাবে ও কল্পনার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট revealed religion বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্মবিশ্বাস রূপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এগুলি যুক্তিমূলক বলিয়া আমাদের বুদ্ধির সহিত অনেকটা মিশ খায়। এ কারণে বর্তমান যুগের সভ্য মানবও উহা অনেকটা বিশ্বাস করে। কিন্তু নৈতিক হিসাবে ইহার কোনো মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পৃথিবী নির্মাণ করিতে ৬ দিনই লাগুক আর ১০ হাজার বৎসরই লাগুক, পৃথিবীর সৃজনকারী এক খোদাই হউন বা তেত্রিশ কোটি দেবতাই হউন, তাহাতে মানুষের জীবনযাত্রার কি আসিয়া যায়? কোনো অসভ্য জাতি একলক্ষ দেবতার শাসনাধীনে আছে বলিয়াই, তাহারা নিশ্চয়ই খুব সাধু সজ্জন হইবে, তাহার কোনো স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নাই।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় নৈতিক বৃত্তিও একটা স্বভাবজাত ধর্ম। ক্রমে ক্রমে ইহার বিকাশ হয়। মানুষের দেবতা যখন তাহারই চরিত্রের প্রতিমূর্তি তখন মানুষের নৈতিক আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে তাহার দেবতার নৈতিক আদর্শও উন্নত হইতে থাকিবে তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। অসভ্য জাতির সর্দার কেবল তাহার নিজের এবং নিজের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে অন্যায়ের শাস্তি বিধান করে, কিন্তু উহারা একটু সভ্য হইলে, সর্দার সর্বসাধারণের ধর্মাবতারে পরিণত হয়। সেইরূপ অসভ্য জাতির দেবতা, তাহাদের নিকট হইতে মাত্র কর ও বশ্যতার দাবী করে। তাহারা ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি দেয় কারণ তাহা বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ; শাস্ত্রনিন্দার শাস্তি দেয়, কারণ তাহা আদালত অবমাননার অপরাধ; কর বা স্তুতি বন্ধ করিলে শাস্তি দেয় কারণ তাহা রাজবিদ্রোহ। আবার এই সব অপরাধীকেই সভ্য জাতির দেবতাও

সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি প্রদান করেন; কিন্তু সভ্য জাতির দেবতা আরও আদেশ করেন যে, মানুষ পরস্পরের প্রতিও ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই দেবতা এখনও স্বেচ্ছাচারী সম্রাট কারণ তিনি মানুষকে তাঁহার স্তুতি গান ও প্রশংসা করিতে আদেশ করেন। এবং করও গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল আত্মানুসন্ধানী শাসক মাত্র নহেন। তিনি সুকৃতিশীলকে পুরস্কার দান করেন, এবং দুষ্কৃতিশীলকে দণ্ডিত করেন।

সময় সময় পৃথিবীতে দেখা যায় সাধুতার পুরস্কার নাই, অথচ অসাধুতার জয়জয়কার হইতেছে। আদিম মানুষের মনে ইহাতে কোনো খটকা বাধে না, কারণ তাহারা মনে করে, কোনো পূর্বপুরুষ কিংবা আত্মীয়ের দোষে সাধুপুরুষও নির্যাতন ভোগ করে; আর পূর্ব পুরুষের সুকৃতির ফলে পাপীরও পাপ খণ্ডন হইয়া যায়। 'অসভ্য জাতির' জীবন-ইতিহাসের কোনো অধ্যায় সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না, পরিবারের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। পরিবারের কোনো ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিলে, সেই পরিবারের যে কোনো ব্যক্তির রক্ত দ্বারা সেই হত্যার প্রতিশোধ লওয়া হয়। যদি এক পুরুষের মধ্যে সেই রক্তপাতের প্রতিশোধ না লওয়া যায়, তবে সে বিবাদ চলিতেই থাকে; কারণ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলেও, সমগ্র সম্প্রদায়ের তো আর মৃত্যু হয় না সুতরাং অপরাধীর পুত্রপৌত্রেরাই পূর্বপুরুষের কৃত অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করিবে এ কথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

সমাজের উচ্চতর অবস্থায় এই পারিবারিক ভাবের পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন মনের বিকাশ খুব দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে। এই সংসারে সকলের প্রতি ঠিক ন্যায় ব্যবহার হইতেছে না, একথা তখন ধরা পড়ে। এ জন্য বিশ্বাস করা হয় যে, পরজন্মে ইহকালের বিচারের দোষ ত্রুটি সংশোধন করা হইবে। অন্য কথায় 'পরলোকে পুরস্কার ও শাস্তি হইবে' এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়। তখন প্রেত জগৎ বা আত্মিক জগৎ দুই অংশে বিভক্ত হয়। এক অংশে পাপাত্মা ও অন্য অংশে পুণ্যাত্মার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। অতএব পাপাত্মারা অন্ধকার দুর্গন্ধময় স্থানে অনন্তকাল ধরিয়া অসীম যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে। আর ভক্ত পুণ্যাত্মারা সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, সোনার মুকুট পরিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া মহা-প্রতাপান্বিত দেবতা বা ঈশ্বরের সৌন্দর্য সুধা পান করিতে থাকিবে।

বলা বাহুল্য, বর্তমান উচ্চশ্রেণীর চিত্তের নিকট পরিণামের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা বিশেষ লোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে এশিয়াতে। রাজ দরবারে সম্মানিত আমীর ওমরাহের পদ অধিকার করা প্রাচ্য মনের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং পরম কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা ক্রমবিকাশের যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তৎকালের দিনে দেবতার প্রতি মানুষের মনোভাব, ঠিক রাজার প্রতি প্রজার মনোভাবের অনুরূপ। প্রাচ্য রাজার প্রজারা অন্তরে সন্তান বা সেবক। এখানে লোকে প্রাণবধের আজ্ঞা পাইলে, সেই নিদারুণ ফরমান চুম্বন করিয়া ভক্তির সহিত নির্বিরোধে শূলে চড়িতে পারে। রাজা তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইলেও, হাত জোড় করিয়া ভক্তিভরে বলিতে পারে, রাজাই দেনেওয়ালা, রাজাই লেনেওয়ালা। 'রাজার নাম ধন্য হউক।' বিদেশী প্রজা, যে কোনো দিন রাজাকে দেখে নাই, কেবলই চাঁদা দিয়াছে, সেও যদি শুনিতে পায় যে রাজা বিপদে পড়িয়াছেন, তখন অমনি সে তরবারি বাহির করিয়া আপন আত্মপরিজন এবং পুত্রকে যেভাবে রক্ষা করিত, ঠিক সেইভাবে রাজাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া যায়।

এই প্রকার ভক্তি রাজার প্রতি প্রদর্শিত হইলে রাজভক্তি, দেবতা বা ঈশ্বরের প্রতি প্রদর্শিত হইলে ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে মনোবৃত্তি একই প্রকার। ধর্মভাবও এক প্রকার শক্তিপূজা বিশেষ। মানুষ ঐহিক নরপতিকে যে সম্মান করিত, অদৃশ্য দেবতাকেও সেই সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। অসভ্য সমাজে কেবল ভীতিই এই সম্মান প্রদর্শনের মূল কারণ, কিন্তু উন্নত সমাজে ভয়ের সহিত ভালবাসাও মিশ্রিত আছে। ইহাতে মনে এক অনির্বচনীয় সুখকর মিশ্র ভাবের উদয় হয়। পার্থিব রাজার প্রতি পূর্বকার এই শ্রদ্ধা ও সম্মান অনেক হ্রাস পাইয়াছে, এমন কি কোনো কোনো দেশে এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। তথাপি অদৃশ্য দেবরাজের প্রতি তাহাদের মনোভাবের ততটা পরিবর্তন হয় নাই। কে জানে ভবিষ্যতে দেবতার রাজ-সম্মান বজায় থাকিবে কি না?

ধর্মভাব ও দেব-পরিকল্পনা সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল, ইহা হইতে সহজে ও পরিষ্কাররূপে বিভিন্ন দেশের রাশীকৃত শ্রুতি, পুরাণ ও কাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীভাগ করা যাইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষের ধারণা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়াছে; একই সমাজে একই সময়ে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনো কারণ নাই। আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই এরোপ্লেনের দিনেও গো-গাড়ী ও একা গাড়ীর অপ্রতুলতা নাই; ইলেকট্রিক লাইটের দিনেও শত শত ঘরে মাটির ঢেবী জ্বলিতেছে; সেইরূপ এক ঈশ্বরের ধারণা প্রবর্তিত হইবার বহু পরেও আমরা প্রকৃতি পূজার শত শত নিদর্শন দেখিতে পাই। হানিবল আর ফিলিপের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাহাতে উভয় পক্ষ বলিতেছেন 'Jupitor, Juno এবং Apollo-র সাক্ষাতে; কার্থেজবাসীর দেবতা এবং Hercules-এর সাক্ষাতে; Mars, Triton এবং Neptune-এর সাক্ষাতে; আমাদের শিবিরে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদের সাক্ষাতে; সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সাক্ষাতে; নদী হ্রদ এবং সমুদ্রের সাক্ষাতে শপথ করিতেছি।' সক্রেটিসের সময় এথেন্সের লোকে সূর্যকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত। আলেকজান্ডার বা সেকেন্দর বাদশাহ যে কেবল সমুদ্রের দেবতাদিগের উদ্দেশ্যেই বলিদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে, (Arrian বলেন) তিনি স্বয়ং সমুদ্রকেও নানা উপহারে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এমন কি Prophet Job-এর গ্রন্থেও তারকাগণকে জীবনধারী প্রাণী মনে করিয়া বলা হইয়াছে, যে তাহারা স্বর্গের সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে সঙ্গীত করিয়া ফিরিতেছে।

আবার যে সব দেশে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে, অর্থাৎ এক শ্রেণী অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষিত এবং অন্য শ্রেণী অনুন্নত ও অশিক্ষিত, সেখানে বাহ্যতঃ এক ধর্ম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে দুইটি ধর্মই বিরাজ করে। প্রাচীন Sabeans-এর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক নক্ষত্রবাসী দেবগণকে ভক্তি করিত, অন্য শ্রেণী নক্ষত্রগুলিকেই পূজা করিত। অগ্নিপূজকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক অগ্নিকে উপলক্ষ মাত্র জানিত, অন্য শ্রেণী অগ্নিকেই উপাস্য মনে করিত। পুতুল বা প্রতিমার প্রচলন যে দেশে আছে সেখানে সর্বত্রই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতেরা প্রতিমাকে ধ্যানধারণার সহায়ক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাহারা পড়িতে জানে না, তাহাদিগকে পুস্তক কিনিয়া দিলেও ফল হয় না। অসভ্য জাতি মনে করে, তাহাদের দেবতা ঐ প্রতিমার ভিতর আছে কিম্বা ঐ প্রতিমাকে দেবতা মনে করে। শিশু তাহার পুতুলটিকে যে চক্ষে দেখে, ইহারা দেবপ্রতিমাকেও ঠিক সেইভাবেই দেখে। শিশু জানে যে তাহার পুতুল রং করা কাঠ কিম্বা কাপড় এবং তাহার ভিতরে [illegible]

কিম্বা করাতের গুঁড়া আছে তবু সে তাহাকে জীবিতের মত ভালবাসে, শাড়ী পরায়, বিছানায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ায়। আদিম মানুষের ভ্রান্তিও ঠিক এইরূপ; কারণ সে কল্পনাশক্তিতে সমতুল্য; সেও প্রতিমার সঙ্গে আদর করিয়া কথা বলে, জল দিয়া তাহার পা ধোয়াইয়া দেয়। তাহার মাথায় ও মুখে তেল দিয়া দেয়; প্রার্থিত জিনিস না পাইলে অনুযোগ করে।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। দেবতার নৈতিক আচরণও দেশের লোকের নৈতিক আদর্শের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেদুইন বা যাযাবর জাতি সচরাচর তাহাদের দল ছাড়া অন্যদলের দ্রব্যসামগ্রী অপহরণ বা লুণ্ঠন করা, অন্য কথায় কাফেরের মাল লুট করা, অন্যায় মনে করে না। তাহাদের দেবতাও তাহাদের মত লুণ্ঠনকারী সর্দার। যখন তাহারা বেদুইন স্বভাব ত্যাগ করিয়া শস্যশ্যামল প্রান্তরে বাস করিয়া কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এবং বাড়ীঘর ও শহর নির্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করে তখন তাহাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও চুরি, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি নিষেধ করিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। কিন্তু সময় সময় তাহাদের পূর্ব-দেবতার বচন বা ক্রিয়াকলাপ লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় এবং ওগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত যুগের লোকেও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করে তখন একটা কৌতুকজনক অথচ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, ধর্মবিশ্বাস তখনকার লোককে উন্নতির দিকে না উঠাইয়া অবনতির দিকেই টানিয়া নামায়। কাজে কাজেই ধর্মবিশ্বাসও অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। কারণ একই কাজ দেবতায় করিয়া গিয়াছেন বলিয়া লীলারূপে পরিগণিত হইবে, আর মানুষে করিলে তাহার জন্য ফাঁসী-কাষ্ঠের ব্যবস্থা হইবে, এই অন্যায় অবিচার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকে দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারে না।

সাধারণ লোকের মন অত্যন্ত অগঠিত ও অপরিপূর্ণ। এজন্য তাহাদের কোনো নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাঁধাবাঁধি বিশ্বাস থাকা চাই। সেই অজানিত ও অজ্ঞেয় পুরুষ বা শক্তি সম্বন্ধে একটা থিওরী থাকা উচিত, যাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাহার জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এই থিওরী যেরূপই হউক না কেন, তাহাকে লোকের বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে হইবে। সেই থিওরী এমন হওয়া চাই যে অনুসন্ধানের ফলে তাহা বিনষ্ট না হইয়া যেন আরও তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

কিন্তু উন্নত জ্ঞানপিপাসী মন কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া সর্বদা সন্দেহে আন্দোলিত থাকিবে। তাহারা যে কেবল অতিরঞ্জিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহা নহে; জগতের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য, জ্ঞানমূলক ও নীতিমূলক যে সমস্ত সুকৌশলযুক্ত থিওরী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতেও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। তাহারা দিনের পর দিন কেবলই চিন্তা করিতে থাকিবে। ক্রমেই জ্ঞানের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে; কিন্তু দেখিতে পাইবে যে চিন্তার ক্ষেত্র অনন্তপ্রসারিত। তখন সে বুঝিতে পারিবে যে মানববুদ্ধি সেই সূক্ষ্মচিন্তার ক্ষেত্রে কত দুর্বল, কত শক্তিহীন। তথাপি মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই—সে অনবরত সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য উদঘাটিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইটিই মানুষের গৌরব। ইতিমধ্যেই সে দুইটি বিরাট সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমটি এই—জগতের সৃষ্টি ও পরিকল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে নানা বৈষম্য দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সকলের মধ্যে এক চমৎকার ঐক্যবন্ধন আছে। বিশ্ব যেন এক অখণ্ড বিরাট দেহ, যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি একে অন্যের পরিপূরক। দ্বিতীয়টি এই যে, জগতের সমুদয় নৈসর্গিক ও নৈতিক ব্যাপারই অপরিবর্তনীয় কঠোর নিয়মের অধীন।

প্রকৃতপক্ষে, বৃষ্টি অথবা সুবাতাসের জন্য প্রার্থনা করা আর সূর্যকে মধ্যাকাশে অস্ত যাইতে বলা সমান হাস্যকর। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা যতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, জীবিকার জন্য বা রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করাও ঠিক ততখানি নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন; আবার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করা যতটা অজ্ঞতার লক্ষণ, মানসিক শান্তি বা পবিত্রহৃদয় লাভের জন্য প্রার্থনা করাও তথৈবচ। পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাই নিয়ম অনুসারে ঘটে। এমনকি যে সমস্ত কাজ মানুষের খামখেয়াল বা খোশমেজাজের উপর নির্ভর করে, তাহাও সমষ্টিগতভাবে মানুষের ইচ্ছার অধীন নহে। একটি মানুষের জীবন একটি পরমাণুর মতই হেঁয়ালিযুক্ত, কিন্তু সমগ্র মানব-সমাজ যেন গণিতের হিসাবের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত। ব্যষ্টি হিসাবে, সে ইচ্ছাশক্তিময় মানুষ, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে সে কলের তৈয়ারী জীব, যাহার এরূপ ছাড়া অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল।

বিশ্বের একত্ব একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহার সৃষ্টিকর্তাকে একটি মাত্র মহামন বলিয়া ধরিয়া লওয়া সদৃশ-যুক্তিমূলক অনুমান। এই অনুমান হয়তো মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা যুক্তিসহ অনুমান। তথাপি ইহা অনুমান মাত্র। আর বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে আমাদের সমস্যার অপনোদন হয় না, সত্যাবিষ্কার বেশী দূর অগ্রসর হয় না। পৃথিবী যেন কচ্ছপের উপর অবস্থিত হইল, কিন্তু 'কচ্ছপ কিসের উপর আছে?' এই নূতন প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সেই মহামন অর্থাৎ 'আল্লা' যেন জগৎ সৃষ্টি করিয়া জাগতিক নিয়ম ঠিক করিয়া দিলেন, কিন্তু 'আল্লা' কোথা হইতে আসিলেন? ধর্মকারেরা বলিলেন, খোদা 'স্বয়ম্ভূত' অর্থাৎ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন; জড়বাদীরা বলিবেন, পদার্থ আপনা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এ সমস্তই অসার কথা, বিস্ময়-বিমুগ্ধ নির্বাক বৈজ্ঞানিকের নিকট এসব কথার কোনোই মূল্য নাই। এই সমস্ত ব্যাপার অসীমের ধারণার ন্যায় বর্তমান মনুষ্যচিন্তার বহির্ভূত। আমরা কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন জ্ঞানান্বেষী হিসাবে আমাদের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত; এবং যে সমস্ত নৈতিক নিয়মের অধীন, নাগরিক হিসাবে তাহা পালন করা কর্তব্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সর্বাপেক্ষা কম আপত্তিজনক। কিন্তু একথা প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল, সুসভ্য গ্রীকদের দ্বারা নহে, অর্ধসভ্য বেদুইন আরবদের দ্বারা। প্রথমে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় যে গ্রীকেরা সর্ববিষয়ে প্রাচীন আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকিলেও, ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে—যাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও বুদ্ধিসাপেক্ষ—কেন আরবদের নিকট ঋণী হইল? কিন্তু উভয় দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একথার উত্তর পাওয়া যায়। গ্রীস নদী, উপত্যকা, ফল, মূল, লতা, পুষ্পে বিচিত্র; আর আরবের রিক্ত প্রকৃতি মরুভূমি মাত্রেই পর্যবসিত। সুতরাং গ্রীকের মনে একক দেবতার কল্পনা করা কষ্টকর ও অস্বাভাবিক, আরবদের পক্ষে তেমনি বহুত্বার ধারণা করাই আশ্চর্যের বিষয়। আরবের মরুভূমির মধ্যে হয়তো কতকগুলি পাথর এবং আকাশের চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আমরা জানি আরববাসী প্রথমতঃ এইগুলিকেই দেবতা বলিয়া মানিত। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় তাহাদের প্রাচীন রাজাদের এক উপাধি ছিল 'সূর্য-দাস'। বর্তমান যুগেও প্রাভাতিক নক্ষত্রকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু এই দেশের বুদ্ধিমান লোকে চিরকাল, (অন্ততঃ ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই) এক খোদায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। একেশ্বরবাদকে আরব্য ধর্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরবদের এই একেশ্বর ধর্ম, হযরত, এব্রাহিম, ইয়াকুব, ইউসুফ,

মুসা, জশুয়া, সামুয়েল, সল, দাউদ, সুলেমান প্রভৃতির জীবন ঘটনার সংস্পর্শে কিরূপ পরিবর্তিত ও বিকশিত হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে কেমন করিয়া খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম উদ্ভূত হইয়া সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সে সমস্ত ইতিহাস চমৎকার হইলেও এখন বলিতে গেলে আপনাদের নিশ্চয়ই ধৈর্যচ্যুতি হইবে। এজন্য আজ আর ক্রমবিকাশের শেষাংশের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে কোন দিনে সে বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াই আজ বিদায় লইতেছি।

## সঙ্কেত

মনে ভাব উদিত হয়; তা রূপ পায় শব্দে, ভাষায় বা ভঙ্গিতে। সঙ্গীত, কবিতা ও নৃত্যকলা মনোভাবেরই পরিপুষ্ট বাহ্য পরিণতি। অপ্রকাশকে সপ্রকাশ করবার জন্য মানুষের সাধনার অন্ত নাই; আর না ক'রে উপায়ও নাই। শিশুর যখন ক্ষুধা পায় তখন ক্রন্দন না ক'রে তার আর উপায় কি?

মানব-সভ্যতার শৈশবেই পরস্পর ভাব আদান-প্রদানের জন্য সঙ্কেত ও ভাষার উদ্ভব হয়েছে। মোটামুটি, সঙ্কেতকে ভাবের 'কার্যরূপ' এবং ভাষাকে তার 'নামরূপ' বলা যেতে পারে। পতাকা, আলোকস্তম্ভ, রেল লাইনের সিগন্যাল, ষ্টীমার লাইনের আড়কাঠি—টেলিগ্রাফের কোড, যুদ্ধক্ষেত্রের বাদ্য-সঙ্কেত; এবং মস্তক-সঞ্চালন, অঙ্গুলি-হেলন, ভ্রূভঙ্গি, কটাক্ষপাত, প্রণতি, আরতি,—এসব সর্বদাই ভাবপ্রকাশের সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার, প্রয়োজনের তাড়নায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কত সহস্র প্রকার ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, এবং মানুষের চেষ্টা ও উদ্ভাবনার ফলে লিপি-কৌশল ও সাঙ্কেতিক অক্ষরের প্রচলন হয়েছে। বাস্তবিক, অক্ষরাদির সাহায্যে ভাষাকে বেঁধে রাখতে না পারলে এর উৎকর্ষ-সাধন হ'ত না। অতীতের যা' কিছু উৎকৃষ্ট, তা' করায়ত্ত হ'লে শিল্পীর পক্ষে নতুন বা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টির পরিকল্পনা অনেক সময় সহজ হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি থাকলে এর আরও উৎকর্ষ হ'ত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শতরঞ্চ খেলায় পূর্বতন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের ভাল ভাল চাল, পাশ্চাত্য-দেশের লোকে লিপিবদ্ধ করে রেখে তার সম্যক আলোচনা ক'রেছে; তাই তারা আজকাল আমাদের চেয়ে এ বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে।

সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই, প্রকাশের ভঙ্গি—শব্দ-সম্ভার, ভাব-ব্যঞ্জনা, সঙ্কেত-চাতুর্য প্রভৃতি তদনুরূপ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এতে অধীর হ'য়ে আমরা অনেক সময় বলে থাকি, 'জীবন অতিশয় কৃত্রিম হ'য়ে পড়েছে—আদিম যুগের সরলতার দিকে আবার ফিরে যাওয়া আবশ্যক।' যদি সত্য সত্যই ফিরে যাওয়া সম্ভব হ'ত, তবু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার স্বভাবের নিয়মেই বহুমুখী জটিলতার দিকে পুনর্গমন করতে হ'ত। মানুষের মনে যে সৃষ্টির প্রেরণা আছে, তারই কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসার বশে জীবনে বৈচিত্র্য সাধিত হয়। এই বৈচিত্র্যকে কৃত্রিম ব'লে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

বর্তমান সময় পর্যন্ত দেখা যায়, মানুষের বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র গণিত শাস্ত্রেই সঙ্কেত বা চিহ্নের প্রসার অধিক হ'য়েছে। সাধারণ সংখ্যা-গণনা থেকে আরম্ভ ক'রে ভগ্নাংশ, ঋণসংখ্যা, এমন কি কাল্পনিক সংখ্যার ধারণা; বিন্দু, রেখা, তল, স্থান, অতিস্থান (hyper-space), তারতম্য, কাল, গতি প্রভৃতির কল্পনা; সান্ত ও অনন্ত নানা প্রকার সংখ্যাপর্যায়ের আবিষ্কার; আর বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা বা পরিমাপের নাম-করণের জন্য ছোট হাতের ও বড় হাতের a, b, c থেকে x, y, z পর্যন্ত সঙ্কেতে অকুলান হওয়াতে বিভিন্ন ভাষা থেকে বর্ণমালা ধার করবার আবশ্যকতা—

এসব বাস্তবিকই বিস্ময়কর। খণ্ড খণ্ড চিন্তা গ্রথিত ক'রে চিন্তাসূত্র নির্মিত হয়। খণ্ড-চিন্তার দিকে মন অত্যধিক নিবিষ্ট হ'লে অনেক সময় সমগ্র বস্তুর ধারণা করতে বিঘ্ন হয়। অতএব মন যাতে অযথা ভারাক্রান্ত না হয়, এজন্য অনুরূপ চিন্তা-সূত্রের সংক্ষিপ্ত নামকরণ ক'রে, তাকেই একক ধ'রে ভবিষ্যৎ চিন্তা অগ্রসর হয়। এই ভাবে যুগপৎ সঙ্কেতের জটিলতা ও চিন্তা-সৌকর্য সাধিত হয়।

কর্ম ও ভাবজগতের যাবতীয় ব্যাপার অঙ্ক-শাস্ত্রের মত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। বোধ হয় এই কারণেই অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্কেতাদি এত অধিক সুসংবদ্ধ হয় নাই। তবু সব ক্ষেত্রেই, এমন কি জটিলতম হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রেও, সঙ্কেতের ব্যবহার আছে এবং ক্রমশঃ তার বৈচিত্র্য সাধিত হচ্ছে তাতে আর ভুল নাই।

বিশেষ শিক্ষা না পেলে এক দেশের ভাষা অন্য দেশের লোকে বুঝতে পারে না। এতে বোঝা যাচ্ছে, ভাষা-সঙ্কেতের মধ্যে সম্প্রদায় বা দেশগত গোপনীয়তা আছে। কিন্তু এ গোপনীয়তা অনিচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত গোপন সঙ্কেতের প্রচলন রাজকীয় গুপ্ত-বিভাগেই অধিক দেখা যায়। তবে হৃদয়-বৃত্তির ক্ষেত্রেও ইচ্ছানুরূপ গোপন সঙ্কেত বা ইঙ্গিতাদি কেবল যে কাব্য-প্রসিদ্ধ তা' নয়; মনে হয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও রীতিমত সুপ্রচলিত।

সঙ্কেত মুখ্য বস্তু নয়, উপলক্ষ মাত্র। যে ভাব বা কল্পনার পরিবর্তে সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়, সেটা ভুলে গেলে আসল বস্তুই গড়বড় হয়ে যায়। কাগজে বা শিলাখণ্ডে হিজিবিজি যতই আঁক দেওয়া থাক না কেন, পাঠোদ্ধার ক'রে হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত সে কেবল আঁচড়ই, আর কিছু নয়। মাটি দিয়ে মানসপ্রতিমা গড়ে যদি তার মধ্যে, বা তা'কে অতিক্রম ক'রে, চিন্ময়ী মানসীর স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়, তবেই তা' সত্যিকার প্রতিমা হয়, নইলে সমুদয় অনুষ্ঠানই মাটি। আমরা সচরাচর একটা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম-অনুষ্ঠান ক'রে থাকি; এই অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যের সঙ্কেত-স্থানীয়। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই, অথচ কাজে কোনো ফল হচ্ছে না, এরূপ হ'লে বুঝতে হ'বে, আমরা সঙ্কেতের ভিতর ডুবে গিয়ে উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছি। দীর্ঘকাল প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ প'ড়ে বা ত্রি-সন্ধ্যা দেবার্চনা ক'রেও যদি হৃদয়ের কলুষ না ঘোচে, তবে বুঝতে হবে আমাদের মনে ঘুণ ধরেছে— আমরা সঙ্কেতকেই ধ্রুবজ্ঞান ক'রে ধ্রুবকে হারিয়েছি। জীবন-যাত্রার পথ, সঙ্কেতহীন হ'লে আবর্জনা স্তূপীকৃত হ'য়ে জীবন দুর্বহ হয় : আবার সঙ্কেত-সর্বস্ব হলে রস-বস্তুর অভাবে জীবন রিক্ত ও ব্যর্থ হয়।

প্রকৃতির কাছ থেকে অহরহ আমাদের কাছে সঙ্কেত পৌঁছুচ্ছে; মনীষা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সে সব বুঝে নিয়ে, তদনুসারে চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত করতে পারা জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা আর তাতেই জীবনের চরম সার্থকতা।

তা' পারা যেত, তবে বোধ হয়, সে চিরকাল শিশুই থাকত। শিশুর পক্ষে যা', পরিণত মানুষের পক্ষেও কতকটা তাই সত্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যেখানে অভাব, সেখানে সমস্ত জ্ঞানই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে কোনো দিন পথ ভোলার কষ্ট ভোগ করে নাই, সে কখনও ঠিক পথে চলার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না; যে কোনো দিন পানিতে পড়ে হাবুডুবু না খেয়েছে, সে কখনও নিরাপদে নৌকায় চড়ার সুখ ভাল করে বুঝতে পারে না।

মানুষ ভুল করে, পরে সেই ভুল সংশোধন করেই সত্যের সন্ধান পায়। সাধারণের ধারণা, "*ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখাই*" বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু "অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি" ব'লেও একটা কথা আছে। নিরুদ্বেগ আপদহীনতার ভিতরেই অনেক সময়ে বিপদের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। আসল কথা, জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতিলব্ধ যে জ্ঞান ও শিক্ষা, বাস্তবিকই তার তুলনা নাই। স্বল্প পরিসর টবের ভিতরে জীবন ধারণ করার চেয়ে, বাইরের বিস্তৃতির ভিতরে আনন্দে বিকশিত হওয়া অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর। তবে অন্যের দুর্দশা দেখেও অবশ্য শিক্ষা লাভ করতে হবে। কারণ একজনের পক্ষে সকল রকম অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। আমাদের এই বর্তমান—কোটি কোটি অভিজ্ঞতারই ফল, সুতরাং জীবনযাত্রায় অন্যের অভিজ্ঞতারও যে প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। অন্যের নিকট থেকে পাওয়া অসম্পূর্ণ বা অপরীক্ষিত জ্ঞানকে নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাচাই ক'রে নিজস্ব ক'রে নিতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিপুষ্ট জীবনের এই-ই ধারা।

মানুষ এই রকম ভুলের উপর চরণ ফেলে ফেলে সত্যকে খুঁজে পাচ্ছে এবং এইভাবেই ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভুল না করলে যেন সত্যের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না,—এ যেন আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা। যেমন, একটা ফুলকে নানাভাবে চারদিক থেকে দেখলে তার নতুন নতুন সৌন্দর্য চোখে পড়ে, এইরূপ সত্যকেও নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে নানাভাবে পরখ করে দেখতে হয়; তবেই তার সমগ্র রূপ ধরা পড়ে। কোনো বৃহৎ সত্যই এ পর্যন্ত সমগ্রভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে কিনা সন্দেহ। তবে যে-সত্যের যত বেশী ব্যতিক্রম আমাদের চোখে পড়েছে, তা আমরা ততই ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছি।

দুঃখ যত প্রবলভাবে মানুষের মনে আঘাত করে, সুখ ততটা করে না। সুখকে কোনো কোনো লোকে যত নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করতে পারে, চেষ্টা করলেও দুঃখকে তত সহজে মনের গোপনে লুকিয়ে রাখতে পারে না। এজন্য জীবনে দুঃখের মূল্য বড় বেশী। আগে দুঃখ পেতে হবে, তবেই সমস্ত অনুভূতি সজাগ ও তীক্ষ্ণ হবে। ভুল ক'রে যে দুঃখ পায়, তার ভুল করা সার্থক। আর ভুল করলেও যে নির্বিকার,—আত্মবিচার যার নাই—তার কাছে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, অর্থশূন্য শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ভুলের সব-চেয়ে বড় সার্থকতা এইখানে যে, ভুল মানুষকে দুঃখ ও অনুশোচনার আগুনে পুড়িয়ে তাকে বিশুদ্ধ করে তোলে, এবং মনুষ্যত্ব-সাধনের দিকে অনেক দূর অগ্রসর ক'রে দেয়।

ভুল সম্বন্ধে আর-একটা বড় কথা এই যে, ভুল না করলে বুঝি বা লোকে প্রেমময় হতে পারে না। তার কারণ, প্রেমের মূল-উৎস হচ্ছে সহানুভূতি। নিজে ভুল করে যার অহঙ্কার চূর্ণ হয় নি, সে মুখে যতই বলুক না কেন তার ব্যবহারের মধ্যে প্রায়ই প্রচ্ছন্নভাবে একটা আত্মম্ভরিতা এবং অন্যের প্রতি উপেক্ষা বা কৃপার ভাব থেকে যায়। আমার মনে হয়, এজন্য গোঁড়া নীতিবাগীশের দল অন্যের প্রতি অতি কঠোর বিচারের প্রয়োগ করেন এবং এই কারণেই তাঁরা রীতিমত সামাজিক হতে পারেন না। কিন্তু যখন বিচারের সেই নিষ্ঠুর মাপকাঠি

দিয়ে নিজের (বা প্রিয়াস্পদের) জীবন যাচাই করে দেখবার সময় আসে, তখনই প্রথম চোখে পড়ে, ভুল করা কত স্বাভাবিক, কত অবশ্যম্ভাবী। তখন তার দৃষ্টি বদলে যায়, করুণায় প্রাণ-মন ভরে ওঠে; তখন তার কল্পনার মোহ ভেঙ্গে যায়। তখনই সে প্রথম বুঝতে পারে, সে রক্তমাংসের মানুষ। আত্মকৃত ভুল মানুষকে ঘৃণা থেকে নিবৃত্ত করে, প্রেমময় হতে শেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা বোধ জন্মায়; একথা শুনতে অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু এ সত্য। ভুলের মত একটা সাধারণ ব্যাপার, যা অহরহ ঘটছে, তাই আবার মানুষের এতখানি কাজে লাগে, এটি বিশ্বের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সত্যোদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টার চেয়েও বোধ হয় ভুলের এই কার্যকারিতা বেশী কল্যাণপ্রসূ হয়েছে।

বাস্তবিক, ভুল আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর। ভুল না থাকলে পৃথিবীর দয়া, মায়া, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল গুণগুলির এত অবকাশ ও বিকাশ হ'ত কিনা সন্দেহ। তা' ছাড়া ভুল না থাকলে এত দিন মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি কবে রুদ্ধ হয়ে সমস্ত অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে যেত। এইখানেই ভুলের মূল্য।

# অহঙ্কার

অবস্থা বিশেষে মানুষের একই প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। একটুতেই সাহস হঠকারিতায়, আত্মোৎসর্গ আত্মহত্যায় ও প্রতিযোগিতা হিংসায় পরিণত হ'তে পারে; আবার অতি সহজেই সমালোচনা পরচর্চায়, প্রশংসা চাটুবাদে, তেজ ক্রোধে, এবং ধর্মপ্রীতি ধর্মান্ধতার স্তরে নেমে আসতে পারে। সেইরূপ ক্ষমা ও দুর্বলতা, সঞ্চয়শীলতা ও লোভ, বিনয় ও কপটতা, লজ্জা ও আড়ষ্টতা, এদের মধ্যে সীমা-রেখা খুব সুনির্দিষ্ট নয়। আবার সৌন্দর্যবোধ ও রূপতৃষ্ণা, প্রেম ও মোহ, অনুসন্ধিৎসা ও পরকীয়-রহস্যোদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টা, পাত্রভেদে বা মাত্রা-ভেদে একই মানব-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বর্তমান প্রবন্ধে অহঙ্কারের দুই-একটা দিক্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাচ্ছে।

সাধারণভাবে অহংজ্ঞান বা আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকাকেই অহঙ্কার বলা যায়। এই অর্থে অহঙ্কারকে মনুষ্যত্বের পরিচয়-সংজ্ঞা রূপে গ্রহণ করলেও অন্যায় হয় না; কারণ, মানুষ যেমন নিজেকে মানুষ বলে অনুভব করে থাকে, অন্য কোনো প্রাণী বোধ হয় তেমন করে নিজ নিজ সত্তা অনুভব করে না।

অহঙ্কার থেকে মানুষের মনে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মে, অর্থাৎ মানুষ নিজেকে সমুদয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এমন কি, অন্যান্য জীব-জন্তু যে মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য তার প্রিয় সেবক, বাহক, খাদ্য, ভূমিকর্ষক প্রভৃতি রূপেই সৃষ্ট হয়েছে, সে সম্বন্ধে মানুষ এক প্রকার নিঃসন্দেহ। বাস্তবিক, মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে অন্যান্য প্রাণীর উপর যে পরিমাণ প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে, তাতে তার মনে এই প্রকার ধারণা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এর উপর আবার সে জড় প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তার উপরও নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করছে। এজন্য মনুষ্যজাতি এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নিকট মাথা নোওয়ায় না। মানুষ নিজেকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে; এমন কি নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, এবং শারীরিক আকৃতি ও মানসিক প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌র প্রতিবিম্ব-রূপে কল্পনা করে।

এক সময় মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে এই পৃথিবীকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলে ধারণা করত, এবং সূর্য ও নক্ষত্রাদি সসম্মানে আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে মনে করে মনে মনে গৌরব অনুভব করত। এই ধারণা মানুষের অহঙ্কার ও সংস্কারের সঙ্গে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, এর ভ্রান্ততা প্রমাণ করতে পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ চিন্তা-বীরকে অশেষ নির্যাতন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হ'য়েছে। যা'হোক, পৃথিবী যখন ব্রহ্মাণ্ডের একটি অতি নগণ্য অংশ বলে জানা গেছে, তখন মানুষের অহঙ্কারে প্রচণ্ড আঘাত লাগলেও অন্যান্য জ্যোতিষ্কে তার চেয়ে উন্নততর জীব থাকা অসম্ভব নয়, এ কথাটি তাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হ'লে সৃষ্ট জীব জগতে তার স্থান কত উর্ধ্বে

বা কত নিম্নে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। মানুষের চেয়ে উন্নততর জীব হয়ত অন্যত্র থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে নাই। এজন্য মানুষ সগর্বে পৃথিবীতে বিচরণ করে অপরাপর জীবকে স্ব-বশে আনতে পেরেছে।

মানুষের এই আত্মোপলব্ধি সমস্ত উন্নতি ও প্রচেষ্টার মূল। এ-ই তাকে শ্রেষ্ঠতা সাধনের প্রেরণা যোগায়। শুধু ইতর প্রাণীর চেয়ে বড় হয়েই তার অহঙ্কার তুষ্ট হয় না। সে নিজেকে অন্য মানুষের চেয়েও স্বতন্ত্র করে দেখে বলে তাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা করে। এর থেকেই প্রতিযোগিতার জন্ম হয়, এবং এই কারণেই জগৎ ক্রমান্বয়ে অধিকতর উন্নত অবস্থায় অভিব্যক্ত হচ্ছে। মনের ভিতরে যে আত্মোপলব্ধি জন্মে, তারই বহিঃ প্রকাশ হয় আত্ম-প্রতিষ্ঠায়। বাস্তবিক পক্ষে, আত্ম-প্রতিষ্ঠার অনুশীলনকেই অপর কথায় পুরুষকার বলে।

পূর্বে বলা হয়েছে, মানুষ কেবল তার সৃষ্টি-কর্তার নিকট মাথা নত করে। এতে কিন্তু তাহার অহঙ্কার বা পুরুষকারে আঘাত লাগে না। কারণ সে সৃষ্টিকর্তাকে আপন সম্ভাবনার পূর্ণ পরিণতিরূপে অর্থাৎ আদর্শরূপে কল্পনা করে। এরূপ একটা অনধিগম্য সুদূর-প্রসারী আদর্শ তার মনে নিত্য-নতুন আশা-উদ্দীপনা ও স্বপ্নের সৃষ্টি করে। এই স্বপ্নকে আশ্রয় করেই ত মানুষের সমুদয় বৃহৎ চিন্তা গড়ে ওঠে। মানুষ আপন আদর্শকে নিজের চেয়ে বড় মনে ক'রে তৃপ্তি অনুভব করে; কারণ, জ্ঞাত-সারেই হোক বা অজ্ঞাত-সারেই হোক, সে ওকেই নিজের প্রকৃত স্বরূপ মনে ক'রে উক্ত আদর্শে পৌছোবার সমুদয় বাধা-বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে।

অহঙ্কার মানুষের মৌলিক বা সহজাত বৃত্তি। এজন্য তার চিন্তা, ভাবনা, কর্ম সমুদয়ের মধ্যেই এর আভাস দেখতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট আর্টের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তা শিল্পীর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ। আপন ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে অনুভব করবার মধ্যে যে আনন্দ আছে, তাই প্রকাশ করা আর্টের লক্ষ্য। আদিম শিল্পী মহান আল্লাহ্ যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তারও মূলে আত্মপ্রকাশ বা আত্মপ্রসারের আনন্দ আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রকৃতপক্ষে, যাবতীয় ইচ্ছার মূলেই রয়েছে অহং-বৃত্তি; আর এই হচ্ছে জগৎ-কারণ, এবং জাগতিক ব্যাপারাদির নিয়ামক।

নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা থাকাতেই মানুষের মনে আত্ম-মর্যাদা বা আত্ম সম্মানের ভাব আসে। এই সম্মান-বোধই মানুষকে হীন কর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, আবার এ-ই তাকে সামঞ্জস্যের সহিত উন্নত জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে, পরের সম্মানের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। এর থেকেই মানুষের অধিকার, কর্তব্য, বিচার-বুদ্ধি, ক্ষমা, প্রেম, প্রভৃতি নানা-প্রকার ভাবের উদয় হয়। সত্যই আত্ম-সম্মান-জ্ঞান সভ্যতার ও মনুষ্যত্বের সর্বপ্রধান উপাদান। এর ফলেই আমরা ভিক্ষার দৈন্য স্বীকার করতে লজ্জিত হই, অনুগ্রহের দান গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হই, আপন অধিকার ও প্রত্যাশার অনুরূপ ব্যবহার না পেলে অভিমানে ক্ষুব্ধ হই এবং স্ব-চেষ্টায় উপার্জন করে আত্ম-নির্ভর হতে আনন্দ পাই। এই মানুষের সমস্ত মহত্ত্ব, সুকুমার বৃত্তির মূল-উৎস। যার মনে অহঙ্কার নাই, সম্মান-নাশের ভয় নাই, অন্যের শ্রদ্ধাভাজন হবার আকাঙ্ক্ষা নাই, তার জীবনের সত্যকার কোনো লক্ষ্য নাই, মহৎ হবার কোনো সুমধুর আকর্ষণ নাই, —ক্রমোন্নতির সমুদয় দ্বারই তার পক্ষে রুদ্ধ। এস্থলে কেউ মনে করতে পারেন, অনেক নির্বিকার সাধু-সন্ন্যাসী বা ফকির-দরবেশের মনে অহঙ্কারের লেশ মাত্রও নাই, এবং তাঁরা লৌকিক সম্মানেরও প্রত্যাশী নন; তবে কি তাঁরা আত্মোন্নতি

সাধন করতে অক্ষম? এ কথার উত্তরে বলব, মানুষের আপন অহঙ্কার বিসর্জন দিবার সাধনার চেয়ে বড় অহঙ্কার আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ যখন আপন ক্ষুদ্র অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে চায়, তখনই বুঝতে হবে, মনুষ্যত্বের প্রকৃত গৌরব যেখানে, সেই বৃহৎ অহঙ্কার বা আত্মাভিজাত্যের দিকে তার দৃষ্টি পড়েছে। সেইখানে সে নিজের আত্মাকে ব্রহ্মের স্বরূপ পদার্থের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখে তারই প্রীতির জন্য শ্রেষ্ঠতার কঠোরতম সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

আমরা অনেক সময় অহঙ্কারকে দাম্ভিকতার প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র অহঙ্কার— আমাদের ভিতরকার পশুর অহঙ্কার। সেখানে আমরা দৈহিক ও তামসিক বৃত্তিগুলোকেই একান্ত বড় ক'রে দেখি। এরূপ দাম্ভিকতায় আমাদের মনে একটি পর্যাপ্তি বোধ-জনিত অবসাদ ও নিশ্চেষ্ট ভাবের উদয় হয়। তখন আমরা পাণ্ডিত্যের অভিমানে স্ফীত হই, রূপের গর্বে উল্লসিত হই, বংশের-গৌরবে উদ্ধত হই, ক্ষমতার মোহে অত্যাচারী হই, সাধুতার আস্ফালনে অসহিষ্ণু হই, এবং আরও কত কি করি, তার ইয়ত্তা নাই। তখন আমরা আপন মতকে অভ্রান্ত এবং আপন অবস্থাকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে অন্যকে ঘৃণা বিদ্রূপ ও নির্যাতন করতে আরম্ভ করি। তখন আমরা মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার কথা ভুলে যাই, বর্তমানকে (এবং কখনও বা অতীতকে) পরম ও চরম বলে বিশ্বাস করি, এবং যাবতীয় শ্রেয়-সাধন ও উন্নতি-প্রচেষ্টার পায়ে শৃঙ্খল পরায়ে দিয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করি। এরূপ অন্ধ আত্মতুষ্টির অহঙ্কার অত্যন্ত ভয়াবহ। জগতের সমস্ত অশান্তি ও বিরোধের মূলে এই স্থিতিশীলতার অজ্ঞান অহঙ্কার স্পষ্টভাবে বিরাজমান। এই প্রলয়ঙ্কর নিম্নগামী অহঙ্কারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রকৃত মানুষ্যত্বের অহঙ্কারে গরীয়ান হওয়ার সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এর মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ ও উন্নতির বীজ, সমস্ত ধর্মের সারমর্ম নিহিত রয়েছে।

# আবু রুশ্‌দ

সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক আবুল ওয়ালীদ বিন রুশ্‌দ ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম-শাসিত স্পেনদেশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা সমসাময়িক যুগের ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ উলামারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নাই। কাজেই শরীয়তের অনেক তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে আলেম-সম্প্রদায় তাঁর প্রতি অতিশয় বিরূপ হ'য়ে পড়েছিলেন, এমনকি তাঁর প্রতি কুফরী ফতোয়া পর্যন্ত প্রদত্ত হ'য়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি অব্যাহত শান্তি ভোগ করতে পারেন নি। আবু রুশদের পিতামহ ছিলেন সুবিখ্যাত কর্ডোভা নগরের কাজী, আর পিতা ছিলেন মরক্কোর প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ও মরেটেনিয়া প্রদেশের কাজী। আবু রুশ্‌দ বাল্যকালে কর্ডোভাতেই আবু জাফর হারুন নামক এক ওস্তাদের কাছে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শরা-শরীয়ত পাঠ করেন। ১১৬৯ সালে তিনি সেভিল শহরের কাজীর পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তৎকালীন শাসনকর্তা আবু ইউসুফ তাঁকে মরক্কোতে অবস্থিত মারাকুশের রাজপ্রাসাদে আহ্বান করে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ রাজবৈদ্য আবু তুফায়েলের স্থলে নিযুক্ত করেন। এর কিছুদিন পরে কর্ডোভার কাজী নিযুক্ত হ'য়ে আবার স্পেনে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে আবু তুফায়েল আবু রুশদকে বলেছিলেন, খলীফা আবু ইউসুফ মূল গ্রীক ভাষায় আরস্তুর দর্শন বিজ্ঞান বুঝতে অসুবিধা বোধ করেন; এই হেতু আরবী ভাষায় আরস্তুর একটি ভাষ্য লিখলে ভাল হয়। আবু রুশদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণভাবে এই কাজ সম্পন্ন করেন। আবু ইউসুফের মৃত্যুর পর ইয়াকুব-আল-মনসুর খলীফা হন। প্রথম প্রথম ইনিও আবু রুশ্‌দের প্রতি সদয় ছিলেন, কিন্তু পরে শাস্ত্রীয় আলেমদের বিরোধিতার ফলে ইঁহারও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ফলে, আবু রুশ্‌দ কর্ডোভার নিকটবর্তী লিউসেনা নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে নির্বাসিত হন, তাঁর সমুদয় দার্শনিক পুস্তক অগ্নিসাৎ করা হয়,—কেবল চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত পুস্তকগুলো রক্ষা পায়। কিন্তু তিনি এখানে সামাজিক উৎপীড়নে বিব্রত হ'য়ে আবার মরক্কোর অন্তর্গত ফেজ নগরে চলে যান। কিন্তু এখানেও ধর্মমতে বৈষম্যের অজুহাতে তাঁকে নির্যাতিত ও প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত হ'তে হয়। এরপর তিনি আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে অবশ্য খলীফা আল-মনসুর তাঁকে পুনরায় মারাকুশের রাজসভায় পূর্বপদে স-সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ইন্তেকাল করেন।

আজ প্রায় ৮০০ বছর পরে ইব্‌নে রুশ্‌দের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার চেয়েও আমাদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে,—আমরা তাঁর কাছ থেকে কি অবদান পেয়েছি। কিন্তু আগেই বলা হ'য়েছে তাঁর রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই জ্বালিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। তবু যে কয়খানা এখনও অবশিষ্ট আছে, তা দ্বারা এবং লাতিন অনুবাদের মারফতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দার্শনিক প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কতকটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

তাঁর 'তাহাফুত-উল-তাহাফুত' গ্রন্থে ইমাম গজ্জালীর 'তাহাফুত-অল-ফলাসিফা'-র প্রতিটি বিষয়ের মোক্ষম জওয়াব দেওয়া হয়েছে। গজ্জালী বিশেষ করে আবু রুশ্‌দের পূর্ববর্তী দার্শনিক আলকিন্দী ও আবু সিনাকে আক্রমণ করে তাঁদের চিন্তা ও যুক্তিধারার অসারতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মত এই যে, আবু রুশ্‌দ গাজ্জালীর প্রত্যেকটি প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক জওয়াব দিয়েছেন, এবং শুধু মুসলিম দার্শনিক নয়, পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিকগণও এযাবত ঐ সকল বিষয়ে (অর্থাৎ আল্লার স্বরূপ, বিশ্বের সনাতনতা, আত্মা ও বোধ-শক্তির সম্বন্ধ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে) আবু রুশ্‌দের চেয়ে অধিক দূর অগ্রসর হ'তে পারেন নি। এর থেকেই বুঝা যায় ইবনে রুশ্‌দ কি উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ধর্ম ও দর্শনের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর দুইখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। আরস্তুর বাক্যালঙ্কার ও বাগ্মিতা সম্বন্ধে এবং ঐশিতত্ত্ব সংক্রান্ত ভাষ্যও বর্তমান রয়েছে। হিব্রুলিপিতে তাঁর রচিত 'যুক্তিশাস্ত্র' (Logica) কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের স্কুল-কলেজে পঠিত হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের উপযোগী ক'রে তিন খণ্ডে উক্ত 'লজিকা' লিখিত হ'য়েছিল। এ-ছাড়া তিনি 'প্লেটো'-র Republic বা সাধারণতন্ত্রের একখানা টীকা এবং 'আলফারাবী'র মুন্তিক বা যুক্তিশাস্ত্রেরও ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

এইবার তাঁর মতাদর্শ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলেই শেষ করব :

বিশ্বজগতের সনাতনত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত এই যে, বিশ্বপতির সদাজাগ্রত ইচ্ছা বলেই মুহূর্তে এর উৎপত্তি ও গতি সাধিত হচ্ছে। গতি বলেই সৌরজগৎ ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির অস্তিত্ব রক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বও সনাতন বটে; কিন্তু তার কারণ এই যে, সনাতন আল্লার সত্তার সহিত তাঁর ইচ্ছাশক্তি, আর এই ইচ্ছাশক্তির সহিত বিশ্বজগত সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আল্লার সত্তা ও তাঁর ইচ্ছাশক্তির কোনও পূর্ব-কারণ নাই ইহা স্বতঃপ্রকাশ ও সনাতন। কাজেই বিশ্বের সনাতনত্ববাদ আল্লার একত্বের বিরুদ্ধে যায় না। ইবনে রুশ্‌দের মতে, আল্লাহ্ তাঁর আপন সত্তা বলেই সর্বজ্ঞ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের জ্ঞান যেমন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কালে কালে সঞ্চিত হয়, আল্লার জ্ঞান তেমন নয়, তাঁর জ্ঞান সমগ্রজ্ঞান, কালের সহিত সম্পর্ক-রহিত। এর থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ সর্বদাই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে সমস্ত অবগত আছেন। অতএব, মানুষ জ্ঞাতা হলেও আল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতা নয়। সমসাময়িক আলেমগণ অভিযোগ করেছেন, ইবনে রুশ্‌দ ব্যক্তির আত্মার অবিশ্বাসী। কিন্তু একথা মোটেই ঠিক নয়। ইবনে রুশ্‌দ (এবং অন্যান্য দার্শনিকরাও) আত্মা ও বোধশক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বোধশক্তি সম্পূর্ণ অজড় ও বস্তু-নিরপেক্ষ। এর অস্তিত্ব কেবল তখনই প্রকাশ পায় যখন বিশ্বজননী সক্রিয় বোধশক্তির সহিত এর সংশ্রব ঘটে; সেই ব্যক্তি এর কতকটা অনুধাবন করতে পেরেছে। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের বোধশক্তিকে বলা যায় নিষ্ক্রিয় বোধশক্তি, যা নিজস্ব প্রকৃতিতে শাশ্বত নয়; অর্জিত বোধশক্তি মাত্র। তার ঐ নিষ্ক্রিয় বোধও সর্বব্যাপী সক্রিয় বোধশক্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে শাশ্বতধর্মী হ'য়ে ওঠে। সর্বব্যাপী ও সক্রিয় বোধশক্তির মধ্যেই সমুদয় চিন্তাকল্পনা ও ভাব অবস্থিতি করে। কিন্তু আত্মার কথা ভিন্ন। দার্শনিক পরিভাষায় আত্মা হচ্ছে এমন এক সঞ্চালক ক্ষমতা যার দ্বারা জৈবদেহে জীবন-সঞ্চার হয় ও উহার অবয়ব বৃদ্ধি পায় বা পরিবর্তিত হয়। ইহা এমন এক শক্তি যা বস্তুনিরপেক্ষ ত নয়ই, বরং নিবিড়ভাবে বস্তুসাপেক্ষ। হ'তে পারে এ এক প্রকার বস্তুবিভাজিত সূক্ষ্ম জড় কণার সমষ্টি দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহ, জড়দেহের মৃত্যু হ'লেও যার পৃথক সত্তা বজায় থাকতে পারে। তবে, এ একটা

সম্ভাবনা মাত্র। ইবনে রুশ্‌দের মতে কেবল দার্শনিক যুক্তির সাহায্যে এই সংজ্ঞা বর্ণিত আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রমাণ করা যায় না। তবে, ঐশী প্রেরণা দ্বারা এর সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

ইবনে রুশদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উত্থাপিত হ'য়েছে যে, তিনি মৃতদেহের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন না। এ ক্ষেত্রেও তিনি পুনরুত্থানকে অসত্য মনে করেন নি, বরং তা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, পরজীবনে আমাদের যে দেহ হবে, সে-দেহ নরজগতের দেহের সহিত কতকটা সাদৃশ্য যুক্ত হলেও, তা আরও উন্নত পর্যায়ের সূক্ষ্ম দেহ; সেখানকার জীবনও পার্থিব জীবনের চেয়ে উন্নত ও পূর্ণতর হবে। তবে পরজন্ম সম্বন্ধে যেসব পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠেছে, সেগুলো তিনি সমর্থন করেন না।

অন্য যে-কোনও দার্শনিকের চেয়ে ইবনে রুশদকে অবশ্য অধিক সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে। তার কারণ, তিনি দার্শনিক গবেষণা ও ধর্ম সম্বন্ধে সর্বাধিক স্পষ্টোক্তি করতে সাহস করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দার্শনিক মতামত ধর্মের সঙ্গে মিলতেই হবে। তবে ধর্মীয় সত্যের রূপভেদ আছে। একই সত্য দার্শনিক উপস্থিত করেন পণ্ডিতদের বা জ্ঞানীদের সামনে, আর পয়গম্বরেরা তুলে ধরেন সাধারণ লোকের সামনে। কাজে কাজেই আপাত-দৃষ্টিতে এ-দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে বলে বোধ হয়। কোনও ধর্মীয় বাণী যদি বিজ্ঞান বা দর্শনের বিরোধী বলে মনে হয়, তবে সাধারণ লোকে হয়ত এর আক্ষরিক অর্থটা নিয়েই তৃপ্ত থাকে; কিন্তু দার্শনিকেরা এর এমন গূঢ়অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, যা অবশ্যই বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে সুসঙ্গত হয়। তিনি ধর্মশিক্ষা দানের ব্যাপারেও এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন স্তরের লোকের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী—নইলে ভুল বুঝা-বুঝির ফলে অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে।

মহামনীষী ইবনে রুশদ সূক্ষ্ম বিষয়-বুদ্ধির সাহায্যে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বহু আপাত-বিরোধের এমন চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিভার ধারণার বাইরে। এই কারণেই সাধারণ ধর্মনেতারা তাঁর কথার মর্ম গ্রহণ করতে না পেরে, তাঁকে কাফের বলতেও দ্বিধা করেন নি। এ-সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগৎ ইবনে রুশদের ধর্মীয় মতামত সম্বন্ধে অবগত হ'লেন, তখন তারাও ঠিক যে-সব কারণে স্পেনীয় গোঁড়া মুসলমান সমাজ আবু রুশদের উপর খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, সেই কারণেই আবু রুশদকে ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন; আর এঁরা ছিলেন প্যারী, অক্সফোর্ড ও ক্যান্টারবেরীর বিশপ! অবশ্য, সে-সময় এঁরাও যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলমান শরীয়তবিদদের চেয়ে অধিক উন্নত বুদ্ধি সম্মত ছিলেন, তেমন মনে হয় না।

যা' হোক, এই কালবরেণ্য মহামনীষী ইবনে রুশ্‌দকে আজ আমরা জ্ঞানী-সমাজের একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

# সমাজ-বৈজ্ঞানিক ইবনে খালদুন

মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথাটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইতিহাস-বিজ্ঞানের শুরুই হয়েছে ইবনে খালদুন থেকে। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাগুলি তিনি প্রথমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেন। এই অনুশীলনে হাত দিতে গিয়ে তিনি সামাজিক রীতিনীতি ও শক্তিগুলির দিকে অপরিহার্যভাবে নজর দিয়েছেন। এইভাবে তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাস-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রবর্তন করলেন। তাঁর মতে ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব-সমাজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম হলো আবু জায়েদওয়ালী আদ-দীন আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ ইবনে খালদুন। তাঁর পিতা ছিলেন সেভিল থেকে আগত এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। বিখ্যাত কুলাচার্য ইবনে হাজমের প্রদত্ত বংশ-তালিকা থেকে জানা যায় যে ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষগণ এককালে আরব দেশের অন্তর্গত হাজরা মাউতে বসবাস করতেন। এই বংশের খালদুন নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম আরবদেশ থেকে স্পেনে আগমন করেন। বিশ বছর বয়সে ইবনে খালদুন ন্যায়শাস্ত্র, গণিত ও আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক, বিচারক, রাজদূত, কায়রো শহরের শেখ—বিভিন্ন সময়ে তিনি এইসব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইবনে খালদুনের জীবন ছিল বিশেষ বৈচিত্র্যময়। তিনি জীবনে অসংখ্য বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েও হতাশ হননি। তৈমুরের হস্তে তাঁর বন্দী হওয়া ও মুক্তিলাভ করা, সিরিয়ার পথে দস্যুদলের আক্রমণ, সমুদ্রগর্ভে প্রিয় পরিবারবর্গের সলিল-সমাধি, রাজ-দরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র তাঁর জীবনকে দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে মহীয়ান করে তুলেছে। নবাব-বাদশা আর আমীর-ওমরাহর সাথে উঠে-বসে কাটলো তাঁর জীবন। এইসব কারণে ইতালীর নামজাদা উজীর ও লেখক ম্যাকিয়াভেলীর সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়ে থাকে। ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইবনে খালদুন এন্তেকাল করেন।

ইবনে খালদুন ছোট বড় অনেকগুলো বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে কিতাব-উল ইবার বা মুসলিম-সভ্যতার ইতিহাস (Universal History), আত-তায়ারিফ ও মুকাদ্দামা বা প্রস্তাবনা Prolegomenon বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুকাদ্দামাতে তিনি ভূগোল, ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষা এবং ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই মুকাদ্দামাই তাঁর মৌলিক-গ্রন্থ এবং সমাজ ও ইতিহাসকে বুঝে নেবার, বিশ্লেষণ করবার ও সমালোচনা করবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর মূলসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মতে সমাজ-বিজ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র বিজ্ঞান যা নির্বিবাদে ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাবলীর সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারে। মানব-সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর ভবিষ্যৎ-গতি-প্রকৃতি নিরূপণ করতে পারে এবং সমাজে যেসব ঘটনা সাময়িকভাবে ঘটে আর যা আদৌ ঘটে না তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারে। Spengler-এর

The Decline of the west যেন মুকাদ্দামার ধাচেই লেখা। সমাজ-বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা ইবনে খালদুন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিয়েছেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন অধ্যাপক Giddings-এর সংজ্ঞার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

ইবনে খালদুন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে সমাজ-বিজ্ঞানের উপকরণগুলি রাজতন্ত্র জীবিকা, বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য এইসব বিভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর গোটা সমাজ-বিজ্ঞানকেই তিনি ছয়টি ব্যাপক অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

১. সাধারণ মানব-সমাজ তার রূপ ও বিশ্ব ইতিহাসে তার ভূমিকা।

২. যাযাবর সমাজ, উপজাতি ও অসভ্যজাতি।

৩. রাষ্ট্র, খিলাফত, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ।

এ অংশে তিনি পরিবার, উপজাতি, ও রাজ-বংশের মৌলিক শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। রাজ-বংশের মৌলিক শক্তিকেই তিনি বলেন 'আসাবিয়াত' অর্থাৎ এমন একটি মানসিকতা যা ব্যক্তিকে দলগত সত্তার বেদীমূলে আত্ম-নিবেদন করতে প্রেরণা যোগায়।

৪. সভ্য সমাজ, গ্রাম ও শহর।

৫. ব্যবসায়-বাণিজ্য, জীবনযাত্রা-প্রণালী ও জীবিকার উপায়, এবং

৬. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জন-পদ্ধতি।

জাতীয় সংগঠনে বিশেষভাবে প্রভাবশীল হয় দু'টি সামাজিক শক্তি—স্বাদেশিকতা ও ধর্মীয় বন্ধন। আরব জাতির ইতিহাস থেকে নজীর দিয়ে তিনি এইসব সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখিয়েছেন। তিনি আবার বলেছেন যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা দলেই বিভিন্ন অবস্থা নির্ভর করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর। এক-একটা জাতির বিশেষ গুণাবলী ও প্রতিভা সম্বন্ধে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

কোন উপায়ে এক-একটি জাতি প্রগতির পথে পা'বাড়ায় আবার পিছিয়ে পড়ে। সমাজের প্রাণই হচ্ছে এই এগিয়ে যাওয়া আর পিছিয়ে পড়া। মানব-প্রগতির ইতিহাস জাতি-কেন্দ্রিক না হলেও অবিচ্ছিন্নতার (Continuity) মৌলিক নিয়ম এখানে কাজ করে চলেছে।

ইউরোপীয় মনীষীরা ইবনে খালদুনকে সমাজ-বিজ্ঞানের জনকরূপে স্বীকার করেছেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত জার্মান সমালোচক ফন ওয়েমেগুক, আমেরিকার Nathanial Schimidt, ফরাসী পণ্ডিত মনিয়ার, ইতালিয়ান Terrerior, ডাচ পণ্ডিত ডিবুয়ার ও অস্ট্রিয়ার মনীষী হ্যামার পার্গাসটালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যারন ফন ক্রেমার তাঁকে Kultur historikar বা মানব-সভ্যতার ঐতিহাসিক বলেছেন। Robert Flint-এর মতে (History of the Philosophy of History) Aristotle থেকে Vico পর্যন্ত কেউ তাঁর সমকক্ষতা লাভ করতে পারেননি সমাজ-বৈজ্ঞানিক হিসাবে। Arnold Toynbee বলেন যে ইবনে খালদুনের সমাজ-বিজ্ঞানকে "যে কোন দেশের ও কালের সমাজ-দার্শনিকের দর্শনের চাইতে শ্রেষ্ঠ" নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে কিছু ঠিক বুঝতে পারেনি। পারার কথাও নয়। কারণ তাঁর যুগের অনেকখানি অগ্রবর্তী ছিলেন তিনি। আধুনিক ঐতিহাসিকদের ছিলেন আধ্যাত্মিক জনক।

# সঙ্গীত

# বাঙ্গালীর গান

সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই জাতীয় জীবনের মর্মকথা প্রকাশিত হয়। হৃদয়ের গভীর অনুভূতির যে এক অনির্দেশ্য ছায়াময় রূপ আছে, সঙ্গীতের অস্পষ্টতার ভিতর দিয়াই তাহার সুন্দরতম প্রকাশ হয়। সাধারণ ভাষার অর্থ সুনির্দিষ্ট, সুচি-মুখের ন্যায় চোখা চোখা। বিন্দুর পর বিন্দু সম্পাতে রেখাপাত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কখনও তুলির পোঁচের মত সমগ্র হয় না। সঙ্গীতে সুরের খেলা যেন তুলির পোঁচ বুলাইয়া মনের মধ্যে এক অখণ্ড সৌন্দর্য বা রূপের কল্পনা জাগাইয়া তোলে। সঙ্গীতে ব্যবহৃত হাবভাব নৃত্যাদি মনের স্বাভাবিক ভাব সঞ্চারের অপরূপ প্রকাশ। গীতের ভাষা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ভাবকে যেন একটু কায়া দেওয়া হয়। তখন এই স্থূলতার উপযুক্ত সমাবেশে অপূর্ব কায়া-ছায়াময় ভাবের খেলা সম্পূর্ণ হয়, এবং অনেকটা ধরা ছোঁওয়ার ভিতরে আসে।

যে কথা গদ্যেই সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায়, তাহাকে যেমন পদ্যে গাঁথিবার প্রয়োজন নাই, তেমনি যে ভাব পদ্যেই সুপ্রকাশিত হইতে পারে, তাহাকে আর সঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিবার সার্থকতা কি ? পদ্যে এমন কিছু অনির্বচনীয়তা আছে, যাহার প্রকাশ গদ্যে অসম্ভব; আবার সঙ্গীতে এমন একটু আবেগবিহ্বলতা আছে, যাহা পদ্যের ছন্দে বা ভাষায় ধরা দেয় না। এই কথাটি মনে রাখিলে, সঙ্গীতে কথা ও সুর লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। শুধু সুরে সঙ্গীত হয়, কিন্তু সুরবিহীন কথায় সঙ্গীত হয় না। যন্ত্র-সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর আলাপ ও গৎ শ্রোতার মনে যে ভাবোদ্রেক করে, বা যন্ত্রীর মনের যে সব কল্পনা ও ভাবকে প্রকটিত করে, তাহাতেই সঙ্গীতের সার্থকতা। যে হৃদয়ে ভাব উদ্বুদ্ধ হইবে, পূর্ব হইতেই তাহার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষ বা ভাবগ্রাহিতা থাকা চাই। ব্যক্তিগত বিশেষ ভাবকে অতিক্রম করিয়া, তাহার ভিতরকার সার্বজনীনতা উপলব্ধি করাই প্রকৃত সঙ্গীত-রসজ্ঞের কাজ। কাজেই সমঝদারের সংখ্যা অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। এইভাবে দেখিতে গেলে সঙ্গীতকে বারোয়ারী ব্যাপার বলা চলে না—এ কেবল জনকয়েক গুণী লোকেরই উপভোগ্য।

তাহা হইলে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া 'জাতীয় জীবনের মর্মকথা' কিরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে যাহাদের মর্ম-কথা প্রকাশিত হয়, তাঁহারা কয়েকজন অতিশয় বিশেষ লোক—গুণী স্রষ্টা ও দরদী বোদ্ধা। কিন্তু কোনো জাতির বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিল্পীর সৃষ্টিই (হয়তো একটু রূপান্তরিত ভাবে) সাধারণের সম্পদ হইয়া থাকে। সুরস্রষ্টাগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যাপারাদি হইতে রস-সঞ্চয় করিয়া যে-কল্পনা ও ভাবের মূর্তিদান করেন, তাহা সাধারণের অন্তরতম অব্যক্ত ভাবের অভিব্যক্তি, এবং অনেকটা তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শের নিয়ন্ত্রকও বটে।

সুরের ঝঙ্কারে ঠিক কোন ভাবটি প্রকাশ করা স্রষ্টার অভিপ্রেত, তাহার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বোল বা বাণী হইতে। এইরূপ কথা দ্বারা ভাব-ব্যঞ্জনার বহুলতা একটু ক্ষুণ্ন হইতে

পারে, তবুও অনেকের পক্ষেই বোধ-সৌকর্যের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। তাই, ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতার উপযোগী হইতে হইলে, বাণীর পরিমাণও কম বেশী হওয়া চাই। একদিকে উচ্চাধিকারীর জন্য যেমন বাণীবিহীন সুরই যথেষ্ট; অন্যদিকে নিম্নাধিকারীর জন্য তেমন বাণীবহুল পদাবলী না হইলে চলে না। সঙ্গীত একদিকে যেমন সুরের খেলায় বাষ্পায়িত অন্যদিকে তেমনি পদের আবৃত্তিতে ভারাক্রান্ত। অধিকাংশের জন্য মধ্যপথই প্রশস্ত।

সুর হিসাবে দেখিতে গেলে বাঙ্গালীর সেতার, এস্রাজ, বেহালা, বাঁশী, কাঁসী, শানাই, কর্ণেট, তবলা, মৃদঙ্গ, হার্মোনিয়ম, খোল, করতাল, আবার কদাচিৎ বীণ, সরোদ, রবাব, জলতরঙ্গ প্রভৃতি দেশী বিদেশী নূতন পুরাতন নানারকম যন্ত্রে সুর বেসুর সব রকমই বাজে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র একক বাজাইলে অতি মনোহর শুনায়; আবার কতগুলি একক বাজাইলে দুঃসহ বোধ হয়, কিন্তু অন্য যন্ত্রের সহযোগে বাদিত হইলে অনেকটা সুসহ হয়। রাগ-রাগিণীর সুর-বিস্তার, তাল-লয়ের নিখুঁত হিসাব, গমক, মীড়, মূর্চ্ছনা তেহাই প্রভৃতির দ্বারা মনোহরভাবে রাগিণীর মূর্তি প্রকটিত করিয়া তুলিবার কৌশল আমাদের দেশে ওস্তাদদের ভিতর বেশ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ব্যবহৃত 'হারমনি' বা কর্ড না থাকাতে মনে হয় আমাদের সঙ্গীত কিছু অপুষ্ট—নিবিড়তা থাকিলেও ইহাতে ব্যাপকতা নাই; ইহাতে গীতিকাব্যের মাধুর্য আছে, কিন্তু মহাকাব্যের বিশালতা নাই। তারের যন্ত্রে চিকারী ও জুড়ির সাহায্যে সুরকে পুষ্ট করিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহা অতি সামান্য। শুনিয়াছি মৈহার নামক স্থানে ওস্তাদ আলাউদ্দীন পাশ্চাত্য ধরণে কন্সার্ট ও ব্যান্ডের পরিকল্পনা করিয়া শিষ্যদিগকে তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, আধুনিক ইউরোপীয় কোরাস ও অরকেষ্ট্রা গঠন করিতে সময় সময় আড়াই শত হইতে তিন শত লোকের প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, হারমনির ব্যবহার ব্যতিরেকেই গমক, তান, প্রক্ষেপ প্রভৃতির সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীত,—সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সঙ্গীত—যতটা ভাব-প্রকাশ-ক্ষম হইয়াছে তাহাতে সমগ্র জাতির সুর বিচার ও রস-বোধের প্রশংসাই করিতে হইবে।

সুরের পরিকল্পনা, রাগ-রাগিণীর পরিপূর্ণ রূপ বিস্তার, একটি জাতির শ্রেষ্ঠ কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার বিষয়; তাহার লক্ষ্য শুধু আর্টের আনন্দ বা সৌন্দর্য-রস সৃষ্টি! সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সুরকে নানা উদ্দেশ্যের পরিচারক রূপে দেখিতে পাই। সং সাজিয়া গানের সাহায্যে ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া, রেল ষ্টিমারে বা রাস্তায় গানের সাহায্যে ভিক্ষা করা এবং এইরূপ আরও কয়েক স্থলে সঙ্গীতের দুর্গতি দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। যাহা হউক, এইরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর গানের আলোচনা না করিয়া সাধারণভাবে কণ্ঠ-সঙ্গীতের কয়েকটি বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমেই বলিতে হয়, বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ বা ভক্তিপ্রবণ জাতি। এজন্য ভক্তিরসাত্মক ও পরমার্থ বিষয়ক গানের প্রাচুর্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। বাঙ্গালী জাতি আবার বাক্‌চতুর। এজন্য বাংলা গান পদবহুল। হিন্দুস্থানী গান যেখানে চার লাইনেই সু-সমাপ্ত হইয়া যায়, সেখানে গড়পড়তায় বাংলা গানের দৈর্ঘ্য দশ-বারো লাইন হইবে। গানের দৈর্ঘ্য হিসাবে ইহা উর্দু বা পার্শী গজলের সহিত তুলনীয়। তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর কীর্তন, পাঁচালী, পদাবলী এবং পালাগান প্রভৃতি দৈর্ঘ্য-হিসাবে বোধ হয় অতুলনীয়। নিধুবাবুর টপ্পার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত বাংলায় প্রণয়-সঙ্গীতের খুব অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও কীর্তনের প্রচলন হয় নাই, তবে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিদিগের পদাবলী উপযুক্ত সুরতালে গীত হইত তাহাতে সন্দেহ

নাই। এইগুলি রস-সঙ্গীত, প্রণয়-সঙ্গীতও বটে। কিন্তু মনে হয় তখন পর্যন্ত দেবদেবীর লীলা হিসাবেই প্রণয়-সঙ্গীতের চর্চা হইত। লৌকিক ভাব দেব দেবীর উপর আরোপ করিয়া তাহারই আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে প্রণয়-সঙ্গীত গাওয়া হইত। নিধুবাবুই সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রীতিতে প্রত্যক্ষভাবে বহুলতর বাংলা প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করেন, এবং সুকৌশল সুরবিন্যাসে বাঙ্গালীমাত্রকেই মুগ্ধ করেন। নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত হুগলী জেলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ১১৪৮ সাল হইতে ১২৩৫ সাল পর্যন্ত ৮৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার পূর্বে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও সরল বাংলা ভাষায় এমন অনেকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা পরবর্তী কালে টপ্পা সুরে গাওয়া হইত। রায় গুণাকর ১১১৯ হইতে ১১৬৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪৮ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। নিধুবাবু ও ভারতচন্দ্রের গানের কিছু নমুনা দিতেছি :

কালংড়া—জলদ তেতালা।

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার, এই সে কারণ দেখি ॥
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ, জানে হে তোমার আঁখি ॥—নিধুবাবু

সোহিনী—জলদ তেতালা।

কি হ'ল আমার সই বল কি করি।
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাশরি ॥
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি
ঘন-মুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি ॥—নিধুবাবু

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

ওহে পরাণ বঁধূ, যাই, গীত গা'য়ো না!
তিল নাহি সহে তালে, বেতাল বাজা'য়ো না।
তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন, মাতালে নাচায়ো না ॥
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই,
বার বার গা'য়ে গা'য়ে মুরখে শিখায়ো না ॥
অপরূপ মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় ভূমি,
না দেখিলে অন্ধকার, আঁধার দেখায়ো না ॥
ভারতীর পতি হও, ভারতের ভার লও,
না ঠেলিয়া ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥—বিদ্যাসুন্দর

নিধুবাবুর পরবর্তী টপ্পাকারের মধ্যে শ্রীধর কথক অতিশয় বিখ্যাত। ইঁহার জন্মস্থান হুগলী জেলায়। ইনি বঙ্গের দ্বিতীয় শোরী মিঞা :

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই, তোমা বিনে আর জানিনে।

বিধু মুখে মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে।
সখি আমায় ধর ধর,
উরু-নিতম্ব-হৃদি পয়োধর-ভারে,
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি।

বাংলায় ভক্তি-সঙ্গীতের মধ্যে মায়ের নামের সংগীত অর্থাৎ শ্যামাসঙ্গীতই বোধ হয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার পরই হয়তো কৃষ্ণ ও রাধা বিষয়ক সঙ্গীত। শ্যামা সঙ্গীতের অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ আমরা ভক্ত রামপ্রসাদের যুগ স্মরণ করিতে পারি। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত হালিসহর ষ্টেশনের নিকট কোনো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এক সময় ইনি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকেও কতকগুলি গান শুনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবপদাবলী গানের পরে সম্ভবত রামপ্রসাদই সর্ব প্রথমে সাহস করিয়া বাঁধা ওস্তাদী রাগ-রাগিণীর ব্যতিক্রম করিয়া স্বরচিত গানে নিজস্ব সুর দিয়াছিলেন; তাঁহার নাম অনুসারে রামপ্রসাদী সুর বহুকাল যাবৎ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আজ পর্যন্ত বহু শ্যামা-সঙ্গীত ও স্বদেশী-সঙ্গীত রামপ্রসাদী সুরে গীত হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ প্রথম জীবনে কলিকাতায় এক ধনীর গৃহে মুহুরীগিরি করিতেন। তিনি জমাখরচের খাতায় নিম্নলিখিত গানটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :

আমায় দেও মা তবিলদারী; আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী ॥
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ, স্বভাব-দাতা তবু জিম্মা রাখ তারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনে ভারি ॥
আমি বিনা মাইনার চাকর কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি ॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি।
ও-পদের মত পদ পাই তো, সে-পদ লয়ে বিপদ সারি ॥"

রামপ্রসাদের উৎকৃষ্ট রত্নরাজির মধ্যে 'এমন দিন কি হবে মা তারা, যখন তারা তারা তারা বলে...' 'গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে, আমি কাজ হারালেম কাজের বশে...' 'জগৎ-জননী তারা ও মা তারা, জগৎকে তরালে আমাকে ডুবালে...' প্রভৃতি অনেক গান বোধ হয় প্রত্যেকেই শুনিয়াছেন। আমি আর একটি মাত্র গান উদ্ধৃত করিতেছি :

আর ভুলালে ভুলব না গো
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব না গো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলব না গো ॥
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুলবো না গো।
আশা-বায়ু-গ্রস্ত হ'য়ে, মনের কথা খুলব না গো।
মায়া-পাশে বদ্ধ হ'য়ে প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো।

আজু গোঁসাই, রামদুলাল, মুকুন্দ দাস প্রভৃতিও রামপ্রসাদের অনুকরণে অনেক গান লিখিয়াছেন।

ভক্তি মূলক গানের মধ্যে, বাউল, ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি নানা প্রকার গান আছে। এই সমস্ত গানের রচয়িতা শুধু পণ্ডিতসমাজ নহে; সাধারণ কৃষক বা নিরক্ষর ফকিরেরাও অনেক উৎকৃষ্ট গান বাঁধিয়াছেন! কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :

(১) ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন্ ঘরামী ঘর বেঁধেছে, এক পাড়ে দুই থাম দিয়াছে ॥
সে ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে
আর একটি বাতি আছে, নিবায় বাতি কু-বাতাসে ॥
ঘরের মাঝে খুপরী আছে, আর খোপে তার
কেহ না যায় কারো কাছে, যার যার মত সে সে আছে ॥

(২) রংমহলে লুট করে ভাই ছয় জনে। (ও মন, তুমি) সাধ
ভক্তি-কপাট এঁটে দিয়ে; মূলধন রাখ গোপনে;
ঘর-চোরাতে যুক্তি করে বেড়ায় ধনের সন্ধানে ॥
অবকাশে রাখিবে ধন কেহ যেন না জানে।
কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুটবে পেলে পতনে ॥
রবি-সূত বশীভূত ঐ ছ-জনে!
গাঁট কাটা ঐ ছ-টা (তোমায়) ধরিয়ে দেবে শমনে।
সামাল সামাল, সকল বা-মাল, রাখবে অতি যতনে,
শুন মন সকল ধন রাখ হরির চরণে ॥

ব্রহ্ম-সঙ্গীতের প্রবর্তক রাজা রামমোহনের একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি :

মনে কর শেষের সে-দিন ভয়ঙ্কর
অন্যে কথা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া
তব মুখ স্মরি তত হইবে কাতর ॥
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন, নাড়ি ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥

বাংলা ভাষায় ভগবান বা পরলোক-সংক্রান্ত যত গান আছে, তাহার পর্যালোচনা করিলে কতকগুলি ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। সংসার অনিত্য, দিন কয়েক এই স্থান হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ভবনদী পার হইয়া অনিত্য-ধামে প্রস্থান করিতে হইবে। কালীতে বা কৃষ্ণে বা গুরুপদে ভক্তি রাখাই শমন-দমন করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। ছয় রিপু এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়—ইহারাই মানুষকে দাগা দিয়া বিপাকে ফেলে। শোক, মৃত্যু, জরা প্রভৃতিকে ভগবানপ্রদত্ত দানস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সবই ভগবানের মায়া, তিনিই দান করেন, তিনিই গ্রহণ করেন, তিনিই সহ্য করেন। ইহা ব্যতীত গিরীশ ঘোষের 'রাম-রহিম না জুদা কর ভাই, দিলকো সাচ্চা রাখো জী', দুলাল মুন্সীর 'জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি, যে তোমায় যে-

ভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজি', প্রভৃতি গানে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিস্থাপনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান-সংক্রান্ত গানে শুধু ভক্তির পরিচয় নয়, তাহাতে বাঙ্গালীর তার্কিকতা ও তত্ত্ব-নিরূপণ প্রচেষ্টাও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, একটি গানের ভনিতা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেটি এই— 'ক্ষ্যাপা বলে, অনন্ত তুই নিতান্ত বাতুল, ও তোর সকল কথা ভুল, বাঁশবনেতে ফোটে কখন কি পারিজাতের ফুল।' এখানে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য বড় বেশী ব্যাকুলতা দেখা যায়।

বাঙ্গালীর তার্কিকতায় আর এক পরিচয় দেখিতে পাই কবির দলের লড়াইয়ে। এখন যেমন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সখের যাত্রা ও থিয়েটারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, নিধুবাবুদের আমলের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে সেইরূপ কবির দলের খুব আদর ছিল। হরুঠাকুর, রামবসু, রঘুনাথ প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত কবিগীতি রচয়িতা।

এতদ্ব্যতীত লালু, নন্দলাল, গোঁজলাগুঁই, কেষ্টা মুচি, ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, যজ্ঞেশ্বরী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, সাতু রায়, আন্‌টুনী সাহেব, নীলমণি পাটনী, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ভবানী বেনে প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অনেক কবিওয়ালা ও বাঁধনদারের নাম ও সুখ্যাতি শুনা যায়। ইহা হইতেই এইরূপ গানের জনপ্রিয়তা কতকটা অনুভব করা যায়।

ইঁহাদের কল্পনা-শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল। কত উদ্ভট পদপূরণ সমস্যা ইঁহারা অনায়াসে সমাধান করিয়া ফেলিতেন, শুনিলে আশ্চর্য বোধ হয়। হরুঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী ১১৪৫ সালে কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। একদিন শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ সভাস্থ পণ্ডিতদিগকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে দেন, তাহার শেষ চরণে থাকিবে 'বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে,' কোনো পণ্ডিতের সমস্যা-পূরণই মহারাজের মনঃপূত না হওয়াতে তিনি হরুঠাকুরকে তলব করিলেন। হরুঠাকুর তখন গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন। সেই বেশেই মহারাজের সভায় উপস্থিত হইলেন। সমস্যার কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ এইভাবে তাহার মীমাংসা করিলেন :

একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধুলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলী হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে।

শুনিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন, এবং সেই হইতে হরুঠাকুর মহারাজের একজন সভাসদের মধ্যে গণ্য হন। হরুঠাকুর এক সখের কবির দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। নানা স্থান হইতে তাঁহার দলের নিমন্ত্রণ আসিতে থাকায়, শেষে সখের দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে মহারাজের সভাসদ হইবার পর তিনি উক্ত পেশাদারী দলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করেন।

কবির গানে মগড়া, চিতেন, অন্তরা, পরিচিতের প্রভৃতি অঙ্গ আছে। চিতেন অনেকটা কোরাসের মত। গানগুলি প্রায়ই খুব লম্বা—বাছিয়া বাছিয়া খুব ছোট একটি উদাহরণ দিতেছি :

মহড়া:—আমারে সখি ধর ধর। ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার।
পথ-শ্রান্তে নহি কাতর। হৃদে নব-ঘন-দলিতাঞ্জন-বরণ উদয়ে অবশ শরীর।
চিতেন:—অঙ্গ থর থর, কাঁপিছে আমার, আর না চলে চরণ।
সেই শ্যাম প্রেম-ভরে, পুলক অন্তরে, সম্বরা যে ভাব অম্বর ॥

অন্তরা:—হায় সে যে কটাক্ষের অপাঙ্গ ভঙ্গিম, বয়ান ক'রে, কি কব।
লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে, সেই সে বুঝেছে ভাব।
চিতেন:—কুলশীল ভয়, লজ্জা তার যায় না রাখে জীবন-আশ।
তার জলে বা, স্থলে বা অন্তরীক্ষে কিবা, সন্দেহ নাহি মরিবার ॥

কবি-গীতিরই একটি রূপান্তর পাঁচালী। বিখ্যাত দাশরথী রায় বাঙলায় পাঁচালী রচয়িতাদের সম্রাট। ইনি ১২১২ সালে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৬৪ সালে ৫২ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ইনি অক্ষয় পাটনীর কবির দলে প্রবেশ করেন। তাঁহার মাতুল লোকলজ্জা ভয়ে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইয়া তিন টাকা বেতনের মুহুরিগিরি কাজে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া আবার অক্ষয় পাটনীর দলে প্রবেশ করেন। অবশেষে মামার তাড়নায় উক্ত দল ত্যাগ করিয়া নিজেই পালা রচনা করিয়া একটি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন। ইহাই রসরাজ দাশরথী রায়ের অমৃতময়ী পাঁচালী রচনার প্রাথমিক ইতিহাস।

উদাহরণ :

কেন শ্যামাগো তোর পদতলে স্বামী।
তুই সতী হ'য়ে পতি প'রে, করিলি কি বদনামী ॥
কার সনে মা ঝগড়া করো, আপনা ছেলে আপনি মারো।
বুঝি ঝগড়া নৈলে রৈতে নারো, নারদ মুনির মামী॥
মান অপমান নাই ভবানী, মাতুল বেটা বাতুল জানি।
আমি কখন জানিনে আছে তোর এত খেপামি ॥

পাঁচালী গানে এক দাশরথি রায়ের পরেই রসিকচন্দ্র রায়ের আসন নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। ইনি ১১ খানি পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। অনেক কবি, যাত্রা, কীর্তন, তর্জ্জা ও বাউল সম্প্রদায়ের গান তিনি লিখিয়া দিতেন! অশ্লীলতা-দোষে 'জীবন-তারা' নামে তাঁহার একখানি পদ্যময় আখ্যায়িকা পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। ইনি হুগলী জেলার অধিবাসী। কবি, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই প্রভৃতিতে প্রধানতঃ পৌরাণিক ঘটনাদি অবলম্বন করিয়া পদ-রচনা ও প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে অনেক সময় ঈর্ষা-দ্বেষজাত অশ্লীলতা থাকিলেও সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলি বেশ শিক্ষণীয় হয়।

তর্জা গানও এই শ্রেণীর ব্যাপার। বর্ধমান জেলায়ই ইহার অধিক প্রচলন ছিল। আজকাল যাত্রা-থিয়েটারের যুগে এগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেই চলে।

যাত্রা ঠিক কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তা নির্ণয় করা সুকঠিন। পূর্বে রাজা-মহারাজা কিংবা সৌখীন বড় লোকদের বাড়িতে হাফ আখড়াই-এর বৈঠক বসিত। ইহাতে গান ও আবৃত্তি হইত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১২১৭-১২৯০) মহাশয় রামলীলা ও সুবল-সংবাদ বিষয়ক অনেক গান লিখিয়া গিয়াছেন। আর রসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২১৮-১২৬৫) সখের ও পেশাদারী কবির দল ও হাফ আখড়াই-এর দলের গান বাঁধিয়া দিতেন। তাঁহার 'পাষণ্ড পীড়ন' পত্রিকার কবিতার কথা আজ পর্যন্ত সাহিত্যামোদী ব্যক্তিরা স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হ'ল পূর্ণিমাতে অমাবস্যা, তের প্রহর অন্ধকার ॥

এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামা বোষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী ॥
আর ভাদ্দর মাসে, সাতুই পৌষে চড়ক পূজার দিন এবার ॥
ঐ ময়রা মাগী মরে গেল মেরে বুকে শূল,
আর বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বচ্ছে চুল ॥
কাল বৃষ্টি জলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হ'ল ছারখার।
ঐ সূর্য্যি মামা পূর্বদিকে অস্ত চলে যায়,
আর উত্তর দক্ষিণ কোণ থেকে আজ লাগছে বাতাস গায় ॥
সেই রাজার বাড়ীর টাট্টু ঘোড়া, সিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাস্‌তেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে ক'জন;
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।

এগুলি পরবর্তী দ্বিজেন্দ্রলারের হাসির গানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাহা হউক, অনুমান একশত বৎসর পূর্বে কলিকাতার বহুবাজারে রাধামোহন সরকার নামক একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের একটি যাত্রাদল স্থাপন করেন। "এই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রাই নাকি কলিকাতার বা বাংলাদেশের প্রথম সখের যাত্রা। রাধামোহন বাবুর বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। যাত্রার আখড়াই রাত্রিকালে হইত; কিন্তু সারাদিন বৈঠক চলিত। মতিলাল গোষ্ঠী (হৃদয়রাম), বাঁড় য্যে গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী সকলেই এই যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে টেলিমেকস অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাত্রায় সখী সাজিতেন।" একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক বসিয়াছে এমন সময় এক ফিরিওয়ালা 'চাঁপাকলা' বলিয়া পথে চিৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় হুকুম দিলেন, "কে আছিস রে, চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরে আন শুদ্ধ 'গান্ধার' বলেছে।" এই চাঁপাকলাওয়ালা—গোপাল উড়ে। বাবুদের অনুগ্রহে তাহার ১০ টাকা বেতন ধার্য হইল। ক্রমে ওস্তাদের নিকট ঠুংরী ও অন্যান্য গান শিখিয়া রাধামোহনের সখের যাত্রাকে গুলজার করিয়া তুলিলেন। ইনি মালিনী সাজিয়া দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিয়া দিতেন। প্রভুর মৃত্যুর পর ইনি সহজ বাংলা ভাষায় নূতন বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দশ বৎসরকাল বাংলার সকল বিশিষ্ট বারোয়ারিতেই আসর পাইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

যশ ও যোগ্যতায় হুগলী জেলার গোবিন্দ অধিকারী গোপাল উড়ের সমকক্ষ ছিলেন। ইনি কৃষ্ণ যাত্রায় নিজে দূতী সাজিতেন। তাঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা দেখিতে যাইত। 'চুক্তির টাকা' ব্যতীত তিনি আসরে অনেক টাকা উপহার পাইতেন। তাঁহার গানে মোহিত হইয়া অর্থহীন লোকেরা গাত্র-উত্তরীয় পর্যন্ত খুলিয়া পারিতোষিক দিতেন। তিনি ১২০৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৭৭ সালে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ইনি আবার কীর্তনের দোহারও গাইতেন। যাত্রার গানে ইঁহার অনুপ্রাস বেশ মনোহর। একটি নমুনা দিতেছি :

চম্পক বরণী বলি, দিলি যে চমক কলি
এ কুলে এ কল আছে কে জানে।
এতো ফুল নয় ভাই ত্রিশূল অসি, মরমে রহিল পশি
রাই-রূপসীর রূপ অসি হানে প্রাণে ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীরাধা-তুল্যবাসী
অসি সরসী বাসি কাননে।
এখন বিনে সেই রাই রূপসী
জ্ঞান হয় সব বিষরাশি, গরলগ্রাসী নাশি জীবনে।
আমার মিথ্যা নাম রাখালরাজ
রাখাল সঙ্গে বিরাজ,
রাখালের রাজ অঙ্গে কাজ কি জানে।
যদি নাই পাই রাধা, জীবনে যার নাইরে রাধা
আনিতে জীবন-রাধা
যারে সুবল সুবোল-বদনীর স্থানে ॥

ইঁহার আর একটি গান 'শুক-শারী সংবাদ' বড়ই চমৎকার। এই গান শুনিলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কৃষ্ণ বলে আমার রাধে বদন তুলে চাও' গানটি মনে পড়িয়া যায়। গোবিন্দ অধিকারীর গানটির কিয়দংশ এই :

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের রাই আমাদের
আমরা রাইয়ের রাই আমাদের ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ;
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল;
নৈলে পারিবে কেন?
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লিখা;
ঐযে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে;
চূড়া তাইতে হেলে ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম;
নৈলে মিছে সে গান॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু;
নৈলে কে কার গুরু ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে আমার রাধার রূপে জগৎ আলো;
নৈলে আঁধার কালো ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।

শারী বলে সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী;
নৈলে হ'ত কাশীবাসী ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে আমার রাধা জীবন করে দান;
থাকে কি আপন প্রাণ?
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল।
(বলে বৃন্দাবনে চল) ॥

যাত্রার আসর করিলে লোকের স্থান সংকুলান করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশের লোক যতই শিক্ষাভিমানী হউক না কেন এখন পর্যন্ত যাত্রার প্রতি বা তৎসংশ্লিষ্ট ধর্ম-চরিত্রের প্রতি দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট প্রাণের টান রহিয়াছে।

এইবার কীর্তনের বিষয় একটু বলিব। একটি বিষয় আপনারা হয়তো লক্ষ করিয়াছেন যে, হুগলী, কলিকাতা ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানেই অধিকাংশ গায়ক ও বাঁধনদারের আবাসস্থল ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। রাজধানীর সন্নিকট বলিয়া, না অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনা করিবেন। আমরা কীর্তনের প্রবর্তক 'মধুকান' বা মধু কিন্নরের আবির্ভাবে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। ইঁহার আবাস যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমায়। ইনি ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যৌবনে ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক ছোটখাঁ ও বড়খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অতঃপর যশোহর জেলার রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ শিক্ষা করেন। "এই ঢপ সঙ্গীতেই আজ তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে মান, মাথুর, অক্রূর-সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পালা রচনা করেন। সঙ্গীতগুলি ভক্তিপ্রধান। গানের সুরে তিনি কাহারও অনুকরণ করেন নাই—স্বয়ংই আবিষ্কার করিয়াছেন। মধুকানের সুর এখন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে ঢপ গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাঁহার যকৃতে ও বুকে পিঠে ভয়ংকর বেদনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরও দেখা দেয়। এই রোগে তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটি গান এই :

কমলিনি আজ একি, কমলে কামিনি দেখি
চরণ-কমলে নীলকমলে কে দিল কমল-মুখী ॥
একেত শ্যাম কাল-কমল, জলে ভাসে নয়ন-কমল
কর-কমলে চরণ-কমল, কমলা সেবিত কমল-পদ গো
সেই কমল-আঁখি পড়ে তোর চরণ-কমলে
ওমা ওমা করলে একি, গঙ্গা যার চরণ-কমলে,
হ'য়ে ত্রিলোক নিস্তারিল, সে দায় পড়ে তোর পায় ধরিল
তুই কেন তায় হলি সুখী ॥
যার নাভি-কমলে ব্রহ্মা হ'য়ে করেন সৃষ্টি স্থিতি
সে আজ ভাসে মান-তরঙ্গে, দেখিনে তার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সুদন কয় আজ মনে এই লয়
প্রলয় করে চাঁদমুখী ॥

মধুকানের পূর্বেও যে কীর্তন একেবারে ছিল না, এমন নহে। কারণ, "জানা যায় মধুকানের পূর্বে গোবিন্দ অধিকারী 'গোলকচন্দ্র দাস অধিকারী'র নিকট কীর্তন শিখিয়াছিলেন, এই সূত্রে অনেক মহাজন পদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। গোলকচন্দ্রের কীর্তনের দল ছিল, গোবিন্দ অধিকারী উক্ত দলে কীর্তনের দোহারী করিতেন। শেষে নিজেই একটি কীর্তনের দল করিয়া বসেন। কিন্তু সে দলের সুযশ না হওয়াতে সেই কীর্তনের দলকেই অবশেষে তিনি যাত্রার দলে পরিণত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।" যাহা হউক, একথা সত্য যে মহাজন-পদাবলী ভাঙ্গিয়া নিজস্ব সুর দিয়া গান রচনা করিয়া কীর্তনকে মনোজ্ঞ করিয়া লোক সমাজে প্রচার করিবার সম্মান মধুকানেরই প্রাপ্য।

কীর্তন গান অদ্যাবধি বাঙ্গালীর বিশেষত্ব হইয়া রহিয়াছে। অনেকে মিলিয়া খোল করতাল ও মৃদঙ্গ লইয়া যখন কীর্তন গাওয়া হয় তখন এক চমৎকার ভাবের সৃষ্টি হয়; এমন কি অনেকে দশাপ্রাপ্তও হইয়া থাকেন। কীর্তন সাধারণতঃ একতালায়ই গীত হয়, কিন্তু সময় সময় ইহাতে তালফেরতা দেওয়া হয়, এবং অবস্থা বিশেষ ও ভাবাবেগ বশতঃ তালের গতি একটু দ্রুত বা মন্দীভূত করিলেও সেটা তেমন দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় না। রেকর্ড সঙ্গীতে মানদাসুন্দরী, বেদানা দাসী প্রভৃতি কীর্তনীয়া আধুনিককালে বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছেন। যেসব হিন্দুবাড়ীতে রেকর্ডের সংগ্রহ আছে, সেখানে বোধ হয় অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশে রেকর্ডই কীর্তন গান। কিছুকাল পূর্বে, অর্থাৎ রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদী গানের পূর্বে এই অনুপাত আরও অধিক ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আধুনিক যুগে আসিবার পূর্বে বিখ্যাত রসিক রূপচাঁদ পক্ষীর বিষয় একটু বলা আবশ্যক। ইনি ১২২১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস চিল্কা হ্রদের নিকটে হইলেও ইঁহার পিতা ও ইনি কলিকাতাবাসী ছিলেন। সকল প্রকার সঙ্গীত রচনাতেই ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনায় ইনি অতুলনীয়। ইঁহার রচিত প্রায় সমুদয় গানে পক্ষী বা খগরাজ ভনিতা দেখা যায়। রূপচাঁদ বড়ই আমোদ-প্রিয় ও রসিক লোক ছিলেন। পক্ষী উপাধিধারী বলিয়া তাঁহার গাড়ীখানি কতকটা খাঁচার আকারের ছিল। তিনি সেই গাড়ী চড়িয়া কলিকাতার বড় বড় লোকের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইতেন। কোনো আশ্চর্য ঘটনা বা হুজুগ উঠিলেই তিনি তদ্বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতেন। অনেক পল্লীগ্রামে আজ পর্যন্ত অনেক স্বভাবকবি দেখিতে পাওয়া যায়,—যাঁহারা ঝড়, ভূমিকম্প, রেলপুল বা অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় লইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়া থাকেন। বেউলা সুন্দরীর গান, নদের চাঁদের গান, ময়নামতীর গান প্রভৃতি প্রাচীনতর এবং বৃহত্তর উদাহরণ। যাহা হউক, রূপচাঁদ পক্ষীর একটি কমিক গানের কিয়দংশ দেওয়া যাইতেছে :

আ মরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহ-কাল  
আজকাল হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।  
মাতৃদায় পিতৃদায় এর আগে লাগে কোথায়  
ভিটে মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে।  
বল্লালি বাঁধাকুল প্রায় হ'ল নির্মূল,  
বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সুরু যে হ'তে।  
সম্বন্ধ না হ'তে বরের মুরব্বীতে  
লম্বা ফর্দ দেন হাতে নবাবী মতে।

বাইশ পোঁচ কালা কফ্রী, (পাশ করার বিষম জারী,)
পাত্রী খোঁজেন সুশ্রী, কিন্নরী হ'তে।
পাকাবাড়ী, মার্বেল ম্যাজ, দরওয়ানের রূপার ব্যাজ
হীরের আংটি, সোনার ল্যাজ, ঝুলবে পশ্চাতে॥...
দাতব্য পাঠশালে, চিরকাল ছেলে পড়ে
বিয়ের সম্বন্ধ এলে দেন স্কুলেতে ॥...
চার-পাশের কর্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্বভক্ষ্য
যার ছেলে গণ্ডমূর্খ, সে মরে দুঃখেতে ॥
ছেলে হ'লে গুণবন্ত, একরাত্রে হ'তাম ভাগ্যবন্ত
পোড়াকপালী ভ্যাড়াকান্ত ধল্লে গর্ভেতে।
অলংকার চায়না ইদানী, কোম্পানীর কাগজ রেডিমনি
বাড়ীর পাট্টা সোনার গিনী, চায় হাতে হাতে।
মেয়ের বেলা বেলতলা, নিমতলা ছাদ খোলা।
মরা দুগাছা সোনার বালা ছাঁদনা তলাতে ॥
উচ্চশিক্ষার প্রভাবে দেশের উন্নতি হবে
সামাজিক কুক্রিয়া যাবে বিদ্যা-জ্যোতিতে।
হিতে হ'ল বিপরীত, পাস করায় বাড়ায় কুরীত
এ শিক্ষা কার মনোনীত হয় অনিষ্ট যাতে।
বিয়ে কর্তে টাকা যায়, ছি ছি মরে যাই লজ্জায়
আর্যের কলঙ্ক রটায় আর্যাবর্তবাসীতে!
খগপতির এই মিনতি, যার যেরূপ হয় সঙ্গতি
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি হোক ধর্ম মতে।
বিবাহের ঘোর বিপদ, হায়রে কি হাস্যাস্পদ
মানুষ্য কি চতুষ্পদ হ'ল ভারতে ॥

সম্প্রতি একটি রেকর্ড বাহির হইয়াছে, 'নয়তো আমি হেলা-ফেলা যেমন-তেমন মেয়ে, কলেজ থেকে এবার আমি পাস করেছি বি-এ,' এ গানটিরও ব্যঙ্গসুর—উদ্ধৃত গানের ন্যায়।

হাসির গান সম্পর্কে প্যারিমোহন কবিরত্নের একটি গানের কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি—ইনি বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। গানটি এই :

ওরে মন তোমারে আজ বাসে কাল
ভবের পটল তুলতে হবে ॥
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে ॥
কোথা থাকিবে ঘরবাড়ী, পড়ে গড়াগড়ি যাবে
গালপাটা কটা গোঁপে, কে আদরে আতর মাখবে ॥
পোমেটম হেয়ারে দিয়ে, চেয়ারে কে বসে রবে ॥
বিধু-মুখে নিধুর টপ্পা গান করে কে প্রাণ জুড়াবে ॥
বুকের ছাতিয়ে ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ী হাঁকাবে
আল্লাদে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে কে খাসি খাবে ॥
দুটি নয়ন করে রাঙ্গা রগ টেনে কে কথা কবে

যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচভূতে সব লুটে খাবে ॥
খাটে তুলে ঘাটে যখন সুঁদরী কাঠে সাধ মিটাবে
প্যারী বলে যাবার সময় মোসাহেব কে সঙ্গে যাবে ॥

ইঁহাদের উত্তরাধিকারী ডি. এল. রায় ও কান্ত কবির হাসির গান আজও বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী। ইঁহারা সাধারণত বিলাতির অনুকরণ, জাতিভেদ বিবাহ-রহস্য, স্ত্রৈণতা, ফাঁকা বক্তৃতা, ধর্মের নামে ভণ্ডামী, অনাচার প্রভৃতি সমস্যা লইয়াই বিদ্রূপ-কশাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক যুগে কি সুর হিসাবে, কি ভাব হিসাবে, কি রচনাভঙ্গী হিসাবে, বাংলা সঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অবশ্য একজন দ্বারা সে পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। পূর্ব হইতেই তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল। থিয়েটারে সুরকে চমকপ্রদ করিবার জন্য রাগিণীর ভাঙচুর আরম্ভ হইয়াছিল। বড় বড় তানের পরিবর্তে ভাবোপোযগী ঝুরা তানের প্রচলন দেখা গিয়াছিল। নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায় মুটো মুটো,' 'যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে' 'কি ছার আর কেন মায়াকাঞ্চন কায়া তো রবে না' 'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব' 'আমার পাগল বাবা পাগলী আমার মা' 'বলে ফুল দুলে দুলে তুলে দেলো বঁধুর গলে'—প্রভৃতি শতাধিক গান অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

২৪ পরগণার মনোমোহন বসু মহাশয় যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই, কবি, বাউল, সংকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার কতিপয় নাটক বাংলার সম্পদ স্বরূপ। ইঁহার রচনায়ও নূতন ভাবের রাগিণীর সংমিশ্রণ দেখা যায়।

কিন্তু যে প্রতিভাবান পুরুষ বাংলা সঙ্গীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, সঙ্গীতকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া গৃহস্থের বাড়িতে স্থান দান করিয়াছেন, সঙ্গীতের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার সাবলীল গতিভঙ্গী দিয়াছেন; তিনি কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। তিনি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, প্রণয়-সঙ্গীত, স্বভাব-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত, শোক-সঙ্গীত, জাতীয়-সঙ্গীত, ঋতু-সঙ্গীত, ক্রিয়া-সঙ্গীত প্রভৃতি সর্বপ্রকার সঙ্গীতসম্পদে বাঙলা ভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন। আগেকার সঙ্গীতে কথাগুলি অনেক সময়ই অত্যন্ত অনাবৃত রুচিহীনতার পরিচয় দিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কবি-অনুভূতির দ্বারা সঙ্গীতে সুরুচি দান করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত মার্জিত ও আভাস-পূর্ণ হওয়াতে (সুর ছাড়া) শুধু বাণীতেই তাঁহার কত চমৎকারিত্ব! সুরের সহযোগে তো একেবারে সোনায় সোহাগা হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে বাউল ও কীর্তনের রেশ লক্ষ করা যায়। অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন, ছাত্র-ছাত্রী মহলে তাঁহার গান যেরূপ চলিতেছে, সাধারণ অশিক্ষিত দেশবাসীর অন্তঃকরণে সেরূপ সাড়া দিতেছে না। এ অভিযোগ অনেকাংশেই সত্য। তবে ক্রমান্বয়ে দেশবাসী শিক্ষিত হইয়া উঠিলে হয়তো এ গান সাধারণ লোকের চিত্তকেও স্পর্শ করিবে। আমরা আশা করি, এই গানের প্রভাবেই দেশের লোকের রুচি-সৌষ্ঠব ও সাধারণ সৌন্দর্যবোধ একটু উৎকর্ষ লাভ করিবে। কিছুদিন পূর্বে কান্ত কবি রজনী বাবুর গান যতটা চলিত, আজকাল ততটা চলে না। বোধ হয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রসারই ইহার একটি প্রধান কারণ। 'রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর খিচুড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন'—এই তাঁহার বিরুদ্ধে ওস্তাদদিগের একটি প্রধান অভিযোগ। কিন্তু তিনি সুসঙ্গতভাবে নূতন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন ভঙ্গী দিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহাই আমাদের বিচার্য। সার্থক ভঙ্গী দিতে পারিলে খিচুড়িকে অপদার্থ না বলিয়া উপাদেয় সৃষ্টিই বলিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই উপাদেয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাবানুগত সুর-সংযোগ করিতে গিয়া তিনি বিশুদ্ধ রাগিণীতে যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমকপ্রদ ও উপভোগ্য হইয়াছে। তিনি দীর্ঘ দ্রুত-তান, মীড়-আল গমকের সাহায্য ছাড়াই, অন্য উপায়ে স্বরের যে ব্যঞ্জনা দিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনারই উপযুক্ত। তাঁহার গানের যে সমস্ত স্বরলিপি বাহির হইয়াছে তাহাতে রাগ-রাগিণী বা তালের কোনো উল্লেখ নাই। তাই বলিয়া যে কোনো রাগিণী হয় নাই, বা বেতালা হইয়াছে তাহা নহে। স্বরলিপির প্রত্যেকটি গান মাত্রা অনুসারে সুবিভক্ত করা আছে। তবে তিনি যে শান্তিনিকেতনের স্কুলে তবলার রেওয়াজ ত্যাগ করিয়াছেন তাহা বোধহয় অন্য কারণে। বাণীর অনুগত সুরের প্রাধান্যই তাঁহার গানের প্রধান সৌন্দর্য। তালের দিকে অতিরিক্ত মনোনিবেশ করিতে গিয়া সুর যেন ক্ষুণ্ন না হয়, এই বোধহয় তাঁহার উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন, সুর ও ভাব প্রাণের ভিতর বসিয়া গেলে, অঙ্গের যে স্বাভাবিক দোলন ও বাক্যের যে স্বাভাবিক নিঃসরণ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ তাল! যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের গান সকলেরই সুপরিচিত, তাঁহার বিশাল রত্নভাণ্ডার হইতে দুই একটা গান উদ্ধৃত করিবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের প্রণালীতেই অনেক সুন্দর সুন্দর বিরহ-সঙ্গীত ও অন্যান্য গান রচনা করিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি ঠুংরী ভঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বাংলা গানে লক্ষ্ণৌই সুর দিয়া তাহার একটু আভিজাত্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। নিধুবাবুও টপ্পাগানে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, দিলীপ বাবুর প্রধান বিশেষত্ব ঠুংরী গানের কৌশলে নয়, সে বিশেষত্ব ইউরোপীয় ভঙ্গীতে উপযুক্ত স্থলে নিম্নস্বর ও উচ্চ-স্বরের সাহায্যে বৈচিত্র্য সম্পাদনে। দিলীপ বাবু সুকণ্ঠ পুরুষ, তাঁহার গান কাজে কাজেই চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, অন্য লোকে তাঁহার অনুকরণে চড়াসুর চাপাইয়া বা আনুনাসিক করিয়া গাইলে ততটা সুশ্রাব্য হয় না। যাহা হউক এরূপ কৌশল, বাংলা গানে নতুন আমদানী, কিছুকাল না গেলে ইহার প্রকৃত মূল্য বুঝা দুষ্কর। অতুলপ্রসাদের অনেকগুলি গান গজল সুরেও গাওয়া হইয়া থাকে। মোটের উপর ইঁহার মর্মস্পর্শী গান বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

বাংলা গানে গজল সুরের প্রবর্তক কবি নজরুল ইসলাম। ইনি কবিতায় ও রচনায় সহজবোধ্য উর্দু শব্দ যোজনা করিয়া ভাষায় তেজ ও শ্রী উভয়ই বর্ধিত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ইংরাজীর মত পদাংশে ঝোঁক ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সঙ্গীতে উর্দু সুরের লালিত্য ও তেজোময় আনন্দ আনিবার জন্য হু-বহু উর্দু গজলের সুর বাংলায় খাপ খাওয়াইয়াছেন! তাঁহার অনেকগুলি গানের অংশবিশেষে গজলের অনুকরণে শে এর বা স-সুর আবৃত্তি ব্যবহৃত হয়। এই উপায়ে দীর্ঘ গজল গানের একঘেয়ে সুরকে অবসাদ হইতে রক্ষা করা হয়। তাহা ছাড়া ঠুংরীর খোঁচ থাকাতে, অর্থাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য রাগিণীর খোঁচ দিয়া মিষ্ট করা হয় বলিয়া, নজরুল-গীতি বড়ই মনোজ্ঞ হয়। নজরুলের স্বদেশী গান, সাম্যবাদী গান, কারাগারের গান, জাতি-বিচারের গান প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া গজল গানও লোকের মুখে মুখে বঙ্গদেশের সীমানা ছাড়াইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই গানের আর একটি বিশেষত্ব ইহা হৃদয়ের গভীর ও প্রবল ভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এজন্য এগুলি সহজেই সর্বসাধারণের মর্মস্থান স্পর্শ করে। দুই একটি গানে একটু অশ্লীলতার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মোটের উপর এগুলি সজীব ও প্রবল বলিয়াই সহজে হৃদয় অধিকার করে।

উপরে যে সমস্ত গানের বিষয় বলা হইল, তাহা ছাড়াও বাঙ্গালীর বিবাহবাসরের গান, হোলি গান, জারিগান, শারিগান, গম্ভীরা উৎসবের গান, চৈত্রপূজার গান, ঝুমুর গান, মাদারপীরের গান, গাজীর গান, মনসার ভাসান, মা'রেফতি গান প্রভৃতি কত যে আছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

মোটের উপর গানের ভিতর দিয়া বাঙালী হৃদয়ের কোমলতা, সহজ ধর্মনিষ্ঠা, বাক্‌পটুতা এবং নানাবিধ সামাজিক রীতি-নীতির যে সমস্ত পরিচয় পাওয়া যায়, কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তদ্বিষয়ে গবেষণা করিলে অনেক তথ্য নিরূপণ করিতে পারেন। অধুনা নজরুল ইসলামের ইসলামী সঙ্গীতও সুকণ্ঠ গায়ক আব্বাস উদ্দীনের গীত রেকর্ডের কল্যাণে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়া মুসলিম সমাজেও আধুনিক ধরনের উৎকৃষ্ট বাংলা হাম্‌দ্‌, না'ত ও সমা'ধর্মী গজলের আদর হইয়াছে। পূর্ববর্তী মা'রেফতী, মুর্শিদা ও ভাটিয়ালী গানের সহিত যুক্ত হইয়া ইহাতে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গলা সঙ্গীতের অভাব কতকটা পূর্ণ হইয়াছে।

## রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে হ'লে সমসাময়িক সঙ্গীতের গতি-প্রকৃতির পটভূমিতে ফেলেই দেখতে হয়। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত এবং তার বিশিষ্ট সুর উনবিংশ শতাব্দীতে খুব প্রচলিত ছিল, এখনও রয়েছে। তবু স্বীকার করতে হয়, বর্তমানে এর জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। এর প্রধান কারণ, ধর্মসঙ্গীতের ধারা এখন পৌরাণিক দেবদেবীমুখী নেই। সৃষ্টিকর্তার ধারণাতেই একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সৃষ্টিকর্তা এখন কল্পলোকবিহারী হৃদয়দেবতা, যার সঙ্গে মানুষের সহজতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। নিধুবাবুর টপ্পাজাতীয় প্রণয়সঙ্গীতও বর্তমানে কতকটা অবহেলিত। নিধুবাবুর একটি গান এই :

নয়নেরে দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে, নাহ'লে মনমিলন।
আঁখি তে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
সেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন।

প্রাচীনকালের অনেক গানের মত এই সুন্দর গানটাতেও যেন একটা সাধারণ তত্ত্বকথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে টপ্পার তানপ্রধান সুরের মনোহারিত্বের জন্য বিশেষ বিশেষ মহলে এর আদর আছে।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী এক সময় শহর-পল্লী মাৎ করে রেখেছিল, এখন আর তার সে কদর নেই। এগুলোর বিষয়বস্তু ছিল রামলীলা, রাধাকৃষ্ণের লীলা ইত্যাদি। এসব গানে দ্ব্যর্থ প্রয়োগের বাহুল্য দেখা যায়; কিন্তু এযুগে ওসব অনেকটা স্থূল ও শ্রুতিকটু বলে গণ্য করা হয়। যেমন :

বৃন্দে গো! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে।
আমার সবরূপ—যে, সব আঁধার
সেই প্রাণ কেশব-বিনে!
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম-শরীর,
মরে কি শরীর কিশোরীর, সে গোবিন্দ জানে ॥

শ্রীধর কথকের গান এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়। সে বোধহয় এর মানবীয় গুণের জন্য। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক :

ভালবাসি ব'লে কিরে আসিতে ভালবাস না।
আপন করম-দোষে না পুরিল কামনা ॥
সতত আমার মন, তব রূপ করে ধ্যান,
অধীনে রেখেছ কেবল ভাবিতে তব ভাবনা ॥

এখানে অতিশয় প্রত্যক্ষ বা স্থূলভাবে প্রিয়তমকে অনুযোগ করা হচ্ছে—ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যায় নি বলে। তবু রেকর্ড-করা সুরে কারুকার্যের জন্য এ গান বেঁচে আছে।

গোবিন্দ অধিকারী, মধুকান ও রূপচাঁদ পক্ষী সম্বন্ধেও মোটামুটি উপরোক্ত মন্তব্য করা যায়। সাতু বাবু ও গিরিশ ঘোষের দু'একটা গান বর্তমান যুগে উৎরাবার মত বলে মনে হয়। যেমন :

নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়েছে।
দরশন সুখে আমায় বিমুখ করেছে।
মন যারে সদা চায়, নয়ন বিবাদী তায়,
সুখ সাধে একি দায়, প্রমাদ ঘটেছে। [ সাতু বাবু ]

আর,

হায় রে হায়, প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে, বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াসা ॥
প্রেমে যায় ভালবাসি, পরাব না, পরব ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনাবেচা, ভালবেসে পুরায় আশা ॥ [গিরিশ চন্দ্র ঘোষ]

কৃষ্ণমোহন মজুমদারের

দাদা, কেবা কার পর কে আপন
কাল-শয্যা পরে মহানিদ্রা ঘোরে, দেখি পরসুরে নিশার স্বপন।
তুমি কার কে তোমার কারে বল রে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখাচ্ছে স্বপন।।

আর, অমৃতলাল গুপ্তের

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন।

আমরাও ছেলেবেলায় শুনেছি। এগুলো তত্ত্বপ্রধান হ'লেও এর ভিতর এমন একটা চিরন্তন সত্যের যাদুস্পর্শ রয়েছে যে, এখনও অনেক ভক্তের প্রাণ উদাস করে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশপ্রেমমূলক গান—'ধনধান্য পুষ্প ভরা', আর হাসির গান 'আমরা বিলাতফেরতা ক'ভাই', এবং আরও অনেক গান এখনও আপন উৎকর্ষবলেই চালু আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে, /আমি যে বেসেছি ভাল, সে বাসা সে ভালবাসে', আর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের '(ও তায়) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই, /পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই', কিংবা 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা' ইত্যাদি গান এখনও একেবারে পুরানো বলে বর্জিত হয় নি।

মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের

একে আমার জীর্ণ তরী প্রেমনদীতে তুফান ভারী
কেমনে যাইব পারে এই ভয়েতে ভেবে মরি।।

এ ধরনের গান এখনও পল্লীগ্রামে শুনতে পাওয়া যায়। রামলাল দাস দত্তের 'তনয়ে তার তারিনি', 'বার বার যে দুঃখ দিয়েছ, দিতেছ তারা', এখনও দিব্যি বেঁচে আছে, বোধহয় সহজ বাণীর গুণে আর গ্রামোফোন রেকর্ডের কল্যাণে। রজনীকান্ত সেনের 'পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়', 'তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমার দেওয়া দুখ,/তোমারি দেওয়া বুকে,

তোমারি অনুভব', 'সেথা আমি কি গাহিব গান, /যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান' ইত্যাদি গান বিশ-ত্রিশ বছর আগেও শুনেছি,—এখন আর শুনতে পাইনে। এসব দেখে মনে হয় গানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কতকটা অন্তর্নিহিত গুণের উপর, আর কতকটা রেকর্ড বা অন্যাবিধ প্রচারণার মারফতে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সঙ্গীতচর্চার বিশেষ চল ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দে লো সখি দে পরায়ে চুলে, সাধের বকুল হার', আর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাওহে তাঁহার নাম, রচিত যার বিশ্বধাম', এখন পর্যন্ত পুরানো হয় নি। বোধহয় মার্জিত ভাষা আর ভাব এবং ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন এগুলোকে আরও অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

এ পর্যন্ত নমুনাসূত্রে যা দেখা গেল, তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে রবীন্দ্রপূর্বকালে গানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা ও লীলা-বর্ণনা, তত্ত্বকথা, সংসারের অনিত্যতা, ভবনদী পার হওয়ার পাথেয়, আর কবি তরজা প্রভৃতি উপলক্ষে বাক্‌যুদ্ধই ছিল প্রধান বিষয়। তবে মাঝে মাঝে টপ্পা, পাঁচালি ও রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে মানবীয় প্রেম আর দেশপ্রেমের গানও প্রচলিত ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি, সামাজিক ঘটনা বা নব্য আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত বিদ্রূপাত্মক গানও বেশ কতকগুলো রচিত হয়। এ পর্যায়ে রূপচাঁদ পক্ষী, প্যারিমোহন কবিরত্ন, মনোমোহন বসু, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে জনসমাজের রুচির পরিবর্তন এবং মূল্যবোধের যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। এই বিবর্তনে বৈদেশিক সুরের মিশ্রণ ব্যাপারে এবং রুচির দিক দিয়ে ডি. এল. রায়ের দান সামান্য নয়। তবুও একথা অসংকোচে বলা যায় যে প্রধানতঃ ঠাকুরবাড়ীর সাঙ্গীতিক পরিবেশ এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অবদানই সামাজিক ও সাহিত্যিক রুচি-উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আগেকার দিনে সঙ্গীতের সঙ্গে বাইজি, বাগানবাড়ী, বারবণিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর বাইরে যে সঙ্গীত তা হয়তো, কবি, তরজা, ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ যাকে পারিবারিক সঙ্গীত বলি, অর্থাৎ মাতাপিতা পুত্রকন্যা সবাই মিলে এক সঙ্গে পারিবারিক জলসায় যে সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্রবাদন উপভোগ করে থাকি, তা বলতে গেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। নানা উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ঋতুপ্রকৃতির জন্য অজস্র সঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত উপভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন। অবশ্য ঋতুসঙ্গীতের প্রতিকল্প 'বারমাস্যা' আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সে গান গৃহপ্রাঙ্গণে হ'ত না, তা হ'ত বাইরে, বিশেষ করে ধানের ক্ষেতে, নিড়ানির সময় বা ধান কাটার সময়। রবীন্দ্রনাথ গানকে বাইরে থেকে গৃহস্থের ঘরের কোণে ডেকে এনে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এইবার বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত গীতের কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি।
রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস, হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রু-নেত্রে কর' বরিষণ করুণ হাস্যভাতি।
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা—
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূথী জাতি।

তব পদতল-লীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা—
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথি ॥

এটা প্রেমসঙ্গীত, মানস-সাথির উদ্দেশে লেখা; মানস-সাথি সুন্দর ও হৃদিবল্লভ। এটা কি ভগবৎপ্রেমের গীত? অসম্ভব নয়। উৎসব কনক-মন্দির, কমলাসন, স্বর্ণবীণা প্রভৃতি পদ বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবীর প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে, কিন্তু 'হৃদিবল্লভ' পদটা এর সাথে খাপ খেতে চায় না। তবু লীলাপরায়ণ বা লীলাপরায়ণা দেবদেবী কখনও পুরুষ কখনও নারীরূপে প্রকাশ পেতে পারেন—অন্ততঃ কাব্যিক প্রশ্রয় (poetic licence) স্বীকার করে গানটিকে ভগবৎগীতি বলে চালিয়ে দিলে হয়তো বহু লোকের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। আবার মানবীয় প্রেম বলে চালিয়ে দেওয়াতেও বোধহয় কারও আপত্তি হবে না। তখন 'কনক মন্দির কমলাসন'-এর একটু ভিন্ন অর্থ হবে; নায়িকাই তখন পুষ্প-আহরণকারিণী পূজারিণী, প্রেমময়ী, বীণাবাদিনী কনকবরণী কন্যারূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আমি তো এই দ্বিতীয় অর্থই অধিক সঙ্গত মনে করি। সে যাই হোক, সন্দেহের মধ্যে থাকা ভাল। এক একজন এক এক অর্থ নিতে পারেন। হয়তো ভাষার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্নতার আমেজ দিয়ে উভয় দিকই খোলা রাখা হয়েছে! এর ফলে গানের আবেদন দ্বিগুণ বিস্তৃত হ'য়ে গেছে। প্রেমের ধর্মই এই যে সব বুঝে ফেললে তো ফুরিয়েই গেল, কিছু স্পষ্ট আর কিছু গোপন থাকলেই প্রেমের মাদকতা বজায় থাকে।

ভাষার দিক দিয়েও গানটিতে দ্ব্যর্থ অলংকারের বহুল প্রয়োগ নাই; একবার মাত্র 'হৃদে এস' আর 'হৃদয়েশ' সদৃশ ধ্বনির ব্যবহার পীড়াদায়ক তো নয়ই বরং অতীব মনোহর হয়েছে। পরিমিত অলংকারের এই গুণ; তা ছাড়া এই কবিতা পড়ে বা গানটি শুনে মানসপটে যে চিত্র উদিত হয় তার মার্জিত রূপ বিশেষ লক্ষণীয়।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনও, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান ॥
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার—
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান।।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে"—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান।।

এই গানটি নিঃসংশয়ে ভগবৎপ্রেমের। এতে হা-হুতাশ নেই, 'অকৃতি', 'অধম', 'হীনমতি', 'পামর' ইত্যাকার বিশেষ প্রয়োগে আত্মধিক্কার নেই, বৈতরণী পার হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই—আছে হৃদয়-দৈন্যের অকৃত্রিম স্বীকৃতি, প্রেমবন্যায় জোয়ারে অবগাহন করার আকুতি, আর অন্তর্যামীর অপ্রত্যাশিত দানের আশায় তাঁর চরণে শরণাপত্তি। কেমন সরল, মর্মস্পর্শী গীত—অন্তর্যামীর মন গলাবার উপযোগী বটে।

যদি বারণ কর তবে গাহিব না,
যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা
তোমার ফুলবনে যাইব না।
যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে
আমি চমকি চলে যাব আন কাজে।

যদি তোমার নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে
আমার তরীখানি বাহিব না।

আশা করি, এই গানটিকে কেউ ঐশীপ্রেমের দিকে টানতে চাইবেন না। তবে, সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তাও বলতে পারিনে। রাধাকৃষ্ণের লীলার দোহাই দিয়ে এমন একটা পরিবেশের কল্পনা হয়তো করা যেতে পারে, তবে শ্রীকৃষ্ণকে এমন নির্লিপ্ত প্রেমিকরূপে কল্পনা করা একটু কষ্টকর বইকি। গানে মানবীয় প্রেমের অভিমানবাণী বা প্রিয়তমার সম্ভাব্য সুখের পথে কাঁটা হয়ে না থাকার সংকল্প প্রবলভাবে (অথচ মধুরভাবে) প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নায়কের গভীর প্রেমের আভাসও যে নায়িকার হৃদয়ঙ্গম হবে না তাও বিশ্বাস করা যায় না। মার্জিতরুচি নায়ক সচরাচর মার্জিতরুচি নায়িকার প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই আশা করা যায়, নায়কের অভিমানের মর্যাদারক্ষা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রবীন্দ্রপূর্ব প্রেমসঙ্গীত পর্যালোচনা করে বোধহয় হাজার-করা এই পর্যায়ের বাণীসমৃদ্ধ ও সুরুচিসম্পন্ন গান একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীত কাব্য ও সুরসম্পদে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার প্রধান প্রধান ভাব ও উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই সে অসম্ভব চেষ্টা থেকে নিরস্ত হলাম।

শুন লো শুন লো বালিকা, রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি, শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুমমঞ্জরী, ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে।

গানটি বৈষ্ণব-গীতের ছাঁচে রচিত, ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত। এমন প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খাওয়া শান্ত প্রেমের নমুনা সুবোধ্য বহির্বঙ্গীয় ভাষায় খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বাঙ্গালীর গান' থেকে নিধুবাবুর একটি গান (রাধিকা গোঁসাই কর্তৃক রেকর্ডকৃত) ভাবের প্রশান্তিতে সমপর্যায়ের ব'লে মনে হয়। যতদূর মনে আছে, তার কয়েকটা চরণ উদ্ধৃত করছি :

সোহাগে মৃণাল ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে।
চপলা অচলা হ'ল, নীলাচলে মিশাইল
গোপনে গোপিনীকুল সে মাধুরী নেহারিল,
শোভিল কদম্বফুল শ্রীরাধাশ্যাম সমাগমে ॥

নিধুবাবু নিজে হিন্দী গানে ওস্তাদ ছিলেন। হয়তো কোনো হিন্দী গানের সুর ও ভাব এই গানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই যদি হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের বাংলা-ভাঙা মৈথিলীর পাশে নিধুবাবুর হিন্দী বা ব্রজবুলি ভাঙা বাংলা গানকে দাঁড় করানো যেতে পারে। গানের রাজ্যে এই ওস্তাদে ওস্তাদে মোকাবেলা ঘটানোতে হয়তো এঁদের কারোই অখুশি হবার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সৌহার্দ্যবলীর অন্তর্নিহিত ভাবরস আত্মস্থ করে কেমন অবলীলাক্রমে সঙ্গীত রচনা করতে পেরেছেন তারই নমুনার নিদর্শনস্বরূপ এ গানটা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে' কিংবা 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে' এই তুলনাহীন গান দুটোর পূর্ণ উদ্ধৃতি বা এর উপর টীকা-টিপ্পনীর কোনো প্রয়োজন নাই। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এটাও রামপ্রসাদী সুরের একটি সুপরিচিত 'স্বদেশী গান'। দেশবাসী সকলে পরস্পর মিলেমিশে একই উদ্দেশ্যে একত্র সম্মিলিত হ'লে যে আনন্দ উপচে

ওঠে এ-গানটিতে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' বিখ্যাত দেশপ্রেমের গান। এখানে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আর পিতা-পিতামহদের মানস-সম্পদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, তার থেকে প্রেরণালাভ করার কথা বলা হয়েছে।

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥

এ গানটাতে বলা হয়েছে দেশের প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে তার ছাপ মুদ্রিত করে দিয়েছে। দেশের উপাদান, ক্ষেতের শস্য আমাদের দেহের গঠনে, পোষণে নিয়োজিত হয়েছে; এসব সত্ত্বেও এই দেশের দুর্দশা মোচনে আমাদের অচেষ্টা যে নিতান্ত বেদনাদায়ক তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

উল্লিখিত সঙ্গীতগুলো থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুধু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পর্ক নয়, দেশের মানুষ ও বিশ্বের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানমূলক উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' কিম্বা 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' দেশাত্মবোধক গান হিসেবে উপাদেয় হলেও এগুলোকে সর্বৈবভাবে একদেশদর্শী বলা যেতে পারে। এগুলোর দৃষ্টি আত্মনিবদ্ধ ও সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা নেই, অন্যকে টেনে আনার এবং আপন করার কোনো কল্পনা নেই, ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিরও কোনো পরিচয় মেলে না। অবশ্য মানসধর্ম ও কালধর্মের জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের ও দ্বিজেন্দ্রলালের এই পার্থক্য রয়েছে। সে যা'হোক রবীন্দ্রনাথ যে এঁদের চেয়ে এত উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন এজন্য তাঁর ঋষিতুল্য দূরদৃষ্টি আর অনন্যসাধারণ মনীষার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস

রিমঝিম ঘন ঘন রে বরিষে
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ॥
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

হায় হেমন্তলক্ষ্মী

শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
করোনা বিড়ম্বিত তারে।

এগুলোতে বছরের বিভিন্ন ঋতু ও প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নিবিড় যোগ অনুভব করেছেন তাই প্রকাশ পেয়েছে কাব্যসঙ্গীতে। তাঁর ঋতু-সঙ্গীতের মধ্যে বর্ষা-সঙ্গীতই সংখ্যায় অধিক। তারপর বসন্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম, শীত, হেমন্ত। অনেকগুলোই একাধারে গান ও কবিতা। এটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষত্ব। তিনি বাণীসম্পদকে গানের কণ্ঠস্বরের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চান নি বা তবলামৃদঙ্গের চাঁটির আঘাতে পর্যুদস্ত করতে চান নি। বরং এদের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি

করে পারস্পরিক শোভাবর্ধন করতে চেয়েছেন। এ বিশেষত্ব প্রথমে ওস্তাদরা স্বীকার করতে চান নি; পরে জনসমর্থনের চাপে পড়ে তার সার্থক পরীক্ষণকে শুধু স্বীকৃতি কেন ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, ভজনের মত একটা বিশেষ মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঋতু-সঙ্গীতে বর্ষা ও বসন্তের ক্ষেত্রে একমাত্র নজরুল ইসলামই রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে খ্যাতিলাভ করেছেন।

'আয় হ্যাদে গো নন্দরাণী', 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে / বনের পাখি ছিল বনে', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি' প্রভৃতি বহু শিশুসংগীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে', 'সহসা ডালপালা তোর উতলা যে', 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি', 'আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়', 'কাছে আছে দেখিতে না পাও' ইত্যাদি ক্রিয়া-সঙ্গীত ও সমবেত-সঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ গৃহের আনন্দ বর্ধন করেছেন। তাঁর অনেক গান আবৃত্তিতে, নৃত্য-সহযোগে বা রঙ্গমঞ্চে গীত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেও অনেক গান রচিত হয়েছে। এখন আর নলকূপ খনন, হলকর্ষণ, শস্য-বপন, প্রিয়জন বা গুরুজনের বিদায় বা বিয়োগ, আমন্ত্রণ, বিশেষ বিশেষ পর্ব বা উৎসব, বিবাহ, জন্মদিন, শিক্ষারম্ভ, বর্ষবিদায়, নববর্ষ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতির জন্য গানের অভাব হয় না। শুভ গুহঠাকুরতা 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা'য় এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঋতু-উৎসব, প্রভাতী, বৈতালিকসঙ্গীত, ধর্মসঙ্গীত ইত্যাদি গাওয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন।

পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে, হৈ হৈ পাড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে
কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী
তাঁরি পদ সেবি, করি তাঁহারই ভজনা
বদ্‌কণ্ঠলোকবাসী আমরা কজনা।

চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতক দল চল হে

ভাল মানুষ নই রে মোরা ভাল মানুষ নই
গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গুণের মধ্যে ওই

ইত্যাদি হাসির গান নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অবদানের সাথে তুলনীয়; হয়তো বা সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে অধিক পরিপাটিও হতে পারে। রবীন্দ্র-পূর্বকালের হাসির গানের অধিকাংশই এত স্থূল যে সেসবের সঙ্গে এগুলোর তুলনাই চলতে পারে না।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (রামপ্রসাদী)
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভাল (বাউল)
আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ। (কীর্তন)
ঝরঝর বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো (সারি)
তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি। (ভাটিয়াল)
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাই নি (দেহতত্ত্ব)

এগুলো ভাবের দিক দিয়েই হোক বা সুরের দিক দিয়েই হোক লোকসঙ্গীতের কোঠায় পড়ে। লোকসঙ্গীত দেশের তথা পল্লীর অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সুর যেন দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকে, আর আপনা-আপনি লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করে। তাই অনায়াসে সে সুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে লোকের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানে তিনি নিজেই সুর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম দিকের গান প্রায়ই রাগরাগিণীতে বাঁধা ও নিয়মিত তালে সন্নিবিষ্ট। তিনি রাগরাগিণী এবং তালে কতদূর দক্ষ ছিলেন তার একটি প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে দুর্গাদাস লাহিড়ীর সংগ্রহ-পুস্তক থেকে। তাঁর বইয়ের প্রকাশকাল ১৯০৫ সাল। এই সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে-সব গান রচনা করেছেন, তার থেকে উক্ত সংগ্রহ-পুস্তকে ২৮১টি গান উদ্ধৃত হয়েছে। তার মধ্যে তালের হিসাবে দেখা যায় ৭৬টি একতালা, ৪৭টি কাওয়ালী, ৪০টি ঝাঁপতাল, ২০টি আড়াঠেকা, ১১টি খেমটা, ৮টি যৎ ও চৌতাল, ৬টি ঠুংরি ও রূপক, ৪টি আড়খেমটা ও তালফেরতা, আর ৩টি তেওড়া, ২টি করে ছেপকা, ধামার ও সুরফাক্তা, আর একটি ক'রে মধ্যমান, টিমেতেতালা ও তেওট দেখা যায়। আর বাকী ৪৯টিতে তাল লেখা নেই, এর কতকগুলি কীর্তন, বাউল ও ভজন। রাগিণীর গণনায় দেখা যায় ২৩টি ভৈরবী, ১৭টি বেহাগ, ১১টি বাহার, ১০টি করে ঝিঁঝিট ও কীর্তন, ৮টি করে কাফি, খাম্বাজ ও ভাঁয়রো, ৬টি করে সিন্ধু ও ইমন কল্যাণ; ৫টি করে জয়জয়ন্তী, ললিত, ভজন, বিভাস, টৌড়ি ও দেশ; ৪টি করে সাহানা, গৌড় সারং, গৌরী, রামপ্রসাদী, আলাইয়া, হাম্বীর, মুলতান। আর স্বল্প ব্যবহৃতগুলির মধ্যে রয়েছে ৩টি করে পূরবী, সিন্ধু কাফি, বাউল, কানাড়া, খট; ২টি করে মল্লার, দেশ, সিন্ধু, প্রভাতী, ধুন, গৌড় মল্লার, সরফর্দা, রামকেলী, কেদারা, পিলু, আর ১টি করে ছায়ানট, ককুভ, কালাংড়া, আশাবরী, টৌড়ি, আনন্দ-ভৈরবী, সুরট, বড়হংস সারং, যোগিয়া, আশাভৈরবী, বাগেশ্রী, মোহিনী, খট, ললিত, দক্ষিণা, টৌড়ি-ভৈরবী, মাঢ়, সিন্ধু ঝিঁঝিট, আশাবরী, রামকেলী, ভুপালী, বেলাওল, মালকোশ, শঙ্করাভরণ, সিন্দু-ভৈরবী, জিলফ্-বারোয়াঁ, কল্যাণ, বসন্তবাহার, জিলফ্ ও বারোয়াঁ। এগুলো বিশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত রাগরাগিণী বা যৌগিক রাগ (মিশ্র নয়)। এছাড়া ৫৩টি গানে মিশ্র রাগিণী ব্যবহার করা হয়েছে। এতগুলো রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করে সুর দেওয়া এবং তাল লয় সহকারে গাইতে পারা অবশ্যই যেমন-তেমন কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ রাগরাগিণীই অধিক ব্যবহার করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে গায়নপ্রণালীতে বাণীর মর্যাদার দিকেও বেশ নজর রেখেছেন! মধ্যবর্তীকালে শাস্ত্রানুযায়ী রাগরাগিণীর মধ্যেও বৈচিত্র্যের জন্য বা সুরকে ভাবানুসারী করবার তাগিদে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সুর সংযোজন করেছেন। শেষ জীবনে শাস্ত্রের লৌহবন্ধন অস্বীকার করেই ভাব, সুর আর বাণীর মধ্যে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য বিধান করেছেন আপন কবিপ্রকৃতি, মৌলিক সুরবোধ আর রসানুভূতির অলক্ষ্য ও অলঙ্ঘ্য তাগিদেই। এর সমর্থনস্বরূপ যোগ্যতর সমঝদারের দেওয়া উদাহরণ এই:

মোর প্রভাতে এই প্রথম ক্ষণের কুসুম খানি
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের আলোক হানি।

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও ব'লে,
কোন্ খানে যে মন লুকানো দাও ব'লে।।

রাগসঙ্গীত বা মার্গসঙ্গীত লোকসঙ্গীতের চেয়ে অনেক বেশী সাধনা-সাপেক্ষ—ওস্তাদের কাছে শিখতে হয়, অনেক ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের মারপ্যাঁচ আছে, তাই পান থেকে চুন খসলে চলবে না। তবু 'অধিকারী'র অধিকার স্বীকার করতেই হয়। অধিকারী তাকেই বলে যিনি সঙ্গীতের ঠাট, জাতি, প্রকৃতি, সুর, তান, লয়, অলঙ্কার প্রভৃতি বাহ্য রূপের সঙ্গে সঙ্গে ভাবরূপটাও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন। এই অধিকারীরাই সঙ্গীতের স্রষ্টা হতে পারেন—এঁরাই ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন আর রাগরাগিণীর অনেক নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এঁদের মধ্যে একজন অধিকারী। তিনি বাল্যকালে কালোয়াতি সঙ্গীতের পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। কৈশোর ও যৌবনে দেশবিদেশে ভ্রমণ করে সঙ্গীতের বিবিধ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন; আপন গৃহেও উদার পরিবেশে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-উদ্ভাবনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন; তার উপর, অনুভূতিশীল কবিচিত্ত দিয়ে সঙ্গীতের বাণী তাল ও সুরের মধ্যে ক্ষেত্রোপযোগী সুসঙ্গত অনুপাতের প্রবর্তন করেছেন। এর ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এক প্রকার ক্লাসিকাল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, নিঃসন্দেহে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে হ'লে এতেও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। শুভ গুহঠাকুরতা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা'র সুদীর্ঘ ভূমিকায় এর অলঙ্করণনীতি, উচ্চারণ-প্রণালী, শ্বাসগ্রহণ-পদ্ধতি, কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান স্বরলিপিতে বিধৃত হয়েছে। তবু শুধু ওর সাহায্যে বাড়ীতে একলা বসে কর্তব্য করাই যথেষ্ট নয়। এ-গানের গতিপ্রকৃতির বিশেষ বিশেষ ঝোঁক রয়েছে, তা আয়ত্ত করতে হ'লে রীতিমত ওস্তাদ ছাড়া গতি নেই। তবে আটঘাট বেঁধে যতই শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ করা হোক জনপ্রিয়তার ফলে মুখে মুখে এর পরিবর্তন বা বিকৃতি বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওস্তাদদের মধ্যেই পার্থক্য দেখা দেবে। তবে এতে অতিমাত্রায় ঘাবড়াবার কারণ নাই। আমার মনে হয়, প্রতিভাবানেরা হাতে হাতে প্রবহমান সঙ্গীতসূত্র ঊর্ধ্বে ধরে রেখেছেন। কিন্তু টেলিগ্রাফের তারের মত, খুঁটির মাথায় সূত্রটা সঠিক উচ্চতা রক্ষা করলেও একটু দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই তা নুয়ে পড়ে। পূর্ববর্তীদের খুঁটির খানিক সামনে রবীন্দ্রনাথ যেমন অপসৃয়মাণ সঙ্গীতসূত্রের এক প্রান্তে নতুন খুঁটি গেড়েছেন, ভবিষ্যতে আর একজন 'প্রতিভা' এসে নুয়ে পড়া সূত্রের প্রান্ত আবার তুলে ধরবেন, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন—এইভাবে অগ্রগামী সূত্র ওঠানামা করতে করতেই চলতে থাকবে। উন্নতির প্রবাহ তো চিরকাল এমনি করে ঢেউ খেতে খেতেই ছুটে চলে।

# সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ

আজকাল বঙ্গভাষী সকলেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। এই ভক্তি অনেকস্থলেই কোনো বুদ্ধি বিবেচনার ধার ধারে না। এটা যেন অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অভ্যাসের মত হয়ে পড়েছে। গোটা সমাজ যাঁর গুণের প্রশংসা করছে, তাঁকে অসঙ্কোচে ভক্তি করা অনেকের কাছেই কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়, না করলে যেন শ্লীলতার অভাব সূচিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনায় যাদের উদ্দীপনার অন্ত নাই, এমন ভক্তদের মধ্যে অনুসন্ধান করলেও দু'চার জন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যাদের মোটামুটি জ্ঞানেরও অভাব আছে।

কিন্তু আজ আমরা তাঁর কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা, হাস্য-কৌতুক, মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সমস্ত ছেড়ে এমন একটা বিষয়ে দু'চার কথা বলব, যার সঙ্গে শিশু থেকে অতিবৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে। এই সর্বজনবিদিত বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন নাই, এমন বাঙ্গালী যদি কেউ থেকে থকেন, তবে সেটা এক পরম আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে।

বাঙ্গালী জাতি গানকে নির্বাসিত ক'রে এমন স্থানে প্রেরণ করেছিল, যেখানে ভদ্রলোকের মেয়েদের কথা দূরে থাক্, ছেলেদেরও যাওয়া নিন্দাজনক ও লজ্জাকর ছিল। এখানে সত্যের অনুরোধে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কিছুকাল (বোধ হয় ৫০ বৎসর) আগে পর্যন্তও ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ, উৎসব ও সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডে পতিতা গায়িকা ও নর্তকীর আমদানী ক'রে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তা' সামাজিকভাবে উপভোগ করা কিছুই নিন্দার বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে লোকের রুচি মার্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সব ব্যাপার অনেকের কাছেই অশ্লাঘনীয় বলে মনে হ'তে লাগলো। তাই, পবিত্র সঙ্গীতও গৃহের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া থেকে, গোপনে কদর্য পল্লীতে আবদ্ধ হ'য়ে পড়লো! ক্রমান্বয়ে অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে কাওয়ালী, কীর্তন ও ভজন ছাড়া সঙ্গীত মাত্রকেই লোকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো; ভাবখানা এমন, যেন সঙ্গীত পরিবেশন বা শ্রবণ একটি অপরাধ।

সঙ্গীতকে এই অবমাননার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে যাঁরা একে ভদ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং রবীন্দ্রনাথই প্রধান। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও স্বদেশী গান; কান্ত কবির ভক্তিবিষয়ক গান এবং রবীন্দ্রনাথের সর্ব বিষয়ক গান বাঙ্গালী সমাজে অতি পরিচিত। তাঁদের পূর্বে বিবিধ বিষয়ে বাংলা গান অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। পুরানো গানের পুঁথি ঘাঁটলে দেখতে পাওয়া যায়, তা'তে শ্যামাসঙ্গীত, রাধাকৃষ্ণের লীলা বা প্রেমতত্ত্ব, আর বাউল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের অতিশয় প্রাধান্য। এজন্য যদি-বা সঙ্গীতের একটু চর্চা হ'ত, তা'ও বিশেষ করে বৃদ্ধদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আজকাল রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচলন হ'য়েছে। এখন সঙ্গীতের বিষয়-

বৈচিত্র্যও অনেক বেড়ে গেছে; আর ভাষা-সৌষ্ঠব ও রুচি-সৌষ্ঠবের দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হ'য়েছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ করলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হ'তে হয়। স্বভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে ধর্ম-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, স্বদেশী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত কিছুরই অভাব নাই। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই উপযোগী সঙ্গীত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তার ভাষা কি অদ্ভুত সুন্দর আর রুচিসঙ্গত! অন্যের রচিত বহু গান আছে, যার ভাষা এত অমার্জিত যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে সে সব গান গাইতে রীতিমত লজ্জাই করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রস-বোধ এত সূক্ষ্ম যে অতি বড় নীতি বিশারদেরাও তাঁর ক্বচিৎ দুই একটা গান ছাড়া অন্য গানে অশ্লীলতা-দোষ আরোপ করতে পারেন নাই। তাঁর কবি-প্রকৃতি শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করতে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হ'য়েছে। ফলে, স্থূল-রস-পিপাসু বাঙ্গালী সমাজে একটু উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্মরস উপভোগ করবার রুচি গঠিত হ'য়েছে। আশা করা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহুল প্রচলনের ফলে খেমটা-বাই-কবি-খেউড়-তর্জা-মুখরিত দেশে সভ্যতার প্রধান অঙ্গস্বরূপ উন্নত রুচি-সৌষ্ঠব খুব তাড়াতাড়ি গড়ে উঠবে।

'ব্রহ্মসঙ্গীত'-খানা খুললেই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষার বিশেষত্ব খুব স্পষ্ট বোঝা যায়: সেখানে অধিকাংশ রচয়িতার গানে বক্তব্যটাই এত প্রাধান্য পেয়েছে যে তা নীরেট গদ্যের মত শোনায়, বলবার ভঙ্গীতে চমৎকারিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপরূপ বাক্য-বিন্যাস ও ছন্দভঙ্গীতে কি যেন এক অনির্বচনীয়তা আছে, যা গানের ভাব ও সুরের আনন্দের মধ্যে আর একটি আনন্দের সংযোগ করে। প্রাগ্-রবীন্দ্রযুগের সঙ্গীত রুচি, ভাষা ও পদ্যের দিক্ দিয়ে কেমন ছিল তার একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে :

হেলায় হায় যায় বয়ে কাল।
মন ভুলে ভব ববম বলে, বাজাইয়ে গাল ॥
বাল্যকাল ক্রীড়া বশে, প্রগণ্ডে প্রকাণ্ড রসে,
যুবাতে যুবতী বশে, বার্দ্ধক্যে বেহাল ॥
সংসারে হ'য়ে আবৃত, ভুলেছরে নিত্য-তত্ত্ব,
তত্ত্ব শিব নিত্য নিত্য লয়ে জপমাল ॥
অধৈর্য জীব, ধর ধৈর্য, ত্যজ ঐশ্বর্য মাৎসর্য
পাইবেরে সুখরাজ্য, কাটি মায়াজাল ॥
কহিলে হে দৃঢ়-ভক্তি, শক্তিপতি দিবেন মুক্তি
শিবতত্ত্বে এই যুক্তি, কহে খগপাল। —রূপচাঁদপক্ষী

আমরা সুরসিক সুগায়ক রূপচাঁদপক্ষীর নিন্দা করবার জন্য নয়, বরং সাধারণভাবে সমগ্র সমাজের কি প্রকার মনোবৃত্তি ছিল তাই দেখাবার জন্য উদাহরণ স্বরূপ উপরোক্ত গানটি উদ্ধৃত করলাম। এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না ক'রে রবীন্দ্রনাথের একটি গান পাশাপাশি রেখে পড়লেই, আমরা কি বলতে চাই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

যাদেরে চাহিয়া তোমারে ভুলেছি, তারাও চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে ॥
দু'দিনের হাসি দু'দিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে ॥

যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে।
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়, ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখ পাথারে।
রবি শশীতারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে।

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত বক্তৃতা বা উপদেশ নয়, আপন হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে তার জন্ম। উপরের উদ্ধৃত গান দুটোর পার্থক্য লক্ষ করলেই তা' স্পষ্ট দেখা যাবে।

এবার প্রণয় সঙ্গীতের নমুনা নেওয়া যাক। শ্রীধর কথকের একটি গান এই—

কেন প্রাণ, এত অপমান।
সুধামুখি! সুধাদানে কিরানে বিধু-বয়ন।।
সুধাকর চকোরে — যদিও বঞ্চনা করে
কেমনে সে প্রাণ ধরে — বল তায় কি সন্ধান।
চকোর চন্দ্র আশ্রিত — অলি যে, নলিনীগত,
ঘনে চাতকী নিশ্চিত — তৃষিতে করে জল দান।
এ তনু তদনুগত — তদনুপরিমিত
বিতরিয়ে কথামৃত— — বাঁচাও প্রাণ রাখ মান।—

শ্রীধর কথক

এর উপমাগুলোর ভিতরে যেন ভোগ প্রবণতার দিকে বেশ খানিকটা ইঙ্গিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত গানটি থেকে রুচির বিভিন্নতা অনায়াসেই ধরা যাবে।—

ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিও তোমার চরণ-মঞ্জীরে।
ধরিয়া রাখিও সোহাগ আদরে
আমার মুখর পাখিটি তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে।
মনে করি সখি বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি তোমার কনক কঙ্কণে।
আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া রাখিও তোমার অলক বন্ধনে।
আমার স্মরণ শুভ সিন্দুরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো তোমার ললাট-চন্দনে।
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিওগো তোমার অঙ্গ সৌরভে।
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো তোমার অতুল গৌরবে। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রেম-নিবেদনটা কেমন আশ্চর্য সৌষ্ঠবের সঙ্গে করা হ'ল। মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল, অথচ অসংযমের লক্ষণ একেবারেই নেই।

সব রকম গানেরই অজস্র উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। মোটের উপর আমরা দেখ্‌তে পেলাম, সঙ্গীতকে রুচি-গৌরব উন্নত ক'রে গৃহস্থ-বধূ এবং শিশু সন্তানদের কণ্ঠে স্থাপিত করবার কাজে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। নৃত্য-সম্বলিত মধুর সঙ্গীত রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী। এরূপ সঙ্গীত সুরে, তালে ও দেহভঙ্গীতে এক অপরূপ মূর্তি পায়। কাজেই এর যে আদর হয়েছে তা' কিছুই আশ্চর্য নয়। এখানে একটা ক্রিয়া-সঙ্গীতে এর নমুনা দেওয়া যাচ্ছে—

আয় রে আয় সাঁঝের বা লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আঁচলটি তোর ভরে ভরে॥
আয় রে আয় মধুকর ডানা দিয়ে বাতাস কর।
ভোরের বেলা গুন্‌-গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥
আয়রে চাঁদের আলো আয়, হাত বুলিয়ে দেরে গায়
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে ॥
পাখীরে, তুই ক'সনা কথা, ঐযে ঘুমিয়ে প'ল লতা। —রবীন্দ্রনাথ

সুরের দিক্ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে সম্পূর্ণ এক নতুন সৃষ্টি বলা যায়। যিনি সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রচলন করেছেন, বানান করতে মৌলিকতা দেখিয়েছেন; এবং কাব্যে অসংখ্য ছন্দ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সঙ্গীতেও রাগ-রাগিণীর নাগ-পাশ থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি লাভ ক'রে সুরকে স্বাধীন রাজ্যে বিচরণ করিয়েছেন। তিনি আগে ওস্তাদী সঙ্গীতের সুরেই গানের সুর দিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন, কঠিন নিয়মের বন্ধনে গায়কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন ক'রে গানকে কৃত্রিম ক'রে ফেলা হচ্ছে। তিনি ওস্তাদের সুদীর্ঘ তানের পরিবর্তে, গানের ভিতর উপযুক্ত স্থানে ছোট ছোট টুকরো তানের প্রাধান্য স্বীকার করলেন; আর যত্রতত্র সুপ্রচুর গমক ও মীড়ের স্থলে ভাবানুগত বাক্য-ভঙ্গী ও সুরভঙ্গী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন। তা'ছাড়া প্রচলিত শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর অনুগত না হ'য়ে ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইচ্ছামত ভাঙ্গাগড়া ক'রে নতুন জিনিস সৃষ্টি করলেন। ওস্তাদেরা এতে রুষ্ট হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে "খিচুড়ী" ও "মেয়েলী"—গান বলতে লাগলেন। বাস্তবিক, এক হিসাবে তাঁদের কথা কতকটা ঠিক। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত স্বর-বহুল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণী-বহুল। কথা বেশী ব'লে, রবীন্দ্র সঙ্গীত অনেক সময় আবৃত্তির মত হ'য়ে পড়ে, তাতে সুরের খেলাটা ঠিকমত দেখা যায় না। এ-অভিযোগ শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত বাংলা গানের বিরুদ্ধেই করা হয়ে থাকে। যা'হোক, কতকটা আবৃত্তি-ভাবাপন্ন হলেও স্বরের ব্যঞ্জনা থাকাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্জীব ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির সাহসিকতার বিষয় স্বর'লিপির সাহায্য ব্যতীত বুঝান কঠিন। অনেক সময় এক রাগিণীর ভিতর হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত সুরের সমাবেশ ক'রে দেন যে, তার সঙ্গতি আগে কেউ কল্পনাই করতে পারেন নি, অথচ তাতে বেসুরা না হ'য়ে বরং গানের চমৎকারিতা ঢের বেড়ে যায়। ভৈরবীতে কড়ি মধ্যমের একটু খোঁচ ওস্তাদী সঙ্গীতেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেহাগে যে কোমল ধৈবত সুসঙ্গতভাবে খেটে গিয়ে স্বপন লোকের সৃজন করতে পারে, একথা

(আমার) নিশীথ রাতের বাদল ধারা
এস হে গোপনে
(আমার) স্বপন-লোকে দিশা হারা।

গানের "স্বপন-লোকের" কাছে আসলেই বেশ টের পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের যে কোনো স্বরলিপির বইতে অপ্রত্যাশিত সুর সংযোগ, আর ভাবের সঙ্গে সুর-ব্যঞ্জনার অদ্ভুত ঐক্যের উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ভিতর আমরা সুরস্রষ্টার বিরাট কল্পনা ও আত্ম-প্রত্যয়ের সাহসিকতা দেখতে পাই।

গানের উদ্দেশ্যে কর্তব্য প্রদর্শন নয়,— নিজে আনন্দ পাওয়া ও দশজনকে আনন্দ দেওয়া। যাকে উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলা হয়, তা' অবশ্য বিশেষজ্ঞ গুণী সম্প্রদায়কে যথেষ্ট আনন্দ দেয়, কিন্তু তাতে সর্বসাধারণের চিত্তের ক্ষুধা মেটে না। উক্ত বিশেষজ্ঞ সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান অবশ্যই নিম্নাঙ্গের ব'লে মনে হ'তে পারে, হয়ত তাঁরা অত্যন্ত সহজ মনে ক'রে এ গানকে অশ্রদ্ধাও করতে পারেন, কিন্তু এ গান বাঙ্গালী সর্বসাধারণের প্রাণের বস্তু। এর জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। তা'ছাড়া ওস্তাদেরা হিন্দুস্থানী গানের মাপকাঠিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিমাণ করতে গিয়ে ভুল করেন। কারণ, এ দু'টো স্বতন্ত্র জিনিস, এদের technique বা কায়দা-কৌশল সব আলাদা। ওস্তাদেরা চেষ্টা ক'রে খুব বিশুদ্ধ চালে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে চেষ্টা করলে কানে বেখাপ্পা শুনায়। কারণ এ-গানের তান ও স্বর-ব্যঞ্জনা স্বতঃউচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের প্রকাশ; এ রস-বস্তু, নিয়মের পেষণে মৃতপ্রায় নয়। ওস্তাদী সঙ্গীতের তান ও গমকও স্বতঃউৎসারিত ভাবাবেগ থেকে বিচ্যুত তা' বলছিনে, কিন্তু অধিকাংশ ওস্তাদেরই গানের সঙ্গে প্রাণের যোগ না থাকাতে আজকাল ওস্তাদী-গান সুরের ও তালের কস্তাকস্তি বা লড়াইয়েই পর্যবসিত হ'য়েছে। ভাল রকম গাইতে পারলে ওস্তাদি গানও তৃপ্তিদায়ক হ'তে পারে, আর প্রাণ ঢেলে গাইতে না পারলে রাবীন্দ্রিক গানও ন্যাকামির মত হ'য়ে পড়ে। ওস্তাদেরা রাগ-রাগিণীকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে প্রথমে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী স্বীকার করেছিলেন। তারপর অনেক উপ-রাগ-রাগিণী গ্রহণ করতে বাধ্য হ'য়েছেন। প্রতিভাবান্ শিল্পীর শুভমুহূর্তের এই সৃষ্টি-গুলি দেশের লোকের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল বলেই ওস্তাদেরা এসব অগ্রাহ্য না ক'রে উপ-রাগ রাগিণী বলে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টিরও কতক কতক সমস্ত বাঙ্গালীর মনোরঞ্জন ক'রে শেষে বিশেষ রাগ-রাগিণীর কোঠায় স্থান পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই।

# গীতিকার নজরুল ইসলাম

কবি নজরুলের সাহিত্যিক কর্মজীবন বিশ বছরের অধিক নয়। এর মধ্যেই তিনি লিখেছেন ১৮ খানা কবিতার বই, ৩ খানা কাব্যানুবাদ, ২ খানা ছোটদের কবিতার বই, ৩ খানা উপন্যাস, ৩ খানা গল্পের বই, ৩ খানা নাটক, ১ খানা ছোটদের নাটক, ৪ খানা প্রবন্ধের বই, আর ১৪ খানা সঙ্গীত গ্রন্থাবলী। এটা সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়। কবিতা ও সঙ্গীতেই তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। তাঁর কাব্যে বন্দনমোচনের আহ্বান, অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নওজোয়ান ও নারী-জাগরণের উদ্বোধন, মুসলিম জাহানের বীর-প্রসস্তি, মানবীয় প্রেম-প্রীতির মাহাত্ম্য বর্ণন— অনেক কিছুই আছে। এসবের বলিষ্ঠ প্রকাশই কবি নজরুলের বিশেষত্ব। তাঁর সঙ্গীত মানবীয় ও ঐশী প্রেমের মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, প্রতীক্ষা-অভিসার প্রভৃতিভাবে বিচিত্র। 'মানব' বলতে তিনি মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য করেন নি। কি কাব্য, কি সঙ্গীত— সর্বত্রই তিনি উভয় কৃষ্টি সম্বন্ধেই অবলীলাক্রমে লেখনী চালিয়েছেন। সহজ অনুভূতিতে উভয় সমাজের অন্তরের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে একদিকে যেমন বাউল-কীর্তনে, অন্য দিকে তেমনি হামদ, না'ত, মর্সিয়া ও গজল গানে। আজ আমরা কেবল তাঁর ইসলামী সঙ্গীত সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত সর্বপ্রথম রেকর্ড থেকেই শুরু হয়। সুকণ্ঠ গায়ক মরহুম আব্বাসউদ্দীন সাহেবই সর্বপ্রথম তাঁর ইসলামী গান রেকর্ড করবার কথা উত্থাপন করেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মুসলমান সমাজের তৎকালীন সঙ্গীত-বিরাগ লক্ষ করে প্রথমে এতে কর্ণপাত করেন নি। ইসলামী গান রেকর্ড করলে বাজারে চলবে কিনা, এই ছিল ভয়। অবশেষে অনেক বিবেচনার পর পরীক্ষামূলকভাবে একখানা রেকর্ড বের করবার সিদ্ধান্ত হ'ল। এই সিদ্ধান্তের পর আধ-ঘন্টার মধ্যেই লেখা হয়ে গেল— "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।" তারপর দিনই লেখা হল "ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর।"

অবশ্য, গান লেখা হওয়ার পরক্ষণেই নজরুল সুর সংযোগ করে আব্বাসউদ্দীনকে শিখিয়ে দিলেন। এখানে বলে রাখা ভাল, নজরুলের মনে গানের সুরই আসত আগে; তারপর সুরের খাঁজে খাঁজে যেন বাণী ভরে দেওয়া হ'ত। সুতরাং উপরে যে সুর-সংযোগের কথা বলা হ'লো, তার মানে সুরটা হার্মোনিয়ামের পর্যায়ে তোলা ছাড়া আর কিছু নয়। এই গানের রেকর্ড মুসলমান সমাজ থেকে যে কী বিরাট অভিনন্দন লাভ করেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে আব্বাসউদ্দীনের লেখা 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' নামক আত্মজীবনীতে। তার থেকে একটি মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করছি : "কাজীদা আমার গলার স্বর শুনে একদম লাফিয়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন"— "আব্বাস, তোমার গান কী যে"—আর বলতে দিলাম না, পা ছুঁয়ে তাঁর কদমবুসী করলাম। ভগবতী বাবুকে বললাম— "তা' হলে এক্সপেরিমেন্টে খোপে

টিকে গেছি, কেমন?" তিনি বললেন, "এবার তা' হলে আরো ক'খানা এই ধরনের গান—" খোদাকে দিলাম অশেষ ধন্যবাদ। এই শুভ সূচনার পর হুড়হুড় করে ইসলামী গানের রেকর্ড বেরোতে লাগল, আর 'তপ্ত-পিঠের' মত সেসব নিঃশেষিত হতে লাগল। আব্বাসউদ্দীন সাহেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে মোট ৩৭ খানা ইসলামী রেকর্ডের উল্লেখ আছে। অবশ্য, প্রত্যেক রেকর্ডে দুইখানা করে মোট চুয়াত্তর খানা গানের প্রথম লাইন পাওয়া যাচ্ছে। আব্বাসউদ্দীনের বিশেষ অনুরোধে গরীব ক্রেতাদের সুবিধার জন্যই বহুগান অল্প দামের রেকর্ডে তোলা হয়েছিল। এসব গানের সুর প্রায়ই নজরুলের নিজের দেওয়া। কেবল অল্প কয়েকটি গানে নজরুলের সুরের কাঠামো অবলম্বন করে সুর-সংযোজনা করেছেন কমল দাশগুপ্ত ও চিত্ত রায়। অন্ততঃ একটি গানে সুর দিয়েছেন আবদুল করিম (বাণী) ও আব্বাসউদ্দীন উভয়ে মিলে।

এইসব জনপ্রিয় ইসলামী গানের একটা পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহপুস্তক বের হ'লে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী ঐতিহ্য-বোধ সঞ্চারিত করবার সুবিধা হ'তে পারে। এখন কয়েকটি গান থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এর বিশেষত্ব দেখা যাক। প্রথম রেকর্ডটিতে আছে :

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুসীর ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন আসমানী তাগিদ।
আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন
হাত মিলাও হাতে
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্বনিখিল
ইসলামে মুরীদ।

এখানে খুশীর ঈদের দিনে আপন-পর, দোস্ত-দুশমন সব ভুলে গিয়ে নিখিল বিশ্বকে আপন করে নেবার কথা বলা হয়েছে।

এরপর অপর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় গানটিতে আছে :

শিয়া, সুন্নী, লা-মজহাবী একই জমাতে
এই ঈদ মোবারকে মিলবে একসাথে
ভাই পাবে আজ ভাইকে বুকে,
হাত মিলাবে হাতে এক আকাশের নীচে যেমন
এক সে মসজিদে-চলো, ঈদগাহে।

এখানে নজরুলের প্রেম-পিয়াসী উদার মন সব মতভেদ অতিক্রম করে একত্র মিলতে চাচ্ছে।

এই ইসলামী অনুষ্ঠানপর্যায়ের আর-একটি গান আছে :

দে যাকাত, দে যাকাত
তোরা দে রে যাকাত
তোর দিল খুলবে পরে
ওরে আগে খুলুক হাত,
ও তোর আগে খুলুক হাত।
দেখ পাক কোর-আন

শোন নবীজীর ফরমান,
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান
—তোর একার তরে দেন নি
খোদা দৌলতের খেলাৎ।

এখানে অন্যকে দিয়ে-থুয়ে সম্পদ ভোগ করবার কথা কবি বলেছেন কোরান-হাদীসের দোহাই দিয়ে। মুসলমান অন্যকে ভুখা রেখে একা একা ঐশ্বর্য ভোগ করবে না— ইসলামের এই প্রেমের বাণী উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

মুহর্‌রম পর্বে কবি মর্সিয়া গাচ্ছেন :

মুহর্‌রমের চাঁদ এলো ঐ
কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়
ওয়া হুসেনা ওয়া হুসেনা তারি
মাতম শোনা যায়।
কাঁদিয়া জয়নাল আবেদীন
বেহুঁশ হলো কারবালায়
বেহেশতে লুটিয়ে কাঁদে
আলী ও মা ফাতেমায়।

আর মা ফাতেমার যে-প্রশস্তি গেয়েছেন তার কয়েকটি চরণ এই :

খাতুনে জান্নাৎ ফাতেমা জননী
বিশ্বদুলালী নবীনন্দিনী
মদিনাবাসিনী পাপতাপনাশিনী
উম্মৎ-তারিণী আনন্দিনী
সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘমায়া
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরু-ছায়া
মুক্তি লভিল মাগো তব শুভ পরশে
বিশ্বের যত নারীবন্দিনী।"

এখানে ছন্দিত কাব্যে কী সুন্দর ভঙ্গীতে বাংলার কবি ফাতেমা জননীর বন্দনাগীতি গেয়েছেন। হামদ-পর্যায়ের একটি গানের বাণী শুনুন :

ফুলে পুছিনু 'বল, বল ওরে
ফুল কোথা পেলি এ সুরভি
রূপ এ অতুল?"
"যার রূপে উজালা দুনিয়া"
কহে ফুল 'দিল সেই মোরে রূপ এই
এই খুশবু আল্লাহ্ আল্লাহ্।"
যাঁরে আম্বিয়া-আউলিয়া ধ্যানে না পায়
কুল মখলুক যাহারি মহিমা গায়
যে নাম নিয়ে এসেছি এই দুনিয়ায়
সে নাম নিতে নিতে মরি
এই আরজু, আল্লাহ্ আল্লাহ্।

এখান আরবীতে-বাংলাতে মিশে কী চমৎকার ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নজরুলের এই কৃতিত্বে বাংলা ভাষা সার্থক হয়েছে, আর বাঙ্গালী মুসলমানের মনের সঙ্গে যোগ সাধিত হওয়ায় তারাও গভীর তৃপ্তির সঙ্গে দিলের আরমান মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে। না'ত পর্যায়ের বহু গানের মধ্যে একটির খানিক টুকরো দেখানো যাচ্ছে :

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমায় সেথা চাঁদ দোলে
যেন উষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে।
মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন,
'এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই'
কহিল যে-জন,
মানুষের লাগি চির দীন-হীন
সাজিল যে-জন,
বাদশাহ-ফকীরের এক শামিল
করিল যে-জন,
এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
(আজি) মাতিল বিশ্ব নিখিল
মুক্তি কলরোলে।

এই আশ্চর্য সুন্দর নবী-বন্দনা বিশেষ করে 'ব্যথিত মানুষের ধ্যানের ছবি' চরণটা বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিবিধ পর্যায়ে ইসলামের বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন কবি এই ভাবে :

'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা
আমরা সেই সে জাতি
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা,
বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি—
আমরা সেই সে জাতি।
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার
লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙ্গাড়ি
শীতল শান্তি-ধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভেঙ্গে দিল
সবারে বক্ষ পাতি,—
আমরা সেই সে জাতি।
কেবল মুসলমানের লাগিয়া
আসেনি ক ইসলাম
সত্য যে চায় আল্লায় মানে
মুসলিম তারি নাম।
আমীর-ফকীরে ভেদ নাই, সবে

ভাই, সব এক সাথী—
আমরা সেই সে জাতি ॥
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি
নর-সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতের বোরকা উতারি,
এনেছি আশার ভাতি—
আমরা সেই সে জাতি ॥'

এখানে মুসলিম আদর্শের যে গৌরবোজ্জ্বল চিত্র কবি এঁকেছেন তা' ইতিহাসসম্মত, কোরানসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত। মোট কথা, নজরুল ইসলাম ইসলামের যে-রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন তা' নিশ্চয়ই বিশ্ববাসী সকলের কাছেই সহজ গ্রাহ্য।

আমরা আমাদের প্রিয় কবির নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি; যিনি "আলা কুল্লে শাই-য়িন ক্বাদীর" তাঁর কাছে আমরা এই মুনাজাত করি।

রেডিও পাকিস্তানে প্রচারিত
১৯৬১

# আমার বন্ধু নজরুল : তাঁর গান

১৯১৯ সালে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের "বাউণ্ডেলের আত্ম-কাহিনী" মাসিক "সওগাতে" প্রকাশিত হয়। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। সেই তরুণ বয়সে আমার সাহিত্যজ্ঞান তখন কতটুকুই বা। একজন মুসলমানের, যাঁর আবার পদবী কাজী, বাংলা ভাষায় তাঁর দখল দেখে আমি রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠি। মনে মনে এই অদেখা বন্ধুটিকে আমার নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনুপ্রাণিত হলাম। তারপর ১৯২০ সাল থেকে "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় একের পর এক তাঁর উদ্দীপনাময় কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে লাগল। এই ঘটনা স্বপ্নের মত রোমাঞ্চকর বলে মনে হত আমার কাছে। ঐ কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলোর প্রচলিত ধর্ম-নীতি বিরুদ্ধ কথাবার্তা যেমন আমি মেনে নিতে পারতাম না, তেমনি ধর্মাদর্শে সংরক্ষণশীল হয়েও সেগুলোকে যা-তা বলে উড়িয়েও দিতে পারতাম না। ফলে আমার আবেগ ও যুক্তির মধ্যে একটা তোলপাড় লেগে যেতো।

বাংলা সাহিত্যাকাশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটির সঙ্গে দেখা করতে আমি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। শীগগীরই একটা সুযোগ এসে গেলো। আমার কলেজের সহপাঠী কাজী আকরম হোসেনের আত্মীয়-পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে ১৯২০ সালের ১০ই অক্টোবর কলকাতায় আমার বিয়ে হয়। আমার শ্বশুর বাড়ী ছিল ১১ নং ওয়ালীউল্লাহ লেনে— ওয়েলেসলি-স্কোয়ারের পূর্ব দিকের গেটের দক্ষিণ কোণ বরাবর। তারিখটা ঠিক কবে এখন সঠিক মনে করতে পারছি না— তবে ১৯২০ কিংবা ২১-এর মধ্যে কোনো একদিন হবে। আকরম (আমার স্ত্রীর ইনসান মামু) ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে নিয়ে যান। তাঁর ঘরের সিঁড়িতে পৌছবার সরু গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নজরুল যে-ঘরে থাকেন সেই বাড়ীর দু'তলা থেকে আমরা তাঁর হাঃ হাঃ হাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। ঘরের মধ্যে ৬/৭ জন আগন্তুক পূর্বাহ্নেই উপস্থিত ছিলেন— কবি তাঁর স্বভাবগত প্রাণের উদ্বেল স্পর্শে সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছিলেন। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। এবং আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আমরা কাজী কি কৈবর্ত তা নিয়ে তিনি আদৌ মাথা ঘামান নি। কিন্তু আমরা দু'জনই প্রফেসর —একজন কলেজের, অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয়ের— একজন ইংরেজীর, অন্যজন ফিজিক্সের (তখনকার দিনে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনো শিক্ষককে প্রফেসর বলা হ'ত) শুনে তিনি সত্যিই খুশী হলেন। আমি লক্ষ করলাম যে প্রফেসরদের প্রতি বিশেষ করে মুসলমান প্রফেসরদের প্রতি তাঁর একটা অবিচল শ্রদ্ধা আছে— সে সময় যাঁদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। বস্তুতঃ আমাদের এক কাপ করে চা এবং কয়েকটি সঙ্গীত দিয়ে আপ্যায়ন করা হ'ল। নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে নজরুল গান করলেন। অপূর্ব নিখুঁত ভঙ্গিতে তিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন; এবং সেইকালে যখন বাঙালী মুসলমান সমাজে সঙ্গীত হারাম না হলেও মকরূহ্ ছিল।

২.
প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম কিংবা হেমন্তের ছুটিতে সস্ত্রীক অথবা একা— যদি আমার স্ত্রী কলকাতায় থাকতেন— কলকাতায় যেতাম। গেলেই "বিদ্রোহী" কবির সঙ্গে দেখা করাটা আমার যেন ফরজ ছিল। প্রতিদান স্বরূপ কবিও আমার শ্বশুর বাড়ীতে আমাদের দর্শন দিতেন। শীগগীরই আমি আবিষ্কার করলাম কবি একজন সুদক্ষ হস্ত রেখাবিদ। একবার ওয়ালিউল্লাহ লেনে (তালতলায়) তিনি আমার এবং আমার শ্যালকদের হাত দেখলেন। আমার বারো বছরের দ্বিতীয় শ্যালক খলিলুর রহমানের হাত দেখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে সে বিদেশে যাবে। আমার নয় বছরের ৩য় শ্যালক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, অতি অল্পকালের মধ্যে সে অনেক অনেক দূরে যাত্রা করবে, কোথায় তা কেউ জানে না। ঘটনা অবিকল তাই হয়েছিল। পরবর্তীকালে খলিলুর রহমান উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে যায়, এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ডিগ্রীসহ বি.এ. পাশ করে ও পি. এইচ. ডি লাভ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান সমেত অন্যান্য আরও অনেক দেশে ইউনেস্কোর এডুকেশন অফিসার হিসাবে চাকরি করে। আর আমার তৃতীয় শ্যালক বদরুল আলম এমন এক দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হয় যে কোনো ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা হেকিম সে-রোগ নির্ণয় করতে পারেন না। সুতরাং বছর তিনিকের মধ্যে সে এমন এক অজানা দেশে চলে যায় কোন পথিক যেখান থেকে আর ফিরে আসে না। আর আমার সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আমার ভাগ্যে সমুদ্র-যাত্রা ঘটবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে প্রভূত সম্মান জুটবে। আমি অবশ্যই বলতে পারি না যে তেমন সৌভাগ্য আমার হয় নি।

৩.
আমার মনে হয় কবির সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। ১৯২৫ সালে কলকাতায় ভারতব্যাপী একটি দাবার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়েন, সুতরাং তাঁর স্থানে আর একজন প্রতিযোগীর প্রয়োজন পড়ে। আমি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম তালিকাভুক্ত করার পরামর্শ দিই। সবাই বিস্ময় অনুভব করেন, কিন্তু অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিযোগীরা খুব খুশী হন। ব্যাপার হ'ল নজরুল ছিলেন একজন কল্পনা শক্তিসম্পন্ন আক্রমণ প্রিয় দাবাড়ে। দারুণ রকমের কুশলী খেলোয়াড় যদিও তিনি ছিলেন না, তবু মধ্যম শ্রেণীর খেলোয়াড় হিসেবেও তিনি মাঝে মাঝে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতেন। প্রতিযোগিতার ফল হয়েছিল ভারী মজার। হাঙ্গেরীয় একজন অতুলনীয় দাবা খেলোয়াড় রবার্ট পিকলার ৯ পয়েন্টের সব কটিই জিতেছিলেন, কলকাতার চ্যাম্পিয়ান এস. সি. আড্ডি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ৮ পয়েন্ট পেয়ে, নজরুল ইসলাম $1^1/_2$ পয়েন্ট এবং "কিংসপন" পেয়ে শেষ-বিজয়ী হন। আর আমি ৭ পয়েন্ট পেয়ে হই তৃতীয়। নিতান্ত অবহেলা করে আমি যদি একটি পয়েন্ট না ছাড়তাম তো মিস্টার আড্ডির সঙ্গে ৮ পয়েন্ট পেয়ে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতাম। এই একটি পয়েন্ট হারবার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বুঝলাম যে দাবা প্রতিযোগীতায় দুর্বলতম প্রতিযোগিটিকেও অবজ্ঞা করা চলে না। এখানে অবশ্যই এ কথাটুকু আমি উল্লেখ করবো যে প্রতিদিন আমরা রাত্রি ৯-৩০ টায় প্রতিযোগিতা শুরু করতাম আর শেষ করতাম পরদিন বিকেল ২-৩০ টায়। প্রত্যেক প্রতিযোগী অপর প্রতিযোগীর সঙ্গে একটি করে গেম খেলেছিলাম। যে-কদিন প্রতিযোগিতা

চলেছিল সে ক'দিন নজরুল ইসলাম ওয়ালীউল্লাহ্ লেনে এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে খেলার স্থান স্টেটসম্যান বিল্ডিং-এ যেতেন এবং মধ্য রাত্রিতে তাঁর গাড়ীতে করে আমার বাসায় পৌঁছিয়ে দিতেন। এখানে বলা আবশ্যক তিনি গাড়ী কিনবার পর পূর্বের ট্রামে চড়বার অভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন। বলাবাহুল্য রাত্রি দ্বিপ্রহরে কলকাতায় ট্রাম পাওয়া যায় না।

৪.

একবার এক ব্যাপার ঘটল। স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব দাবা খেলা পছন্দ করতেন। তিনি একদিন নজরুল ইসলামকে, আমাকে ও মিঃ আড্ডিকে নিয়ে তাঁর বাসায় যেতে বললেন আমাদের খেলা দেখবেন বলে। সুতরাং নজরুল ইসলাম মিঃ আড্ডিকে তাঁর নেবুতলা এ্যাভেনিউ (বউ বাজার)-এর বাড়ী থেকে এবং আমাকে তালতলা থেকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিলেন গোধূলি-সন্ধ্যায় ঢাকুরিয়া লেক এরিয়া থেকে অর্ধ-মাইল দূরে অবস্থিত শরৎচন্দ্রের শরৎচন্দ্র এ্যাভিনিউয়ের বাসায় পৌঁছলাম। আমরা দেখলাম বৃদ্ধ ঔপন্যাসিক একটি দাবার ছকের সামনে বসে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। আমরা এক মুহূর্ত দেরী না করে খেলায় বসে গেলাম এবং রাত্রি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একটানা খেললাম। গৃহকর্তা শরৎচন্দ্র ও নজরুল সারাক্ষণ বসে খেলা দেখছিলেন আর নজরুল ইসলাম ও অতিথি খেলোয়াড়দের প্রচুর পান ও চা জোগাচ্ছিলেন। খেলার ফলাফল হয়েছিল সমান সমান। খেলার পর পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী কিছু খানাপিনা হ'ল। তারপর নজরুল ইসলামের গাড়ীতে করে আমরা ঘরে ফিরে এলাম।

আড্ডি এবং আমি উভয়েই প্রায়ই নজরুলের বাড়ীতে যেতাম; এবং গৃহকর্তারও বাড়ীতে অবশ্য নির্দেশ দেওয়া থাকত যে, কবি বাড়ীতে উপস্থিত নেই, এমন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে যেন আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। ব্যাপার হ'ল অনাহূত আগন্তুকেরা এসে কবিকে বিরক্ত করতো বলে উদ্দেশ্যজনকভাবে তিনি তাঁর বাড়ীর প্রবেশ পথের উপর একটি "বাড়ী নেই" বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে রাখতেন। আমার মনে হয়, দাবা খেলোয়াড় হিসাবে নজরুল বড় জোর কলকাতার মাঝারি খেলোয়াড়দের সমান ছিলেন। সুতরাং ১৯২৫-এ কলকাতার দাবা প্রতিযোগিতায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, যদিও আমি ছাড়া অন্য একজন সাধারণ প্রতিযোগী থেকে অর্ধেক পয়েন্ট তিনি জিতে নেন।

৫.

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"-এর প্রথম বাৎসরিক সভার বিশিষ্ট সম্মানীয় অতিথি হিসাবে নজরুল ইসলাম আমন্ত্রিত হন— বিশেষ করে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে এবং "মুসলিম সহিত্যসমাজে"র তরুণ সদস্যদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে। গোয়ালন্দ থেকে লঞ্চে নারায়ণগঞ্জে আসার পথে "খোশ আমদেদ" (স্বাগতম) নামে উদ্বোধন সঙ্গীতটি তিনি রচনা করেন। করতালির মধ্য দিয়ে গানটি এইভাবে শুরু হয় :

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী!
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুইহাতে মোর মাখা যে কালি!!

এখানে নজরুল অতিথিদের যে-কথা বলে সম্বোধন করেন বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় প্রবাদ অনুযায়ী তার তাৎপর্য হ'ল একটি নতুন শিশুর বেহেশত থেকে দুনিয়ায়

আসা মানে এক অবিনশ্বর (অতীত) কাল থেকে অন্য অবিনশ্বর (ভবিষ্যৎ) কালে যাওয়ার পথ পরিক্রমামাত্র। ঢাকার প্রগতিশীল তরুণ-তরুণীদের প্রতি এটি ছিল তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। রাষ্ট্র অথবা আভিজাত্যের দ্বারা শোষিত নিষ্পিষ্ট সাধারণ মানুষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, মুক্ত ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার জন্য ভবিষ্যতের দিকে উন্নত আদর্শে বলীয়ান হয়ে কুসংস্কারকে পদদলিত করতে তাঁর এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। তরুণদের প্রশংসা করে এমন প্রাণমন মিশিয়ে আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে গানটি তিনি গাইলেন যে সমস্ত দর্শক তো বটেই এমন কি গানকে দু'চোখে যাঁরা দেখতে পারতেন না এমন দু'চারজন লোক, যাঁরা সভা পণ্ড করতে এসেছিলেন, তাঁরাও কথা ও সুরের মাদকতায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

৬.

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, উক্ত সভায় আমি "সঙ্গীতে মুসলমানের অবদান" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। অধিকাংশ দর্শকের মতে আমি নাকি একটা বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছিলাম। আমার সৌভাগ্য এই যে, আমাকে কোনো বিক্ষোভের সম্মুখীন হ'তে হয়নি। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট, যা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে, নজরুলের সঙ্গে কমপক্ষে তিনটি ব্যাপারে আমার সাধারণ মিল ছিল। প্রথমতঃ উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্যায়ে আমাদের জন্ম দ্বিতীয়তঃ দাবা খেলার প্রতি ঝোঁক এবং তৃতীয়তঃ সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্তি। যতটা মন পড়ে ১৯২৭ সালে নজরুল যখন ঢাকাতে আসেন তখন তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের একটি কক্ষের নীচের তলার পুর্বদিকের অর্ধাংশে আস্তানা গাড়েন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে উক্ত গৃহের বাসিন্দা ছিলেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বড় ডাইনিং হলে সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশন বসে। যা'হোক, সভাশেষে নজরুলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সাধারণ পরিচয় থেকে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ঢাকাতে সে যাত্রা তিনি তিনদিন অবস্থান করেন। ঐ সময় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার জগন্নাথ হলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কবি সেখানে তাঁর কতকগুলি জনপ্রিয় গান পরিবেশ করেন। যার একটি হল :

কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে?

৭.

১৯২৮ সালে সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনীতে তিনি আবার আমন্ত্রিত হন— তাঁর উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত ও বক্তৃতা দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত মার্চ সঙ্গীতটি গেয়েছিলেন—যার শুরুটা হল এমনি :

চল্ চল্ চল
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

এগিয়ে চলার এই অগ্ন্যুদ্দীপক আহ্বান বাঙালীর গোটা ইতিহাসকে পুনর্জাগরণের মন্ত্রে উদ্বোধিত করে তুলেছিল। সভাশেষে কবির নিকট আমন্ত্রণ এল বুড়িগঙ্গা তীরের [illegible]

রূপবাবুর বিশাল অট্টালিকা থেকে, পুরানো হাইকোর্টের অঙ্গনে অবস্থিত অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের গৃহ থেকে এবং আরও বহু বুদ্ধিজীবি কৃষ্টিবান নাগরিকদের কাছ থেকে, বিশেষ করে কবির কল্লোল-গোষ্ঠীর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে, যাঁদের মধ্যে প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

এই সময় নজরুল ইসলাম বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমী) নীচের তলায় আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতেন। আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসাবে তখন ওখানে বাস করছিলাম। এই সব নিমন্ত্রণে অধিকাংশ সময়েই আমি নজরুলের সঙ্গে যেতাম এবং তাঁর গান ও কথাবার্তা উপভোগ করতাম।

রূপবাবুর বাড়ীতে তিনি অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন কারণ ঐ সময় ঢাকার সকল অভিজাত ব্যক্তিরাই সেখানে জমা হয়েছিলেন।

গানটি হল :

বসিয়া নদী কূলে এলোচুলে কে উদাসিনী।
কে এলে পথ ভুলে এ অকূল বন-হরিণী ॥
কলসে জল ভরিয়া চায় করুণায় কুলবধূরা।
কেঁদে যায় ফুলে ফুলে পদমূলে সাঁঝ-তটিনী ॥
হারালি গোধুলি-লগনে, কবি কোন নদী কিনারে,
এ কি সেই স্বপন চাঁদ পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সঙ্গিণী।

বুড়িগঙ্গার বাড়ীতে ঐ গান প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এক আশ্চর্য সঙ্গতির সৃষ্টি করেছিল। আরও যে একটি গান তিনি গেয়েছিলেন সেটি হল :

জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্রহানি
হাঁকে নিপীড়িত জনমন মথিত বাণী
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
রে ঐ আগত ॥

এটা তাঁর কাব্যের একটি প্রধানতম বিষয় যা নজরুল ইসলামকে কাব্যরাজ্যের রাজসিংহাসনে বসিয়েছিল।

৮.

[ঢাকার ত্রয়ী : ১, নোটন; ২. রানু এবং ৩. লোটন]

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র একজন ভাল কবি ছিলেন। তিনি অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর সনেট ও গান লিখেছিলেন। খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে পারতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট ছাড়াও একজন চিত্রশিল্পী ও পিয়ানো-বাজিয়ে ছিলেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা কুমারী উমা মৈত্র ওরফে নোটন সেতার ও পিয়ানোর একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। সে সময় তিনি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এস. সি পরীক্ষায় পাশ করে বেরিয়ে এসেছেন এবং দাবা খেলায় মোটামুটি শিক্ষালাভ করেছেন। বলাবাহুল্য লন টেনিস খেলাতেও তিনি তখন চমৎকার পারদর্শিতা লাভ করেছেন। কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে জানি না তাঁকে বি. এ. কিংবা বি. এস. সি. পড়তে দেওয়া হয় নি, অথচ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ঠিক উল্টোদিকে অবস্থিত) ছিল কলেজ রোড নামক প্রধান সড়কের অপর পাশে।

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় এবং প্রফেসর সত্যেন বসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ) এই পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দিলীপ রায় যখ যখন কলকাতা থেকে ঢাকাতে আসতেন এবং নোটনকে শুধু ব্রহ্মসঙ্গীতই নয় তাঁর নিজের লেখা এক ধরনের উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতও শেখাতেন। মৈত্র পরিবারটি ছিল সবদিক দিয়ে উদার; এবং তাঁদের কাছে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন কথা ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের সুধীজনেরা তাঁদের বন্ধু ছিলেন. যেমন উদাহরণতঃ প্রফেসর সত্যেন বোস (একজন হিন্দু), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন (একজন মুসলমান), প্রফেসর বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি (অঙ্কের প্রফেসর, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চালু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বদলী হয়ে তিনি সেখানে যান) এবং শহরের অনেক গুণীজ্ঞানীজন অধ্যক্ষ মৈত্রের বাড়ীতে উদার অভ্যর্থনা পেতেন। পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও খেলাধূলা ও সঙ্গীতের প্রতি অধ্যক্ষ মৈত্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল. আমিও সময় সময় হাইকোর্টের অন্তর্গত অধ্যক্ষের পারিবারিক লনে আমার প্রফেসর বঙ্কিম বাবু, তাঁর ছেলে অজিত, অন্য একজন প্রফেসর সুরেন ঘোষ (পদার্থ বিদ্যা) এবং তাঁর দুই ছেলে তাবু ও টুকুর সঙ্গে টেনিস খেলতাম। দিলীপ রায় দাবা খেলতে ভালবাসতেন এবং তিনিও আমার একজন দাবা খেলার বন্ধুত্বে পরিণত হন। আমি নোটনকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলাম। দিলীপ রায়ও নোটনের সঙ্গে মাঝে মঝে দাবা খেলতেন। বিখ্যাত ওস্তাদ গুল মহম্মদ খান নোটনকে তিন-চার বছর ধরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখান। নোটন তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ সঙ্গীত গাইতেন এবং সাথে সাথে সেতারও বাজাতেন। তাঁর মাতাপিতা এই কুমারী কন্যাটিকে কতটা স্বাধীন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন উপরের বর্ণনাটি তারই মোটামুটি খসড়া।

১.

১৯২৮ সালে নজরুল যখন ঢাকায় আসেন প্রিন্সিপাল মৈত্র তাঁর গান শোনেন। একজন উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তিনি বুঝতে পারেন যে, নজরুলের গানের একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন অলংকার মীড়, গমক, বোঁদ, মূর্ছনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিব্যঞ্জনা সেতারে এবং কণ্ঠ সঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে নোটনকে সাহায্য করতে তিনি নিমন্ত্রিত নজরুলকে তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। নোটন সেতার বাজাতেন অপূর্ব সুরের দ্যোতনা ফুটিয়ে,— এবং নজরুল অর্গানের রিডে সুনিপুণ আঙ্গুলের মৃদু স্পর্শে সূক্ষ্মতম সুরের ব্যঞ্জনা, ফুটিয়ে,— নোটনের পক্ষে সেতারে যা ফোটানো সম্ভব হত না— কণ্ঠ মিলিয়ে গান করতেন, আর মিস্টার ও মিসেস মৈত্র সেই অপূর্ব সঙ্গীতের শিল্প সুষমার মাধুর্য তন্ময়চিত্তে উপভোগ করতেন। নজরুল যতদিন ঢাকায় ছিলেন তিনি নিয়মিত প্রতিদিন প্রায় দু'ঘণ্টা করে মনোরম সঙ্গীত চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। নজরুল জানতেন দিলীপ কুমারও নোটনকে তাঁর নিজস্ব ঢঙে বাংলা গানের কায়দা-কানুন শিখিয়েছেন। ঐসব গান ছিল খানিকটা টপ্পার ধাঁচে লেখা বিশেষ ধরনের ঠুংরী— শিক্ষকদের নোটের লিপিপিটি কিংবা "প্যাসেজে" এর দ্রুত লয়সম্পন্ন দিলীপকুমারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সংকল্প করেন নজরুল এবং সিদ্ধি লাভও করেন। তারা এই দুই সুপরিচিত সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীতজগতে সঙ্গীত শিক্ষাদানের কৌশলে পরস্পরের [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীটি যদি হতেন বিদগ্ধশিল্পী। কুমারী মৈত্র দিলীপের কাছে

ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং অভিজাত মহিলা। স্বভাবে তিনি ছিলেন খুবই শান্তশিষ্ট এবং যে-কোনো ওয়ার্ডস্বার্থের চোখে কাব্যপ্রেরণাদাত্রী আনন্দের নির্ঝরিণী— Phontom of delight. নজরুল তাঁর গানগুলিকে যে গভীর আবেগে মূর্ত করে তুলতেন তারই পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর "চক্রবাক" কাব্যের 'গানের আড়াল' কবিতায়

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—
এইটুকু শুধু রবে পরিচয়? আর সব অবসান?
অন্তরতলে অন্তরতর যে-ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয়?
হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয়ত কাহিনী কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আবার অহরহ রণ রণি,—
উপকূলে বসে শুনেছ সে-সুর, বোঝ নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে-সুর, দুলেছে দুল হয়ে শুধু কানে?
হায় ভেবে নাহি পাই—
যে-চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই
সাগরের সেই ফুলে ফুলে কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন?
সুরের আড়ালে মূর্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ?

১০.

কিন্তু নোটনের কাছ থেকে কোনো রকম সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নি। তাঁর মুখের অবে স্বীকৃতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন ফুটে উঠেনি কখনো। যেন দা ভিঞ্চির মোনালিসার মত তিনি ছিলেন সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক মূর্তিমতী রহস্য। কারও কারও হয়ত মনে হতে পারে উল্লিখিত কবিতাটি প্রতিভা সোম ওরফে রানুকে উপলক্ষ করে লেখা; কিন্তু আমার আদৌ-সন্দেহ নেই যে কবি তাঁর কাব্যপ্রেরণাদাত্রীর পরিচয়টিকে যথাসাধ্য গোপন করার চেষ্টা করেছেন। কেবল নোটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতার জন্য নির্বাক আবেদনের যতটা প্রয়োজন ছিল অন্যের বেলায় ততটা ছিল না। কেননা অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কবির স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশী।

রানুর সঙ্গে পরিচয়ের ভূমিকা-স্বরূপ শুধু এইটুকু বলতে পারি : রেণুকা সেন নাম্নী টিকাটুলির এক কুমারীর সঙ্গীত শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন দিলীপ রায়, গ্রামোফোন রেকর্ডে অতুলপ্রসাদ সেন লিখিত "পাগলা মনটারে তুই বাঁধ" গানটি গেয়ে তখন রেণুকা দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি দিলীপের শিক্ষকতার গুণে এই দুর্লভ খ্যাতিলাভ করেন। এই সময় "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক রসিক সজনীকান্ত দাস দিলীপ ও রেণুকার সম্বন্ধের বিকৃত রূপ দান করে দিলীপের নাম দিলেন "রেণুরে"। নজরুল তাঁর শিষ্যা রানুকে দিয়ে রেণুকার চেয়েও সুন্দরভাবে তাঁর স্বরচিত গান রেকর্ড করবার সংকল্প করেন। কারণ এমনিতেই রানুর কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুরেলা, চড়া পর্দাতেও তাঁর গান খুবই মিষ্টি শোনাত। [রানুর বাবা, মা, অধ্যক্ষ সুরেন মৈত্র, প্রফেসর সত্যেন বোস আমাদের বাসায় প্রায়ই আসা যাওয়া করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য প্রফেসর সত্যেন বোস কেবল একজন বিজ্ঞানাচার্য

বিজ্ঞানী ছিলেন না, একজন সুদক্ষ বেহালাবাদকও ছিলেন।] যা'হোক, গল্পে ফিরে আসা যাক, নজরুলের সঙ্গীত ভাণ্ডারে সুরের রাগরাগিনীর যত গভীর সূক্ষ্ম কলা-কৌশল ছিল রানুর কণ্ঠে তা তুলে দিতে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। এই উপযুক্ত শিক্ষার্থিনীটি তাঁর সকল বিখ্যাত গানকে সে সময় আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে রানুর কণ্ঠে নিম্নলিখিত গানটি (মিশ্র ভৈরবী ও আশাবরী) অপূর্ব দ্যোতনায় রূপলাভ করত :

কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুমবাগের গুল্‌বদনে ॥
*　　　*　　　*
সহসা জাগি আধেক রাতে শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে।
বাহু-সিথানে কেন কে জানে কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে ॥
বৃথাই গাঁথি কথার মালা লুকাস কবি বুকের জ্বালা
কাঁদে নিরালা বনশীওয়ালা তোরি উতালা বিরহী মনে ॥

তাঁর কণ্ঠে পিলুতে (কাহারা দাদরা) গাওয়া আরেকটি নজরুল-গীতি উল্লেখযোগ্য :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥
আগে মন করলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥
চকোরী দেখলে চাঁদে দূর হতে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে তেমনি জলে চলে বলাকা ॥
বকুলের তলায় দোদুল কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারি কোমরে বাঁকা ॥
তরুরা রিক্ত পাতা আসলো লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলের গলে ঝরেছে বলে ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥
ডালে তোর হান্‌লে আঘাত দিস রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ॥

১১.

এমন অবস্থায় 'শনিবারের চিঠি'র রসিক সম্পাদক সজনীকান্ত কেমন করে আর নীরব থাকেন? এই যে দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই— গভীর মনযোগের সঙ্গে নজরুল প্রতিদিন রানুকে সঙ্গীতের পাঠ দিয়ে চলেছেন, এতে সজনীর মত ব্যক্তির পক্ষে স্থির থাকা কেমন করে সম্ভবপর? একি দিলীপ রেণুকার সম্পর্কের চেয়ে আরও গায়ে জ্বালা ধরানোর মত মারাত্মক ব্যাপার নয়? এমনি জল্পনা-কল্পনায় উত্তেজিত হয়ে নজরুলকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি উপযুক্ত রকমের একটি প্যারোডি লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। যে-গানটির প্যারোডি লেখা হয় উপরে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে— "কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে"। সজনীকান্তের প্যারোডিটি এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কিন্তু প্যারোডিটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিণতির ফল শীগগীর পাওয়া গেল।

একদিন রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আমাদের অতিথি নজরুল ইসলামের জন্য আমরা বর্ধমান হাউসে অপেক্ষা করছিলাম। আরও আধঘন্টা খানেক পর আমরা সিঁড়িতে দ্রুত মনুষ্য পদধ্বনি

শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম নজরুল ইসলাম তাঁর ঘরে ঢুকছেন— হাতে তাঁর একটি নতুন লাঠি, গায়ের কুর্তায় রক্তের দাগ এবং শরীরে লাঠির আঘাতের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এবং কোনরকমে ক্ষতস্থানে পট্টিয়াদি লাগানোর পর তার কাছ থেকে নিম্নোক্ত ঘটনা শোনা গেল :

সোম মশায়ের বাড়ী থেকে আমি কেবল বেরিয়ে এসে পথে নেমেছি এমন সময় ৭/৮ জনের একটি যুবকের দল ছড়ি ও লাঠি নিয়ে হঠাৎ আমাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো। প্রথমটা আমি হকচকিয়ে গেলাম কিন্তু পর মুহূর্তেই একজনের হাত থেকে এই বেতের ছড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে কেমন করে আঘাত ফিরিয়ে দিতে হয় তা একটু তাদের বুঝিয়ে দিলাম। আমার কাছাকাছি যে দু'তিন জন ছিল ঐ হায়দরী ঘায়ের দু'চারটা খেয়ে সেখানেই ঘুরে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে এবং কাছের নবাবপুর স্ট্রীটের পাহারাদার পুলিশের আগমন ভয়ে তারা সব দ্রুত পালিয়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল বনগ্রাম লেনে। এই গলির উপরেই ছিল সোম মশায়ের বাড়ী। স্থানীয় হিন্দু-যুবকেরা সজনীকান্তের প্যারোডিটি সম্ভবতঃ পড়েছিল। এতে তাদের মনে সন্দেহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। তারা একটা কেলেঙ্কারীর কথা আঁচ করে তার একটা বিহিত করার চেষ্টা করেছিল। রানু হিন্দুর মেয়ে আর নজরুল মুসলমানের ছেলে। সুতরাং তাদের হিন্দু-রক্ত এই সম্পর্কটিকে একেবারে সহ্য করতে পারছিল না। এ যেন ছিল তাদের পৌরুষের উপর আঘাত।

যা'হোক ঐ গল্পের ঐখানেই শেষ। এর দু'একদিন পরে নজরুল আমাকে তাঁর সেই ঐতিহাসিক ছড়িটা উপহার দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। আট ন'বছর যাবৎ ছড়িটা আমার সঙ্গেই ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাঁচী থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত লোহার দাগা নামক এক জায়গায় আমার ঢাকা কলেজের সহপাঠী রুক্মিনীর বাড়ীতে এক সাপ মারতে গিয়ে ছড়িটি ভেঙ্গে যায়। ঘরের মেঝেতে শুয়ে আমরা দুই বন্ধু ঘুমাচ্ছিলাম এমন সময় সাপটি আমাদের দু'জনের উপর দিয়ে চলে যায়। রুক্মিনী আমাকে জাগিয়ে দিয়েছিল; ঝক ঝকে মেঝের উপর শুয়ে থাকা সাপটিকে মারা আমার পক্ষে তেমন কঠিন হয় নি।

১২.

যতদূর মনে পড়ে ১৯২৮ সালে নজরুলের দ্বিতীয়বার ঢাকা আগমনে কুমারী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় নিয়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। ফজিলাতুন্নেসা অসামান্যা সুন্দরীও ছিলেন না অথবা বীণানিন্দিত মঞ্জুভাষিণী'ও ছিলেন না। ছিলেন অঙ্কের এম.এ. এবং একজন উঁচুদরের বাকপটু মেয়ে। তিনি আমার বান্ধবী ছিলেন এবং আমার কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন যে কবি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ। আমাকে তিনি কবির কাছে তাঁর হাতের রেখা দেখাবার জন্যে অনুরোধ করেন। যথারীতি একদিন কবিকে নিয়ে হাসিনা মঞ্জিলের কাছে দেওয়ান বাজার রাস্তার উল্টোদিকে অবস্থিত ফজিলাতুন্নেসার গৃহে আমি উপনীত হই। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কবি ফজিলাতুন্নেসার হাতের মস্তিষ্করেখা, জীবনরেখা, হৃদয়রেখা, সংলগ্ন ক্ষুদ্র রেখাসমূহ এবং সেইসঙ্গে ক্রস, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সমন্বিত অন্যান্য মাউন্ট, শুক্র, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল ও চন্দ্রের অবস্থানগুলো নিরীক্ষণ করলেন; কিন্তু এগুলোর সম্বন্ধ-সূত্রের ফলাফল নির্ণয় করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি একজন জ্যোতিষীর মত সূর্য-

চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তারকার অবস্থান টুকে নিলেন এবং রাত্রিতে তিনি বিশদভাবে এটা নিয়ে পরীক্ষা করবেন বলে জানালেন। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ফিরে এলাম। রাত্রে খাবার পর প্রতিদিনকার অভ্যাসমত আমরা শুতে গেলাম। তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হওয়ার আগে জেগে উঠে দেখলাম নজরুল নেই। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম নজরুল কোথায় যেতে পারে। সকালে নাস্তার সময় তিনি ফিরে এলেন এবং তাঁর অমনভাবে অদৃশ্য হওয়ার কারণ বললেন :

রাত্রে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন জ্যোতির্ময়ী নারী তাকে অনুসরণ করার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু জেগে উঠে সেই দেবীর পরিবর্তে একটি অস্পষ্ট হলুদ আলোর রশ্মি দেখলাম। আলোটা আমাকে যেন ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে, আমার সামনে সামনে এগিয়ে চলছিল। আমি বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে কিছুটা অভিভূত হয়ে সেই আলোকরেখার অনুসরণ করছিলাম। মিস ফজিলাতুন্নেসার গৃহের কাছে না পৌছান পর্যন্ত আলোটা আমার সামনে চলছিল। তাঁর বাড়ীর কাছে পৌঁছতেই আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দেখলাম একটি ঘরের মধ্যে তখনও একটি মোমের বাতি জ্বলছে। রাস্তার ধারের জানালার কাছে সম্ভবতঃ পথিকের পায়ের শব্দ শুনে গৃহকর্ত্রী এগিয়ে এসে ঘরের প্রবেশ-দরোজা খুলে দিলেন এবং মিস ফজিলাতুন্নেসার শয়ন-ঘরের দিকে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ফজিলাতুন্নেসা তাঁর ঘরের দরোজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। কুমারী নেসা তাঁর শয্যার উপর গিয়ে বসলেন আর আমি তাঁর সামনে একটি চেয়ারে বসে তাঁর কাছে প্রেম যাচ্ঞা করলাম, তিনি দৃঢ়ভাবে আমার প্রণয় নিবেদন অগ্রাহ্য করলেন।

এই হচ্ছে সামগ্রিক ঘটনা— একে মানসচক্ষে নিয়ে আসা কিংবা এর রহস্যোদ্‌ঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন। সূর্য উঠার পর কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : ঐ ঘটনার পর নিরতিশয় ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি; তাই ভোর বেলা রমনা লেকের ধারে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিলাম।

এটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। কেননা নজরুল রমনার লেক ভালবাসতেন এবং লেকের ধারে সাপের আস্তানা আছে জেনেও সেখানে ভ্রমণ করতে যাওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আরও একটি বিস্ময়ের ব্যাপার তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঐদিন দুপুরে লক্ষ করলাম ফজিলতের গলার লম্বা মটর-মালার হারটা ছিড়ে দু' খান হয়ে গিয়েছে। পরে সেটা সোনারুর দোকান থেকে সারিয়ে আনতে হয়েছিল। অত্যন্ত কাছ থেকে জোরাজুরি ছাড়া এমন একটা কাণ্ড কেমন করে ঘটতে পারে আমার পক্ষে তা বুঝে উঠা মুশকিল। নজরুল ইসলাম আমার কাছে ও ফজিলাতুন্নেসার কাছে যেসব দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় এমন অঘটন কিছু ঘটেছিল যাতে ফজিলতের হৃদয় তিনি জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঐসব চিঠিপত্রে নজরুলের হৃদয়ের গভীর হাহাকার ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে নোটনের ব্যাপারে যেমনটি ঘটেছিল ফজিলতের ব্যাপারেও ঠিক তাই-ই ঘটেছিল।

১৩.

কুমারী ফজিলাতুন্নেসার বিলাত গমন উপলক্ষে নজরুল "বর্ষা-বিদায়" নামক একটি কবিতা লেখেন। তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কিন্তু কবিতাটি এমন নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখা যে অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে এর যথার্থ কিংবা রূপকের রহস্যভেদ

করা কঠিন। তাঁরা শুধু দেখবেন প্রকৃতি কিভাবে বর্ষা ঋতু থেকে শীত ঋতুতে রূপ পরিবর্তন করছে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে তিনি তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে চেতনাশ্রিত কল্পনায় এমনভাবে জারিত করে নিয়েছিলেন যা থেকে তিনি মুক্তোর মত এমন কতকগুলো কবিতা রচনা করেন যা তাঁর অনুভূতিকে বিশ্বচারিত্র্য দান করেছে। অসাধারণ ক্ষমতাবান কবি ছাড়া বক্তব্য বিষয়কে এমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি কবিতাটির নির্বাচিত কয়েকটি পংক্তি এখানে তুলে দিলাম :

ওগো বাদলের পরী।
যাবে কোন দূরে ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী
ওগো ও ক্ষণিকা পূব অভিসার ফুরাল কি আজি তব?
পহিল ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন দেশ অভিনব?
তোমার কপোলে পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেনু।
ওগো ও কাজল মেয়ে—
উদাস আকাশ ছল ছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।
কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।
ওগো ও জলের দেশের কন্যা! তব ও বিদায় পথে
কাননে কাননে কদম কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে।
তুমি চলে যাবে দূরে—
ভাদরের নদী দু'কূল ছাপায়ে কাঁদে ছল ছল সুরে!
যাবে যবে দূর হিমগিরি শিরে, ওগো বাদলের পরী
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহাকেও স্মরি।
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার নির্মম শুভ্রতা,—
কে জানে কী ভালো বিধুর ব্যথা— না মধুর পবিত্রতা।
সেথা রবে তুমি ধেয়ানমগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি "ফটিকজল"।

১৪.

বাদলের পরীর সঙ্গে আর একটি কবিতার যে অনেকখানি মিল আছে সে কথাটি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই কবিতাটিও ফজিলাতুন্নেসার বিলাত গমন উপলক্ষে রচিত। কবিতাটি এমনি :

জাগিলে "পারুল" কি গো "সাতভাই চম্পা" ডাকে।
উদিলে চন্দ্রলেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে।
চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যেথায়
জীবনের ফুল্ল-শাখে।
আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,

জাগিছে বন্দিনীরা টুটে ঐ বন্ধকারা!
থেকোনা স্বর্গে ভুলে—
এ পারের মর্ত্য কূলে
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে ॥

এই কবিতাটিতে নজরুল তাঁর মনের ভাব গোপন করেন নি, ফজিলাতুন্নেসাকে ফিরে আসার জন্য সরাসরি আবেদন করেছেন। কিন্তু আরও একটি কবিতায় এবং 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর অনেকগুলি কবিতায় কবি তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতিকে বিভিন্ন অলঙ্কার ও রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করেছেন। ফজিলতের প্রতি নজরুলের অনুভূতির তীব্রতা দু'তিন বছরের সময়-সীমায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। সমান্তরাল আর একটি স্তবকে লক্ষ করা যায় কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রেমকে সুন্দরতর আর এক জগতে খুঁজে ফিরছেন যেখানে প্রেমে কোনো নৈরাশ্য নেই, কোনো বেদনা নেই। প্রেমের জন্যে নারীর কাছ থেকে তিনি চেয়েছিলেন পূর্ণ আত্মসমর্পণ কিন্তু কোথাও তিনি তা পান নি। ফলে ধীরে ধীরে তিনি খোদা-প্রেমের দিকে ঝুঁকে পড়লেন :

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও ॥
এ জনমে যাহা বলা হল না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও ॥
হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা ভরা হেথা অমিয় ॥
হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি',
মিলনে হারাই দু'দিনেতে ভুলি',
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়—
সেই অমরায় মোরে স্মরিও ॥

স্বভাবতই, প্রেমের এই বিশ্বাসহীনতা ও ক্ষণস্থায়িত্বের অভিজ্ঞতা কবিকে পার্থিব প্রেমের প্রতি নিরাসক্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি অমর এক প্রেমের জগতে আত্মার শান্তি খুঁজে ফিরছিলেন; যেখানে প্রেম কখনও বিচ্ছেদের জ্বালায় কলুষিত হয়ে ওঠে না— শাশ্বত মিলনের আনন্দই যেখানে সদা প্রবাহিত।

১৫.

১৯৩০ সালে কবিকে বাঙালী জাতির তরফ থেকে কলকাতা এলবার্ট হলে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভায় বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতিত্ব করেন। অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন ব্যারিস্টার এস, ওয়াজেদ আলী এবং কনিষ্ঠতম রাজনৈতিক

নেতা সুভাষচন্দ্র বোস, যিনি আই. সি. এস. হলেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন নি; প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন। আমি দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।

১৯৩১ সালের দিকে নজরুল সিনেমা ও থিয়েটার জগতে প্রবেশ করেন। আমার মনে আছে ঐ সময় যখনই আমি কলকাতায় গিয়েছি তখনই নজরুল আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য টিকেটের ব্যবস্থা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও অভিনয়ে অংশ নিতেন— যেমন 'ধূপছায়া' ছায়াছবিতে তিনি বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

এই সময় ঠুংরী সম্রাট ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের মৃত্যু হলে গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে হেড কম্পোজার ও সঙ্গীত শিল্পীদের ট্রেনার হিসাবে নিযুক্ত করেন। অনেক দফা নজরুল ইসলাম আমাকে সঙ্গে নিয়ে দমদম রেকর্ডিং অফিসে গিয়েছেন। সেখানে আমি কবিকে আঙুরবালা, ইন্দুবালা, আশ্চর্যময়ী, বেদানাদাসী, কমলা ঝরিয়া, কাননবালা (পরবর্তীকালে কাননদেবী), কানা কেষ্ট (কৃষ্ণচন্দ্র দে), কে, মল্লিক (মুহম্মদ কাসেম)-এর মত প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিল্পীদেরকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে এবং তদারক করতে দেখেছি। রেকর্ডিং-এর জন্য শিল্পীদের নিয়ে প্রাথমিক রিহার্সাল তিনি কখনো তাঁর নিজের বাসায় অথবা ১০৬ আপার চিৎপুর রোডে সমাধা করতেন।

এর থেকে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে "নজরুল কি এত উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন যে ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খানের স্থলে ঐসব নামজাদা অভিজ্ঞ শিল্পীদের সঙ্গীত শিক্ষাদানের তিনি উপযুক্ত?" উত্তর হল : নজরুলের সঙ্গীতের মান প্রশ্নাতীতভাবে সুন্দর এবং যখন তিনি করাচীতে ৪৯নং বাঙালী পল্টনে সৈনিকতা করছেন তখন একজন সুদক্ষ বংশীবাদক বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। ঐ করাচীর পল্টন জীবনে তিনি একজন পশ্চিমা ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখেছিলেন। আমি তাঁকে ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছেও সঙ্গীতের পাঠ নিতে দেখেছি। মঞ্জু সাহেব মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন, পরবর্তীকালে কলকাতার এন্টালীতে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। নজরুল তখন পানবাগান লেনে ঐ একই জায়গায় বাস করতেন। এরপরে তিনি মেটিয়া বুরুজের ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান এবং পরে মহান ওস্তাদ কৈয়াজ খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবী কৈয়াজ খাঁ তখন কলকাতায় এসে বাস করছিলেন।

ঢাকাতে ১৯২৭।২৮-এর দিকে একবার নজরুলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঢাকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদদের (যাদের মধ্যে খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পায় অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ আমাদের ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীও ছিলেন) সঙ্গে তুলনা করলে সঙ্গীত জগতে আপনার স্থান কোথায় হতে পারে বলে আপনি মনে করেন। নজরুল তখন এই বলে উত্তর দেন : আপনার ওস্তাদজী সঙ্গীতে বি. এ. এবং আমি সম্ভবতঃ একজন ম্যাট্রিক কিংবা বড় জোর আই. এ.। অন্যান্য ওস্তাদদের মত মোহাম্মদ হোসেনের তাল, লয় এবং বিশুদ্ধ রাগের উপর পুরোপুরি দখল আছে। অতি সহজে বাদী সম্বাদী থেকে ঔড়ব, খাড়ব এবং সম্পূর্ণ রাগাদি প্রদর্শনে তাদের আরোহণ ও অবরোহণে তাঁর ঐতিহ্যগত স্বাভাবিক ক্ষমতা তর্কাতীতভাবে সুন্দর, কিন্তু আমার এমন কতকগুলো মৌলিকতা আছে যা সঙ্গীত শাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রীধারী এইসব ওস্তাদেরা তার ধারে কাছেও কোনোদিন পৌঁছতে পারবেন না। এইসব ওস্তাদেরা গানের অর্থ, ভাব এবং আবেগকে শ্রদ্ধা করেন না এবং সে জন্যেই প্রয়োজনবোধে যেখানে বিশেষভাবে কাব্যিক শৈল্পিক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন হয়, আন্তরিকতার সুযোগে সঙ্গীতকে সর্বপ্লাবী

করার দরকার হয়, সেখানে তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাঁরা মনে করেন রাগের কাঠামোর বাইরে শিল্পীর কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমি এমন কিছু স্বাধীনতার প্রশ্রয় দিই যাতে গানটি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। গানের অন্তরানুভূতি শারীরিক রূপলাভ করে।

আমার মনে হয় কবির এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে সত্য এবং যথার্থ। ঐ একই প্রশ্ন আমি কবির ব্যাপারে আমার ওস্তাদজীকে (যাঁর কাছে আমি দু'বছর ধরে কণ্ঠসঙ্গীত শিখেছিলাম এবং পরে যিনি আমাকে তিনবছর ধরে সেতারের গোপন রহস্য শিখবার পরামর্শ দিয়েছিলেন) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন : কবি নজরুলের কণ্ঠ তেমন উচ্চাঙ্গের কিংবা সুরেলা নয়। তবে তাঁর কণ্ঠ বেশ জোরালো পৌরুষময় (বুলন্দ)। তাছাড়া তাঁর গলায় অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কতকগুলো কাজ ফুটে উঠতে দেখা যায় যার সঙ্গে আমার আদৌ পরিচয় নেই। যদিও সঙ্গীতের মহত্তম শিল্পীরা এই ধরনের কলাকৌশল কখনও কখনও দেখিয়ে থাকেন; তবু তারা আবার মূল রাগের কাঠামোর মধ্যে ফিরে আসেন। বলাবাহুল্য রাগের এই রস কিংবো আত্মার উপর অসাধারণ দখল ছাড়া এমনটি করা কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। মোটকথা তিনি তাঁর পথে চলেন আর আমরা চলি আমাদের পথে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদেরা সাধারণতঃ এইভাবে কাউকে স্বীকৃতি দেন না। সুতরাং আমার ওস্তাদ যে এই ঔদার্য দেখালেন সেজন্য তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এই প্রসঙ্গে বলা অকারণ হবে না মোহিনী সেনগুপ্তা নাম্নী রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপিকার একজন মহিলা নজরুলের পরম হিতৈষিণী ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে নজরুলকে ধ্রুপদ গানে কিভাবে অস্থায়ী অন্তরা আভোগ ও সঞ্চারী বিন্যস্ত করতে হয় তারই শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করতে এবং ঐগুলো পৃথক পৃথক সঙ্গীতের পৃথক পৃথক স্থান এবং পংক্তিতে কিভাবে সন্নিবেশিত হবে এবং "ন্যাসস্বর" ও "গ্রহস্বর"-এর ভূমিকা গানে কতটা সে-বিষয়ে পরামর্শ ও জ্ঞানদান করেন। সঙ্গীতের এই আঙ্গিকগত কলা-কৌশল শিখবার পরামর্শ নজরুলকে অনুপ্রাণিত করে এবং গভীরভাবে সেগুলো অনুশীলন ও শিক্ষালাভে কৌতূহলী করে তোলে। ফলে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে পরবর্তীকালে ঐগুলি শিখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেন। যদিও একথা সত্যি যে নজরুল অবিকলভাবে একাধারে সঙ্গীতের কোনো বিশেষ ধারা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চর্চা করেন নি; কিন্তু সঙ্গীতের সূত্রগুলো তাঁর অসাধারণ প্রতিভার আগুনে তিনি শোষণ করে নিতে পারতেন এবং অসঙ্গতিপূর্ণ খণ্ডগুলিকে শিল্পীসুলভ আশ্চর্য ক্ষমতাবলে জোড়া লাগাতে সক্ষম হতেন। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিনয় করে তিনি নিজেকে সঙ্গীত-জগতে ম্যাট্রিক ও আই. এ-এর স্তরে পড়ি বললেও পরবর্তীকালে আরও অধিক শিক্ষা, সাধনা ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা এবং তাঁর জন্মসূত্রে অর্জিত সঙ্গীত-প্রতিভার এম. এ ডিগ্রীর বদৌলতে তিনি তাঁর সমসকার সকল গুণী, বি. এ পাশ করা, কণ্ঠসঙ্গীতের ওস্তাদদের সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দমদম এবং চিৎপুর রোডের রিহার্সাল-রুমে শিল্পীরা যখন কোনো গান গাইতেন কবি তখন সেই গান অনুসরণ করে বৃদ্ধের হাতের কাছে যেটাই থাকতো, হারমোনিয়াম কিংবা অর্গান, সেটাই বাজাতেন এবং শিল্পীদের গাওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটিবিচ্যুতি হলে গানের ভাব, ভাষা ও সুর অনুযায়ী গানের শিল্পরূপটি যথাযথ না ফুটলে তিনি হাত তুলে শিল্পীদের থামবার ইশারা করতেন এবং স্বকণ্ঠে গেয়ে সেই স্থানটা সংশোধন করে দিতেন। এবং যেমনটা স্বাভাবিক, তার ব্যাখ্যা একটাই নিশ্চয় হত' যে পণ্ডিতেরা সেটাই অনুমোদন করতেন এবং তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে

গাইতেন। এইভাবে তাঁর গানকে যাঁরা কণ্ঠে তুলতেন তাঁরা বারংবার একটি গানকে সার্থকভাবে রূপায়িত না করা পর্যন্ত গেয়ে চলতেন। অবশ্য, বেদানা দাসী, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া এবং কানন দেবী নজরুলের গায়কীটা যত তাড়াতাড়ি ধরতে পারতেন আঙুরবালা, আশ্চর্যময়ী, কানাকেষ্ট, কে. মল্লিক, আব্বাসউদ্দীন এবং অন্যদের পক্ষে তা ধরতে একটু দেরী হ'ত। কেননা, আপন-আপন গাইবার ভঙ্গী ও একঘেঁয়ে অভ্যাস তাঁদের পক্ষে ত্যাগ করা কঠিন হ'ত বলে নজরুলের যথাযথ প্রকাশভঙ্গিটা তাঁদের পক্ষে কব্জায় আনা সহজ হ'ত না।

১৬.

আব্বাসউদ্দীন, প্রতিভা সোম এবং আরও অনেকে নবীন প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠশিল্পীরা সঙ্গীতের পাঠ নিতে নজরুলের বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। নজরুল এজন্য মোটেই বিরক্ত হতেন না, তাঁদের সবাইকে বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্য করতেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, নজরুল তাঁর কতকগুলো বাছাই করা গানের গ্রামোফোন ও জেনোফোনের রেকর্ড (এক ডজনের বেশী) কুমারী ফজিলাতুন্নেসাকে উপহার দিয়েছিলেন; আমাকেও হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের খান পাঁচেক রেকর্ড দিয়েছিলেন।

বলাবহুল্য যে-গতিতে নজরুল একটি নতুন গান লিখে শেষ করতেন সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটা এমনি বিস্ময়কর। হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রথমে তিনি বিষয় ছাড়াই একটি রাগের সম্পূর্ণ কাঠামোটা তৈরী করে নিতেন তারপর যে যে শব্দ ঐ সুরের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাপ খায় তেমনি বাছাই করা উত্তম সুরের সাহায্যে তিনি গানটি রচনা করতেন। নজরুল হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গানটি গাইতে থাকতেন আর গ্রামোফোন কোম্পানীর স্ক্রিপ্ট লেখকেরা সেটা দ্রুতগতিতে লিখে নিতেন, অথবা কবি নিজেই গাইতেন এবং লিখতেন। এইভাবে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটি রাগের কাঠামোর প্রতটি অঙ্গের আকার অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর পংক্তিগুলি রূপায়িত হয়ে উঠতো একটি সম্পূর্ণ গানের শরীরে। ১৪ নং ওয়েলেসলি স্ট্রীটে অবস্থিত "সওগাত" অফিসে কবি অনেক সময় প্রতিশ্রুত সময়ে তাঁর লেখা লিখতে না পারলে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন ঘরে আটকে লেখা আদায় করতেন। দেখা যেত আধঘণ্টা একঘণ্টার মধ্যে লেখক অতি মনোরম আবেগসমৃদ্ধ প্রবন্ধ কিংবা কবিতা লিখে দিয়েছেন।

তরুণ অথবা তরুণী লেখক-লেখিকাদের নজরুল সাহিত্যকর্মের জন্য উৎসাহ জোগাতেন। কখনও তাঁদের লেখা প্রয়োজনমত সংশোধন করে দিতেন অথবা কাউকে লক্ষ করে ছোট্ট একটি কবিতা লিখে তাঁকে প্রেরণা যোগাতেন। এইসব তরুণ-তরুণীর মধ্যে যাঁদের নাম সহজে মনে আসে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : হাবিবুল্লাহ বাহার, শামসুন্নাহার, সুফিয়া এন. হোসেন (পরবর্তীকালে সুফিয়া কামাল), দক্ষিণ-কলকাতার মেটিয়া ব্রুজের জাহানারা বেগম, ফরিদপুরের সুফী মোতাহার হোসেন, কবি আবদুল কাদির (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র)। হাবিবুল্লাহ বাহার ছিলেন নজরুলের বন্ধু এবং ইডেনগার্ডেন ও গড়ের মাঠের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা দেখার সঙ্গী। সুফিয়া কামাল ও শামসুন্নাহার আমাদের বিখ্যাত লেখিকাদ্বয়; জাহানারা বেগম ছিলেন "বর্ষবাণী" নামক বার্ষিক সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদিকা; সুফী মোতাহার হোসেন হলেন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও নজরুল ইসলাম প্রশংসিত বিখ্যাত সনেটকার আবদুল কাদির "দিলরুবা" ও "উত্তর বসন্ত" কাব্যযুগলের কবি

এবং নজরুল "নজরুল রচনাবলী" ও "নজরুল রচনা-সম্ভারে"র বিখ্যাত সম্পাদক। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নজরুল নিরাময় সমিতির উৎসাহী সদস্য কবি আবদুল কাদির নজরুল সাহায্য তহবিল থেকে কিছু টাকা নিয়ে কলকাতায় কবিকে দেখতে যান নজরুলের চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করতে। ফিরে এসে তিনি জানিয়েছিলেন নজরুল নাকি কয়েকবার 'মোতাহার' 'মোতাহার' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। যদিও তখন নজরুল সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট। তবু তাঁর অবচেতন মনে হয়ত আজও কয়েকজন বন্ধুর নাম সাঁতরিয়ে ফেরে।

১৭.

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যকার সম্পর্কটি ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ছিল না, ছিল কিছুটা গুরু-শিষ্যের মত এবং তা' শুধু কাব্য ও সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয় সঙ্গীত ও সুরের রাজ্যেও। রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে কতটা স্নেহের চোখে দেখতেন তা "ধূমকেতু"কে আশীর্বাদ করে লেখা তাঁর কবিতা পংক্তিসমূহে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট :

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু!
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।

শুধু এই কবিতায় নয়। নজরুল যখন পুনরায় ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে স্বরাজ পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত "লাঙলে"র সম্পাদনার ভার নেন তখনও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহমূলক এই আশীর্বাণীটি পাঠান :

জাগো, জাগো বলরাম ধরো তব মরু-ভাঙা হল
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল।

অনশন ধর্মঘট ত্যাগ করাতে হুগলী জেলে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে "অনশন ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়" বলে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার থেকে বোঝা যায়— বাংলা সাহিত্যের কাব্য-গগনে উদিত এই নতুন নক্ষত্রটির জন্যে তাঁর কী গভীর উৎকণ্ঠা ছিল। নজরুল সেই স্নেহের প্রতিদানে রবীন্দ্রনাথকে "গুরুদেব" সম্বোধন করে তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন যে দেশের সবাই যখন তাঁকে পরিহাস করছিলেন রবীন্দ্রনাথই তখন তাঁকে যথার্থ বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথম যৌবনে নজরুল রবীন্দ্রনাথের গানকে সবকিছুর উপর স্থান দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ নজরুলই আমাকে প্রথম কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গান শেখান। তার প্রথমটি হল :

কে যেন আমারে এনেছে ডাকিয়া এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দু'টি পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না এসেছি ভুলে।

দ্বিতীয় গানটি হল :

তোরা পারবি নাকি যোগ দিতে সেই ছন্দেরে
খসে যাবার ভেসে যাবার মরবারই আনন্দে রে ॥

এই দুটি সুপরিচিত গান ছাড়াও "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্য" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের আরও অনেক গান নজরুল গাইতেন। সুতরাং এই দুই দৈত্যতুল্য সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীত-রচয়িতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর আমার পক্ষে সেটা বলা নাজুক ব্যাপার।

১৮.

রবীন্দ্রনাথ প্রায় হাজার তিনেক গান লিখেছেন। অপরদিকে নজরুল গ্রামোফোন রেকর্ডের গান নিয়ে প্রায় চার হাজারের মত গান লিখেছেন। দু'জনের সব গানই প্রথম শ্রেণীর নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শিল্পের খাতিরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে লিখেছেন আর নজরুল অধিকাংশ গান লিখেছেন জীবিকা নির্বাহের দায়ে পড়ে। তাই বলে নজরুলের গানগুলিতে তাঁর সমস্ত হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি শিল্প-সুষমা ফুটে উঠে নি, বলা চলে না। সঙ্গীতের গোটা পরিধির মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটতে বাধ্য যদি পর্যায়ক্রমে চিন্তা ধারার পরিবর্তন না ঘটে। যেমন ধরুন আপনি কেবল বসন্তের সৌন্দর্য নিয়ে যদি অবিরাম লেখেন তো বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটবে। যদি রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুল দশটি কবিতা লেখেন তা হ'লে চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তি হবেই– প্রতটি কবিতার আঙ্গিকগত ভিন্নতাসত্ত্বেও। পাঠক ও শ্রোতার কল্পনাকে আকর্ষণ করতে পারে এমন নন্দনতাত্ত্বিক প্রকাশ ভঙ্গিমাই কাব্যালোচনার মৌল বিষয়। জীবনের প্রথম পনর বছর বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ ৬৫ বছর সাহিত্যসাধনা করেছেন। এই পরিমাপ অনুযায়ী নজরুলের সাহিত্যজীবন মাত্র ২৬ বৎসরের যা রবীন্দ্র-সাহিত্য-জীবনের পাঁচ ভাগের দুইভাগ মাত্র। যদি শুধু সঙ্গীতের বিষয় ধরা যায় তাহলে বলতে হবে নজরুলের সৃষ্টি ক্ষমতা অনেক বেশী। দেখে মনে হয় তিনি তাঁর বংশধরদের জন্য তাঁর পক্ষে যতটা দেওয়া সম্ভব তা উজাড় করে দিয়ে গেছেন। যদি উভয়ের সঙ্গীতের গুণগত দিকের বিচার করতে হয় তাহলে উভয়ের জীবনের বাল্য ও কৈশোর জীবনের অর্থাৎ পনর বছরে পৌঁছা পর্যন্ত প্রাথমিক জীবনের পরিবেশের কথা উল্লেখ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, নিধু বাবু (বিখ্যাত টপ্পার স্রষ্টা), রামপ্রসাদ ও রজনীকান্তের সঙ্গীতের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে তাঁদের প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গীতকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব সুমার্জিত ও উৎকৃষ্ট করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অন্যদিকে নজরুল রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সমৃদ্ধ তৈরী বাংলা ভাষা পেয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরী ওস্তাদদের রাগের কাঠামোকে ভেঙে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছিলেন, পূর্ববর্তীদের গায়কী ঢঙ বদলে দিয়ে ছন্দ বজায় রেখে রক্ষণশীল ঐতিহ্যগত ধ্বনি ও মাত্রার পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এতে গায়কেরা রাগের ওস্তাদী রক্ষণশীলতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গানগাইবার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ, সঙ্গীতের স্বীকৃত চারটি আঙ্গিক ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পার (তাদের বৈচিত্র্যসহ) সঙ্গে তিনি আরও একটি নতুন ঢঙ সংযুক্ত করেছিলেন। সঙ্গীতের এই নতুন ঢঙটি "রবীন্দ্র সঙ্গীত"। এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তিনি ধ্রুপদ ও খেয়ালের গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলেন। সংক্ষেপে ব্রহ্ম-সঙ্গীত, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি রাগের চারিত্রিক পরিবর্তন না ঘটলেও একটি রাগের সংহতি থেকে ক্রমান্বয়ে ভাবের মুক্তি ঘটলো। অন্য কথায় বলা যেতে পারে দু'তিনটি রাগকে তিনি একত্রে মিশ্রিত করেছিলেন

যাদের নতুন নাম হল 'সঙ্কর' রাগ ও রাগিণী। উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি বিদেশী সুরেরও মিশ্রণ ঘটান। বাংলা সঙ্গীতে এ-ছিল একটি অভিনব সাহসী পদক্ষেপ, স্বাস্থ্যকর অবদান।

১৯.

মহান রবীন্দ্রনাথের কাছে যে নজরুল ঋণী সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। ঐতিহ্যসূত্রে তিনি যা পেয়েছিলেন সেগুলোকে আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সঙ্গীতে যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন তার থেকে আরও এগিয়ে গেলেন তিনি। সংস্কৃত শব্দপ্রাচুর্যে শৃঙ্খলিত বাংলা ভাষাকে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ সহজবোধ্য ভাষায় রূপান্তরিত করেন— যে ভাষা হিন্দী, ফার্সী, আরবী, পর্তুগীজ, প্রাকৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা থেকে আহরিত শব্দে নির্মিত ভাষা হিসেবে জনগণের ভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। নজরুল ইসলাম বিপুল সাহসের সঙ্গে নতুন নতুন আরবী-ফার্সী ও অন্য বিদেশী শব্দ— যা বাংলা ভাষার সঙ্গে অশ্রাব্য না হয়ে মিশতে পারে— ব্যবহার করেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি হয়ত কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন; কিন্তু এ-কথাও ঠিক ঐ শব্দগুলোই আবার পরিবর্তিত হয়ে আগামী ৪০/৫০ বছরের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে— বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে। নজরুল ইসলাম যে-সব শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশই ১৮শ শতাব্দীর পুঁথি-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু খ্রীস্টান মিশনারীদের সহযোগিতায় উন্নাসিক সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে অতি চাতুর্যের সঙ্গে মৌখিক ভাষাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কৃত্রিম সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। নজরুল ইসলামের প্রকৃত কৃতিত্ব বিদ্বেষবশতঃ বিবর্জিত বিদেশী শব্দকে বাংলা সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

বাংলাগানে নজরুল গজলকে জনপ্রিয় করে তুলেন। কিন্তু প্রকৃত গজলের সুরে একঘেয়েমীর যে-রেশ দেখা যায়— নজরুল তাঁর গজলকে সেই প্রচলিত অনুশাসন থেকে মুক্তি দিলেন তাঁর গজলের মধ্যে শেয়র-এর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে। 'শেয়র' হ'ল গানের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি এবং আবৃত্তির পর পুনরায় গানের মূল তাল ও লয়ে ফিরে আসা। যেমন একটা উদাহরণ :

চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা এ নয়ন পানে।
জানিতে নাই কো বাকি সই ও আঁখি কী যাদু জানে।
একে ঐ চাউনি বাকা সুরমা-আঁকা তায় ডাগর আঁখি।
বধিতে তায় কেন সাধ যে মরেছে ঐ আঁখি-বাণে ॥
কাননে হরিণ কাঁদে সলিল—ফাঁদে ঝুরছে সফরী,
বাঁকায়ে ভুরুর ধনু ফুকে— অতণু কুসুম-শর হানে ॥
(কুনাল কি পড়ল ধরা পিযুষ-ভরা ঐ চাঁদো মুখে,
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল লাল কপোলের কমল-বাগানে ॥
জ্বলিছে দিবস-রাত্তি মোমের বাতি রূপের দেওয়ালী,
নিশি-দিন তাই কি জ্বলি' পড়ছে গলি অঝোর নয়নে ॥)
মিছে তুই কথার কাটায় সুর বিঁধে হায় হার গাঁথিস কবি,
বিকিয়ে যায় রে মালা আর নিরালা আঁখির দোকানে ॥

এই গজলের মধ্যে বন্ধনীধৃত পংক্তিসমূহই শেয়র। নজরুলের গানের অন্যান্য গুণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলেছি। এখানে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন এমন কথা আমরা বলতে পারি না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের বিশালতা ও গভীরতা নজরুলের চেয়ে কিছুটা বেশী। প্রকৃত পার্থক্য হ'ল দু'জনের রুচির ভিন্নতা এবং তারও কারণ সময়ের পার্থক্য, তারুণ্যের সঙ্গে বার্ধক্যের পার্থক্য, নবীনের সঙ্গে প্রবীণের পার্থক্য। আসলে কবিতায় কিংবা গানে নর নারীর দেহ-সম্পর্কিত প্রেম ও ভাষা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের শালীন কৃষ্টি ও রুচি বিশেষ সীমা অতিক্রম করতে বাঁধ সেধেছিল। কিন্তু নজরুল তাঁর ভিন্নরুচির (যা অতটা মার্জিত নয়) জন্য রবীন্দ্রনাথ যে উদাহরণ আমাদের সামনে রেখেছিলেন তা নিঃসঙ্কোচে অতিক্রম করে গেছেন। এইসব কারণে, এবং যৌন-সম্পর্কিত বাস্তবভিত্তিক বর্ণনার জন্য, যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রকাশ করা কঠিন ছিল, নজরুল হাল-জগতের মানুষকে তৃপ্ত করতে বেশী সক্ষম হয়েছিলেন। নজরুলের বাস্তব-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও প্রজ্ঞাদৃষ্টি সাধারণ মানুষের অনুভূতি ও আবেগকে রূপদান করতে এবং এর ক্ষেত্র প্রসারণ করতে সাহায্য করেছিল।

২০.
এখানে আরও একটি বিষয় আলোচিত হতে পারে— সেটা সঙ্গীতের স্বরলিপি-ঘটিত বিষয়। রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত প্রয় ছাব্বিশ খানা স্বরলিপি এবং মোহিনী সেনগুপ্তাকৃত "রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি" যা রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেছিলেন সে-গুলোর কাঠামো-ভিত্তিক রূপ ছাড়া অন্যরূপে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে দিতে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। অথচ নজরুলের অনুমতি নিয়ে যে-সব গানের স্বরলিপি তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয় উৎকর্ষ সাধন হেতু তার সামান্য রদবদলে তিনি তেমন আপত্তি করতেন না। এটা ভাবতে অবাক লাগে যে রবীন্দ্রনাথ, যিনি পুরনো রীতিকে ভেঙ্গে স্বাধীন রীতির জন্ম দিলেন, তিনিই স্ববিরোধিতা করলেন সঙ্গীতের শিক্ষকদের অভিনবত্ব দানের জন্য তাঁর গান গাইবার স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করে। যদিও সন্দেহ নেই আজকালকার সঙ্গীতবিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়ে যেসব ভূঁয়ো সঙ্গীত-শিক্ষক আছেন তাঁদের অনেকেরই মধ্যে সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞানই অবর্তমান। প্রকৃতপক্ষে সেইজন্যই আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুল-গীতি উভয়ই এইসব তথাকথিত শিক্ষকদের দ্বারা এমনভাবে বিকৃত হচ্ছে যে অনেক সময় তাদের স্বরূপ চিনে উঠাই মুশকিল। কিন্তু এ মুশকিলের আসান হবে কি করে! যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অভিজ্ঞ জ্ঞানবান শিক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে ভণ্ড শিক্ষকের ইচ্ছারই জয় হবে। ব্যবহারিক সঙ্গীতকে অবশ্যই কার্যকরী হতে হবে। সময়ের গতির ও কায়দা-কানুনের বিরুদ্ধে না গিয়ে নজরুল ভালই করেছেন। তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথের মত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। অনামিকে এমন নাম দিলে অবহেলিত বিষয়কে আমরা এমনি করে মহাত্ম্য দান করি। বস্তুতঃ পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকৃতি না দিলে একমাত্র আজকের ধ্রুপদ ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। আধুনিক প্রবণতা হ'ল লোক-গীতিকেও স্বীকৃতি দেওয়া— যেগুলোকে সাধারণতঃ গীতি বলা হয়। বছর দশেক আগে ওস্তাদেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সঙ্গীতকে গীত অপেক্ষা অভিজাত বলে চিহ্নিত করতেন। কিন্তু আভিজাত্য জনগণের চাহিদার কাছে তেমন মূল্য পাচ্ছে না। সুতরাং এই প্রবণতাকে আর ঠেকিয়ে রাখা অর্থহীন।

২১.
রবীন্দ্রনাথ বহুদিন হল আমাদের মধ্যে নেই। নজরুল আজও আমাদের মধ্যে আছেন; কিন্তু জীবিত থেকেও তিনি আজ মৃত। ১৯৪২ সালে এক দুশ্চিকিৎসা-রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা ঘোষণা করেছেন যে তাঁর মস্তিষ্কের প্রধানতম অংশ Brain Cells শুকিয়ে-গেছে। সুতরাং চিকিৎসা দ্বারা তাঁর রোগ নিরাময়ের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রথমদিকে দেখা যেত শিশুর মত তিনি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছেন, সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার তাদের কুড়িয়ে তুলছেন এবং একটা একটা করে গুণছেন; মাঝে মাঝে উন্মাদের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে দর্শকদের-দিকে মারমুখিভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই রকম মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যেও আমি সব সময় দেখেছি ভগ্নস্বাস্থ্য পক্ষাঘাতাক্রান্ত তাঁর স্ত্রী প্রমীলা বিছানায় শায়িত থেকে তাঁর হতভাগ্য স্বামীকে সেবা করছেন। পায়ের দিকটা অবশ হয়ে যাওয়াতে তিনি উঠতে পারতেন না। কিন্তু সে অবস্থাতেও গৃহভৃত্যকে নির্দেশ দিয়ে একজন ভক্তিমতি সেবাপরায়ণা গৃহকর্ত্রীর মত স্বামীর খাওয়া, পরা, গোসলাদি সবই নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতেন। আমি জানিনা ১৯৬২ সালে প্রমীলা যখন মারা যান তখন নজরুল তাঁর এই আনন্দে প্রোজ্জ্বল এবং বেদনার অন্ধকারে আক্রান্ত জীবনের নিত্যসঙ্গী, এই প্রিয়তম বন্ধুটির শেষ বিদায় মহূর্তটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না। এই ভক্তিমতী সাধ্বী-সতীর আত্মা আল্লাহর অসীম করুণা লাভ করুক। নজরুল আজও জ্ঞানহীন অবস্থায় আছেন— নিশ্চল, নিশ্চুপ! পরিবর্তনহীন!

হে আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান, সর্ববিরাজমান, সর্বদয়াল মহাপ্রভু, একবার তুমি তোমার হতভাগ্য বিদ্রোহী সন্তান নজরুলের প্রতি তোমার করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তোমারই দৃষ্টির আশ্রয়ে, তোমারই নিযুক্ত এই মহাসৈনিক, পৃথিবীর লাঞ্ছিত নিপীড়িত অবহেলিত অগণিত মানবসন্তানের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য শোষকের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করেছেন। হে করুণাময়, তোমার এই বীর সন্তানের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর। তুমি গফুরুর রহিম, তুমি দয়ার সাগর! তোমার ক্ষমা ও দয়া প্রাপ্তির জন্য নজরুলের মূক প্রার্থনাকে তুমি কবুল কর।*

অনুবাদক : শাহাবুদ্দিন আহমদ।
১৩৮১

* ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের লেখা ইংরেজী প্রবন্ধ Nazrul Islam : The singer and writer of songs থেকে অনূদিত। নজরুল-ভক্ত বিদেশী বন্ধুদের একটি মুশায়েরায় পড়বার জন্য তাঁর এক ছাত্রের অনুরোধে তিনি প্রবন্ধটি লেখেন। লেখাটির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ বলে আমরা অনুবাদটি লেখকের অনুমতি নিয়ে ছাপিয়ে দিলাম। সম্পাদক, নজরুল একাডেমী পত্রিকা। ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত ১৩৮১

# সঙ্গীতচর্চায় মুসলমান

কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য ও সঙ্গীত, এই চারিটি বিদ্যাকে "আলঙ্কারিক কলা" বলা যাইতে পারে। ইহারা নানাবিধ রসের প্রকাশক ও উদ্দীপক।" এই চারিটি বিদ্যারই সমান উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য স্বভাব বর্ণনা। কথার দ্বারা স্বভাবের অনুকরণ করা কাব্যের কার্য, রং দ্বারা স্বভাব অনুকরণ চিত্রের কার্য; গঠন ও আকৃতি দ্বারা স্বভাব অনুকরণ ভাস্কর্যের কার্য, সেইরূপ সুরের দ্বারা স্বভাব অনুকরণ করা সঙ্গীতের কার্য। কেবল মানব-মনের ভাব ও আবেগ বর্ণনা করাই সঙ্গীতের একমাত্র কার্য নহে। —বাহ্য জগতের সমুদয় শব্দময় কার্যই সঙ্গীতের বর্ণনীয়।" এজন্য কণ্ঠ যেখানে অপারগ সেখানে আমরা বংশী, তার বা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি। আবার কথা ও সুরের ভিতরকার গতিচ্ছন্দও একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ছন্দঃপতন হইলে সুমিষ্ট সুরও বেসুরা বোধ হয়—তাহার রসোদ্দীপিকা শক্তি অনেকাংশে কমিয়া যায়। এইজন্য সুরগুলি তালে তালে সুসঙ্গতভাবে উচ্চারণ বা বাদন করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে বোধ হয় শারীরিক গতিভঙ্গী, করতালি, পদক্ষেপ প্রভৃতির ব্যবহার হইত। পরে সেইগুলি উৎকর্ষ লাভ করিয়া নৃত্যকলায় পরিণত হইয়াছে। এখন আমরা গান, বাদ্য ও নৃত্য তিনটিকে সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানি।

রসানুভূতি মানবজাতির প্রকৃতি-দত্ত অমূল্য সম্পদ। এজন্য সৃষ্টির আদিকাল হইতে সঙ্গীত সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোনভাবে বিদ্যমান আছে। সভ্য সমাজ হইতে অতি দূর-দূরান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে একতারা বা দোতারা এবং দুই বা ততোধিক ছিদ্র-বিশিষ্ট বংশীর ব্যবহার দেখা যায়।

মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তি যতই চাপিয়া রাখা যাউক না কেন, কোন না কোন রূপে তাহার প্রকাশ অবশ্যই হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধার্মিক মুসলমানগণ প্রায় কোন সময়েই সঙ্গীতকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তথাপি দেখিতে পাই, উচ্চকণ্ঠে সুললিত স্বরে আজান দেওয়া হয়, কেরাত করিয়া সুমিষ্ট স্বরে কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়। ইহা ছাড়া পরমার্থ সম্বন্ধীয় গজল, কাওয়ালী প্রভৃতির অন্ত নাই। মিলাদ শরীফে যে-প্রকারে দরুদ পড়া হয় এবং হযরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে ওজনে সমস্বরে "সালাম আলাইকা" পড়া হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরাও 'আমোদে নিয়ম নাস্তি' হিসাবে বিবাহের সময় দফ বাজাইয়া গান করা জায়েজ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ হয় যে নানারূপ সামাজিক ও ধর্ম-নৈতিক বিধি-নিষেধের ভিতরেও অনুষ্ঠান-প্রিয় মুসলমানগণের স্বাভাবিক সঙ্গীত-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার সৎসামান্য পন্থা আছে।

হযরত মুহম্মদ আবির্ভূত হইবার পূর্বের আরব দেশে একশ্রেণীর গায়ক ছিলেন, তাঁহারা পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া দফ, তার, কামান্দজা কিংবা গসবা সহযোগে গান করিতেন। ইঁহারা একাধারে কবি ও গায়ক দুই-ই ছিলেন। আরবদের ন্যায় কবিতাপ্রিয় জাতির মনোরঞ্জনের

জন্য গানের শুধু সুর হইলেই যথেষ্ট হইত না—অর্থ ও পদবিন্যাসের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইত। বোধ হয় সে-গানের প্রকৃতি অনেকটা সুর-সমন্বিত আবৃত্তি (recitation) কিংবা অন্যান্য দেশের কবিগানের মতো ছিল।

ইসলাম প্রচারের প্রথম দিক দিয়া অনেক দিন যাবৎ আরব-সঙ্গীত বিশেষ কোন উৎসাহ পায় নাই। তাহার কারণ সে-সময় লোকের মন আধ্যাত্মিক উন্নতি-চিন্তায় অতিশয় ব্যগ্র ছিল। এবং জাতির উন্নতির জন্য যে-সমস্ত গুণ অনুশীলন করিলে সত্বর কার্য সিদ্ধি সম্ভব তাহাই প্রাণপণ উৎসাহে অভ্যাস করিতে করিতে সঙ্গীতের উপযুক্ত অবসরও তেমন ছিল না। বিশেষতঃ হযরত মুহম্মদ ধর্মাভ্যাস হিসাবে সঙ্গীতের উপকারিতা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণ, তিনি বলিয়াছেন "পানিতে যেমন শেওলা জন্মায়, সঙ্গীত বা গীত হইতে হৃদয়ে তেমনি কৃত্রিমতা জন্মে"; "যদি সঙ্গীতকে আরাধনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে সে-আরাধনা কেবল হাততালি এবং বংশী বাদনেই পর্যবসিত হইবে।"

যদিও শুনা যায় হযরত ওমর (৬৩৪) কবিতা বা গান রচনা করিতেন এবং হযরত ওসমান (৬৪৪) ইবনে সৌরেজ নামক গায়কের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তবুও ইহাদের সময় সঙ্গীত জনসমাজে একপ্রকারে অনাদৃত অবস্থায়ই ছিল। Salvador সাহেব তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে হযরত আলীর (৬৫৬) খেলাফত সময়ে সাহিত্য, কাব্য ও অন্যান্য ললিতকলার ন্যায় সঙ্গীতচর্চার দিকেও লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হযরত মাবিয়ার রাজত্বকালে (৬৬১) গ্রীস দেশের অনেকাংশে আরবদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন তিনি রাজসভার অসংখ্য সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে গ্রীক সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য গ্রন্থরাজি অনুবাদ করিবার আদেশ দেন। এইরূপে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে গ্রীকদের বহু সংগীত-গ্রন্থও আরব্য ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময় হইতে আরব সঙ্গীতে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইতিপূর্বেই আরবীয়েরা পারস্য দেশ জয় করিয়া তাহাদের সঙ্গীতকে আপন করিয়া লইয়া এক বিশিষ্ট সঙ্গীত-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহাকে আরব্য-পারস্য সঙ্গীতরীতি বলে।

আমরা দেখিতে পাই অষ্টম শতাব্দীতে সঙ্গীত আরবদের শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এমনকি কয়েকজন খলিফাও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খলিফা এজিদ (৬৮০) সঙ্গীত রচনা করিতেন; ১ম ওলিদ (৭০৫) বংশীবাদনে অভ্যস্ত ছিলেন। খলিফা আবুল আব্বাস (৭৪৯) এবং মনসুর (৭৫৪) গায়ক ও বাদকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেন। খলিফা মাহ্দী (৭৭৫) নিজে সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র বিশ্ববিখ্যাত হারুণ-অর-রশীদকেও রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই হারুণ-অর-রশীদ খলিফা হইবার পর (৭৮৬) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সঙ্গীত, উপন্যাস প্রভৃতির উন্নতিকল্পে যেরূপ অবারিতভাবে রাজ-কোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত কীর্তিকাহিনী আজও আরবের মুখে মুখে ধ্বনিত ও গীত হইয়া থাকে। তিনি যেমন একদিকে অগণিত মসজিদ নির্মাণ করেন, সেইরূপে অন্যদিকে অসংখ্য স্কুল-কলেজেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সঙ্গীতও রীতিমতভাবে আলোচিত হইত, এমনকি কয়েকটিতে কেবলমাত্র সঙ্গীতই শিক্ষা দেওয়া হইত।

নবম শতাব্দীতে সঙ্গীতশাস্ত্র (theory) সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি লিখিত হয়। কবি খালিল ৭৮০ খৃষ্টাব্দে "শব্দবিজ্ঞান" ও "তাল জ্ঞান" নামক দুইখানা পুস্তক লিখিয়া যান। আর একজন লেখক ওবেদুল্লাহ বিন আবদুল্লা "স্বর ও সঙ্গীতের সুরবৈচিত্র্য" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তারপর ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত দার্শনিক আলকিন্দী সঙ্গীত বিষয়ক ছয়খানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন ঃ (ক) রচনা প্রকরণ, (খ) স্বর-বিবরণ, (গ) প্রাথমিক সঙ্গীত, (ঘ) লয় ও তাল প্রকরণ, (ঙ) বাদ্যযন্ত্র, (চ) কবিতা ও সঙ্গীতের সমন্বয়-রহস্য। তাঁহার শিষ্য আসমত-বিন্ মুহম্মদ "সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা" নামক একখানা বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন।

আরবদের মধ্যে কেবল যে পুঁথিলেখা বিদ্যারই বিশেষ আলোচনা করা হয়, তাহা নহে। ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতেও বড় বড় ওস্তাদ আরবদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন ঃ (১) ইব্রাহিম মসৌলী (৭৪২-৮০৩) আরব-সঙ্গীতের পিতৃস্থানীয়—কারণ তিনি নিজে তো একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেনই, তাহা ছাড়া তিনি অসংখ্য কৃতবিদ্য শিষ্য তৈয়ার করিয়া যান। (২) জোরায়ের-ইবনে-দাহমান রাজসভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, এমনকি তিনি পুরস্কার স্বরূপ দুইটি গ্রামের জায়গীর লাভ করেন। (৩) মাবেদ-মাদিনী গায়করূপে সমস্ত আরব দেশ ভ্রমণ করিয়া যশোলাভ করেন। (৪) জাসিদ হাওয়া সর্বপ্রথমে অন্তঃপুরে সুশিক্ষিতা গায়িকা দ্বারা গান করাইবার প্রথা প্রচলিত করেন। (৫) কোরায়েশ সঙ্গীত-সাধন বিষয়ে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। (৬) খলিফা মোতাওয়াককিলের পুত্র আবু আয়কা তিনশত গীত রচনা করেন। (৭) মসোলির পুত্র ইছাহাক অনেক সঙ্গীত-গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রচারক ছিলেন। (৮) সুকবি ও সুগায়িকা ও রায়েব অনেক গীত রচনা করেন—তাঁহার নাকি একুশ হাজার তান কণ্ঠস্থ ছিল। ইহা ছাড়া, মুহম্মদ ইব্নল হারেস, মেলসেল মোকারিক, আলগারিদ, ইবনে জর্জে-সুমা প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন। এই শেষোক্ত দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী সভা-গায়ক ছিলেন। খলিফা হারুনের রাজত্বকালে অনেক নতুন গীত রচিত হয়, তৎসমুদয় সংগ্রহের নিমিত্ত জালেদ ইব্নল এবং অন্য দুইজন গায়ক লইয়া এক কমিশন গঠন করা হয়। তাঁহারা নব-সঙ্গীতের এক প্রকাণ্ড খসড়া প্রস্তুত করেন।

কিন্তু বোগদাদের গৌরব বেশী দিন অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। আমরা এখন বোগদাদকে যশের উন্নততম শিখরে আরূঢ় রাখিয়া এইবার আরবাধিকৃত স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিব। স্পেনীয় খলিফা ১ম হাকাম (৭৯৬) কর্তৃক আহূত হইয়া বোগদাদের একজন বিখ্যাত ওস্তাদ, সারজাব কর্ডোভায় আগমন করেন। ইনি পূর্বকথিত খ্যাতনামা ইব্রাহিম মসৌলির একজন উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। ইনি ৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ডোভায় এক সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শীঘ্রই সেভিল, গ্রানাডা, ভ্যালেন্সিয়া এবং টলেডো নগরেও সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভার বিদ্যালয় পরিণামে উপপাত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ উভয়বিধ সঙ্গীতের জন্যই বিখ্যাত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে যেমন তানসেন, স্পেন, আরব ও মিশরে তেমনি আলকারাবীর (মৃঃ ৯৫০) নাম ঘরে ঘরে প্রচারিত। তাঁহার সঙ্গীত-পুস্তক এখনও সম্মান-সহকারে রক্ষিত আছে। আলী হিস্পানী (মৃঃ ৯১৮) আর একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে—তথাপি "কিতাবুল আগানী"-তে তাঁহার সঙ্গীত ও রচনা পাঠ করিয়া লোকে আনন্দ লাভ করে। গ্রানাডার লোক-প্রিয় গায়ক আবুবক্কর এবনে বাজেহ্ আরস্তর "শব্দবিজ্ঞানের" সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। ঐ যুগের আরও কয়েকজন গায়কের নাম—বিনজায়দান, রাবি ইউনুস, রাবির সসা, ওবাদিল, মোহো, আব্বিল এবং সরজাবের শিষ্য মৌসালী।

আরবদের সঙ্গীত ও সঙ্গীতপুস্তক সম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে আরব-সঙ্গীত বেশ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এই সঙ্গীত যে কেবল আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা

নহে। বস্তুতঃ পার্সী, তুর্কী, মিশরী, তাতারী প্রভৃতি সমুদয় মুসলমান জাতিই প্রায় তুল্যরূপে এই সঙ্গীত-ঐশ্বর্যের রসভোগ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ আরবী মুসলমানদের কোরআনের ভাষা, এজন্য অন্যান্য ভাষার তুলনায় এই ভাষার প্রভাব স্বভাবতঃ ধর্মপ্রাণ মুসলমান জাতির উপর অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়; বিশেষতঃ ইসলামের মূলীভূত একতার ফলে, যাহা একদেশের মুসলমানদের সম্পদ, তাহা শীঘ্রই সর্বদেশীয় মুসলমানদের সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়। আর একটা প্রধান কারণ, তখন আরবেরাই কি বল-বিক্রমে কি জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-দর্শনে, পৃথিবীর অন্য সমুদয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এজন্য তাহাদের অনুকরণ করা তখন অন্য জাতির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আরবদের নিকট হইতেই তৎকালীন ইউরোপ জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীত ব্যাপারেও ইউরোপ আরবদের নিকট বিশেষতঃ আরবাধিকৃত স্পেনের নিকট ঋণ-সূত্রে আবদ্ধ।

স্পেনে এক অপূর্ব সমন্বয়-কার্য সংঘটিত হয়। সেখানকার সঙ্গীত-বিদ্যালয়গুলিতে যে কেবল আরব-পারস্য পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা নহে। লুপ্তপ্রায় গ্রীক-পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাও এ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। কালক্রমে উভয় পদ্ধতিই কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া এক অভিনব পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। আজ পর্যন্ত পূর্ব-আরবে প্রাচীন পন্থা প্রচলিত থাকিলেও, স্পেন, আলজিরিয়া, তিউনিস, মিশর প্রভৃতি স্থানে এই মিশ্র-পদ্ধতি অনুসারেই গান গাওয়া হইয়া থাকে। আজও মাদ্রিদের রাজপথে আরব-পারস্য-গ্রীক রীতির তানমূলক গান যথেষ্ট শোনা যায় তাহা বোধ হয় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গান। এরপর ইউরোপীয় সঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের এখন আর তান-প্রধান (melody) সঙ্গীত নাই—এখন তাহা সংযোগ-প্রধান (Harmoni music)। এমন কি পূর্বকালে গীর্জায় যে তান-প্রধান গ্রেগরীয় সঙ্গীত (Gregorian music) শুনা যাইত। তাহাও এখন সংযোগ প্রধান করিয়া গাওয়া হয়। প্রাচীন রোমীয়দের আটটি "গ্রাম" বা স্বরান্তর প্রকাশের ধারা ছিল; গ্রীক ও আরবেরা চৌদ্দটি "গ্রাম" ব্যবহার করিতেন। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে কেবলমাত্র Major scale এবং স্থল-বিশেষে minor scale এই দুইটি মাত্র গ্রাম ব্যবহার করা হয়! এজন্য আজকাল ইউরোপের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বলিতেছেন যে, কেবল একটি বা দুইটি মাত্র "গ্রাম" অবলম্বন করিয়াই যেমন বিচিত্র সংযোগ-প্রধান সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে পরিত্যক্ত গ্রামগুলি পুনরায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে ও পরস্পর সংযোগে ওই প্রণালীতে সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া বর্তমান সঙ্গীতের বৈচিত্র শতগুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এইবার ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের উপর মুসলমানের প্রভাব কিরূপ কাজ করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই একটু আলোচনা করিব। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ভারতীয় সঙ্গীত ও আরব্য-পারস্য সঙ্গীত উভয়েই সম-প্রাকৃতিক। উভয়েই তান-প্রধান সঙ্গীত এবং তবলা বা এরূপ কোন তাল-রক্ষণ যন্ত্রের সহিত গীত বা বাদিত হয়। উভয়েই রাগ-রাগিণীর দৃঢ় বন্ধন আছে—পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ন্যায় লৌকিক প্রভাবের (Individual fancy) ততটা স্থান নাই। যে গমক বা মীড় ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞের কানে বিসদৃশ লাগে, তাহা ভারতীয় ও আরবীয় সঙ্গীতের একটা শ্রেষ্ঠ-ভূষণ। আবার যন্ত্র হিসাবেও ভারতীয় বীণা, আরবের রবাব, ভারতের বেহালা, আরবের কামান্দাজা, ভারতের মুরলী, আরবের গসবা, ভারতের ঢোল, আরবের দফ, ভারতের ত্রিতন্ত্রী, আরবের কৌই এ বা কিন্নারা, ভারতের জয়ঢাক, আরবের আতাম্বর। এইরূপে দেখা যায় যে ভারতে যে কাজের

জন্য যে-যন্ত্র আছে, আরব-পারস্য-তাত্তার প্রভৃতি দেশেও সেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অনুরূপ যন্ত্র বর্তমান আছে।

ভারতীয় সঙ্গীত মুসলমানী সঙ্গীতের সমভাবাপন্ন হওয়াতে এদেশের পাঠান ও মোগল বাদশাহদের পক্ষে তাহার রসগ্রহণ করা সহজ হইয়াছিল। রসগ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি এতটা মনোযোগ দিতেন কি-না সন্দেহ। বাস্তবিক পক্ষে মুসলমান বাদশাহরা এদেশের সঙ্গীতকে যে-ভাবে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তৎসহ আরব-পারস্যের নূতন রাগ-রাগিণীর সংমিশ্রণে অতিবৈচিত্র্যময় মনোহর সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন। রাগ-রাগিণীর সংখ্যা এত বর্ধিত হয় যে, তাহাদিগকে ঠাট হিসাবে, গাইবার সময় হিসাবে, উত্তর আরব হিসাবে প্রভৃতি নানা উপায়ে শ্রেণী বিভাগ করা। এ কাজটি মুসলমানেরাই করিয়া গিয়াছেন, তাহা না করিলে বর্তমানে আমরা যে সমস্ত রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাই, তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। দ্বাদশ মল্লার, অষ্টাদশ কানাড়, সপ্ত-সারঙ্গ, নব-নট, দ্বাদশ চৌড়ী প্রভৃতি নাম হইতেই মুসলমান বাদশাহের আমলে ভারতীয় সঙ্গীত যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গীত-সূত্রসারের" উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "মুসলমান সম্রাটদিগের সময় হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। এজন্য তৎকালে সঙ্গীতের যে প্রকার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা পূর্বকালাপেক্ষা অধিক ব্যতীত অল্প নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উন্নতির প্রধান কারণ ও উত্তেজক। অতএব তাহারই প্রভাবে হিন্দুস্থানী লোকের সঙ্গীতজ্ঞান, রচনা-কৌশল এবং কর্তব্য শক্তি প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে; কেননা, নবাব-বাদশাহরা ভূয়োভূয়োঃ উৎসাহ-দান দ্বারা বহুকাল এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্রোত প্রবল রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে নূতন নূতন রাগ-রাগিণীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, নূতন নূতন সঙ্গীতযন্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার উন্নতির অনেক লক্ষণই দেখা যায়। কেবল সঙ্গীতের দুর্বোধ্য সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুশীলন হয় নাই বলিয়া, সঙ্গীতের অবনতি হওয়া স্বীকার্য হইতে পারে না। এ সকল গ্রন্থে বর্ণিত ২২ প্রকার শ্রুতি, ২১ প্রকার মূর্চ্ছনা, ২৩ প্রকার গমক, ৬৩ প্রকার বর্ণালঙ্কার, সহস্র প্রকার তান, ইত্যাদির কেবলমাত্র নাম শিখিয়া ওস্তাদদিগের কি উপকার হইত?"

অতি প্রাচীনকালে যেসমস্ত রাগ-রাগিণী ছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ উন্নতি হইলে প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আদিমকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে মাত্র তিনটি স্বরে গান হইত, পরে ক্রমে ক্রমে সপ্ত-স্বরের সৃষ্টি হয়। "কুশীলব যখন রাজসভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত-স্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কিনা সন্দেহ।[১] কৌশল এক হইলেও আদিম মানব-হৃদয়ে তাহার সর্বাংশ স্ফূর্তি পায় নাই বলিয়া একেবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে, "মুসলমানদিগের সময়ও সুর সংখ্যার দিক দিক না হউক, বৈচিত্র্যের দিক দিয়া সঙ্গীতের অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে উপপত্তি ভিন্ন গান গৎ প্রভৃতি কর্তবাংশের উদাহরণ কিছুই পাওয়া যায় না।[২] প্রাচীনকালের ব্যবসায়ী লোকে যে এ সকল সঙ্গ সংস্কৃত গ্রন্থের মতানুসারে সঙ্গীত-সাধনা করিত, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে।"

---

১. ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের "ঐতিহাসিক রহস্য" তৃতীয় ভাগ হইতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত।

২. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "গীতসূত্রসারের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

সুতরাং প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের সহিত আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তুলনা করা বড়ই দুষ্কর। তবে শুনা যায়, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটি, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে এখনও নাকি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারেই সঙ্গীতচর্চা হইয়া থাকে। তাহাকে কর্ণাট ও দ্রাবিড়ী সঙ্গীত বলে। তাহা ছাড়া মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙালী সঙ্গীতও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে ভিন্ন। কলিকাতায় সর্বপ্রকার সঙ্গীতই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু গুণীগণ এক বাক্য হইয়া মুসলমান-প্রভাবান্বিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেই শ্রেষ্ঠ ও মনোহর বলিয়া স্বীকার করেন—তাই এদেশে কর্ণাটি, মহারাষ্ট্রী বা বাঙালী ওস্তাদ অপেক্ষা হিন্দুস্থানী ওস্তাদদেরই সমাদর অধিক।

পাঠান রাজত্বকালে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী স্বয়ং উত্তম গায়ক ছিলেন। বিখ্যাত সাধক ও গায়ক আমীর খসরু তাঁহার সভাকবি ছিলেন। এসময় দক্ষিণ দেশে নায়ক গোপাল নামক একজন বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া সমুদয় বিখ্যাত ওস্তাদকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে আলাউদ্দিনের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে আমীর খসরুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করতে হয়। কিভাবে তাঁহাদের প্রতিযোগিতা হইল, এবং কিরূপে জয়-পরাজয় নির্ণীত হইল, তাহার কোন বিবরণ এ পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমীর খসরুর চেষ্টা ও উৎসাহেই প্রথমে মুসলমানেরা হিন্দু-সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি সেফর্দ্দা, ইমন, ইমন-কল্যাণ, ইমন-সুরিয়া ও ইমন-বেহাগ রাগিণী সৃষ্টি করেন। আবার ইনিই বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। কথিত আছে, বর্তমান কালে যে ঢং-এ ধ্রুপদ গাওয়ার রীতি আছে, গুণী-শ্রেষ্ঠ আমীর খসরুই তাহার প্রবর্তক। মোগল-সম্রাট আকবর শাহের সময় স্বনামধন্য তানসেন তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তানসেনের কীর্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে; সে-সমস্ত আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি দরবারী কানাড়া, মিয়া-সারঙ্গ, মিয়াদ-মল্লারের সৃষ্টিকর্তা। আকবর বাদশাহের রাজত্বকাল ভারত সঙ্গীতের এক গৌরবময় যুগ। তাঁহার উৎসাহ না পাইলে কখনই হরিদাস স্বামী, তান্‌সেন, তানতরঙ্গ, মানতরঙ্গ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গায়ক এবং বীণাকার ফিরোজ খাঁর ন্যায় গুণী ব্যক্তি এত সুপরিচিত হইতে পারিতেন না এবং পরবর্তী যুগের সঙ্গীতের উপর তাঁহারা এরূপ স্থায়ী চিহ্নও অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিতেন না।[১]

জৌনপুরের অধীশ্বর হোসেন সিরকী "খেয়াল" গানের সৃষ্টিকর্তা। তাহা ছাড়া ইনি সোহাটোরী, সুখরাইটোরী, নাচারী-টোরী, মূলতানী বারোয়া, মিলু, মালিগৌরা, হোসেনী কানাড়া ও সাহানা রাগিণীর সৃষ্টি করেন।

মিএর বখত, সুখল বেলাওল ও বাহাদুরীটোরী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

লাক্ষ্ণৌ নিবাসী গোলাপ নবী টপ্পা গানের সৃষ্টি-কারক। আকবর বাদশা স্বয়ং উৎকৃষ্ট পাখোয়াজী ছিলেন।

ইহা ছাড়া তানসেনের পুত্রদ্বয় মানতরঙ্গ, তানতরঙ্গ, তানসেনের ছাত্রদ্বয় চাঁদ খাঁ, সুরুজ খাঁ; বিখ্যাত খেয়ালীদ্বয় সদারঙ্গ, অদারঙ্গ; কলাবৎ নুর খাঁ; ধম্মাগায়ক হামদ্‌ম; সদারঙ্গের শিষ্যদ্বয় শক্কর, মাক্কন; গোলাম রসূল; মুহম্মদ খাঁ; সাজ্জু খাঁ; শেখ বিজ্জু; মির্জা আক্কেল; মিয়া শনু; বীণাকার নাসির আহম্মদ; হাস্‌সু খাঁ; করিম খাঁ; হার্দু খাঁ; কাশীনিবাসী বীণাকার মুহম্মদ খাঁ; সারঙ্গী নবীবক্স; বড় মিএর; ছোট মিএর; বীণাকার ওয়ারিশ আলী খাঁ; রবাবী বাসদ খাঁ; তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাদকালী খাঁ; সেতারী এমদাদ খাঁ; শারদী উজির খাঁ প্রভৃতি গুণীগণ সমগ্র ভারতব্যাপী যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন।[২] একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এই সকল

১. আকবর বাদশাহ স্বয়ং উৎকৃষ্ট পাখোয়াজী ছিলেন।
২. ইহাদের অধিকাংশ নামই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর "সঙ্গীত-সার" হইতে গৃহীত।

গায়কেরা অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং যন্ত্রীরাও প্রত্যেকে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গৎ প্রস্তুত করিয়া সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

খেয়াল, টপ্পা. ঠুংরী প্রভৃতি গান পূর্বে ছিল না। এগুলি বাদশাহী আমলের সৃষ্টি। এজন্য ইহাদের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এদেশে কেবল ধ্রুপদ (বা ধ্রুবপদ) গানেরই প্রচলন ছিল, এবং তাহার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল। প্রবন্ধ, হোরি (বা হোলি গান) তেলেনা, যুগলবন্ধ, রাগমালা প্রভৃতি ধ্রুপপদের অন্তর্গত। ধ্রুপদের রচনা বিস্তৃত এবং তাহা অস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারি অংশ বা কলিতে বিভক্ত। প্রথম অংশে, সুর মধ্য-সপ্তকে থাকিয়া রাগিণীর মূর্তি প্রকাশ করে; দ্বিতীয় অংশে, মধ্যসপ্তক হইতে তারা-সপ্তক পর্যন্ত আরোহণ করিয়া আবার আরোহণ-ক্রমে অস্থায়ীর সহিত মিলিত হয়; তৃতীয় অংশে; সাধারণত মধ্যসপ্তক হইতে মন্দ্র-সপ্তকে অবতরণ করিয়া নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ করে; তৎপর চতুর্থ অংশে আবার তারা-সপ্তক পর্যন্ত উঠিয়া রাগিণীর সম্পূর্ণ বিস্তার দেখাইয়া ক্রমে অস্থায়ীর সহিত মিলিত হয়। ধ্রুপদ গান করা বড় কঠিন কার্য, তাহার কারণ এই নহে যে কঠিন-কঠিন তালে গান করা হয়, কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, ধ্রুপদের গদ অতিদীর্ঘ, তাহাতে অনেক দমের প্রয়োজন। ধ্রুপদের সহিত মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজের সঙ্গত হয়। সাধারণতঃ চৌতাল, ধামার, সুর-ফাঁক, ঝাপতান, রূপক, ঢিম-তেতালা প্রভৃতি তালই বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয়। মৃদঙ্গের চামড়ার উপর ভিজা ময়দার ঢিপি করিয়া তাহার উপর আঘাত করিলে যে অতি গুরুগম্ভীর আওয়াজের সৃষ্টি সয়, তাহার তালে তালে রাগ-রাগিণীর বিস্তার পূর্বক যে ধীর-মন্থর গতিতে ধ্রুপদ গাওয়া হয়, তাহাতে সমগ্র মজলিসে এক শান্ত, সৌম্য, উদাত্ত ভাবের সৃষ্টি হয়—তখন আপনা হইতেই ঐ গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গে মনে একপ্রকার পবিত্র ভক্তি-ভাবের উদয় হয়। প্রাচীনকালে ধ্রুপদের বাগ্-বিন্যাস কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া জানিবার উপায় নাই। এখন তানসেন, দুঁদি খাঁ, মিঞা বক্‌সু, বাব! সুরদাস প্রভৃতির রচিত অনেক উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গান প্রচলিত আছে। এখন এইগুলিই প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে পরিগণিত। পাঞ্জাব প্রদেশে ধ্রুপদের চর্চা অধিক। সেখানকার সঙ্গীতাধ্যাপক মৌলাদাদ ও ইলিয়াস বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জৌনপুরের অধীশ্বর সুলতান হোসেন সিরকী ধ্রুপদ ভাঙ্গিযা খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। খেয়ালের রচনা ধ্রুপদ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। ইহার মাত্র দুইটি কলি আছে, অস্থায়ী ও অন্তরা। কদাচিত তিন-চারটি কলিও থাকে : খেয়ালের রচনা একটু দীর্ঘ হইলে এবং কিছু শ্লথ করিয়া গাইলে, ইহাকে ধ্রুপদ হইতে পৃথক করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। কারণ ধ্রুপদের অধিকাংশ তালই জলদ ভাবে খেয়ালে ব্যবহৃত হয়। তবে "ধ্রুপদের সুরফাঁক, তেওরা, সাওয়ারী তালের ন্যায় ছন্দ খেয়ালে ব্যবহার নাই, "আবার খেয়ালের আড়া ও মধ্যমান তালের ন্যায় ছন্দ ধ্রুপদে ব্যবহার নাই।" খেয়ালে ক্ষুদ্র তান বা গিটকারী ব্যবহৃত হয়, ধ্রুপদে হয় না; আবার ধ্রুপদে যে প্রকার গমক ব্যবহৃত হয় খেয়ালে তাহা হয় না। হিন্দী খেয়ালের মধ্যে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের হিন্দী খেয়ালই সর্বোৎকৃষ্ট, এজন্য তাহাই অধিক প্রচলিত। সদারঙ্গ, অদারঙ্গ বাদশাহ মুহম্মদ শাহের দরবারের সম্মানিত গায়ক ছিলেন। খেয়াল ও ধ্রুপদ উভয়ই ঈশ্বর-বিষয়ক গানের উপযোগী। খেয়ালে সুরের খেলা অধিক হয় বলিয়া ইহা ধ্রুপদ অপেক্ষা মিষ্টি। পক্ষান্তরে ধ্রুপদের গতি ধীর ও গম্ভীর বলিয়া বিরাট ভাবপ্রকাশের ইহাই অধিকতর উপযোগী। মোটের উপর সঙ্গীত মানুষের প্রাণের ভাষা, এবং তাহার আদর জনসাধারণের রুচির উপর নির্ভর করে। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রকৃতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য

খেয়াল প্রথমাবস্থায় ধ্রুপদী ওস্তাদদের ব্যঙ্গ সহ্য করিয়াও এ যাবৎ জীবিত আছে এমনকি ধ্রুপদকে প্রায় আসনচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে।

খেয়ালের পর টপ্পা। টপ্পার মূল অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা। বোধ হয় টপ্পার গতিভঙ্গী চঞ্চল ও লঘু বলিয়া এই প্রকার গানের 'টপ্পা' নাম হইয়াছে। টপ্পা বলিতে আমরা শোরী মিয়ার টপ্পা বুঝি। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু লাক্ষৌ-নিবাসী জানি খাঁর পুত্র গোলাম নবীই টপ্পা সৃষ্টিকারক। শোরী নাম্নী তাঁহার এক প্রিয়তমা প্রণয়িনী ছিলেন। এজন্য তিনি গাইবার সময় শোরী-মিয়ার ভণিতা দিয়া গাইতেন। কাপ্তেন উইলার্ড সাহেবের মতে টপ্পা রীতির গান পাঞ্জাব প্রদেশের উষ্ট্রচালকদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। 'শোরী মিয়া" সুকৌশলযুক্ত সাধনা দ্বারা ঐ গানকে বিশেষ সুললিত ও কারিগরী-বিশিষ্ট করিয়া ইহাকে সভ্য-সঙ্গীত-আসরে গাইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। এতদবধি উহা সভ্য-সমাজে আদর লাভ করিয়া আসিতেছে। সভ্য-সমাজে প্রচলিত টপ্পা রীতির গান অল্পদিন হইল সৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য এখনও ইহার আয়তন ক্ষুদ্র, এবং সমস্ত রাগিণীতে টপ্পা গান গাওয়া হয় না। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, কালেংড়া, দেশ, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি এবং আধুনিক রাগিণীর মধ্যে কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, মাঝ, ইমনি, ওলুম এই কয়েকটি মাত্র টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে টপ্পা ধরনের অন্যান্য রাগিণী গাওয়া সম্ভবপর নহে। ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে হইতে নিশ্চয়ই টপ্পায় আরও অধিক সংখ্যক রাগিণীর ব্যবহার হইবে। তাহা ছাড়া সম্ভবতঃ টপ্পার আয়তনও বর্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহাতে সঞ্চারী ও আভোগ যুক্ত হইবে। তাহার লক্ষণ এখনই দেখা যাইতেছে। "প্রায়ই দেখা যায়, ওস্তাদেরা পিলু, ঝিঁঝিট, বাবোরা প্রভৃতি আলাপ করিবার সময় ইহাদের সঞ্চারী ও আভোগের উপযোগী অঙ্গ বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে এইসব আধুনিক রাগিণীও বর্ধিত হইয়া প্রাচীন রাগের তুল্য হইয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য প্রাচীন রাগ-রাগিণী সমূহও এইরূপ ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বর্ধিতায়ন হইয়া বর্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে।[১] অনেকের ধারণা আছে যে, আদির সাশ্রিত গানকেই "টপ্পা" বলে। কিন্তু তাহা নহে। কারণ আদিরসের গান খেয়াল ও ধ্রুপদেও বিস্তর আছে। তবে টপ্পার প্রকৃতি লঘু ও গতি চঞ্চল ও দ্রুত হওয়াতে ভগবৎ প্রেমের শান্ত ভাবের সহিত ইহার তেমন সামঞ্জস্য হয় না। এইজন্য সচরাচর ইহাতে হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ আনন্দ প্রণয় প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির গানই গাওয়া হয়।

ঠুংরী জাতীয় যে গান লক্ষ্ণৌতে প্রচলিত তাহা টপ্পারই অন্তর্গত। "শৌরী মিয়ার" রচিত গানকেই ওস্তাদেরা টপ্পা বলিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য টপ্পাকে নামান্তরে ঠুংরী বলা হয়। খেয়ালের সঙ্গে যেমন ধ্রুপদের সম্বন্ধ সেইরূপ টপ্পার সহিতও খেয়ালের নিকট সম্বন্ধ। এক শ্রেণীর গান আছে যাহা টপ্পা ও ঠুংরীর মধ্যবর্তী--উভয়ের প্রকৃতিই ইহাতে বর্তমান, এজন্য ওস্তাদেরা ইহাকে "টপ্পা-খেয়াল" নাম দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া খেয়াল-টপ্পার অন্তর্গত কাওল-কালওয়ানা, গুল-নকশ, জিগর, সোহেলা, গজল এবং দেওয়ালী গান[২] মুসলমানেরা সৃষ্টি করিয়া এদেশে প্রচলিত করিয়াছেন। কাজী মামুদ নামে একজন গুজরাটি গায়ক প্রথমে জিগর গানের সৃষ্টি করেন। আজমীর শরীফের দিকে কওয়াল নামক এক শ্রেণীর গায়ক আছেন তাহাদের গানকে কাওলকালওয়ানা এবং তালকে কাওয়ালী তাল বলে। অনেক সময় গানকে কাওয়ালী গান বলে। হিন্দুদের যেমন কীর্তন মুসলমানদের মধ্যে তেমনি কাওয়ালী ধর্ম-সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হয়।

১. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গীত-সূত্রসার (৮২ পৃঃ)
২. দেওয়ালী রাগ সম্বন্ধে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীতসারের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীতে উৎসাহদাতাদের মধ্যে সম্রাট আলাউদ্দিন, সম্রাট আকবর, বাহাদুর শাহ, মুহম্মদ শাহ, এবং পরবর্তীকালে মেটে-বুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, এ যাবৎকাল মুসলমানেরা সেই প্রাধান্য ক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিখ্যাত গায়ক, বাদক প্রভৃতি বেশীর ভাগই মুসলমান। এমনকি বর্তমান হিন্দুস্তানী সঙ্গীত উপপত্তি হিসাবে হিন্দু-সঙ্গীত হইলেও তাহা ক্রিয়া-সিদ্ধাংশকে কি ভাষা হিসাবে কি ঢং হিসাবে মুসলমানী সঙ্গীত বলিলেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না।

যন্ত্র হিসাবে ধরিতে গেলেও বীণা ভারতের আদিযন্ত্র—ইহাতে রাগাদির আলাপ ধরা হয়! আবার ইহার সমকক্ষ রবাব যন্ত্রও এদেশে (বিশেষতঃ দিল্লীর নিকটবর্তী রামপুরের নবাব দরবারে) প্রচলিত আছে। রবাব আরবীয় যন্ত্র, ইহাতেও ভারতীয় রাগাদির সুন্দর আলাপ হয়। বীণার আওয়াজ হৃদয়স্পর্শী হইলেও অত্যন্ত ক্ষীণ। এজন্য মুসলমানেরা বীণাকে বড় করিয়া সরদ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। বীণা বা সরদে রীতিমত আলাপ করিতে হইলে বহুবর্ষ-ব্যাপী সাধনার দরকার।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আমীর খসরু বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। প্রথমে ইহাতে মাত্র তিনটি তার সংযোজিত থাকিত। ক্রমে পাঁচ তার সাত তার হইতে হইতে এখন ইচ্ছাধীন বহু তার যুক্ত হইয়া থাকে। ছোট সেতার গৎ বাজাইবার পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। রাগ-রাগিণীর বিস্তৃত আলাপের নিমিত্ত বাদশাহের আমলে সেতারকে বড় করিয়া অধিক তার যুক্ত করিয়া সুরবাহার যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যিনিই এ যন্ত্র শুনিয়াছেন, তিনিই ইহার সুরবাহার নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

বংশী এদেশের অতি প্রাচীন যন্ত্র। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এ যন্ত্রের সৃষ্টিকারক কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন। আমরা এ পর্যন্ত জানি যে তিনি মোহন-বাঁশরী বাজাইয়া গোপিনীদের মনোরঞ্জন বা মনোহরণ করিতেন। বাস্তবিক বংশীর সুর এমন সুমিষ্ট ও চিত্তহারী যে তাহাতে মন উধাও হইয়া যেন কোন এক মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। গভীর রাত্রে কিংবা সায়ংকালে উদাস-করা বাঁশীর সুরে শ্রবণ-মন আকৃষ্ট হয় না, এমন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কোমল ও প্রেম-বিহ্বল উদাস ভাব ভারতবাসীর জাতীয় বিশিষ্টতা। বাঁশীতে এই দুইটি ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া সমাজের স্তরে স্তরে (অন্য সমস্ত বিষয় পশ্চাৎপদ) কৃষকদের মধ্যেও ইহার আদর হইয়াছে। কিন্তু ইহার সুর অতি ক্ষীণ এবং আনন্দের সুর যেন ইহাতে ঠিক ধরা দেয় না। এ অভাব দূর হইয়াছে বাদশাহী আমলের সানাই দ্বারা। উৎসবে এবং নহবত সানাই বাজে; ইহার সুর জোরাল এবং আনন্দব্যঞ্জক।

কানুনযন্ত্র আরবদেশ হইতে কাবুল ও ভারতবর্ষে আনীত হয়। মিয়া তানসেনের বংশধর পিয়ারসেন কানুন বাজাইয়া খ্যাতি লাভ করেন। আজকাল কানুনের ব্যবহার খুব কমিয়া গিয়াছে। আরব্য কানুনে ৭৫টি ছোট-বড় তার সংযোজিত আছে। জল-তরঙ্গে যেমন ছোটবড় পেয়ালার আঘাত করিয়া নানারূপ সুর উৎপাদিত করা হয়। কানুনেও তেমনি এই সমস্ত তারে কাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া সুরোৎপাদন করিতে হয়।

গানের সহিত সঙ্গতের জন্য সারঙ্গী এদেশের অতি প্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্র। কোমলকণ্ঠী গায়িকা বা বাইজীদের গানের সহিত এবং আধুনিক সৃষ্ট যাত্রাগানেই আজকাল ইহার প্রচলন দেখা যায়—তাহা ছাড়া অন্যত্র ইহার আদর বড় দেখা যায় না। কাশীধামের প্রসিদ্ধ সারঙ্গী নবী-বক্স সেতার ও সারঙ্গী এই দুইটি যন্ত্রের সমাবেশ করিয়া এস্রাজ বা এসরার যন্ত্রের সৃষ্টি

রবাব, জলতরঙ্গ প্রভৃতি দেশী-বিদেশী, নয়া-পুরানা নানারকম যন্ত্রে সুর-বেসুর সবরকমই বাজে। রাগ-রাগিনীর সুর-বিস্তার তাল-লয়ের নিখুঁত হিসাব, গমক, মীড়, মুর্ছনা, তেহাই প্রভৃতির দ্বারা রাগিণীর মূর্তি মনোরম করে ফুটিয়ে তোলার কৌশল আমাদের ওস্তাদদের বেশ রফত আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতের হারমনি বা কর্ড না থাকাতে মনে হয় আমাদের সঙ্গীত কিছু অপুষ্ট ; নিবিড়তা থাকলেও এতে ব্যাপকতার অভাব, তারের যন্ত্রে বিকারি আর জুড়ির সাহায্যে সুরকে পুষ্ট করার যে-পদ্ধতি আছে, তাতে হারমনি বা কর্ডের কাজ হয় না। তবু, হারমনি ছাড়াই গমক, তান, প্রক্ষেপ প্রভৃতি ব্যবহার করে ভারতীয় ও পাকিস্তানী সঙ্গীত-সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সঙ্গীত-যতটা ভাব প্রকাশে সক্ষম হয়েছে তাতে আমাদের গৌরব বোধ করবার কারণ আছে।

সুরের পরিকল্পনা, রাগ-রাগিণীর পরিপূর্ণ রূপ-বিস্তার যে-কোনো জাতির শ্রেষ্ঠ কল্পনা ধ্যান-ধারণার বিষয়। এর লক্ষ্য সৌন্দর্য ও রস-সৃষ্টি। কিন্তু সেখান থেকে নামিয়ে এনে সুরকে নানান উদ্দেশ্যের পরিচারক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও দেখতে পাই। সং সেজে গান গেয়ে আর বাজনা বাজিয়ে ওষুধের বিজ্ঞাপন দেওয়া, রেল স্টীমারে গান গেয়ে ভিক্ষা করা-- সঙ্গীতের এইসব দুর্গতি দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। যাহোক এসবের দিকে নজর দিয়ে খামাখা মন খরাপ করে লাভ নেই।

ধার্মিক মুসলমানগণ প্রায় কোনো সময়েই সঙ্গীতকে ভাল চোখে দেখেননি। তবু দেখা যায়, সুললিত স্বরে আযান দেওয়া, বা সুমিষ্ট কেরাতের সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াৎ করা প্রশংসনীয় কাজ। গজল, কাওয়ালী প্রভৃতি পরমার্থিক গান সম্বন্ধে কারোই কোনো আপত্তি নেই একথা বলা না গেলেও, অনেকেরই যে সহানুভূতি আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হজরতের প্রতি তা'জীম দেখাবার জন্য মিলাদ শরীফে কেরাম করে সমস্বরে যে "সালাম আলায়কা" পড়া হয়, তাকেও একরকম ভজন সঙ্গীত বলা যেতে পারে। যাই হোক, হাজার বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃতিগত সঙ্গীত প্রীতিকে চেপে রাখা যায়নি।

পাক-ভারতে অন্যান্য জায়গার মতো পূর্ব বাংলায়ও ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির চলন ত আছেই তা'ছাড়া বিশেষভাবে এখানকার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে মারেফতি, ভাটিয়ালী, জারী, সারি, মার্সিয়া, বাউল, গজল, কীর্তন, ঢপ, কাজরী, বারমাস্যা, পালা-গান প্রভৃতিরও চলন আছে। ভর্জা আজকাল প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু কবি-গান আর যাত্রা-গান এখনও কিছুটা চলতি আছে। আজকাল সর্বত্রই হালকা ধরনের সিনেমা সঙ্গীতের প্রচলন হয়েছে। এতে গভীরতা কিছুই নেই। বর্তমানের কর্মব্যস্ত আর জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত লোকের দ্বারা যেন কোনোরকম সাধনাই হয়ে উঠছে না। এর পরিণাম খুবই খারাপ, অথচ দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি না হলে এ অবস্থার উন্নতি কেমন করে হবে, তাও বুঝা যাচ্ছে না।

তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে ঢাকা শহরেই সঙ্গীত চর্চার যতটা ধুম ছিল, এখন আর তা নেই। লোকের আর্থিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন দুই-ই এজন্য দায়ী। নিঃসংশয়ে বলা যায়, সঙ্গীত চর্চায় প্রধানতঃ এদেশের হিন্দুরাই উৎসাহ দিতেন। বড় ওস্তাদদের মধ্যে অবশ্য বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান, কিন্তু তাঁদের কাছে যাঁরা শিক্ষালাভ করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু [illegible]। ধ্রুপদে এমদাদ খাঁ, মহেন্দ্র বসাক; খেয়ালে গুল মহম্মদ খাঁ, [illegible], [illegible] খাঁ, মহম্মদ হোসেন খসরু, রইসউদ্দীন; টপ্পায় মোহাম্মদ হোসেন;

ঠুংরিতে শচীন্দ্র দেব বর্মন, গৌর ওস্তাদ, পচা ওস্তাদ ; পাখোয়াজে পারীন্দ্র বসাক ; তবলায় প্রসন্ন বণিক, গোলাপ ওস্তাদ, কেশব ব্যানার্জি ; সেতারে ভগবান সেতারী, হায়দার হোসেন, হাফিজ মিয়া, ছোট মিয়া ; এস্রাজে পিলু বাবু ; বাঁশীতে ফজলে আমীন প্রভৃতি অনেক গুণীকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। কুমিল্লার বিখ্যাত বংশীবাদক আফতাবউদ্দীনও দুই-একবার ঢাকায় এসে সকলের মনোরঞ্জন করে গেছেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে ঢাকার ছোট খাঁ, বড় খাঁ এবং তাঁদের শাগরেদ যশোর বনগ্রামের মধুকান বা মধু-কিন্নর সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। এই মধু-কিন্নরকেই কীর্তনের প্রবর্তক বলা যায়। মধুকণ্ঠী হাসনু ওস্তাদের তারীফও এখন পর্যন্ত শোনা যায়। তাছাড়া গত এক শতাব্দীর মধ্যে এখানে তোসাদ্দক খাঁ, কালে খাঁ, শ্যাম পাণ্ডে, আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েত খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদদের শুভাগমন হয়েছিল। ঢাকা শহরে সঙ্গীত বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বলদার চৌধুরী জমিদার, আর কল্যাণগঞ্জের রূপলাবুদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মফঃস্বলে ভাওয়াল, মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, শেরপুর, পুঁটিয়া, কালিয়া এবং আরও অন্যান্য স্থানের জমিদারেরা বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। আগে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিশেষ করে সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা আর প্রতিযোগিতা হত। বর্তমানে আর তেমন উৎসাহ বা চর্চা দেখা যায় না। ঝুলনের সময় লালমোহন সাহা শংখনিধির বাড়িতে এবং আরও অনেক স্থলে বিখ্যাত বাইজীদের কীর্তন গান হত। সেই সূত্রে জোহরা বাই, গওহর জান, মালকা জান, জানকী বাই প্রভৃতি অনেক নামকরা কীর্তনিয়ার আগমন হত।

কবি, পাঁচালী, হাফ আখড়াই, সখের যাত্রা প্রভৃতি নিম্নাদের আসরও এখন আর তেমন জমকালো হয় না। মধুকানের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যশোরের রাধা নাথ বাউলের কাছে 'ঢপ'ও শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর পালা-গানের মধ্যে মান, মাথুর, অক্রুর সংবাদ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতির এখনও নাম শোনা যায়। বরিশালের ভূষণ দাস এবং-র গোবিন্দ অধিকারী, গোলক চন্দ্র দাস অধিকারী প্রভৃতি বিখ্যাত পালা-গানের রচয়িতা এবং গায়ক ছিলেন।

এছাড়া বেউলা সুন্দরীর গান, মনের চাঁদের গান, ময়নামতির গান, দেওয়ান মদিনার গান পূর্ব-বাংলার বিশেষত্ব। এগুলো প্রধানতঃ নিরক্ষর গ্রাম্য কবিদের রচিত হলেও এসবের সাহিত্যিক মর্যাদা আর রস পরিবেশন ক্ষমতা সভ্যজগতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মহররমের সময় কারবালার শহীদানদের স্মৃতিতে মার্সিয়া গান হয়। আর বিভিন্ন প্রকার সাময়িক ঘটনা নিয়ে জারীগান তৈরি হয়। বিবাহে কাজরী, নৃত্যের সঙ্গে গম্ভীরা গান, মাঝিদের পীর বদরের গান বা শারী গান, গাজীর গান, মাদার পীরের গান, মনসার ভাসান, যোগিগান প্রভৃতি পূর্ব-বাংলার পল্লী আর শহর মুখরিত করে রাখত ; এখনও এর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

এইবার গানের মোটামুটি বিষয়-বস্তুর কথা কিছু বলেই শেষ করব। বাঙালী স্বভাবত ভাবপ্রবণ বা ভক্তিপ্রবণ, আবার সঙ্গে সঙ্গে বাক-চতুর। তাই পূর্ব-বাংলায় ভক্তি রসাত্মক আর মুর্শিদা বা দেহতত্ত্বের গান বিস্তর রয়েছে, এবং সে-সব গানের দৈর্ঘ্যও সাধারণতঃ বেশ বড়। হিন্দুস্থানী গান যেখানে চার লাইনেই শেষ হয়ে যায়, বাঙালীর গান সেখানে দশ পনের দশ-বারো লাইনের বেশি ছাড়া কম হবে না। গানের দৈর্ঘ্যে উর্দু বা ফার্সী গজলের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। আগেকার যুগে প্রণয়-সঙ্গীতের খুব অভাব ছিল। তখন দেব-দেবীর প্রণয়

টপ্পার কল্যাণে খোলাখুলিভাবে মানবীয় প্রণয়-প্রীতি গানের অঙ্গীভূত হল। তারপর রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ প্রভৃতির রচনা আর সুর যোজনায় কোনোরকম গানেরও এখন আর অপ্রতুলতা নেই। বাংলার গজল জগতে নজরুল ইসলাম যুগান্তর এনে দিয়েছেন। পরমার্থিক, লৌকিক, সবরকম গানেরই তিনি অফুরন্ত ভাণ্ডার। অবশ্য উর্দু-ফার্সী গজলও কিছুদিন আগে পর্যন্ত যথেষ্ট গাওয়া হত,-এখনও কিছু কিছু হয়। এতে আল্লাহ্-রসুলের বিষয়ের সঙ্গে আশেক-মা'শুকের প্রণয় ব্যাপারও রূপক ভাবেই হোক বা অনাবৃত ভাবেই হোক, গাওয়া হয়ে থাকে। বাংলায় পরমার্থিক গানের ভাব পর্যালোচনা করলে কয়েকটি ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। সংসার অনিত্য, ভাব-কাণ্ডারী গুরুকে বা মুর্শীদকে ধরে ভবনদী বা পুলসিরাত পার হতে হবে, ছয় রিপুই দাগা দিয়ে মানুষকে ভোগায়, শোক-মৃত্যু-জরা সবই আল্লাহ্র দান বলে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি। এ-ছাড়া "রাম-রহিম না জুদা কর ভাই, দিল কো সাচ্চা রাখো জী", এই ধরনের মিলন সঙ্গীত সুপ্রচুর। বিশেষ করে মারেফতি, মুর্শিদা আর বাউল গানের ভিতর দিয়ে মানুষের একত্ব বোধ জাগ্রত করার বিশেষ চেষ্টা হয়েছে। মন্দির আর মসজিদে যেন মানুষ-রতনের সন্ধান ব্যাহত না করে,— এইসব ভাব লোকের মনে দৃঢ় আসন গেড়ে বসেছে।

হাসির গান আর ব্যঙ্গ কৌতুকের সাহায্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ, জাতিভেদ, পণ-প্রথা, বিবাহ রহস্য, স্ত্রৈনতা, ফাঁকা বক্তৃতা প্রভৃতি অনেক সামাজিক কুপ্রথার উপর কশাঘাত করা হয়েছে। মোটের উপর গানের ভিতর দিয়ে বাঙালী হৃদয়ের কোমলতা, সহজ ধর্ম নিষ্ঠা, বাক-পটুতা এবং নানাবিধ সামাজিক রীতি-নীতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যে-বিষয়ে গবেষণা করলে অনেক তথ্য উদঘাটন করতে পারবেন।

মাহে-নও
ভাদ্র ১৩৬০

# ঢাকার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য

গত চল্লিশ বছর ধরে আমি ঢাকায় আছি। এই চল্লিশ বছরে আমি স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক কর্ম-প্রচেষ্টা নিরীক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি, তার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, চিত্রকলা, গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত, শিল্পকার্য, ধর্মোৎসব এবং সব রকমের সঙ্গীত। এর মধ্যে সঙ্গীতই আমাকে আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশী। ক্ষণকালের জন্যে হলেও সঙ্গীত মানুষের মনকে পার্থিব দুঃখ ও অশান্তি থেকে মুক্ত করে নিয়ে যায় স্বর্গীয় আনন্দের রাজ্যে। এই আনন্দকে যেমন সহজে উপলব্ধি করা যায়, তেমন সহজে বর্ণনা করা যায় না। তবু আমার যতদূর স্মরণ হয়, ঢাকার সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

ধ্রুপদ-সঙ্গীত আজ অবহেলিত এবং বিলুপ্ত প্রায়। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ ইমদাদ খান। তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট ও ব্যঞ্জনাময়, যদিও খুব সম্ভব বয়সের জন্যে তেমন জোরালো ছিল না। তাঁর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথা আমার এখনো মনে আছে। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি। মিটফোর্ড হাসপাতালের বিপরীত দিকে এক মেডিক্যাল মেসে দু'ঘন্টারও বেশী সময় ধরে তিনি মহেন্দ্র বসাকের পাখোয়াজ সহযোগে ধ্রুপদ সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। তিনি এমন একটা আবহের সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁর কণ্ঠস্বর, পাখোয়াজ এবং বিমুগ্ধ দর্শকদের আবেগময় হৃদয়-স্পন্দন সেদিন এক হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল ঠুংরী এবং টপ্পার মত হাল্কা সঙ্গীতের তুলনায় ধ্রুপদ-সঙ্গীত যে কতো উচ্চস্তরের এবং কতো মনোমুগ্ধকর, তা সেদিনই আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম।

গত ৪০ কি ৫০ বছরে খেয়াল-সঙ্গীতের নামজাদা শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোহাম্মদ হোসেন (খ্যাতনামা খেয়াল-শিল্পী তোসাদ্দক হোসেন খানের সাগরেদ,) চাঁদ ওস্তাদ (নওয়াবপুরে তিনি একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন), গৌর ওস্তাদ (মোহাম্মদ হোসেনের সাগরেদ), ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ (একটি সঙ্গীতজ্ঞ ঘরানা পরিবারের লোক), ওস্তাদ সালামত হোসেন (তোসাদ্দক হোসেনের পরিবারের লোক) কাশ্মীর রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষিত ওস্তাদ ভোলাগিরি, ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন (খসরু) এবং আরও কয়েকজন। ৫০ বছর আগে যে-সব ওস্তাদ ঢাকায় এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের কালে খানের নাম এখনো স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তানের উপর তাঁর সুন্দর দখল ছিল এবং উদারা থেকে তারা পর্যন্ত আড়াইটি অক্টেভে তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর খেলাতে পারতেন। জোহরা বাই এবং জানকী বাইয়ের (চাপান ছুরি) সঙ্গীতের আসরও উল্লেখযোগ্য। ঢাকার পঞ্চায়েতের আমন্ত্রণে তাঁরা এখানে আসতেন, বিশেষ করে ঝুলনের সময়।

উপরে যে-সব খেয়াল-শিল্পীর কথা বলা হলো, তাঁদের কেউ কেউ ঠুংরী সঙ্গীতেরও চর্চা করতেন। এ ছাড়া এ-সঙ্গীত শোনাতেন গাজী ওস্তাদ, বিলাত ওস্তাদ, এবং বাইরে থেকে

অনেক শিল্পীর, যেমন ত্রিপুরার শচীন্দ্র দেববর্মণ এবং কলকাতার দিলীপকুমার রায় ও কবি নজরুল, জ্ঞান সেন, মন্টু ঘোষ এবং কল্যাণী দাসও তাঁদের সুমিষ্ট গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন।

টপ্পা-সঙ্গীত একেবারে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন মাঝে মাঝে এ-সঙ্গীত গেয়েছেন। এ-সঙ্গীত তিনি শিখেছিলেন হাসনু মিঞার কাছে। তাঁর সুমিষ্ট ও সুচিক্কণ কণ্ঠস্বরের জন্যে তিনি স্মরণীয়। এ ছাড়া আমার টপ্পা সঙ্গীত শোনার সুযোগ হয়েছে নিতাই ঘটক, দর্শক মিঞার কাছে এবং 'বাংলোকার' ওস্তাদপুর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের কাছে। কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী টপ্পা-সঙ্গীত শুনিয়ে তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন।

ঢাকা ছিল তবলচীদের একটি বড় কেন্দ্র। স্থানীয় কালের মধ্যে সবচেয়ে বড় তবলচী ছিলেন ওস্তাদ প্রসন্ন বণিক। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের শিল্পী। তাঁর সাগরেদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুক্তাগাছার জমিদার রায়-বাহাদুর কেশব ব্যানার্জী। প্রসন্ন বাবুর সাথে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে। তখন তাঁর শ্রবণ-শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও তিনি স্বহস্তে তবলা বাজিয়ে কেশব বাবুকে তবলা শিক্ষা দিতেন এবং শুধু চোখে দেখেই তাঁর ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারতেন। কেশব ব্যানার্জী নিজে সঙ্গীতের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্পী ছিলেন। বাইরে থেকে এসে যে-সব বিশিষ্ট শিল্পী খেয়াল বা ঠুংরী গাইতেন, তিনি তাঁদের সাথে সঙ্গত করতেন। কায়েতটুলীর গোলাপ ওস্তাদজী ছিলেন আরেকজন নামকরা সঙ্গতিয়া। রায়-বাহাদুর এবং গোলাপ ওস্তাদজীর বিশেষত্ব ছিল স্বর-সাধনাদের সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং সঙ্গীতের নিগূঢ় মর্ম অনুধাবনের ক্ষমতা। আরেকজন তবলা-শিল্পী ছিলেন নওয়াবপুরের রবীন্দ্র বসাক। ঢাকার অন্যান্য তবলচীদের তুলনায় তিনি ছিলেন বেশী ক্লাসিক্যাল-ধর্মী। যেকোন ওস্তাদজীর সঙ্গে তিনি সঙ্গত করতে পারতেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী প্রসন্ন বণিকের শিষ্য। নওয়াবপুর ছিল তবলচী ও পাখোয়াজীদের কেন্দ্রস্থল। নওয়াবপুরের তবলচীরা সাধারণতঃ বাজনার উপর জোর দিতেন। তাঁরা জোরে তবলা বাজাতেন বলে অনেক সময় কণ্ঠসঙ্গীত চাপা পড়ে যেত, আর তার ফলে সঙ্গীতের মাধুর্য ক্ষুণ্ন হতো। এ-প্রসঙ্গে লালজী এবং গোঁসাইজীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠায়দুন, চৌদুন, গোলাইয়া কেলিয়া, পরান, আড়ি এবং তেহাইয়ে সুদক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রায়ই সঙ্গীত-শিল্পীদের সাথে তাল রেখে চলতে পারতেন না।

যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যক্তিমান ছিলেন ভগবান সেতারী। তিনি একজন সত্যিকারের শিল্পী ছিলেন। যেকোন আবেশ এলে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নতুন নতুন রাগের মূর্ছনা সৃষ্টি করে যেতেন। বিভিন্ন রাগের বাজনার সাথে তাঁর শরীর দুলতো, আর মনে হতো তাঁর শরীরও যেন তাঁর যন্ত্রের অংশবিশেষ। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন [illegible] হাবিব ওস্তাদ। সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্যে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করেছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি পাঞ্জাবের কোনো এক সঙ্গীত কেন্দ্রে সেতার বাজাতে শিখেছিলেন। তাঁর ছেলে ছোট্ট মিঞা ১২ বছর বয়সে সেতার বাজাতে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিল। এ-বয়সে অবশ্য কেবল টেকনিকই প্রাধান্য পেয়ে থাকে; বয়স বাড়লে তবেই শিল্পস্ফূর্তি আসে। ছোট্ট মিঞা পরে প্রকৃতই শিল্পদক্ষতা অর্জন করেছিলেন, কারণ কয়েক বছর পর তিনি নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঢাকার আগত শিল্পীদের মধ্যে [illegible] নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ সালের কাছাকাছি সময়ে

ময়মনসিংহের গৌরীপুর থেকে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২০। ঢাকায় তিনি কিছুদিন ছিলেন। তিনি ছিলেন ওস্তাদ এনায়েত খানের পরিবারের অন্তর্গত। সেতারে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল। রাজা আজম সাহেব ছিলেন সেকালের ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীতের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক তাঁর বাড়ীতে একবার তিনি সেতার বাজানর এমন দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে, ভগবান সেতারীকে (তিনিই সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন) কিছুতেই সেতার বাজাতে রাজী করানো যায়নি।

ভগবান সেতারীর ভাই (যাঁর নাম আমি ভুলে গেছি) একজন বিশিষ্ট এসরাজ-শিল্পী ছিলেন। আরেকজন এসরাজ-শিল্পী ছিল সিক্রেটের শিবু বাবু। বর্তমানে যেখানে ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের অফিস যে বাড়ীতে আছে, সেই বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। তাঁর হাতে এসরাজ যেন মানুষের মতো আবেগভরে কথা বলে উঠতো।

বেহালা বাদনের জন্যেও ঢাকা বিখ্যাত। সাধারণতঃ একজন কারিগর বেহালা বাজায় আর ছোট ছোট ছেলেরা তালে তালে গান গায় এবং ড্রাম পেটায়। কারিগরের সাথে সাথে ছেলেরাও গান গায় অথবা নৃত্য করে। ড্রাম পেটানোই এখানে তবলার কাজ করে। বস্তুতঃ ফুর্পানিয়া ইমদাদ ওস্তাদের জীবন আরম্ভ হয়েছিল এ-রকম একজন বালক-শিল্পী হিসেবেই। এতে বোঝা যায় যে, সঙ্গীতে যার প্রকৃত আগ্রহ ও প্রতিভা আছে, তাঁর পক্ষে ড্রাম-পেটানো গান সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে কতখানি কার্যকরী হতে পারে। এ-প্রসঙ্গে এও লক্ষ্য করার বিষয় যে সঙ্গীতের তাল-সুরের সঙ্গতি-অসঙ্গতি সম্পর্কিত তত্ত্ব না জানা থাকা সত্ত্বেও একজন নিরক্ষর শিল্পী কিরূপ মহৎ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে, যা থেকে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ আনন্দে বলেন "গান সুধা নিরবধি।" কার্জন হলের এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম বংশীবাদক কুমিল্লার আফতাবুদ্দিন খান বাঁশী শুনিয়েছিলেন। তাঁর বাঁশীর মোহিনী যাদুতে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হারমোনিয়ামেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। হারমোনিয়ামের নামকরা ওস্তাদ আবতার ও সালামের হারমোনিয়াম বাজানো শোনার সুযোগও আমার হয়েছে। আবতারের হারমোনিয়াম বাজানো শুনেছিলাম মাহুতটুলীতে তাঁর বাড়ীতে এবং সালামের বাজনা শুনেছিলাম দিলকুশায় রাজা আজমের বাড়ীতে। তাঁদের কৃতিত্ব ছিল এইখানে যে, তাঁরা বড় বড় সঙ্গীত-শিল্পীদের সব রকম ক্লাসিক্যাল রাগ সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারতেন, এবং গায়কেরা যখন নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে থামতেন, তখনো তাঁরা বিভিন্ন রাগ রূপায়িত করতে ও তাল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন।

অন্যান্য সঙ্গীত যথা কাওয়ালী, মর্সিয়া, কীর্তন, ভজন, ঢপ, ভাটিয়ালী, বারমাস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই না। যেটুকু বলা হয়েছে তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বহুকাল থেকেই বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত ও নৃত্য ঢাকার অধিবাসীরা উপভোগ ও চর্চা করে এসেছে। ওস্তাদদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন মুসলমান, কিন্তু তাৎপর্যের বিষয় এই যে, হিন্দু শিক্ষিত-সমাজই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। প্রধানতঃ সরস্বতী পূজা ও ঝুলন যাত্রা উপলক্ষেই ওস্তাদদের নিয়ে আসা হতো। ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে কমার্শিয়াল একাডেমীতে ওস্তাদদের একটা বড় কেন্দ্র ছিল। বিভাগ-পরবর্তী কালে সঙ্গীত-শিল্পে ভাটা পড়েছে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল এবং রেডিও পাকিস্তান এর এই অবনতি কিছু পরিমাণে রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। বুলবুল একাডেমীও এ-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে। একাডেমীতে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত এবং নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এইসব

প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের সমাবেশে ক্লাসিক্যাল ও অন্যান্য সঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ আবার ফিরে আসবে, পশ্চাদগামিতার অবসান হবে এবং সঙ্গীত-শিল্প নতুন বিকাশের পথে অগ্রসর হবে।

৯ম সংখ্যা, পরিক্রমী বর্ষ, ১৯৫৬

# বাদ্য-যন্ত্রের স্বর-ভঙ্গী

কোন শব্দ শুনিবামাত্রই আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারি উহা কিসের শব্দ। পরিচিত ব্যক্তিকে তাহার কথা শুনিয়া অনায়াসে চিনিতে পারি; তবলা, হারমোনিয়াম বা এস্রাজ বাজিতে থাকিলে, চোখে না দেখিয়াও বলিতে পারি কোন্ যন্ত্র বাজিতেছে, ঘড়ির টিক্‌টিক্, চাবুকের শপাশপ, বৃষ্টির টাপুরটুপুর, বিদ্যুতের কড়্‌কড়্, পাখীর কিচিরমিচির এসব আমাদের এত পরিচিত যে, একটিকে অন্যটি বলিয়া ভ্রম করা একরকম অসম্ভব।

কোন্ শব্দ ক্ষণকাল স্থায়ী, কোন্‌টি অধিকক্ষণ স্থায়ী : কোন্‌টি অতি মৃদু, কোন্‌টি সমধিক উচ্চ, কোন্‌টি খাদে বাজে, কোন্‌টির বা চড়া সুর। সেতার বীণা প্রভৃতির ক্ষীণ আওয়াজের সঙ্গে ব্যাঞ্জো পিয়ানোর অপেক্ষাকৃত উচ্চ রবের পার্থক্য অনুভব করা কিছু শক্ত নয়। সেইরূপ নারীকণ্ঠের উঁচু পর্দার গান শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়, উহা পুরুষের গলা নহে। আবার ঢাক-তবলার আকস্মিক আরম্ভ ও দ্রুত নিঃশেষ লক্ষ্য করিলেই অর্গান বেহালা বা তানপুরার সুরের সহিত সে শব্দের ভুল হইবার কথা নহে।

শব্দের এই ভঙ্গীর বাহ্য কারণ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিব। আমরা জানি, বায়ুর কম্পনই শব্দোৎপত্তির কারণ। কম্পন নানা প্রকার হইতে পারে। বায়ু-কণার বিশুদ্ধ দোলন-গতি হইতে যে-শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকেই অমিশ্র সুর বা নামান্তরে স্বর বলা হয়। প্রত্যেকের শব্দ করিবার বা ধ্বনিত হইবার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, যাহার দরুন শব্দের প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা একরূপ থাকিলেও উহাদের বিভিন্নতা অনায়াসে ধরা পড়ে। শব্দের এই বিশিষ্টতাকে উহার ভঙ্গী বা ব্যঞ্জনা বলা হয়।

অঙ্ক কষিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত ফুরিয়ার দেখাইয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পুনরাবৃত্তি করে, এমন যে-কোন চিত্র বা গতিকে অনেকগুলি বিশুদ্ধ দোলন বা দোলনগতির সমবায়ে গঠন করা যাইতে পারে, তাহাও আবার একভাবে ছাড়া দুইভাবে হয় না। শুধু গণিত শাস্ত্রে নয়, যন্ত্রাগারে বিশেষ পরীক্ষা দ্বারাও একথা প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক বাদ্যযন্ত্রাদির সুরের বায়ু কম্পন-রীতির চিত্র গ্রহণ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার কোনটিই অমিশ্র দোলন-চিত্র নহে। বস্তুতঃ স্বাভাবিক শব্দ প্রায় ষোল আনাই বিভিন্ন দোলন কম্পনের বিচিত্র মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। কেবল বড় মুখ-ওয়ালা অর্গান-নল আর স্থূল সুগঠিত স্বর-শলাকা মৃদুভাবে বাজাইলে যে শব্দ হয়, তাহাই অমিশ্র দোলন-স্বর। এইরূপ স্বর আমাদের কানে বড় প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না; কেমন যেন একঘেয়ে ও নাকি রকমের শুনায়; অধিকক্ষণ শুনিলে ক্লান্তি ও বিরক্তির সহিত একরূপ অনৈসর্গিক অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন দোলন-কম্পনের যে বিচিত্র মিশ্রণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা কম্পনের প্রাবল্য ও দ্রুততার প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মিশ্র সুরের তীক্ষ্ণতা নির্ণয় করিবার সময় সাধারণতঃ আমরা উহার ধীরতম কম্পন-সংখ্যাই ধরিয়া থাকি। এই ধীরতম বা প্রধান কম্পনের সহিত যে-সমস্ত

দ্রুততর কম্পন মিশ্রিত থাকে তাহাকে উহার উচ্চাংশ বা উপরাংশ বলা যাইতে পারে। কোন কোন শব্দের উপরাংশগুলি প্রধান সুর অপেক্ষা দুই তিন চার পাঁচ এমন কি চৌদ্দ পনের গুণ পর্যন্ত দ্রুত হয়। আবার কোন কোন শব্দে উপরাংশগুলি প্রথম স্বরের সহিত এইরূপ কোন সহজ সম্বন্ধ রক্ষা করে না। আমরা প্রথমোক্তগুলিকে সরল উপরাংশ বলিয়া শেষোক্তগুলিকে জটিল উপরাংশ বলিব। জটিল উপরাংশ প্রবল হইলে সুরের মিষ্টতা থাকে না। জলতরঙ্গ, তবলা, ঢাক-ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতিতে জটিল উপরাংশ আছে। জলতরঙ্গ ও তবলার উপরাংশগুলি প্রধান সুর হইতে অত্যধিক দূরবর্তী হওয়াতে তাহার সহিত বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে না। তাহা ছাড়া ও-গুলি ক্ষীণ এবং স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়াতে সুরের মিষ্টতা ততটা নষ্ট করিতে পারে না। কাঁসার ঘণ্টার উপরাংশ না বলিয়া বরং নিম্নাংশ বলাই ঠিক; কারণ ইহাদের দ্রুততম সুরটি সর্বাপেক্ষা প্রবল হওয়াতে তাহা দ্বারাই উহার তীক্ষ্ণতা নিরূপিত হয়। সাধারণতঃ এগুলি অন্য যন্ত্রের সহযোগে বাদিত হয় এবং সুরের মিষ্টতা অপেক্ষা তাল রক্ষণই ইহাদের প্রধান কাজ।

বায়ু কিভাবে কম্পিত হইতেছে, তাহা চিত্র-সাহায্যে দেখাইবার অনেক উপায় আছে। তন্মধ্যে প্রফেসর মিলারের উদ্ভাবিত ফোনোডাইক যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে; একটি হর্নের সম্মুখে শব্দোৎপাদক যন্ত্র বাজান হয়। সেই হর্নের সরু দিক একটি অতি সূক্ষ্ম কাঁচের পাত দিয়া বন্ধ করা থাকে। এই কাঁচের চওড়াই এক ইঞ্চির তিন সহস্র অংশের অধিক হইবে না। এইরূপ সরু পাত অত্যন্ত নমনশীল হয়। হর্নের ভিতর দিয়া শব্দ কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়া এই পাতের উপর পড়ায় ইহা শব্দের সহিত সমান তালে কাঁপিতে থাকে। সুতরাং ইহার কম্পন বায়ু-কম্পনেরই অনুকৃতি মাত্র। এই পাতের মধ্যস্থলে একটি সরু তার আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই তার একটি খাড়াভাবে রক্ষিত গোলাকার ইস্পাত-দণ্ডের চারিদিকে এক পাক আবেষ্টন করিয়া থাকে। ইস্পাত-দণ্ডটি খাড়াভাবে থাকিয়া যাহাতে অতি অল্প টানেই ঘুরিতে পারে, তাহার যথোচিৎ ব্যবস্থা করা আছে। দণ্ডটির সহিত একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ আয়না লাগান থাকে। আয়নাখানি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক ইঞ্চির প্রায় পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। পূর্বোক্ত পাতের কম্পনের সহিত সরু তারটির উপর একবার টান পড়ে, আবার সেটি ঢিলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাত দণ্ড ও তৎসংলগ্ন আয়নাখানি খাড়া থাকিয়াই এপাশ-ওপাশ দুলিতে থাকে। ক্ষুদ্র একটি আলোক-রশ্মি আয়নার উপর ফেলিয়া লেন্সের সাহায্যে তাহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ফটো তুলিবার ফিল্মের উপর ফেলা হয়। আয়নার কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীভূত আলোক ফিল্মের উপর সরল রেখা উৎপন্ন করিতে থাকে। আবার এই ফিল্মকে সমান বেগে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা থাকে। কাজে কাজেই ইহার উপর ঢেউয়ের মত রেখা অঙ্কিত হইতে থাকে। এই রেখা দ্বারাই বায়ু-কম্পনের রীতি অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। কারণ এই ঢেউয়ের মত চিত্র হইতেই কোন্ সময়ে বায়ু-কণা মধ্য-রেখা হইতে বা স্বাভাবিক অবস্থান হইতে কত দূরে ছিল, তাহার পরিমাপ পাওয়া যাইতেছে।

একদিকে যেমন সুরে উপরাংশের অভাব থাকিলে আওয়াজ একঘেয়ে ও নাকি হয়, অন্যদিকে তেমনি অতি-তীক্ষ্ণ উপরাংশগুলির প্রাবল্য থাকিলেও সুর কর্কশ ও পীড়াদায়ক বোধ হয়। সঙ্গীতজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে, সুমিষ্ট সুরে অন্তত নয়-দশটি উপরাংশ থাকা আবশ্যক, আর ঊর্ধ্বতন উপরাংশগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিবে। তারের যন্ত্রে সাধারণতঃ এই দুইটি শর্তই প্রতিপালিত হয়। এজন্য তারের যন্ত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পক্ষে

সমধিক উপযোগী। কেবলমাত্র একটি তার টান করিয়া দুই দিকে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে ঘা দিলে অতি ক্ষীণ আওয়াজ হয়; কিন্তু ঐ তার যে যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, তাহার কাঠ ও তন্মধ্যস্থ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হওয়াতে জোরালো সুর বাহির হয়। অভ্যন্তরস্থ বায়ুর একটি নিজস্ব স্বাভাবিক কম্পন আছে। তারের কম্পন সংখ্যা তাহার নিকটবর্তী হইলে অভ্যন্তরস্থ বায়ু প্রবলভাবে আন্দোলিত হইয়া সেই সুর উৎপন্ন করে। এজন্য অন্যান্য সুর অপেক্ষা এই বিশেষ সুরটি অধিক জোরে ধ্বনিত হয়। ইংরেজীতে ইহাকে wolf not বলে। যাঁহাদের এস্রাজ বাজাইবার অভ্যাস আছে তাঁহারা এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই সুরের নিকটবর্তী সুর বাজালে অনেক সময় (হারমোনিয়ামের পাশাপাশি পর্দা টিপিবার মত) কর্কশ ও কম্পিত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এস্রাজ পুরাতন হইলে এবং বাদক সুদক্ষ হইলে এটি তত লক্ষ্যযোগ্য হয় না। এস্রাজ যন্ত্রের মূল তার বা নায়কী তার ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলি তার বা চিকারী থাকে। এগুলি বিভিন্ন সুরে বাঁধা থাকে বলিয়া নায়কী তারের সুরের সহিত বা তাহার কোনো উপরাংশের সহিত ইহাদের যেটি সমসুরে বাঁধা থাকে সেইটি ধ্বনিত হইয়া সুরের পুষ্টি সাধন করে। এস্রাজে বাঁধা ঘাট থাকিলেও ঘাট হইতে একটু এদিক-ওদিক হাল্কাভাবে স্পর্শ করিয়া সুরের কম্পন ও স্পর্শ-সুর প্রকাশ করা যায়, এবং ইচ্ছা করিলে অবিচ্ছেদে সুর হইতে সুরান্তরে গমন করিতে পারা যায়। এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতি যে-সমস্ত যন্ত্র ছড় দ্বারা বাজান হয়, তাহাদের উপরাংশগুলি প্রধান সুর অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষীণ; বস্তুত ক্রমিক উপকরণগুলির উচ্চতা ১+২², ১+৩², ১+৪², এইরূপ বর্গহারে কম হয়। বেহালার খোলের গঠন এস্রাজ হইতে ভিন্ন; উহার তার ক্যাটগাটের, খাদের তার রৌপ্যমণ্ডিত, এবং ঘাট বাঁধা নাই। এইসমস্ত কারণে এস্রাজ অপেক্ষা ইহার সুর অধিক মোলায়েম হয়, এবং বাদকের স্বাধীনতা কিছু বেশী থাকে। তার নমনীয় হইলে উপরাংশগুলি সরল হয়, অর্থাৎ প্রধান সুরের সহিত সহজ সম্বন্ধ রক্ষা করে। খাদের তার ভারী করিতে গিয়া বেশী মোটা করিলে পাছে অনমনীয় হইয়া পড়ে এজন্য ভাল বেহালার খাদের তারে ক্যাটগাটের উপর সরু রূপালী তার দিয়া মোড়া থাকে, তাহাতে নমনীয়তা রক্ষা করিয়াই ওজনে ভারী করার সুবিধা হয়। তারের যন্ত্রের ঠিক কোন স্থলে আঘাত করিতে হইবে, বা ছড় চালাইতে হইবে এ বিষয় রসজ্ঞ ওস্তাদদের ভিতর কোন মতভেদ নাই। তাঁহারা উৎকৃষ্ট আর্টের খাতিরে তারের নিম্নভাগ হইতে প্রায় দশমাংশের নিকট ছড়, মেজরাব বা কাটা চালাইয়া থাকেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম হইতে নয়টি উপরাংশে ধ্বনিত হইবে দশমটি থাকিবে না। প্রথম হইতে নয়টি উপরাংশে পরিমাণ মত থাকিলেই সুমিষ্ট স্বর নির্গত হয়। বেহালা বাজাইবার সময় বাম হস্তের অঙ্গুলি দিয়া তারের দৈর্ঘ্য বাড়ান-কমান হয়। সেই সঙ্গে অভিজ্ঞ বাদক ছড়-প্রয়োগের স্থানটিকেও একটু এদিক-ওদিক করিয়া থাকেন; মোটের উপর সর্বদাই এই প্রয়োগস্থল কম্পমান তারের দশমাংশের কাছাকাছি থাকে। তানপুরা বাজাইবার সময় সাধারণত সমস্ত তারটিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া নিম্নভাগ হইতে তাহার চতুর্থ অংশে অঙ্গুলী চালনা করা হয়। সাত ভাগ করিয়া তাহার যে-কোন অংশে আঘাত করিলেই ফল একই হয়, তবে সাধারণত কাঁধের উপর ফেলিয়া বাজান হয় বলিয়া চতুর্থ অংশে অঙ্গুলী চালনা করাই সুবিধা। যাহা হউক, এই প্রণালীতে বাজাইলে সপ্তম উপরাংশটি ধ্বনিত হইবে না। তানপুরার পক্ষে প্রথম ছয়টি উপরাংশে বর্তমান থাকিলেই যথেষ্ট। সুন্দর স্বর নির্গত হয়। তীক্ষ্ণতর উপরাংশগুলি স্বভাবতই ক্ষীণ—তাহার অভাবে ইহার মিষ্টতার ততটা ব্যাঘাত ঘটে না।

সেতার, পিয়ানো, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি যে-সমস্ত যন্ত্রে তারের উপর আঘাত করিয়া স্বরোৎপাদন করা হয় তাহাতে উপরাংশগুলি এস্রাজ ও বেহালার মত ক্ষীণ হয় না। এজন্য এসব যন্ত্রে তীব্রতম উপরাংশগুলি বর্তমান থাকে, এবং উহাদের উচ্চতা যথাক্রমে প্রধান সুরের অর্ধেক, এক-তৃতীয়, এক-চতুর্থ, এক-পঞ্চম এইরূপভাবে কম হয়। সেতার ও ব্যাঞ্জোতে মেজরাব বা কাঠির আঘাতে কাটা-কাটা সুর বাহির হয়। প্রত্যেকটি সুর ধ্বনিত হইবার পর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই থামিয়া যায়। এজন্য ক্রমাগত টোকা দিয়া ইচ্ছামত সুর নির্গত করিতে হয়। তবলার সহিত তালে তালে বাজাইবার পক্ষে এইসমস্ত যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। গমক, স্পর্শসুর, মূর্ছনা প্রভৃতির সাহায্যে এসব যন্ত্রে চমৎকার সুর-ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা যায়। পিয়ানোতে এক-যোগে বহু সুর বাজাইয়া হার্মনী প্রকাশ করিবার সুবিধা আছে। তাহা ছাড়া উহার তারে আঘাত করিবার যে কাঠিগুলি পর্দার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহার অগ্রভাগে নরম পদার্থের পুঞ্জলী থাকায় সুর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম হইয়া নির্গত হয়। কিন্তু ইহাতে এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায় বাঁধা পর্দার মধ্যবর্তী সুর ধ্বনিত করিবার কোন উপায় নাই। বাঁধা পর্দার সমুদয় যন্ত্রেই হার্মনী প্রকাশের পক্ষেও মূল সুর হইতে চড়া বা খাদে নামাইয়া বাজাইবার পক্ষে কিছু না কিছু অসুবিধা আছে। ইচ্ছামত সুরের স্বাধীনতা বেহালা বা ভাইয়োলীন শ্রেণীর যন্ত্রেই সবচেয়ে বেশী। বাঁধা পর্দার সমুদয় যন্ত্রের বিভিন্ন পর্দার গাইবার ও বাজাইবার সুবিধার জন্য Temperament বা সুর সমীকরণের আশ্রয় লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে শুদ্ধ সুর হইতে অতি সামান্যই ব্যতিক্রম হয়। একক বাজাইবার সময় এই সামান্য বেসুর কানে ঠেকে না, কিন্তু কনসার্ট বা সহযোগ-বাদনের সময়, রসজ্ঞ আর্টিষ্টের কানে তাহা ধরা পড়ে। ইহার কারণ বলিতে হইলে বিভিন্ন সুর ও উপরাংশসমূহের সমবায়ে উৎপন্ন কম্পিত সুর, যৌগিক সুর ও বিয়োজক সুরের মোটামুটি আলোচনা করিয়া তাহার সহিত বাদী ও বিবাদী সুরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়। এজন্য সে আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রাখা হইল।

হারমোনিয়াম, আমেরিকান অর্গান প্রভৃতি যন্ত্রে একটি ধাতু নির্মিত অবলং-আকৃতি সরু পাত বা রীডের কম্পনে একটি সম-আকৃতি ছিদ্র একবার বন্ধ হয় একবার খুলিয়া যায় বলিয়া শব্দ উৎপন্ন হয়। রীডগুলিকে আন্দোলিত করিতে হইলে বা সুরগুলিকে স্থায়ী করিতে হইলে বেলো করিয়া উক্ত ছিদ্র-পথে বায়ু সঞ্চালন করিতে হয়। বাঁধা-পর্দা থাকার দরুন যে-অসুবিধা তাহা ইহাতে পূর্ণমাত্রায় আছে; তাহা ছাড়া উপরাংশগুলি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সুর যেন কানের ভিতর বিঁধিতে থাকে। অর্গান যন্ত্রে প্রত্যেক রীডের সহিত উপযুক্ত আকৃতি ও মাপের পাইপ সংলগ্ন থাকায় মূল সুরের প্রাধান্য বর্ধিত হইয়া উপরাংশের প্রাধান্য খর্ব হয়, এজন্য সুর অনেকটা মোলায়েম হয়। কিন্তু হারমোনিয়াম ও আমেরিকান অর্গানে এরূপ ব্যবস্থা না থাকায় অতিশীঘ্র ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপন্ন করে।

ফ্লুট, মুরলী প্রভৃতি যন্ত্রে রীড নাই—কেবল লাইন আছে। ইহাদের গায়ে কতকগুলি ছিদ্র থাকে, সেগুলি খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া বিভিন্ন সুরোৎপাদন করা হয়। প্রথমে হয়ত অঙ্গুলী চালনার যাহাতে সুবিধা হয় সেইরূপ স্থানেই ছিদ্রগুলি করা হইত। অবশেষে সঙ্গীতের প্রয়োজন অনুসারে ছিদ্রগুলির অবস্থান ও আয়তন উভয়ই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রে সুর বোদ্ধাদের প্রচলিত রীতি থিওরীর নিখুঁত হিসাব-নিকাশকে অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছে, দেখা গিয়াছে চড়াসুরে বাজাইলে পিতল বা অন্য ধাতু নির্মিত ফ্লুট অপেক্ষা কাঠের বা বাঁশের বাঁশরী

অধিক শ্রুতিমধুর হয়। সম্ভবতঃ কাঠের ঘর্ষণে উপরাংশগুলি কিঞ্চিৎ ক্ষীণতর হওয়াতেই এরূপ হয়। ফ্লুট ও মুরলী চড়া সুরে বাজাইলেই অধিক মিষ্ট হয়। কিন্তু অতিরিক্ত চড়াইতে গেলে খুব জোরে ফুঁ দিতে হয় বলিয়া উপরাংশের অত্যধিক প্রাধান্যে সুর কড়া হইয়া পড়ে। এরূপ সুর জোরাল সঙ্গীতের সহিত ছাড়া বিশেষ প্রীতিকর হয় না। আবার অধিক নিম্ন-পর্দায় খুব আস্তে ফুঁ দিতে হয় বলিয়া উপরাংশ অতিসামান্যই থাকে, এজন্য সুর একটানা ও নির্জীব হইয়া পড়ে। পরিমাণমত চওড়া ও সুন্দর সুর উৎপাদন করিবার পক্ষে পিক্কলো যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। পিক্কলো আর কিছুই নয়, ক্ষুদ্র আকারের ফ্লুট মাত্র। মুরলীও ছোট করিয়া তৈয়ার করিলে পিক্কলোর কাজ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য বাঁধা অসুবিধা এসব যন্ত্রেও বর্তমান আছে। তা ছাড়া শীত-গ্রীষ্মে সুর সামান্য একটু ওঠানামা করিয়া থাকে। ক্লারিওনেট যন্ত্রে একটি ক্ষুদ্র ফুঁদেলের মত মুখে ঠোঁট লাগাইয়া ফুঁ দিয়া বাজাইতে হয়। আকৃতি অনেকটা ফ্লুট জাতীয় যন্ত্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাতে বেতের রীড আছে, এই রীড ক্লারিওনেটের এক প্রান্তে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে পর্যায়ক্রমে একবার খুলিয়া দেয় আবার বন্ধ করে। এই মুখ যখন খোলা থাকে তখন ইহার ভিতর দিয়া বায়ু প্রবেশ করে, বাহির হইয়া যাইতে পারে না। এই কারণে সমুদয় উপরাংশ পাওয়া যায় না; প্রধান সুরের পরেই যে উপরাংশ তাহার সংখ্যা উহার তিনগুণ। অন্য কথায়, প্রধান সুরটির সা ধরিলে উপরাংশটি চড়া সার পরবর্তী পা। এই দীর্ঘ ব্যবধান পাকাতে বহুসংখ্যক পার্শ্বছিদ্রের আবশ্যক। ছিদ্রগুলি বোতামের মত চাক্তি দ্বারা আবৃত থাকে, টিপিলেই খুলিয়া যায়। মোটের উপর পর্দা বেশী থাকায়, বাজাইতে দক্ষতার প্রয়োজন। যে-সকল উপরাংশের কম্পন দ্বিগুণ, চারগুণ বা ছয়গুণ দ্রুত, সেগুলি বর্তমান থাকে না, থাকিলেও অতিশয় ক্ষীণভাবে থাকে; এজন্য ক্লারিওনেটের সুর-ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট প্রকারের হয়। তা ছাড়া রীডের আকৃতির উপরও সুরভঙ্গী কিছুটা নির্ভর করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা মানুষের কণ্ঠ-স্বর সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়াই উপসংহার করিব। ফুসফুস্ হইতে বায়ু নির্গত হইয়া স্বরসূত্রের উপর পড়ায় শব্দ উৎপন্ন হয়। দুইটি পর্দার রীড পাশাপাশি সংলগ্ন থাকে। এই দুইটি মিলিয়া ১টি স্বরসূত্র হয়। বায়ুর বেগে রীড দুটি স্পন্দিত হইয়া একবার বিচ্ছিন্ন হয় আবার জোড়া লাগিয়া যায়। স্বরসূত্রের স্পন্দমান রীড দুইটি বন্ধ হইবার সময় যদি সামান্য একটু ফাঁক থাকে, তবে স্বর কর্কশ হয়। সর্দি-কাশির সময় অধিক চেঁচাইলে স্বরসূত্রের ফাঁক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া গলা ভাঙিয়া গিয়া সাঁই সাঁই আওয়াজ বাহির হয়। সুকণ্ঠ ব্যক্তির সুর-সূত্রের পাশাপাশি রীড্ দুটি সম্পূর্ণরূপে গায় গায় লাগিয়া থাকে। মুখমণ্ডল নাসিকা প্রভৃতি গহ্বরের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ সুর সহধ্বনিত হইয়া নানারূপ সুরভঙ্গী বা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং সুগঠিত মুখগহ্বরের উপরেও সুরের মিষ্টতা অনেক নির্ভর করে। আবার বিভিন্ন প্রকার মুখ-ব্যাদানের ফলে সহধ্বনিত সুরের পরিবর্তন হয় বলিয়া অ আ ই উ প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরবর্ণও উচ্চারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা সুরকে ইচ্ছামত চড়ান ও নামান হইয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে খাদের সুর উচ্চারণ করিবার সময় সমগ্র স্বরসূত্র একযোগে নড়িতে থাকে; মধ্যম রূপ চড়া সুর উচ্চারণ করিবার সময় রীড্দ্বয়ের প্রান্তের দিকে সমুদয় অংশ স্পন্দিত না হইয়া উহাদের সংযোগ স্থলের পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত সরু অংশটুকু মাত্র স্পন্দিত হয়; আর, তীক্ষ্ণতম সুর বাহির করিবার সময় রীড্ দুইটির সংযোগ-স্থলের কতক অংশ দৃঢ় ও নিশ্চলভাবে থাকায় মধ্যবর্তী ফাঁকের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায় এবং স্বর-সূত্রের সামান্য অংশ মাত্র স্পন্দিত হয়। বলা

বাহুল্য, স্পন্দমান সূত্রটি যত সরু ও দৈর্ঘ্যে ছোট হইবে এবং উহাকে যত অধিক বলে টান দেওয়া যাইবে সুর ততই তীক্ষ্ণ হইতে থাকিবে। নারীকণ্ঠের স্বরসূত্র স্বভাবতই ক্ষুদ্রাকার, এজন্য পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের সুর চড়া হইয়া থাকে, আবার এই কারণেই শিশুকালের সুর পূর্ণ-বয়স্কের সুর অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ হয়। জিহ্বার অবস্থান, নাসিকার কুঞ্চন, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন ভঙ্গী, স্বরসূত্রের রীড্‌গুলির নমনীয়তা এবং ইহাদের মোলায়েমভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ হইবার ক্ষমতা,—প্রভৃতি নানা কারণে মনুষ্যকণ্ঠ উৎকৃষ্ট স্বর নির্গত করিবার পক্ষে অন্যান্য যন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য যন্ত্র নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে মনুষ্যকণ্ঠকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন সুকণ্ঠ ব্যক্তির সুরই তিন সপ্তকের বেশী বিস্তৃত হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং ব্যাপকতার দিক দিয়া অনেক যন্ত্রই কণ্ঠকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যে-সব সুর কণ্ঠে প্রকাশ করা যায় না অথচ কল্পনায় আসে, যন্ত্রের সাহায্যে সেইসব সুর বাজাইয়া মানুষ আর্টের আবেদন পূর্ণ করিয়া অশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

# মনীষী-মূল্যায়ন

# সাধক লালন শাহ্

সঙ্গীতপ্রিয় বাংলাদেশীয় সমাজে লোকগীতির ক্ষেত্রে সাধক লালন শাহ্ এত অজস্র ও অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন যে, এইসব পরমার্থ-সূচক মরমী গানের সহজ প্রকাশমাধুর্য ও লালিত্যের গুণেই তিনি বেশ কয়েক শতাব্দী যাবৎ বাঙালীর হৃদয়ে ভাব-লহরীর উদ্রেক করতে পারবেন। মরমী গানের প্রকৃতিই হচ্ছে, নানা রূপক দিয়ে অতীন্দ্রিয় ভাবকে প্রকাশ করতে হয়। অনেক সময় সেগুলো বুদ্ধি দিয়ে বেড় পাওয়া যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেই লোকে তৃপ্তি পায়। হৃদয়ের অলক্ষ্য ভাবগুলো যেন মনকে কোনও মনোহর উচ্চগ্রামে নিয়ে যায়; এ অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী না হলেও, এর ক্ষণিক-প্রাপ্তির আনন্দটাই বা কম কি? সমুদয় মরমী ভাবের জন্য উপযুক্ত ভাষা না থাকাতেই ভাবাবিষ্ট গায়ককে হয়ত কখনও এক-একটা আজগুবি শব্দের উদ্ভাবন করতে হয়, নয়ত রূপক-অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়ে ইঙ্গিতে ভাব-সঞ্চারণ করতে হয়, আবার কখনও হয়ত ঐশিক প্রেরণায় হঠাৎ দৃষ্টি খুলে যায়,—সে অবস্থায় অজ্ঞাতসারে 'অপরিচিত'-ও যেন পরিচিতরূপে আবির্ভূত হয়। এসব রহস্যের কথা কে কাকে বুঝাবে? যার যার মেকদার মত সেই সেই, একটা অর্থ ঠিক করে নেয়। তাইতে একটি বস্তু বা দৃশ্য এক এক জনের কাছে এক এক রূপে গৃহীত হয়। এই অনিশ্চিত ক্ষেত্রের প্রশ্নের সুনিশ্চিত জওয়াব নেই।

আমার মনে হয় সদ্‌গুরু সবাইকে শিক্ষা দেন, আর যে যতটুকু পারে সেইটুকু ধারণ করলেই মুরশিদ তুষ্ট হন। অবশ্য যার ক্ষমতা অধিক তাঁর দিকে গুরুর কৃপাও কিছু অধিক হয়। এসব অগম্য রাজ্যের কথায় আমার বিশেষ বক্তব্য নাই—তাই তর্ক বা বিচারের দিকে আমি যেতে চাইনে। তবে গণিতশাস্ত্রের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলতে পারি,—যখন বহু চেষ্টা করেও কোন অঙ্কের সমস্যা সমাধান করতে পারছিনে, তখন সময় সময় অবচেতন মনে বা স্বপ্নঘোরে হঠাৎ যেন অঙ্কের পেঁচ খুলে গিয়ে সমাধানটা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আধ্যাত্মিক জগতেও যে এটা হতে পারে না, তা কেমন করে বলবো? অকস্মাৎ হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারের অন্ধকার টুটে গিয়ে "বিদ্যুচ্ছটার মত দিব্য আলোকের আবির্ভাব" হওয়া আমি বিশ্বাস করি। শুনা যায়, একজন বিশিষ্ট আউলিয়ার মৃত্যুর পূর্বে শয়তান এসে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি যে বল, 'আল্লা আছেন',—তা প্রমাণ করতে পার?" "পারি" বলে আউলিয়া সাহেব এক-একটা করে প্রমাণ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু শয়তান তাঁর প্রত্যেকটা প্রমাণ যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করে দিল। এইভাবে দশ-বিশটা প্রমাণ রদ হয়ে যাওয়ায় আউলিয়া সাহেব খুব ফাঁপরে পড়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন মুর্শিদ তাঁকে বলছেন, "ওরে বেওকুফ—তুই কেন বলছিস্ নে যে, আল্লাহ্ আছেন, তা আমি 'বিল গায়ব'—বিশ্বাস করি।" মুর্শিদের এই কথা শুনামাত্র শয়তান অন্তর্হিত হল। বস্তুতঃ আল্লাহ 'অলখ' সাঁই। কখনও কখনও 'সলখ' হলেও বেশীর ভাগ সময়েই 'অলখ' বা অগোচর থাকেন। জ্যামিতি শাস্ত্রেও এমন অনেক 'সত্য' আছে, যা প্রমাণ করা যায় না, সেগুলোকে বলে স্বতঃসিদ্ধ।

উপরে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সদ্‌গুরুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যই গুরুরা অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞানদান করেন। এই ব্যাপার নবজন্মের সঙ্গে তুলনীয়। তাই পিতামাতার মতই গুরুও সম্মানীয়। কিন্তু তাই বলে গুরুকে আল্লাহর সমাসনে বসান যায় না; আর একমাত্র আল্লা ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা হারাম বা নিতান্ত গর্হিত কর্ম। অথচ আল্লাই আবার আগুন দিয়ে সৃষ্ট ফেরেশতাগণকে ও ইব্‌লিসকে আদেশ দিলেন, "তোমরা সবাই আদমকে সেজদা কর।" একথার কি ভেদ (গুপ্তরহস্য) রয়েছে তা একমাত্র আল্লাই জানেন, আর কেউ জানে না। তাছাড়া কেতাবে যে উক্তি আছে, আদমের পাঁজরের একটা হাড় খুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাওয়া বিবিকে সৃষ্টি করে আদম-হাওয়াকে বেহেশ্‌তে অবাধে একত্র বেড়ানোর অধিকার দিলেন; আর একটি গাছের ফল ছাড়া, অন্য সব গাছের ফল, যদৃচ্ছভাবে ভোগ বা ভক্ষণ করবার অধিকার দিলেন—এসবের তাৎপর্য কি? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। অবশেষে ইবলিসকে সাপের আকার ধারণ করায়ে তাকে দিয়ে হাওয়া বিবিকে প্রলুব্ধ করে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করানো এবং পরে হাওয়া বিবির সঙ্গে আদমকেও ঐ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করানো হলো, এই বা কেন? এরপর আদম-হাওয়ার মনে লজ্জার উদয় হওয়ায়, বেহেশ্‌তের গাছের লতাপাতা দিয়ে এরা যথাক্রমে পুরুষাঙ্গ ও নারী-অঙ্গ ঢেকে ফেল্‌লো এবং বেহেশ্‌ত থেকে তাদের বহিষ্কৃত করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আরও আশ্চর্যের বিষয় শয়তানের অনুরোধে তাকেও পৃথিবীতে চিরজীবন ভোর আদম-হাওয়া ও তার সন্তান-সন্ততিদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হল। এইসব আদিম রহস্য ও পরবর্তীকালে হাবিল-কাবিলের কেচ্ছার প্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটন—এসব কি আল্লার ইচ্ছাক্রমেই হল? না, এগুলো সবই ইবলিসের কারসাজী? আমরা একদিকে জানি আল্লাই সবকিছু ঘটনার নিয়ন্তা। তাহলে বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী যেসব ছলনা, দুষ্কর্ম চলছে এসবের জন্য কি তাঁর দায়িত্ব কিছুই নেই? তিনি শুধু সুকর্মই সংঘটন করেন, আর ইবলিসই সব দুষ্কর্ম করায়? ইবলিসের সঙ্গে কি আল্লার এক প্রকার ভাগ-বাঁটওয়ারার চুক্তি রয়েছে?—এসব বড় গুরুতর প্রশ্ন। আবার আমাদের বিশ্বাস-যোগে দেখতে পাই,—মানুষকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়া হচ্ছে,—"আমি ঈমান আনলাম আল্লার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কেতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলদের প্রতি, আর শেষ (অর্থাৎ কেয়ামতের) দিনের প্রতি, তকদীরের ভালমন্দ সবকিছু আল্লার তরফ থেকেই ঘটে এই সূত্রের প্রতি, এবং মৃত্যুর পরে যে পুনরুত্থান হবে তার প্রতি।" এই ঈমান কেউ নির্বিচারে (বিল্ গায়েব) বিশ্বাস করে, কেউবা তলিয়ে দেখে বিশ্বাস করে। এইসব গুরুতর প্রশ্ন জাগ্রত মনে উদয় হবেই। আল্লা স্বয়ং এসবের জওয়াবে যা বলেছেন তার ভাবার্থ হচ্ছে : আমি আমার বান্দাদের ভালমন্দ বেছে নেবার কিছুটা শক্তি দিয়েছি, আবার কতকটা কব্জেও রেখেছি; বস্তুতঃ আমি লোক বুঝে ব্যবস্থা নিয়ে থাকি,—ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করি, অক্ষমদের অবস্থা বিবেচনা করি, প্রকৃত অনুতপ্ত লোকদের মার্জনা করি; কিন্তু মুনাফেক এবং উদ্ধত সত্যদ্রোহীদের কিছুতেই ক্ষমা বা দয়া করিনে। অর্থাৎ, আল্লা তাঁর নিজের বিচার অনুসারে কাজ করেন, আর তিনি দয়াময় ও সর্বজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ মানুষের বিচারেও ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আল্লার ভুল হয় না। মোট কথা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহির্ভূত বিশাল ক্ষেত্রে মানবকুলের জীবনের অভিযাত্রা সহজ ও নিষ্কণ্টক নয়। তাই নজরুল আক্ষেপ করে বলেছেন :

কেন দিলে এ কাঁটা, যদি গো কুসুম দিলে?
ফুটিত না কি কুসুম, ও কাঁটা না বিঁধিলে।

এতক্ষণে হয়ত মানবের যাত্রাপথের দুস্তরতা ও জটিলতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে—এখন লালন-গীতি থেকে কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে খতিয়ে দেখা যাক, এই স্বয়ং-শিক্ষিত (বা অশিক্ষিত) ব্যক্তিটার মতি-গতি, ধ্যান-ধারণা কেমন ছিল। তিনি কি জাগ্রত-চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন? তাঁর মনে কি বিবিধ বিচিত্র প্রশ্নের উৎপত্তি হয়েছিল? আর হয়ে থাকলে তিনি এসবের কিরূপ সমাধান দিয়ে গেছেন?

১. পার করহে দয়াল চাঁদ আমারে,
ক্ষমহে অপরাধ আমার ভবকাগারে।
না হলে তোমার কৃপা সাধনসিদ্ধি কে করিতে পারে?
আমি পাপী তাইতে ডাকি, ভক্তি দাও মোর অন্তরে।
পাপী-তাপী জীব তোমার, না যদি করহে পার,
দয়া প্রকাশ করে,
পতিত-পাবন পাতক-নাশা বলবে কে আর তোমারে?
জলেস্থলে সব জায়গায় তোমার সর্ব কীর্তিময়,
ত্রিবিধ সংসারে
না বুঝে অবোধ লালন পড়ল বিষম ঘোরতরে।

এখানে দেখা যাচ্ছে,— লালনের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এক 'দয়ালচাঁদ' আল্লার উপরে। লালন জানেন, কোনও মানবের সাধ্য নেই, সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে তার সব কর্তব্য সম্পন্ন করে যাবার; তাই অপরাধী হিসাবে খেদ করছেন, আর আস্তাগফার চাচ্ছেন, গাফুর-উর-রাহীমের কাছে। বলছেন, জানি তুমি কৃপাময়, তবু সাহস পাইনে, আমার পাপ-ভয় তুমি খণ্ডন করবে কিনা, আমি ভয়ে অভিভূত। এটা ঠিক 'মুত্তাকী'র পরিচয়। নিজেকে 'অবোধ লালন' বলছেন, কাতর-মিনতির সহিত। এইত ভক্তের ভক্তি। কোন্ নবী আল্লার দরবারে এসে ভয়ে ক্রন্দন করেননি, দোজখের আগুন থেকে রেহাই চাননি? শেষে 'ঘোরতর' শব্দটি 'ঘোরতর বিপদ' বুঝাচ্ছে,—মনের আবেগে ব্যাকরণ বদলে গেছে। তবে এটা তেমন গুরুতর ভুল নয়, বরং 'পদ্যের নিষ্কৃতি' (Poetical license)।

২. সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন কয় জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কিসে রে!
কেউ মালা কেউ তসবী গলায়, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়?
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়, জেতের চিহ্ন রয় কার রে।
জগৎ বেড়ে জেতের কথা, লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন সে জেতের ফাতা, বিকিয়েছে সাত বাজারে।

অক্ষরজ্ঞানহীন লালনের মুখের এমন 'অন্তর ন্যাশনাল' মানবতার বাণী শুনলে বুঝা যায় কি গভীর ঔদার্য বিরাজ করছে ঐ 'উম্মী'র অন্তরে। এ শক্তির মূল কোথায়?—ধ্যানে, সাধনায়। এত উর্ধ্বে লাখের মধ্যে একজনও উঠতে পারেন কিনা সন্দেহ। এর গুণ-বিচার কি আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে শোভা পায়? আল্লা কি সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখেন না? হাঁ দেখেন, কিন্তু তাঁর কাছে যে যোগ্যতার বিচার আছে, তা কি মর্ত্যভূমিতে পাওয়া যায়? বলনা, পৈতে, টিকি, টুপী, লেংটি, ধুতি ইত্যাদি দিয়ে কি মানুষের বিচার করেন আল্লা? আল্লা কি

মানুষের মন বা হৃদয়ের খবর রাখেন না—তাঁর বেহেশ্‌ত-দোজখ কি মানুষের ইনছানিয়াৎ বা মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে বন্টিত হয় না? ফাঁকা বুলি ও জাঁকজমকের ধাপ্পাবাজীতে কি তাঁকে ভুলানো যায়? গানটাকে বেশ চমৎকার রগড় করে মুসলমান নরনারী আর হিন্দু বামন-বামনী চিনবার প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হয়েছে।

৩. খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥

আট কুঠরী* নয় দরজা* মধ্যে মধ্যে ঝলকা আঁটা।
তার উপর আছে সদর কোঠা আয়নামহল তায় ॥
মন তুই রইলি খাঁচার আশে, খাঁচা যে তৈরী কাঁচা বাঁশে
লালন কয় খাঁচা খুলে সে পাখী কোনখানে পালায় ॥

অতি সুন্দর গান। এর জিজ্ঞাস্য, আমাদের দেহের খাঁচার ভিতরে যে একটা জ্যান্ত পাখী (প্রাণ) রয়েছে, সেটা কোন্ পথে আসা-যাওয়া করে? আমার ক্ষমতা থাকলে চিরকাল ঐ পাখীটাকে দেহ-পিঞ্জরে ধরে রাখতাম। কিন্তু তা'ত হবার নয়। নশ্বর মানুষ, আমি ত কাঁচা বাঁশের মত বিকল হয়ে পড়বো। কিন্তু সব দরজায়ই আট-সাঁট করে ঘেরা রয়েছে; ফাঁকগুলোও আয়না দিয়ে মোড়া আছে, তাই তো আশ্চর্য লাগে—'ঐ প্রাণ-পাখীটা কোন্ পথ দিয়ে উড়ে যাবে।'

লালন শাহ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের গ্রাজুয়েটদের চেয়েও অধিক জ্ঞান রাখেন। এই উচী লোকের শব্দ-সম্ভারও দেখা যায় প্রচুর। অতএব এঁকে রীতিমত কৃষ্টিবান বলতে হয়।

৪. আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর, এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি, ও তার নাই কেনারা, নাই তরণী পারে।
মনে বাঞ্ছা করি, দেখব তারি—আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে॥
কি কব সেই পড়শীর কথা, ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো, আমার যম-যাতনা যেত দূরে।
আবার সে আর লালন একখানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাক্‌রে ॥

এই কবিতার ইঙ্গিত বোঝা কঠিন মনে হচ্ছে—অতিশয় আচ্ছন্ন করে যেন কোনও প্রচ্ছন্ন ভাবের বর্ণনা হয়েছে। 'তারে' বলতে 'পড়শী'কেই বুঝাচ্ছে। কিন্তু সেই পড়শীটি কে? এর উত্তর হতে পারে 'পীতম পিয়ারী' কোনও নারী—স্বকীয়া অথবা পরকীয়া। এই অর্থে, রতিক্রিয়া সংসৃষ্ট পানি অতিক্রম না করে মিলন অসম্ভব। তাই মনে নিদারুণ পিপাসা থাকলেও, বৈষ্ণবপ্রথা (বা বাউল-প্রথা) অনুসারে সামনের ভোগ-সামগ্রী ভোগ বা ভক্ষণ করা সাধকের পক্ষে অবৈধ, আত্মসংযম করে রিপু দমন করতেই হবে। আবার রমণী লালনের কাছেই আছে, হয়ত লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে এমনভাবে রয়েছে যে তার 'হাত-পা-স্কন্ধ-মাথা' কিছুই দেখা যায় না; আর বিপুল আকাঙ্ক্ষা থাকলেও রমণীর একটা স্পর্শও পাওয়া যায় না। সে পাওয়া কি এতই সহজ? সে জানে "রমণীর মন সহস্রবর্ষেরই, সখা, সাধনার ধন।" হয়ত

* কুঠরী—ছোট খোপ (আট কুঠরী—জানি না কি কি; বোধ হয় সুফল মিত্রের অভিধানে নাম দেওয়া আছে।)

* দরজা—২ চক্ষু, ২ কর্ণ, ২ নাসারন্ধ্র, ১ মুখ, ১ পায়ু (মলদ্বার), ১ উপস্থ (লিঙ্গ, যোনী)

রমণীর মন পড়ে আছে অন্যত্র, তাইতেই কি লালন একটু স্পর্শও লাভ করতে পারছে না। প্রিয়তমা কাছে থেকেও যেন সহস্র যোজন (৪০০ ক্রোশ বা ৮০০০ মাইল) দূরে অবস্থান করছে, একি সামান্য দুঃখের কথা? আর পূর্বোক্ত প্রশ্নের আরেকটি জওয়াব হচ্ছে, পড়শীটি হচ্ছেন বিশ্ব-বিধাতা। তিনি ত দূরে অবস্থান করেন না, বরং প্রত্যেকের শাহ রগের চেয়েও কাছে তিনি রয়েছেন।

কোরআন-এর ভাষায় 'আকরাবু মিন হাবলিল ওয়ারীদ।' তার 'হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা' কিছুই নাই। এখানে আরশীনগর বোধ হয় খোদার 'আরশ'কেই বুঝাচ্ছে। সে গাঁয়ে যেতে হলে সচরাচর মালিকুল-মৌত এর দরজা দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু কোনওক্রমে সেখানে গিয়ে পড়তে পারলে আর দ্বিতীয়বার যম-যাতনা সহ্য করতে হয় না। তিনি থাকেন অতি ঊর্ধ্ব আরশের উপর। 'আবার ক্ষণেক থাকে নীরে' কথাটা রহস্যজনক। আল্লার কিতাবে আছে, আর বিজ্ঞানেও বলে—পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে পানি, তারপর পানির উপরে ফেনা, তারপর জলচর প্রাণী, তারপর মৃত্তিকা, তারপর জলচর ও স্থলচর প্রাণী, ঘাসপাতা, পাহাড়, ইত্যাদি, তারপর মানুষ। হয়ত এই বিভিন্ন যুগের আভাস দেবার জন্যই 'ক্ষণেক ভাসে নীরে' পদগুলো লিখিত হয়েছে। অবশ্য সৃষ্টির সমুদয় রহস্য এখনও জানা যায়নি। সাধকেরা হয়ত দিব্যচক্ষে সময় সময় কিছুটা ইঙ্গিত বা ইসারা পেয়েছেন। এসব ইসারাও আদৌ ফেলে দেবার মত নয়।

প্রথমোক্ত 'রসকেলি' অর্থের অপব্যবহারের দরুন বহুসংখ্যক দুর্বল-হৃদয় যোগী-সাধকের অধঃপতন হয়েছে। অবশ্য ভাল হাতিয়ার দিয়েই সু ও কু উভয় কর্মই সম্পন্ন হতে পারে। তাই সাধু-সজ্জনকে অতি সতর্কতার সহিত ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। এ পিচ্ছিল পথ অবশ্যই বিপদসঙ্কুল। তবু মানবিক দুর্বলতার কথাও স্মরণ রাখতে হয়। স্খলন মানুষের হয়, আবার তা আয়ুকালের মধ্যেই শুধরে নেওয়ার সুযোগও পাওয়া যায়। ইসলামেও একপ্রকার 'মুতাহ' প্রথা আছে; সেটা অনেকটা অর্ধ বিবাহের মত, বা অস্থায়ী বিবাহের মত। একথাটা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, দুর্বল যোগী-ঋষি-সাধকের অনৈতিক আচরণ দেখে হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, শিয়া, সুন্নী, মুজাদ্দিদিয়া, নকশবন্দিয়া প্রভৃতি দলীয় অনুষ্ঠানগুলোর মূল আদর্শের প্রতি অনেকেই পরস্পর পরস্পরের আদর্শের প্রতি কটাক্ষ করে থাকেন। সবসমাজেই সবরকমের দুর্বল লোক আছেন, আবার আদর্শ লোকও আছেন। আদর্শের সীমালঙ্ঘন করলেই গোলমাল হয়; প্রকৃত সাধু-সজ্জনেরা অনায়াসে বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে যান; দুর্বলেরাই পানি ঘোলা করে অনর্থ ঘটিয়ে থাকে। বিধাতা-পুরুষ বোধ হয়, এইসব লীলা দেখে কৌতুক বোধ করেন। এসব হয়ত বিধাতারই প্রকাশিত লীলা—নইলে তিনি শয়তানকে এতটা আস্কারা দেবেন কেন? আবার সেই ভালমন্দ চিনে নেবার রহস্য।

৫. ও মন, যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়।
সে যে রাম রহিম, করিম কালা এক আল্লা জগৎময় ॥
'কুল্লো সাইয়েন' সহিত খোদা, আপন যবানে কয় সে কথা
যার নাইরে আচারবিচার বেদ পড়িয়ে গোল বাধায় ॥
আকার সাকার নিরাকার হয়, একেতে অনন্ত উদয়
নির্জন ঘরে রূপ নেহারে এক বিনে কি দেখা যায় ॥
এক নেহারে দেও মন আমার, ভজ নারে দেখ তার
লালন বলে একরূপ খেলে ঘটে পটে সব আধার ॥

এই গানটার ভাব অতি পরিষ্কার, সন্দেহের লেশমাত্র নাই। এই লোক হিন্দু না মুসলিম; এ প্রশ্ন বৃথা। আল্লা ছাড়া কেউ কারো মনের নাগাল পায় না। তিনি বলেছেন, "আকার সাকার নিরাকার হয়, একেতে অনন্ত উদয়"। সত্যি তো একের মধ্যে বহুর বাস, যার যেমন দৃষ্টি সেই তেমন দেখে নিক। এ ধরনের আরেকটা গানের (শ্রী রামদুলাল রচিত) খানিকটা উদ্ধৃতি দেই :

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজি ॥
মগে বলে ফরা-তারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি ॥
শ্রী রামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ভবে
এক ব্রহ্মে দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি ॥

৬. কে বোঝে মন মওলার আলেক বাজী
করছেরে কোরানের মানে যা আসে তার মনের বুঝি ॥
(সবে) একই কোরান পড়াশুনা, কেউ মৌলবী কেউ মৌলানা,
দাহিরে রয় কত জনা, সে মানেনা শরার কাজী ॥
রোজ কেয়ামত বলে সবায়, কেউ করেনা তারিখ নির্ণয়
হিসাব হবে কি হচ্ছেরে সদায়, কোন কথায় মন রাখি রাজী ॥
মলে জান ইল্লীন-সিজ্জীনে রয়, যতদিন রোজ হিসাব না হয়,
কেউ বলে জান ফিরে জন্মায়, তবে ইল্লীন-সিজ্জীন কোথায় আজি ?
এ'রাফ বিধান শুনিতে পাই, এক গোরো মানুষের মৌত নাই
সে আমার কোন ভাইরে ভাই, বলছে লালন কারে পুছি ?

এই গানটাতে মৌলানা-মৌলবীদের কারসাজীতে কোরআনের একই লিখনের বিভিন্ন মানে বা অর্থের সৃষ্টি হয়ে নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে, আবার ঐ কোরান পড়েই কেউ বা 'দহরিয়া' হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ জড় পৃথিবীটাকেই বা আল্লার বিশাল সৃষ্টিকেই, আল্লা বলে মনে করে; আর কাজীর প্রদত্ত ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত মানে না। লালন বলছেন, সবার মুখে শুনি রোজ কেয়ামত এসে পড়লো বলে, আখেরী জমানা এসে পড়েছে, অথচ কেউ তার তারিখ নির্ণয় করে না, হিসাব করে একটা নির্দিষ্ট অভিমত দেয় না—এমন হলে কোনটা বিশ্বাস করি? একজনের কাছে শুনি, মৃত্যু হলে প্রাণটা ইল্লীন ও সিজ্জীন নামক দুইটি মোকামে রক্ষিত হয়—রোজ কেয়ামতের বিচারের অপেক্ষায়। আবার কেউ বলছেন মরা প্রাণটাই আবার জ্যান্ত হয়; তাহলে ইল্লীন-সিজ্জীন কোথায় গেল! আবার শুনি, বেহেশ্‌ত ও দোজখের মধ্যবর্তী কোনও একটা উচ্চস্থানে এক বৃহৎ অপেক্ষা-গৃহ আছে, তার নাম এ'রাফ; এদের নাকি কর্মগুণে বেহেশত ও দোজখে যাওয়ার প্রায় সমান সম্ভাবনা, তাই এদের বিচার খানিকক্ষণ মুলতবী আছে—খানিক পরেই এদেরকে যথাস্থানে প্রেরণ করবেন, কাউকে বেহেশতে আবার কাউকে দোজখে। এ'রাফের লোকের নাকি বেহেশতের দিকে তাকিয়ে উঁচু থেকে চেনা লোক দেখতে পেলে তাদেরকে ডেকে ডেকে সালাম করে সন্তোষ প্রকাশ করবেন, যাতে আল্লা বেহেশতীদের ওসিলায় একটু সদয় হয়ে বেহেশতে আশ্রয় দেন। মৌলবী মৌলানারা এ'রাফ সম্বন্ধেই অন্ততঃ আরও দুই প্রকার গল্প ফেঁদেছেন। যাহোক এসব শুনে লালন বলছেন, এতসব বিভ্রান্তিকর

কথা শুনে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মত হয়—জানিনে ওই গোরোহ্ বা দলে আমারই ত অমর ভাইয়েরা আছে, তবে এসব কথা কাকে শুধাই? বস্তুতঃ কোরান শরীফের শব্দ ও ভাবরাশিকে বিকৃত করে এক জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হয়েছে—তাই তিনি এইসব আলেমকে বিশ্বাস করতে ইতঃস্তত করছেন।

বিদ্বজ্জনের গবেষণার ফলে মোটামুটি বুঝা যায়—লালন শাহ-র জন্ম হয় হিন্দুর ঘরে ইংরেজী ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আর মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর, শুক্রবার। এঁর আদি বাসস্থান চাপড়ার জোড়া-গ্রাম ভাঁড়ারায়। এঁর পিতার নাম মাধব কর, নানার নাম ভস্মদাস, মায়ের নাম পদ্মাবতী আর এঁর নিজের নাম ছিল লালন কর। তিনি ভাঁড়ারার যে পাড়ায় বাস করতেন সেই পাড়াটার নাম ছিল দাসপাড়া (এখনও সেই নামই আছে)। পরে লালন ঘটনাক্রমে মুসলমান গৃহে আশ্রয় ও স্নেহপ্রীতি পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের ৭ ভাগের মধ্যে প্রায় ৬ ভাগই সেই মুসলিম সমাজের মধ্যেই বসবাস করে গেছেন। জীবনের শৈশব ও কৈশোরকালে ১৭/১৮ বৎসরকাল যাবৎ হিন্দুসমাজের ধ্যানধারণা, আচারব্যবহার, কিংবদন্তি, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির আওতাতেই ছিলেন। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্বন্ধেই সঙ্গীত রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

নিম্নের কবিতাটি অবধান করুন :

৭. শহরে ষোলজন বোম্বেটে,
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে ॥
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি, চোরেরও সে শিরোমণি,
নালিশ করব আমি কোনখানে, কার নিকটে ॥
পাঁচজনা ধনী ছিল, তারা সব ফতুর হলো
কারবারে ভঙ্গ দিল কখন যেন যায় উঠে ॥
গেল ধনমান আমার, খালি ঘর দেখি জমার,
লালন কয়, খাজনারো দায়, কখন যেন যায় লাটে ॥

অর্থ : শহরে (দেহের মধ্যে) ষোলজন দুষ্ট অবস্থান করছে—তারা হলো দশ ইন্দ্রিয় (২ চক্ষু, ২ নাসারন্ধ্র, ২ কর্ণ, ১ মুখ, ১ নাভি, ১ মূত্রদ্বার, ১ মলদ্বার), আর ছয় রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) :

'দশ ইন্দ্রিয়ের দশজন দ্বারী, কর্ণ গুণ ধরে জোর চালায়
অকুল ভব-সাগর-বারি পার হবি কে আয়রে আয়॥ (প্রাচীন সঙ্গীত)

অপর মতে, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় (হাত, পা, কণ্ঠস্বর, জননেন্দ্রিয়, মল নিষ্কাশনেন্দ্রিয়), পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) এবং ছয়টি রিপু,—এই ষোলজন বোম্বেটে। মানুষের দেহের মধ্যে এই ষোলজন কদাচারী গৃহশত্রু রয়েছে। আর যিনি রাজ-রাজেশ্বর তিনিই বা কম কি? সেই আত্মা বা পরমপুরুষ লুকিয়ে থাকেন, দেখা দেন না—অদৃশ্য থেকে মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে রগড় করেন। আবার দেহের মধ্যেই পাঁচজন ধনী ছিল (বিবেক, জ্ঞান, সংযম, বৈরাগ্য ও ভক্তি), এর ইন্দ্রিয় ও রিপুর সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে তারাও রণে ভঙ্গ দিয়ে এখন গতায়ুপ্রায়। লালন মানুষটি এখন বিব্রত হয়ে পড়েছে, তার মান বজায় রাখা হয়েছে দায়। আবার পরমেশ্বরের কাছে হিসাব-নিকাশের বেলায়ও দেখা যাচ্ছে, ব্যয়ের কোঠা ভরতি, আয়ের কোঠায় শূন্য। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি,—জীবন, পালন, স্বাস্থ্য, সম্পদ,

পিতামাতা, স্ত্রীধন, বন্ধুবান্ধব, প্রীতি, প্রশংসা ইত্যাদি, তারজন্য কৃতজ্ঞতার খাজনাটাও দেওয়া হয়নি; এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো, কাজের কাজ একটুও হয়নি, লালনের সব সম্পত্তি লাটে উঠেছে; এখন লালন করবে কি?

এর মধ্যে ত দোষ ধরার মত এমন কিছু দেখছি না। জীবনরহস্যের সবকথা ঠিকমত বোঝা যায় না; আবার চেষ্টা করলে, অনায়াসেই ভুল বোঝা যায়। জীবনের অনেক গুপ্তরহস্য আমার বুদ্ধির অতীত; অতএব সে সম্বন্ধে বিশেষ করে উচ্চাঙ্গের সাধনভজনের বা ভক্তিযোগের বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তাই, এখানেই কেচ্ছা খতম করি—আর বিচার দিবসে আমার নিজের এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমগ্র মানবসমাজের উপর রাজাধিরাজের সুপ্রসন্ন নজর পড় ক, সেই আকাঙ্ক্ষা করি।

লালন স্মারকগ্রন্থ
মার্চ ১৯৭৪

# ভাই গিরীশচন্দ্র সেন

## ভূমিকা

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীকে হিন্দু ধর্মীয়-জাগরণ ও সমাজ-চেতনার যুগ বলা হয়। ইতিপূর্বেই ইসলাম ধর্মের সাম্য, মৈত্রী ও তৌহিদের সংস্পর্শে এসে পৌত্তলিক ধর্মের মূল শিথিল হ'য়ে পড়েছিল। ফলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদিরও বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'য়েছিল। এর পর ইংরেজের সংস্পর্শে এসে—বিশেষ ক'রে ইংরেজী সাহিত্যের ব্যক্তি-স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে আর যুক্তি-ভিত্তিক বিজ্ঞানের প্রভাবে জনসাধারণের মনেও কতকটা শাস্ত্র-জিজ্ঞাসা ও সমাজবোধের উদয় হ'য়েছিল। এর ফলে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ধর্মীয় নেতা উপনিষদাদির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, একেশ্বরবাদই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তবে অন্যান্য পন্থাও আছে, যেগুলো অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। কেশবচন্দ্র বললেন, সকল ধর্মমতই সত্য। আবার রামকৃষ্ণ পরমহংসও বললেন, যত মত তত পথ, এমনকি তিনি নিজেও বিবিধ ধর্ম-সাধনা অবলম্বন ক'রে পরীক্ষা করে দেখলেন, সব পথেই একই লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। যাই হোক, এইসব আন্দোলনে রেষারেষিও বড় কম হয়নি। পূর্বোক্ত কয়েকজন মহাপুরুষ এবং তাঁদের সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দের চেষ্টায় জনমনে প্রবল চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছিল। তাই এ-যুগে বেশ কয়েকজন আদর্শ-চরিত্র সাধকের জন্ম হ'য়েছিল, যাঁরা তাঁদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও ব্যবহার দ্বারা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন।

এমন একজন সাধু পুরুষ ছিলেন ভাই গিরীশচন্দ্র সেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আদেশে ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থাদি যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথে পাঠ করে কুরআন শরীফের প্রথম বাংলা তর্জমা করেন; হযরত ইব্রাহিম, মূসা, দাউদ এবং মুহম্মদ (সঃ)-এর বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত লিখে প্রচার করেন; হাদীস মেশকাতুল মাসাবীহ-এর বঙ্গানুবাদ চার খণ্ডে সম্পন্ন করেন; সুবিখ্যাত 'তাপস-মালা' গ্রন্থ রচনা করেন এবং মুসলিম ঐতিহ্যবাহী আরও কয়েকখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। সুখের বিষয়, তিনি একখানা অতি অকপট আত্মজীবনী লিখে গেছেন, যার থেকে তৎকালীন সমাজের একটা জাজ্বল্যমান চিত্র পাওয়া যায় এবং তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন-বরণের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। মোট কথা তিনি একজন বিনয়ী স্পষ্টবাদী, সমর্পিতচিত্ত ভক্ত ছিলেন, যাঁর জীবনচরিত্র আলোচনা করলেও লাভবান হওয়া যায়—দুর্বল চিত্তে বল-সঞ্চয় হয়।

তাই আজ যখন হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জাতীয় পুনর্গঠনের আয়োজন চলছে, তখন চরিত্র, সাধনা ও শুভবুদ্ধি দ্বারা যিনি নিজে ব্রাহ্ম হ'য়েও মুসলিম ধর্মের

আলোচনায় বিশেষ কীর্তি রেখে গেছেন সেই বিরাট কর্মী মৌলবী গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বিশেষ সময়োপযোগী হবে। এতে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিমের বর্তমান প্রশংসনীয় সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হতে পারে।

এই প্রবন্ধে মৌলবী গিরীশের রচনাবলী থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতিও উপস্থিত করা হবে। তাতে তৎকালীন রচনারীতি এবং সামাজিক ও নৈতিক মনোভাবেরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এই ভূমিকাতেই তাঁর 'আত্মজীবন'-এর 'ভূমিকা' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হ'ল :

> খ্যাতিমান ও ক্ষমতাবান লোকের মৃত্যুর পর সচরাচর সত্যকে অতিক্রম করিয়া এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়। সত্যের প্রতি আদর থাকিলে এ-প্রকার ভাবুকতা ও কল্পনার প্রাধান্য হইতে পারে না। জগতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হউক, মিথ্যা ও কল্পনার স্রোত বন্ধ হয়ে যাউক, ইহাই প্রার্থনীয়।—আমি এই সত্তর বৎসরের জীবনে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আলোক-অন্ধকারাদি পরস্পর বিপরীত ও বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এই জীবনের উপর দিয়া অনেক বিপৎ-পরীক্ষা গিয়াছে, আধ্যাত্মিক সম্পদুন্নতিও ভগবৎ-কৃপায় প্রচুর লাভ হইয়াছে। আমি ভগবানের বিশেষ প্রেম ও করুণা এই পাপ-জীবনে ভোগ করিয়াছি।—তিনি স্বয়ং এই তৃণতুল্য অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে পবিত্র বিধানের কার্যে ব্যবহৃত করিয়াছেন। আমার জীবনে ভগবানের কৃপা যে কত প্রকাশ পাইয়াছে অন্য লোক এমন কি নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পর্যন্ত তাহা অল্পই জানেন। আমি স্বীয় জীবনে প্রেমময় বিধাতার জীবন্ত প্রেমের লীলা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, জগতে স্বয়ং তাহার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে এই আত্মজীবন পুস্তক লিখিলাম। ইহা আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকদিগের হস্তে সমর্পিত হইতে পারিবে, আমার জীবদ্দশায় সাধারণের নিকটে প্রচার এবং পত্রিকাদিতে সমালোচিত হওয়া প্রার্থনীয় নহে।

এর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তিনি "পবিত্র বিধানের কার্য্যে" ব্যবহৃত হ'য়ে (এবং তৌহিদের শিক্ষার মর্মস্থানে পৌছে গিয়ে) নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছেন, আর সেই পরম করুণার আধার বিশ্বনিয়ন্তার কাছে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। আমিও অত্যুক্তি ও নিম্নোক্তি যথাসম্ভব বর্জন করে এর সরল-স্বভাব ভক্তের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

কাজী মোতাহার হোসেন

৪.১.১৯৬৪

# জীবন-কথা

**জন্ম ও বাল্যজীবন**

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে বাংলা ১২৪১ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৩৪, এপ্রিল/মে) গিরীশচন্দ্রের জন্ম হয়। ঐদিন মঙ্গলবার ছিল, কিন্তু কোন মঙ্গলবার, তা এখন আর সঠিক নির্ণয় করার উপায় নাই। গিরীশচন্দ্রের পিতা মাধবরাম রায়, পিতামহ রামমোহন রায় এবং প্রপিতামহ ইন্দ্রনারায়ণ রায়। ইন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষনারায়ণ রায় ও মধ্যম ভ্রাতা দেওয়ান দর্পণনারায়ণ রায়। এই দেওয়ান সাহেব নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে দেওয়ানী করতেন। এঁর প্রতিষ্ঠা ও সুকৃতির ফলেই পাঁচদোনার দেওয়ান বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এঁদের আসল পদবী 'সেন' এবং মোগল সুবাদার প্রদত্ত উপাধি 'রায়'। এজন্য এঁরা নামের শেষে কখনও সেন, কখনও রায় আবার কখনও বা সেনরায় লিখতেন। সে সময় ফার্সী রাজভাষা ছিল; মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় হস্তলিপিতেই বিখ্যাত গ্রন্থাদির বহু কপি প্রকাশিত হ'ত। ফার্সী হস্তলিপিতে 'শিকস্ত'[১] ও 'নুস্তালিক' এই দুই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। গিরীশচন্দ্রের পিতামহ মুনশী রামমোহন রায়ও মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি ফার্সী মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরাও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ ও ফার্সীলিপিতে খোস-নবীশ ছিলেন। মুনশী রামমোহন ও মুনশী রাধানাথ 'শিকস্ত' লেখক এবং মাধবরাম ও গঙ্গাপ্রসাদ 'নুস্তালিক' তালিমের লেখক ছিলেন। এঁরা সকলেই গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, পান্দনামা প্রভৃতি বহু পুস্তক হস্তে কপি করেছিলেন।

পাঁচ বছর বয়সে গিরীশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। কুলগুরু বিশ্বনাথ পঞ্চানন সরস্বতী দেবীর পূজা ক'রে খড়িমাটির ঢেলা দিয়ে মাটির উপর অ-আ ক-খ ইত্যাদি বর্ণ লিখে এক-একটি অক্ষরের উচ্চারণ শিখিয়েছিলেন। কলা-পাতায় বছর দুয়েক বর্ণমালা লেখা অভ্যাস করবার পর পিতা মাধবরাম রায় মহাশয় তাকে ফার্সী ভাষার চর্চায় নিযুক্ত করেন। একজন মোল্লা এসে নামায পড়ে আলেফ-বে-তে-সে ইত্যাদি পড়িয়ে যান। রীতিমত সিন্নী দিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম' আবৃত্তি করে পাঠারম্ভ হয়। এর পর মুনশী মাধবরামের হস্তে কপি করা 'পান্দনামা' পড়ান শুরু হয়।

গিরীশচন্দ্র তিন ভাই ও তিন ভগ্নীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাই মায়ের অতিশয় আদুরে ছেলে ছিলেন। আত্মজীবনীতে গিরিশবাবু লিখেছেন : "তিনি আমাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। আমার গলায় হার, হাতে বালা, বাহুতে বাজু নামক ভূষণ, কোমরে ঘুমুর বা গোট, পদে নূপুর ও মল ছিল। —তখন আমি অতিশয় ক্ষীণাঙ্গ-দুর্বল-ভীরু-প্রকৃতি ছিলাম; দুষ্ট-দুরন্ত বালকদের সঙ্গে কখনও মিশিতাম না; প্রায় কোন খেলাই জানিতাম না। ক্রীড়ামোদের জন্য যেরূপ বুদ্ধি-চাতুর্যের প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমি দরিদ্র ছিলাম। আমাদের

১. শিকস্ত—ভাঙ্গা ভাঙ্গা বা ছাড়া ছাড়া লেখা; নুস্তালিক—জড়া লেখা।

বাড়ীতে একজন বৈদ্য চিকিৎসক (কবিরাজ-দাদা) ছিলেন। প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার ঘরে তাঁহার নিকটে বসিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতাম। তাঁহা হইতে লবঙ্গাদি, নৃপবল্লভ ইত্যাদি বড়ি প্রস্তুত করিবার তালিকা লিখিয়া লইয়াছিলাম এবং মাতৃদেবী হইতে অর্থ গ্রহণপূর্বক ঔষধের উপকরণ লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, পিপ্পলী ইত্যাদি খরিদ করিয়া আনিতাম, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে একত্রে পেষণপূর্বক গুলী প্রস্তুত করিতাম, পল্লীর কাহারও জ্বর বা উদরাময় বা শিরঃপীড়া হইয়াছে শুনিলে তাহাকে ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতাম। সকলে আমোদ করিয়া হউক বা যেভাবে হউক আমার প্রদত্ত ঔষধ আদর করিয়া গ্রহণ করিতেন। আমার বাল্যক্রীড়ার মধ্যে ইহা একটি ক্রীড়া ছিল।" তবে বাল্যক্রীড়ার মধ্যে ঠাকুর-পূজাই ছিল প্রধান। বালক গিরীশের ছোট সীপকোষা, টাট, পুষ্পপাত্রাদি, পূজার বাসন, ক্ষুদ্র কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খ ইত্যাদি সরঞ্জাম ছিল। তাঁদের পরিবারে লক্ষ্মী গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই 'পারিবারিক পুতুল সকলকে চূড়া হার, স্বর্ণময় উপবীত ও বিবিধ বসন দ্বারা' সাজানর আগ্রহ ছিল অসীম। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু পৌত্তলিক ছিলেন। আত্মচরিতের কথায় : "আমি একজন পাক্কা হিন্দু ছিলাম, উচ্চ-নীচ জাতি বলিয়া আমার ভেদজ্ঞান প্রবল ছিল! মোসলমানের ছায়া মাড়ালে আমি যেন অপবিত্র হইলাম, মনে করিতাম। আমাদের ঘরে একজন শূদ্র জাতীয় চাকরানী ছিল, সে বহুকাল আমার পরিচর্চা করিয়াছিল, আমি তাহার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি। তাহাকে আমি মাসি বলিয়া ডাকিতাম। একদিন রাত্রিতে আমি ভোজন করিতে বসিয়াছি, করুণামাসী আমার পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া যায়, তাহার আঁচল আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আমি তৎক্ষণাৎ ভোজনে নিবৃত্ত হইয়া অন্নপাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলাম। শূদ্রজাতির স্পর্শ হইল, আমি কেমন করিয়া আর সেই অন্ন গ্রহণ করি? তখন আমার ৯/১০ বৎসর হইবে।...আমি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের পরও বহুকাল পর্যন্ত মোসলমানদের প্রস্তুত পাউরুটি ভক্ষণ করি নাই, সভ্য লোকের প্রিয় খাদ্য কুক্কুট-মাংস কোনও দিন রসনায় স্পর্শ করি নাই।"

পাঁচদোনা গ্রামে 'সখী-সংসদ' গানের দল ছিল। বালক গিরীশচন্দ্র সারা রাত জেগে কবির গান শুনতেন, অতি উৎসাহে গান শিখতেন, আর ঐ দলের সখা-সখীদের জেগে কবির গান শুনতেন, অতি উৎসাহে গান শিখতেন, আর ঐ দলের সখা-সখীদের গাঁজা তামাক যোগাতেন। সুতরাং বাল্যে লেখাপড়া ঠিকমত হয়নি। বিশেষ ক'রে নয়-দশ বছর বয়সে তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়; এর আগে পিতার কাছে এবং অন্য গুরুজনের কাছে 'পান্দনামা' ও 'গুলিস্তাঁর' কতক অংশ পড়া হ'য়েছিল। বাংলা লেখাপড়ার চর্চা বিশেষ কিছুই হয়নি। আর ফার্সী পড়াও ছিল না বুঝে কেবল 'মতন' পড়ে পাঠ মুখস্থ করা। পিতার মৃত্যুর পর কোনও শাসন না থাকায় পড়াশুনা যা হচ্ছিল, তাতেও আর মনোযোগ রইল না—তখন একদিন 'সবক' তিন দিনেও 'ইয়াদ' হ'ত না।

সে সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বিশেষ সুবিধার ছিল না।

"স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নীতির বন্ধন ছিল না, চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দুর্লভ ছিল। অধিকাংশ জ্ঞাতি-কুটুম্ব মদ্যপায়ী ছিল। আমি মদ্যপ্রিয়াসক্ত বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি মদ্যপান করে নাই, আমাদের বাড়ীতেও কখনও সুরাপানের ঘটা হয় নাই। তথাপি আমি মাতালের সংসর্গে অনেক কাল বাস করিয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে সুরার আস্বাদ কখনও প্রাপ্ত হই নাই, কোনরূপ মাদক দ্রব্য এমনকি ধূমপানাদি আমাকে

বশীভূত করে নাই; কিন্তু আমার চরিত্রের নীতির বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়াছিল। আবশ্যক হইলেই আমি মিথ্যা কথা কহিতাম, গৃহে সুরস খাদ্য ও মিষ্টান্নাদি চুরি করিয়া খাইতে পাপ বোধ করিতাম না, আরও কোন কোন বস্তু চুরি করিয়াছি।—মঙ্গলময় মঙ্গল-হস্তে কেশ-মুষ্টি ধারণ করিয়া আমাকে অনেক প্রকার পাপ-দুর্বলতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বহু প্রলোভন ও কুশিক্ষা হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার হৃদয়কে পবিত্র ধর্মালোকে আলোকিত ও স্বর্গাভিমুখী করিয়াছেন।"

**ছাত্রজীবন**

পিতার মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পরে গিরীশচন্দ্রের বড় দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায় ছোট ভাইকে ঢাকায় নিয়ে এসে পগোজ স্কুলে ভর্তি করে দেন। দিন কয়েক রীতিমত পড়াশুনা চললো। কিন্তু একদিন হেডমাস্টার কোনও অপরাধে দুই-তিন জন ছাত্রকে সকলের সাক্ষাতে এমন নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করলেন যে, তা দেখে গিরীশচন্দ্রের মনে বিশেষ আতঙ্ক জন্মে। সেই থেকে তাঁকে আর কোনও প্রকারেই স্কুল-মুখো করান গেল না। তারপর আবার ঢাকা নগরেই ফার্সী শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি আবার নিজ গ্রামে ফিরে এসে সেখানে তিন-চার বছর অবস্থান করেন। সেই সময় পাঁচদোনা থেকে আধ মাইল দূরে শষানখলা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মুনশী কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাস করতেন। ইনি ফার্সীভাষাবিদ ও অতিশয় রসিক পুরুষ ছিলেন বলে লোকে তাঁকে বাঁকা কৃষ্ণরায় বলতো। বাঁকা কৃষ্ণরায়ের কাছে গিরীশচন্দ্র তওয়ারীখে জাঁহাগীর, মা' দনোজ্জওয়াহের, মহব্বতনামা, বহরদানেশ, সেকেন্দরনামা, রোক্কাতে ইয়ার মুহম্মদ ইত্যাদি বৃহৎ পারস্যগ্রন্থ পূর্ণ বা আংশিকভাবে অধ্যয়ন করেন। এর ফলে ওস্তাদের সাহায্য ছাড়াই তিনি পারস্য গদ্য ও পদ্য-পুস্তকের মর্ম গ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জন করেন; কিন্তু ফার্সীতেই হোক বা বাংলায়ই হোক, তখনও এক ছত্র লিখবার ক্ষমতা হয়নি।

এরপর গিরীশচন্দ্র তাঁর ছোট দাদা হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ময়মনসিংহে গিয়ে অবস্থান করেন। এখানে কিছুদিন ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মৌলবী আবদুল করিম সাহেবের কাছে 'রোক্কাতে আল্লামী' পাঠ করেন। তখন গিরীশচন্দ্রের বয়স আঠার-উনিশ বছর হবে।

এই সময়ে সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন ছাত্রদের বিলাসিতা ও শিক্ষায় ব্যয়াধিক্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু গিরীশচন্দ্র চিরকাল গরীবানা হালে কাটিয়ে গিয়েছেন, এক টাকা দেড় টাকার বেশী দামের চটি পরেন নাই, জল খাওয়ার পর চিড়ে-মুড়ি-লাড়ু দিয়েই শেষ করেছেন আর বাল্য ও যৌবনে প্রতিদিন নিজ হাতে রাঁধাবাড়া করেছেন।

এই সময় পূর্বোক্ত আবদুল করিম সাহেবের কাছারীতে নকলনবিশী করতে আরম্ভ করেন। এই কাজে প্রায় ছয় মাসে তিনি মাত্র এক টাকা রোজগার করতে পেরেছিলেন। তবে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরবার সময় আর সবার মত তিনিও অফিসের কালি-কাগজ নিজে লেখাপড়ার জন্য বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন। তখন ওটা অধর্ম বা অ-নীতি বলে বোধ ছিল না। এই সময় নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ ও মনুষ্য নামের অযোগ্য মনে ক'রে, তাঁর মন বিষাদে পূর্ণ হ'য়েছিল। এমনকি, 'দুই-তিনবার মানসিক যন্ত্রণায় আত্মঘাতী' হবার উদ্যোগও নিয়েছিলেন।

এই সময় ময়মনসিংহে একটি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হয়। তখন ছোট দাদার সম্মতি নিয়ে নকলনবিশী ত্যাগ করে গিরীশচন্দ্র ঐ পাঠশালায় ভর্তি হন। এখানে বিদ্যাসাগরের

উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ও ঋজু পাঠ শেষ করে তিনি কিছুদিনের মধ্যে সংস্কৃত কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ, বাল্মীকি-রামায়ণ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা ইত্যাদি পুস্তকেরও কিছু কিছু চর্চা করেন। এমনকি, এই সময়ে তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত কবিতা রচনা এবং পদ্যাংশের শেষ চরণের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রথম তিন চরণ মিলিয়ে দিতে পারতেন। পরে অবশ্য এই ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন পরে স্থানীয় হার্ডিঞ্জ স্কুলের সঙ্গে শিক্ষণ-পদ্ধতির জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। গিরীশচন্দ্রও বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস-ভূগোলের কিছু কিছু আলোচনা ক'রে নর্মাল শ্রেণীতে প্রবেশের পরীক্ষা দেন। কিন্তু তিনি গণিত একেবারেই জানতেন না। 'তখন কোনও সহাধ্যায়ী গণিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিলেন।' সে সময়ে এমন কাজ অন্যায় বলে মনে করা হত না—বরং ধরতে গেলে, এই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। যা হোক, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি ছাত্রীয় বৃত্তি ও পারিতোষিক লাভ করেছিলেন এবং 'শেষ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম রূপে গণ্য হ'য়েছিলেন।'

এই সময় তাঁর বাংলা কবিতা রচনায় উৎসাহ জন্মে। ঢাকার 'চিত্তরঞ্জিকা' নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছিল। এ-ছাড়া তিনি 'বনিতা-বিনোদ' নামে একখানা পদ্য-পুস্তক রচনা ক'রে প্রকাশ করেন। তা কোনও বিদ্যালয়ে পাঠ্যও হ'য়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতার বিষয় প্রচার করা।

এরপর তিনি সাপ্তাহিক 'ঢাকা-প্রকাশ' পত্রিকার ময়মনসিংহের সংবাদদাতা রূপে কাজ করেন। এই সূত্রে তাঁকে অনেক অপ্রিয় সত্যও প্রকাশ করতে হয় এবং সেজন্য তাঁর ভাগ্যে বহু তিক্ততা ও লাঞ্ছনা জুটেছিল।

নর্মাল স্কুল থেকে পাস করে বেরোবার পরই তিনি হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্ন-শ্রেণীর অন্যতম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই স্কুলের শিক্ষক থাকতে থাকতে তিনি শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' পুস্তকের কিয়দংশ অনুবাদ ক'রে 'হিতোপাখ্যান মালা', ১ম ভাগ নামে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক আসাম প্রদেশের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়, পরে বঙ্গদেশেও অনেক জিলার স্কুলসমূহে পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হয়। গিরীশচন্দ্র জীবিত থাকতেই এই পুস্তকের ত্রয়োদশ সংস্করণ মুদ্রিত হ'য়েছিল।

### ধর্মজীবন ও নানা পরীক্ষা

গিরীশচন্দ্রের বাল্যকালীন হিন্দুধর্মের আচার-নিষ্ঠার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হ'য়েছে। তারপর প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সের সময় তিনি কুলগুরু বিশ্বনাথ পঞ্চাননের নিকট শিবমন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন প্রতিদিন স্নানের পর ফুলচন্দন দিয়ে ঠাকুর-পূজা করেছেন। তাঁর পূজা-আহ্নিকে নিষ্ঠা আর দেবদ্বিজে ভক্তি দেখে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের ধারণা হয়েছিল যে, এই বালক একদিন হিন্দুকুলের এবং নিজ বংশের গৌরব রক্ষা করবে। কিন্তু চার-পাঁচ বছর পরেই এই ভক্তিনিষ্ঠায় ভাটা পড়ে ত্রিসন্ধ্যা সংক্ষিপ্ত আহ্নিক মাত্রে পর্যবসিত হয়। এই অবস্থায় তিনি ছোট দাদার সঙ্গে ময়মনসিংহে আসেন। এখানে এসে আহ্নিক ত্যাগ করে স্নানান্তে কেবল মূলমন্ত্র 'নমঃ শিবায়' কয়েকবার জপ করতেন। অল্পদিন পরে মূলমন্ত্র জপও ত্যাগ করলেন। তখন থেকে পূজা-অর্চনায় আস্থা-ভক্তি আর অবশিষ্ট রইলো না; কেবল 'ঈশ্বর আছেন' এই মাত্র বিশ্বাস করতেন।

এই সময় ময়মনসিংহে একটি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হ'য়েছিল; সেখানে আদি সমাজের প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা হ'ত। কিন্তু গিরীশচন্দ্র ব্রহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মদের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর ভগ্নীপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত ব্রাহ্ম-সমাজের একজন সভ্য হ'য়েছিলেন বলে তাঁর প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ম'শায় একজন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, এই কথা শুনে তাঁর রচিত 'বোধোদয়' প্রভৃতি পুস্তক স্পর্শ করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। একদিন কৌতূহলবশে কয়েকজন বয়স্যের সঙ্গে ভগবানচন্দ্র বসুর আবাসে ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী দেখতে গিয়ে দেখলেন, ভগবান বাবু পুস্তক পড়ে উপাসনা করছেন আর অধিকাংশ সভ্যই চোখ বুঁজে বসে রয়েছেন। এই দেখে সবাই মিলে বেশ হাসাহাসিও করেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে, গিরীশচন্দ্রের ২৩/২৪ বৎসর বয়সে, তাঁর ছোটদাদা হরচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় পরলোকগত দাদার বন্ধু-বান্ধবের আগ্রহ ও অনুরোধে গিরীশচন্দ্র জেলা স্কুলে অপেক্ষাকৃত উন্নতপদে নিযুক্ত হন। হরচন্দ্র রায়ের কোন কোন বন্ধু ব্রাহ্ম ছিলেন। এঁরাও বিশেষত মুড়াপাড়ার জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গ গিরীশচন্দ্রকে তাঁর দাদার খাতিরে বেশ স্নেহ করতে লাগলেন। রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় তখন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি হ'ত। গিরীশচন্দ্র মাঝে মাঝে উপাচার্যের মুখে মহর্ষিকৃত ধর্মব্যাখ্যা শুনতে যেতেন। এই ব্যাখ্যানের প্রতি ক্রমে তাঁর অনুরাগ জন্মে। তখন থেকে তাঁর অন্তরে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ তিরোহিত হয়; এমনকি প্রত্যহ স্নানান্তে 'নমস্তে সতে তে জগৎ কারুণায়'—এই ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করতে শুরু করেন।

গিরীশচন্দ্র তৎকালীন ব্রাহ্মদের চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন :

"অনেক সভ্য সুরা পান করিতেন, কোন কোন উপাচার্য পানাসক্ত ছিলেন। একদিন উপাসনার সময় রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় একজন পান-বিহ্বল বৃদ্ধ পুরুষ আসিয়া 'আম্রফলে ঈশ্বরের মহিমা' বিষয়ে বক্তৃতা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। উপাচার্য গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা দানের জন্য তাহাকে আসন ছাড়িয়া দেন। বক্তা দুই-চারটি কথা বলিয়াই চৈতন্য-শূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়ে। সেই বক্তা কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মাতাল ব্রাহ্মদের সঙ্গ করিয়া আমি কখনও মদ্য স্পর্শ করি নাই।"

এই কিছুদিন পর সামাজিক উপাসনার জন্য একটি বৃহৎ চৌচালা ঘর ক্রয় করা হয়। সেখানে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি রিডিং ক্লাব স্থাপিত হয়। গিরীশচন্দ্রও সেই রিডিং ক্লাবের একজন সভ্য ছিলেন। একদিন গিরীশচন্দ্র ঐ ক্লাবের পাক্ষিক সভায় 'বঙ্গভাষা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ দিন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ-নিবাসী সভ্যদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হয়। সেই দিন থেকে রিডিং ক্লাবের অবসান হয়।

১৭৮৭ শতকের (খ্রীঃ ১৮৬৫) অগ্রাণ মাসে ময়মনসিংহে একটি কৃষি মেলা হয়। সেই সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও সাধু অঘোরনাথ নব-বিধান ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। জাত যাওয়ার ভয়ে নগরের কোনও ব্রাহ্ম নিজালয়ে তাঁদের স্থান দিতে সাহস পাননি। সমাজ-ঘরের পাশে একটি তাঁবু খাটিয়ে তাঁদের স্থান করা হয়েছিল। কলকাতা থেকে একজন মহাবাগ্মী এসেছেন শুনে বহুলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। গিরীশচন্দ্রও প্রায় দুই বেলাই যেতেন। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু হ'য়ে কেউ যেতেন না। গিরীশ বাবু লিখেছেন, (আদি)

সমাজের একজন সভ্য কেশব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "ভাল বক্তৃতা কেমন করে দেওয়া যায়?" কেশব বাবু জওয়াব দিয়েছিলেন : "বক্তৃতা আর এমন কঠিন কাজ কি? বেহায়া হ'লেই বক্তৃতা করা যায়।" শুনা যায় আচার্য কেশব ঐ যাত্রায় নৌকাযোগে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ আসবার সময় তাঁর True Faith নামক বিখ্যাত পুস্তকখানা লিখে শেষ করেছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি মাত্র চারদিন অবস্থান করেছিলেন। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন একদিন রাত্রিতে বহু গণ্যমান্য লোককে কেশবচন্দ্রের সাথে পংক্তি-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন; কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই জাত যাওয়ার ভয়ে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। গিরীশ বাবু আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "আমি আর কেশব বাবুর ন্যায় লোকের সঙ্গে পংক্তি-ভোজন কি করিব? জাত যাইবার ভয়ে তখন পাউরুটি পর্যন্ত ভোজন করিতে পারিতাম না।"

কেশব বাবুর প্রচার করে যাওয়ার বছর-দুই পরে প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ম'শায় ময়মনসিংহে প্রচার করতে আসেন। তিনি সমাজ-গৃহে চার-পাঁচটা বক্তৃতা দেন। তাতে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ এবং উপবীত ধারণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। ফলে কয়েকজন উপবীত ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা সকলেই সামাজিক অত্যাচারের ভয়ে অচিরে প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত পুনগ্রহণ করেন। গোস্বামী মশাইয়ের সঙ্গে যাঁরা পংক্তি-ভোজন করেছিলেন তাঁদের নাম 'ঢাকা-প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। তা' পড়ে হিন্দুগণ উত্তেজিত হ'য়ে হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা স্থাপন করে সকলকে সমাজচ্যুত করেন। গোস্বামী মশাই ময়মনসিংহ থেকে শেরপুর গিয়ে আবার ফিরতি পথে ময়মনসিংহে আসেন। সেবারে পুলিশ হেড্ ক্লার্ক ঈশানচন্দ্র সে অনেককে পংক্তি-ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত ও গিরীশচন্দ্র সেন ছাড়া আর কেউ সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সাহসী হননি। এরপর হিন্দু-সভা ব্রাহ্মদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করতেই দুই-একজন ছাড়া সকল ব্রাহ্মই হিন্দু আত্মীয়দের ভয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই দুই-একজনের মধ্যে গিরীশ বাবুও ছিলেন।

গিরীশচন্দ্র তখন জিলা স্কুলের হেডমাস্টার পার্বতী বাবুর সঙ্গে একত্র বাস, একত্র ভোজন করতেন। এই ঘটনার পর অন্তঃপুরে ভোজন বন্ধ হ'ল, বহির্বাটিতে খাবার আসতো; গিরীশ বাবুকেই সে থালা ধোয়া-মাজা করতে হ'ত। তারপর অন্ন-ব্যঞ্জন পাঠানো বন্ধ হ'লো, গিরীশ বাবু স্বয়ং রন্ধন করতে লাগলেন, পরে একজন ভৃত্য রাখা হ'ল। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর অত্যাচারে দুই-তিন দিন পরেই সে প্রস্থান করে। এমনকি ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম বন্ধুদের কেউই তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে জলযোগ করতে সাহসী হননি। "এদিকে অনেকেই রাত্রিকালে জমিদার বাবু কেশবচন্দ্র আচার্যের বোটে যাইয়া মোসলমান বাবুর্চির রাঁধা পোলাও-মুরগীর কারি উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিয়া আসিতেন।"

এইসব ঘটনার দশ বছর আগে ছোট দাদা হরচন্দ্র রায়ের জীবিতকালেই, বার বছরে কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবীর সহিত গিরীশচন্দ্রের বিবাহ হয়েছিল। এই বিপদের সময় পুণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী উপযুক্ত সহধর্মিণীর কাজ করেছিলেন। একমাত্র তিনিই স্বামীর ধর্মপথে সহায় ও বন্ধু হয়ে উৎসাহ-সূচক চিঠিপত্র দ্বারা তাঁর মনে সাহস যুগিয়েছিলেন। ওদিকে মাতা ও বড় দাদা 'অবৈধ উপায়ে' তাকে সমাজে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছিলেন। এখন বিদেশে স্বামীর জীবনযাপন দুর্বহ হ'য়ে উঠছে দেখে তিনি ময়মনসিংহে আসবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন।

তাই গিরীশ বাবু স্ত্রীকে নিয়ে এসে তাঁর বন্ধু দুর্গাশঙ্কর গুপ্তের আবাসে সস্ত্রীক অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু মাস দেড়েকের মধ্যেই উক্ত বন্ধু সে বাসা বিক্রয় করে দিয়ে সপরিবারে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। নতুন ক্রেতা জানালেন তিনি স্বয়ং বাস করবেন বাড়ীতে। গিরীশচন্দ্র পড়লেন মহা ফাঁপরে। সে সময় কেউ নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, বাড়ীর পাশেও স্থান দিতে প্রস্তুত ছিল না। পরে কোনও ক্রমে স্কুলের একজন সহকর্মী তাঁর নিজ গৃহের পার্শ্বে ক্ষুদ্র একখণ্ড পতিত জমি গৃহনির্মাণের জন্য গিরীশ বাবুকে প্রদান করলেন। এইভাবে বর্তমান সঙ্কটের সমাধান হয়। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে ব্রহ্মময়ী দেবী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। তাতে আর-এক সঙ্কট উপস্থিত হ'ল। ময়মনসিংহ নগরে বা স্বগ্রামে তাঁর প্রসবের সময় স্ত্রীলোকের সাহায্য পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। পরম দয়াময়ের কৃপায় এরও একটা হিল্লে হ'ল। এসব ঘটনার কয়েক বছর আগে থেকেই গিরীশচন্দ্র ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্যের কাজ করছিলেন। এই সূত্রে ঢাকায় নব-বিধান সমাজের উপাচার্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তিনি আসন্ন বিপদের কথা জানতে পেরে, তাঁকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে তাঁর আরমানীটোলায় বাসভবনে চলে আসবার উপদেশ দিলেন। গিরীশচন্দ্র বঙ্গচন্দ্রের আশ্রয়ে ঢাকায় চলে এলেন; কিছুদিন পরে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়; কিন্তু এক কাল অতীত না হ'তেই কন্যা-রত্নের কাল হয়। তখন ব্রহ্মময়ী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হ'য়ে অস্থিচর্মসার হ'য়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁর মাতা মাতৃস্নেহের আবেগে কন্যাকে আর দূরে ফেলে রাখতে পারলেন না। মাতৃগৃহের সেবা-যত্নে কিছুকাল পরেই তিনি সুস্থ ও সবল হ'য়ে ওঠেন। গিরীশচন্দ্র শ্বশুরের বাড়ী থেকে আবার স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যান। কিন্তু ময়মনসিংহে পৌঁছার সপ্তাহকাল মধ্যেই স্ত্রীর বসন্ত রোগ হয়, বহু কষ্টে তাঁকে নৌকাযোগে ঘোড়াশালের ঘাট পর্যন্ত আনা হয়, তারপর 'মহাফায়' বসিয়ে ভাটপাড়ার শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বহু সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও আট-নয় দিন পরেই রোগিনীর মৃত্যু হয়। এই সাধ্বী রমণী নৌকাযোগে বাড়ীতে ফিরবার সময় স্বামীকে বলেছিলেন : "শোক-দুঃখ-বিপদে তুমি অন্য লোককে সান্ত্বনা দিয়ে থাক; তাই উপস্থিত ব্যাপারে তুমি নিজে স্থির থেকো, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যেন অন্য কারও প্রয়োজন না হয়।" এই প্রেমময়ী স্ত্রীর শান্ত মধুর ব্যবহার স্মরণ ক'রে গিরীশচন্দ্র আজীবন স্ত্রীজাতির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এঁর মৃত্যুর পর তিনি আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেননি। তিনি আজীবন স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং স্ত্রীজাতির কল্যাণের জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা করেছেন।

এইসব সামাজিক ও পারিবারিক বিপদ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে গিরীশচন্দ্র আরও পরিপূর্ণভাবে ধর্মজগতে প্রবেশ করেন।

১৮৭৯ সালে ময়মনসিংহে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর-বছর স্থানীয় ব্রাহ্মদের আহ্বানে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ধর্মপ্রচারের জন্য ময়মনসিংহে এসে গিরীশ বাবুর আবাসেই অবস্থান করেন। তিনি সে-যাত্রায় প্রায় মাসাবধি কাল স্থিতি করে উপাসনা, ধর্মালোচনা এবং বক্তৃতাদি করেন। সে-বারে প্রায় ৮/৯ জন যুবা সাধু অঘোরনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। প্রতি সন্ধ্যায় ঈশ্বর-দর্শন, প্রত্যাদেশ শ্রবণ, বিশেষ করুণা প্রভৃতি এক-একটি বিষয়ে উপদেশ দান ও বিশেষভাবে আলোচনা করতেন। নবদীক্ষিত ব্রাহ্মগণের প্রায় সকলেই হিন্দু

আত্মীয়-স্বজন দ্বারা নিগৃহীত হ'য়ে গিরীশবাবুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এঁদের অনেকের অন্নবস্ত্রের ভারও তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়। সে-সময় তিনি মাসিক কুড়ি টাকা বেতন পেতেন, তার থেকেই নিজের ও অন্য আশ্রিতদের অন্ন-সংস্থান করতে হত এবং কলকাতা প্রচার-ভাণ্ডারে মাসিক এক টাকা করে চাঁদা দিতে হত। সৌভাগ্যক্রমে সে-সময় টাকায় এক মণ চাল পাওয়া যেত এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সুলভ ছিল। তখনকার ব্রাহ্ম যুবকগণের জ্বলন্ত উৎসাহ ছিল, তাঁরা কোনও পরীক্ষা-বিপদ গ্রাহ্য করতেন না। গিরীশ বাবু বিষয়-কর্মে ব্যাপৃত থাকার সময়েও সুযোগমত ধর্ম প্রচার করতেন, নিত্য উপাসনায় আনন্দ পেতেন। তিনি কখনও ভগবানের কৃপায় নিরাশ হননি। তিনি বলেছেন, বিশ্বাস করে তাঁর চরণে পড়ে থাকলে কখনও বঞ্চিত হ'তে হয় না। এর আগে থেকেই তিনি উপাচার্যের কাজ করে আসছিলেন, কিন্তু তখনও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কলকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই সময় এক বন্ধু তাঁকে বলেন যে, দীক্ষিত না হ'য়ে উপাচার্যের কাজ করা সঙ্গত নয়। এ-কথার সত্যতা স্বীকার ক'রে তিনি এই বৎসরেই (১৮৮০ সালে) বঙ্গচন্দ্র রায়ের নিকট বিশ্বাস স্বীকার করে মণ্ডলীভুক্ত হন। ইতিপূর্বেই, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র একবার পূজার বন্ধের সঙ্গে তিন মাসের ছুটি নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করে আসেন। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবপ্রদেশের প্রায় ত্রিশটি বিখ্যাত স্থানে গমন করেন। জলযান, নৌ-যান, ট্রেন, একাগাড়ি, অশ্বারোহ ও পদব্রজে এই ভ্রমণকার্য সম্পন্ন হয়। দেখা যায়, সে সময় ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত মালবাহী ষ্টিমার যাতায়াত করতো আর কুষ্টিয়া থেকে কলকাতায় ট্রেনের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল।

স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকেই গিরীশচন্দ্রের সংসারাসক্তি হ্রাস পেতে থাকে। সম্ভবত পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ ও তীর্থাদি-দর্শন এরই বহিঃপ্রকাশ। যাই হোক, ময়মনসিংহে ফিরে এসেও তিনি উপাচার্যের কাজেও কোনও বন্ধুর বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'লেন। এর ফলে, তিনি ময়মনসিংহ ত্যাগ করে কলকাতায় গিয়ে প্রচারব্রতী হবার সঙ্কল্প করেন। তাই ১৮৭২ সালে আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে চলে গেলেন। এরপর আচার্যের নির্দেশে উক্ত আশ্রমের অন্তর্গত স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হন।

তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার-ব্রত গ্রহণ না করেই প্রচারকের ন্যায় জীবন-যাত্রা শুরু করেন। এতে তাঁর বিশেষ ক্লেশ হ'য়েছিল। সাধারণ প্রচারকদের জীবিকার ভার প্রচার-ভাণ্ডারের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু গিরীশবাবু পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বড়-দাদার কাছে থেকে মাসিক সাত টাকা মাত্র পেতেন, তার থেকেই সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করতেন। অর্থাৎ এর থেকে ছয় টাকা প্রচার ভাণ্ডারে জমা দিয়ে নিজের হাত-খরচার জন্য মাসিক এক টাকা মাত্র রাখতেন। পরে এই বরাদ্দ আট টাকায় উন্নীত হয়েছিল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভাতুষ্পুত্র প্রথমে মাসিক ১০ ও কিছুদিন পরে মাসিক ১২ টাকা করে পাঠাতে লাগলেন। এর থেকেই গিরীশচন্দ্রের বিষয় আশয়ে অনাসক্তি এবং সরল জীবন-যাপন ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পৈত্রিক সম্পত্তির অবস্থা ত এই। মাতৃ-সম্পত্তির ব্যবস্থা এর চেয়েও শোচনীয়। তিনি ধর্ম-ত্যাগী বলে সেসম্পত্তি হ'তে তাঁকে বঞ্চিত করা হ'য়েছিল। পরে কিছু নগদ টাকা তাঁকে দেওয়া হয়, তার কিছুটা তিনি প্রচারভাণ্ডারে দান করেন, কিছু অংশ দিয়ে মায়ের অন্তিম

ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন এবং বাকীটা পুস্তকমুদ্রাঙ্কন ফাণ্ডে জমা দিয়ে দেন। এ ছাড়া তাঁর স্বরচিত পুস্তাদির উপস্বত্বও তিনি উইল করে কিছুটা পুস্তক-প্রকাশনা ফাণ্ডে, কিছুটা প্রচার ভাণ্ডারে এবং অবশিষ্টাংশে জন্মভূমির অভাব মোচনের জন্য দান করে গেছেন। এ ছাড়া কতকগুলো পুস্তক তিনি মিশনে দান করেছেন।[১]

## প্রচার

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গিরীশচন্দ্র ধর্মপ্রচারকরূপে কাজ করতে শুরু করেন। তখনও তিনি যথারীতি প্রচারকমণ্ডলীতে গৃহীত হননি। তবে ঐ বৎসরের শেষের দিকে নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে কলকাতা ফিরে আসবার পর আচার্য কেশবচন্দ্র রবিবাসরীয় 'মিরর' পত্রিকায় তাঁকে প্রচারক বলে অভিহিত করেন। আসামে প্রচারকালে রেলওয়ে, জাহাজ, গো-যান, ডোঙ্গা, নৌকা, অশ্ব, গজ, থাবা ও পদচারণায় যাতায়াত করতে হয়। ('থাবা' হচ্ছে খাসিয়া কুলির পিঠে ঘোড়ার মত একটি আসন—ঘন বনে আচ্ছাদিত পাহাড়ে উঠবার পক্ষে উপযোগী।)

এই সময়ে তিনি মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জন্মস্থান 'বড়দওয়া' গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন। শঙ্করদেব বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু মূর্তিপূজা করতেন না। শিষ্যগণকে প্রতিমার প্রসাদ গ্রহণ করতেও নিষেধ করেছিলেন। আর তিনি জাতিভেদও মানতেন না। তিনি বহু নাগাকেও 'মহাপুরুষীয়' ধর্মে দীক্ষিত করে নিয়েছিলেন। আসামে এখনও কামরূপীয় শ্রীশঙ্করাব্দ প্রচলিত আছে। (ইংরেজী সন থেকে ১৪৫০ কিংবা ১৪৪৯ বিয়োগ দিলে শঙ্করাব্দ পাওয়া যায়।)

এরপর তিনি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি সিলেট জিলার 'বিথলঙ্গে' নিরাকারবাদী সাধুভক্ত রামকৃষ্ণ গোস্বামীর দর্শন করেন। তারপর বিহার, উত্তরবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ (করাচী,

---

১. উইলপত্রে তাঁর রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় :
কোরানের বঙ্গানুবাদ; মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত; মহাপুরুষ মুসার জীবনচরিত; মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত; মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত, তিন খণ্ড : হাদিস মেশকাতোল মাসাবিহের বঙ্গানুবাদ, চারি খণ্ড; হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ; হিতোপাখ্যানমালা, দ্বিতীয় ভাগ; নীতিমালা, প্রথম ভাগ; তত্ত্বরত্নমালা; তত্ত্বসন্দর্ভমালা, ১ম ভাগ; চারিজন ধর্মনেতা। (এগুলির উপস্বত্বের এক-চতুর্থাংশ প্রচার-ভাণ্ডারের জন্য, আর তিন-চতুর্থাংশ পাঁচদোনা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অভাবগ্রস্তদের জন্য।)
তাপসমালা, ৬ ভাগ; দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ, প্রবচনার্থ; তত্ত্ব-কুসুম; কোরানের রত্নাবলী; দরবেশদিগের সাধনপ্রণালী; দরবেশদিগের ক্রিয়া; দরবেশদিগের উক্তি, দরবেশী; তুফসী রচিত; সতি রচিত; রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন; ঈশা কি ঈশ্বর?" (এগুলো প্রচার ভাণ্ডারে ভুক্ত হয়েছে।)
"হাদিস পূর্ববিভাগ, ৫ম খণ্ড পর্যন্ত; হাদিস উত্তর-বিভাগ, ১ম খণ্ড হইতে ২য় খণ্ড পর্যন্ত; এমাম হাসান ও হোসেন; মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এস্লাম ধর্ম; ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য; খলিফাদের নীতি।" (এ সকল পুস্তক, প্রচার ভাণ্ডারের অর্থ-সাহায্য ব্যতীত, প্রকাশন ফাণ্ড থেকে মুদ্রিত করা গিয়েছে।)
এ ছাড়া, কতকগুলো উর্দু পুস্তক ও বক্তৃতা লাহোর ব্রাহ্মসমাজের অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'য়েছে। 'মহিলা' নাম্নী মাসিক পত্র প্রায় চার বৎসর যাবত সম্পাদিত হ'য়েছে (৮ই বৈশাখ, ১৮৯৯ সালে লিখিত।)—এগুলোর উপস্বত্বে গিরীশ বাবুর কোনও দাবী নাই, এ-কথাও উইলপত্রে উল্লিখিত আছে।

হায়দরাবাদ), মদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বহু স্থানে প্রচার করেন। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, হায়দরাবাদ (সিন্ধু ও নেজাম), লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, ঝানসী, লাহোরিয়াসরাই, সিমলা প্রভৃতি স্থানে উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশেও ঢাকা চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিরাজগঞ্জে উর্দুতে বক্তৃতা করেন। এইসব প্রচারকার্যের কতকগুলো এককভাবে আর কতকগুলো দলবদ্ধভাবে করা হয়।

**আরবী ভাষার চর্চা ও কুরআনের অনুবাদ**

গিরীশচন্দ্র ইসলাম ধর্মের গুরুতত্ত্ব জানবার জন্য ১৮৭৬ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে আরবী ভাষার চর্চা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ মৌলবী এহসান আলী সাহেবের কাছে প্রায় এক বৎসর কাল আরবী ব্যাকরণ ও দিওয়ান হাফিজ পাঠ করেন। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে এক মৌলবী সাহেবের কাছে কিছুদিন অধ্যয়ন করে ঢাকায় চলে আসেন। সেখানে নলগোলার মৌলবী আলিমউদ্দিন সাহেবের কাছে আরবী ইতিহাস ও আরবী সাহিত্য আলোচনা করেন। তারপর ১৮৭৮ সালের দিকে তাঁর এক সমবিশ্বাসী বন্ধু মিয়া জালালুদ্দিনের যোগে একখানা কুরআন শরীফ কিনে, তরজমা ও তফসীরের সাহায্যে পড়তে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজে নিজেই আয়াতসমূহের অর্থ বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করেন এবং কিছু কিছু বাংলা তর্জমা করতে আরম্ভ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এর প্রথম খণ্ড (প্রথম পারা) শেরপুর চারুচন্দ্র প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। পরে কলকাতার বিধান-যন্ত্রে প্রতি মাসে খণ্ডশঃ মুদ্রিত হ'তে হ'তে প্রায় দুই বৎসরে সম্পূর্ণ অনুদিত ও মুদ্রিত হয়। পরিশেষে সমুদয় একসঙ্গে বাঁধাই করা হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ) দেবযন্ত্রে ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের সহস্র কপিও ১৯০৬/০৭ সালের মধ্যে প্রায় নিঃশেষিত হ'য়ে যায়।

কুরআনের অনুবাদের কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হবার পর মুসলমান সমাজে এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। একজনের উক্তি : "জনৈক কাফের আমাদের কুরআন-পাক অনুবাদ করেছে; হাতের কাছে পেলে তার গর্দান নিতাম।" আবার তিনজন প্রধান মৌলবী সংবাদপত্রের মারফতে তাঁর প্রশংসা করে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তার মর্ম এই "কুরআনের অনুবাদ প্রথম দুই খণ্ড পাঠ করে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনি কি করে এমন উদার আনুপূর্বিক প্রকৃত অনুবাদ করতে পারলেন। আমাদের আন্তরিক অশেষ কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করুন। আমাদের ইচ্ছা, অনুবাদক সাধারণের সমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি লোকমণ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করতে সক্ষম হলেন, তখন সমস্ত লোকের নিকটে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁর উপযুক্ত সম্ভ্রম লাভ করা সমুচিত।"

'মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত' তিন খণ্ড পাঠ করলে বুঝা যায় কি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে সত্য-সন্ধানী গিরীশচন্দ্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন ও ধর্ম-জীবনের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্য উদঘাটন করে দেখিয়েছেন।

**দেশ-হিতৈষণা ও চারিত্রিক স্বকীয়তা**

প্রতি বৎসর মাতৃদর্শনের জন্য পাঁচদোনা গ্রামে গিয়ে ভাই গিরীশচন্দ্র কিছুদিন অবস্থান করতেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর পরিবারস্থ মহিলাগণ হস্তাক্ষর, বাংলো রচনা, কাগজে কাটা ছবি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতায়

অংশ গ্রহণ ক'রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে বহু পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পাঁচদোনা গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬৩/৬৪) স্থাপনেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ময়মনসিংহে শিক্ষকতা করার সময় তিনিই উদ্যোগী হ'য়ে মুড়াপাড়ার জমিদারদের সাহায্যে ঐ শহরে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ 'প্রত্যহ প্রাতে ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টা কাল' বিনা বেতনে এই স্কুলে শিক্ষা দান করেন। ময়মনসিংহ ত্যাগ করে কলকাতা আসার পর আচার্য কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে (বিনা-বেতনে) শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হন। তিনি স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'রামাবোধিনী' পত্রিকায় বহুকাল নিয়মিত প্রবন্ধ লেখক ছিলেন। এঁরই প্রস্তাবে ও উৎসাহে নারীদের জন্য পরিচারিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে। তিনি বারো বছরেরও অধিক কাল 'মহিলা' পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। ময়মনসিংহে চাকুরী করবার সময়ই 'বনিতাবিনোদ' নামে একখানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। কত লেখিকার রচনা প্রকাশ করে বা অন্য প্রকারে উৎসাহিত করে যে তিনি নারীহিত-ব্রত পালন করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। 'মতিচুর' পুস্তকের রচয়িত্রী মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনও গিরীশ বাবুর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। গিরীশ বাবু লিখেছেন : "মোসলমান প্রতিভাশালিনী বিদূষী কন্যা 'মতিচুর' পুস্তকের রচয়িত্রী শ্রীমতি আর. এস. হোসেন মৎকর্তৃক অনুবাদিত 'ধর্মসাধননীতি' পুস্তকের সমালোচনায় আমাকে 'মোসলমান-ব্রাহ্ম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকৃতি-প্রকৃতি-ভোজ্য-পরিচ্ছদ-আচার-ব্যবহারাদি দেখিয়া আমাকে মোসলমান-ব্রাহ্ম বলেন নাই; আমি মোসলমান শাস্ত্রের আলোচনা করি এবং মোসলমান জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া থাকি তজ্জন্য সেরূপ বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তাঁহার সঙ্গে আমার মাতৃ-পুত্র সম্বন্ধ স্থাপিত। সেই মনস্বিনী মহিলা উক্ত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় নিজেই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে পত্রাদি লিখিতে পত্রে নিজের নাম না লিখিয়া নামের পরিবর্তে 'মা' বা 'আপনার স্নেহের মা' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। কিন্তু মাতা অপেক্ষা পুত্রের বয়ঃক্রম দ্বিগুণেরও অধিক, মাতার ২৬/২৭ বৎসর বয়ঃক্রম, পুত্রের ৭১/৭২ বয়স।'

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নব-বিধান সমাজের ধর্মগুরু কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের বিবাহ উপলক্ষ করে দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন হয় তাতে গিরীশচন্দ্র দৃঢ়তার সহিত কেশবচন্দ্রের 'প্রত্যাদিষ্ট কর্মের সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে এই আন্দোলন প্রধানতঃ হুজুগ-প্রিয় দায়িত্বহীন ছাত্রসমাজের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়; তবে এর সঙ্গে কোনও কোনও প্রবীণ নেতারও সমর্থন এবং উস্কানি ছিল। গিরীশচন্দ্র আক্ষেপ করে লিখেছেন ঃ "কেশবচন্দ্রের পূর্বতন অনুগামী ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমিতেই স্থিতি করিলেন, তাঁহাকে অস্বীকার করাতে তাঁহার জীবনে প্রকাশিত নব-আলোক ও নব-সত্য গ্রহণ ও ধারণে অসমর্থ হইলেন। কেহ বা হিন্দু-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণপূর্বক স্বয়ং মন্ত্রদানে মন্ত্রগ্রাহী বৈষ্ণব সমাজ স্থাপন করিয়াছেন; কেহ বা হিন্দু বামাচারী মহান্ত হইয়া শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক পূজিত হইয়াছেন; কেহ বা কর্তাভজা গুরুর, কেহ বা মন্ত্রগ্রাহী গোস্বামী গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কেহ বা সিংহবাহিনী ভবানী-পূজায় যোগ দিয়াছেন। সমধিক বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন সে-সকল লোক কেশবচন্দ্রের প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমাদের ধর্মপিতা মহর্ষি দেব তাঁহাদের সহায় ও মুরুব্বি হইয়াছেন; তাঁহাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়াছেন; অর্থাদি দানে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন; তাঁহার মত ও বিশ্বাসে মিলুক বা না মিলুক তাঁহারা তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র

হইয়াছেন। উক্ত ঋষিধর্ম যোগধ্যানের সঙ্গে এইরূপ ভাবের কি প্রকার সামঞ্জস্য আছে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।'

এই সূত্রে আপন ভগ্নীপতি, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী প্রমুখ নিকট আত্মীয়ের সঙ্গেও গিরীশচন্দ্র সম্পর্কচ্ছেদ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এঁদের পুত্রকন্যাদির বিবাহে পর্যন্ত যোগদান করতে বিরত রয়েছেন। এই সময় কেশবচন্দ্রের অনুগামী ব্রাহ্মদের সবিশেষ সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। যে-সকল উপাচার্য কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁদের অনেককেই বেদী-চ্যুত করা হয়। এই সময় গিরীশচন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন দরবারাশ্রিত প্রেরিতকে বিতাড়িত হ'য়ে পথে দাঁড়াতে হয়েছিল। বহু ক্লেশ ভোগের পর এঁরা শেষে বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত কেশব একাডেমীর স্কুল-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর পর অনেক চেষ্টাচরিত্তের পর হ্যারিসন রোডের নিকটবর্তী ২০ নং পটুয়াটোলা ভবনে প্রচারকার্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র ও ছাত্র-নিবাস স্থাপিত হয়। এখানে প্রত্যহ প্রত্যূষে ছাত্রদের নিয়ে উপাসনা করার ভার গিরীশচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়েছিল। এইসব বিপর্যয়ের শেষে গিরীশবাবু মন্তব্য করেছেন : "বিধাতা অত্যাচার-উৎপীড়নকে স্থায়ী হ'তে দেননি; আজ হোক কাল হোক তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা, ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।"

নববিধান ঘোষণার পর বিধানাচার্য একদিন শ্রী-দরবারে এক একজন প্রচারককে এক একটি বিশেষ কার্য ও ভাব দ্বারা চিহ্নিত করেন। গিরীশচন্দ্রের কার্য ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের চর্চা ও অনুবাদের সাহায্যে প্রচার আর ভাব সত্যানুরাগ ব'লে নির্দিষ্ট হয়।

**রাজনীতি**

গিরীশচন্দ্র রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তবু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সমুদয় বিশিষ্ট হিন্দুনেতার অভিমতের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে নিজের যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য। এর থেকে পূর্ববাংলার কল্যাণচিন্তা তাঁর মনে কত গভীর ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে :

"কতকগুলো সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কতিপয় বক্তা এই প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রবর্তক। তাঁহাদের লেখনী ও রসনা হইতে রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি অজস্র কটূক্তি বর্ষণ হইতে পারে—আনুষঙ্গিক ইংরোজ জাতির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াই যায়। এই আন্দোলন ও প্রতিবাদের স্রোতে পড়িয়া বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক, বালক-বালিকারা পর্যন্ত উত্তেজিত হয়, রাজবিদ্বেষী ও ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া উঠে। আমি বঙ্গবিভাগ নীতির বিপক্ষে নহি, বরং স্বপক্ষে। আমার বিশ্বাস এতদ্বারা পশ্চাদপদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরবর্তী চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য-স্থান হইতে চলিল, পূর্ববঙ্গবাসীদের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সে-দেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্যালয় সকল স্থাপিত ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আসাম প্রদেশও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিই, বাঙ্গালদিগের উন্নতিদর্শনে অনেকের চক্ষুশূল হইতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ-নিবাসী কৃতবিদ্য

লোকেরা কোন অফিসে তাঁহাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ববঙ্গ নিবাসী অনেক বক্তা ও পত্রিকা-সম্পাদক দুগ্ধপোষ্য বালকদিগকে পর্যন্ত উত্তেজিত করিয়া প্রশ্রয় দিয়া উদ্ধত অবিনীত ও অবাধ্য করিয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করেন, উহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়। স্কুলের অত্যাচারী বালকগণ রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে মারামারি করিয়া জেল খাটিয়া আসিলে, এদিকে তাহাদিগকে Martyr বলিয়া প্রশংসা করিয়া মাথায় তোলা হয়, পুরস্কার দেওয়া যায়। ঔদ্ধত্য, অবিনয় ও অনীতির ফল কখনও ভাল হইবার নহে। আমার জন্মস্থান ঢাকা জিলায় সে-স্থানে আমার বাসগৃহ, আমি ঢাকা-নিবাসী। ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয় উন্নতি হইতে চলিল ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। নূতন রাজ্য-শাসন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটিল বলিয়া যত আর্তনাদ ও আন্দোলন। কিন্তু সম্বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে কি যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কি যে অনিষ্ট হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার লক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। উভয় প্রদেশের বক্তা ও লেখকগণ সম্মিলিতভাবে উৎসাহ সহকারে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন, রেলওয়ে ও ষ্টিমারাদি যোগে পূর্ববৎ উভয় প্রদেশে সম্মিলিতভাবে বাণিজ্যাদি চলিতেছে, প্রত্যহ সহস্র সহস্র নর-নারীর অবাধ গমনাগমন হইতেছে, বিবাহাদি সম্বন্ধযোগ উভয় প্রদেশবাসী লোকের সঙ্গে পরস্পর ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা চলিয়াছে, তাহার এক বিন্দুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। অবচ্ছেদ কেমন করিয়া বুঝা যায়? যদি প্রকৃত একতা চাও, তবে পূর্ববঙ্গ-নিবাসীদের প্রতি 'বাঙ্গাল', উড়িষ্যাবাসীদের প্রতি 'উড়িয়া', বিহার প্রদেশের লোকদের প্রতি 'মাড়ুয়া' এইরূপ বিদ্বেষজনক ও ঘৃণাসূচক শব্দ প্রয়োগে নিবৃত্ত হও।"

এই দীর্ঘ (অথচ অসম্পূর্ণ) উদ্ধৃতি থেকে মৌলবী গিরীশের বাস্তব দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, দেশপ্রীতি, স্পষ্টভাষণ, নৈতিকবল ও সত্যানুরাগী স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর মানসিক গঠনে কুরআন-অনুমোদিত শরীয়তের পা-বন্দী বা বিধানানুগত্যের স্পষ্ট নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে গিরীশচন্দ্রের 'আত্মজীবন' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি আর কতদিন বেঁচে ছিলেন, তার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, এর বছরখানিক পরেই কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই উক্তির পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া গেলে তখন সে-তথ্য সংযোজিত করা হবে।

## পরিশিষ্ট

গিরীশচন্দ্রের গ্রন্থমালা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন ও রচনাশৈলীর কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ এর থেকে মুসলিম ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট চিন্তা-ভঙ্গীরও খানিকটা নিদর্শন পাওয়া যাবে।

১. কোন ব্যক্তি আপন মুখে নিজের মূর্খতা স্বীকার করে না। কিন্তু যে অন্যের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই কথা বলিতে আরম্ভ করে, তাহা দ্বারাই তাহার মূর্খতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একজনে কথা বলিতেছে, এমন সময় তুমি কথা বলিতে আরম্ভ করিও না। বিবেচক সতর্ক লোকেরা অন্য বক্তাকে নীরব না দেখিলে কথায় প্রবৃত্ত হয় না।' হিতোপাখ্যানমালা, ১ম ভাগ। (পৃঃ ৪), পারস্য নীতিপুস্তক 'তনির্ভা' হইতে সঙ্কলিত।

২. 'অন্য লোকে সস্তা জানিয়া অধিক মূল্য দিয়া কিনিবে এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে দর চড়াইয়া কোনও দ্রব্য লওয়া নিষেধ। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রতারণা করিবার জন্য বিক্রেতার দ্বারা এইরূপ ব্যবহার ঠিক করিয়া লয়, তবে যখন তাহার গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখনই সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। এরূপ রীতি আছে যে, বাজারে মাল রাখিয়া দেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে না সে তাহার দর বাড়াইয়া দেয় এ প্রকার করা পাপ। যে অচতুর বিক্রেতা দ্রব্যের মূল্য জানে না, সস্তা বিক্রি করে, তাহা হইতে জিনিস কেনা অনুচিত; এবং যে ভোলা-প্রকৃতি ক্রেতা দর জানে না, অধিক দরে জিনিস কিনে তাহার হস্তে বিক্রি করা অন্যায়।'—নীতিমালা, ১ম ভাগ (পৃঃ ৩৯) উর্দু পুস্তক 'আক্‌সীর হিদায়েত' হইতে সঙ্কলিত।

৩. 'তিনি সুফী (সাধু) যিনি মালিন্য হইতে মুক্ত, সচ্চিন্তাযুক্ত, ঈশ্বরের সান্নিধ্যবশতঃ যাঁহার মায়াবন্ধন ছিন্ন ও যাঁহার চক্ষুতে ধূলিও স্বর্ণতুল্য।'

'নির্ভর স্থাপন প্রেরিত পুরুষদিগের অবস্থা, যিনি নির্ভর স্থাপনে প্রেরিত পুরুষদের অবস্থা প্রাপ্ত হন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদের বিধি পরিত্যাগ করেন না।'

'আত্মোৎসর্গ ব্যতীত নির্ভর স্থাপন ঠিক হয় না, আত্মচেষ্টা ত্যাগ না করিলে আত্মোৎসর্গ হয় না।'

'নির্ভরের তিনটি লক্ষণ। অন্যের নিকট প্রার্থী না হওয়া, কিছু উপস্থিত হইলে গ্রহণ না করা, গ্রহণ করিলে বিতরণ করা।

'নির্ভরশীলকে তিনটি বিষয় দেওয়া হয়—সার বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দীপ্তি, ঐশ্বরিক সান্নিধ্যদর্শন।'

'ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই দানে তোমার সন্দেহ না করাই নির্ভর।'

'কিছু থাকুক, বা না থাকুক, উভয় অবস্থায় তোমার স্থির থাকাই নির্ভর।'

'অন্য-সম্পর্ক-শূন্য হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি জীবন যাপন করিবে, ইহাই আন্তরিক নির্ভর।'

সমুদয় ভাবেরই সম্মুখ ও পশ্চাৎ আছে, কিন্তু নির্ভরের সর্বতোভাবে সম্মুখ আছে, তাহার পৃষ্ঠভাগ নাই। ইহার মর্ম এই যে সংসারের প্রতি বিরাগ হইতে বৈরাগ্য ও নিবৃত্তির, বাসনা প্রবৃত্তির নিদারুণ বিরুদ্ধাচরণ হইতে শাসন সংগ্রাম, দর্শন ও বস্তুজ্ঞান হইতে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা, তেজ ও কোমলত্ব হইতে ভয় এবং আশা, দুঃখ ও কষ্ট হইতে ভারার্পণ, আদেশ হইতে সম্মতি দান, সম্পদ হইতে কৃতজ্ঞতা, বিপদ-সঙ্কট হইতে ধৈর্য; কিন্তু নির্ভর নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের উপর হইয়া থাকে। সুতরাং নির্ভর পৃষ্ঠশূন্য সর্বতোমুখীন। যদি কেহ বলে, ঈশ্বরের উপর নির্ভরের ন্যায় বন্ধুতাও হইয়া থাকে, আমি বলিব, বন্ধুতা ঈশ্বরের সঙ্গে হয়, ঈশ্বরের উপর নয়।"—তাপসমালা, চতুর্থ ভাগ, সপ্তম সংস্করণ, ১৯২৭ (পৃঃ ১৭) সহল তস্তরী।

৪. 'নিশ্চয় ঈশ্বর শস্যকণিকা ও বৃক্ষবীজের বিদারক, তিনি মৃত হইতে জীবিতকে ও জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন, ইনিই ঈশ্বর; তবে কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া যাও? ইনি উষাকালের উদ্ভেদক এবং ইনি রজনীকে বিশ্রাম ও চন্দ্র-সূর্যকে (কাল-গণনার) নিদর্শন করিয়াছেন, পরাক্রান্ত জ্ঞানী ঈশ্বরের এই নিরূপণ। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য নক্ষত্রাবলী সৃজন করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা সমুদ্র ও প্রান্তরের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও; যাহারা

বুঝিতেছে, সেই দলের জন্য নিশ্চয় আমি নিদর্শন সকল বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিলাম। এবং তিনিই যিনি এক ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, পরে তোমাদের জন্য অবস্থানভূমি ও প্রত্যার্পণভূমি আছে; যাহারা বুঝিতেছে সেই দলের জন্য নিশ্চয় আমি বিস্তারিতভাবে নিদর্শন সকল বর্ণনা করিলাম। এবং তিনিই যিনি আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন, পরে আমি তাহা দ্বারা প্রত্যেক উৎপাদ্য বস্তু বাহির করি, অনন্তর সেই জল হইতে হরিৎ পদার্থ নিষ্ক্রামিত করি, তাহা হইতে পরস্পর সম্মিলিত বীজ নিঃসরণ করি এবং খোরমা-তরু হইতে তাহার কোরকযুক্ত পরস্পর সন্নিহিত শাখাবলী (বাহির করি) এবং দ্রাক্ষালতা হইতে উদ্যান সকল এবং জয়তুন ও পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ দাড়িম্ব (নির্গত করি)। যখন ফল জন্মে ও তাহার পরিপক্কতা হয়, দৃষ্টি কর তাহার ফলের দিকে, যে-সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতেছে, তাহার জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন-সকল আছে। এবং তাহারা অসুরকে ঈশ্বরের অংশী করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে তিনি সৃজন করিয়াছেন, তাহারা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত। তাঁহার জন্য পুত্র ও কন্যাগণ সংঘটন করিয়াছে, তিনি পবিত্র ও যাহা বর্ণনা হয়, তদপেক্ষা উন্নত।'—কুরআন শরীফ, সূরা আনাম (রুকূ ১২, আয়াত ৯৬—১০০) পৃষ্ঠা ১৭২—১৭৩।

৫। 'যাহার অন্তরে ঈশ্বরে প্রেম প্রবল হইয়া মত্ততায় পরিণত হইয়াছে, তাহার জন্য সঙ্গীত প্রয়োজন। সঙ্গীতযোগে সূফীদিগের কাহারও কাহারও অন্তরে যেরূপ গূঢ় ধর্মীয় ভাব প্রকাশিত হয়, হৃদয় কোমলতা লাভ করে, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। সূফীগণ সঙ্গীতের প্রভাবে যে স্বর্গীয় প্রেমার্দ্র ভাব প্রাপ্ত হন, তাহাকে তাঁহারা 'ওজ্দ' (ভাবাবেশ) বলেন। আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আত্মার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সঙ্গীত সেই সম্বন্ধে এতদূর জীবন্ত করিয়া তোলে যে আত্মা ইহলোক হইতে একেবারে প্রস্থান করে। সঙ্গীতের এইরূপ ভাবদর্শন করিয়া যাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহাদেরও তৎপ্রভাবে অনেক উপকার হয়।'—ধর্মসাধননীতি, ২য় ভাগ (পৃঃ ২৪), সঙ্গীতের বৈধাবৈধ বিষয়ে ইমাম গায্যালীর কিমিয়ায়ে সাদত থেকে সঙ্কলিত।

# নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ্

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জাগরণের উদ্বোধক ও গণমনে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চারকারী সমাজ-সেবক নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্যার সলিমউল্লাহর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাংলার মুসলমান ছিল শরাফতের মোহে আচ্ছন্ন, আধুনিক শিক্ষায় উদাসীন এবং ধন-সম্পদেও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় পার্শ্ববর্তী হিন্দু-সমাজের তুলনায় অনেকাংশে হীন। আবার সেই সঙ্গে পুরোনো যুগের ফার্সী শিক্ষাও মন্দীভূত এবং ইসলামের অনুষ্ঠান-মাত্র অবশিষ্ট ছিল—তার আদর্শ একপ্রকার বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব ছিল প্রবল—জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবোধ তো দূরের কথা, গণতন্ত্র বা গণস্বাধীনতার চিন্তাও উন্মেষিত হয়নি। দেশের জমিদারদের প্রতাপ ও জাঁকজমক অবশ্যই ছিল—তাঁদের উৎসাহে যাত্রা, থিয়েটার, কবিতা-চর্চা, তর্জা, কুস্তি, লাঠিখেলা, সঙ্গীতচর্চা, ধর্মীয় উৎসবাদি ও আমোদ-প্রমোদের ভিতর যে-কালচার প্রকাশ পেত, তা ছিল মূলতঃ রক্ষণ-ধর্মী বা স্থিতিধর্মী বিকাশধর্মী নয়। বর্তমান যুগে শিক্ষণ, উচ্চপদ বা বিশিষ্ট কোন গুণাদির সাহায্যে উচ্চতর সমাজে উন্নীত হওয়ার পথ যতটা খোলা আছে সে-যুগে ততটা ছিল না। কিন্তু স্যার সলিমউল্লাহ এদিক দিয়ে আশাতীতভাবে উদার ছিলেন। অন্য কথায়, তিনি আপন সহৃদয়তা দ্বারা সমসাময়িক জনমতকে যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকগণ তাঁর এইসব দুর্লভ সদ্‌গুণের আলোচনা দ্বারা বৃথা অভিমানের স্বাতন্ত্র্য ভুলে গিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের শুভ-সম্মিলনে অনুরাগী হ'তে পারেন, এই আশায় নওয়াব সলিমউল্লাহ বাহাদুরের জীবনের ঘটনাবলী, যতটা জানা গেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে চেষ্টা করব। তা ছাড়া দেশের কৃতী সন্তানদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারলে, দেশবাসীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, আর জাতীয় উন্নয়নের আদর্শ সম্বন্ধে হয়তো বা কিছু দিশা মিলতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পারসিক ও কাশ্মিরী বণিকগণ পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে ঢাকা, সিলেট ও বাখরগঞ্জ জিলায় জাঁকালো ব্যবসায় খুলে বসেছিলেন। তাঁরা গরম কাপড়, লবণ ও কাঁচা চামড়ার ব্যবসা করতেন। খাজেহ্ আবদুল ওয়াহাব নামক একজন কাশ্মিরী বণিক সর্বপ্রথম ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে দিল্লী থেকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিলেটে আগমন করেন। তখন একমাত্র পূর্ববঙ্গ ছাড়া উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি বিরাজ করছিল। দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে মারহাট্টাদের অভ্যুত্থান তো ছিলই, তার উপর আবার মহাবীর আহমদ শাহ আবদালী ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষবারের মতো দিল্লী আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ খাজেহ্ আবদুল ওয়াহাবের বাণিজ্যব্যপদেশে সিলেট আগমনের এ-ও আর একটি কারণ ছিল। যা হোক, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং কিছুদিন পরে, অতিরিক্ত আয়ের উপায় হিসেবে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শরীকানায়

নীলের কারবার করেও প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। বর্তমানে যেখানে সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের অফিস, সেইখানেই এঁদের বাসস্থান ছিল। যা হোক, অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান হতে না হতেই এই বংশের দুই ভ্রাতা খাজেহ্ হাফিজউল্লাহ ও খাজেহ্ আহসান-উল্লাহ ঢাকা শহরের পূর্ব-দরজা অঞ্চলে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। এই অঞ্চলে তাঁদের গোরস্থান এবং ভগ্ন প্রাচীরাদির নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। আনুমানিক ১৮১৩ সালে আহসানউল্লাহ হজ্জ করবার জানা মক্কা শরীফে গমন করে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। হজ্জে যাবার সময় তিনি তাঁর পুত্র খাজেহ আলিমউল্লাহকে আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছিলেন। আলিমউল্লাহর চাচা হাফিযউল্লাহই সর্বপ্রথম ব্যবসায়ের টাকা দিয়ে পড়ন্ত মুসলমান জমিদারদের জমিদারী খরিদ করা শুরু করেন। এরপর আরও অনেক মুসলিম জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোক তাঁদের সম্পদ ও ওয়াকফ্ সম্পত্তি খাজেহ্ আলিমউল্লাহর হেফাজতে রেখে তাঁকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। এভাবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা ও পাবনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁর সম্পত্তি গড়ে উঠে। তাঁর উত্তরাধিকারীরাও এর সঙ্গে আরও কয়েকটি নতুন এস্টেট সংযুক্ত করেন। এভাবে সর্বসাকুল্যে সম্পত্তির মোট আয় বার্ষিক ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে খাজেহ আলিমউল্লাহ ফরাসী কুঠিয়ালদের কাছ থেকে বুড়ীগঙ্গার তীরবর্তী কুমারটুলী অঞ্চলে কয়েকটি কুঠিবাড়ী ক্রয় করেন। ইতিপূর্বে এইসব কুঠিবাড়ীর মালিক ছিলেন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 'জালালদীর' সৌখীন জমিদার শেখ এনায়েত উল্লাহ। সে-সময়ে এইসব কুঠিবাড়ী 'রঙ্গমহল' নামে পরিচিত ছিল। এনায়েত-উল্লাহর পুত্র শেখ মুতী-উল্লাহর এই রঙ্গমহল ফরাসী কুঠিয়ালদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। পরবর্তী কালে এর কিছু কিছু সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। পরে এর নাম হয় 'আহসান মঞ্জিল।' এর সরহদ্দের ভিতরে এখনও শেখ এনায়েত-উল্লাহর মাজার রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত প্রকাণ্ড পুষ্করিণীটি ফরাসীদের আমলে "লিউইস জলা" নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য খাজেহ্ সাহেবদের আমলেই জলাভূমিকে বর্ধিত করে গোলাকার পুষ্করিণীতে পরিণত করা হয়।

খাজেহ আলিমউল্লাহর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ওফাতপ্রাপ্ত হন। তখন কার দ্বিতীয়া বেগমের গর্ভজাত খাজেহ্ আবদুল গনীই গদীনশীন হন। এর বয়স তখন ৪১ বছর। ইনি স্বভাবে, বিদ্যায় ও নানাবিধ গুণে পিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। দেশের লোকেও তাঁর সঙ্গীত ও ফারসী কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দানশীলতা ও মধুর ব্যবহারে এঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট ছিল। ইনি রাজ্য বা সুবার শাসনকর্তা ছিলেন না, তবু ভাইসরয়, গভর্নমেন্ট ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এঁকে শাসনকর্তা নওয়াবের মতই সম্মান করতেন। ১৮৬৭ সালে তিনি ভাইসরয়ের মন্ত্রণাসভার সভ্য নিযুক্ত হন; ১৮৭৫ সালে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত হন; ১৮৭৭ সালে এই উপাধি বংশানুক্রমিকভাবে প্রথম পুত্র বা তদভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ উত্তরাধিকারীর উপরে বর্তাবে বলে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭২ সালে নওয়াব আবদুল গনী নিজের তত্ত্বাবধানে সমগ্র রঙ্গমহল ও কুঠিবাড়ী পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করে প্রিয় পুত্র খাজেহ আহসান-উল্লাহর নাম অনুসারে এর নাম দেন 'আহসান মঞ্জিল।' এর দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার দিকে প্রশস্ত বারান্দা ও উত্তরে সদর রাস্তার দিকে প্রধান তোরণের উপর নহবতখানাও তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। আবার ঐ বৎসরেই মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রাঙ্গণে আহসান উল্লাহ যানানামহল (ফিমেল ওয়ার্ড) নির্মাণের জন্য ষাট হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে

(৭ই এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭ টা) ঢাকার কুমারটুলী ও নদীতীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। এর ফলে আহসান মঞ্জিলের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত যানানা-মহল ভেঙে পড়ে। নওয়াব আবদুল গনী ও আহসানউল্লাহ এর ঠিক পূর্বক্ষণেই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছিলেন। শোনা যায়, নওয়াব পরিবারের অন্য একজন প্রধান লোক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। আশেপাশের পড়শীরা এসে কোনক্রমে এঁকে টেনে তোলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন, বহুক্ষণ পরে তাঁর হুঁশ ফিরে আসে। এই ঘোর বিপদের সময় ইউরোপীয় অফিসারগণও আহসান মঞ্জিলে এসে উপস্থিত হন। নওয়াব আবদুল গনী তৎক্ষণাৎ ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের প্রাথমিক সাহায্যের জন্য তাঁদের হাতে ২৫,০০০ টাকার একখানি চেক লিখে দেন।

১৮৯৬ সালে বিরাশী বৎসর বয়সে নওয়াব আবদুল গনী ইনতেকাল করেন।

পিতার মৃত্যুর পর নওয়াব স্যার আহসানউল্লাহ বাহাদুর কে. সি. আই. ই. তাঁর গদীতে সমাসীন হন। প্রকৃতপক্ষে, ইতিপূর্বে ১৮৭৫ সালে তিনি ও তাঁর পিতা একসঙ্গে নওয়াব উপাধি পেয়েছিলেন। নওয়াব হওয়ার পর তিনি সি.আই. ই. (Companion of the Order of the Indian Empire) হন; অতঃপর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে কে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন। লেডী ডাফরীন "Our Viceregal Life in India" গ্রন্থে নওয়াব আবদুর গনী ও নওয়াব আহসানউল্লাহ্ সম্বন্ধে লিখেছেন," সমাজ উন্নয়নের কাজে বদান্যতার ক্ষেত্রে পিতাপুত্রে প্রতিযোগিতা চলে। ১৮৯৬ সালে তিনি (নওয়াব আহসানউল্লাহ) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। ঢাকা শহরে এমন কোনও মসজিদ, মাজার বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নেই, যাতে তিনি মুক্ত হস্তে দান না করেছেন। ১৯০১ সালে তিনি চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকায় যে বৈদ্যুতিক আলোকব্যবস্থা করেছেন তাতে ঢাকাবাসী অতিশয় উপকৃত হয়েছে। তিনি কলিকাতায় গভর্নরের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর মর্যাদাবোধ এত প্রখর ছিল যে, কোনও দিন নওয়াবের জন্য নির্দিষ্ট (Nassalis Special) বলে চিহ্নিত বিশেষ ট্রেনে বা স্টিমারে ছাড়া এইসব সভায় যোগদান করতে আসেননি।"

আহসান মঞ্জিলের রাজসোপানের সম্মুখস্থ বৃহৎ কক্ষে রক্ষিত পরিপাটিরূপে বাঁধাই করা সোনালী হাসিয়াযুক্ত একখানা পরিদর্শক-বহি (Visitors book) রাখা থাক্‌ত। তাতে সই দিতে পারলে উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করতেন। ১৯০১ সালে রমযান মাসে হৃদযন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় নওয়াব আহসানউল্লাহর মৃত্যু হয়। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজেহ হাফিয-উল্লাহ ষোড়শ বৎসরে (১৮৮৪ খ্রীঃ) ইন্তেকাল করেন। এই প্রিয়দর্শন কিশোর বালকের স্মৃতি-রক্ষার জন্য ঢাকার ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার্কে স্ফটিক প্রস্তর দ্বারা একটি চতুষ্কোণী সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। প্রাক্তন নবাব সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র খাজেহ সলিমউল্লাহর জন্ম হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে; ইনিই পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

**নওয়াব স্যার খাজেহ্ সলিমউল্লাহ বাহাদুর G.C.I.E.**
**Grand Commander of the Order of the Indian Empire**

খাজেহ সলিমউল্লাহ বাল্যকাল থেকেই অতিমাত্রায় শরীয়ত-ভক্ত ছিলেন, এবং উচ্চনীচ ভেদাভেদ তুচ্ছ করে সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। শোনা যায়, একসময়ে

তিনি অধিকাংশ সময়ই মসজিদে কাটাতেন, আর নামাযরত মুসল্লীদের জুতা-খড়ম ইত্যাদির হেফাজত করতেন। এইজন্য তাঁর পিতা তাঁকে মোটেই দেখতে পারতেন না। শুধু পিতার কাছে নয়, ঢাকার শরীফ সম্প্রদায়ও তাঁর এইসব বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। আসলে যুগটা ছিল সামন্ততন্ত্রের। তখন উচ্চবংশীয়রা নিজেদের গৌরব সম্বন্ধে ছিলেন অতিশয় সতর্ক—তাঁরা অপেক্ষাকৃত হীনবংশীয় লোকদের কাছে সম্মান দাবী করতেন এবং পেতেনও; আবার এই হীনবংশীয়রাই তাদের চেয়ে নীচবংশীয়দের সঙ্গে ঠিক এই ব্যবহারই করতেন। এমনকি শ্রেষ্ঠতায় ডোম বড় না মেথর বড় এ নিয়েও ঝগড়া করতে শোনা গেছে। নওয়াব বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এমন লোকদেরকেও নওয়াব সলিমউল্লাহর নিন্দা করতে শুনেছি, রযীল লোকদের সঙ্গে দহরম-মহরম করা, আর গভর্নমেণ্টের অধীনে নৌকরী করার যিল্লতী স্বীকার করার জন্য। অবশ্য ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ আর সুফিয়ানা মেজাজের প্রতি যথার্থ সম্মানবোধ যাদের নেই, তেমন লোকদের মনোভাব এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

যা হোক, ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁর বংশ ও পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁকে সরাসরি উচ্চস্তরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করে ময়মনসিংহে প্রেরণ করলেন। কিছুকাল পরেই পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তিনি একখানা বিশেষ ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা এসে পড়লেন। বোধ হয় এবার তাঁর নবাবীর উপযুক্ত মর্যাদাবোধের পরিচয় দিতে হয়েছিল। যা হোক তাঁর ছোটভাই খাজেহ্ আতীক-উল্লাহ বা অপর কেউই তাঁর পিতৃস্থল অধিকার করার ব্যাপারে আপত্তি করেননি।

তিনিও তাঁর পিতার মতো মুক্তহস্তে দান করতেন। নওয়াব হয়ে প্রথমেই তিনি জনশিক্ষায় উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন। এর ফলে দেখতে দেখতে শহরের মহল্লায় নৈশ-স্কুল খোলা হয়ে গেল। তিনি মহা ধুমধামের সহিত ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্মোৎসব পালন করতেন; আর অন্য লোককেও এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। এই উপলক্ষে মুসলিম মহল্লার গৃহাদি তোরণমাল্য ও আলোকসজ্জায় মনোহরভাবে সজ্জিত হত।

তিনি মহল্লা-সর্দারদের আহ্বান করে দেশের লোকের শিক্ষা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদির বিষয় ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন, এবং এইসব বিষয়ে উন্নতি কিসে হবে, সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে ইউনিভার্সিটি), আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল (বর্তমানে ফজলুল হক হল), মির্টফোর্ড কলেজে আসমাতুন্নিসা ভবন বা ওয়ার্ড (তাঁর দাদীর স্মরণে)—এ সমস্তই নওয়াব সলিমউল্লাহ বাহাদুরের দান। ঢাকা কলেজ হোস্টেলও (বর্তমানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রাবাস, শহীদুল্লাহ হল) নবাব সলিমউল্লাহ বাহাদুরের সময়েই নির্মিত হয়। এ ছাড়া মিটফোর্ড হাসপাতালের King Edward Memorial (সম্রাট এডওয়ার্ডের স্মৃতিসৌধ), স্যার সলিমউল্লাহ মুসলিম এতিমখানাও তাঁর দানে পুষ্টি হয়েছে। এইসব জনহিতকর ও শিক্ষা-উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তিনি মুসলিম বাংলার অবিসংবাদিত নেতার স্থান অধিকার করেছিলেন।

লর্ড কার্জনের অনুষ্ঠিত বঙ্গবিভাগের দুইটা প্রধান কারণ ছিল। প্রথম বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার সমবায়ে গঠিত এত বড় অঞ্চল শাসন করা একজন লাটের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়ত, এই সম্মিলিত প্রদেশের মুসলমান জনসাধারণ নানা কারণে ন্যায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছিল। লর্ড কার্জন এর প্রতিকারকল্পে ঢাকা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের সঙ্গে

আসাম সংযুক্ত করে পূর্ববঙ্গ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে এর রাজধানী নির্দিষ্ট করেন ঢাকা। আর বঙ্গদেশের অবশিষ্ট অংশ বিহার উড়িষ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠন করে এর রাজধানী নির্দিষ্ট করে কলকাতা। এ ব্যাপারে নবাব সলিমউল্লাহর নেতৃত্বে সমুদয় মুসলমান নেতার পূর্ণ সম্মতি ছিল। কিন্তু ঢাকায় নতুন রাজধানী হলে চাকরী-বাকরী ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের লাভ হবে, এই ব্যাপারটাকে হিন্দু স্বার্থের হানি বলে মনে করে সমগ্র ভারতের বিখ্যাত হিন্দু নেতারা ধুয়া তুললেন "হিন্দু জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুর্বল করে ফেলবার উদ্দেশ্যেই বঙ্গবিভাগ করা হয়েছে।" এই নিয়ে দেশে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীরাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বিলাতী দ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন, ছাত্র-আন্দোলন প্রভৃতিতে চতুর্দিকে মুখরিত হয়ে উঠল। এই অবস্থার মুকাবিলা করবার জন্য নওয়াব সলিমউল্লাহ বাহাদুর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতির আয়োজন করলেন। কুমিল্লাতেও এইরূপ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নবাব বাহাদুর এই সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য নওয়াব হুসসাম হায়দার চৌধুরীকে আমন্ত্রণ করেন। এই উপলক্ষে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (পরবর্তীকালে নওয়াব বাহাদুর, সি.আই.ই কার্যকরী সমিতির সদস্য), মৌলবী আবদুল হক (সালার), মৌলবী আবদুল হামিদ (মুসলিম ক্রনিকল পত্রিকার সম্পাদক), মিঃ খলিল সাবীর (ঢাকা), চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস (ঢাকা), মীর্জা ফকির মুহম্মদ (ঢাকা), ফরিদউদ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকী (ঢাকা), সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর (ঢাকা) এবং আরো কয়েকজন প্রিয় বন্ধুর একদল নিয়ে কুমিল্লায় উপস্থিত হন। স্টেশনে পতাকা ও ইশতেহারপত্র নিয়ে বহুলোক অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। তারপর সারিবদ্ধভাবে মিছিল করে গন্তব্য স্থলে যাওয়ার পথে স্থানীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের এক উচ্ছৃঙ্খল দল মিছিলে আক্রমণ করে। এমনকি, পুলিশের এক দারোগাও গুলি করে একজন মুসলমান কর্মীকে হত্যা করে। এর দু'দিন পর স্পেশ্যাল ট্রেনে করে ফিরবার পথে চাঁদপুর পৌছবার প্রাক্কালে হঠাৎ বিষম ঝাঁকি লেগে ট্রেন বাঁদিকে একটু কাত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এর গতিও অতিশয় মন্থর হয়ে গেল। যা হোক, চাঁদপুরে পৌছে জানা গেল দিন-দুপুরে বিরুদ্ধ পক্ষের সন্ত্রাসবাদীরা রেলের উপর কোনও বাধা স্থাপন করে গাড়ী লাইনচ্যুত করবার চেষ্টা করেছিল।

মুসলিম শিক্ষার প্রসারের জন্য নওয়াব সলিমউল্লাহ বাহাদুর দুই-দুইবার ঢাকার নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা অধিবেশন (All Indian Muslim Education Conference) আহ্বান করেন। দুইবারই তিনি আপন তত্ত্বাবধানে এর আয়োজন সম্পন্ন করেন এবং সমুদয় ব্যয়ভারও একাই বহন করেন। এঁরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ঢাকা নগরীতেই ঐতিহাসিক নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ (All India Muslim Lague) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকায় একত্রে সম্মিলিত হন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নওয়াব ভিকার-উল-মুলক সাহেব। এই অধিবেশনে খ্যাতনামা যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন, নওয়াব মুহসীন-উল-মুলক, মেহেদী আলী খান বাহাদুর, নওয়াব ফৈয়াজ আলী খান (পাহাসু), নওয়াব স্যার সাদিক আলী খাঁ, মৌলানা মুহম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, মিঃ সৈয়দ আলী ইমাম, মিঃ হাসান ইমাম, মিঃ আলে নবী, হাযিকুল মুলক হাকিম, আজমল খাঁ, রাজা নওশাদ আলী, সাহেবযাদা আফতাব আহমদ খাঁ, সৈয়দ ওয়াঠার হাসান, ডঃ স্যার মুহম্মদ রিয়াজুদ্দীন; মিঃ জাফর উল্লাহ খাঁ, আল্লামা শিবলী নোমানী, মৌলানা আবুল কালাম আযাদ, শাহ সুলায়মান (ফুলওয়ারী) সৈয়দ গুলামুস সাকলায়ন,

মৌলানা আলতাফ হোসেন হালী, জাস্টিস শাহদনি, জাস্টিস স্যার শরফ উদ্দীন প্রমুখ। প্রধান স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিলেন মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (পরে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর), এবং খান বাহাদুর মুহঃ মাহদুদ (সিলেট), শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সাহেব ও নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা সাহেব, যিনি নওয়াব সলিমউল্লাহ বাহাদুরের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন। মুসলিম লীগের এই বিরাট সম্মেলনে কয়েক দিন যাবৎ সুপ্রশস্ত শাহবাগ অঞ্চল সুধী সমাগমে আলোচনা পর্যালোচনায় তাম্বু শিবিরে, আলোক-মালায়, আমোদ-উৎসবে খানাপিনায় ও হাস্য-পরিহাসে নওয়াব সলিমউল্লাহ বাহাদুরের দূরদৃষ্টি ও মুসলিম ভাগ্য উন্নয়নের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। তিনি জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তৎকালীন হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্ক কিরূপ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের বাধা কোথায় এবং এই বাধা অতিক্রম করবার উপায় কি—এ সম্বন্ধে নিজের পর্যবেক্ষণ ও সহজ বুদ্ধি দ্বারা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলিম সমাজের চিন্তা-ভাবনা আশা-আদর্শ ও দাবী-দাওয়া পেশ করবার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে পরবর্তী কালের পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ নওয়াব সলিমউল্লাহর এই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ ভুল করেছিলেন ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে এবং ইংরেজ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে দেশকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করে। এর প্রতিকার করেছিলেন মনীষী স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৭৫ সালে আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইংরেজ গভঃমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে। এদিকে বাংলার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কলিকাতা মুসলিম সাহিত্য-সমিতির (The Muhammadan Literary Society Calcutta স্থাপনকর্তা নওয়াব আবদুল লতিফও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও ইংরেজদের সহিত সহযোগিতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত সাহিত্য-সমিতির একসভায় জৌনপুরের বিখ্যাত মৌলানা কেরামত আলী সাহেবকে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর সঙ্গে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁকে এ সম্পর্কে অভিমত দিতে অনুরোধ করেন। এই সভায় মৌলানা সাহেব দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া ধর্মসঙ্গত নয়। আবার এদিকে ১৮৭১ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োর আদেশে হার্ন্টার সাহেবও 'The Mussalmans of India" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের প্রতি অবিচার এবং কিসে এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ সুপারিশ করেন। এর সম্মিলিত ফল এই দাঁড়াল যে ইংরেজ গভর্নমেন্ট সঠিক অবস্থা বুঝতে পেরে মুসলিম নির্যাতন ক্ষান্ত করে তাদের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা ইংরেজ আর মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের নয়, বরং তখন সমস্যা দাঁড়িয়েছিল হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে—অধিকারভোগী ও অধিকার-প্রত্যাশীর মধ্যে আপোসরক্ষার প্রশ্ন নিয়ে। বহু বৎসর চেষ্টার ফলে দেখা গেল, হিন্দু ও মুসলমানের সমস্যা সর্বৈব এক নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিরোধও রয়েছে। তাই, অসাধারণ ধীমান নওয়াব সলিমউল্লাহ পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে মুসলিম আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে সুস্পষ্টভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করলেন। নবাব সলিমউল্লাহ সর্বপ্রথম নেতা, যিনি

মুসলিম রাজনীতিকদের নিজস্ব চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনের কথা ভেবে তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। এর সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে কবি নজরুল ইসলামের অনন্যসাধারণ দান। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামী শব্দ ও ইসলামী চিন্তাধারার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যখন সংস্কৃতমূলক কৃত্রিম বাংলা রীতিতেই গতানুগতিক সাহিত্যসৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম, সেই সময় নজরুল ইসলাম প্রাণময় ভাবোজ্জ্বল উর্দু-ফার্সী-মিশানো বলিষ্ঠ স্বচ্ছন্দগতি বাংলা ভাষার আদর্শ স্থাপন করলেন। এরপর আমরা নতুন পথের সন্ধান পেয়ে আত্ম-প্রত্যয় লাভ করলাম। বলা বাহুল্য, পূর্বেকার (বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগরীয়) যুগে সাধুভাষা যেমন কেবল হিন্দু-বাংলার সংস্কৃতির ধারক ছিল, পূর্বেকার (কংগ্রেসী আমলের) রাজনীতিও তেমনি সমগ্র ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ধ্যানধারণা প্রকাশে অক্ষম ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নওয়াব সলিমউল্লাহ্ বিশিষ্ট মুসলিম ভাবধারা প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থার প্রবর্তন করেছেন। আশা ছিল, উভয় ধারার যুগপৎ প্রবাহের ফলে হয়ত একদা নবতর ধারার সৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু মৌলানা মুহম্মদ আলী, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির শত চেষ্টাতেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত ধারার সৃষ্টি সম্ভব হল না। এতেও দেখা যাচ্ছে, স্যার সৈয়দ আহমদ ও স্যার সলিমউল্লাহর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই বোধ হয় অধিকতর বাস্তবানুসারী ছিল।

নওয়াব সলিমউল্লাহ তাঁর পিতা-পিতামহদের চেয়েও উচ্চতর রাজসম্মান লাভ করেছিলেন। এর কারণ এই যে, তিনি ধর্মানুরাগী হয়েও আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তা-ধারার অধিকারী এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বশালী সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে নওয়াব উপাধি পেয়েছিলেন। বাপ-দাদার অর্জিত K.C.I.E উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়। ঢাকার নওয়াবদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম নওয়াব বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। এরপর তাঁকে C.I.F. খেতাব দেওয়া হয়, অবশেষে ১৯১১ সালের দিল্লী দরবারে তাঁকে G.C.I.E উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই G.C.I.E উপাধি (Grand Commander of the Order of the Indian Empire) K.C.I.E অপেক্ষাও অধিক সম্মানজনক, তাই এই উপাধিকারীদের নামের প্রথমে স্যার লেখা যায়। শুধু G.C.I.E হলে স্যার লেখা চলে না। সচরাচর G.C.I.E উপাধি কেবল আশ্রিত বা মিত্র নওয়াব বা রাজাদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। অনন্য-সাধারণ গুণগরিমার জন্যই তাঁকে এই বিশিষ্ট উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ঢাকায় এসে নওয়াব বাহাদুরের সম্মানিত অতিথি হিসেবে আহসান মঞ্জিলেই অবস্থান করেন।

মুসলমান সমাজের কল্যাণের জন্য নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ্ বাহাদুরের চিন্তার অবধি ছিল না। তিনি যে কত শিক্ষিত যুবকের ভালো চাকরীর জন্য সুপারিশ করেছেন, তার অন্ত নেই। এক সময় সৈয়দ তৈফুর সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এত অধিক সার্টিফিকেট দিলে তো সার্টিফিকেটের কদর কমে যাবে?' তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন, 'সার্টিফিকেটের কদরের জন্য ভাবলে চলবে না। সার্টিফিকেট দিলে যদি তিনজনের মধ্যে একজনের ভাগ্যেও একটি ভাল চাকরী জুটে যায়, তাহলে দেখতো কত আনন্দ! নিজের সুপারিশের মানের খাতিরে কি আমি কাউকে চাকরীর সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করতে পারি?' এমনি সদাশয় লোক ছিলেন তিনি। আর যে কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা [illegible]

ডাক দিয়ে প্রাণ খোলা হাসি হাসতেন। এইসব কারণে লোকে তাঁকে ভয় করত না, ভালবাসত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নওয়াবযাদা সলিমউল্লাহ অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন; যৌবনকালের নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ বাহাদুর আবশ্যক মতো নওয়াবী ঠাটও বজায় রাখতেন; শেষ বয়সে তিনি আবার ধর্মানুষ্ঠানের দিকে সবিশেষ ঝুঁকে পড়েন। তখন তিনি দাড়ি রাখতেন এবং নামায ও তিলাওয়াতে বহু সময় ব্যয় করতেন। জনাব তৈফুর সাহেব এরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এইভাবে ঃ একবার রমযান শরীফে শীতের রাতে নওয়াব বাহাদুরের সঙ্গে শবীনা তারাবীহ্ পড়তে গেলাম দিলকুশা মসজিদে। সঙ্গে আরও কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু ছিলেন। অবশ্য শবীনা তারাবীহ্তে পুরা তিরিশ পারা কুরআন খতম করা হয়, এ-কথাও জানতাম। যা হোক, নওয়াব বাহাদুরের পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত করার পরই আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না, চুপি চুপি সরে পড়লাম। নওয়াব বাহাদুরকে দেখলাম, তিনি যেন ধ্যানস্থ হয়ে একাগ্রভাবে বিশ্ব-স্রষ্টার সামনে অত্যন্ত তা'যিমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরদিন জানতে পারলাম, কেবল খানবাহাদুর খাজেহ মুহম্মদ আযম এবং অন্য একজন কি দুইজন ভক্ত অনুচর ছাড়া আর সবাই পিঠটান দিয়েছিলেন। সকাল হয় হয়, এমন সময় নামাজ শেষ হল। তখন নওয়াব বাহাদুর পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেই অবস্থাটা আঁচ করে মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

নওয়াব বাহাদুরের আমলের ১৮৯৭ সালের প্রবল ভূমিকম্পে আহসান মঞ্জিলের দক্ষিণ দিকের বারান্দা আর উত্তর দিকের সদর রাস্তার পার্শ্ববর্তী নহবতখানা ভেঙে পড়ে। পরে তা আবার নির্মিত হয়। নওয়াব আবদুল গনীর সময় থেকেই জাঁকজমকের সঙ্গে নহবতখানার উৎসবকালীন শানাই আর ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বনির বিচিত্র সুরমালা শোনা যেত। মাঝে কিছুদিন এ রেওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৪ সালে লর্ড কাজর্ন যখন নওয়াব বাহাদুরের আহসান মঞ্জিলে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন, সে-সময়ে নহবতখানা আবার চালু করার অনুরোধ করেছিলেন। সেই থেকে বছর দু'য়েক আবার ঘণ্টার স্বরলহরী শোনা গিয়েছিল। তারপর নহবতের সময় ঘোষণা একেবারে থেমে গেছে। নওয়াব বাহাদুর ১৯১৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে কলকাতা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। পরদিনই স্পেশ্যাল লঞ্চে করে তাঁর মৃতদেহ ঢাকায় নিয়ে এসে পূর্বদরজা লেনস্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন কার্য সমাধা হয়।

### ঢাকার নওয়াব-বংশ

ঢাকার নওয়াবদের পূর্ব-পুরুষ যাঁরা সিলেটে এসে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদেরকে আমরা অতিশয় কর্মদক্ষ ও হুঁশিয়ার সওদাগররূপে দেখতে পেয়েছি। আরও দেখেছি, তাঁরা খুব ধর্মপ্রাণ ও শিষ্টাচারী ছিলেন।

আরবী-ফার্সী শিক্ষার চর্চাও বেশ ছিল। সুযোগ বুঝে বিলেতী সাহেব-কোম্পানীর সঙ্গে শরীকানায় কাজ করবার ক্ষমতা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা কত সতর্ক ও সম্মানী লোক ছিলেন। ঢাকায় এসে জমিদারী খরিদ ও বন্ধক রাখার ব্যাপারেও তাঁদের বিষয়বুদ্ধির প্রচেষ্টা বেশ বোঝা যায়। একসময় এঁদের কোনো দূর-সম্পর্কীয় গরীব আত্মীয়ের ওয়াকফনামা ও অন্য কয়েকখানা দলিলপত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই থেকে বুঝতে পেরেছি সাবেক আমলের

ভদ্রলোকদের বিষয়বুদ্ধি ও পরিবার-সংহতির ব্যবস্থা কেমন সুক্ষ্ম ও সুবিবেচনা-প্রসূত ছিল। অবশ্য, এই উৎকর্ষ বাদশাহী আমলের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারের মধ্যে একটি।

নওয়াব খাজেহ হাবীবউল্লাহ বাহাদুর, বর্তমান নওয়াব খাজেহ হাসান আসকারী বাহাদুর এবং ঐ বংশের খাজেহ মুহম্মদ আযম, খাজেহ নাজিমউদ্দিন, খাজেহ শাহাব উদ্দীন, খাজেহ সলিম, খাজেহ আদেল, খাজেহ আজমল বা অন্য যে-কোনও লোকের সঙ্গে যাঁরই সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে, তিনিই বহুবার দেখতে পেয়েছেন, তাঁদেরকে আগে সালাম দেওয়া কত কঠিন। তাঁদের এই আদর ও নম্রতার মাধুর্য দেখে তাঁদের প্রতি সভ্রমে আপনা-আপনি মাথা নুয়ে আসে।

অবস্থার উত্থান-পতন সর্বত্রই আছে। ঈদে, বকর-ঈদে গরীব হোক আর মহৎই হোক—নওয়াব-বংশের সবাই মুরুব্বীদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে থাকেন। পরিবারভুক্ত সকলকেই পারিবারিক গোরস্থানে অন্তিম আশ্রয় গ্রহণ করতে দেওয়া হয়।

ঢাকায় এসে জমিদারী খরিদ করবার পর দেখা যায়, এঁরা আগেকার ধর্মভাব ও শিষ্টাচার বজায় রেখেও বুনিয়াদি জমিদারের মত হাশমত-দবদবার সঙ্গে কাল কাটিয়েছেন। আর শিক্ষার ব্যাপারে আরবী ফার্সী আর উর্দু ছাড়াও ইউরোপীয় গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরেজী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। নওয়াব আবদুল গনীর দাদা খাজেহ আহসানউল্লাহ ভালো আলেম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ঢাকায় তাঁর অনেক মুরীদও ছিল। এই প্রথম আহসানউল্লাহর পুত্র খাজেহ আলীম-উল্লাহও বংশের পুত্র-কন্যাদের স্বভাব-চরিত্র ও তালিমের দিক খুব খেয়াল রাখতেন। এঁর বড় ছেলে খাজেহ আবদুল হাকিমের বাজে খরচ করবার অভ্যাস ছিল, আর শরাফতের খেলাপ কাজকর্মেও প্রবৃত্তি ছিল। এই কারণে তিনি দ্বিতীয় পুত্র খাজেহ আহসানউল্লাহকেই পরিবারের কর্তা নিযুক্ত করে যান। খাজেহ আবদুল গনী আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে বুৎপন্ন ছিলেন এবং সঙ্গীতেও উর্দু ফার্সী কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নওয়াব স্যার খাজেহ আহসানউল্লাহ ভালো আরবী, ফার্সী ও উর্দু জানতেন। ইংরেজী শিক্ষাও বাড়ীতেই আয়ত্ত করেন। তিনি নাম-করা উর্দু কবি ছিলেন, তাঁর তাখাল্লুস বা ছদ্মনাম ছিল 'শাহীন'।

নওয়াব আবদুল গনীই প্রথম নওয়াবী শান-শওকত, প্রজাসাধারণের আমোদ-প্রমোদ এবং সৎকর্মে দান-ধ্যানের একটি আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি প্রতি বৎসর মক্কাযাত্রী বহু হাজীর যাতায়াতের খরচ বহন করতেন। মক্কাশরীফের যুবিদুন্নাহারের সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ-সাহায্য করেছিলেন, তা ছাড়া রুশিয়া-তুর্কী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্যও প্রচুর দান করেছিলেন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষাদিতে মুক্তহস্তে দান করতেন; গরীব-দুঃখীদের বিশেষ করে যারা স্বচ্ছল অবস্থা থেকে ফতুর হয়ে পড়েছে তাদেরকে সাহায্য করতেন; লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক ১৮৭৫ সালে উদ্বোধিত ঢাকার পানির কল তিনিই নিজব্যয়ে স্থাপন করেন। হাতী চলাচলের জন্য ঢাকা থেকে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোহর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার ভিতর দিয়ে তিনি উঁচু কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত করেছিলেন; বাল্যকালে সেই রাস্তায় বহুবার হাতী চলতে দেখেছি। লাঠিখেলা, হাডুডু খেলা প্রভৃতিতে পুরস্কার ও সাহায্য দিয়ে এবং কোনও কোনও সময় নিজে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিতেন। তিনি ঢাকায় বিখ্যাত ঘোড়-দৌড় খেলার প্রবর্তন করেন এবং সেজন্য ভাল জকি, ভাল ঘোড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মাইনে করা কুস্তিগীর ছিল, তারা নানা রকম কসরত ও প্যাঁচ দেখিয়ে লোকের আনন্দ যোগাত। তিনি বুড়িগঙ্গা নদীর

ধারে চা-খানা স্থাপন করেছিলেন, সেখানে প্রত্যহ সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বিনামূল্যে সকলকে কাশ্মিরী চা বিলান হত, আর সেই সময় তিনি লোকদের অভাব-অভিযোগ শুনে তার যথারীতি প্রতিকার করতেন; ১৮৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী তারিখে শাহবাগে আলোকসজ্জা করে এবং বাইজীদের নাচ-গানের ব্যবস্থা করে দর্শকের আনন্দ বর্ধন করতেন। তাঁর দস্তরখানে সর্বদা উচ্চাঙ্গের রুচিকর মোগলাই খানা পরিবেশিত হত। একথা তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও বিশিষ্ট অতিথিগণ আনন্দ এবং গর্বের সাথে স্মরণ করে থাকেন। তাঁর দরবারে খোলা তলোয়ার হাতে ঝলমলে তকমাধারী রক্ষী বা তুর্ক সওয়ারের এক বৃহৎ দল ছিল, শাহবাগ, দিলকুশা ও মতিঝিলের সুসজ্জিত প্রমোদ-উদ্যান, আর নারায়ণগঞ্জ ও বেগুনবাড়ীর ঝর্ণাশোভিত পশুশালা ও শিকারভূমি দর্শনীয় বস্তু ছিল; নওয়াব সাহেব একটি উৎকৃষ্ট পর্তুগীজ ব্যাণ্ডপার্টি পোষণ করতেন; তারা উৎসবাদিতে ইউরোপীয় সুর-বাদন করে সকলের আনন্দ বর্ধন করত। নওয়াব আবদুল গনী সাহেবের চোখ দু'টো নীলবর্ণের ছিল। কিশোর বয়সের দেখা তাঁর নীল চোখের প্রসন্ন চাউনি আর হাসিমুখে ফুটে ওঠা সদয় হিতৈষণার স্মৃতিকথা সৈয়দ তৈফুর আবেগ ভরে বর্ণনা করতেন।

নওয়াব বাড়ীর এই শানশওকত নওয়াব বাহাদুর সলিমউল্লাহর সময় পর্যন্ত মোটামুটি একভাবেই বর্তমান ছিল। তারপর জমিদারী দখল (Acquisition) অ্যাক্টের ধাক্কায় পারিবারিক ওয়াকফ ছাড়া বাকী সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নওয়াব বাড়ীর ধুমধামও একরকম উঠে গেছে বললেই চলে। তবু তাঁদের মান-সম্মান ও ঢাকাবাসীর উপর এঁদের এখনও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাঁদের বিশিষ্ট কালচার যতদিন বজায় থাকবে, ততদিন এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের গুণেই এঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ জনসাধারণের চিত্তে প্রীতি ও সম্মানের আসন অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন বলেই আশা রাখি।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ বাহাদুরের স্থায়ী প্রভাব বিনষ্ট হবার নয়। এর কারণ, শান-শওকত ঘরোয়া বা পারিবারিক ব্যাপার, স্থানীয় দান-খয়রাত, (পানির কল, বিজলী বাতি ইত্যাদি) প্রাদেশিক এবং বস্তুজগতের ব্যাপার, এতিমখানা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদির মধ্যে বস্তুজগতের সঙ্গে মনোজগতেরও কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। নওয়াব সলিমউল্লাহ বাহাদুর এসব তো করেছেনই, এর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নতুন যুগের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা, গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি, জন-সাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পরিকল্পনা—এসব আরো উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার, তার আত্মিক সূক্ষ্ম প্রভাব জনমনের পরতে পরতে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পূববর্তী নওয়াবদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে স্যার সলিমউল্লাহর গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের পর পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ ঢাকা পূর্ববঙ্গ প্রদেশের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কার্জন হল বিল্ডিং, হাইকোর্ট বিল্ডিং, বর্ধমান হাউজ, হুদা হাউজ, চামেরী হাউজ, আরও কতকগুলো বাংলো এবং নীলক্ষেতের কুঠিগুলো তৈরী হয়। দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি জীবনের সবক্ষেত্রে কর্মচাঞ্চল্য এবং প্রদেশবাসীর মনে আশার আলো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু হিন্দু-নেতার স্বার্থমূলক আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালের দিল্লীর দরবারে বঙ্গবিভাগ রদ হয়ে যাওয়াতে মুসলিম-প্রধান পূর্ব-বাংলার সকল আশা বিলুপ্ত হল। তখন নওয়াব সলিমউল্লাহ ঢাকায় একটি ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পরিকল্পনা পেশ

করেন। সরকার নওয়াব বাহাদুরের এই প্রস্তাব নীতিগতভাবে মেনে নিল ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিল পাস হল ১৯২০ সালে, কিন্তু এর পাঁচ বছর আগেই নওয়াব বাহাদুরের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্য আরম্ভ হল। স্যার সলিমউল্লাহ বাহাদুরের প্রচেষ্টার ফলেই যে পরিণামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা সফল হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এই শ্রেষ্ঠদান কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করার যোগ্য। এই কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ-স্বরূপ ঢাকা ইউনিভার্সিটির সর্বপ্রথমে নির্মিত হলের নাম দেওয়া হয়েছে 'সলিমউল্লাহ মুসলিম হল'। যে সব কৃতী ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছে তাঁরাই আজ দেশের নেতা, নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ স্থলে অধিষ্ঠিত থেকে দেশ ও সমাজের সেবা করে চলেছেন। আমরা, পরবর্তী যুগের লোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে, এর একাডেমিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতাকে খর্ব না করে, এর আদর্শকে কলুষ-কালিমা থেকে বাঁচিয়ে এর ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে যথাসম্ভব সাহায্য করলে স্যার সলিমউল্লাহর আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

## শের-এ-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক

১৮৭৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে (সাবেক বাংলা ১২৮০ সনের কার্তিকের মাঝামাঝি সময়ে) বরিশাল জেলার এক সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ও শরীফ বংশে স্বনামধন্য এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের জন্ম হয়; আর নব্বই বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার ছয় মাস বাকী থাকতেই ১৯৬২ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে (মুতাবেক বাংলা সন ১৩৬৯ সালের ১৪ই বৈশাখ) তিনি ইন্তিকাল করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি যেমন সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন, তেমনি তিনি সাধারণ মেধা ও প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। বরিশালের মহাপুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঢাকার বিচক্ষণ জননেতা স্যার সলিমউল্লাহ্ বাহাদুর এবং কলিকাতার বঙ্গশার্দুল জাস্টিস স্যার আশুতোষ এঁরা সবাই তেজঃপুঞ্জ যুবক ফজলুল হককে অতিশয় স্নেহ করতেন।

১৯০৬ সালে ঢাকায় আহূত নিখিল-ভারত মুসলিম শিক্ষা-সম্মেলনের সমুদয় ব্যবস্থাদি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করে, এবং কয়েকটি প্রস্তাবের মুসাবিদা করে দিয়ে ফজলুল হক তাঁর কর্মদক্ষতা আর ইংরেজী ভাষার উপর অপূর্ব অধিকারের পরিচয় দেন। তিনি বাংলা ও উর্দু ভাষায়ও অবলীলাক্রমে বক্তৃতা করতে পারতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে কার্জন হলের সম্মুখস্থ লাটভবনের হল-কামরায় ১৯১৭ সালের পূর্ব থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হত। সে-সময় ঐ হলের গ্যালারিতে বসে ঢাকা কলেজের ছাত্রেরা রাজনীতিকদের বিতর্ক শুনতে পারত। আমরা তখন বিশেষ করে ফজলুল হক সাহেবের বক্তৃতা শুনবার জন্যেই গ্যালারিতে উপস্থিত হতাম—আর তাঁর অনর্গল বক্তৃতার সুসম্বদ্ধ সুদীর্ঘ বাক্যগঠন, ভাষণচাতুর্য এবং আইনগত উত্তর-প্রত্যুত্তরের বাহাদুরী দেখে চমৎকৃত হতাম, আর বিশেষ গর্ববোধ করতাম এই ভেবে যে আমাদেরই একজন মুসলিম নেতা এমন তুখোড় বক্তৃতা দিতে পারেন। পরে সময় সময় সলিমউল্লাহ মুসলিম হলের ডাইনিং হলেও তাঁর ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতা শুনেছি। আবার কোনও কোনও উর্দু মহলে তাঁর অনর্গল উর্দু বক্তৃতা শুনবারও সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

১৯৩৮ সালের লীগ-সম্মেলনে লক্ষ্ণৌ শহরে বাগ্মীপ্রবর ফজলুল হক সাহেব কংগ্রেসশাসিত সাতটি প্রদেশে মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে জ্বালাময়ী উর্দু বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা শুনে হাজার হাজার আহলে-যবান উর্দুভাষীদের কণ্ঠে শেরে-বাংলা যিন্দাবাদ, শেরেবাংলা যিন্দাবাদ' ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল। এইভাবে লক্ষ্ণৌবাসীরা এবং পরে ভারতীয় জনগণ একযোগে স্বতঃউৎসারিত ধ্বনিতে তাঁদের মহান নেতা ফজলুল হককে শেরে-বাংলা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তাঁদের পাটনায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত মুসলিম শিক্ষা-সম্মেলনেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

জনাব তফাজ্জল হক মালিক সাহেব একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন—বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কার্জন হলে একবার প্রাক্তন গভর্নর গোলাম মোহাম্মদের সম্বর্ধনা-সভায় ফজলুল হক

সাহেব উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ এক অশীতিপর বৃদ্ধের গলা শোনা গেল— বলছেন, "বাবা আমাগো হক সাব কই? তারে এক নজর দেখার লাইগা মানিকগঞ্জ থেকে তিরিশ মাইল পথ হেঁটে ও হাইটা আইছি। তুমি বাবা আমারে তার কাছে লইয়া যাও। তারে দেহন আমার জীবনের আশা"...এই কথা শুনবা মাত্র শেরে-বাংলা দুই হাতে বুড়াকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। দু'জনের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে—অপূর্ব এ দৃশ্য। মনে হয়, এ যেন হযরত ওমর ফারুকের কাহিনী, নজরুল যেমন বলেছেন তোমাকে সালাম করতে এহাত বুকের উপরে আর ওঠে না—পরম বন্ধুর মত বুকে শাপটে ধরতে ইচ্ছে হয়। হায় ইসলামের সাম্যনীতির, ভ্রাতৃত্বের এসব অনাবিল দৃশ্য দেখবার ভাগ্য আর কি আমাদের হবে? হৃদয়ের টান দিয়ে যে-সব মানুষকে জড়িয়ে ধরতে চায়, তার হৃদয় যে বিশ্বের মতই বিশাল।

এর কারণ, ফজলুল হক নিজে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতপালিত হয়েও কখনও বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে দরিদ্র জনগণের কথা ভোলেননি—গরীবের দুঃখ দেখলেই তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠত। অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনের ব্যাপারে তিনি হিন্দু-মুসলিম, আত্মীয়-পর এসব বিচার করতেন না। একবার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে দয়ার সাগর হক সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন ফজলুল হকের হাত একদম খালি ছিল—তিনি তাকে বৈকালে দেখা করতে বললেন। ভাগ্যক্রমে সেদিন হক সাহেব পাঁচশ' টাকা রোজগার করেছিলেন। বিকালবেলা ঐ ব্রাহ্মণ আবার এলেন, তখন হক সাহেব সেদিনকার রোজগারের পাঁচ শ' টাকা ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন। এ যেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর।

হক-সাহেব জীবনে যেমন বিপুল সম্মান পেয়েছেন, তেমন দারুণ অবহেলা ও অবজ্ঞাও সহ্য করেছেন—কিন্তু সর্বদাই আল্লাহর দেওয়া নিয়ামৎ হাসিমুখেই গ্রহণ করেছেন। কারো প্রতি ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই, "ইজ্জত ও জিল্লাৎ, অন্ন ও মৃত্যু সবই আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে", ইসলামের এই মহান শিক্ষা তাঁর জীবনে কার্যে পরিণত হয়েছে", তিনি কিন্তু সারা জীবন ভরে দানই করেছেন প্রকাশ্যে ও গোপনে। তাতে কোনও অহঙ্কার নেই, আছে শুধু গরীবের সেবা, মানুষের সেবা, পরকে আপন করে নেওয়া, কেবল অকপট ভালবেসে।

তিনি কৃষক-মজুর সাধারণ দেশবাসীর জন্য কত যে কাজ করে গেছেন তার ফিরিস্তি দেওয়া সহজ কথা নয় :

১. মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সরকারী স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ।
২. বঙ্গের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে জমিতে প্রজার স্বত্ব রয়েছে, এই স্বীকৃতি আদায় করেছেন (১৯৩৭)।
৩. পূর্বপাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদের প্রাথমিক সোপান হিসাবে তিনি ক্ষমতাশালী কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরই সুপারিশ পাকিস্তান অর্জনের পরেই পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ করা সহজ হয়েছিল।
৪. তিনি ১১,০০০ ঋণ-সালিশী বোর্ড গঠন করে প্রায় ৭ কোটি প্রজার সুদের উচ্চহার রহিত করে ঋণ পরিশোধ করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এমনকি ৪০ বৎসর আগের ঋণের দায়ে যেসব বাস্তুভিটা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল তারও অনেকগুলো ফেরত পাওয়া গিয়েছিল।

৫. বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশ করে সুদের উচ্চহার রহিত করে দরিদ্র প্রজাদের সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

৬. বাংলার দোকানী কর্মচারীদের চাকুরী শর্ত ও ছুটির অধিকার দিয়েছিলেন।

৭. লক্ষ্মৌ চুক্তি অনুসারে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোয় অধিক হারে প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার উদ্যোক্তাদের মধ্যে হক সাহেব ছিলেন অন্যতম (১৯৪০)।

৮. হক-সাহেব অবিভক্ত বাংলার সমস্ত সরকারী চাকুরীর শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের শর্ত আদায় করেছিলেন। আর এ অধিকার পুরোপুরি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শূন্য বা নূতন পদে শতকরা ৭৫ জন মুসলিম নিয়োগের বিধান করে উক্ত বিধান মত কাজ করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করবার জন্যও অফিসার নিযুক্ত করেছিলেন।

৯. জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের বেসরকারী তদন্ত কমিটিতে মুসলমানদের মধ্যে সভ্য হিসাবে কেবল তৈয়বজী ও ফজলুল হক কাজ করেছিলেন, আর বাকী তিনজন হিন্দুসভ্য হিসাবে। তখন এই গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজে আর কোনও নেতার পাত্তা পাওয়া যায়নি (১৯১৯)।

উল্লিখিত কাজগুলো যে কত বাধাবিপত্তি ঠেলে, কত সংগ্রাম করে করতে হয়েছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কারো পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন। অনেকদিন ধরে যারা ন্যায়ভাবেই হোক, বা অন্যায়ভাবেই হোক কোনও সুবিধা ভোগ করে আসছে, তার থেকে কিছু অংশ অপরের হাতে কেউ সহজে ছেড়ে দেয় না—তার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করেই সেসব সুবিধা অবহেলিত ও বঞ্চিত মুসলমানদের জন্য আদায় করতে হয়েছে। হক-সাহেব সর্বদা গরীবের ও বঞ্চিতের সুবিধা করতে চেয়েছেন বটে কিন্তু সর্বত্র সফল হতে পারেন নি। এর জন্য চাই দুর্জয় সাহস ও মনোবল। সেকালের কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এসব জন-সাধারণের নামে হলেও আসলে সামন্তবাদী নেতাদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। সাধারণ লোক তখন এখনকার মত এত সজাগ ছিল না। কৃষকপ্রজাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, দরিদ্র—ঐসব গৃহস্থের নেতা হলেন আরও বড় গৃহস্থ, উচ্চমধ্যবিত্ত বা জমিদারশ্রেণী। আর এদের কেউ হিন্দু জমিদার আবার কেউ মুসলমান জমিদার বা জমির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কচ্যুত শহরবাসী নওয়াবজাদারা। কাজেই হক-সাহেবকে অনেক বন্ধু হারাতে হয়েছে, অনেক সেয়ানে-সেয়ানে যুদ্ধ করতে হয়েছে; তাতে হারজিত আছে। এইরকম কোনও এক নব-প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ঐর সঙ্গে কায়দায় পেরে ওঠা হক-সাহেবের পক্ষে কঠিন ছিল। এ সময় কোন্ পন্থা ছিল সময়োপযোগী তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। আবার ফজলুল হক অতিদূরের ব্যাপার স্পষ্ট দেখতে পেলেও হাতের কাছের অনেক ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে অন্য নেতাদের হাতে মার খেয়েছেন। এই রকম ভুলের মধ্যে প্রধান হল, যে-নির্বোধ জনসাধারণ অন্ধের মত তাদের নেতাদের অনুসরণ করছে সেই জনসাধারণের বোধশক্তি জাগ্রত না করেই তিনি আশা করেছিলেন, তারা তাঁর উদার মহান নীতি অনুসরণ করুক। কিন্তু তা হয় না; অধিকাংশ লোক অবুঝ হলে তাদের নির্বুদ্ধিতার জড়ত্বের বলেই— অন্য কথায় তাদের উপযোগী ডেমোক্রেসী দ্বারাই—তাদের অদূরদর্শী কল্যাণ বা অকল্যাণ যাই হোক ঘটতে দেওয়াও বিধি। লোকেরা ঠকেই শিখুক, বোধহয় ডেমোক্রেসীর সাহায্যে ঠকে

শিখাই ভাল শিক্ষা। তবু সেই ঠকা যেন বারংবার না ঘটে, বুদ্ধিমান হিতৈষী নেতারা সেদিকে অনুগতদের দৃষ্টি ফেরাবেন, এই হল কাজ।

এই মহান নেতার বীরত্ব সম্বন্ধে ১৯১৮ সালে খ্রীষ্টান মিশনারী পত্রিকা 'এপিফ্যানী'র কাহিনীটা উল্লেখযোগ্য। ঐ বছর ফজলুল হক একাধারে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। যা হোক কলকাতার এক পাদ্রী সাহেব এপিফ্যানী পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে হযরত মোহাম্মদের চরিত্রে কুৎসা রটনা করেন। অচিরেই ভারতের ওলামাগণ নানাস্থান থেকে কলকাতায় সমবেত হয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ শোভাযাত্রা বের করেন। আগে থেকেই নাখোদা মসজিদের সামনে গোরা সৈন্যরা মেশিন গান বাগিয়ে রেখেছিল। শোভাযাত্রা পথ দিয়ে লাটভবনের দিকে অগ্রসর হতেই প্রথমে পুলিশ লাঠি চার্জ করে, পরে গুলি করে। এতে বহু লোক হতাহত হয়। তবু শোভাযাত্রা চলতেই থাকে। এ-বিষয় নিয়ে সে-সময় লাটভবনে কর্তব্য নির্ধারণী সভা হচ্ছিল। গুলির আওয়াজ আর আল্লাহ আকবর শব্দ শুনতে পেয়ে ফজলুল হক সাহেব উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে খালি পায়ে দৌড়িয়ে এলেন জনতার সামনে। এই সময় গোরা সৈন্য মেশিন গান চালাতে উদ্যত। এই দেখে ফজলুল হক ছুটে গিয়ে মেশিন গানের সামনে বুকটান করে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "আমাকে আগে মার, তার আগে আমি কোনও মুসলমানের গায়ে গুলি লাগতে দেব না। আমার বুকে গুলি কর, আজ এখানেই বৃটিশ-রাজত্ব খতম হয়ে যাক।" ফজলুল হক সাহেবের পিছনে পিছনেই লাটসাহেবের চীফ সেক্রেটারী বসে পড়েছিলেন। তিনি এই সংকটমুহূর্তে সম্মুখ থেকে ফজলুল হককে জড়িয়ে ধরে মেশিন গানের মুখে নিজ পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করে তখনই ঘোষণা করলেন "আজই পাদ্রী সাহেবকে জাহাজে করে বিলাতে পাঠান হবে। হতাহতের পরিবার-বর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, যাবতীয় মামলা প্রত্যাহার করা হবে। এপিফ্যানীর যাবতীয় কপি বাজেয়াপ্ত করা গেল।" এইভাবে ব্যাপারটার অবসান হল। এখানে ফজলুল হক সাহেবের মহাপ্রাণতা, বীরত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে খালি হাতে একাকী জেহাদ করবার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। একেই বলে শের-ফিল শার্দুল।

হক-সাহেব তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়া ছাড়া প্রায় অপর সমুদয় পদই অলঙ্কৃত করেছেন, প্রত্যেক স্থলেই তাঁর মন ছিল তাঁর দেশের জনসাধারণের এবং দরিদ্র-নিপীড়িতের হিতসাধনের দিকে। এক সময় তিনি গবর্নমেন্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজও করেছিলেন; কিন্তু এ কাজ তাঁর নিজেরও পছন্দ ছিল না, তাঁর পরম-হিতৈষী স্যার আশুতোষেরও পছন্দ ছিল না। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা লোক—নিজে পরিশ্রম করে স্বাধীনভাবে উপার্জন করবেন, নিজের খুশিমত খরচ করবেন যাতে দেশের ও দশের ভাল হয়। টাঙ্গাইলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে একবার তিনি বিচারের নামে দরিদ্র গৃহস্থের কাঁথা-কাপড়, ঘটি-বাটি, লোটা-বদনা ক্রোক হওয়া দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন, তবু ঐ গৃহস্থের বা তার কচি ছেলেদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আইনসঙ্গতভাবে কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কাজেই অধিক দিন ডেপুটিগিরি করা তাঁর ধাতে সইল না, তিনি ঐ কাজে ইস্তফা দিলেন। স্বাধীন ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, উপার্জন করেছেন প্রচুর, দান-খয়রাত করেছেন প্রচুরতর। অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের একমাত্র বাঙ্গালী সভাপতি হয়েছিলেন ফজলুল হক। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের যে চুক্তি হয় সেই লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী একমাত্র বাঙ্গালী মুসলমান ফজলুল হক। ১৯২৬ সালে তিনি

স্বেচ্ছায় শিক্ষামন্ত্রীর পদ বেছে নেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকায় যে নিখিল বঙ্গ প্রজাসমিতি অনুষ্ঠিত হয় তার সভাপতি ছিলেন ফজলুল হক, আর সেক্রেটারী কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহম্মদ। ১৯৪০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ বৎসর লাহোরের মুসলিম লীগ কনভেনশনে তিনিই পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। চাখার কলেজ তিনিই স্থাপন করেন। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ ও লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ স্থাপন করাও তাঁরই কীর্তি। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য "শাসনতন্ত্র" উত্থাপন করার ভারও অর্পিত হয় ফজলুল হকের উপর। পাক-ভারতে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য শহর নাই যেখানে ফজলুল হক যান নি, আর যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি বিশেষ স্মরণীয় কিছু করেছেন।

# মানুষের প্রিয় মানুষ

সোহরাওয়ার্দী স্মৃতিকমিটির মাননীয় সদস্যগণ ও সমবেত সমাজদরদী বন্ধুগণ,

আজ আপনারা আমাদের জনপ্রিয় মহান নেতা মরহুম সোহরাওয়ার্দী সাহেবের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য আহ্বান করে আমার প্রতি যে প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ; কিন্তু সেই সঙ্গে নিদারুণ দ্বিধা ও সঙ্কোচও বোধ করছি। সঙ্কোচের প্রধান কারণ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন দূরদর্শী, প্রজ্ঞাশীল রাজনীতিবিদ; আর আমি গো-বেচারী শিক্ষক, ৪৫ বছরের অধিকাল এই একই কাজ করছি—রাজনীতিকদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ কমই পেয়েছি, তা ছাড়া সে-সুযোগের সন্ধানও কোনও দিন করিনি। কোনও কোনও শিক্ষক বোধ হয় অতি-মাত্রায় আদর্শবাদী হয়; তারা রাজনীতিকে নোংরামী বা ছল-চাতুরীর সঙ্গে প্রায় সমার্থক বলেই জ্ঞান করে। বোধহয় সেজন্যই বর্তমানে তাদের কোনও রাজনৈতিক পদের প্রার্থী হওয়াও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এরূপ মনোভাবের যুক্তিবত্তা থাকুক বা না থাকুক, অবস্থাদৃষ্টে এতে যে কিছুমাত্র সত্য নেই এমন কথা বলা চলে না। সে যাই হোক, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সম্পর্কে লোক-সুবাদ বেশ অনুকূল, তাঁর বক্তৃতাদির মধ্যে একটা সুশোভন মর্যাদাবোধ প্রকাশ পায়, তাঁর হৃদয়বত্তারও মহৎ পরিচয় পাওয়া গেছে—এসব কারণে তিনি সবার কাছে যেমন প্রিয়, আমার কাছেও তেমনি। তাই সোহরাওয়ার্দীর নাম করে আমাকে ডাক দিয়েছেন, সে ডাক উপেক্ষা করা যায় না; আর এই প্রীতির ডাকের আনুষঙ্গিক যে সম্মান রয়েছে, তার লোভ সংবরণ করাও কঠিন। তাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে হলেও আদেশ পালনের জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি অযোগ্যতা সত্ত্বেও। বোধহয় ব্যক্তি হিসেবেই মানুষের সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, তখন দলীয় স্বার্থের দ্বারা ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না। একদিন কার্জন হলে কোনও এক উপলক্ষে জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তখন ডক্টর জেঙ্কিন্স ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। সভায় বক্তৃতা দিতে হয়েছিল, কিন্তু কি বিষয়ে তা স্মরণ হচ্ছে না। আমিও উপস্থিত ছিলাম বিজ্ঞান বিভাগের ডীন হিসাবেই হোক, কিংবা ক্ষুদে সাহিত্য-সেবী হিসেবেই হোক। সে-সভায় জেঙ্কিন্স সাহেবও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অবশ্য সোহরাওয়ার্দী সাহেবও ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলরের ভাষণ শুনেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব তৎক্ষণাৎ উঠে স্মিতহাস্যে বলেছিলেন, "আজ আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। আমি বরাবর ভাবতাম, এ ধরনের প্লাটফর্ম-বক্তৃতায় আমি কারো চেয়ে কম নই। কিন্তু আজ এইমাত্র এমন একজনের বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য হল যিনি অনায়াসে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—তাই আপনার কাছে হার স্বীকার করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অকুণ্ঠে সে-কথা প্রকাশ করছি।" এখানে সোহরাওয়ার্দী ব্যারিস্টার নন, রাজনৈতিক নন, মন্ত্রী নন, অত্যন্ত স্বাভাবিক মানুষ, শিশুর মত সরল, অকপট

মানুষ। এমন উদার গুণগ্রাহী লোক কয়জন আছে? এই স্বভাব-সুন্দর মাধুর্যের জন্যেই তিনি সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র। নিজের গুণ সম্বন্ধে সচেতন, অথচ অন্যের গুণের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল এমন লোকই ত নেতৃত্বদানের প্রকৃত অধিকারী।

নোয়াখালীর দাঙ্গা, কলকাতার হাঙ্গামা,—এসব দেখে কোন্ নেতার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল? কে প্রাণভয় ত্যাগ করে দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সুবুদ্ধি জাগাবার পণ গ্রহণ করেছিল? সেদিন ত শান্তি-মিশনে গান্ধী আর সোহরাওয়ার্দী ছাড়া অন্য কোনও বিশিষ্ট নেতার পাত্তা পাওয়া যায়নি। যখন পূর্ব-পাঞ্জাব, মেওয়াল এবং বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রে মুসলিম নিধন-পর্ব চলছিল তখন কোন্ মুসলিম নেতা মানবতার সেবায় অত্যাচারের প্রতিরোধ-কল্পে নানা শহরের অলিগলিতে জীবন হাতে করে ঘুরে বেড়িয়েছিল? সে এই বাঙ্গালীবীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পীর বংশে যাঁর জন্ম। প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং অন্যান্য সৌভাগ্য যখন তাঁকে প্রলুব্ধ করছিল, তখন সে-সবের মোহে মুগ্ধ না হয়ে তিনি ফকিরের হালে আল্লাহর রাস্তায় সাধারণ লোকের হিতার্থে শাহাদাত বরণ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। বিপদেই বন্ধু চেনা যায়। তখন দেশের লোক চোখ মেলে দেখেছিল, অবাক হয়ে, বীর মুজাহিদ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। সে দেখা কখনও ম্লান হবার নয়; দুঃখের দিনে বন্ধুকে দেশের লোকে চিনে নিয়েছিল। তাইতেই ত তাঁর অনুষ্ঠিত কর্মপন্থায় লোকের আস্থা, তাইতেই ত তৎকালীন পূর্ববাংলার প্রথম নির্বাচনে তাঁর দলের ও মিত্র-জোটের অপূর্ব সাফল্য লাভ হয়েছিল।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার সাধনায় প্রাণপণে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি—যেমনটী এঁর পূর্বে চেয়েছিলেন আলী-ভাইয়েরা এবং কায়েদে আযম। এই ছিল সোহরাওয়ার্দী তরীকার সূফী-সাধকদের বংশধরদের উপযুক্ত কাজ-যে-সাধকদের প্রথম দল নবম শতাব্দীতে মুলতানে আগমন করেছিলেন এবং চিশ্‌তিয়া সূফীদের সহযোগে নাদির ও আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণকালে বহু হিন্দু-মুসলমান নরনারীকে নির্যাতন ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

এই শহীদ সোহরাওয়ার্দীই ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় শহরে শহরে, অঞ্চলে অঞ্চলে নঙ্গরখানা খুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহার-মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন। দেশ-বিভাগের সময় ইনিই বাংলা ও পাঞ্জাবের সর্বাংশই যাতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এতে তিনি সফল হন নি বটে, কিন্তু সেই শুভপ্রচেষ্টার গুণ ত অস্বীকার করা যায় না।

ইনিই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন গণতন্ত্র বাংলাদেশে বিফল হয় নি, বরং যথা-যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গণতন্ত্রের দাবী শুধু মুখের কথা নয়—এটা তাঁর অন্তরের বাণী। সাধারণ লোকের হাতেই তুলে দেবে নিঃস্বার্থভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির অনুবর্তী হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করবার ভার। অবশ্য বলা হয়ে থাকে, যেখানে শতকরা ৮০ জনের অধিক একেবারে নিরক্ষর সে-দেশের লোক উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করবে কেমন করে? এটা কিন্তু নিতান্তই কুযুক্তি। আপন হিত পাগলেও বোঝে। আসল গলদ রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্বে, যারা একটু চালাক-চতুর অথবা সমাজে কৌলিন্য, ধনাঢ্যতা বা উচ্চপদাধিকারে ক্ষমতাশীল তারাই স্বার্থের চক্র ঘুরিয়ে নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। আমাদের দেশে অশিক্ষিত কৃষকেরাও সহজাত বুদ্ধিতেই ভালমন্দ চিনতে পারে; কিন্তু অবস্থা-বৈগুণ্যে, অর্থলোভে, নির্যাতনের ভয়ে

সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী ত্যাগ করে সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্বরূপ Parity (!)র স্বীকৃতি আদায় করা সোহরাওয়ার্দীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বাস্তবধর্মী প্রজ্ঞার বলেই সম্ভব হয়েছিল।

অবশেষে, দুঃখের সাথে বলতে হয়, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর মত দুইজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাকেও তথাকথিত নেতাদের হাতে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ত তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশ ত্যাগ করে শেষ জীবনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল লাহোরে (ধূর্ত রাজনীতিকদের চক্রান্তে)। তবু মন্দের ভালো এই যে, তাঁর শেষ দেহরক্ষা হয়েছে তাঁর সাধের পূর্ব-পাকিস্তানে।

আজ আমরা মরহুম সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সমবেত হয়েছি, দল-নির্বিশেষে দেশের সকল বাসিন্দা। ভালমন্দের মাপকাঠি রয়েছে আল্লাহর হাতে,— "আশরাফ সেই যে স্বভাবে শ্রেষ্ঠ।" দেশবাসী প্রত্যেকটি নরনারী আজ তাঁর স্বভাবের সততা, মানবীয়তা, মহানুভবতা স্মরণ করে চোখের পানিতে ভিজে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও প্রশান্তি কামনা করছে। আমীন!

# নবীন সেন

"শতবর্ষ পূর্বে" এক শুভ মুহূর্তে নবীন সেন জন্মেছিলেন। কবি সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক ও সহৃদয় ভদ্রলোক হিসাবে তিনি আজও দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন; আজকার এই অনুষ্ঠান তারই পরিচয়। তিনি উচ্চশিক্ষিত ধীমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন— কিন্তু আজ দেশবাসী তাঁকে যে সম্মান দিচ্ছে— এমনকি তাঁর জীবিতকালেও প্রত্যেক কর্মস্থল থেকে বদলির সময় তাঁর যে বিপুল সংবর্ধনা হত, তা' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ-গৌরবের সম্মান নয়। হাজার হাজার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাংলাদেশে জন্মেছেন ও মরেছেন, কিন্তু তাঁদের শতকরা নিরানব্বইজনকে পরবর্তীকালে কেউ স্মরণ করা প্রয়োজন বা কর্তব্য বোধ করে না। কি গুণে নবীন সেন স্মরণীয়, তিনি আমাদের কি দিয়ে গেছেন যার জন্য কৃতজ্ঞভাবে তাঁকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য, আজকার সভায় অনেকেই সে বিষয় আলোচনা করবেন। নবীন বাবু এখন নিন্দা প্রশংসার অতীত লোকে— কিন্তু তিনি যে কীর্তি রেখে গেছেন তা এখনও বর্তমান। তাঁর কীর্তির সম্যক পর্যালোচনায় আমাদেরই লাভ— আমরা অতীত চিন্তা ও কর্মের ধারা লক্ষ করে বর্তমানের উপযোগী আদর্শ ও কর্মপন্থার নির্দেশ পেতে পারি।

কাব্য, সাহিত্য, এসব পরিস্ফুট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয় করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। কারণ আমি নিজে কবি নই, এবং কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। হয়ত কেউ বলবেন, ছন্দোবদ্ধ গদ্যই কাব্য; কেউ বলবেন চিত্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করাই কাব্যের লক্ষণ; আবার কেউ বলবেন, ভাবে ও ছন্দে সৌন্দর্যের সমাবেশ করে পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতির অনুরণন সৃষ্টি করাতেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। এইসব তর্কজালে আবদ্ধ হয়ে অবশেষে একটা 'হিং টিং ছট' গোছের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু তা হয়ত অসার্থক। কাব্যের রকম-ভেদ থাকা বিচিত্র নয়; আবার "ইলিশ মাছ ভাল, না খল্‌সে মাছ ভাল" এ ধরনের তর্কের শেষ না থাকাও আশ্চর্য নয়। তবে নবীনচন্দ্রের কাব্যে বা গদ্য সাহিত্যে অস্পষ্টতা নাই এবং সহজ প্রকাশের সাচ্ছন্দ্য আছে একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন।

কর্মজীবনে মানুষের যে রূপ প্রকাশ পায়, তাই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আদর্শ একদেশদর্শী, কিন্তু বাস্তবের সংঘাতে যে কর্মের উৎপত্তি হয়, তা বিভিন্ন প্রভাবের একটি বিশিষ্ট সমাবেশ। এই বিশিষ্টতাই মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয়। কর্মজীবনের কষ্টিপাথরে আমরা নবীনচন্দ্রকে দেখতে পাই স্বাধীনচেতা, তেজস্বী, কর্মদক্ষ, সুচতুর, ন্যায়নিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, দয়াপরবশ, সমাজ হিতৈষীরূপে। কাজে কাজেই তাঁর রচিত কাব্য ও সাহিত্যে আমরা এইসব লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখতে পাই।

তিনি পুরীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে পুরীর রাজা ও তার কয়েকজন অনুচর জনৈক সাধু-সন্ন্যাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই মোকদ্দমার পরিচালনায় নবীন বাবু

নিজের জীবন বিপন্ন করেও যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন, লোভ সম্বরণ ও ন্যায়-নিষ্ঠার যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তা' বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। মনে মনে অনেকেই বীর ও নির্লোভ হ'তে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রেই তার সত্য পরিচয় হয়। কার্যক্ষেত্রের পরীক্ষায় নবীনচন্দ্রের মানবতা জয়যুক্ত হয়েছিল। এই মোকদ্দমায় রাজার শাস্তি হওয়ার পর কলকাতার হাইকোর্টে আপিল হয়। নবীন বাবুকে আপিলের তদ্বির করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা স্বরূপ কলকাতা পাঠান হয়, এবং তাঁর চেষ্টায় রাজার দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। এই ঘটনাতেই তাঁর সুচতুর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের কতদূর আস্থা ছিল, তা'র প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিনি যে অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা ক'রেছিলেন তাতেও তাঁর কর্মতৎপরতা, দায়িত্ববোধ এবং সুকৌশল নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু এই এক ঘটনায় নয়, তাঁর সারা কর্মজীবনে নানা ঘটনায়, নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁর এইসব সদ্‌গুণের প্রকাশ দেখা যায়।

নবীনচন্দ্র বন্ধুবৎসল ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে অবসর যাপন করতেন। অনেক সময় তাঁদের জন্য বেগার-খাটনীও কম খাটতে হয় নি, কিন্তু তিনি কখনও কোনো বন্ধুকে পারৎপক্ষে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু তাঁর কর্তব্যবোধ, ন্যায়বিচার এবং গরীব প্রজার প্রতি দয়া কখনও বন্ধুত্ব দ্বারা ক্ষুণ্ন হয় নি। নোয়াখালিতে কাজ করবার সময় খাসমহলের ভারপ্রাপ্ত তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর তত্ত্বাবধানে চরের প্রজাদের উপর বে-আইনীভাবে গোচারণ বা "গোরকাটি" জমা সূত্রে প্রায় ষাট-সত্তরটি সার্টিফিকেটের মামলা উপস্থিত করা হয়। নবীন বাবু এক হুকুমে সব মামলা খারিজ করে দেন। তিনি বন্ধুর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু গরীব প্রজাদের গলা কেটে তা' সাধন করবার মত ক্ষুদ্রতা বা হৃদয়হীনতা তাঁর ছিল না। নবীন বাবু ভাগলপুরে থাকতেও একবার এইরূপ তিনশত সার্টিফিকেটের অন্যায় মোকদ্দমা এক হুকুমে খারিজ করে দিয়েছিলেন। খাসমহলের ডেপুটি কালেক্টর তাঁর এই গুরুতর 'গোস্তাখীর' জন্য কালেক্টরের কাছে নালিশ করেছিলেন। এই ঘটনায় কালেক্টরের সঙ্গে নবীন বাবুর সাক্ষাৎভাবে কথা কাটাকাটি হয়। নবীব বাবু তেজস্বী পুরুষ, তিনি নির্ভয়ে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেন। তা'ছাড়া তিনি আইনে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। কালেক্টরকে সমুদয় বুঝিয়ে দেবার পর কালেক্টর নবীন বাবুর যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলেন। মোট কথা, নবীন বাবুর মত কর্তব্য পরায়ণ, আত্মসম্মানযুক্ত, সুদক্ষ রাজকর্মচারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে বেশী পাওয়া যায় না। তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে অনেক আপসোস করে গেছেন। তেজস্বী সৎসাহসী লোকের উন্নতি হয় না। অনেক স্থলে অযোগ্য উপরিওয়ালা সাহেব কর্মচারীকে চাটুবাদে মুগ্ধ ক'রে লোকে সাবডেপুটি থেকে ডেপুটি হয়। এদের দ্বারাই প্রজার উপর জুলুম অবিচার বেশী হয়। এইসব 'ক্ষ্যাপারাম' ও ঘটিরাম ডেপুটির বৃত্তান্ত তাঁর জীবন-চরিতে অনেক লিখে গেছেন। আর আমাদের সদাশয় গবর্ণমেন্ট, বঙ্কিম বাবুর মত তেজস্বী ও উপযুক্ত লোককেও এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে অনেক আক্ষেপ করেছেন। দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত কর্মচারী হিসাবে নবীন বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী এবং মৌলবী আব্দুল জব্বার সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি "আমার জীবনী" তৃতীয় ভাগে লিখেছেন—"হায়! বৃটিশ রাজ্য! যে আবদুল জব্বারের বৃটিশ রাজ্যে এই দুর্গতি হয়, সেই আবদুল জব্বার ডেপুটিত্ব হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভূপালের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইয়া গবর্ণর জেনারেলের My dear friend (প্রিয় বন্ধু) হন।"

বিহারে নবীনচন্দ্র কতদূর জনপ্রিয় ছিলেন, তা' নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে কতকটা অনুমান করা যায়। বিহার ছাড়বার প্রায় ১০ বৎসর পরে তিনি যখন রাণাঘাটের এস. ডি. ও. তখন একদিন দেখেন, চেনা-চেনা বোধ হয়, এমন একজন মুসলমান ভদ্রলোক মোক্তারদের পশ্চাতে এক বেঞ্চে বসে আছেন। তিনি চুপি চুপি মোক্তারদের কাছে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারলেন না। তখন ভদ্রলোকটি হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন! "হাম, আলী আহমদ!" অমনি নবীন বাবু "কেয়া, মৌলবী সাহেব, আপ্ কাহাঁসে তশরিফ লে আয়ে হেঁ?" বলে এজলাস থেকে ছুটে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, এবং সেদিনকার মত এজলাস ভঙ্গ ক'রে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বাসায় ছুটলেন। ইনি বিহারের এক লক্ষপতি জমিদার, কোনও কাজ উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন, নিকটেই রাণাঘাটে নবীন বাবু আছেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্য একজন ভৃত্য এবং একটা বদনা মাত্র নিয়ে সেই দিনই ১০ টার ট্রেনে তিনি রাণাঘাট পৌছেছিলেন। নবীন বাবু লিখেছেন, "তিনি বড় সাধু পুরুষ, বড় ধার্মিক মুসলমান। এক সঙ্গে ঘোড়ায় বেড়াইতেছি, যেই নামাজের সময় হইল, ইনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া রাস্তার একপার্শ্বে রুমাল বিছাইয়া নামাজ পড়িতে বসিতেন। আমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চাহিয়া দেখিতাম। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে আমার প্রতি এই অপরিসীম স্নেহ আছে আমি জানিতাম না।"

এর থেকে দেখা যায়, তিনি বিহারের লোকের কত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নবীন বাবুর এই বন্ধু তাঁকে বলেন, "তোমার আশ্চর্য শক্তি! তুমি এখানে অমর নাম রাখিয়া গিয়াছ। এত বৎসর হইয়া গিয়াছে তথাপি এখনও তোমার নাম সকলের মুখে মুখে। যাহাকে দেখি, জিজ্ঞাসা করিলে বলে,— নবীন বাবুর কিয়া হুয়া (নবীন বাবু কোথায় গিয়াছেন)।" এই ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক অন্ধতা বা গোঁড়ামি নবীন বাবুর মধ্যে ছিল না। নবীন বাবু নিজে অনেক তীর্থ ভ্রমণ কচ্ছেন। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সামনে ভাবে গদ্‌গদ হ'য়ে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। তখন থেকেই তাঁর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হ'য়েছিল। উড়িষ্যা ও বিহারের মন্দিরসমূহের অধিকাংশ দেবদেবীই যে বৌদ্ধ যুগের হিন্দু সংস্করণ, তা বিশ্বাস করতেন। বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রার সময় লক্ষাধিক যাত্রীর সার্বজনীন ভোগের দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর মনে মানুষের জন্য একত্বাবোধ জন্মেছিল। ভাগলপুর থেকে ছুটি নিয়ে তিনি যখন স্বদেশে আসেন তখন তাঁর কোনও আত্মীয় বলেছিলেন যে বিহারের জলবায়ুতে তাঁর যে কেবল স্বাস্থ্যই ভাল হ'য়েছে তা' নয়, হৃদয়ও পূর্বাপেক্ষা উদার, প্রেমপ্রবণ ও ধর্মপ্রবণ হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি এখন যেন শ্রীভগবানের ধ্যানে বিহ্বল। তিনি নিজেই বলেছেন, "রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস বেহারে সূচিত হয়, এবং রৈবতক সেখানে লিখিতে আরম্ভ করি। হৃদয় সত্য সত্যই কি এক অজ্ঞাত প্রেমে আর্দ্র, কি এক অজ্ঞাত উল্লাসে এবং কি এক অজ্ঞাত আনন্দে পূর্ণিত ছিল।"

নবীন বাবুর জনহিতকর কার্যের মধ্যে রাস্তাঘাট, রেলপথ ও স্টীমারের পরিকল্পনা, মেলকার্ট স্থাপন; ড্রেন, পায়খানা ও হাট-বাজারের উন্নতি; জমিদারে-জমিদারে ও জমিদারে-প্রজায় বিবাদ মীমাংসা; নৌ-ডাকাতি দমন; স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা; প্রয়োজনকালে ত্বরিত বিচার, প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রবর্তন চেষ্টা, ইন্‌কাম ট্যাক্স ও খাশমহলের খামখেয়ালীর বিরুদ্ধতা প্রভৃতি নানা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সমস্ত বিষয় যে কোনও রাজকর্মচারীর সম্মুখে উজ্জ্বল আদর্শ রূপে স্থাপিত রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে সর্বত্র তাঁর সৌখিন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নিজস্ব পাল্কী, ইন্‌স্পেক্‌শন বোট, বাসা-বাড়ীর

সুমহান আলেখ্য অঙ্কন করেছে। যেখানে যতটুকু দরকার, সেখানে ঠিক ততটুকুই রঙ ফলিত হয়েছে— উৎকট আগ্রহে সামঞ্জস্যচ্যুত হয়ে উদ্ভট পদার্থের সৃষ্টি হয়নি। এই সামঞ্জস্য বিধানই কবির কৃতিত্ব এবং অনাড়ম্বর সহজ প্রকাশেই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর কাব্যের মনোমোহিনী শক্তিই এর ঋজু ও স্বভাবসঙ্গত প্রকাশভঙ্গিতে। কবি সুন্দরের পূজারী, কিন্তু তাই বলে সত্যের অপলাপী নন। কল্পনার রাজ্যে যদৃচ্ছাবিচরণ তিনি পছন্দ করেন না। অবাস্তব, অলীক বা দুর্নীতিমূলক কাব্য উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয়— এই তাঁর অভিমত। সত্যাশ্রয়ী হয়েও সুনিয়ন্ত্রিত কল্পনা কত বিচিত্র হ'তে পারে তারই প্রমাণ তিনি "মহরম শরীফ" কাব্যে প্রদর্শন করেছেন। এই কাব্যে আমরা তাঁর নির্ভীকতা ও স্বাধীন চিন্তারও একটি বিশেষ পরিচয় পাই। ঐতিহাসিক তথ্যমূলে দেখা যায়, হযরত মাবিয়া খলিফা নির্বাচন ব্যাপারে ইসলামের পবিত্র আদর্শ ক্ষুণ্ন করে দুর্বলতার বীজ বপন করে গেছেন— অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ প্রবর্তিত সাধারণতন্ত্রের স্থলে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের সর্বনাশের পথ সুগম করে দিয়ে গেছেন। হযরত মাবিয়ার এই অশোভন চতুরতার জন্য কবি তাঁকে তীব্র কষাঘাত করতে ছাড়েন নাই। তিনি বলেন, কেবল হযরতের প্রিয় সহচর বলেই যে কারও "সাত খুন মাফ" করতে হবে এমন কোনও কথা নাই কবি যে-সম্মোহিত যুগে লালিতপালিত, সে-যুগের পক্ষে এ বিষয়ে এতটা সংস্কারমুক্ততা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

কবির "অশ্রুমালা" যখন হিন্দু-মুসলমান পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করছিল, সেই সুদূর ১৩০২ বঙ্গাব্দে আমাদের অনেকের জন্মই হয় নি। তাঁর "উত্তপ্ত" অশ্রুজল "প্রভাত শিশির মালা"র মত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেতে পারে। কিন্তু মহাশ্মশান কাব্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। কবি নিজেই বলেছেন, "মহাশ্মশান স্বর্গ, অশ্রুমালা মর্ত্য। অশ্রুমালাতে কেবল কবির অশ্রুজল, আর মহাশ্মশানে হিন্দু ও মুসলমান সাম্রাজ্যের চিতাভস্ম।" মহাশ্মশান কাব্যে কবি মুসলমান সমাজকে বীরমন্ত্রে দীক্ষিত করতে গিয়েছিলেন। কবির দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তাঁর সে আশা সফল হয়েছে। কবির কথায় "আজই হউক, কি দুইশত বৎসর পরেই হউক মুসলমানদের মধ্যে যখন বাংলা ভাষার বহুল প্রচলন হবে, তখন তাঁরা এই মহাশ্মশান কাব্য পড়ে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ তাঁদের পূর্ব পুরুষদের অসাধারণ শৌর্যবীর্যের শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।"

কায়কোবাদের কবিতা শুধু শব্দের কৌশলময় গাঁথুনী নয়— প্রাণের তলদেশ থেকে উৎসারিত। তাই প্রাণের উপর এর ক্রিয়া হয়— তাইতেই এতে এত মাদকতা। স্বতঃউৎসারিত অবাবেগ কাব্যরূপে প্রকাশিত হয়ে যে রসের সৃষ্টি করে তা বড়ই উপভোগ্য— সে যেন কাব্যের দশমরসরূপী প্রাণরস। কবির সহজ সুন্দর উপমা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তাঁর গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া যায়। আমরা একটু পরেই আবৃত্তির ভিতর দিয়ে তার পরিচয় পাব। আমি কেবল অষ্টশালী মহাশয়ের উদ্ধৃত কয়েকটি চরণের উল্লেখ করব। যথা—

'—বাধিলা কবরী
উঠাইয়া ভুজদ্বয় বাকিয়া পশ্চাতে
অনঙ্গের ধনুপ্রায়— দুটি পুষ্পকলি
শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ ধনুকে
দুটি সুবর্ণের শর নয়ন-রঞ্জন।"

নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনে কিভাবে অশ্লীলতা বর্জন করে কল্পনার মনোরম রামধনু রচনা করতে হয়, উদ্ধৃত কবিতাটি তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ভট্টশালী মহাশয় বলেছেন, "এইরূপ আদিরসপূর্ণ সুন্দর উপমা আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে কম পাইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" অশ্লীল বর্ণনায় লালসা জাগায় আর রুচিময় বর্ণনায় আনন্দ উৎপাদন করে। উল্লিখিত চরণগুলিতে কি চমৎকারভাবে সুরুচির গণ্ডির মধ্যে নিখুঁৎ রমণীয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা লক্ষ করবার বিষয়। কায়কোবাদের-কাব্যে আমরা নীতিবাগীশতা কি অশ্লীলতা কোনটারই উগ্রগন্ধ পাই না। এই সহজ সংযম শক্তিমানের পক্ষেই সম্ভব।

এইবার আমার অনধিকার চর্চা ক্ষান্ত করে উপসংহার করতে চাই। কিন্তু তার আগে কবি এই প্রবীণ বয়সে যে শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই সাহিত্য সংসদকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছেন, সেজন্য সকলের পক্ষ থেকে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি; আর পরম করুণাময় আল্লার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের ভিতরে থেকে জাতীয় সাহিত্যের গতি-নির্দেশ ও উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করতে পারেন।

মাসিক মোহাম্মদী
বৈশাখ ১৩৫১

# মৌলানা শহীদুল্লাহ

স্বনামধন্য প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ, বি. এল, ডিপ্লোফোন, ডি. লিট সাহেব আজ একাশি বৎসর অতিক্রম করে বিরাশি বৎসরে পদার্পণ করেছেন। তাই আজ আমরা তাঁর গুণ-মুগ্ধ সাহচর্য-ধন্য ও হিতবাণীস্নাত সকলেই কেউ তাঁর সহকর্মী হিসাবে, কেউ বন্ধু হিসাবে, আর কেউ বা ছাত্র-শিষ্য বা ভক্ত হিসাবে এই আন্তঃমহাদেশীয় ভোজনালয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভক্তি সমর্পণ করবার জন্য সমাগত হ'য়েছি।

ডক্টর শহীদুল্লাহ এমন লোক নন, যাঁকে এড়িয়ে চলা যায়। তাঁর সাহচর্যে আসলে তাঁর বিবিধ ভাষায় পাণ্ডিত্য, হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-ইহুদী সমুদয় ধর্মের শাস্ত্রীয় বাণী ও লোক-কাহিনী সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান, আর মানুষ হিসাবে দয়া-দাক্ষিণ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদ-বিনিময়ে অকৃপণ এই লোকটির এক বা একাধিক গুণে আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর না হওয়াই যেন অদ্ভুত।

আমি তাঁকে প্রথম দেখেছি ১৯২১ সালের জুন মাসে,— তিনি যখন প্রথম ঢাকায় এলেন সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক এবং সেক্রেটারিয়েট মুসলিম হোস্টেলের বা হলের হাউস-টিউটর হিসাবে। তাঁর নাম তো' আগে থেকেই জানা ছিল, সংস্কৃত ভাষায় এম.এ, পাস করা একজন সংগ্রামী মুসলিম হিসাবে, আর সেকালের একজন বিখ্যাত বাংলা লেখক বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বাদি বিষয়ে উৎসাহী প্রবন্ধ-রচয়িতা রূপে।

তাঁর ঢাকা আগমনকালে আমি ঢাকা কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর অর্থাৎ এম. এ পাঠ শেষ করা অথচ তখনও পরীক্ষা না দেওয়া একজন ছাত্র ছিলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাঠারম্ভ হ'বার কথা পহেলা জুলাই থেকে। তার আগেই শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক— একথা তখনকার কর্মনির্বাহকরা বেশ জানতেন। তাই জুন মাসের আগেই সমুদয় নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছিল। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই কর্মে নিযুক্ত হন, আমি ঐ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই নিম্নতম শিক্ষক হিসাবে যোগ দিই। অর্থাৎ সেই সময় থেকে ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমি ছাত্রও ছিলাম, শিক্ষকও ছিলাম। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রাথমিক সহকর্মীদের অন্তর্গত একজন হওয়ার গৌরব বোধ করতে পারি। কিছুদিনের মধ্যে এ. এফ. রহমান, সত্যেন বোস, জ্ঞান ঘোষ, নরেশ সেনগুপ্ত, রমেশ মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরিদাস ভট্টাচার্য—প্রমুখ মহারথীরাও ডক্টর সাহেবের সহকর্মী হয়ে আসেন। তখনকার দিনে সর্বস্তরের শিক্ষকদের মধ্যে বেশ সমানভাবে আলাপ-আলোচনা, হাসি-তামাসা, খোশগল্প, খেলাধূলা ইত্যাদির চলন ছিল। ভোজনালয়ে জনাব শহীদুল্লাহ সাহেবের আর রমেশ বাবু, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতির মধ্যে অনেক মুখরোচক গল্প চলতো। খাদিমদাররা আহার্য দিতে আসলে আহাররত লোকদের কি কি আচরণে তাদের পাতে আহার্য দ্রব্যাদি দিতে হয়, আর কখন নিবৃত্ত হতে হয়, সে-সম্বন্ধে যতদূর মনে পড়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের শ্লোকটি এই—

'আহা' দেওৎ, 'উহুঁ' দেওৎ, দেওঞ্চ শিরশ্চালনে
'হাহা' দেওৎ, 'কিংকরো' দেওৎ, ন-দেওৎ ব্যাঘ্র ঝমপনে।

আর রমেশ মজুমদারের একটি খোশগল্প হচ্ছে এই :

একদিন সকালে তো ভারি বৃষ্টি, রাস্তায় বেরোনো যায় না, জন-মানবের চিহ্ন নাই। আমার ছোট ছেলেটার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গেছে, ঘুম থেকে উঠে কেবলি কাঁদাকাটা করছে। কাঁদতে কাঁদতে বাইরের দরজার ধারে এসেই হঠাৎ কান্না থামিয়ে আমাদের ডেকে বললো, "বাবা, মা, দেখে যাও কি আশ্চর্য কাণ্ড।" ওর মা দেখতে গেল, আমারও কৌতূহল হল, আমিও গেলাম দরজার ধারে। তখন খোকা বলে কি "ঐ দেখ বাবা, রাস্তায় লোকজন নাই, কেবল একটা ছাতা কেমন করে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে।" আমরাও ঠিক মানুষটা দেখতে পেলাম না। শেষে যখন ছাতাটা আমাদেরই বাড়ীর সামনে এসে পড়লো, তখন দেখি, একি! এযে আমাদের শহীদুল্লাহ।

গল্পটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার বিশ্বাস, ডক্টর সাহেবের কারো সঙ্গে (হয়ত ঐ হলের হাউস-টিউটর বা আর কারো সঙ্গে) প্রতিশ্রুতি ছিল, ঐ সময় কোনো বিষয় আলোচনা বা মীমাংসা করবার। কারণ ডঃ শহীদুল্লাহ ওয়াদা খেলাপ করবার লোক নন।

আর একটা গল্প আছে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব কেমন করে দুটি বিরোধী কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন :

সলিমুল্লাহ হলের হাউস-টিউটর থাকা কালে, ঐ হলের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থাকা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে। কিন্তু অনুষ্ঠানে অনেক সময় সঙ্গীত হয়, নাটকও হয়। সেগুলো সম্পূর্ণ জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে মতদ্বৈত আছে। এরূপ সন্দেহজনক স্থলে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও সঙ্গীতাদি আরম্ভ হতেই দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে অনেক সময় চোখ বুজে বসে থাকতেন।

এইরূপ কথিত ঘটনার সত্যাসত্যের বিষয় আমি অবগত নই। তবে চোখ বুজবার কারণ কতকটা অনুমান করা যায় আর একটা ঘটনা থেকে। একবার অভিনয়ের জন্য 'বঙ্গনারী' নাটক নির্বাচিত হয়েছিল। অতিকষ্টে ডক্টর সাহেবের কাছ থেকে ছাত্রেরা সম্মতি আদায় করেছিল— তবে একটি শর্তে। শর্তটা এই যে এতে ছাত্রেরা নারী সেজে নারীর পার্ট অভিনয় করতে পারবে না। বলা বাহুল্য, সে-যুগে হলের মঞ্চে— নাট্যমঞ্চ বলা যায় না— নারী এনে নারীর পার্ট অভিনয় করাবার প্রশ্নই উঠতে পারত না। সুতরাং মনে হয়, ছাত্রেরা পুরুষ সেজেই নারীর পার্ট অভিনয় করবে,— খুব সম্ভব এই ছিল অভিপ্রায়। এসব ঘটনা ডঃ সাহেবের বিলাত যাওয়ার আগেও হ'তে পারে, পরেও হ'তে পারে। কারণ বিলাত থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসবার পরেও তাঁর মধ্যে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের চারিত্রিক দৃঢ়তা লক্ষণীয়। এই সঙ্গে সত্যের খাতিরে একটি কথা বলা আবশ্যক। পারমার্থিক বা ইসলামী সঙ্গীত শুনতে তাঁর কোনোদিনই আপত্তি ছিল না— তা' সে বাংলাই হোক বা আরবী ফার্সী উর্দুই হোক। এখানেও তাঁর ব্যবহার সঙ্গতিপূর্ণ— নইলে 'ইয়া নবী সালামো আলায়কা' অথবা পবিত্র কোরান শরীফের তেলওয়াত শুনাও কঠিন হয়ে পড়ত।

ধর্মীয় ব্যাপারে আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে পড়ছে। প্রথমবার যখন ঢাকার মাঠে মেয়েরা জামাতে ঈদের নামাজ পড়বার সংকল্প করে, সেবারে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব অত্যন্ত সাহসের কাজ করেছিলেন। কোথায়ও স্থান না হওয়াতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির খেলার ময়দানে স্থান তো পাওয়া গেল, কিন্তু সারা শহরে কোনও মৌলবী-মৌলানা বা খুদে

মুন্সীও ইমামতী করতে রাজী হল না। সেই সঙ্কটের সময়, স্থানীয় ও'লামাদের বিরোধিতার মুখে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব মেয়েদের ঈদের নামাজে ইমামতী করলেন।

আজকে এই সভার উদ্যোক্তা হচ্ছেন, পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সভ্যবৃন্দ। এঁরা অবশ্যই জানেন, সাহিত্য রচনায় লেখকের চিন্তা বা মতামত প্রকাশের কতটুকু স্বাধীনতা থাকা উচিত। এমন এক সময় ছিল, যখন হয়ত মনে মনে চিন্তা করতে বাধা না থাকলেও প্রবন্ধ বা অন্যবিধ রচনায় স্বক্রিয় স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল— যদি সে-চিন্তার মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় মতের সঙ্গে সামান্য পার্থক্য বা বিরোধ থাকতো। আজও যে ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তেমন কিছু বাধা একেবারেই নাই, তা নয়। যা'হোক, একবার ঢাকার মুসলিম সাহিত্যসমাজের একজন তরুণ সদস্য লিখেছিলেন— তেরশ' বছর আগে খেজুর ও মরুভূমির দেশের মেষপালক বা উষ্ট্র চালকেরা যেসব নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা' কি এই বিংশ শতাব্দীতেও সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমিতে হুবহু গ্রহণযোগ্য?— বা এই ধরনের কিছু। এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হ'ল দিওয়ান বাজারের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তাদের দাবী হ'ল এইসব কুফরীকালামের স্রষ্টাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া চাই। বিচারের ভার পড়ল জনাব ডঃ শহীদুল্লাহর উপর। তিনি সঙ্কটটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে রায় দিলেন, লেখক যা লিখেছেন, তাতে তার উপর 'কুফরী ফতোয়া' দেওয়া যায় না। এতে মহল্লাবাসীদের রাগ গিয়ে পড়লো ডঃ সাহেবের উপরেই। তাঁর প্রতি যত শ্রদ্ধা ছিল, তা পরিণত হ'ল বিতৃষ্ণায়। কিন্তু ডঃ সাহেব স্থির থাকলেন তাঁর অভিমতের উপর। যা'হোক ব্যাপারটা কিছু বিশিষ্ট সম্ভাষণ ও কটূক্তির উপর দিয়েই অবশেষে মিটে গেল। ... তরুণ লেখকদের জীবনটা রক্ষা হ'ল।

আমরা ডঃ শহীদুল্লাহকে দেখেছি প্রত্যেক জুমা'র নামাজের খোতবার আগে ইসলামের রূপ বিশ্লেষণ করতে আর সেই আদর্শে জীবন— নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিতে; সত্য-সন্ধানী অমুসলিমকে মুসলিম করে নিয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর আহার-বাসস্থান ও জীবিকার ভার নিজে বহন করতে; শত-সহস্র মিলাদ মহফিলে ভাষণ দিয়ে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর চরিত্রের মাধুর্য বিশ্লেষণ করতে; অনেক গরীব মুসলিম ছাত্রকে নিজগৃহে স্থান দিয়ে তাদের উচ্চশিক্ষার সহায়তা করতে; পারিবারিক শাদী-গমীতে শরীক হয়ে অনেক সময় বিবাহ-পড়াতে অথবা জানাজার নামাজের ইমামতী করতে; হাজার হাজার সাহিত্য-সভা ও সংস্কৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করতে; হিন্দু মুসলিম-ব্রাহ্ম-বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ভজনালয়ে বা উৎসব-মণ্ডপে উপস্থিত হ'য়ে সম্প্রীতি ও প্রেম-ধর্মের মহিমা ও ধর্মগুরুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে; ইউনিভার্সিটির ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দড়ি-টানা ও শত-গজ দৌড়ে যুবকদের হারিয়ে (!) দিতে; অবসরের দিনে চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা বা তারও অধিক কাল কোরান তেলাওয়াত, গ্রন্থ রচনা, অধ্যয়ন, দোয়া-কালাম ও পীর-মুরিদান তত্ত্বালোচনা করতে; বহুকাল যাবৎ নিজ খরচায় ইংরেজি মাসিকপত্র 'Peace' চালিয়ে যেতে; অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা (গদ্য-পদ্য, মূল অনুবাদ) রচনা করতে; এবং আরও কত কিছু কাজ করতে, যা অল্পের মধ্যে গুছিয়ে বলা অতিশয় কঠিন।

আমরা দেশের কৃতী সন্তান, জাগ্রতমনা, কর্তব্যনিষ্ঠ, বহুগুণান্বিত, অনাড়ম্বর যুবকগণ অশীতিপর মনীষী আলহাজ্জ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রতি উৎসারিত প্রাণের শ্রদ্ধা অর্পণ করে, আল্লাহ কাদিরের দরগায় প্রার্থনা করি তিনি যেন সুখ শান্তিপূর্ণ 'বিংশোত্তরী বা বিশে-শয়" দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

পরিক্রম
মার্চ ১৯৬৭

# কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর অবদান

আমরা কারও জীবনী আলোচনা করতে হ'লে প্রথমেই বিবেচনা করি তাঁর লৌকিক পরিচয় কি— তাঁর বাপ-দাদা ও নানা-মামুরা কি পর্যায়ের লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁর বংশপরিচয়টাই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের বা প্রাচ্যের রীতি। কিন্তু প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গী একটু অনুরূপ— অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তিগত গুণপনার উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাচ্যদেশের এই বদ্ধমূল রীতির উপর আঘাত এসেছে বুদ্ধদেবের কাছ থেকে, হযরত মুহম্মদের কাছ থেকে এবং এঁদের অনুসারীদের কাছ থেকে। তবু আমাদের দৃঢ়-সংস্কারের প্রাচীর একরূপ অনড়ই রয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে ডারউইনের প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারবাদ, পরোক্ষভাবে হ'লেও, কতকটা বংশ পরম্পরার বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণ-যুক্তির পরিপোষক হয়েছে। তাই আমি আলোচনার প্রারম্ভেই কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের বংশপরিচয় ও পরিবেশ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে নিতে চাই।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের পিতৃভূমি বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে। আমি বাল্যকালে দেখেছি বাগমারার কাজীপাড়ায় সাতটি বিভিন্ন বংশের বাস— চারটি কাজীবংশ আর একটি ক'রে মিয়া বংশ, খোন্দকার বংশ আর মীর্দাহ্ বংশ। অবশ্য এই ভদ্র চাকলার আশে-পাশে একটু দূরে আশ্রিত প্রজা বা অনুগত কৃষক-প্রজাদেরও বাস ছিল। আমারও পিতৃভূমি বাগমারা গ্রামে।

ওদুদ সাহেবের নানাবাড়ী ছিল পদ্মার ধারে বাগমারা থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরবর্তী হোগ্‌লা গ্রামে। এঁরা ছিলেন মোটা গৃহস্থ। ওদুদ সাহেবের নানা পাঁচুমোল্লা ছিলেন বিষয়সম্পত্তিওয়ালা বিচক্ষণ লোক। ইনি নিজের ছেলেপিলেদের লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। ওদুদ সাহেবের ছোট মামু নজীরউদ্দিন মোল্লা দারোগা, মেঝে মামু খবীর উদ্দিন বি. এ. শিক্ষাবিভাগের সহকারী ইনস্পেক্টর, আর বড় মামু আসহাবউদ্দিন ছিলেন পিরোজপুরের বড় দারোগা। ওদুদ সাহেবের মা ছিলেন পাঁচুমোল্লার কনিষ্ঠা কন্যা। ওদুদ সাহেবের বড় মামুই তাঁর শ্বশুর কিন্তু তাঁর লেখাপড়ার ভার ছিল ছোটমামুর উপরে। তিনি বিভিন্ন জেলায় কয়েকটা বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। আর বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের লোকের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ওদুদ সাহেবের পিতা কাজী সগীরউদ্দিন স্টেশন মাস্টার ছিলেন দর্শনা (?), সোদপুর, হাওড়া প্রভৃতি তৎকালীন ইস্ট-বেঙ্গল রেলওয়ের কয়েকটি স্টেশনে। ইতিপূর্বে বাগমারার বিশিষ্ট সর্বমান্য বয়োজ্যেষ্ঠ রইস 'কাজেম কাজী'র এক পুত্র (ওদুদ সাহেবের একজন দাদা) পাঁচুমোল্লাদের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতার কাজ করতেন। তখনও সগীর কাজীর চাকুরী হয়নি। এই সুযোগে পাঁচুমোল্লা সাহেব নিজের সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যার সহিত সগীর কাজী সাহেবের বিবাহ সম্পন্ন করেন। পরে স্বভাবতঃই নাজীরউদ্দীন দারোগা, আসহাবউদ্দিন দারোগা গয়রহের তদ্বিরে ওদুদ সাহেবের পিতা রেলওয়ের স্টেশন মাস্টারীর পদ পেয়েছিলেন।

সগীর কাজী সাহেবের আর একটি বিরল নাম ছিল 'সৈয়দ হোসেন কাজী'। যা'হোক এঁরা যে কাজী বংশের লোক, আর সৈয়দ বলে কখনও দাবীও করেন নি— তাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমি শ্রীমান আবুল ফজলের বইয়ে ওদুদ সাহেবকে 'সৈয়দ' বংশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে দেখেই কথাটা পরিষ্কার করে বললাম। ...সগীর সাহেব রেলওয়ের চাকুরে ব'লে তাঁকে অধিকাংশ সময় স্টেশন কোয়ার্টারেই থাকতে হ'ত। কদাচিৎ বাগমারার বাড়ীতে আসতেন। তিনি বড় মিশুক ও রসিক লোক ছিলেন। গ্রামে এলেই সবার বাড়িতে এসে দেখা করতেন আর অনেক গল্পগুজব করতেন। ওঁর কথাবার্তার ঢং ছিল অতিশয় স্পষ্ট আর মতামত অতিশয় দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট। গ্রামের সবাই তাঁকে ভালবাসতো, তিনিও কারো শত্রু ছিলেন না। ১৯২০/২১ সালের কিছু পরে তাঁর মৃত্যু হয়,— হাওড়াতে স্টেশন কোয়ার্টারেই।

ওদুদ সাহেবের দাদা ইয়াসীন কাজী সাহেব নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র এবং নির্বিরোধী লোক ছিলেন— নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতেন না। পিতৃকুলের চেয়ে মাতৃকুলের ছাপই ওদুদ সাহেবের মনে গভীরতর রেখাপাত করেছে।

বাল্যকালে আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেতাম প্রতিবৎসর স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটিতে। তখন আমি ছিলাম গ্রাম্য বোকারাম, আর তিনি ছিলেন শহুরে ফিটবাবু। তাঁর ডাকনাম 'ফতুমিয়া'। তিনি বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায় বড়। সুতরাং আমাদের (গ্রাম্য বালকদের) উপর তিনি ছিলেন অন্ততঃ থানার দারোগা বা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট। গ্রাম্য বালকেরা উড়াতো চিলে ঘুড়ি, তিনি উড়াতেন 'ঢাউশ', যা ওড়ে 'চিলে'র বহু উর্ধ্ব দিয়ে; আমরা গায়ে দিতাম বড় জোর একটা গেঞ্জী, তিনি পরতেন ফতুয়া, বা শার্ট-কোর্ট। আমরা বেড়াতাম খালি পায়ে, তাঁর পায়ে থাকতো চটি বা পাম্প সু—কত আকাশ পাতাল পার্থক্য। তবু আমাকে তিনি ভালবাসতেন, ভাল ছেলে বলে আমাকে অনেকরকম কুট প্রশ্ন ও সমস্যা দিয়েও দস্তুরমত ঠকাতে পারেন নি ব'লে আমার ঘিলুতে একটু বুদ্ধি আছে, সে কথা স্বীকার করতেন। তিনিই আমাকে সাত ঘুঁটি বাঘবন্দ, আর মোগল-পাঠান (দুইরকম ছকে) শিক্ষা দেন। এসব খেলায় প্রথমে পাঁচছয় দিনে হেরে হেরে পরে তাঁর সমকক্ষ হতে পেরেছিলাম— এতে তিনি খুব খুশী। পরে যৌবনকালে যখন আমি দাবা খেলা শিখলাম, তখন তিনিও আমার কাছ থেকে ও খেলাটা শিখে নিলেন। সে খেলায় পাঁচবার হেরে যদি একবারও জিততে পারতেন, তা হলেই মনে করতেন, তাঁরই জিত হয়েছে। শেষে তিনি যখন ঢাকার বাড়ী বেচে দিয়ে কলকাতায় বাড়ী করলেন, তখনও আমি কলকাতা গেলেই আমাকে ডেকে নিয়ে দাবাখেলা শুরু করতেন, অন্ততঃ একটি বাজী জিতবার জন্য। সেই জিৎ-বাজী না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাব না, আমি জানতাম। তাই শেষ বাজীটা তাঁকে দিতেই হ'ত। উনি বলতেন, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে", আর "All's well that ends well"

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব পাকা তার্কিক ছিলেন। কখনও হার মানতেন না। আমাকে অনেকবার বলেছেন, তুমি বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারছ না। আমি যেটা বলছি, সেটাই নির্ঘাত সত্য। তবু আমাকে দিয়ে হার স্বীকার করিয়ে নিতে অক্ষম হলে, অবশেষে বলতেন, "Let us agree to differ—হয়ত তোমার যুক্তির মধ্যেই কিছু সত্য আছে!"

এবার আমরা তাঁর শিক্ষাজীবনের কিছু তথ্য দিয়েই তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করবো। তাঁর প্রথম পাঠ হয় জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে। এটা হোগলা থেকে আরও দূরে

বাগমারা থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূর। বাগমারা, ছেদগলা, জগন্নাথপুর সবগুলোই পদ্মানদীর তীরে, এবং পশ্চিম পার্শ্বে। জগন্নাথপুর থেকে আরও মাইল চার-পাঁচ অগ্রসর হ'য়ে পদ্মা পার হ'লেই পাবনায় যাওয়া যায়। বাগমারা থেকে আড়াই মাইলটাক দূরে আজুদিয়া। পদ্মার পারেই আজুদিয়া গ্রাম। পাঁচু মোল্লা সাহেবের সম্পত্তি ছিল হোগলা থেকে আজুদিয়া অন্তর্বর্তী অঞ্চলে— এক লাগাট নয়, কয়েকটি ছিটমহলের সমষ্টি। যা'হোক, জগন্নাথপুর থেকে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়ে তাঁর ছোট দারোগা মামার সাথে ঢাকা, নরসিংদি (সাটিরপুর), পাবনা ইন্‌স্টিট্যুট, নারায়ণগঞ্জে (মুরাপাড়া) আবার ঢাকায় এক বৎসর পরে ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন; যা পড়তেন সে সম্বন্ধে চিন্তাভবনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এরপর নাজিরউদ্দীন সাহেব (ছোট মামা) তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠিয়ে দেন। কলকাতাতেই তিনি আই. এ., বি. এ. ও এম.এ. পাশ করেন। আমি পড়াশুনায় তাঁর থেকে দুই বছর নীচে ছিলাম। তিনি আই. এ. পাশ করার পর আমিও প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস. সি. পড়তে যাই। তিনি থাকতেন বেকার হস্টেলে বে-কার নয় Baker সাহেবের নামে বেকার আর আমি থাকতাম পার্শ্ববর্তী ইলিয়ট হস্টেলে। এ সময় আমি তাঁর বিশেষ 'স্নেহ' ও সাহায্য পেয়েছিলাম। ইংরেজির একখানা পাঠ্যবই ছিল Coverley Papers তাঁর পড়া শেষ হয়েছিল ব'লে তিনি আমাকে তাঁর Edison নামক বৃহৎ বইখানা দিয়ে দিয়েছিলেন। এতে সমুদয় Coverly Papers ছাড়াও আরও অনেক সাহিত্যিক রচনা ছিল। তিনি যে পাঠ্য-অংশের থেকে আরও অধিক জ্ঞানের পিপাসী ছিলেন, এ হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত।

কলকাতায় থাকতে তিনি আমাকে 'সাহিত্যক' সভায় নিয়ে যেতেন। সেখানে একটা রীতি ছিল যে, উপস্থিত সবাইকে কিছু না কিছু বক্তৃতা করতেই হবে। এখন সে সাহিত্যিক সমিতির নাম ভুলে গিয়েছি। সেটা বোধ হয়, কোনো মুসলিম সাহিত্যিক সভাই হবে; কারণ এ সম্পর্কে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র আফজালুল হকের এবং যশোর জেলার সুবক্তা মহম্মদ ওয়াজেদের নামও মনে পড়ছে।

ওদুদ সাহেব তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রামপ্রসাদ মুখার্জি, দিলীপ কুমার রায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, আমীন আহমদ এবং আরও কয়েকজনের নাম করতেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সত্যেনদত্ত তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। সবুজপত্র, প্রবাসী ও পরিচয় পত্রিকাও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এগুলো আমাকে পড়তে দিতেন, আমাকে সাহিত্য তালিম দেবার জন্য। এতে অবশ্যই আমি উপকার পেয়েছি। স্কুল কলেজে তিনি ক্লাসিক্যাল বিষয় হিসাবে আরবী-ফার্সী পড়েননি; পড়েছিলেন সংস্কৃত। আর একটি আশ্চর্যজনক কথা এই যে এম. এ. ক্লাসেও তিনি বাংলা নেন নি। তাঁর বিষয় ছিল— অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি (Economics & Politics)।

তাঁর প্রথম দুইখানা পুস্তক 'মীর পরিবার' ও 'নদীবক্ষে' আর শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' এর সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ বুঝতে পারলেন বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক তরুণ তারকার আবির্ভাব হয়েছে। প্রথম দুইখানা বইয়ে তিনি বাংলার অবহেলিত সাধারণ মুসলিমের গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করেছেন, এবং অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তাদের চিন্তাভাবনা, পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধ, একত্র শান্তিপূর্ণ বসবাসের প্রসঙ্গাদি আলোচনা করেছেন। এগুলো তাঁর ছাত্রাবস্থায় লেখা।

১৯২০ সালে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার অধ্যাপক হয়ে ঢাকায় আসেন। ঐ সময় প্রাক্তন ঢাকা কলেজের বি. এ., এম. এ. অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে, এর আই. এ., আই. এস. সি. অংশ গবর্ণমেন্টের ইন্টারমিডিয়েট বোর্ডের অধীন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হ'য়েছিল। ওদুদ সাহেবের উপর উল্লিখিত বইগুলো অবশ্যই বিখ্যাত গবেষক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের চোখে পড়েছিল। তাই তাঁর কাছে বাংলা গবর্ণমেন্টের প্রেরিত নির্বাচন ফাইল পৌঁছে গেলে তিনি সব কাগজপত্র দেখে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকেই বাংলার অধ্যাপকরূপে নিযুক্তির সুপারিশ করেছিলেন। এতেই বোঝা যায় তিনি বাংলা সাহিত্যের জগতে তখনই একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকরূপে গণ্য হয়েছিল।... অতঃপর ঢাকা থেকে রাজশাহী কলেজে কিছুদিন বাংলা অধ্যাপনা করেন। তারপর গবর্ণমেন্ট তাঁকে কলকাতার টেকস্টবুক কমিটির 'রীডার' হিসাবে নিযুক্ত করেন। রীডার এর কাজ ছিল স্কুল কলেজের জন্য দাখিলকৃত পাঠ্য বইয়ের মধ্যে কোনটা গ্রহণযোগ্য, আর কোনটা নয়, তা নির্ণয় করা, এবং আরও বিবিধ প্রশাসনিক কাজ, যা ইতিপূর্বে সাধারণত এ. ডি. পি. আই.-রাই করতেন।

কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যকৃতি বিশেষভাবে রক্ষিত রয়েছে তাঁর "শাশ্বত বঙ্গ" ও 'সমাজ ও সাহিত্যে"র প্রবন্ধাবলীতে; এবং তাঁর 'গ্যেটে'র রচনাবলীর স্তিতরে। এছাড়া "হজরত মোহাম্মদ ইসলাম" গ্রন্থে তিনি ধর্মসংক্রান্ত অনেক কথার আলোচনা ও বিবেচনা করে বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি, তার মর্মানুসরণ করবার কথা বলেছেন। তিনি রামমোহন রায়ের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। তাঁর যৌবনকালে সাধারণ মুসলমান সমাজকে তিনি হযরত মোহাম্মদের অতিশয় গোঁড়া ভক্ত ব'লে খেদ করেছেন, অথচ, তিনি নিজে যে রাজা রামমোহনের ততোধিক অন্ধ ভক্ত, একথা বুঝতে পারতেন না, বা বুঝতে চাইতেন না। তবে প্রৌঢ়কালে তিনি নানামতের সুমিত সমাধান ও তদ্রূপ ব্যবহারেরও পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর শিক্ষক জীবনের প্রথম অবস্থায় ১৯২০ সালে তিনি আমাকে অংশীদার ক'রে পুর্বদরজা রোডের ধারে একটি বড় বাড়ী ভাড়া নেন। সেখানে আমরা দুই তিন বছর সপরিবারে বাস করি। তখনও দেখেছি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার, স্নেহ-প্রবণ স্বভাব। আমি ১৯১৭-১৮ সাল থেকেই একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের কাছে ঠুংরী ও খেয়াল শিক্ষা আরম্ভ করেছিলাম। তা দেখে তিনিও আমার তানপুরা থেকে বৃহত্তর একটি তানপুরা কিনে ওস্তাদজীর কাছে তালিম নিতে শুরু করলেন। এই ওস্তাদজীর কাছে আমি তাঁর প্রথামত প্রথম বৎসর শুধু 'সরগম'-এর শিক্ষা লাভ ক'রে কণ্ঠ ও যন্ত্রের স্বরের মধ্যে 'জানে জানে' মিল হবার পরে সঙ্গীতের তারানা, পদ, বাদী, সম্বাদী, আস্থায়ী-অন্তরা ইত্যাদি শিখেছিলাম। কিন্তু তিনি সপ্তাহখানেক গলাসেধেই চৌতাল, তেওরা, আড়াঠেকা, মধ্যমান ইত্যাদি ধ্রুপদী তালে সঙ্গীত শিখবার জন্য জিদ ধরলেন। ওস্তাদজীকে অগত্যা তাই স্বীকার করে নিতে হল। এতে আমার মনে পড়লো, লালনশা'-র সঙ্গীতের একটা পদ— "ওরে, যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাকেরে ভোলা"। যা'হোক ওদুদ সাহেব ৩/৪ বছর পর্যন্ত কয়েকটা ওস্তাদি গান শিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে সব গানই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত শুনাতো। তবে তাঁর গলা দরাজ ছিল এবং গানের লয়-বোধও ছিল।

১৯২৬ সালে ওদুদ সাহেবের সভাপতিত্বে, কবি আবদুল কাদিরের উৎসাহে, অধ্যাপক আবুল হোসেনের সম্পাদনায়, আমার সহকারিতায়, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য

স্থানীয় কলেজের সাহিত্যানুরাগীদের সমবেত চেষ্টায় 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূলবাণী ছিল "বুদ্ধির মুক্তি"। আর মানুষের বিচার কোনও বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং সকল ধর্মের সারাংশে যে 'মানবতা বা মনুষ্যত্ব' তারই মাপ-কাঠিতে। অল্পদিনের মধ্যেই সুধীসমাজে এর প্রসার হ'ল, কিন্তু সম্প্রদায়বাদীদের কাছ থেকে প্রবল বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হ'ল। যা'হোক, পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে ছাত্রসমাজের মধ্যে ক্রমশ এই আদর্শের মর্মবোধের ব্যাপ্তি হ'তে লাগলো, এর সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তাদের অভিভাবকদের কিছুটা চোখ খুলে গেল। এই সমাজে বিভিন্ন সভ্য কর্তৃক পঠিত 'সম্মোহিত মুসলমান', 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ', 'আনন্দ ও মুসলমান সমাজ', 'মানুষ মোহম্মদ', 'অসীমের সন্ধানে', 'মানব মুকুট', 'মুস্তফা চরিত', 'সমাজ ও সাহিত্য' ইত্যাদি বহু প্রবন্ধ প্রশংসিত বা বিশেষভাবে নিন্দিত হ'য়েছিল।

ওদুদ সাহেবের চিন্তাশক্তি গভীর ও বহুমুখী ছিল। তিনি প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ, সমালোচনা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার্কিক হিসাবে তিনি যে কোনও বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তির সহিত অভিনব চিন্তার সংযোগ করে প্রতিপক্ষকে চমৎকৃত ক'রে দিতেন। আমরা এই ক্ষণজন্মা বীর সাহিত্যিকের মাগফিরাৎ কামনা করি।

ওদুদ সাহেবের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর ঐতিহাসিক বোধ এবং বীরধর্মী দুঃসাহসিকতার কাহিনীর সূক্ষ্মবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এই ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই এখানেই ক্ষান্ত দিলাম।

উত্তরাধিকার

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫

# কর্ম-প্রাণ আবুল হুসেন

মৌলবী আবুল হুসেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯১৫ সালে কলকাতার ইলিয়ট হোস্টেলে। কিন্তু সে-পরিচয় কেবল মুখ-চেনা-চিনি। তিনি তখন কলেজে "সেকেন্ড ইয়ার"-এ পড়ছেন। আর আমি "ফার্স্ট ইয়ার"-এ। সে-সময় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার বিশেষ কোনো কারণ ঘটে নি। ছাত্র-জীবনে অনেক সময় কারণ নির্বিশেষে কারও কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে থাকে। কিন্তু আবুল হুসেন সাহেবের এমন কোনো সহজ দৃষ্ট বিশেষত্ব ছিল না, যার জন্য স্বভাবতঃ লোকে তাঁর অনুরাগী হ'তে পারে এবং তাঁর কাঠখোট্টা রকমের মুখপোড়া চেহারা দেখে তাঁর প্রতি অন্যান্য ছাত্রের কিঞ্চিৎ অবহেলার ভাব হওয়াই অধিক সম্ভব ছিল। বোধ হয় এই কারণে এবং কলেজে এক বৎসরের ব্যবধানের জন্য বহুবার তাঁর সঙ্গে ইলিয়ট হোস্টেলের কমনরুমে এবং কয়েকবার কলকাতার এক লিটারারী সোসাইটিতে দেখা দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে তখন তাঁকে চিনতে পারি নি। পরবর্তীকালে তাঁর কাছে এ কথা প্রকাশ করে বলায় উভয়ের হাস্যের কারণ হয়েছিল। যা হোক, তাঁকে সর্বদা স্বল্পভাষী বিমর্ষ দেখতে পেতাম খেলাধূলা বা কৌতুক আমোদের দিকে কোনোদিন তাঁর আগ্রহ দেখতে পাই নি। এখন বুঝতে পারি, তিনি ছিলেন এক ধেয়ানী পাঠ-নিষ্ঠ—সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত। একমাত্র জ্ঞান-লোক ছাড়া অন্য জগৎ তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর ছিল।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি। ইলিয়ট হোস্টেলে একাধিক মেস ছিল, আর আমরা বিভিন্ন মেসের মেম্বর ছিলাম। বিভিন্ন মেসের মধ্যে এক প্রকার মৃদু রেষা-রেষি ভাব চলত। হয়ত এই কারণেও আমাদের মধ্যে পরিচয়ের স্বচ্ছন্দতা কিছু ব্যাঘাত পেয়ে থাকবে। আজ মনে হচ্ছে হায়, কেন এইসব অপ্রকৃত বাধা ঠেলে তখন প্রকৃত গুণের সমাদর করতে পারি নি?

তারপর ১৯২১ সালে তিনি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চাকরী নিয়ে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয়। এই পরিচয় নিবিড়তর হ'ল। এখন আর সেই স্বল্পভাষী-বিমর্ষ আবুল হুসেন নয়, আত্মবিশ্বাসের আনন্দে উদ্ভাসিত নতুনতর আবুল হুসেন। এবার দেখি, জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগের সংযোগ হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অন্তঃসৌন্দর্য ও সহজ হৃদ্যতার বলে আমাকে এবং আরও অনেককে আকর্ষণ করে নিলেন। এবার বুঝলাম, তিনি সত্য সত্যই মুখ-পোড়া— উচিত কথাটি শুনিয়ে দিতে কাউকে খাতির করেন না। যা'হোক, অচিরেই তিনি সত্যনিষ্ঠা কর্মনিষ্ঠা ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করলেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রচুর সমাদর লাভ করলেন।

কিন্তু আবুল হুসেনের আসল কর্তৃপক্ষ ছিল তাঁর বিবেক। তাঁর বিবেক বলল, 'সমাজের কাজে নামতে হবে।' তাই কর্ম-প্রাণ আবুল হুসেন জ্ঞানবর্তিকা উজ্জ্বল ক'রে জ্বালিয়ে অন্ধ সমাজকে পথ দেখাতে চাইলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চারদিকে শিষ্য, সমভাবুক ও

সহকর্মীরা জুটে গেল। আমার অলস প্রাণেও তিনি একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করলেন; মাঝে মাঝে যে একটু আধটু সাহিত্যচর্চা করে থাকি, আবুল হুসেনের প্রেরণাতেই তার সূচনা। তিনি সময় সময় এই বিষয়ে উল্লেখ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন; আজ আমি সাধারণ্যে এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

জ্ঞানের সম্মার্জনীতে আবর্জনা দূর হয় সত্য, কিন্তু সকলের পক্ষে তা সুখ হয় না। তাই আবুল হুসেনকে নানা আপদ-বিপদ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি নির্ভীকভাবে জ্ঞান-শিখা প্রজ্বলিত করে ঘুমন্ত সমাজে 'জাগরণ'-এর বার্তা ঘোষণা করেছেন। মুসলমানের অতীতকে তিনি গৌরবময় বলে জানতেন; কিন্তু তার ধ্যানে মুহ্যমান না হয়ে বরং ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সমাজকে আহ্বান করেছিলেন। মুসলমানের সম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হয়ে শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তাই তিনি মুসলমানের উত্তরাধিকার আইনের সংস্কারপ্রার্থী ছিলেন। ধর্মকে তিনি জীবনপথের সহায়ক মনে করতেন, তাই 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে ধর্মের বহিরাবরণের দিকে জোর না দিয়ে তার অন্তর্নিহিত প্রাণবান, সতত বিকাশমান সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। মুসলমানকে তিনি ভিক্ষুকের বেশে দণ্ডায়মান দেখতে লজ্জা বোধ করতেন, তাই তাঁর বিখ্যাত 'শতকরা পয়তাল্লিশ' প্রবন্ধে তিনি মুসলমানের আত্মসম্মান-বোধ জাগাতে চেয়েছিলেন।

তাঁর নিজের আত্মসম্মান-বোধ প্রবল থাকাতেই তিনি ইউনিভার্সিটির উচ্চ আয়ের পদ ত্যাগ করে অনিশ্চিত আইন-ব্যবসায়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এতে তার সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত যশ অর্জন করে গেছেন। বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বহুলাংশে তারই কীর্তি। ক্রমোন্নতি তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। তাই জীবন-সংগ্রামের জন্য যতটা পরিশ্রম করে সাধারণ লোকে সন্তুষ্ট হ'ত তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এম. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকার সুপ্রতিষ্ঠিত পসার ত্যাগ করে কিছুদিন পরেই কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে যান।

মৌলবী আবুল হুসেন সমাজবৎসল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে এবং তার পরেও যখনই যে-কোনো বিষয়ে তাঁর উপদেশ বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি অকুণ্ঠিতভাবে তা দিয়েছেন। তিনি কখনও প্রতিদানের আশায় পরোপকার করতেন না। বস্তুতঃ আবুল হুসেন এত বৃহৎ ছিলেন যে, তাঁর উপকার করব, এমন কথা কোনোদিন আমার মনে হয় নি; আর তাঁর কাছ থেকে উপকার চাইতেও কোনোদিন সঙ্কোচ বোধ করি নি।

আবুল হুসেনের সমাজ-প্রীতি তাঁর মানব প্রীতিরই বিশেষ অভিব্যক্তি ছিল। এজন্য সামান্য সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতায় তাঁর মন কোনো দিন আচ্ছন্ন হয় নি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী ছিলেন। হিন্দু-কালচার ও মুসলমান-কালচারের মধ্যে তেল-জলের সম্বন্ধ, এ কথা তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন, উভয় কালচার পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দূরের কথা বরং মধুরতর হয়ে ক্রমশঃ কালোপযোগী পরিপুষ্টি লাভ করছে। হিন্দু-মুসলমান যদি আপন আপন কালচার নিয়েই, সব কালচারের মূলীভূত মানবতার ক্ষেত্রে একত্র হয়, তবেই স্থায়ী মিলন সম্ভব হ'তে পারে। মানবতার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, কোনো কালচারের সঙ্গেই এর বিরোধ নাই এবং কোনো বিশিষ্ট কালচার যে অন্য কালচার দ্বারা গ্রাসিত হ'তে পারে এরূপ ভয়ও তিনি করতেন না।

কর্মপ্রাণ আবুল হুসেন নদী-সমস্যা, আইন-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা, এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা সমস্যার চিন্তা করেছেন, পুস্তক রচনা করেছেন এবং এসব সমাধানের জন্য বিবিধ কমিটি ও বোর্ডের মেম্বররূপেই হোক, আর ব্যক্তিগতভাবেই হোক, আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। সে-সময় নিজের সুখ-সুবিধা বা স্বাস্থ্যের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নি। তাঁর অক্লান্ত জ্ঞান-লিপ্সা ও কর্মপিপাসাই বোধ হয় তাঁকে অকাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর অসাধারণ কর্মশক্তি, সংগঠন-ক্ষমতা এবং পরিচালন-প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হওয়া বর্তমান বাংলাদেশের, বিশেষ করে সদ্য জাগরিত মুসলমান সমাজের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

[মুসলিম হল বার্ষিকী, দ্বাদশ বর্ষ।]

# সাহিত্যিক আবুল ফজল

অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেবের সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে বহুদিন আগে— ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যেই, যখন ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর মারফতে 'সীমাবদ্ধ জ্ঞান' এবং 'আড়ষ্ট বুদ্ধিকে" প্রসারিত ও মুক্ত করবার প্রথম সাহিত্যিক আন্দোলন বেশ খানিকটা জোরদার হয়ে উঠেছিল। আবুল ফজলের মননশক্তি, সহজ জ্ঞান আর কল্যাণ-বুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে তার সুচিন্তিত প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে, তখনই তাঁর সংস্কার-মুক্ত মন আর বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির যে লক্ষণ দেখা গেছে, তা এযাবৎ শুধু রক্ষিতই হয় নি, পরিপুষ্টও হয়েছে। তাঁর কৈশোরের 'বাহাই ধর্ম' আর নিকট-অতীতের সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রবন্ধাদি পড়লে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় সুযোগ বা দুর্যোগ অনুসারে এই লোকটির সাহিত্যিক বুনিয়াদ নড়েচড়ে যায় নি,— অটল রয়েছে। আবুল ফজলের প্রতি আমার শ্রদ্ধার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ—এর মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর রয়েছে তা সাহিত্যিক সত্য নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

পাকিস্তান হওয়ার পরে, কার্জন হলে পঠিত ১৯৫৪ সালের সাহিত্যিক অভিভাষণ, 'সমকাল'-এ প্রকাশিত আবদুল ওদুদের সাহিত্য-প্রসঙ্গ, উত্তরণে প্রকাশিত শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ যে কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্লাঘার বস্তু। এগুলোতে মতামতের অকুণ্ঠ প্রকাশ রয়েছে, প্রকাশ ভঙ্গিতেও আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। তবে আমার মনে হয় ওদুদ-সাহিত্য প্রসঙ্গে কোনও কোনও স্থানে কিছুটা আতিশয্য এসে পড়েছে। অবশ্য মনন-সাহিত্যের একজন আদর্শ ধারক এবং সঞ্চালক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার শতকরা নিরানব্বই ভাগই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু অন্য সাহিত্যিকের সঙ্গে তুলনাঘটিত ব্যাপারে মনে হয় শতকরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ পক্ষপাতদুষ্টি ঘটেছে। তবে এটি আমার নেহাৎ ব্যক্তিগত অভিমত। সে যা'হোক আবুল ফজল সাহেবের প্রবন্ধগুলোর একটা সঙ্কলন বের হলে দেখা যাবে, পূর্বপাকিস্তানের বর্তমান আর অবর্তমান সমুদয় প্রবন্ধ-সাহিত্যিকের মধ্যে তিনি একটা বিশেষ সম্মানিত স্থানের (দাবিদার হোন বা নাই হোন) অধিকারী নিশ্চয়ই।

আবুল ফজল সাহেবকে পাঠকসমাজ হয়ত গল্প বা উপন্যাস-লেখক হিসেবেই বেশী করে চেনেন। তাঁর রাঙ্গা-প্রভাত, চৌচির, জীবনপথের যাত্রী, সাহসিকা, প্রদীপ ও পতঙ্গ এই জাতীয় বই; আর কায়েদে আজম, প্রগতি, একটি সকাল, আলোকলতা (এগুলো নাটক বা একাঙ্কিকা), তা ছাড়া বিদ্রোহী কবি নজরুল আর কোরানের বাণী (যথাক্রমে জীবন-চরিত ও ধর্মবিষয়ক রচনা), এসবের ভিতর দিয়ে লেখকের বিষয়ানুরক্তির ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক প্রতিভাবান, কাজে কাজেই তিনি যাতেই হাত দেবেন, তাতেই অন্ততঃ মাঝারি রকম সফলতা নিশ্চয়ই অর্জন করবেন, এবং করেছেনও। ধর্মীয় রচনা, জীবনচরিত ও একাঙ্কিকা (বা একাঙ্কিকার উপন্যাস রূপ) এক রকম ভালই উৎরেছে বলতে হবে। এ জাতীয় রচনা হয়ত অন্যের হাতে ছেড়ে দিলেও তেমন ক্ষতি হ'ত না! সাহসিকা, প্রগতি,

আলোকলতায় হাস্যরস আছে, জীবনসমস্যার কথাও আছে, আর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিতও রয়েছে; তবুও মনে হয় এগুলো পড়ে হয়তো পাঠক সাময়িকভাবে উল্লসিত হয়ে উঠবেন, আবার দু-দণ্ড পরে খোশতবিয়তে ভুলেও যাবেন। একটি সকাল, প্রদীপ ও পতঙ্গ— মনে হচ্ছে কোনও সময়ে যেন পড়েছিলাম কিন্তু বর্তমানে স্মরণ নেই। চৌচির অনেক দিন আগে (বোধ হয় প্রথম প্রকাশের দুই-এক বছরের মধ্যেই) পড়েছিলাম। ভাল লেগেছিল, লেখকের প্রকাশভঙ্গিতে আনন্দলাভ করেছিলাম। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে 'কায়েদে আজম' সুলিখিত নাটক, স্টেজে কেমন উৎরাবে জানিনে। তবে রাজনৈতিক তথ্য-পিপাসুরা আনন্দ পাবেন, চিত্রামোদীরা রতনবাইয়ের মৃত্যুঘটনা সম্বন্ধীয় দৃশ্যাদি না দেখে হয়ত হতাশ হবেন, আর সাধারণ দর্শক নিশ্চয়ই রেস্তোরাঁর গল্প গুজব বেশ উপভোগ করবেন।

কিছুদিন আগে কোনও গল্প-সঙ্কলনে আবুল ফজলের একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প পড়েছিলাম। বলতে কি, ঐটেই ছিল সেই সঙ্কলনের প্রধান গল্প। এতে গাল্পিকের সহানুভূতি, বাস্তবতাবোধক, স্বচ্ছ চিন্তা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে নিপুণভাবে কোনও মৌলবী সাহেবের 'জীবন-পথের যাত্রী' আঁকা হয়েছে। অন্য লোকের হাতে পড়লে হয়ত কালিমালিপ্ত একটি পাষণ্ডের চিত্র হয়ে পড়ত, কিন্তু শিল্পীর হাতে তা হয়ে উঠেছে একটি যাত্রিকের সংগ্রামময় (আর শোভাময়) বলিষ্ঠ চরিত্র। এমন সার্থক চিত্রণ চৌচিরেও আছে বলে আবছা-আবছা মনে পড়ছে।

এইবার 'জীবন পথের যাত্রী' আর 'রাঙ্গা-প্রভাত' নামক দুইখানা উৎকৃষ্ট পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। 'জীবন-পথের যাত্রী' ঘটনাপ্রধান নয়, মনস্তত্ত্ব-প্রধান উপন্যাস। অনেকটা দিলীপ রায়ের 'মনের পরশ' আর 'দোধারার' মত। নায়িকা হেনা এক সুরুচিসম্পন্ন ব্যারিস্টারের আদুরে মেয়ে, মাতৃহীনা শিক্ষিতা, সুন্দরী আর আধুনিকা কাজে কাজেই ভীষণ জেদী আর বিবাহাদি ব্যাপারে আপরুচি অর্থাৎ গার্জিয়ানের মত অগ্রাহ্যকারী। উপন্যাসের নায়ক মামুন একটি করিৎকর্মা আদর্শবাদী ছেলে, ডাক-সাইটে স্কলার, এক সময়ের অতিশয় স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ থাকলেও বর্তমানে শরীরচর্চা আর পোশাক-পরিচ্ছদে অমনোযাগী। মামুনের যখন টলটলে স্বাস্থ্য ছিল, তখন হেনা এর সঙ্গে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়। বর্তমানে হেনা ম্যাট্রিক পাস করেছে, উঠন্ত যৌবনকাল, দেহে লাবণ্য উপচে পড়ছে।

ঘটনাপ্রবাহে এই সময় মামুনকে কিছুদিন তার গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে হল; এবার হাড়-বেরুনো কৃশকায় মামুন প্রথম দৃষ্টিতেই হেনার প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করল, কিন্তু হেনা এখন অন্য একটি ছেলে, তার ছোট ভাই মুহসীনের গৃহশিক্ষক হাসিমের প্রতিই যেন একটু বেশী টান অনুভব করতে লাগল। আসল কথা চতুর মেয়ে হেনা মামুনের হাল-হকিকত আন্দাজ করে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু মামুন নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে সতর্কভাবে গৃহশিক্ষকের কাজ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। মামুন আবার হেনার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ও। ব্যারিস্টার সাহেবের খুব ইচ্ছা যে, মামুনের সঙ্গেই হেনার বিয়েটা হোক। কিন্তু হেনা, "বিয়ে করব না" কিম্বা "এখন করব না", "করবার হলে সময়মত নিজের পছন্দ মতই করব"— এই ভাবের কথা বলে। ব্যারিস্টার সাহেব এতে অতিশয় মনঃকষ্ট পেলেন। ছেলেটিও পাছে এর সংসর্গে থেকে অবাধ্য হয়ে পড়ে এই ভয়ে তাকে বিলেতে পাঠালেন, ফিরে এসে ব্যারিস্টারী করবে এই আশায়। যা'হোক, ছেলে বিলেতে যাওয়ার পর নানা অশান্তিতে

ব্যারিস্টার সাহেবের শরীর ভেঙ্গে পড়ল। এদিকে মেয়ে হাসিমের সঙ্গে একটু বেশী মাখামাখি শুরু করেছে দেখে মেয়েকে শাসনও করতে পারেন না। কারণ সহজ ভদ্রতাতে বাধে বলে, আবার সইতেও পারেন না। শেষে ছেলে বিলেতে থাকতেই, আর মেয়ের কোনো হিল্লে না করেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। এরপর মেয়ের মাথার উপর কোনও মুরব্বী রইল না। বাড়ীতে কলেজের যুবক-ছোকরা থেকে আরম্ভ করে বড় বড় ভ্রমরস্বভাব চাকুরেরা পর্যন্ত আড্ডা জমাতে শুরু করল। তবে মেয়ে দৃঢ়চেতা, কারও সঙ্গেই তার সম্পর্ক বে-তরোভাবে বেশীদূর গড়াতে পারে নি। তাহলেও পাড়া-প্রতিবেশীদের মনে স্বভাবতই নানা রকম সম্ভব-অসম্ভব ধারণা জন্মাল, অর্থাৎ লোকনিন্দা হতে বিলম্ব হ'ল না।

এমনকি হিতৈষীদের কাছ থেকে বিলেত পর্যন্ত মুহসীনের কাছেও অনেক রসাল খবর পৌঁছে গেল। এমন অবস্থায় শীগগির একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবার জন্য হেনা হাসিমকেই বিয়ে করবার জন্য সব ঠিকঠাক করে ফেলল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিয়ের মজলিসে প্রকাশ পেল এর আগেই হাসিমের বিয়ে হয়ে গেছে এবং সে স্ত্রী হেনারই এক বাল্যবন্ধু। সেও বিয়ের নিমন্ত্রণে নিজের ছোট ছেলেটাকে নিয়ে হেনার বাড়ীতে এসে পড়েছে। সুতরাং হাসিমের সঙ্গে বিয়ের উৎসব আয়োজন ফেসে গেল। তারপর এমন কয়েকটা অনুকূল ঘটনা ঘটল, যার ফলে হেনার প্রথম প্রেম আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, আগের অভিমানটা প্রশমিত হ'ল আর সকল অহঙ্কার ত্যাগ করে হেনা মামুনকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিল। অবশ্য গল্পাংশের এই কঙ্কাল দিয়ে শ'দুয়েক পৃষ্ঠার পরিপূর্ণ উপন্যাস সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করা যায় না। লেখক এর উপর পরিমাণমত রক্তমাংসের সমাবেশ করে বেশ একটা অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। ব্যারিস্টার আজমল সাহেব, নায়িকা হেনা আর নায়ক মামুনের চরিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে, উপনায়ক হাসিম ও ছোট ভাই মুহসীনের চরিত্রও যতটুকু দরকার বিকশিত করা হয়েছে। চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে নায়িকার সখী মরিয়মের (অর্থাৎ হাসিমের স্ত্রীর) সমর্পণধর্মী চরিত্রের সঙ্গে হেনার উদ্ধত উগ্র-স্বাধীনচিত্ততার তুলনা বেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মোটের উপর উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক ভদ্র পরিবারে ছেলেমেয়েকে সর্বদা আদর করে আগলে রেখে তাদের আত্মবিকাশের সুযোগ কতখানি দেওয়া যায় এবং তাতে করে ছেলেমেয়েরা সুখে-শান্তিতে জীবনধারণ করবার কতটুকু উপযোগী হয়ে উঠতে পারে এই সমস্যা উত্থাপন করে, নায়িকার মানসিক উদ্যোগাদির ভিতর দিয়ে তার একটা সমাধানও দেয়া হয়েছে। সার্থক নারীজীবন বলতে কি বুঝায়, সমাজতন্ত্রবাদের মূল সমস্যা কি, এক দেশের কোনও 'ইজম' হুবহু অন্য দেশে প্রয়োগ করতে গেলে কেমন সব বিসদৃশ অবস্থার উদ্ভব হয় ইত্যাদি অনেক কথাই প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে। ফলে, উপন্যাসখানা শিক্ষাপ্রদ হয়েও উপভোগ্য হয়েছে, বা উপভোগ্য হয়েও শিক্ষাপ্রদ হয়েছে।

'রাঙ্গা প্রভাত' মাত্র দু'বছর আগে বের হয়েছে। এটি পরিণত বয়সের মার্জিত লেখা। বনেদী মির্জা বংশের বৃদ্ধ জমিদার এনামুল হোসেন সাহেব সেকেলে ধরনের মানুষ হলেও রুচিবান। ইনি ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন ইংরেজী স্কুলে। ইংরেজী শিক্ষার ফল প্রকাশ পেল বাপের বিনে হুকুমে বিয়ে করা, আর প্রজাদের উপর অন্যায় জুলুম করার ভিতর দিয়ে। কিন্তু বৌটি ছিল গুণবতী, সে সহজেই শ্বশুর-শাশুড়ীকে আপন করে নিল। ছেলে তবু মির্জা সাহেবের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে একদিন দলবল নিয়ে পাড়ার এক সদ্যবিবাহিতা যুবতী কন্যাকে নিজে বিয়ে করে ভোগ দখল করবার জন্য ধরে নিয়ে এসে বাড়ীর ভিতর

আটক করে রাখল। এমন সময় মির্জা সাহেব বাড়ীতে এলেন। অবস্থাটা বুঝতে পেরেই তিনি পাল্কীর একটা ডান্ডা খুলে নিয়ে, আপন ছেলের পিছনে ধাওয়া না করে তার সাহায্যকারীদের যাকে হাতের কাছে পেলেন তাকেই শায়েস্তা করতে লেগে গেলেন। বেগতিক বুঝে ছেলে তো একেবারে নিরুদ্দেশ, লম্বা পাড়ি দিল বর্মা মুলুকে। একমাত্র পৌত্র বা নাতি কামাল। এবাড়ে বুড়ো লাগলেন এর পিছনে, ভাল শিক্ষা দিতে হবে, যাতে মির্জা বংশের চৌদ্দ পুরুষের নাম বজায় থাকে। কাজেই শিশুকাল থেকেই শুরু হ'ল নিয়মিত নামাজ-কালাম শিক্ষা আর গ্রামী পাঠশালায় মিঞাজির কাছে প্রাথমিক শিক্ষা। মিঞাজির শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক বিস্তারিত (অর্থাৎ অতিরঞ্জিত) সম্ভব-অসম্ভব রসাল বর্ণনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বালক-হৃদয়ের কৌতূহল, খেলাধূলা, বিশেষত পাড়ার 'জরী' নাম্নী একটি কচি মেয়ের সঙ্গে মাছধরা, আমকুড়ানো ইত্যাদি বিষয়ের চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিছুদিন পরে কামালকে দাদা-দাদী ও মায়ের কাছ থেকে দূরে শহরের স্কুলে দেওয়া হ'ল। পড়াশুনা ভালই চলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পাঠ হিসাবে দেশী-বিদেশী ভাল ভাল বই যা হাতের কাছে পাওয়া গেল, তাও তার পড়া হয়ে গেলো। শহরে আসবার কালে নৌকাপথের দৃশ্য কামাল সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল। তারপর স্কুলের আশেপাশে পাহাড় ও প্রান্তরের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে কামালের জীবনের কয়েকটি সুখের বছর কেটে গেল। কামালের বি. এ. পরীক্ষার কিছুদিন বাকী থাকতেই মির্জা সাহেবের শরীর একদম ভেঙ্গে পড়ে। তাছাড়া কামালও যেন ঠিক দাদার মনোমতোভাবে গড়ে উঠল না বরং অনেকটা বাপের ধারাই পেল। এ দুঃখও মির্জা সাহেবের মনে প্রবল হয়ে উঠল।

অসুখের সময় পাশের গ্রামের জমিদার রায়বাবুও মির্জা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। সঙ্গে এল তাঁর ছোট মেয়ে। মায়া তখন স্কুলের ছাত্রী। এই মেয়ের সহজ শালীনতাপূর্ণ ব্যবহার, সুঠাম গড়ন সুন্দর মুখশ্রী, মধুময় কণ্ঠ কামালের বড় ভাল লাগল; আবার অনুরূপ কারণে মায়ার মনেও কামালের প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে গেল। রায়বাবু এবং মির্জা সাহেবের কথাবার্তায় প্রকাশ পেল, এই পরিবারের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক বংশানুক্রমে চলে এসেছে। এই সূত্রে রায় পরিবারের সঙ্গে কামালের একটু একটু করে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল। মির্জা সাহেব ইন্তেকাল করলেন, পরদিন কামালের দাদীও পরকালের যাত্রী হলেন। সংসারের ভার পড়ল কামালের উপরে, তবে একটি বিশ্বস্ত পুরানো গোমস্তা থাকায় কামাল কতকটা নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারল। পাকিস্তান হওয়ার পর হিন্দুদের মধ্যে পূর্ব-বাংলা ছেড়ে পশ্চিম-বাংলা বা হিন্দুস্থান চলে যাওয়ার হিড়িক লেগে গেল। মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাও হতে লাগল। তখন রায়বংশের জমিদার চারুবাবু যিনি এতদিন শহর থেকে ওকালতী করে বেশ পয়সা-কড়ি জমিয়ে ছিলেন, ওকালতী ছেড়ে দিয়ে দেশের বাড়ীতে এসে আদর্শ স্কুল স্থাপন করে দেশের লোকের জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করলেন। তাঁর মত ছিল, হিন্দু-মুসলমানে মিলেমিশে বাস করাই মানুষের কাজ মানুষে-মানুষে প্রীতি না থাকলে আর জীবনধারণে সার্থকতা কি? — ইত্যাদি। কামাল ছিল এই স্কুলের সেক্রেটারী। মায়ার বড় ভাই মুকুলের সঙ্গে কামালের খুব বন্ধুত্ব জন্মে গিয়েছিল। এই ছেলেটাও চিন্তাশীল, আর হিন্দু-মুসলমান প্রীতি-বন্ধনে বিশ্বাসী। চারুবাবুর ইচ্ছা ছিল, এই ছেলেটা ডাক্তারী পাস করে এসে গ্রামে একটা ফ্রি হাসপাতাল খুলবে। আর মায়া বি. এ. বি. টি. পাস করে বেরুলেই গ্রামে একটি মেয়ে-স্কুল খোলা হবে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা লোকেরাও কাজ করছিল। তাদের লোক একদিন চারুবাবুকে খুন করে ফেললো। এত সব প্রোগ্রামে ওলট-পালট হয়ে গেল। চারুবাবুর স্ত্রী এখানকার বিষয়-সম্পত্তি বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এদিকে নানা লোক কামাল ও মায়াকে জড়িয়ে কানা ঘুষা শুরু করে দিল। বিশেষ করে, চারুবাবুর বাড়ীতে এসে এইসব কুৎসার কথা বলে শাসিয়ে গেল। ইতিপূর্বে মুকুল একদিন তার মায়ের কাছে প্রস্তাব তুলেছিলো কামাল ত বেশ ভাল ছেলে, ওর সঙ্গেই মায়ার বিয়েটা দিয়ে ফেল না কেন? আমরা ত আধুনিক সমাজের মার্জিত রুচির লোক, হিন্দু-মুসলমান মানিনে মানুষকে সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে স্থান দিই। বিশেষ করে যখন স্পষ্টই টের পাচ্ছি এরাও পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত তখন আর এতে দোষ কি?" মা তো শুনে আগুন হয়ে গেলেন। বললেন, আমি বেঁচে থাকতে এসব অনাসৃষ্টি হতে দেব না। মায়ের মনে আঘাত লাগবে ভেবে সেদিন মায়াও দৃশ্যত মুকুলের উপর রাগ করে ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় পড়ে কি কান্নাই না কেঁদেছিল। কিন্তু এখন মোড়লরা যখন বাড়ী চড়াও হয়ে উপরোক্ত কুৎসার কথা বলে শাসাতে লাগলো তখন আর মায়া স্থির থাকতে পারলো না। সে জোর গলায় চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে দিল— হ্যা আমি কামালকে বিয়ে করব, করব, করব।

এদিকে কামালও তার মায়ের কাছে বিয়ের কথা পাড়তেই তার মাও সামাজিক আপত্তি তুলেছিলেন।

আবুল ফজল সাহেব এইসব বিবরণের মধ্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন মুসলমান সমাজেই হোক বা হিন্দুসমাজেই হোক আমরা কেমন করে অস্পষ্ট উল্লাসে মেতে উঠে ভাবের ঘরে চুরি করে থাকি। যা'হোক, শেষ পর্যন্ত মায়াকে নিয়ে চারুবাবুর স্ত্রী কলকাতাতেই আপাতত তাঁর বড় জামাইয়ের বাসায় উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা পৃথক বাড়ী খুঁজবার চেষ্টা কতে লাগলেন আর মায়ার জন্য একটা বর। মায়া বলল, "মা, আমি তো আগেই একজনের কাছে নিজেকে নিঃশেষে সপে দিয়েছি"। মা বললেন, "সে তো রাগের কথা, উত্তেজনার বশে বলেছিলি"। যা'হোক অনেক চিন্তার পর স্নেহময়ী মাকে খুশী করবার জন্যই রাজী হয়ে গেল অন্যত্র বিয়ে করতে। কিন্তু ঐদিন রাতে মায়ার বুক-ফাটা চাপাকান্নার শব্দ শুনে মা নিশ্চয় করে বুঝতে পারলেন মেয়ের মন কোথায় পড়ে রয়েছে। তখন মাতৃহৃদয়ের সহজ অনুভূতি দিয়ে কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের কথা বিবেচনা করে মা বললেন, "ভগবান সাক্ষী তুই যদি সেখানেই সুখী হতে পারবি বলে মনে করিস, তবে আমি তোকে ঠেকাবো না। আশীর্বাদ করি ভগবান তোর মঙ্গল করুন।"

ইতিমধ্যে কলকাতায় বেধে উঠল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। আর খবরের কাগজে খবর বেরোল, "পূর্ব-পাকিস্তানে ইসাখেলী গ্রামের স্কুল-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আসবাব-পত্র বাঁচাতে গিয়ে স্কুলের তরুণ সেক্রেটারী কামাল মির্জার শরীর স্থানে স্থানে পুড়ে গেছে। বর্তমানে তিনি চাটগাঁর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।'

এই সংবাদে মায়া ও মুকুল বিচলিত হয়ে চাটগাঁয়ে এসে হাসপাতালে কামালের সঙ্গে দেখা করল। আগের থেকেই কামালের অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। এখন মায়া ও মুকুলকে কাছে পেয়ে আর মায়ার সম্মতির কথা জানতে পেরে তার মনটাও চাঙ্গা হয়ে উঠল। কামাল ও মায়ার শুভ-মিলন হল। কামাল আর মায়া আবার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার আর জনসেবার কাজে লেগে গেল।

রাঙ্গা প্রভাতের ঘটনাপ্রবাহ সরল ও সুনির্দিষ্ট। এখানে আমরা যেন এক ব্যাপক পরিবেশে মানুষ আবুল ফজলের সাক্ষাৎ পাই। এতে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব, মানবতার তাগিদ, নতুন আদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ-- সবটা মিলে মনের উপরে বেশ একটা প্রভাব থেকে যায়। জীবন-পথের যাত্রীর মনোবিশ্লেষণ যেন মোটামুটি প্রেমিক বা শিল্পী আবুল ফজলের চিত্ররূপ। অন্যকথায়, রাঙ্গা-প্রভাতের পটভূমি জীবনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট, আর 'জীবনপথের যাত্রী'র পটভূমি মুখ্যত ব্যক্তিমানসের ব্যাপার, যদিও সঙ্কীর্ণ পরিসরে সামাজিক পটভূমিও একেবারে উপেক্ষিত হয় নি।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই দুই উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে সবিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে : মনে হয় এঁরা যেন একই ব্যক্তি। যেমন জীবন-পথের যাত্রী ব্যারিস্টার সাহেব আর রাঙ্গা প্রভাতের মির্জা সাহেব উভয়ই যেন আধুনিক জীবন-দর্শন খনিকটা মেনে নিয়েও পারিবারিক জীবনে তা যেন ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না। তবে মনে হয় মির্জা সাহেব বলিষ্ঠতার কর্মী গোছের মানুষ আর ব্যারিস্টার সাহেব মৃদুতর স্বাপ্নিক গোছের লোক। দুই জনের সন্তান-সন্ততির মধ্যে ওয়ারেশী সূত্রে পাওয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রবল ধাক্কা সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দর্শনে প্রেম ব্যাপারেও মামুন-হেনার সঙ্গে কামাল-মায়ার যথেষ্ট মিল দেখা যায়, এমনকি মামুন আর কামাল দুই জনই ঘর-পোড়া প্রেমিক, দু'জনেরই প্রেম-অভিযান সার্থকতা লাভ করেছে 'সিঁদুরে মেঘ'দেখার পরে। এই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শুধু তাহারাই সাহসিকা নয়, হেনা ও মায়াও সাহসিকা; শুধু জাফরই প্রগতিবাদী নয়; মামুন, হাসিম, কামাল-মুকুলও তাই। এদের সকলের চরিত্রেই বেশ খানিকটা অসাধারণত্ব রয়েছে। আর জাফর-তাহেরা, হেনা-মামুন, কামাল-মায়া সকলেরই রাঙ্গা প্রভাতের স্বপ্ন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এসব থেকে হয়ত সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আবুল ফজল সাহেবের আদর্শাশ্রয়ী প্রগতিবাদী মনের উজ্জ্বল চিত্র বিভিন্ন পরিবেশে তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক, ছোটগাল্পিক আর ঔপন্যাসিক আবুল ফজল ব্যক্তিগত জীবনেও তার চরিত্রগত স্নিগ্ধমাধুরী দিয়ে বহুগুণী ও ভক্তের স্নেহ, প্রীতি সম্মান শ্রদ্ধা আর ভালবাসা অর্জন করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক আর মানবিক জীবন আরও দীর্ঘায়িত হোক, ঝড়-ঝঞ্ঝাময় জীবনসংগ্রামে আরও বিজয়গৌরব লাভ করুক আমরা সকলেই তাই কামনা করি।

# বিবিধ প্রসঙ্গ

# লেখক হওয়ার পথে

কিছুদিন খেয়াল চাপল, মস্ত লেখক হব। মনে হল, কত লোকে কত ছাইভস্ম লিখে সংসারে নাম রেখে যাচ্ছে, আমিই বা কেন বসে থাকি ? আমি কি তাদের চেয়ে কম ? একটু চেষ্টা করলেই এমন সব জিনিস লিখে যাব যা দেখে জগৎ-শুদ্ধ লোকের তাক লেগে যাবে। তারা ভাববে, "হাঁ, একজন লেখক বটে।" দুই-একজন বন্ধুর নিকট কথাটা পাড়তেই তাঁরা ঐতিহাসিক দার্শনিক ও গাণিতিক যুক্তি দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণ করে দিলেন যে আমার সফলতা লাভ অবধারিত—কেবল একটু কষ্ট করে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই হয়। বন্ধুদের কথা শুনে নিজের মনেও অনেকখানি সাহস বাড়ল। মহা-উৎসাহে লিখতে বসে গেলাম। কিন্তু কি লিখি, এই হ'ল প্রথম সমস্যা। বন্ধুরা বলেছিলেন, "মনে যা আসে তাই লিখে যেয়ো, সেইটেই হবে ভাষা, আর মনের কথার স্বাভাবিক প্রকাশেই হবে সরস সাহিত্য।" আমি ভেবেছিলাম, "মনে ত কত কথাই আসে ; সেই মনের কথা অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা কষ্টকর হতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করব এতে আর কষ্টটা কি ? কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ভয়ানক খট্‌কা বেধে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম মনের কথা গদ্যে আসে না পদ্যে আসে। চোখ বুঁজে আমার মনের কথা ভাবতে লাগলাম, কিন্তু সে-কথা গদ্যেও এলো না পদ্যেও এলো না। কি সাংঘাতিক ! গদ্যও নয় পদ্যও নয়, তবে মনের কথা লিখব কিসে ? বন্ধুদের শরণাপন্ন হ'লাম। তাঁদের ভিতরেও মতের ঐক্য দেখলাম না। কেউ বললেন, "মানুষের আদিম ভাব, আবেগ-উৎকণ্ঠা, প্রেম-প্রীতি সব, সঙ্গীত ও কাব্যেই রচিত হয়েছে। সুতরাং মনের কথা সঙ্গীত ও কাব্যের ভিতর দিয়েই আসতে বাধ্য।" কেউ বললেন ঠিক তার উল্টো। আমি দেখলাম, এর যখন মীমাংসা হ'ল না, তখন দুটিকেই trial দেওয়া উচিত।

পদ্য লিখব বলে স্থির করলাম। যখন দেখলাম মনের ভিতরে কিছুতেই সঙ্গীত আসে না, মিল ও ছন্দ আসে না, তখন হঠাৎ এক ঝলক inspiration আসায় বুঝতে পারলাম—সাধনা চাই। অমনি সাধনায় লেগে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের মত চুল রাখলাম, শেকস্‌পিয়ারের মত গোঁফ ছাঁটলাম, দান্তের মত টুপী মাথায় দিলাম, ওমর খাইয়ামের মত আলখেল্লা পরলাম, আর নজরুল ইসলামের মত মার্চ করে হাঁটা অভ্যাস করলাম। বাল্মীকি-বেদব্যাস, কালিদাস-ভবভূতি, টেনিসন-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বিটোভো-মোজার্ট; হোমার-ভার্জিল, জামি-ফেরদৌসী, সাদী-হাফেজ, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, খসরু-তানসেন, ইব্রাহিম-ফারাবী প্রভৃতি যত কবি ও সঙ্গীতকারদের নাম জানা আছে, সকলের ফটো কিনে এনে উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বেঁধে ঘরে লটকিয়ে দিলাম। দুপুর রাতে উঠে ছাদে গিয়ে চাঁদের দিকে, উন্মুক্ত আকাশের দিকে, এবং ঝিকিমিকি তারকার দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগলাম। দিবসে কোকিলের ডাক শুনবার জন্য আম্রবনে, নদীর কল-নাদ শুনবার জন্য পদ্মাতীরে, এবং মরালগতি ও গজেন্দ্র-গমন দেখবার জন্য মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেতে আরম্ভ করলাম। শুধু তাই নয়, খবর পেলেই সঙ্গীতের জলসায়

যেতাম, কবিতার বইএর নাম শুনলেই কিনে আনতাম, আর চুলের ভিতর অঙ্গুলিচালন, করতলে গ্রীবা-সংরক্ষণ, গৃহমধ্যে মুদিত চক্ষে পায়চারীকরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে মনের ভিতর কাব্য-ভাব জাগরণের চেষ্টা করতে লাগলাম।

এত করেও কিন্তু কবিতায় ভাবতে পারলাম না। কেবল দুই-একদিন স্বপনে দেখতাম যে অনর্গল কবিতা আউড়িয়ে চলেছি। সে কি তীব্র আনন্দ। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, প্রেমের কবিতা, গজলগান, খণ্ডকাব্য কিছুতেই আটকাতাম না। কিন্তু হায়, জেগে উঠে তার কিছুই মনে থাকত না। স্বপনের কথা বেঁধে রাখবার জন্য আকুল প্রার্থনা করতাম, পেন্সিল হাতে নিয়ে, খাতা খোলা রেখে নিদ্রা যেতাম ; কিন্তু রহমান কিছুতেই কৃপা করলেন না। আর আল্লাকেই বা বৃথা দোষ দিই কেন? তিনি এইটুকু জানিয়ে দিলেন যে, মনের কথা স্বপনেরই মত—অস্পষ্ট, অ-কায়া ; মনের ভিতর উঁকি মারে, খেলা করে, আর মিলিয়ে যায়। ঠিক মনের কথাটা—তার আবেগ, ব্যাকুলতা ও গভীরতা—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভাব অসীম, আর ভাবাধার ভাষা সসীম। ভাবের এত বিভিন্ন স্তর আছে, মনের এত অসংখ্য mood বা সাময়িক অবস্থা আছে, যে ভাষার মার্কামারা একটা কথা কখনও মনের কথার ঠিক প্রতিবিম্ব হ'তে পারে না। তবে এরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, পাঠক ভাষাকে নিজের মনের রঙে রঞ্জিত করেই গ্রহণ করে। তা'তে ভাষার দৈন্যর অনেকখানি পুষিয়ে যায়।

সে যাই হোক, এইবার আমার ইতিহাস আরম্ভ করি। ইতিপূর্বে যে কবিতায় ভাববার চেষ্টা করছিলাম, এখন তা' নিষ্ফল বলে ছেড়ে দিয়ে এখন থেকে মনের ভাবকে যতদূর সম্ভব কবিতার আকারে কায়া দিবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বহু কষ্টে ৪/৫ টা কবিতা লিখেও ফেললাম। নিজের কাছে মন্দ লাগল না, বন্ধুরাও বললেন "চমৎকার হয়েছে।" এতদিনে কিন্তু বন্ধুদের কথায় আমার বিশ্বাস কমে আসছিল ; সুতরাং একদিন গোপনে এক বিখ্যাত কবির নিকট গিয়ে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কবিতাগুলো দেখে দিতে অনুরোধ করলাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর ভাব দেখে বুঝলাম, তিনি আমার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছেন। অবশেষে তিনি বললেন, "ছোক্‌রা, তোমার দুরাশা ত কম নয়! এই বয়সে তুমি কবিতার কী বুঝবে? তোমার সে experience কোথায়? তুমি কী দেখেছ, আর কতটুকুই বা অনুভব করেছ? কবিতা লিখতে হ'লে সমগ্র বিশ্বের সহিত সহানুভূতি চাই, সুন্দরের অনুভূতি চাই, আর কল্পনাবলে সাধারণ জগদ্ব্যাপারের ভিতর অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার পটুতা চাই।" আমি বিনীতভাবে নিবেদন করলাম, "আপনি ঠিকই বলেছেন। সত্যি-সত্যিই কবিতা লিখবার মত আমার কোন যোগ্যতাই নাই।" এতে তিনি একটু প্রসন্ন হয়ে বললেন, "আচ্ছা বাবা এসেছ ত ওই টুলটা টেনে নিয়ে বসো। দেখ, শাস্ত্রে বলে, সাধনায় সিদ্ধি। কথাটা বড় খাঁটি ; কিন্তু কারও কাছ থেকে উপদেশ না নিয়ে আন্দাজে সাধনা করলে কোন ফল হয় না। আমার কাছে তোমার মত অনেক ছেলে-ছোকরার দলই এসে থাকে ; তাদের মধ্যে দুই-চার জনকে একটু গড়ে-পিটে মানুষও করেছি। তোমাকেও দুই-একটা উপদেশ দিই, সেগুলি মনে রাখলে তোমার কবিতা লেখার বিশেষ সাহায্য হবে।" এই বলে তিনি মস্ত 'সিগার' জ্বেলে বেশ আরাম করে টান্‌তে টান্‌তে বলতে আরম্ভ করলেন, "প্রথমে ছন্দের দিকে লক্ষ্য কর ; পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত, তোটক, একাবলী, ভুজঙ্গ, প্রয়াত, শার্দুল-বিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি নানা প্রকার ছন্দ আছে।" তারপর নিজের কবিতা থেকে উদাহরণের পর উদাহরণ উদ্ধৃত করে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা

করলেন। আমি এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না। তবে, আমি বুঝতে পারছি কিনা, এমন কি শুনছি কিনা, এ দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য করলেন না, তাই রক্ষে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এত-সব ছন্দ-টন্দ আমার আসবে না ; আমি সোজাসুজি অমিত্রাক্ষর চালাব, সব লেঠা চুকে যাবে। যা হোক, ছন্দ-পর্ব শেষ ক'রে বলতে লাগলেন, "তারপর কবিতার ভাব বা বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য কর। সবই ত প্রায় হৃদয়-বৃত্তি নিয়ে কারবার, তার মধ্যে আবার প্রেমের প্রাধান্য। সুতরাং ভাল কবি হ'তে হলে অবশ্য কারও প্রেমে পড়া চাই। বাছা বাছা কবিতার মধ্যে দেখতে পাবে, পুরুষ যেন নারীর স্তব-গান করছে। বেশী কবিতা পড়লে অনেক সময় মনে হয়, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেন নারীর মনস্তুষ্টির জন্যই আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করছে। স্বভাব-বর্ণ, আদর্শ অঙ্কন এবং যাবতীয় সৌন্দর্য-সৃষ্টির মূলে যেন এই আদিম প্রবৃত্তিটিই প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি মারছে। এইজন্যই ত শাস্ত্রে আদিরসকে রস-শ্রেষ্ঠ বলেছে।" আমি বললাম, "ভাল করে বুঝতে পারছি না।" তিনি বললেন, "তা ত আগে থেকেই জানি। বুঝবার দরকার নাই ; গম্ভীর বিষয় আলোচনা হচ্ছে, চুপ করে শোন। এসব কথার ঝঙ্কার তোমার কানে থেকে যাবে ; তারই অস্পষ্ট প্রতিধ্বনিতে তোমার ভিতরকার কাব্য-লক্ষ্মী চেতনা লাভ করবেন। হাঁ, আমি বলছিলাম, মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক, তার নিজের চিত্তের রহস্যময় সৌন্দর্যকে সে বাহ্য জগতে প্রক্ষিপ্ত ক'রে নারীরূপে, স্বপ্নরূপে, কল্পনারূপে অগণ্য মায়ামূর্তির সৃষ্টি ক'রে উপভোগ করে। মোটের উপর সে নিজেই নিজেকে ভোগ করে। তুমি ছেলে মানুষ, এসব কথা বুঝবে না। এইবার কবিতাকে সরস ও পল্লবিত করবার দুই-একটা কৌশলের দিকে লক্ষ্য কর। আমি খুব practical উপদেশ দিচ্ছি যা' অতি সহজে কাজে লাগাতে পারবে। কতগুলো খুব বাছা বাছা কোমল ও সমিল শব্দ, উপমা, রূপক, ফুলের নাম, পাখীর নাম প্রভৃতির একটা লিষ্ট করে সর্বদা সামনে রাখবে, আর সেগুলির সমাবেশ সন্নিবেশ করে এমনভাবে লাগাবে যে অন্যের কাছ থেকে চুরি করলেও তা যেন কেউ ধরতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ, তুমি যদি কোনদিন চকোর না-ও দেখে থাক, তবু স্বচ্ছন্দে তাকে দিয়ে চাঁদের সুধা আকণ্ঠ পান করাতে পার ; মালতীফুল চেন আর নাই চেন যথেচ্ছা-মত যে-কোন ঋতুতে তার সৌরভ ছুটাতে পার ; যদি মৃণাল-ভুজ অথবা বঙ্কিম গ্রীবা তোমার মনোমুগ্ধকর নাও হয়, এমন কি তা যদি তোমার কাছে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলেও মনে হয়, তবু আর্টের খাতিরে অসঙ্কোচে রূপবর্ণনায় ও-সব phrase ব্যবহার করবে। তা'হলে কবিতার চমক বাড়বে। খবরদার, নিজের মন থেকে উপমা গ'ড়ে লাগাতে গিয়ে যেন হাস্যাস্পদ হয়ো না।" ইত্যাদি—

কবিবরের গম্ভীর আলোচনা ও উপদেশ শুনে আমি বাস্তবিকই গম্ভীর হয়ে গেলাম। সেইদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর না। এত কৃত্রিমতা আর ফাঁকি আমার দ্বারা চলবে না। কবিবরকে নমস্কার করে বাসায় ফিরলাম। সেই সঙ্গে কাব্য-লক্ষ্মীকেও বিদায় দিলাম।

এরপর থেকে স্থির করলাম গদ্যেই সাহিত্য রচনা করব। তাতে পয়ারের মত অক্ষর গোণাগুণি নাই, আর সনেটের মত লাইন গুণে নিখুঁৎ form বজায় রাখার হাঙ্গামাও নাই।

গদ্যে 'সাহিত্য-রচনার' মানে উপন্যাস লেখা কি না, ঠিক বলতে পারি না ; কিন্তু কেমন করে যেন ঐ রকম একটা ভাব আমার মনের কোণে জাগছিল। তাই উপন্যাস লিখবার দিকেই সকলের আগে মনোনিবেশ করলাম। এইখানে বলে রাখা উচিত যে ছেলেবেলা উপন্যাসের প্রতি আমার এক স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। যদিও আমি শিশুকালে দাদী-নানীর কাছে ভুরি ভুরি

রূপকথা ও উপকথা শুনেছি এবং সেগুলি রীতিমত উপভোগ করতাম বলে এখনও স্পষ্ট মনে আছে, তবু একটু বড় হয়ে মাসিকের পৃষ্ঠায় ক্বচিৎ যখন দুই একটি গল্প বা উপন্যাস পড়তাম তখন পাঠান্তে সর্বদাই আমার মনে কেমন এক রকম অনুশোচনার ভাব আসত—মনে হ'ত, বাজে আমোদের জন্য এই সব রাবিশ পড়ে সময়টা কেন নষ্ট করলাম ? এ সময়টা যদি কোন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, স্বাস্থ্য-নীতি, দেশের আর্থিক-সামাজিক-নৈতিক সমস্যার আলোচনা পাঠ করতাম তা' হলে অনেক বেশী উপকার হ'ত ! তা' ছাড়া আমি ক্রমান্বয়ে যেন একটু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হয়ে পড়ছিলাম। রূপকথাকে মিথ্যা জেনেও (শিশুদের কল্পনা-বিকাশের জন্য তার কিছু উপযোগিতা আছে বলে, এবং সে-সময় শিশুদের হাল্‌কা জিনিসেরই প্রয়োজন, এই মনে ক'রে) কোন রকমে ক্ষমা বা উপক্ষো করতে পারতাম ; কিন্তু তাই বলে আগাগোড়া মিথ্যা গল্প ও উপন্যাসকে কেমন ক'রে ক্ষমা করা যায় ? দেশ-শুদ্ধ লোকে এই ভয়ানক মিথ্যাকে কেন যে সহ্য করছে, এমন কি উৎসাহিত করছে, তা' ভেবে আমি অবাক হয়ে যেতাম ! ক্রোধের উদ্রেক হ'ত কিন্তু প্রয়োগ করবার পাত্রের অভাবে সে-ক্রোধকে হজম করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু পরে ভাল ভাল দুই-একখানা ইংরাজী ও বাংলা নভেল পড়ে আমার এ-ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। তাদের বইতে দেখতে পেলাম, ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান সমস্তই কাল্পনিক হলেও, মোটের উপর তার ভিতর দিয়ে যে মূল কথাগুলো বলা হয়েছে, তা স্বাভাবিক, সুন্দর এবং অতীব সত্য ! এমন কি, মানবজীবনের কর্ম কোলাহলের ভিতরকার অনেক মিথ্যা ও অস্পষ্টতার ভিতরকার যে চিরন্তন সত্যবাণী তাই যেন তাঁদের লেখায় ফুটে বেরুচ্ছে। তাঁদের লেখা যেন অনেক সময় অগ্রবর্তী হয়ে মানব-জীবনের ধারা অর্থাৎ কর্ম পথ নির্দেশ করছে। এই-সমস্ত দেখে নভেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কিন্তু আমি সেরূপ পবিত্র সাধনা, অতটা দিব্য দৃষ্টি কোথায় পাব ? ভবিষ্যতে যদি কোনদিন অতটা অভিজ্ঞতা বিশ্বজগতের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি এবং গভীর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার সহিত কল্পনা-শক্তি জাগে, তখন নভেলে হাত দিব মনে করে আপাততঃ নভেল লেখার সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম।

কতকটা পূর্বোক্ত কারণে নাটক লেখার আশাও আপাততঃ ছেড়ে দিলাম। তা' ছাড়া পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়ে যদি চরিত্র-বিশেষের প্রতি অবিচার ক'রে বসি তবে তাঁর মৃত আত্মা আমার স্কন্ধে ভর ক'রে নাকানি-চুবানি খাওয়াবে এ ভয়ও ছিল। কাজে কাজেই দুই-একটা ছোটগল্প লিখে ছাপলাম। মনে হ'ল এইবার বুঝি সাহিত্যে আমার প্রকৃত পথ বেছে নিয়েছি। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলাম, আমি নিজের অজ্ঞাতসারে কোন কোন জীবন্ত ব্যক্তির প্রতি অবিচার করেছি ! কয়েকজন ভদ্রলোক এসে বলে গেলেন, 'মশায়, আপনি বেশ গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছেন দেখছি ! নাম ভাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের কথা প্রকাশ করবার আপনার কি অধিকার আছে ? এইভাবে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কি রকম ভদ্রতা, তা'কি একবার ভেবে দেখেছেন ?" তাঁরা আরও বলে গেলেন, মুখের কথায় নিরস্ত না হ'লে কোর্ট করবেন। আমি ভাবলাম, এর চেয়ে বোধ হয় স্বর্গগত আত্মার বিরাগভাজন হওয়াও নিরাপদ ছিল! যা'হোক, অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেও যখন ভদ্রলোকদের থামাতে পারলাম না, তখন অগত্যা ছোটগল্প লেখাও ছেড়ে দিলাম।

ইতিহাস লিখতে গেলে ভয়ানক খেটেখুটে পড়া দরকার। তা' ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বই ঘাঁটলেও এবং ভূগর্ভ থেকে সমস্ত অনুশাসন ও তাম্রলিপি খুঁড়ে বের করলেও, যথাযথ

ইতিহাস লিখতে পারব কিনা এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হওয়ায়, ও-চিন্তাই আর মনে স্থান দিলাম না।

এইবার বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, বিজ্ঞান ত অনেকটা exact knowledge, তুমি বিজ্ঞান লেখ না কেন ? বিজ্ঞানের theory দিন দিন বদলাচ্ছে, তবু বৈজ্ঞানিকগুলো প্রাণপণে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছে বলে, বিজ্ঞানের প্রতি আমার এক স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল ; কিন্তু কোন আকর্ষণ ছিল না। বিশেষতঃ বিজ্ঞান এসে সাহিত্যে ভাগ বসাবে, এটা আমার কাছে অসম্ভব বোধ না হ'লেও সাহিত্যের আভিজাত্যের হানি হবে এই ভয়ে বন্ধুদের কথার আমল দিলাম না। তখন তাঁরা বললেন "আচ্ছা, তোমার ত বেশ চোখা-চোখা কথা আছে—সমালোচনা-সাহিত্যে নাম করতে পারবে। বিশেষ কিছু পড়তেও হবে না, কেবল একধার থেকে বিদ্রূপ আর নিন্দা করবে। কাউকে হঠাৎ প্রশংসা ক'রে নিজেকে খেলো করো না। কারণ তোমার প্রশংসিত বিষয় যদি অন্যে নিন্দে করে তবে তোমার মান থাকে কোথায় ? আর তোমার নিন্দে করা বিষয় যদি অন্যে প্রশংসা করে, তবে প্রমাণ হবে, তোমার রুচি এবং ভালমন্দের মাপকাঠি সাধারণের চাইতে অনেক উচ্চ। যেটা নেহাৎ বেশী ভাল লাগে, সত্যের খাতিরে সেটাকে না-ভাল না-মন্দ করে রেখে দিও ; তাহ'লে সুবিধা মত যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে। তা'হলে দেখবে কত লোকে তোমার কাছ থেকে একটা অনুকূল সমালোচনা পাবার জন্য তোমাকে খোসামোদ করবে। দেখ দাদা, এমন সুযোগ হেলায় নষ্ট করো না ?" আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, "তোমরা আমাকে পেয়েছ কি ? না পড়ে সমালোচনা করা তোমাদের মতে impartial হতে পারে এই হিসাবে যে সকলের ভাগ্যেই প্রায় সমান নিন্দে পড়বে। কিন্তু আমি এভাবে সাহিত্যের আদর্শকে খর্ব করতে পারব না। সমালোচনা কোন নূতন সৃষ্টির গৌরব করতে পারে না, এতে যতই কৃতিত্ব থাক সেটা বড় জোর অন্যের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য আবিষ্কার মাত্র।"

এই কথায় বন্ধুরা রেগে অভিসম্পাৎ দিয়ে গেলেন, "তোর কোন জন্মে কিছু হবে না। খুঁৎ-খুঁতে হ'লে কখনও কিছু লেখা যায় ? কেবল আদর্শ, আদর্শ, আদর্শ। তুমি যদি মনে কর যে জগতকে তোমার কোন কথা বলবার আছে, আর সেজন্য যদি যথেষ্ট প্রেরণা অনুভব কর, তবেই লিখতে পারবে। নইলে শুধু বাতিকগ্রস্তের মত লেখক হব লেখক হব বলে কল্পনায় নিজেকে মস্ত বড় লেখক ঠাওরানোর কোন অর্থ নাই।"

আমার বন্ধুরা খোস-মেজাজে থাকলে প্রায়ই আমার মতে মত দিয়ে বাহবা দিতেন; কিন্তু এঁরা রাগের মাথায় আজ যে সত্যটা বলে গেলেন, তা' আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। আমি দেখলাম, সত্যি সত্যিই প্রাণের ভিতরে তেমন প্রেরণা আসে নাই, আমার লেখক হওয়ার খেয়াল একটা বিলাস মাত্র। তা' ছাড়া জগতকে বলবার এবং দিয়ে যাওয়ার মত সত্যই আমার কিছু আছে কি না, এ-বিষয় অভিনিবেশ করে বুঝতে পারলাম, জগতের জ্ঞানসমুদ্রের বিন্দুপরিমাণ জ্ঞানও আমার নাই, তা' ছাড়া এত 'মহাজ্ঞানী মহাজন' এত সত্য উদ্‌ঘাটন ও প্রচার ক'রে গিয়েছেন যে নূতন সত্য আবিষ্কার করা, ধরতে গেলে, অসম্ভব। কিন্তু এ-চিন্তায় আমাকে ততটা বিচলিত করতে পারল না—কারণ দেখলাম, আমার নিজের মনের রঙে রঞ্জিত হ'লে, পুরাতন সত্যও এমন একটা বিশিষ্টরূপ নিতে পারে যা" পুরাতন হয়েও নতুন। কিন্তু বাস্তবিক আমার মনের কোন সত্যিকার বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, না আমি গতানুগতিক ভাবে জন-স্রোতে গা ভাসিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে "চিত্তদুয়ার বন্ধ রেখে" তৃণের ন্যায় ভেসে চলেছি

এই হল আসল প্রশ্ন। আমি কোন দিন কোন বড় লেখকের ভাষা বা style নকল করতে গিয়েছি বলে মনে পড়ে না, আর আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু একবার বলেছিলেন, আমার ভাষায় নাকি একটু বিশিষ্ট ভঙ্গী এবং প্রাণের একটু ক্ষীণ স্পন্দনের আভাস লক্ষিত হয়—এখন সঙ্কটকালে এই দুটি কথা স্মরণ হওয়াতে একটু সান্ত্বনা পেলাম।

প্রথম জীবনে পড়াশুনা বিশেষ করি নাই ; কারণ, আমার ধারণা ছিল, আমি মস্ত বড় genius, পড়াশুনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া পড়াশুনা করলে মৌলিকতা নষ্ট হবে, এই ছিল মস্ত ভয়। শেষে যখন দেখলাম, পড়াশুনা না করাতে আমার বলবার কথা প্রায় কিছুই নাই, এবং কোন কথা বললেই পড় য়ারা তৎক্ষণাৎ সেটাকে হয় অযথার্থ, নয় চুরি বলে প্রমাণ ক'রে দেন, তখন বাধ্য হয়ে genius-এর অভিমান ত্যাগ করে পড়াশুনায় মন দিলাম। তাতে বিস্তর জ্ঞান লাভ করলাম এবং অনেক বিষয় নতুন নতুনভাবে ভাবতে শিখলাম। বাস্তবিক, আমার অনেক চিত্ত-বৃত্তি আশ্চর্যরূপে পরিপুষ্টি লাভ করল। এইবার আমি লেখকের বদলে শুধু পাঠক হয়েই অত্যন্ত তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করলাম। নতুন নতুন ভাব, নতুন নতুন interpretation আমাকে মুগ্ধ করতে লাগল। নতুন চিন্তা, নতুন সভ্যতা, মানুষের নব নব প্রয়াস চোখে পড়াতে মানুষের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং নতুন-পুরাতন সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা সহানুভূতি জন্মে গেল, আর সমস্ত জগতের সঙ্গে নিজেকে এবং নিজের সমাজকে যুক্ত ক'রে দেওয়ার জন্য একটা প্রেরণা জাগল।

এই ভাবে আমার সামাজিক প্রবন্ধ লেখার সুত্রপাত হ'ল। অবশ্য, সেটা কতকটা সমালোচনা অর্থাৎ আমরা কোথায় আছি তাই বুঝাবার চেষ্টা, এবং কতকটা suggestion বা পথ নির্দেশের ইঙ্গিত। কিন্তু ফলে "উল্টো বুঝলি রাম" হয়ে দাঁড়াল। সমাজপতিরা বললেন, আমি হীন নিন্দাবৃত্তি অবলম্বন করেছি, এবং সমাজকে ধ্বংস ক'রে বিশৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করছি। যে বিশৃঙ্খলা আনবার ভয়ে (অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত যুবকদের সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে, এই ভয়ে) রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই নাই, ছাত্রদের ধর্মঘটে উৎসাহ দিই নাই, শেষে কিনা সেই বদনামই ঘাড়ে করতে হ'ল !

আমি বললাম, 'দেখুন, আমাদের সমাজ কত অশিক্ষিত, সব বিষয়ে কত পিছিয়ে আছে, এরা কিছু বুঝতে চায় না, চোখমেলে দেখ্‌তেও চায় না, তাই আমি বন্ধুভাবে এদের একটু বুঝাতে চেয়েছি মাত্র। এরা অন্ধশক্তির বলে যে দিকে চলেছে বা চালিত হচ্ছে সে পথের বিপদ এরা ঠিক দেখতে পাচ্ছে না, তাই এদের জন্য একটা ক্ষীণ জ্ঞানের শিখা জ্বেলে দিতে চাচ্ছি।" সমাজপতিরা বললেন, "ফেলে রাখুন আপনার জ্ঞানের কথা—ওসব খেরেষ্টানী মত এখানে চলবে না। আপনার জ্ঞান নিয়ে আপনি স্বর্গে যান, তাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সনাতন সমাজ, যার প্রতি অঙ্গ ধর্মের স্পর্শে সুপবিত্র, আর ধর্মের শাসনে সুসংবদ্ধ, সে সম্বন্ধে আপনার মত-ফরাক্কা কথা বলে লোকের মনে সন্দেহ জাগাতে চেষ্টা করছেন কেন, তার কৈফিয়ত চাই।" আমি বললাম, "ধর্ম মানুষের হৃদয়ের পরতে পরতে এমন ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে যে, তাকে মুছে ফেলবার মত ক্ষমতা কারই নাই। তবে ধর্ম যদি জীবন্ত হয়, তা'হলে প্রত্যেকের অন্তঃকরণে তার বিকাশ ও পরিণতি হওয়াও স্বাভাবিক, কেউ তা' রোধ করতে পারবে না। আর আপনারা যে, ধর্মকে সমাজের কোঠায় টেনে এনে ধর্মের পরিধি বাড়াতে চাচ্ছেন, এটা বড় জবরদস্তি হচ্ছে। এইরূপে আপনারা সমাজের সর্বাঙ্গে ধর্মের পোঁচ লাগিয়ে শেষে ধর্মের দোহাই দিয়ে, ফলতঃ, সমাজকে মেজে

ঘষে পরিষ্কার করবার পথে বাধা দিচ্ছেন, এটাও ভয়ানক।" তাঁরা এবার গৰ্জ্জন করে বলে গেলেন, "হাঁ, বুঝেছি আপনি নতুন সমাজ গড়তে চান, ধর্মকে বাদ দিয়ে ; আর গা ঢেলে দিতে চান, সেই অন্যায় সমাজের বীভৎস পাপস্রোতে। আপনার মত নাস্তিক কাফেরকে ধিক্, শত ধিক্। আপনার সঙ্গে কথা বলাতেও পাপ আছে।" এই বলে তাঁরা যুদ্ধ-জয়ীর মত বিজয়-গর্বে প্রস্থান করলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল খবরের কাগজে "দজ্জালের আবির্ভাব" বলে মোটা হেডিং দিয়ে প্রবন্ধ বের হয়েছে। আগে হ'লে হয়ত এই ঘটনার পর সামাজিক প্রবন্ধাদি লেখা ছেড়ে দিতাম কিন্তু এখন আর তা' পারলাম না—আমার চিন্তা কর্ম এবং লেখা যেন জীবনের একটা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। এতে সফলতা লাভ যতটা হোক না হোক একটা আদর্শ অনুসরণের সহজ আনন্দ যেন পেতে লাগলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট আশা রইল যে, আজকার ক্ষীণ আলো ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয় ক'রে যখন প্রখর সূর্যে পরিণত হবে, তখন আর তাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারও থাকবে না।

# ঔপন্যাসিক

খেয়াল হ'ল নাম করব। এ খেয়াল কার না হয় ? কিন্তু ভেবে দেখলাম তাজমহল গড়া, ট্রয় ধ্বংস করা, ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা, উত্তর-মেরু আবিষ্কার করা, কোটি কোটি টাকা দান করে দেওয়া, রাজ্য ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া, ধর্মার্থে পুত্র হত্যা করা, পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া বা পোষাকের একটা নতুন ফ্যাশানের প্রচলন করা—এসবই আমার সাধ্যাতীত। বেহেশ্‌তের কুঞ্জি হয়, ভগবানের নামের চরকী হয়, Algebra Made Easy হয়, আর যশেরই কি একটা short-cut হয় না ? হয় বৈ কি ? আমি বই লিখব।

লিখতে গেলাম কবিতা, কিন্তু মিল বা ছন্দ কিছুই এলো না। তাই নিরুপায় হয়ে গদ্য লিখতে শুরু করলাম। আলোচনা, সমালোচনা, ছোটগল্প, সামাজিক প্রবন্ধ অনেক-কিছু লিখে নতুন সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলাম। আর যেগুলো সম্পাদকেরা ভুল বুঝে বা বুঝতে না পেরে (নিতান্ত অন্যায় ক'রে) ছাপাতে অস্বীকার করলো, সেগুলো কেবল আশে-পাশের বন্ধুদের শুনিয়েই ক্ষান্ত হলাম না, ডাকযোগে দূরস্থ বন্ধুদের কাছেও পাঠিয়ে দিলাম। আর তাদের কাছে বিশেষ করে লিখে দিলাম, "দেখ, আমাদের দেশের সম্পাদকেরা কি গাধা ; না আছে একটু রসবোধ, না আছে একটু সৌজন্য। দেশের দুর্দশা কি সাধে হয় ? এইসব কারণেই হয়।"

মোটের ওপর, মনটা প্রসন্ন হ'ল না। দেখলাম, যশোলাভ যতটা হওয়া উচিত এই অভাগা দেশে জন্মেছি ব'লে তার দশাংশের একাংশও হচ্ছে না। অনেক বার ভেবেছি, দেশ ত্যাগ করে যাই, কিন্তু হাজার হলেও দেশের মায়া তো ? এ কি সহজে কাটান যায়? তা ছাড়া একদিন লোকে বলতেও পারে যে, এই লোকটা ইচ্ছে করলেই দেশ ছেড়ে গিয়ে প্রভূত যশ উপার্জ্জন করত পারত, কিন্তু ধন্য এর স্বার্থত্যাগ ; দেশে বসে বসে শত অনাদর-অবহেলা সহ্য করেও, দেশের উন্নতির জন্য জন্মভূমিতেই পড়ে রইল।

যা'হোক, যশোলাভের একটা শেষ চেষ্টা করবার জন্য নিজের style টা সম্পূর্ণ বদলিয়ে এবার উপন্যাস লেখা শুরু করলাম। আগে বিশ্বাস ছিল, ভাবকে সরল ও যথাযথভাবে প্রকাশ করাই শ্রেষ্ঠ ভাষার লক্ষণ। আমার লেখাগুলির আদর না হওয়াতেই বুঝতে পারলাম ভাষা সম্বন্ধে নিজের ধারণায় স্থির থাকলে লোকের মনঃপূত হবে না—আর লোকের মনঃপূত না হ'লে যশোলাভের আশা কোথায় ? তাই এবার সহজ কথাকে এমন-ভাবে ঘোরালো ক'রে মার্জ্জিত ক'রে লিখতে আরম্ভ করলাম যে, আমার আসল বক্তব্যটা কী সে সম্বন্ধে শুধু পাঠকদের নয়, মাঝে মাঝে আমারও মনে খট্‌কা বাধতে লাগ্‌লো। অনেক লোকের তাক্ লেগে গেল, তারা আমার বিদ্যে-বুদ্ধি, বিশেষ করে প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠলো। বুঝলাম, এই ঠিক হয়েছে, জগতের নিয়মের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে। মনের কথা যে মূর্খ ফস্ করে সোজাভাবে বলে ফেলে তাকে লোকে বর্বর বলে। সভ্য ভাষার লক্ষণ মনের কথাটা গোপন ক'রে প্রকাশ করা। তাতে প্রকাশ করাও হয়, রূঢ়তা থেকেও বাঁচা যায়। সভ্যভাবে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অপমান করলেও তা দূষণীয় নয়। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে সত্য কথা বলাও অমার্জ্জনীয়

অপরাধ। আর এক কথা—যা সহজে বোঝা যায়, সবাই ভাবে যে-কেউ ইচ্ছে করলেই ও-রকম লিখতে পারে ; কিন্তু যা বুঝতে কষ্ট হয়, লোকে তাকে কষ্ট ক'রেই বোঝে এবং সেইজন্যই তাকে শ্রদ্ধা করে।

Style টা দুরস্ত করে নিয়ে এমন একখানা উপন্যাস লিখলাম, যাতে সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় (এতকাল ধরে যা' কিছু লক্ষ করেছি) ঠিক যেমনটি ঘটে, তেমনি করেই বর্ণনা ক'রে গেলাম। বোধ হয় সত্যনিষ্ঠা জিনিসটা আমার মজ্জাগত দোষ। তাই, জাজ্বল্যমান মিথ্যা আদর্শ বা ভাব-প্রবণতার আতিশয্য প্রকাশ করা থেকে বিরত রইলাম। সম্পাদক ও প্রকাশকদের ওপর নির্ভর না ক'রে এবার নিজের খরচায় বইখানা ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম। সমালোচনায় কেউ বললেন, "পৃথিবীতে যে জিনিসটি যেমন ক'রে ঘটে তা' ত সবাই দেখছে, তা লেখায় আবার বাহাদুরী কি ? ঘাসের সবুজতাকে আর একটু সবুজতর ক'রে, বাতাসের আকুলতাকে আর একটু আবেগ-বিহ্বল ক'রে, সমুদ্রের ভীষণতায় একটু আনন্দ-ভৈরবের নৃত্য-দোদুলতার যোজনা ক'রে দিতে না পারলে আবার সৃষ্টি কিসের ?" কেউ বললেন, "শুধু ঘটনার ওপর ঘটনা গেঁথে যাওয়া, সে ত ইটের পাঁজা সাজানো ! তাতে বিশাল-বিপুল চিত্ত কই ? মনোবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব, হৃদয় বৃত্তির সুনিপুণ বিশ্লেষণ, এসব কই ? ইট যদি বা সাজানো হ'য়েছে, তাতে সংহতি বাঁধে নাই।" কেউ বললেন, "সংসারে যা কিছু ঘটে, সবই কি লিখতে হয় ? মনে যা' কিছু আসে সবই কি বলতে হয়, না করতে হয় ? মোটকথা, লেখক অনেক স্থলেই ভদ্রতা ও সুরুচিকে অতিক্রম করছেন। লেখার উদ্দেশ্য, আনন্দের ভিতর দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে লোকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়তা করা। পাপ-প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ছিদ্র ক'রে তার বীভৎসতা প্রদর্শন করা কখনই সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়।" আবার কেউ কেউ লিখলেন, "উপন্যাস তো অত্যন্ত হাল্‌কা ব্যাপার ; দুপুর বেলা গৃহস্থ বউদের সময় কাটানোর জন্য এবং রাত্রে কলেজের বিনিদ্র ছাত্রের নিদ্রাকর্ষণের জন্যই বিশেষভাবে রচিত। একটু মজাদার হ'লেই যথেষ্ট, এ নিয়ে আর গম্ভীর তর্ক-আলোচনা কেন ? ভিতরকার ব্যাপারটা যত বেশী মিথ্যা, আজগুবি ও হাল্কা হবে, উপন্যাস ততই বেশী কৌতুকপ্রদ হ'য়ে সময় কাটানো ও নিদ্রাকর্ষণের পক্ষে বেশী উপযোগী হবে। রূপকথা ও ডিটেকটিভ গল্পই ভাল উপন্যাসের আদর্শ। আসল কথা, উপন্যাস হ'চ্ছে রস-রচনা—রসিক লোক বেছে বা'র করবার chemical re-agent. আলোচ্য পুস্তকখানিতে হাল্কা রসের আমেজ থাকলেও মিথ্যারস ও আজগুবি রসের অভাব থাকাতে আমরা একে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করতে পারলাম না।"

আরও অনেক জনে অনেক রকম সমালোচনা করলেন ; সে-সব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আমার পক্ষে সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা হলেও, আর সকলের কাছে বিরস লাগারই সম্ভাবনা। যা'হোক আমি নানা প্রকার সমালোচনায় দিশাহারা হয়ে অবশেষে বন্ধুদের শরণাপন্ন হ'লাম। তাঁরা বললেন, যশোলাভ করতে চাও তো রস-রচনা কর। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে style-এর বাহাদুরীতেই লেখায় রস সঞ্চার হয় না। আগে মানুষটি তৈরী হয় ; তার হাত থেকে যা' বেরোয়, তাই হয় style. মানুষটি তৈরী হওয়ার আগে যে style হয়, তার নাম অনুকরণ। সংসারেও ত এই দেখা যায়। যার মনে আভিজাত্য আছে তার ব্যবহারের নাম শিষ্টাচার ; আর যার মনে আভিজাত্যের অভাব তার শিষ্টাচারের নাম আড়ম্বর। বন্ধুদের কথায় মনটা সত্যিসত্যিই ভারি দমে গেল। "যশের কাঙ্গালী হ'য়ে কথা গেঁথে গেঁথে করতালি নিতেই" বা ক'জন পারে ? তাই ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম এবার রস-রচনা না করে ঘরে বসেই নাম করব। নিজের নাম নয় ; পরাজিতের চির-শরণ আল্লাহ্-করীমের নাম করব।

## প্রবীন সাহিত্যিক

ভবতোষ বাবা সাহিত্যিক। অন্যে তাঁর সম্বন্ধে কী মনে করে, ঠিক বলা যায় না ; কিন্তু তিনি নিজকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চ্যাটার্জি প্রভৃতির সমকক্ষ বলেই মনে করেন। "প্রভৃতি" কথাটা কেবল অন্য সাহিত্যিকদের মান-রক্ষার জন্য ব্যবহার করা গেল। তাঁর আসল মনের ভাবটা এই যে রবীন্দ্রনাথ সুচতুর লোক, কোন গতিকে নিজের লেখার ইংরাজী অনুবাদ ক'রে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সাহেব ঠকিয়ে নোবেল প্রাইজটা বাগিয়ে দেশে এসে কবি-সম্রাট উপাধি নিয়ে জেঁকে বসেছেন ; আর শরৎচন্দ্র ভাল মানুষদের নিন্দা-চর্চ্চা ক'রে দুরন্ত খোকা আর অপরাধিনী নারীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে কেবল মুখের জোরে বাঙ্গালী ভাব-বিলাসী ছাত্র-বাবুদের কল্পনায় সাহিত্যের দিক্‌পাল হ'য়ে অধিষ্ঠান করছেন। ভবতোষ বাবুর লেখার যদি কেউ সুন্দর তর্জমা ক'রে বিদেশে প্রচার করতো, তবে এতদিন তিনিও নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের গর্ব খর্ব করতে পারতেন ; আর বাঙ্গালী সমাজে যদি প্রকৃত সমঝদার থাকতো তবে এতদিন শরৎচন্দ্রকে নিষ্প্রভ ক'রে তিনিই সাহিত্য-আকাশের পূর্ণ-চন্দ্র রূপে বিরাজ করতেন। উচ্চ দরের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তিনি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পেরে অবশেষে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের উপর বিরক্ত হয়ে বিলাত যাওয়াই স্থির করলেন।

বিলাতে দুই-তিন বৎসর যাবৎ সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে, অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে সদর্পে দেশে ফিরলেন। ফিরে দেখেন এখনও সেই রবি-চন্দ্রের রাজত্ব। মাঝে মাঝে অনেক তারা ফুটেছে, কিন্তু কেউ তাদের লক্ষ করে না। ভবতোষ বাবু বাঙ্গালী সমাজকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, রবি-চন্দ্রের চেয়ে এই তারারাই বড়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক জাত তাঁর এইসব যুক্তিকে 'চোখের-দেখা'র চেয়ে বড় বলে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না। এতে তিনি বিষম চটে গিয়ে সাহিত্যের সমালোচক হলেন।

সমালোচনার বলে প্রমাণ হয়ে গেল যে, রবীন্দ্রনাথ নিছক কল্পনা-বিলাসী—তাঁর লেখায় তাজা প্রাণের সরল অভিব্যক্তি নাই, আর তাঁর ভাষা যতই সালঙ্কারা হোক, আসলে তা' জীবনের সম্পর্ক থেকে বহুদূরে উড্ডীয়মান রঙীন ফানুষ বই আর কিছুই নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি একান্ত খাতিরের ব্যাপার। আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাঙ্গালীর নেহাৎ ঘরুয়া কথা—এক ঘেয়ে দুর্বল ভালবাসা, সামাজিক জটলা, আর আদুরে গোপাল ছেলের দুরন্তপনা,—সেই খাড়া-বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি-খাড়া। তবে শরৎ বাবুকে ধন্য বলতে হয় যে, তিনি ইদানীং বৈচিত্র্যের খাতিরে বাঙ্গালী পুরুষ ও মেয়েছেলের মুখে মানান সই রকম বিলাতী ভাব ও বুলির খৈ ফুটিয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ আলো করেছেন। যা'হোক শরৎ বাবুর খুব কপালের জোর, তাই সাহিত্যের দিক্‌পাল নাম পেয়েছেন, কিন্তু ন্যায়-বিচার অনুসারে তাঁকে সাহিত্যের রামপাল, ভূপাল কিম্বা বড় জোর নেপাল পর্যন্ত বলা যেতে পারে।

যা'হোক, শুধু নিন্দা করলে লোকে শুনবে কেন? তাই ভবতোষ বাবু সঙ্কল্প করলেন জীবনে ও সাহিত্যে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু তার আগে একটা সমঝদার সভা তৈরি করে নেওয়া দরকার; কারণ তা'হলে এদের মধ্যবর্তিতায় দেশের লোকে তাঁকে কিছু কিছু বুঝতে পারবে। দেশে অবশ্য আলাপ করবার মত লোক একটাও নাই. এজন্য কয়েকজন সাহেব এবং (সংখ্যা ভারী করবার জন্য) এদেশের কয়েকজন পদস্থ বিলাত-ফেরতের সঙ্গে পরিচয় ক'রে একটা বুধ-মণ্ডলী গঠন করলেন। কলির দশাবতার হিসাবেই হোক, কিম্বা দশ-দিক্‌পাল হিসাবেই হোক, দশজন দেশী ও বিদেশী সভ্য নিয়ে প্রতি বুধবারে বুধ-মণ্ডলীর সভা বসত। মণ্ডলীতে সাহেব না থাকলে তিনিই প্রেসিডেণ্ট হ'তেন। যা'হোক, আপাততঃ তিনি সেক্রেটারী হ'য়ে বুধ-মণ্ডলীর সভ্য ছাড়া আর-সব লোককেই অ-সভ্য বলে ভাবতে লাগলেন। এক-একবার তাঁর মনে হ'ত এই অ-সভ্য দেশে থেকে কি হবে? কিন্তু অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে এদেশের লোকের কল্যাণ-চিন্তা ক'রে অতি কষ্টে তিনি সাহিত্য-অ-রসিক অ-সভ্য বাংলাদেশেই রয়ে গেলেন এবং বাঙালী জাতির জন্য সাহিত্যের মত সাহিত্য লিখে যেতে কৃতসঙ্কল্প হ'লেন।

প্রথমেই পরশ-পাথর নাম দিয়ে একখানা উপন্যাস লিখলেন। বাংলার নিকৃষ্ট ধাতু যাতে সোনা হয়ে ওঠে, সেজন্য এই পুস্তকে তাঁর বিলাতের যাবতীয় অভিজ্ঞতা, সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি, সেখানকার লোকের চিন্তাধারা প্রভৃতি অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করে দিলেন। আর H. G. Wells, Bertrand Russell, Oliver Lodge, Romain Rolland, Bernard Shaw, Galsworthy প্রভৃতি লোক তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে কত খুশী ও উপকৃত হ'য়েছিলেন, এবং তাঁর কাছ থেকে এঁরা কোন্ কোন্ বই-এর পরিকল্পনা পেয়েছিলেন, আভাসে-ইঙ্গিতে তাও বিবৃত করলেন। এতেও যদি তাঁর মনীষা সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ জাগে, তাই তিনি ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, নরওয়ে, জাপান প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে পূর্বে যে সব পত্র-বিনিময় করেছেন, এবং এখন পর্যন্ত প্রতি মাসে তাঁরা যে-সব পত্র লিখে থাকেন, তার বিস্তারিত নমুনা সংকলিত করে দিলেন। বই উপহার পেয়ে বুধ-মণ্ডলী নব-পদী কবিতায় তাঁর স্তুতি করলেন; এবং জন-সাধারণের সুবিধার জন্য কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, আর দেশী-প্রবাসী নানা বন্ধুর কাছে পুস্তকপাঠ ও প্রচারের জন্য অনুরোধ-পত্র লিখে দিলেন। কিন্তু বছর দুই-তিন অপেক্ষা করেও দেখা গেল, হতভাগ্য বাঙালীরা পয়সা খরচ করে বই কিনে পড়তে নিতান্ত নারাজ। ভবতোষ বাবু ভাবলেন, এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপন্যাস পাঠ ক'রে যথার্থভাবে মূল্যবোধ করতে পারে এমন বাঙালী কয়জন আছে? উলু-বনে মুক্তা না ছড়িয়ে, এই বইখানাই ইংরেজীতে লিখলে লাখো লাখো কপি বিক্রি হ'ত, আর প্রশংসা-সূচক পত্রে সুটকেসের পকেট, দেরাজ এবং তোরঙ্গ ভর্তি হ'য়ে যেত। যা'হোক এই পুস্তকের দ্বারা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ভবতোষ বাবু সাধারণ বাঙালী লেখক ও পাঠকের বহু ঊর্ধ্বে তাদের অচিন্তনীয় চিন্তালোকে অধিষ্ঠিত।

এইবার তিনি সঙ্কল্প করলেন, আর একটু নীচে নেমে আসতে হবে। ফলে, অল্প দিনের মধ্যেই একখানা বই বেরুল—নাম "সত্যদর্শন"। অবশ্য দার্শনিক সত্য প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য নয়। অনেকের অবাস্তবতা দোষ হয়েছে, এজন্য সত্য সত্যই যা' দেখা যায়, অর্থাৎ বাস্তবিক যা' ঘটে, তারই বর্ণনা ক'রে তিনি এই বই লিখলেন; চমৎকার কাগজে ছাপা, আর বর্ণনা-নৈপুণ্যে অতুলনীয় বলে কিছু দিন বইখানার বেশ কাটতি হল। কিন্তু পাঁচ-ছয় মাস পরে

কি জানি কেন, বইখানা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। রাজনীতির সম্পর্ক থাকলে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় আশ্চর্য কিছু থাকত না। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ যখন জানতে পারল যে ভয়ানক বিশ্রী রকমের বাস্তব ঘটনা-সম্বলিত ছিল বলেই বইখানা কর্তৃপক্ষের বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে গেছে, তখন যারা আজ কিনি, কাল কিনি বলে শৈথিল্য করে করে এমন মুখরোচক বই পড়বার সুযোগ হারিয়ে ফেলল তাদের আর অনুশোচনার সীমা রইল না। অনেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় গবর্ণমেন্টের কাজের প্রতিবাদ-সূচক বেনামী প্রস্তাব বের হল। সে-সবের প্রধান বক্তব্য : (১) যা' নিত্য ঘটে, তেমন জিনিসকে অগ্রাহ্য করলে সাহিত্যকে অকারণে পঙ্গু করে রাখা হয়। (২) সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নীতিকথা বলা বা স্রষ্টার মনের কোন বিশেষ বাণী প্রচার নেহাৎ সেকেলে ধরনের প্রপাগাণ্ডা। (৩) সাহিত্যের লঘু-পক্ষকে প্রপাগাণ্ডার ভারে ভারাক্রান্ত করলে তার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-কল্পনার অঙ্গচ্ছেদ হয়। (৪) আর্টমাত্রেই নীতি-দুর্নীতির গণ্ডীর বাহিরে। আর্ট যদি লোক-হিতের অপেক্ষা রাখে তবে তার পুষ্টি অসম্ভব। (৫) আধুনিক সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, তা বাস্তব কঠোরভাবে বাস্তব, নিষ্ঠুরভাবে বাস্তব, নির্লজ্জভাবে বাস্তব। রবীন্দ্রনাথের ভাব-বিলাস থেকে এই রকম সহজ সত্য-দৃষ্টি অনেক বেশী আর্টিষ্টিক। আর শরৎচন্দ্রের প্রচার-চেষ্টা থেকেও আধুনিক সাহিত্য বিমুক্ত। তার প্রধান কারণ, গোড়া থেকেই কোন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা আধুনিক সাহিত্যিকের রীতি নয় ; তাহ'লে তার স্বাধীনতা খর্ব হয়। তাই প্রত্যেক বইয়ে জমকালো রকম বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। মোটের উপর যদি তার কোন অর্থ না-ই হয়, তাতে এমন কি আসে যায় ? অর্থ কে চায় ? এই ভাব-বৈচিত্র্যই মনোরম ও স্বভাব-সঙ্গত। পাঠক নানা বৈচিত্র্য ও বৈপরিত্যের ভিতর থেকে ইচ্ছা করলে যা' কিছু অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। পাঠকের চিত্তকে এরূপ স্বাধীনতা দেওয়ার আর্ট অত্যন্ত আধুনিক ব'লে প্রাচীনপন্থীরা এর মাহাত্ম্য এখনও বুঝতে পারছে না। কিন্তু এদের প্ররোচনায় গবর্ণমেন্ট 'সত্যদর্শনের' প্রচার বন্ধ করে বাঙ্গালীর সমাজের ও সাহিত্যের যে ক্ষতি করলেন, তা অপরিমেয় ও অপূরণীয়।

কিন্তু এসব লেখা-লেখিতে কোন ফল না হওয়ায় ভবতোষ বাবু আপাততঃ মহাকাব্য লিখে অমর হওয়াই স্থির করলেন। মহাকাব্য লিখতে কোনো গোলমাল নাই। কথার অলঙ্কার দিয়ে মালা গাঁথা খুব সহজ কাজ ; বিশেষতঃ আজকাল ছন্দের বাঁধাবাঁধি উঠে যাওয়ায় আরও সুবিধা হয়েছে,—মিল, অমিল, গোঁজামিল, গরমিল, কিছুতেই দোষ নাই। আর ব্যাখ্যা করবার ভার পাঠকদের উপর। তারা চেষ্টা করে যে কোনো কাব্যের আট-দশ রকম ব্যাখ্যা দিয়ে ফেলবে ; আর ব্যাখ্যা দিতে নিতান্তই অক্ষম হ'লে কাব্যের গভীরতা দেখে বিস্মিত হ'য়ে থাকবে। যা'হোক তিনি বিবিধ ছন্দে আন্দোলিত, আদি-অন্ত রসে রসান্বিত, ত্রিবর্ণ চিত্রে বিচিত্রিত, ইংরাজী-বাংলা শব্দে ঝঙ্কৃত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা পংক্তি সমন্বিত ; পনের শত পৃষ্ঠা ব্যাপিত এক মহাকাব্য লিখে প্রকাশ করলেন। বুধ-মণ্ডলী একবাক্যে একে অনুপম বলে অভিহিত করলেন, আর নবীন পাঠকেরা দলে দলে এসে ভবতোষ বাবুকে তাদের আচার্য বলে বরণ করতে আরম্ভ করলো। ফলে, এরা বুধ-মণ্ডলীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হলেও অর্ধ-সভ্য হিসাবে কিছু খাতির পেতে লাগলো। আর একদল, যারা সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে বৃথা মাথা ঘামায়,—অর্থাৎ যারা সাহিত্যে রস-সৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ অথচ নিঃসংশয়িতভাবে মানব-কল্যাণের ছায়াপাত দেখতে চায়—তারা এই পুস্তককে সোজাসুজি প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু তাদের কথা তলিয়ে গেল। মহাসমারোহে প্রমাণিত হ'য়ে গেল, রবি-চন্দ্র কিছুই

নয় ; বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল—এসবের চেয়ে বুধ-মণ্ডলীর ভবতোষ আচার্য গুরুতর ও শ্রেষ্ঠতর। বিশেষতঃ আচার্য ভবতোষ যখন লিখলেন :

> আমিও একদা ভাবিতাম বটে তোমাদের মত অতি অসার,
> কিন্তু যেদিন বিলাতী আলোক পশিল আমার মনের পর,
> সেই দিন থেকে পুরানো ধারণা ত্যজিয়া হয়েছি ধুরন্ধর
> নতুন আমার অভিমত যাহা জানিও সে-সব সারাৎসার।

তখন এ যুক্তির মুখে আর কোনো তর্কই টিকল না। সাহিত্য-আকাশে আপাততঃ বুধ রাজারই জয়গান কীর্তিত হতে লাগল।

# বাঙ্গাল

বাঙ্গাল 'মনুষ্য' কিনা এবং উড়েই বা কি 'জন্তু'—এ কথার মীমাংসা হয়ত কোন কালেই হবে না। উড়িয়ার দেশ এখন বাংলার থেকে পৃথক হয়ে গেছে, কিন্তু খাস বাঙ্গালের দেশ এখনও বাংলার ভিতরেই আছে। তাই উড়ের কথা ছেড়ে দিয়ে 'বাঙ্গাল' কথাটার তাৎপর্য কি, একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক। বাঙ্গাল বলতে যে আসমুদ্র-হিমাচল এবং আব্রহ্ম-বিহারাঞ্চলের সমুদয় লোককে বুঝায় না, একথা আর বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। স্পষ্টতঃ কথাটা ব্যঙ্গ-সূচক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ব্যঙ্গের লক্ষ্য কি? কথ্য-ভাষার বিভিন্নতাই বোধহয় প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু কেবল তাই যদি হবে, তবে ত ভাষার পার্থক্য হলেই পরস্পর পরস্পরকে বাঙ্গাল বলতে পারে। তা' যখন নয়, অর্থাৎ একজন যখন ঐ আখ্যা স্বীকার করে নেয়, তখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভাষার বিভেদের সঙ্গে নিশ্চয় আরো কিছু জড়িত আছে।

বহুদিন যাবৎ নবদ্বীপ বাংলার সংস্কৃতির লালনভূমি ছিল। এই কারণে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী শান্তিপুরের লোকে সভ্যতা ও ভব্যতায় যে কিছু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এই সেদিনও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বাংলার শ্রেষ্ঠ রত্নের সমাবেশ হত, আর তাদের সমাদরও হত। শৌখিন রাজা-মহারাজা ও বিদ্যানুরাগীর সংস্রবে নদীয়া-শান্তিপুরের চারদিকেই বাংলার শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি গড়ে উঠেছিল। তাদের মনে একটু শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান এবং অন্যদের প্রতি একটু অবজ্ঞাভাব হওয়া আশ্চর্য নয়। মক্কাবাসীরা যেমন একমাত্র হেজাজের অধিবাসীকে 'আরব' বলত, এবং তা'ছাড়া অন্য দেশের লোককে অবজ্ঞাভরে 'আজমী' উপাধিতে ভূষিত করত, ঠিক সেইভাবে নদীয়া-শান্তিপুরের লোকে একমাত্র নদীয়ার লোককে বাঙ্গালী এবং তা' ছাড়া অন্য জেলাবাসীকে বাঙ্গাল বলত। বর্তমানে কলিকাতা জ্ঞানে ও সভ্যতায় বাংলায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছে; কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগে কলকাতা, চব্বিশপরগনা, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের লোকে বাঙ্গালী ছিল না, বাঙ্গালই ছিল। এখনও নদীয়া-শান্তিপুরের অনেক সাবেক লোকে হয়ত ভাষার আভিজাত্যের দিক দিয়ে বাইরের লোককে পাত্তা দিতে নারাজ। হয়ত এটা শূন্য-দম্ভ মাত্র। কিন্তু মানুষ প্রকৃত বড় না হলে এ-দম্ভ ত্যাগ করতে পারে না; কারণ অনেক সময় এই দম্ভটুকুই যে তার একমাত্র সম্বল। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কত বড় ছোট হ'য়ে যাচ্ছে, আবার কত ছোট ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। তবু যদি কোনও অতি হীনজীবী লোকের মুখে শুনা যায় যে সে খাজা খাঁ নবাবের বংশধর, বাংলাদেশে তার সমকক্ষ আশরাফ বা কুলীন কেউ নাই—তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। মানুষ অতীতের মোহে অনেক সময় এত অভিভূত থাকে যে চোখের সামনেকার বর্তমানকে কিছুতেই দেখতে বা স্বীকার করতে পারে না। আমাদের নিজেদের চরিত্রের আনাচে-কানাচেও কত যে মোহাবেশ জমা বেঁধে আছে, তা' একটু অনুধাবন করলেই বুঝা যায়। প্রকৃত বুদ্ধিমান এসব সম্মোহন-জাত দম্ভ দেখে রুষ্ট বা বিরক্ত হন না বরং কতকটা কৌতুকমিশ্রিত সহানুভূতি অনুভব করে।

আজকাল কলিকাতার এবং আশেপাশের লোকে ভাষার আভিজাত্যের অধিকারী। বর্তমান জ্ঞানলাভের সুযোগ এরাই অধিক পেয়েছিল এবং বর্তমান সভ্যতার সংস্রবে আসবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যও এদেরই হয়েছিল। প্রত্যেক জেলারই কিছু না কিছু উপভাষা আছে, সেটুকু ছেড়ে দিয়ে কলিকাতার ভাষাই বর্তমানে আদর্শের সম্মান লাভ করেছে এবং আর সবাই তা স্বীকার করে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে। কলিকাতার লোক নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বর্ধমান-হুগলী চব্বিশপরগণার ভাষার অভিজাত্য স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের মতে পদ্মার ওপারের ত কথাই নাই যশোর-খুলনা-ফরিদপুর-বরিশাল, এমনকি নদীয়া জেলারও চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া মহকুমার লোক বাঙ্গাল পর্যায়ভুক্ত। আবার এই শেষোক্তেরা অনেক সময় আরও পূর্বদেশীয় লোকের উপর ঐ আখ্যা প্রয়োগ করে নিজেদের গা বাঁচাতে চেষ্টা করে।

যা হোক, ভাষার বা উচ্চারণের বিভিন্নতা এমন কিছু অপরাধ নয় যার জন্যে লজ্জিত হবার প্রকৃত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তবু সময়ে-অসময়ে খোঁটা খেলে গায়ে একটু বেঁধে বই কি? সব সময়ে বাঙ্গাল-ক্ষ্যাপানি হেসে উড়িয়ে দেবার মত মহাপুরুষ খুব কমই আছে। যদি এই ক্ষ্যাপানি কেউ গায়ে না মাখতো তবে আর এর ধারই থাকত না। অনেক সময়ই লোকে একটু কৌতুকের জন্যই ক্ষ্যাপায় আর যে ক্ষ্যাপে তাকেই ক্ষ্যাপায়।

বাঙ্গাল নামে বহুলোকে ক্ষ্যাপে, তাই এর অনেক ভাষ্য বের হয়েছে। ব্যঙ্গ-কৌতুকের আসরে বাঙ্গালের বোল-চাল, থিয়েটারে বাঙ্গাল-চরিত্রের অভিনয় এসব বেশ রংচং দিয়েই করা হয়। ঢাকার থেকে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও ধ্বনি বিস্তারেও প্রথম প্রথম অনেকদিন গ্রাম্য বাঙ্গাল চরিত্রকে বোকা সাজিয়ে 'গ্রামের পথে' কলিকাতার ভাষায় বাঙ্গালদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনও বোধ হয় মাঝে মাঝে 'গ্রামের পথে' শিক্ষা দেওয়া হয়। বাঙ্গালেরা যদি এইগুলো বেশ সহজভাবে বহন করতে পারে তবে শীঘ্রই বাঙ্গাল-ক্ষ্যাপানির ধার মরে যাবে। রস-বোধ জিনিসটা এমনই যে তার মধ্যে চুবিয়ে নিলে ছুরির ধারও নষ্ট হয়ে যায়। স্বীকার করতে দোষ নাই, পশ্চিমবঙ্গের লোকে স্বভাবতই রসিকতা ও ভাঁড়ামীতে পূর্ববঙ্গীয়দের চেয়ে দড়। কৃষ্ণনগরেই গোপাল ভাঁড়ের লীলাভূমি ছিল। বোধ হয় তার মধ্য দিয়ে ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক রসবোধেরই সুকৌশল প্রকাশ হয়েছিল।

সাধারণতঃ চ, ছ, জ, ঝ, এর অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং র, ড়, এর অপপ্রয়োগকেই বাঙ্গালের প্রধান লক্ষণ বলে মনে করা হয়। অনেক পূর্ববঙ্গবাসী বিশ-ত্রিশ বছর কলিকাতায় থেকে চেষ্টা করে এগুলি 'শুধরে' নিতে পারেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষরিক উচ্চারণ ছাপিয়ে বাক্য উচ্চারণের এমনই একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে বিশ-ত্রিশ বছরেও সেটি আয়ত্ত করা যায় না বা জন্মস্থানের বৈশিষ্ট্য বা বাক্যভঙ্গী ত্যাগ করা যায় না। মাড়োয়ারীর মুখে অতি বিশুদ্ধ বাংলা শুনেও যেমন কোন বাঙ্গালী তাকে বাঙ্গালী বলে ভুল করে না ঠিক তেমনি কলিকাতার লোক বাঙ্গালের মুখে অতি বিশুদ্ধ কলিকাতাইয়া ভাষা শুনেও তাকে কখনও কলিকাতার খাস বাঙ্গালী বলে ভুল করে না, কথার একটিমাত্র টানেই সমস্ত ফাঁস হয়ে যায়। আহেলা বাঙ্গালের চেয়ে এইসব ক্যালকেশিয়ান বাঙ্গালের কথাতেই বরং কলিকাতার লোক আরও নিবিড় কৌতুক অনুভব করে।

পূর্বে যে বাঙ্গালের ভাষ্যের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ভাষা ছাড়া আরও অনেক জিনিস বাঙ্গালের লক্ষণের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গলায় কক্টার জড়িয়ে নাকে কানে প্রচুর সর্ষপ তৈল মাখা; মাথায় চুপচুপে করে তৈল মালিশ করা; কুলকামিনীকে

জলখাবার গেলাশের মত ব্যবহার করা; রেলে টিকেট করতে গিয়ে দাম দুই পয়সা কম দিতে চাওয়া; ট্রাম গাড়ীতে উঠে মেমসাহেবের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা; কুয়া উল্টিয়ে মনুমেন্ট তৈরী হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা; ধুতির উপর টুপি পরে রাস্তায় বের হওয়া, এক পয়সার মোমবাত্তি চার পয়সা দিয়ে কেনা; আর রহস্য করতে গেলে চটে উঠা বাঙ্গালের লক্ষণ। কথায় বলে, বাঙ্গালের মার দুনিয়ার বার। যা হোক মোটের উপর দেখা যায়, বাঙ্গালকে অদ্ভুত, আদেখলে নির্বোধ, বদরাগী এবং অরসিক বলে কল্পনা করা হয়। এইসব লক্ষণ কিন্তু পূর্ববঙ্গীয়দের একচেটে নয়। এইপ্রকার লোক শুধু বঙ্গদেশে কেন, জগতের কোথাও দুর্লভ নয়। অতএব বাঙ্গাল কেবল বাংলায় নয় পৃথিবীময় ছড়ান আছে। জীবনের উদ্দেশ্য যদি মারামারি কাটাকাটি না হয়, তবে যত লোক দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বা তাতে প্ররোচনা দেয় সবাই বাঙ্গাল। জীবনের উদ্দেশ্য যদি প্রভুত্ব বা স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি না হয় তবে যত জাতি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে সবাই বাঙ্গাল। জীবনের উদ্দেশ্য যদি পরকে আপন করে আত্মার প্রসার করা হয়, তবে প্রেমহীন বর্তমান দুনিয়ায় সবাই বাঙ্গাল। তাই আজ জগৎ জোড়া বাঙ্গালের মেলায় দাঁড়িয়ে "বাঙ্গাল মনুষ্য কিনা"—এ-বিচার সুসাধ্য নয়।

সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকী ১৩৪৮

# দুই বন্ধু

রহিম বাঙাল আর শ্যামল বাঙালী। অর্থাৎ রহিমের জন্মস্থান ফরিদপুরে আর শ্যামলের মেদিনীপুরে। এরা দুইজনে প্রেসিডেন্সী কলেজে একসঙ্গে পড়ত, সে আজ অনেকদিনের কথা। এখন দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তখন শ্যামল রহিমকে বাঙাল বলে ক্ষ্যাপাত, আর রহিম রেগে গিয়ে শ্যামলকে ঘটি, ছাতু, নেংটি ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করত। উভয়ের রাগ মিটলে শ্যামল বলত, ভাই বাঙাল কাকে বলে জান? যে নিজের হিতাহিত বুঝতে পারে না, এবং ঠাট্টাকে ঠাট্টা বলে গ্রহণ করতে পারে না, সেই আহম্মকই বাঙাল। রহিম বলত, ভাই ঘটি বলে কাকে জান? যে নিজের ঘটিটাকে পরের ঘড়াটার চেয়ে মূল্যবান ভাবে, আর নিজের নেংটিকে অন্যের চাপকানের চেয়ে ভদ্রোচিত জ্ঞান করে, সেই স্বার্থপর আত্মম্ভরীই ঘটি। এইভাবে ঝগড়া ও মিলনের মধ্যে তাদের মধুর কৈশর কেটেছে।

রহিম বি.এ. পাস করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হল, আর শ্যামল ল' পাশ করে উকিল হল। রহিম কর্মক্ষেত্রে সারা বাঙ্গালায় ঘুরে ঘুরে এখন পাকিস্তানের একজন হোমরা-চোমরা অফিসার, আর শ্যামল প্রথম জীবনে ওকালতিতে পসার জমিয়ে এবং পরবর্তী কালে পলিটিক্সে প্রতিষ্ঠা করে এখন হিন্দুস্থান ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। রহিম থাকেন ঢাকায়, আর শ্যামল কলকাতায়। তখনও 'পাসপোর্ট' ও ভিসার জন্ম হয়নি, তাই মাঝে মাঝে দুই বন্ধুতে দেখা হয় কখনও ঢাকায়, কখনও কলকাতায়। তাঁদের মধ্যে নিভৃতে যে-সব আলাপ আলোচনা হয়, তা খাশ কামরায় কথা, কিন্তু খবরের কাগজে অলেখ্য; কারণ, তাতে সমাজ-জীবনের আলেখ্য খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করাই থাকে উভয়ের লক্ষ্য। এ-সব স্পষ্ট কথায় অবশ্যই বাঙ্গালের রাগ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, বাঙ্গালীর অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্যও তেমনি স্বাভাবিক। যা' হোক তবু বেহেশতের ঘুলঘুলির ফাঁকে কান পেতে জ্বীন-পরী বা প্রেত-প্রেতিনীরা সেকথা শুনে এসে কখনও কখনও মর্ত্যলোকে প্রকাশ করে থাকে। তারি দুই-একটা কথা নীচে লেখা যাচ্ছে।

একদিন শ্যামল বললেন, দেখছ ত রহিম কাণ্ডকারখানা? ভারত কেমন দুইখানা হয়ে গেল। কোথায় গেল গান্ধীর অখণ্ড ভারত, আর কোথায় রবীন্দ্রনাথের "সেই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে?" রহিম বললেন, আরও কাছের জিনিস দেখ। কেমন বাঙাল আর ঘটি ঝটাপট দু'দিকে সরে দাঁড়াল—ঠিক যেন তোমাদের ছিন্নমস্তা—ধড় একদিকে, মুণ্ডু আর একদিকে। শ্যামল জওয়াব দিলেন এত লোক শহীদ হওয়ার পরেও শরতের দুর্দিন কাটবে না, একি কখনও হয়? ব্যাঙগুলোরও ত নিদ্রা যাওয়া চাই! শীত যাবে, বসন্ত যাবে, অতঃপর বর্ষা আরম্ভ হলেই ব্যাঙের কোটরে জল ঢুকবে, তখন দেখবে সব একাকার—[illegible] রবে কানে তালা লেগে যাবে। রহিম বললেন কি যে বল মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। শ্যামল বললেন, ছিন্নমস্তা যে, মাথাই তো নেই, তবে আবার বুঝবার কথা ওঠে কেন? রহিমের হার হল, সে নিরুত্তর।

আর একদিনের কথা। রহিম বললেন, অপ্‌শন্‌ জানানোর চিঠি পেলাম, পাকিস্তান না হিন্দুস্থান? ভাবলাম চাকুরি করব—টাকা দিয়ে কথা। হিন্দুস্থানে ত হিন্দুরাই কেষ্ট-বিষ্টুর স্থান অধিকার করে থাকবে, ওরা কি আর আমার মাইনে বাড়িয়ে দেবে? শ্যামল রহিমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সমাপ্তি কাটলেন, "হ্যাঁ, তার চেয়ে যাই পাকিস্তানে, সেখানে পাক পরওয়ার-দেগারের দোওয়ায় দেড়া-দ্বিগুণে মাইনে আদায় করা যাবে। কেমন তাই ত? কিন্তু টাকাটা আসবে কোত্থেকে তা ভেবে দেখেছ কোনো দিন?" রহিম বললেন, কেন? সে ভাবনা গবর্নমেন্টই ভাববে। টাকার গাছ হচ্ছে গিয়ে বাঙ্গালের পাট আর গবর্নমেন্টের ছাপাখানার নোট। আর তেমন যদি বল, তা বাঙ্গালীই বা এত টাকা মাইনে পাবে কি করে? তোমাদের মন্ত্রীরা ত আর মোফতে বা এমন কিছু কম মাইনের কাজ করে দেবে না। আর বাঙ্গালের মন্ত্রী যদি এক ডজন হয়, তবে দেখে নিও, বাঙ্গালীর মন্ত্রীও সংখ্যায় বা ওজনে ঐ এক ডজনের কম হবে না। "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই নাকি ভরসা? সেই গৌরী সেনটা কোথায় বলতে পার কি? শ্যামল প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলেন, পরে মাথা চুলকিয়ে বললেন, আমাদের গৌরী সেন দিল্লী। আমরা এত বড় ইউনিট, একখানের ঘাটতি অন্যখান থেকে পুষিয়ে নেব। আমাদের চা আছে, লোহা-লক্কড় আছে, কয়লা আছে, কাপড়ের কল ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প সব আছে, পাটও কিছু আছে, তা ছাড়া সোনা ও হীরার খনিও আছে। আমাদের ভাবনা কি? আর তোমরা পাটের দড়ি বানিয়ে ফাঁসিও নিতে পারবে না—কাপড়, কয়লা, কাগজ-পেন্সিল, লোহা, সিমেন্ট, তেল, চিনি—এইসব কিনতেই সব পাট লোপাট হয়ে যাবে। রহিম জওয়াব দিলেন, ভাই, মন্ত্রীরা যতদিন মাইনে নেবেন, ততদিন আমরাও পাব, আমাদের ফাঁকি দিয়ে আর নিজেরা নিতে পারবেন না। তা ছাড়া, আর মোটে পাঁচ বছর চাকুরী আছে, এই ক'টা দিন কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। তারপরে কা কস্য পরিবেদনা। ভবিষ্যতের কথা ত? সে, ছেলে-ছোকরারা তখন বাজেট করে আয়-ব্যয়ের হিসেব কষে বুঝে নেবে। আর তাদের মাইনে কম হলেই বা কি? তাদের তো আর আমাদের মত এতবড় পরিবার পরিজন থাকবে না। কি বল শ্যামল? শ্যামল এ কথার কোনও জওয়াব খুঁজে পেলেন না। বোধহয় মনের মধ্যে এ যুক্তিরও সমর্থন পেলেন। যা হোক, মোটের উপর এ দফা শ্যামলের হার হল।

আর একদিন, ১৫ই আগস্টের কথা! শ্যামল বললেন, রহিম ভাই, দেখেছ কি তাজ্জব কাণ্ড। লোকগুলো ক্ষেপে গেল নাকি? এই সেদিন গলা-কাটাকাটি করল, আর আজ গলাগলি করে অলি-গলিতে নিশান উড়িয়ে মাথায় টিকি নাচিয়ে বা লালটুপির টিকি দুলিয়ে কেমন শোভাযাত্রা করে বেড়াচ্ছে! রহিম বললেন, কেমন যেন সন্দেহ হয়, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ না ত? তবে হতেও পারে, দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন তার প্রথম ধাক্কায় হিন্দু-মুসলমানে মিলে হয়ত মানুষ হয়ে গেছে। শ্যামল বললেন, তা হবেও বা।

এর কয়দিন পরেই আবার যখন কলকাতার মাথা কাটাকাটি শুরু হল, তখন শ্যামল ঢাকায় এসেছেন। কারণ কে সাধ করে বিপদের মধ্যে থাকে? যে ঘোর কলিকাল পড়েছে, তাতে হঠাৎ শ্যামলের মত পদস্থ লোকও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। অবশ্য, তার সম্ভাবনা হাজার-করা একেরও কম। কিন্তু তাই বলে কি কেউ জীবন-মরণ ব্যাপারে দৈবের উপর নির্ভর করবে? যে নিজেকে নিজে সাবধান করতে পারে ঈশ্বর তারই সহায় হন।

রহিম বললেন, কেমন বলেছিলাম না, অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ? তেলে আর জলে কি একসঙ্গে মিশ খায়? সাধে জিন্নাহ সাহেব বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি? শ্যামল বললেন যা বলেছ ভাই, কথাটা তেমন মিছেও নয়। এই দেখ না, আমরা যাকে পূজো করি, তোমরা তাকে জবাই করে খাও; আমাদের উপাসনা উৎসব হয় ঢাক ঢোল পিটিয়ে রাজপথে, তোমাদের নামাজ-কালাম চুপে চুপে মসজিদের ভিতরে, আমাদের পরমেশ্বরের সহস্ররূপ, আর তোমাদের আল্লাহ একেবারেই অরূপ। রহিম এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন, আমরা খাই কলাপাতার সোজাপিঠে, তোমরা খাও উল্টোপিঠে, আমাদের সমাজে ইচ্ছামত চার বিবিতে দোষ নাই; তোমাদের সমাজে বাধ্য হয়ে এক বিবিতেই রোশনাই, আমরা মরে মাটির তলায় মিশে যাই, তোমরা মরে ভূত হয়ে আকাশে উড়ে যাও। এইভাবে কলকাতার দাঙ্গার পটভূমিতে প্রমাণ হয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি, কেবল হিন্দু ও মুসলমান, মানুষ নয়।

এরপর গান্ধীর অনশন, কয়েকজন বীরের শাহাদৎ, আবার হিন্দু-মুসলমানে মিলন। তারপর একবার রহিম কলকাতায় শ্যামলের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বললেন, শ্যামল ভাই, আমার মনে হয় অন্ততঃ বাঙ্গাল ও বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান কখনও একজাত, আবার কখনও দুইজাত। এ বড় অদ্ভুত। শ্যামল বললেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, আলো-বাতাসে, রক্তের লালিমায় এরা একজাত; আবার দাঁড়ি ও টিকিতে, লুঙ্গী ও ধূতিতে, বদনা ও ঘটিতে বাঙ্গাল ও বাঙ্গালী ভিন্ন জাত। রহিম বললেন, আল্লা ও ঈশ্বরে, পয়গম্বর ও অবতারে, বেহেশ্‌ত্‌ ও স্বর্গে এরা একজাত, আবার লীগে ও কংগ্রেসে, মসজিদে ও মন্দিরে, কবরে ও শ্মশানে এরা ভিন্নজাত। তারপর উভয়েই একযোগে নজরুলের বিখ্যাত কয়েকছত্র আবৃত্তি করলেন—

"হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?" ইত্যাদি।

জয়শ্রী

কার্তিক ১৩৫৪

# দাবা খেলা

দাবা খেলার উৎপত্তি কোন্ দেশে তা নিয়ে এখনও পণ্ডিতে-পণ্ডিতে মতভেদ আছে। ভারত ও চীন এই সম্মানের দাবীদার। এতকাল পরে এখন এ সমস্যার মীমাংসা হওয়া কঠিন, আর তার বিশেষ প্রয়োজনও দেখা যায় না। এ কথা নিশ্চয় যে, এখন যে-নিয়মে খেলা হয়, আগে ঠিক সে নিয়ম ছিল না। ভারতে অতি-প্রাচীন কাল থেকে চতুরঙ্গ নামে এক রকম খেলা ছিল। একটা চতুষ্কোণ ছকের চারদিকে বসে চারজনে খেলত। সামনা-সামনি দুইজন একপক্ষে এবং বাকী দুইজন অন্যপক্ষে থাকত। প্রত্যেক অংশে, রাজা, গজ, ঘোড়া, নৌকা এবং চারটি করে ব'ড়ে বা পেয়াদা থাকত। মন্ত্রী ছিল না। ঘুঁটি সাজিয়ে পাশার দান দিয়ে খেলা সূচনা হত। ক্রমাগত হাত ঘুরে ঘুরে দান পড়ত, আর কোনো নির্দিষ্ট দান ফেলতে পারলে তবেই ঘুঁটি চালাবার অধিকার হত, তার আগে নয়। এ ব্যাপার ঠিক পাশা খেলার মত। যা' হোক পরে নিয়ম বদল হয়ে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে খেলার রেওয়াজ হল, এবং একটি রাজা মন্ত্রীর পদবী লাভ করল। কাজে কাজেই এক-এক দিকে রাজা, মন্ত্রী, দুই গজ, দুই ঘোড়া, দুই নৌকা এবং আটটি করে ব'ড়ে নিয়ে খেলা হ'তে লাগল। তখনও কিন্তু গজই সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিল। সাতঘুঁটি বাঘ-বন্ধ কিম্বা মোগল-পাঠানের মত বিপক্ষের ঘুঁটির উপর দিয়ে টপ্‌কে খালি ঘরে পড়তে পারলেই সে-ঘুঁটি খাওয়া যেত। যা' হোক, কালক্রমে নিয়ম বদল হ'য়ে মন্ত্রী সবচেয়ে প্রবল, তারপর নৌকা, তারপর গজ, ঘোড়া, তারপর ব'ড়ের ক্ষমতা নির্দিষ্ট হল। অবশ্য, বিপক্ষের রাজাকে আক্রমণ ক'রে কিস্তিমাৎ করাই খেলার উদ্দেশ্য, সুতরাং রাজার গতি মন্থর হলেও রাজাকেই প্রধান বল বলে মানতে হবে।

একথা ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, চীনেও হয়ত অন্যবিধ নিয়মে চতুষ্কোণ ছক ও ঘুঁটি নিয়ে কোনও রকম খেলা প্রচলিত ছিল। সুতরাং কোন্ দেশে দাবা খেলা আগে প্রচলিত ছিল তা' বিচার করার মানদণ্ডেরই অভাবে রয়েছে। সে যাই হোক, অতীত নিয়ে গৌরব ক'রে কোন লাভ নেই। বর্তমানে কোন্ দেশ এ-খেলায় কত উন্নত, সেইটেই আসল কথা।

পাক-ভারত থেকে পারস্য আর আরব ঘুরে এ-খেলা ইউরোপে প্রবেশ করে। 'চতুরঙ্গ' পারস্য ভাষায় 'শতরঞ্জ' নাম ধরেছিল। আরবীয়েরাও এ-নাম বহাল রেখেছিল। পারস্য ভাষায় রাজাকে শাহ্, মন্ত্রীকে উজীর বা ঘারজী, গজকে পিল, ঘোড়াকে আপ্‌স্, নৌকাকে রোখ্ আর ব'ড়ে পেয়াদা বা পায়দল বলে। কিস্তি দেওয়াকে কিশ্‌ত বা 'শাহ্' বলে। এইসব নাম আজও ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। লঙ্কা বা ভারতের রানী মন্দোদরী এবং পারস্য বা তুরস্কের সুলতান দেলাবাম দাবা খেলার ইতিহাসে পৌরাণিক মহিমা লাভ করেছেন। আরবের এস্তেমা আর ইটালীর রাই-লোপেজ নিজ নিজ দেশে সেকালে শ্রেষ্ঠ খেলুড়ে ছিলেন। স্পেনের ঘিলিওর, স্কটল্যাণ্ডের ম্যাকডনেল, ফ্রান্সের লা' বরডনে বিশ্বজিৎ পর্যায়ের খেলোয়াড় বলে সর্বত্র স্বীকৃত। ইংলণ্ডের স্টাউনটস, জার্মানীর এনডারসন, স্টাইনিজ

ও লস্কর, আমেরিকার পল মরফি ও ক্যাপাব্লাঙ্ক, ফ্রান্সের প্রবাসী নাগরিক এলেখিন এবং হল্যাণ্ডের মাকস উইএ পূর্ববর্তী বিশ্বজিৎ খেলোয়াড়কে হারিয়ে নিয়মিতভাবে বিশ্বজিৎ আখ্যা পেয়েছিলেন। এ ছাড়া ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন, আমেরিকার মার্শাল, হাঙ্গারীর শ্লেষ্টার, রাশিয়ার শিগোরিন, জার্মানীর রেটি, নিমজোভি, স্কান্দিনেভিয়ার বুলগিজুরো, রুবিনষ্টিন; আমেরিকার ফাইন এবং পাঞ্জাবের সুলতান খাঁ—এঁরাও ভুবনবিখ্যাত খেলোয়াড়।

ইংরেজী mate শব্দ আরবী মাৎ থেকে, আর rook শব্দ আরবী বা ফার্সী রোখ থেকে দেওয়া হয়েছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, যখন যে দেশ শৌর্যবীর্য ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ হয়েছে, তখন সে দেশের লোকেই শ্রেষ্ঠ দাবা-খেলোয়াড় হয়েছে। মোটের উপর ভারত, পারস্য, আরব, ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা, রাশিয়া—এই ক্রম-অনুসারে দাবা খেলার উন্নতি করেছে। আবার দেশের শ্রীবৃদ্ধির দিক দিয়েও অনেকটা এই ক্রমই রক্ষিত হয়েছে বলে ধরা নেওয়া যায়। কিছুকাল আগে এলেখিন বিশ্বজিৎ খেলোয়াড় ছিলেন; তার জন্মভূমি রাশিয়ার মস্কো নগরে; কিন্তু যৌবনে রাজনৈতিক কারণে তিনি ফ্রান্সকেই স্বদেশ বলে বরণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরের জুন মাসে যে বিশ্বপ্রতিযোগিতা শেষ হয়েছিল, তাতে রাশিয়ার ইউক্রেন-নিবাসী বট উইনিক বিশ্বজিৎ পদবী লাভ করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্পাইস্লভও রাশিয়াবাসী; তৃতীয় কেরিস আর রেশেভস্কির মধ্যে কেরিস পুরাতন রাশিয়ার অন্তর্গত নার্ভার নিবাসী; আর রেসেভস্কি রাশিয়ান পোলাণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও পরে আমেরিকা-প্রবাসী।

অধুনা প্রচলিত ভারতীয় খেলা আর আন্তর্জাতিক খেলার মধ্যে নিয়মের পার্থক্য আছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে অবলম্বন করা হয়। এতে খেলার অনাবশ্যক বিলম্ব নিবারণ করবার জন্য রাজা নৌকা এক চালে পরস্পর অতিক্রম করে কেল্লাবন্দীর নিয়ম করা হয়েছে, আর বড়ের প্রথম চাল ইচ্ছামত একঘর বা দুইঘর দেবার এবং অষ্টম ঘরে পৌছলে ইচ্ছামত যে কোনও বল পড়বার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া প্রথমে ঘুঁটি সাজাবার সময় রাজার সামনে রাজা এবং মন্ত্রীর সামনে মন্ত্রী রাখবার নিয়ম করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মতে মন্ত্রীকে রানী, গজকে বিশপ এবং পেয়াদাকে পত্তন বলা হয়। পৃথিবীর সর্বত্র একই নিয়মে খেলবার সুবিধা অনেক। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে রক্ষণশীলতা এত প্রবল যে এখানে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে, বিভিন্ন নিয়মে খেলা হয়, এবং তা' নিয়ে সময় সময় ঝগড়া-বিবাদও হতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও জেলায় ঘোড়ার বড়ে অষ্টম পৌছলেই ঘোড়া হয়ে এক লাফ দেয়, নইলে আবার কোথাও মার মুখে না থাকলে, তবেই লাফ দেয়, নইলে এক চাল বসে থাকতে হয়; আবার কোথাও ঘোড়া হয়ে যদি কিস্তি পড়ে তবে লাফ দিতে পারে না; আবার কোথাও কোন অবস্থাতেই লাফ দেবার নিয়ম নেই। মেদিনীপুর জেলায় সদ্য-উন্নীত ঘোড়া লাফ পায় না, কিন্তু মন্ত্রী হলে তৎক্ষণাৎ এক চাল পায়। সিলেট অঞ্চলে দুই ঘোড়া, দুই গজ, কিংবা মন্ত্রী থাকতেও সেই-সেই ঘরের বড়ে অষ্টমে পড়তে পারে কিন্তু ঐ বড়ে গাধা হয়—গাধার চাল সামনে পিছনে কোনাকুনি একঘর মাত্র। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে একরকম নিয়ম আছে, তাকে মাস্তু নিয়ম বলে। তার মানে এই যে, নির্জোর ঘুঁটি ছাড়া অন্য ঘুঁটিকে মারা যায় না। এ রকম নিয়ম-বিভ্রাট নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়, তাতে আর সন্দেহ কি?

আন্তর্জাতিক খেলার উন্নতির মূলে রয়েছে চাল-লিপি বা চাল বুঝবার সহজ সঙ্কেত। প্রায় তিন-চার শ' বছর আগে পর্যন্ত যে-সব বিখ্যাত খেলা হয়েছে তা চাল-লিপিতে ধরা থাকায় যে কেউ সে খেলা গোড়ার থেকে সাজিয়ে আবার খেলে দেখতে পারে। এতে বিখ্যাত খেলোয়াড়দের সাধনা এক যুগেই নষ্ট হয়ে যায় না—পরবর্তীরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, এবং প্রতিভাবান নতুন খেলোয়াড়রা তার উন্নতি বিধানও করতে পারে, এইভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুশৃঙ্খলা মত উন্নতির পর উন্নতি হয়ে চলেছে, এখনও সে উন্নতির ধারা থেমে যায় নি এবং তুলনায় আমাদের দেশের খুব বড় বড় খেলোয়াড়ের রীতি বা পদ্ধতি তাঁর বৈঠকের সহচরদের মধ্যেই প্রধানতঃ আবদ্ধ থাকে এবং এক বাজী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত ভাবৈশ্বর্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদেশে সমষ্টিগত সাধনা নাই বললেই চলে। কিন্তু পূর্ববর্তীদের সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু ব্যক্তিগত প্রতিভা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা শ্রেষ্ঠ বিশারদের খেলার কায়দা বিশেষভাবে চর্চা করেন। শুধু শুরু-খেলা-সম্বন্ধেই কমের পক্ষে পাঁচ হাজার বই লেখা হয়েছে। মাঝের খেলা, শেষের খেলা, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের সব বই এবং সাময়িকীর এক-একখানা গণনা করলে বিশ হাজারের কম হবে না। এবং তুলনায় পাক-ভারতে এ-যাবৎ যে-সব বই লেখা হয়েছে তার সমষ্টি হয়ত কিছুতেই পঞ্চাশের উপরে যাবে না।

বাংলাদেশে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে একমাত্র বিধু-ঘোষের "দাবা খেলা" ছাড়া একখানাও চোখে পড়ে না। পাণ্ডুলিপি এ-যাবৎ দেখবার সুযোগ হয়নি।

এই অভাব একজনের চেষ্টায় পূরণীয় নয়। তবু বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টার সার্থকতা আছে।

সমকাল
ভাদ্র ১৩৬৪

বাংলা-ইংরেজি রচনা। মোতাহার হোসেন তাঁর প্রবন্ধচর্চার প্রেরণার পটভূমির কথা এবং সেইসঙ্গে প্রবন্ধের বিষয়-প্রকরণ ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন : 'বস্তুতঃ সমাজে সংস্কৃতি, শিল্প ও ধর্ম নিয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাঙালী মুসলমান সমাজে যে নতুন চিন্তার উদ্‌গম হয়–নব-জাগরণের সেই চিন্তার ধ্বনি আমাদের সকলের চিন্তায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার অনেকগুলো প্রবন্ধে সেই মানসিকতার ছাপ রয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে যে-গুলো ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতি নিয়ে সেগুলোর মধ্যে' ('নির্বাচিত প্রবন্ধ', ১ম খণ্ড, পৃ. ভূমিকা-৬)। পাশাপাশি তিনি তাঁর রচনার শিল্পগুণ রক্ষার ব্যাপারেও যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন সেই কথাটিও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: '... আমার লেখায় প্রসঙ্গ-ক্রমে ধর্ম ও সমাজের কথা অনেকবার এসেছে, এসেছে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের কথা, শিল্প ও সংগীতের কথা–কিন্তু সেসব কথা যাতে রিপোর্ট অর্থাৎ বিবরণী না হয়ে যায় সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল। আমি সাহিত্যকে সাহিত্য রস থেকে বঞ্চিত করে বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের ওকালতি করিনি' (ঐ, পৃ. ভূমিকা-৬)।

বর্তমান 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ'টি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য মোতাহার হোসেনের ১১০তম জন্মবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। নামকরণে 'নির্বাচিত' শব্দটি না থাকলেও এক-অর্থে এটি তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলনই। মোতাহার হোসেন নানা বিষয়ে যে-সব প্রবন্ধ বা প্রবন্ধধর্মী রচনা লিখেছিলেন তা থেকে বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাষা-বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রবন্ধগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। এই 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে'র সংকলন-সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর ড. আবুল আহসান চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন-চর্চায় যাঁর আগ্রহের স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে নানা প্রয়াসে।

'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' নামে সংকলিত প্রবন্ধগুচ্ছে কাজী মোতাহার হোসেনের বিচিত্র আগ্রহ, মানসতা ও সন্ধিৎসার পরিচয় যেমন, পাশাপাশি তাঁর চিন্তা-চেতনার মৌল প্রবণতা ও প্রকৃত স্বরূপটির প্রতিফলনও লক্ষ করা যাবে।

প্রচ্ছদ : উত্তম সেন